শারদীয়
গল্প-ভারতী

আশ্বিন, ১৩৭৭

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক :
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য পাঁচ টাকা

শ্রীদোলবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সুদীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠ সাধনা, অবিচলিত অধ্যবসায় অসীম সাহসিকতা ও বিপুল অর্থব্যয়ে গড়ে উঠেছে এই বিরাট বিচিত্র সার্কাস প্রতিষ্ঠান। আজ "অলিম্পিক" সার্কাস জগতের বিস্ময়। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম সার্কাস দেশবাসীকে অফুরন্ত আনন্দ ও কৌতুক দান করবে।

22864
756·3
০৩৪।৪

এই সংখ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডী

সুললিত সমাচার [সম্পূর্ণ উপন্যাস	বিমল মিত্র	১৫
তিনটি শব্দ	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬১
একদৃষ্টা	—পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৭৩
একটি নাগিনী কন্যার অভিসার রজনী	—সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮১
নমো নমো হিমালয় [পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ কাহিনী	—সুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী	৮৯
রাজাবদল	—শক্তিপদ রাজগুরু	১১৮
রাজা ও রাখাল [ছোট উপন্যাস]	—বাণী রায়	১৩১
সদা বৈরাগী	—চিত্তরঞ্জন মাইতি	১৫৫
মশালের আলো [সম্পূর্ণ উপন্যাস]	—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৬১
মূল্য	—রামপদ মুখোপাধ্যায়	২০৯
সফর	—সুবোধ বসু	২১৫
অপূর্ব রায় ও আমি	—বিভূতি ভূষণ গুপ্ত	২৩৩
খবর	—মহাশ্বেতা দেবী	২৪০
সীমা স্বর্গ	—মানবেন্দ্র পাল	২৪১
পিঞ্জর	—মায়া বসু	২৫৬
ভালোবাসা ছিল [সম্পূর্ণ উপন্যাস]	—আশাপূর্ণা দেবী	২৬৭
এক রাণী : একটি কণ্ঠহার	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১৯
পালকি	—কবিতা সিংহ	৩২৫
শুদ্ধতার চূড়ায় [ছোট উপন্যাস]	—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৩৩
ফেউ	—অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য	৩৬১
রণরঙ্গিণী [গুপ্তচর কাহিনী]	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	৩৬৯
লাহুলের বিবাহ প্রথা	—শম্ভু মহারাজ	৩৮৯
জ্বালবো বাতি [ছোট উপন্যাস]	—সুলেখা দাশগুপ্ত	৩৯৩
তৃষ্ণা [একাঙ্কিকা]	—মন্মথ রায়	৪১৭
শোকমুক্তি [উপন্যাসোপ মবড় গল্প]	—নরেন্দ্র মিত্র	৪২১
লেবেডেফের থিয়েটার প্রথম বাংলার নাট্যকার	—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ	৪৫১

আকর্ষণীয়

বাংলা সাপ্তাহিক

অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, খেলাধুলা
ছায়াছবি প্রভৃতি রচনায় সমৃদ্ধ।
প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকগোষ্ঠীকে প্রকৃত আনন্দ দান করে।

আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৩

এই সংখ্যায়

●

= সংযোজন =

পরিচালনা—বেলা দে

দেবী বর্ণনা		
সেকাল ও একালের দুর্গাপূজা	—অরুণা মুখোপাধ্যায়	৪
পূজার আয়োজন	– কল্যাণী মুখোপাধ্যায়	৬
পূজা মণ্ডপ	শাম্পা বসু	৭
আল্পনা	সুনীতি গুপ্ত	৯
উমা কি ভবনে এলো	হাসি ভট্টাচার্য্য	১২

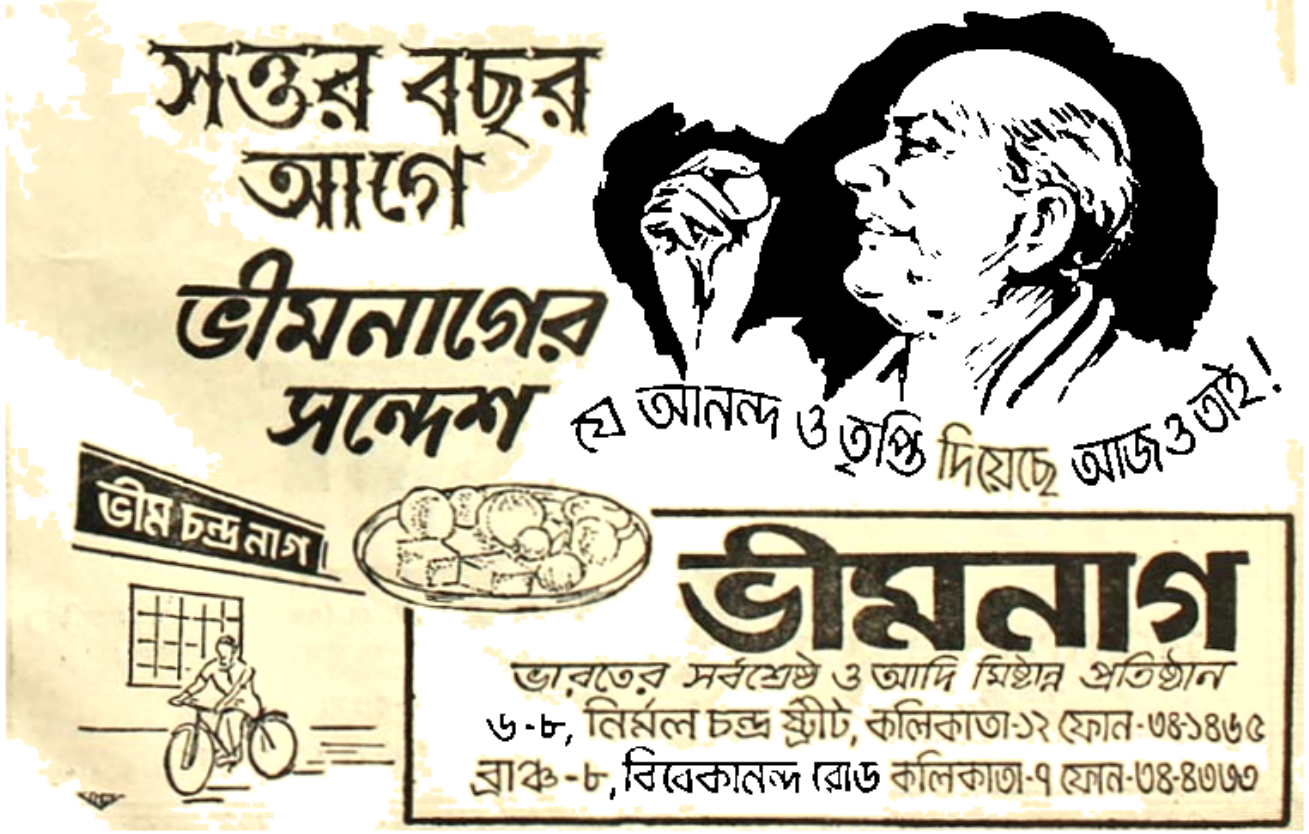

অকৃত্রিম,
বিশুদ্ধ ও ফলপ্রদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী

বলিতে

সাধনাকেই

বোঝায়

আয়ুর্ব্বেদ জগতে
বহু সাধনার ফল

সাধনা

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ্. সি. এস্. (লণ্ডন) এফ্. সি. এস্ (আমেরিকা)
আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যেকোন পত্রের তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া হয়।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এফ্. সি. সি. এস্. (লণ্ডন) আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য

এই সংখ্যায়

দেবীসজ্জার একাল সেকাল	—রূপা নন্দী
পূজার উপহার কেনাকাটা	—মীনা সেন
পূজোর তত্ত্ব	—বেলা দে
গৃহসজ্জা	—শকুন্তলা
পূজার দিনের খাবার	—অঞ্জলি চ্যাটার্জি
কনকাঞ্জলী	—অঞ্জনা ভট্টাচার্য
বিজয়া	—বেলা দেবী
সেকালের তথা অবারোয়ারী পূজার দালান	—জ্যোতির্ময়ী দেবী
আমার চোখে	—ইন্দিরা দেবী
পূজায় ভ্রমণ	—পুতুলা রায়

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-১৮৯৯
২৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

হেড অফিস : ৫৬/২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০

—এমাস এই প্রথম—

* এ দেশের মেয়ে *

মেয়েদের কল্যাণব্রতে—শুধু মেয়েদের পরিচালনায়

একমাত্র পত্রিকায়

শারদ অর্ঘ্য

এই অর্ঘ্য সাজিয়েছেন বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মেয়েরা :

ইন্দিরা দেবী, বেলা দেবী, মায়া বসু, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী, অঞ্জলি বসু, গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়, নীলিমা মুখোপাধ্যায়, আশা গঙ্গোপাধ্যায়, সতীদেবী মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, জয়ন্তী সান্যাল, হীমা মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, অরুণা মুখোপাধ্যায়, সুতপা চক্রবর্ত্তী, গীতা বসু, সুপ্রীতি ঘোষ, মনিয়া খাতুন, অর্পণা মুখোপাধ্যায়, রূপা নন্দী, শান্তা বসু, লক্ষ্মী ভট্টাচার্য্য, দীপালী রায়, অমিতা রায়, পুতুল রায়, করুণা সাহা, উমা দেবী, হাসিরাণী ভট্টাচার্য্য, চিত্রিতা দেবী, মঞ্জুশ্রী দাস, শ্রদ্ধা ভাদুড়ী, জয়ন্তী সেন, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, কাজল ঘোষ, সুনীতি গুপ্ত, পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য বিচারে অতুলনীয়

এই পত্রিকার মূল্য মাত্র—৩·০০ (তিন টাকা)

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

সত্বর সংগ্রহ করুন। পূজার পূর্বেই বেরুবে।

ফোন নং—৫৫-৬০৫৭
৫৫-১৩৫৫

সম্পাদিকা—বেলা দে
২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৬

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ

গল্প ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতি অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হউন

সডাক বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১৫৲

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৫২৯৪ ও ৫৫-১৩৫৫

চন্দন সৌরভে
সুরভিত হয়ে থাকুন

মলয়
স্যাণ্ডাল সোপ ও
ট্যাল্‌ক—দুয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে।

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ দিয়ে স্নানে আনন্দ—স্নিগ্ধশীতল ফেনায় গা ভুড়োবে—ঝক ঝকে হয়ে উঠবে কমনীয় কান্তিময়। আর স্নান শেষে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক গায়ে ছড়িয়ে দিলে দেহ-মন সতেজ হয়ে উঠবে। এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার দুয়ে মিলে আপনাকে দিনভর ঝরঝরে রাখবে—প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তও ঘিরে থাকবে চন্দন সৌরভে।

FILT 5Q1A

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

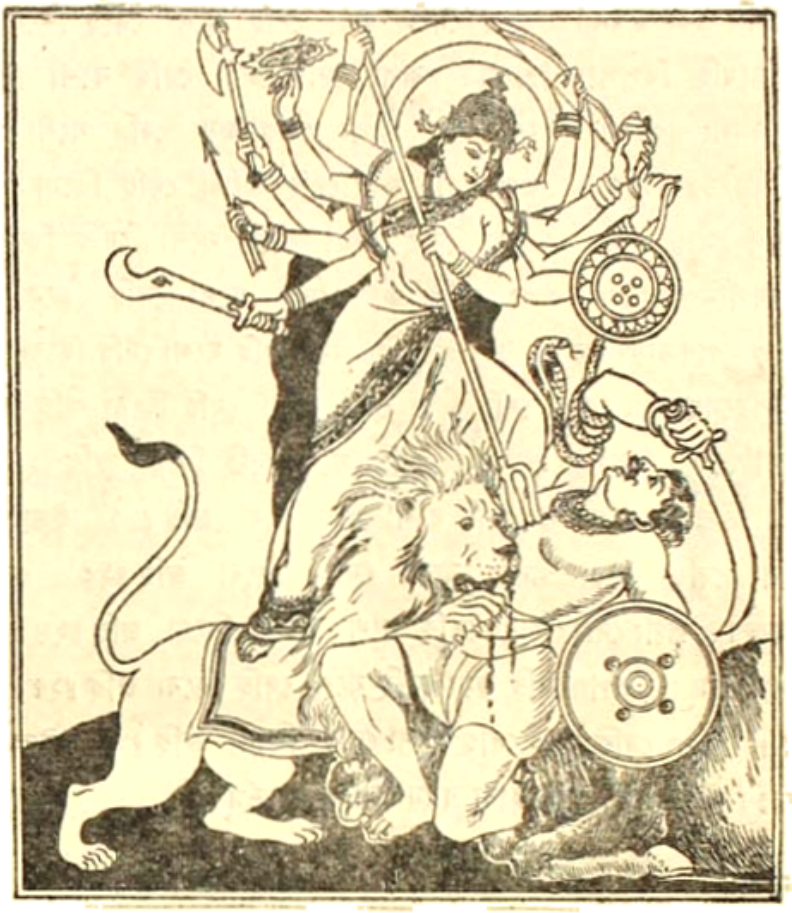

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপসারিণি। জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥১ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥২ মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃবরদে নমঃ। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩ মহিষাসুরনির্ণাশি বিধাতৃ বরদে নমঃ। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৪ ধূম্রনেত্র-বধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৫ রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৬ নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৭ বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৮ অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৯ নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১০ স্তবৈরুক্তো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১১ চণ্ডিকে সততং

স্তুতে জয়ন্তি পাপনাশিনি রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১১ দেহি সৌভাগ্য-আরোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৩ বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৪ বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৫ সুরাসুরশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৬ বিধেহি দেবি যশসং বিধেহি পরমং শ্রিয়ং। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৭ দেবি প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডদৈত্যদর্পনিসূদিনি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৮ প্রচণ্ড-দৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৯ চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্র সংস্তুতে পরমেশ্বরি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২০ কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২১ হিমাচলসুতানাথ সংস্তুতে পরমেশ্বরি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২২ ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৩ দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে রূপং দেহিঃ জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৪ ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৫ তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৬ ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ। সপ্তশত্যাং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥২৭

দেবী পূজার বোধন মন্ত্রে আমরা শুনতে পাই :—

ওঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা ॥

মর্ত্তে শরৎকালে এই যে দশভুজার পূজা—এর আরম্ভ করেন শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য এবং সে পূজার বোধন ও ঘটাদি কল্পারম্ভ করেন ব্রহ্মা স্বয়ং—

রাবণ বধের তরে বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামেরে অনুগ্রহের কারণ।
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে সৈল চণ্ডীর বোধন।
দেবগণ সহিতে পূজিল মহামায়।
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়।

* * *

ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়।
ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলুপাণি,
উপায় কেবল দেবী পূজা।
তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুরগণ,
বোধিয়া শরতে দশভুজা।

এখানেই দেখা যায় শরৎকালে দেবীপূজা শ্রীরাম চন্দ্রেরও আগে স্বর্গে স্বয়ং দেবরাজ করেছিলেন এবং অসুরদের পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মার উপদেশে দেবীপূজার জন্য ব্যাকুল হলেন :

বিধাতা কহেন প্রভু এক কর্ম্ম কর বিভু
তবে হবে রাবণ সংহার।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে যে এ দুঃখ পাথার।
শ্রীরাম কহেন তবে কিরূপে পূজিতে হবে,
অনুক্রম কহ শুনি তার।

শ্রীরামে আপনি কয়, বসন্ত শুভ সময়,
শরৎ অকাল এ পূজায়।
বিধাতার নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তায়।
সেদিন হ'য়েছে গত, প্রতিপদে আছে যত,
কল্পারম্ভ সুরথ রাজায়।

দেবীপক্ষের প্রতিপদে কল্পারম্ভ হয়। ধ্বনিত হয় চণ্ডীতত্ত্ব স্তোত্র। প্রকৃতি রূপ পালটায়—।

মহামায়া জগজ্জননীর কাছে সন্তানের আকুতি—মা! আমাকে জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, শান্তি দাও।

চণ্ডীতে আমরা পাই রাজা সুরথ ঋষি মেধসকে জানালেন তাঁর মনোবেদনার কথা; কেন তিনি রাজ্য ছেড়ে এলেও তাঁর আত্মীয় স্বজন-এর চিন্তা মন থেকে যাচ্ছে না :—

রাজোবাচ: ॥৩২

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ। দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিন্তায়ত্তাং বিনা ॥৩৩ মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি। জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥৩৪ অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ। স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি ॥৩৫ এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ। দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥৩৬ তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি। মমাস্য চ ভবত্যেষাঽবিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥৩৭

ঋষিরুবাচ: ॥৩১

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩২ দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥৩৩ জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্। যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥৩৪ জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্। মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥৩৫ জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু। কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৬ মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৭ তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥৩৮ তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥৩৯ জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥৪০ তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৪১ সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥৪২

রাজোবাচ: ॥৪৩

ভগবন কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কি দ্বিজ ॥৪৪ যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥৪৫

ঋষিরুবাচ: ॥৫৬

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥৫৭
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥৫৮

আজ আমরা এমনি এক যুগসন্ধির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। সংশয় ও অবিশ্বাসের কালো ছায়া আজ আমাদের ঘিরে রেখেছে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে চলেছে আজ হানাহানি, গৃহে গৃহে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

আবার শরৎ এসেছে আমাদের দ্বারে। শিউলী গন্ধ, অভ্রা বরণা জননীর আগমনী বারতাকে—তাঁর অভয় বাণীকে বয়ে এনেছে। আমরাও তাই কুসুম জলে পূজার অর্ঘ্য সাজাতে চলেছি পূজা মণ্ডপে।

মা! আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের এই আশা পূর্ণ কর। তোমার পূজা সার্থক হউক। আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত গ্রহণ কর—

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।
আধার ভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে।
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুয়সে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ।
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১ অ।

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ধ্যান

ওঁ ঘটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্। অতসীপুষ্পবর্ণাভাং (তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং) সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্। ত্রিশূলং দক্ষিণে ধোয়ং খড়্গং (শঙ্খং) চক্রকরাধঃ। তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ। ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ। শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদানবং খড়্গপাণিনম্। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদ্রুধিরভূষিতম্। রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত-বিস্ফুরিতেক্ষণম্। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটিভীষণাননম্। সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ। দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি। সক্রুদ্ধমকরীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্। শৃণ্বন্তমিব তদ্রূপমম্বিকৈঃ সন্নিবেশয়েৎ। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা। আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

গায়ত্রী। মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

মন্ত্র। ওঁ ভক্তযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ নমো দুর্গায়ৈ নমঃ।

প্রণাম

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে, জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্যের আগমনী গান কয়টি গাইতেন

আগমনার গান

(১)

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা মা মা বলে কেঁদেছে।
সোনার বরণী গৌরী আমার, ভাঙড় ভিখারী জামাই তোমার,
মায়ের যখন দুখের আভরণ ভাঙ ধুতুরা ভাল খেয়েছে।

(২)

গিরি গণেশ আমার শুভকারী, পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, বর্ণে শুনব চণ্ডী, আসবে কত হাতী ঘটাঘুটধারী।
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
হরেণ দুখার গণেশ আমার তাদের না দেখিলে ঝরে নয়নবারি।

(দাশরথি রায়)

(৩)

ওকে মা এলি সো গিরিদাদার বেটি
দুনো ছোকরাডি সাথ দুনো ছুকরিডি সাথ।
আর এক বেটা বুলপি কাটা
কামড়ে দিল দুঁটি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: "ভক্তিভাবে ও আন্তরিক পূজাই আসল পূজা। ভক্তের ভক্তির টানেই মায়ের আবির্ভাব হয়। আন্তরিক না হলে, ভক্তি না থাকলে সে পূজায় কোনই ফল হয় না। সে পূজা নিষ্ফল।

"পরমহংসদেবের দেশের নিকটে কোন এক গ্রামে একজন দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি লোকের বাড়ী চণ্ডীপাঠ করে দিন যাপন করতেন। সর্বমঙ্গলা নামে তাঁর একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি সুরূপা দেখে একজন জমিদার তাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে যান। ব্রাহ্মণ একদিন চণ্ডীপাঠ ক'রতে ক'রতে মনে করলেন, মা আমি গরীব মানুষ বলে কি তোমায় পূজা করতে পাব না? কেবল বড় মানুষরাই কি তোমার পূজা করবে? ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন যেমন করে হোক্ একবার মায়ের পূজা করতেই হবে। ব্রাহ্মণী তাঁর মনের ভাব জেনে সম্মত হ'লেন এবং দারা বৎসর চেষ্টা করে দু'জনে বারটি টাকা জমালেন। পূজার দিন নিকটবর্তী হ'ল ব্রাহ্মণ একটি আধুলি নিয়ে কুমার বাড়ী গিয়ে বললেন, "বাপু! এই আধুলিটি নাও, যেমন হয় একখানি প্রতিমা গ'ড়ে দাও।" কুমার বললে, "ঠাকুর মশাই! আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি! দুর্গা পূজা করবেন আপনার এমন সামর্থ কি?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "আজ এক বৎসর ধ'রে মানস করেছি এবার পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্বদল দেব, তা বাপু এতে সামর্থ আর অসামর্থ কি? তুমি এই আট আনায় যেমন হয় একখানি প্রতিমা গ'ড়ে দাও।"

কুমার বললে, "তা ভাল আপনি আধুলিটা নিয়ে যান, আমি আপনাকে একখানা প্রতিমা গ'ড়ে দেব এখন।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "না বাপু তা হবে না ঐ আট আনায় যেমন হয় তুমি আমায় একখানা প্রতিমা গ'ড়ে দাও।" ব্রাহ্মণ কোন মতেই আধুলিটা ফিরিয়ে নিলেন না, অগত্যা কুমার আধুলিটা নিয়ে তাঁকে একখানা ভাল প্রতিমা গ'ড়ে দিলে। ব্রাহ্মণী সর্বমঙ্গলাকে আনবার কথা বললে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সে কথায় কান দিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আমার তো সে রকম পূজা নয় যে, তার শ্বশুরবাড়ী নেমন্তন্ন করি। আর বিশেষ তারা বড় লোক, নিজেদের বাড়ী পূজা, এ সময় তাঁরা তাকে পাঠাবেই বা কেন? পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণ প্রতিমা বাড়ীতে আনলেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে বললে, "তুমি সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে এসো।"

ব্রাহ্মণ অগত্যা তাই ক'রতে বাধ্য হলেন। সর্বমঙ্গলার শ্বশুর শাশুড়ী তাকে পাঠাতে চাইলে না, তাঁরা বললেন, "আমাদের বাড়ীতে পূজা, আর ঐ আমাদের একমাত্র পুত্রবধূ, তাকে এ সময়ে কি ক'রে পাঠাব।" ব্রাহ্মণ সর্বমঙ্গলার সঙ্গে দেখা ক'রলেন, সর্বমঙ্গলা বাপের কথা শুনে কাঁদতে লাগলো—কিন্তু সে কি করবে, শ্বশুর শাশুড়ীর অমতে তো সে যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ তাকে সান্ত্বনা ক'রে তাদের বাড়ী থেকে চলে আসছেন, এমন সময় পথের মাঝে শুনতে পেলেন যে, পিছন থেকে "বাবা—বাবা" ক'রে ঠিক যেন সর্বমঙ্গলার মতন কে ডাকছে। ব্রাহ্মণ পিছন পানে চেয়ে দেখেন যে সর্বমঙ্গলা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে। তিনি সেখানে দাঁড়ালেন, ক্রমে সর্বমঙ্গলা নিকটে এসে বললে, "বাবা! আমি এসেছি।" ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বললেন, "কাউকে না বলে এলে, শেষে কোন বিপদ হবে না তো?"

সর্বমঙ্গলা বলল, "না বাবা! সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই।" ব্রাহ্মণ সর্বমঙ্গলাকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন, ব্রাহ্মণীরও ভারি আনন্দ হল। সপ্তমী অষ্টমী মায়ের পূজা হয়ে গেল, নবমীর দিন সকালবেলা সর্বমঙ্গলা তার বাবাকে বললে "বাবা পুজোয় ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয় না?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "নিয়ম বটে কিন্তু আমি কোথায় পাব যে বামুন খাওয়াব? তবে মায়ের যদি দয়া হয় তো আগামী বৎসরে দেখবো।"

সর্বমঙ্গলা বলল, "বাবা! আমি তবে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসি?" ব্রাহ্মণ নিষেধ ক'রলেন, কিন্তু সর্বমঙ্গলা সে কথা না শুনে পাড়ার লোকদের সব প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ ক'রে এলো। ফলারের কথা শুনে যথা সময়ে দলে দলে লোক এসে উপস্থিত হল। লোকের ভিড় দেখে ব্রাহ্মণ ভীত হলেন এবং সর্বমঙ্গলাকে নানা প্রকার তিরস্কার করতে লাগলেন। সর্বমঙ্গলা বলল, "বাবা! ভয় কি? আমি সকলকে প্রসাদ ভোজন করাবো, তুমি চিন্তা করো না, জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সেই মা আজ তোমার ঘরে উপস্থিত। তুমি কেন ভয় কর, তিনি কি এই ক'টি লোককে খাওয়াতে পারবেন না?" পরে সর্বমঙ্গলা বাইরে এসে নিমন্ত্রিত লোকদের বললেন, "আমার বাবা দীনদুঃখী তিনি আপনাদের ষোড়শোপচারে ভোজন করান এরকম সঙ্গতি তাঁর নেই, তবে মহাপ্রসাদ পাবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিলাম। আসুন সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।" সর্বমঙ্গলা মহাপ্রসাদ বের করলে, প্রসাদ থেকে এমন এক সৌরভ বেরুতে লাগল যে, সকলে মোহিত হয়ে গেল। প্রসাদ থেকে এরকম সৌরভ বেরুতে কেউই কখন দেখে নি, শুনে নি।

সর্বমঙ্গলা একটু একটু প্রসাদ সকলকে দিল, অমনি সকলের পেট ভরে গেল। পাড়ার লোক আশ্চর্য; প্রসাদ পেয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। ব্রাহ্মণ এতক্ষণ একান্ত মনে ভগবতীকে স্মরণ

করছিলেন, লোকরা চলে গেলে পর চোখ খুলে সর্বমঙ্গলাকে বললেন, "আমায় বুঝি সকলেই শাপ দিয়ে গেল?" সর্বমঙ্গলা বললে "শাপ দেবে, কেন বাবা? সবাই প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হ'য়ে চলে গেল, ঐ দেখ এখনও এত প্রসাদ রয়েছে যে, গ্রামশুদ্ধ লোককে খাওয়ান যায়।" ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হ'য়ে সর্বমঙ্গলার অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন। পরদিন বিজয়া, ব্রাহ্মণ ভগবতীকে দধি-কড়মা নিবেদন করবার পর চোখ খুলে দেখল যে, সর্বমঙ্গলা তা ভক্ষণ করছে, ব্রাহ্মণ ক্রোধে অন্ধ হয়ে ব্রাহ্মণীকে ব'ললে, "দেখ দেখ তোমার মেয়ের বিবেচনা দেখ, হায়! কি সর্বনাশ হল। কাল ভগবতীর কৃপায় ব্রহ্মশাপ হতে রক্ষা পেয়েছি, আজ আবার তুই এই করলি?" সর্বমঙ্গলা এ কথা শুনে কাঁদতে লাগল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সর্বমঙ্গলার কান্না দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে স্থির হতে বলে পুনরায় দধি-কড়মার আয়োজন করতে গেল। ব্রাহ্মণ পুনরায় দধি কড়মা নিবেদন করে দিলেন সেবারেও সর্বমঙ্গলা তা উচ্ছিষ্ট করে দিল। ব্রাহ্মণী তৃতীয়বার দধি-কড়মা এনে দিল, সেবারেও সর্বমঙ্গলা তা উচ্ছিষ্ট করে দিল, ব্রাহ্মণ তা দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে সর্বমঙ্গলাকে দূর হয়ে যেতে বললেন, সর্বমঙ্গলা অমনি কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে গিয়ে বলল; "বাবা আমায় দূর হয়ে যেতে বলেছেন, আমি যাই। আমি আজ তিন দিন কিছু খাইনি, এখুনি অনেক দূর যেতে হবে বলে এবং অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছিল বলে দধি-কড়মা খেয়েছিলাম, বাবা তাতে বিরক্ত হ'লেন, মা এক্ষণে আমি বিদায় হই।" ব্রাহ্মণী পুনরায় দধিকড়মার যোগাড় করেছিলেন, পেছন ফিরে দেখেন সর্বমঙ্গলা সেখানে নাই, ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে সর্বমঙ্গলাকে ডাকতে লাগল, কিন্তু সর্বমঙ্গলাকে দেখতে না পেয়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে সকল কথা বলল। ব্রাহ্মণের প্রাণ কেঁদে উঠল এবং তাড়াতাড়ি সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। সর্বমঙ্গলা সকল কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, "বাবা তুমি কি বলছ, আমি তোমার বাড়ী কখনই বা গেলাম, কখনই বা দধি-কড়মা খেলাম এবং তুমিই বা আমাকে কখন দূর করে দিলে? আমি তো তার কিছুই বুঝিতে পারছিনা। আমি এখানে যেমন ছিলাম তেমনি আছি।" ব্রাহ্মণ কন্যার কথা শুনে অবাক হলেন এবং তখন সকল কথা বুঝতে পেরে বক্ষে করাঘাত করে ভূমিতে পড়ে কিছুক্ষণ অচেতন হয়ে রইলেন, পরে চৈতন্য হলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন, "হায়! হায়! আমি কি করলাম, পরম যত্ন করে পেয়েও চিনতে পারলাম না? হায় মা! কেন আমায় এভাবে বঞ্চনা করলে? আমি অধম, যদি কৃপা করে আমার বাড়ী এলে, আমায় 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকলে তবে মা কেন আমার চোখটী খুলে দিলে না আমি তোমার নিত্যরূপ; দেখে কৃতার্থ হতাম।" ব্রাহ্মণ এইরূপে বিলাপ করতে করতে নিজ বাড়ীতে এসে ব্রাহ্মণীকে সবিশেষ বললেন। ব্রাহ্মণীরও শোকের সীমা রইল না।

এবার পুজো এলো প্লাবন নিয়ে।

বস্ত্রাত্রাণেও দলাদলি।

কা'রো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ !!

প্রাক পূজা পরিকল্পনা !

সুখী পরিবার ! আমরা অসুখী কেউ নই !

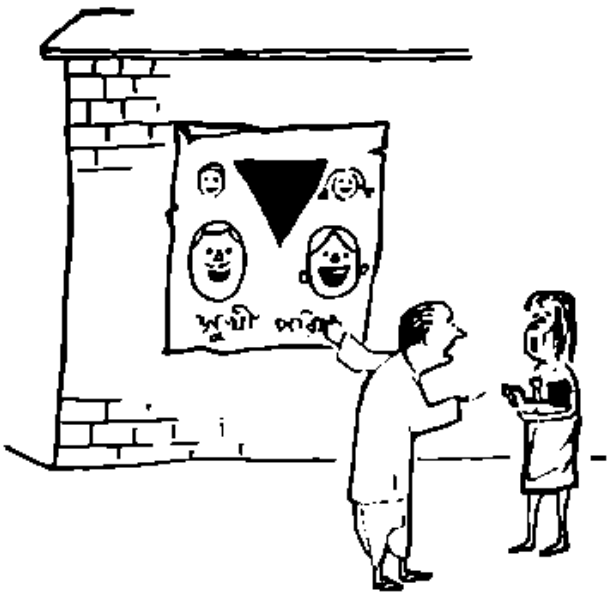

বাবু ! আমরা পড়তেও জানিনা
ছবির মানেও বুঝি না—
আমাদের কি হবে ?

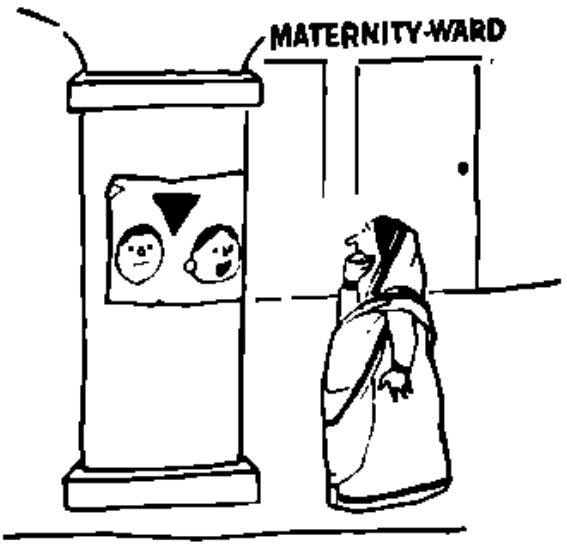

—আপনি বুঝি প্রতিবছরই আসেন
একবার করে !

পুলিশ সমাচার

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজোয় চাই
নতুন জুতো

Bata

জীবনী সকলেরই শোনবার মত। তা সে রাম-শ্যাম-যদু-মধু যে কারোরই হোক। যদি তেমন করে লেখা যায় তো সকলের জীবনী নিয়েই মহাভারত লেখা যায়। রামায়ণ লিখেছিলেন বাল্মিকী। কিন্তু সে বাল্মিকী না লিখে অন্য কেউ লিখলে তা আর রামায়ণ হতো না। হতো অন্য কিছু। শামুয়েল জন সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি বস্‌ওয়েলের জন্যে। স্যামুয়েল জনসনের জীবনী না লিখে বস্‌ওয়েল সাহেব যদি অন্য কারো জীবনী লিখতেন তাহলে তাও ধন্য হয়ে উঠতো সমান বিখ্যাত।

রামায়ণের রামের মহা-সৌভাগ্য যে বাল্মিকী তাঁর জীবনী রচনা করেছিলেন। স্যামুয়েলেরও সেই একই সৌভাগ্য! কিন্তু হায়, আজকের যুগে সেই রাম বা স্যামুয়েল জনসনও যেমন নেই, সেই বাল্মিকী বা বসওয়েলও নেই। আজকের ক্যাইক্লোপীডের যুগে সবাই রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর। কেউই ছোট নয়। খবরের কাগজই আজকে সমস্ত মহাপুরুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। সে যাকে বড় বলে আমরা তাকেই বড় বলি। সে যাকে ছোট করে আমরাও তাকে ছোট করি।

আমি সুললিতকে ছোটবেলা থেকে চিনতাম।

সুললিত চ্যাটার্জি। শুধু একসঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম বলে নয়। আমার বাড়ির কাছে তাদের বাড়ি বলেই তাকে বেশি করে চিনতাম।

কিন্তু কোথায় যেন আমাদের দলের সকলের সঙ্গে সুললিতের একটা পার্থক্য ছিল।

ছোটবেলায় যখন আমরা হাতীবাবুর বাগানে পেয়ারা চুরি করতে যেতাম তখন সুললিত বলতো—না ভাই আমি হাতীবাবুর বাগানে যাবো না—

আমরা জানতাম চুরি করতেই সুললিতের আপত্তি! কিন্তু পরের বাগানের গাছে কি পেয়ারা চুরি করাটা আসলে চুরি? ওকে যদি চুরি করা বলি তো রাস্তার পড়ে থাকা কোনও জিনিস কুড়িয়ে পাওয়াটাও তো চুরি? চুরির ধাতুগত অর্থে একটা আলপিন চুরি করাও তো চুরি, আবার সিন্দুক ভেঙে লক্ষ টাকা চুরি করাও চুরি। কিন্তু সেটাকে কি প্রচলিত অর্থে আমরা চুরি করা বলি?

বিদ্যাসাগর মশাই অবশ্য লিখে গেছেন—'পরের দ্রব্য না-বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।' কিন্তু কে আর এ-যুগে বিদ্যাসাগর মশাইকে মানে? এই যে আজ এত বছর পরে এই বছরে তাঁর দেড়-শো বছরের জন্ম-বার্ষিকী পালিত হতে চলেছে, এও তো দেখে-শুনে মনে হয় যেন একটা প্রহসন।

সুললিতের মতন কত ছোট-খাটো বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে রয়েছে তা কে বলতে পারে?

সুললিত বলতো—না ভাই, পয়সা দিলে কত পেয়ারা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, মিছিমিছি হাতীবাবুর বাগান থেকে চুরি করতে যাবো কেন ?

মনে আছে এই সুললিতকেই আমরা এককালে 'যুধিষ্ঠির' বলে সবাই ঠাট্টা করতাম।

বলতাম—সুললিত আমাদের কলিযুগের যুধিষ্ঠির—

কিন্তু আমাদের সময়ে স্কুলের মাস্টার-মশাইরা ছিলেন অন্য প্রকৃতির। এখনকার মত তাঁদের কথায়-কথায় স্ট্রাইক-ধর্মঘট করবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠতো না। গান্ধীজীর আগে কাকে বলে হরতাল, কাকে বলে ধর্মঘট তা আমরা জানতাম না। আমরা জানতাম শিক্ষক মানে পূজনীয় ব্যক্তি। শিক্ষকের আদর্শেই আমরা নিজেদের গড়ে তোলবার চেষ্টা করতাম। এক-একজন শিক্ষককে আমরা যেমন ভয় করতাম তেমনি আবার ভক্তি করতাম। রাস্তায় দেখা হলে তখন যে যে-অবস্থায় থাকি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম, কিংবা সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় গতি পরিবর্তন করে অদৃশ্য হতাম।

কিন্তু সুললিত সে-রকম নয়।

সে সোজা গিয়ে শিক্ষকের সামনে মাথা নিচু করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

রাধামাধববাবু আমাদের অঙ্ক করাতেন।

তিনি সুললিতকে দেখেই তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন।

সুললিত বলতো—আপনার বাজারের থলিটা দিন স্যার, আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

রাধামাধববাবু তখন বাজার করে ফিরছিলেন। তাঁর থলির মধ্যে আলু-পটল শাক-মাছ মিলে অনেক বোঝা হয়ে গিয়েছিল।

রাধামাধববাবু আপত্তি করতেন। বলতেন—না না, তুমি নেবে কেন ? আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারবো—

কিন্তু সুললিত না-ছোড়-বান্দা! বলতো—না স্যার, আমি আপনার ছাত্র, আমি থাকতে আপনি কেন বইবেন ?

শেষকালে সেই বাজারের থলি সুললিত রাধামাধববাবুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তবে শান্ত হতো। তারপর রাধামাধববাবুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতো। অথচ সুললিতকে নিজের বাড়ির কোনও কাজ কখনও নিজের হাতে করতে হতো না। সুললিতদের অবস্থা ভালো ছিল। দারোয়ান, চাকর, বাবুর্চি সমস্ত কিছু ছিল। সুললিতের নিজের ছিল শৌখিন রাখনের মত মেয়েলি চেহারা। কাজ-কর্ম করা তার ধাতে আসতো না। কিন্তু গুরুজনদের বেলায় সে কোনও কাইতোগ করতে কোনও দিন পেছপাও হয়নি।

আর শুধু কি তাই ?

চুরি না করা বা পরোপকার করা, এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক গুণ নয়। সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক পাওয়া যাবে যারা কোনও দিন চুরি করেনি, কিংবা যারা সুযোগ পেলেই অন্যকে রক্ষা করে এসেছে বা যারা প্রাণ দিয়ে পরোপকার করেছে।

কিন্তু মিথ্যে কথা বলেনি এমন লোক ক'জন আছে সংসারে।

মিথ্যেও দু'রকমের। ছোট ছুরি আর বড় ছুরির মত ছোট মিথ্যে আর বড় মিথ্যেও আছে। কিন্তু সুলালিতের কাছে ছিল মিথ্যে মিথ্যেই।

মিথ্যে কথা না বলতে পারার জন্যে একবার মনে আছে সুলালিত ইংরেজিতে ফেল করেছিল। অথচ যদি মিথ্যে কথা বলতো তাহলে ইংরেজিতে সে ফার্স্ট হতো।

হেডমাস্টার মশাই শশীকান্তবাবু তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন—তুমি। কি বই দেখে টুকে লিখেছ?

সুলালিত বললে,—না স্যার।

—তাহলে কি মুখস্থ লিখেছিলে?

সুলালিত বললে—না।

টুকেও লেখোনি, আবার মুখস্থও লেখোনি, তাহলে এ্যানুয়াল-পেপার এত নিখুঁত হলো কী করে?

শশীকান্তবাবু খুব কড়া হেড-মাস্টার ছিলেন। আজকালকার হেড্-মাস্টার হলে তাঁকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। কিন্তু সেকালে মাস্টার-মশাইরা যত কড়া হতেন ছাত্ররা ততই তাঁদের ভয় করতো।

—বলো! জবাব দাও?

শশীকান্তবাবুর হাতের বেত টেবিলের ওপর চটাৎ করে শব্দ করে উঠলো।

সেদিন সুলালিত যদি বলতো যে সে মুখস্থ করে লিখেছে তাহলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কারণ মুখস্থ করা তো আর অপরাধ নয়। আর তা ছাড়া মুখস্থই সে করেছিল। কিন্তু এক জায়গায় এসে পৌঁছে সে ভুলে গিয়েছিল। পাশেই সলিল খাতা খুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল। তার খাতার দিকে চেয়ে দেখতেই আবার সবটা মনে এসে গিয়েছিল। একটা মাত্র শব্দ। সেই শব্দটা দেখেই সব কিছু গোলোপা হয়ে গিয়েছিল।

—কই, জবাব দিচ্ছ না যে? জবাব দাও?

সুলালিত বললে—একটা জায়গায় আমার আটকে গিয়েছিল তাই আমার পাশে সলিলের খাতা দেখে নিয়েছিলুম—

আর কথা নয়। শশীকান্তবাবু বললেন—ঠিক আছে, আমি তোমায় ফেল করিয়ে দিলাম—

ফেল তো ফেল। শশীকান্তবাবুর যে-কথা সে-ই কাজ। যে সুলালিত কখনও কোনও দিন জীবনে কোনও পাবলিক্ পরীক্ষায় ফেল করেনি সেই-ই সেবার ইংরাজিতে ফেল করলো।

আমরা বললাম—কেন সত্যি কথা বলতে গেলি তুই? সলিল তো তোর চেয়ে খারাপ ছেলে। সলিলের খাতা দেখে তুই টুকছি এ কেউ বিশ্বাস করবে না—

সুলালিত বললে—কিন্তু আমি যে সত্যিই সলিলের খাতা দেখেছিলুম—

—তা সে-কথা বলতে গেলি কেন তুই?

সুলালিত বললে—তা সত্যি কথা বলবো না?

আমরা সবাই সুলালিতের সত্যি কথার ঘোড় দেখে তার বোকামিতে হেসে উঠেছিলাম:

—তাহলে সত্যি-কথা বলার ফল ভোগ কর্।

এতেও সুললিতের শিক্ষা হয়নি। এর পরে সুললিত আমাদের সঙ্গেই বি-এ এম-এ পাশ করলে। আমরা যে-যার দিকে জীবন-সংগ্রামের চাকার তলায় তলিয়ে গেলাম। তখন আমাদের সকলের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু যদি কচিৎ-কদাচিৎ কারোর সঙ্গে রাস্তায়-ঘাটে দেখা হয়ে যেত তো পরস্পরের খবর নিতাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ হয়েছে সেলস্‌ম্যান, কেউ কেরাণী, আবার কেউ বা সেক্রেটেরিয়েট অফিসার। কেউ বা তখনও ভ্যাগাবণ্ড ভাজছে। জীবনের পাশা খেলায় কেউ সাময়িকভাবে জিতেছি, আবার কেউ সাময়িকভাবেই হেরে গিয়েছি।

এমনিই হয়ত হয়। এখন অবশ্য বড় হয়ে বুঝেছি যে জীবনে এই হার-জিৎটা কিছু নয়। কারণ কত লোকের উত্থান দেখলাম, আবার কত লোকের পতন। উত্থান যাকে বলি সেটাও সব সময় ঠিক উত্থান নয় আসলে, আবার পতন যাকে বলি সেটাও ঠিক পতন নয়। আসলে হার-জিৎ কথাটাই আপেক্ষিক। কিন্তু বেশি টাকা আয় করলেই কেউ বড় হয় না, ছোট চাকরি করলেই কেউ ছোটও হয় না। নিজের বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড়র সংজ্ঞাও আমার বদলে গেছে।

কিন্তু এ-সব অনেক পরের কথা!

যার গল্প বলতে বসেছি তার গল্পটা আগে বলি। কারণ সুললিত যত সামান্যই হোক তার কাহিনীর মধ্যে আমি জীবন-রহস্যের একটা সূত্র পেয়ে গেলাম বলেই আমার এত আগ্রহ।

অথচ সুললিত রামায়ণের রামও নয়, বঙ্কিমের জগৎশেঠও নয়। আমার নিজেরও এমন ক্ষমতা নেই যে আমি সুললিতকে ঈশ্বরের লয়-পর্যায়ে তুলে ধরবো। তবে এ-টুকু বলতে পারি যে আমার চেয়ে আরো কোন ক্ষমতাবান হলে হয়ত তা পারতো।

★

যে সুললিতের কথা বলছিলাম, তার কথা এতদিন পরে বলার একটা সঙ্গত কারণ আছে।

কারণটা হলো সেদিন আবার বহুকাল পরে সুললিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হওয়ার মধ্যে সব সময় যে আনন্দ আছে তা নয়। কারণ সাফল্য যার হয়নি সে সাধারণতঃ অতীতের পরিচিতদের এড়িয়ে চলতেই চায়। সাধারণতঃ সকলেই টাকার মাপে সাফল্যকে বিচার করে থাকে। যার দু'ইঞ্চি কম সাফল্য হয়েছে সে তাকেই এড়িয়ে চলে যার চার ইঞ্চি সাফল্য হয়েছে। এ-সব দেখে মাঝে-মাঝে ঘৃণাও হয়, আবার হাসিও পায়। হাসি পায় এই ভেবে যে মানুষ আজকাল কত অল্প নিয়ে তুষ্ট থাকে!

তা সেই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়েছে। কাঁধে কার হাতের ছোঁওয়া পেয়েই চমকে উঠলাম।

—কে?

—আমি সুললিত রে, ডাকাত নই।

বলে সেই আগেকার মত হেসে উঠলো।

বললাম—ছুটিতে বুঝি?

সুললিত বললে—চাকরি ছেড়ে দিয়েছি—

—কেন?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। স্পেশাল-পুলিশের চাকরি ছিল সুললিতের। সে-যুগে সুরুতেই ছপো

টাকা মাইনের চাকরি পাওয়া যে-সে কথা নয়। আমার মনে আছে সুললিতের অত ভালো চাকরি পাওয়ার খবরে ঈর্ষান্বিতই হয়েছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই গানের লাইনটা মনে পড়ায় যে-ব্যথা মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনটা হলো—'যার কপালে যা জুটেছে সেই আমাদের ভালো'।

আমাদের মধ্যে শলিলের তখনও কিছু চাকরি হয়নি। সে সুললিতের চাকরি হওয়ার খবর শুনে বলেছিল—দূর, পুলিশের চাকরি আবার একটা চাকরি নাকি!

কথাটার মধ্যে এমন ভাব ছিল যে পুলিশের ভালো চাকরি পেলেও সে যেন করবে না।

কিন্তু সেই অত ভালো চাকরিটা সুললিত ছেড়ে দিলে শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। বাঙালীর ছেলে অহরহ প্রাণ। চাকরি কি বাঙালী সহজে ছাড়তে পারে?

জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল তোর?

সুললিত বললে—মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল ভাই।

—মিথ্যে কথা? তার মানে?

—হ্যাঁ ভাই, একটা দারুণ মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল।

আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। পুলিশের চাকরিতে মিথ্যে কথা বলাটা একটা অপরাধ নাকি? আর পুলিশের চাকরির নামে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? আজকাল প্রাণ রাখতেই তো প্রাণান্ত। যে-কোনও রকমে আমরা সবাই আপোষ করেই তো বেঁচে আছি। কেউ স্বামীর সঙ্গে আপোষ করছি, কেউ বা স্ত্রীর সঙ্গে। রাস্তায়, বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে, প্লেনে আমরা তো হামেশাই আপোষ করে চলছি। পাশের লোক ট্রামের ভাড়া না দিয়ে লুকিয়ে নেমে যাচ্ছে দেখেও তো কই কেউ প্রতিবাদ করি না। অন্যায় অবিচার অত্যাচার আমরা মুখ বুঁজেই সহ্য করে চলেছি। সেও তো এক রকমের মিথ্যাচার।

সেই মিথ্যাচারটা কি সুললিতের কাছে এত বড় হলো যে তাকে চাকরি ছাড়তে হলো! আর যে-সে চাকরি নয় তার, তাল ইণ্ডিয়া-গভর্নমেণ্টের গেজেটেড্ পোষ্ট। সামান্য মিথ্যে কথা বলার জন্যে চাকরি ছেড়ে দিলে!

বললাম—অফিসের কর্তারা কি তোকে জোর করে মিথ্যে কথা বলতে বললে?

সুললিত বললে—না। তা হলে তো বাঁচতুম। মনে মনে একটা সান্ত্বনা পেতুম এই ভেবে যে আমি অন্যায়ের প্রতিবাদে চাকরি ছাড়লুম। কিন্তু এতো তা নয়। আমি নিজে থেকেই মিথ্যে কথা বললুম তাই—

—কেন?

সুললিত বললে—সে এক ট্র্যাজেডি—

বললাম—কী রকম? কী মিথ্যে কথা তুই বললি?

সুললিত বললে—সে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। আসলে এর পেছনে অঞ্জলি আছে—

—অঞ্জলি?

আমি অঞ্জলির নাম শুনে আরো অবাক হয়ে গেলাম। সেই অঞ্জলি। সে অঞ্জলি এতদিন পরে কোত্থেকে এল?

সুললিত বললে—আমাদের বাড়িতে একদিন আসিস না। আমাদের নতুন বাড়ি তো তুই চিনিস।

আমি যাবো বলাতে সে সেদিনকার মত চলে গেল।

292864

*

আমাদের সেই ছাত্র-জীবনে আমরা অতসিকে দেখেছিলাম। দেখবার কারণ আমাদের এই সুললিত। সে-যুগে আমাদের মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশার কোনও সুযোগ ছিল না। সেই তখনকার দিনে সুললিত প্রায় অতসিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেই ফেলেছিল।

আমাদের সঙ্গে যার দেখা হতো হঠাৎ তার অন্তর্ধান দেখে আমরা বন্ধুর দল সবাই প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দলিল একদিন বললে - হ্যাঁ রে, সুললিতটার কী হলো? সে যে আসে না বড়?

কথাটা আমাদেরও মনে সাড়া তুললো। সত্যিই তো, সুললিত তো ক'দিন ধরে আমাদের আড্ডায় আসছে না।

সেদিন আমি নিজেই গেলাম সুললিতদের বাড়ি। সুললিতদের বহুকালের পুরান বাড়ি। পুরপুরুষের বাড়ি। আর একান্নবর্তী সংসার। কাকা, বাবা, জ্যাঠা, খুড়তুতো ভাই, জাঠতুতো ভাই, একেবারে ভর-ভরাট সংসার, যাকে বলে। বাইরের সদর দরজাটা রাত দশটা পর্যন্ত হাট করে খোলা পড়ে থাকতো। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেই একটা বড় ঘর একপাশে, সেখানে হাতীর মতন পুরোন আমলের সব জাঁদরেল। রাত্রে আশে-পাশে চাকর-বাকরা শুতো। তারপর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যে-যার মাদুর-বিছানা গুটিয়ে তক্তাপোষের তলায় লুকিয়ে রাখতো। সে-ঘরে কখনও কেউ বসতো না বলে একপুরু ধুলো জমে থাকতো জাঁদরেলগুলোর ওপর।

ছোটবেলায় ওই ঘরখানাতেই ছিল আমাদের আড্ডা।

ওইখানাতে বসে আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতাম। বড় হয়ে আমরা কী হবো তারই গোপন পরামর্শ। টাকা উপায়ের প্রশ্ন আমাদের মনের কারো ছিল না। কারণ মোটামুটি খাবার-পরবার সংস্থান আমাদের সকলের পরিবারেরই ছিল। সারা দিন আড্ডা দিয়েও আমরা একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে যখনই আমরা বাড়িতে যাই, আমাদের বাঁধা-বরাদ্দ ভাত যার-যার বাড়িতে ঠিক ঢাকা আছে। সুললিতেরই একমাত্র পারিবারিক অবস্থাটা আমাদের চেয়ে ভালো ছিল।

সুললিত বলতো—আমি ভাই বি-এ পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাবো, বাবা বলেছে—সে-যুগে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ছেলেদের ব্যারিস্টার হওয়াটা ছিল একটা ইজ্জতের ব্যাপার। তাতে টাকা উপায় হোক আর না-হোক বিয়ের বাজারে তার দাম ছিল। বিশেষ করে বড়লোকদের ছেলেদের বেলায় তো বটেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুললিতের ব্যারিস্টার হওয়া হলো না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন, ব্যারিস্টার হলি না কেন রে?

সুললিত বললে—না ভাই, ইচ্ছে হলো না—

আমি বললাম—তোর যত মিথ্যে কথা, ব্যারিস্টার হতে কার না ইচ্ছে করে? আমার বাবার যদি টাকা থাকতো আমি বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যেতাম—।

সুললিতের মুখের চেহারা দেখে আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো।

বললাম—তোর বাবা বুঝি আপত্তি করলে?

সুললিত বললে—না রে, বাবা আপত্তি করলে আমি শুনছুম নাকি। বাবাদের কথা আজকাল কেউ শোনে নাকি? জীবনে কখনও বাবার কথা শুনিনি আমি। বাবা তো বরাবর আমাকে সায়েন্স পড়তে বলেছিল, আমি কি তার কথা শুনিছি? আমি তো আর্টস পড়েছি।

—তাহলে কেন ব্যারিস্টারি পড়লি না?

সুললিত একটু হেসে বললে—অঞ্জলি বারণ করলে তাই।

অঞ্জলি! আমি তার মুখের দিকে চাইলাম। ভাবলাম অঞ্জলি কে হতে পারে? সুললিতের খুড়তুতো বোন না তাদী? সুললিতদের বাড়িতে অনেক মেয়ে। কার কী নাম তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভাবলাম অঞ্জলি তাদের মধ্যেই কেউ হবে! জিজ্ঞাস করতেও ভরসা হলো না অঞ্জলি তার কে হয়। অঞ্জলির সঙ্গে সুললিতের এমন কী সম্পর্ক যে সে বারণ করলো বলে সুললিতের ব্যারিস্টারি পড়া হলো না। সুললিতের ওপরে কি তার এতই প্রভাব?

কী জানি কী মনে করবে ভেবে আর ও-কথা তুললাম না সুললিতের কাছে। সেদিনই অঞ্জলির নাম প্রথম শুনলাম।

তারপরে যেদিন অনেক-কাল দেখা না-হওয়ার পর সুললিতদের বাড়ি গেলাম, দেখলাম বাইরের বৈঠকখানাটা সেই আগেকার মত ফাঁকা। সেই ঘরটার পেছনে আর একখানা ঘর। সে-ঘরটায় সেকালের কর্তাদের বসবার জায়গা। এককালে যখন সুললিতদের পূর্ব-পুরুষরা এই বাড়ি করেছিলেন তখন তাঁদের অবস্থা ভালো ছিল। অবস্থা ভালো থাকার জন্যে বিলাসিতারও চূড়ান্ত ছিল তাঁদের বাড়িতে। সেই বসবার ঘরটা ছিল সে কালের কর্তাদের স্ফূর্তি করবার আসর। দেওয়ালের গায়ে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত বড় বড় মেমসাহেবদের ছবি টাঙানো। শ্বেত-পাথরের উঁচু পরী। সে-সব তেমনই টাঙানো ছিল তখনও। কিন্তু তখন তাতে ধুলো জমছিল। ঝাড়-পোঁছ করবার লোকজনেরও তখন নিতান্ত অভাব। সেই বংশের ছেলে হয়ে সুললিত যে কেমন করে প্রহ্লাদ হয়ে উঠেছিল সেইটেই ছিল আমাদের বন্ধুদের কাছে ভাববার মতন জিনিস।

একজন চাকরকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম —সুললিতবাবু আছে?

সে বললে—না, বাড়ি নেই—

আমি বললাম—তুই ভালো করে একবার দেখ্ না, যাবে আর কোথায়? যা ভেতরে গিয়ে একবার দেখে আয়।

সে বললে—না বাবু, ছোটবাবু তো রোজ এই সময়ে শ্যামবাজারে যায়—

—শ্যামবাজার? শ্যামবাজার কেন? শ্যামবাজারে কোথায়?

চাকরটা বললে—পরেশ অ্যাঠাবাবুর বাড়ি?

—পরেশ অ্যাঠাবাবু? পরেশ অ্যাঠাবাবু আবার কে?

অত-শত বলতে পারলে না সে। ওইটুকু বলেছে, ওইটুকুই যথেষ্ট! ওর বেশি আর কিছুই জানতে পারলাম না তার কাছে। আমি চলে এলাম।

রাস্তায় আসতেই সুললিতের সঙ্গে দেখা।

বললাম—আরে, তোর বাড়িতেই তো গিয়েছিলুম। তুই কোথায় গিয়েছিলি?

সুললিত বললে—অঞ্জলিদের বাড়ি—

বললাম—কিন্তু তোদের চাকর যে বললে তুই শ্যামবাজারে পরেশ জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে গিয়েছিস?

সুললিত বললে—হ্যাঁ তাই তো, পরেশ জ্যাঠামশায়ের বাড়িতেই তো গিয়েছিলুম। ও তো ঠিকই বলেছে—

তবে তুই যে বললি অঞ্জলিদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

সুললিত বললে—ওই একই কথা। অঞ্জলি তো পরেশ জ্যাঠামশায়ই তাই-কি।

কে যে তার পরেশ জ্যাঠামশায় আর কে যে তার তাই-কি অঞ্জলি তা তখন আমরা জানি না। আমি শুধু তার মুখের হাসি দেখে এইটুকু বুঝতে পারলাম যে সেখানে গিয়ে সে খুব খাতির পায়, সেখানে যেতে তার খুব ভালো লাগে!

শুধু জিজ্ঞাস করলাম—পরেশ জ্যাঠামশায় তোর কী-রকম জ্যাঠামশাই?

সুললিত বললে—আমার আপনার জ্যাঠামশাই নয়, আমার বাবার বন্ধু! শ্যামবাজারে থাকে—

তোর সঙ্গে আলাপ হলো কী করে?

সুললিত বললে—পরেশ জ্যাঠামশায় লক্ষ্ণৌতে থাকতো, চাকরি থেকে রিটায়ার করে কলকাতায় আসার পর থেকেই আলাপ হয়েছে। পরেশ জ্যাঠামশায় খুব ঘাই-ভিয়ার লোক তাই। লক্ষ্ণৌতে থাকতো কি না, তাই খুব গান বাজনার চর্চা।

সুললিত নিজেও গান-বাজনার চর্চা করতো। নিজে গাইতে পারতো না বটে, কিন্তু গাইবার চেষ্টাও করতো না। শুধু শুনতো। গান শুনতে বরাবর ভালোবাসতো সুললিত। আবদুল করিম সাহেব যেবার কলকাতায় প্রথম এলেন, সুললিত একেবারে পাগল, সেই গান শুনে শুনেই কয়েকটা রাত একেবারে কাবার করে দিলে।

বললাম—তারপর?

—তারপর পরেশ জ্যাঠামশায় আর আমি দুজনেই গান-পাগলা মানুষ, আমরা দুজনে মিউজিক কনফারেন্স এ্যাটেণ্ড করে বেড়াই। আর সঙ্গে থাকে অঞ্জলি—

আমি বললাম—অঞ্জলিও কি গান পাগলা নাকি?

সুললিত বললে—হ্যাঁ। আমার চেয়েও বেশি গান পাগল! গান শুনতে গেলে সে আমায় খেতে ভুলে যায়। তোরা তো কেউ গান-বাজনা বুঝিস না, তাই তোদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তেমনি রস পাই না। সময় পেলেই তাই পরেশ জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যাই—

সুললিতের কথা শুনে বুঝলাম সে এবার শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছে।

সেদিন সেই পর্যন্ত। বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললাম—তোরা আর সুললিতকে আসা করিসনি। ওর ভরসা আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমাদের দল থেকে নাম কেটে দে—

যদে যা-যা শুনেছিলাম সব সবিস্তারে বললাম।

★

কিন্তু সুললিত ছিল সেই চরিত্রের ছেলে যে যেটা ঠিক বলে জানবে তাই-ই করবে। কারো কোনও কথায় নিজের পথ বা মত পরিবর্তন করবে না। তা সে যেই হোক। বাবা মা থেকে সুরু করে কাকা জ্যাঠা কেউই তার ওপর কোনও রকমেই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সেই সুললিত একদিন হঠাৎ আমাদের আড্ডায় উদয় হলো।

সলিল বললে—কী রে তুই নাকি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস ?

সুললিত ভীষণ রেগে গেল তার গাল কান সব লাল হয়ে উঠলো।

বললে—আমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি ? তার মানে ?

সলিল বললে—আমরা সব শুনেছি বাবা, আমাদের কাছে আর কেন চেপে যাচ্ছিস তুই ?

সুললিত হঠাৎ সলিলের গলাটা চেপে ধরলে। বললে—কী শুনেছিস তোকে বলতে হবে। জীবনে কখনও আমি কোনও কাজ লুকিয়ে করিনি। কী অন্যায় করেছি তোকে বলতেই হবে, বল !

আমরা সবাই মিলে তাড়াতাড়ি সুললিতের হাতটা চেপে ধরলাম। না ধরলে হয়ত সুললিত সলিলকে মেরেই ফেলতো।

সুললিত তখন রাগে কাঁপছে। আমরা অনেক কষ্টে তাকে তখন সরিয়ে নিয়ে এসেছি। তারপর সলিলকে আমরা সবাই মিলে ধমকে দিলাম।

কিন্তু সামান্য কথায় যে সুললিত এমন রেগে যাবে এ আমরা তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

সুললিতকে বুঝিয়ে বললাম—তুই অত রেগে গেলি কেন ? ও তো তেমন কিছু বলেনি।

সুললিত বললে—তেমন কিছু বলেনি মানে ? আমাকে বলে কিনা আমি ডুবে ডুবে জল খাই ? আমি জীবনে কখনও লুকিয়ে কিছু করেছি ? আমার বাবা মা আমাকে বলতে সাহস করেনি, সলিল কিনা আমাকে তাই বলবে ? আমি অঞ্জলির সঙ্গে মিশি এ আমার বাড়িতে সবাই জানে। আমার বাবা, কাকা, মা কারো জানতে বাকি নেই—

শেষকালে সুললিতকে অনেক বোঝালাম।

আমি বললাম—ওর দোষ নেই যে, তুই আমাকে যেমন বলেছিলি আমিও তেমনি ওদের এসে বলেছিলুম।

—কিন্তু আমি কি তোকে একথা বলেছিলাম যে আমি অঞ্জলির সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করি ? আমার সঙ্গে এতদিন মিশেও তোরা আমাকে চিনলি না ? আমি কখনও কোনও ব্যাপারে তোদের মত মিথ্যে কথা বলেছি ? মিথ্যে কথা বলতে পারলে আমি আজকে কত বড় চাকরি পেতে পারতুম তা জানিস ?

সে আমরা জানতাম।

সুললিতের বাবা সুললিতের জন্যে একটা পাঁচশো টাকার চাকরি জোগাড় করেছিল। সবই ঠিক ঠাক ছিল। শুধু বয়েসটায় সীমা তিন মাস বেশি হয়ে গিয়েছিল।

সুললিতের বাবা বলেছিলেন—কোর্টে গিয়ে এফিডেবিট করলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে—

সেই ভাবে উকিলের পরামর্শও নেওয়া হয়েছিল। শুধু আইন বাঁচানোর জন্যেই ওই ব্যবস্থা। তাতে চাকরি-দাতারও কোনও আপত্তি ছিল না।

কিন্তু বেঁকে বসলো সুললিত।

সে বললে—আমি এ মিথ্যের প্রশ্রয় দেব না—

সুললিতের বাবা বললেন—কিন্তু তোকে তো মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে না। আমিই বলবো যে তোর জন্মের তারিখটা স্কুলে ভর্তি করানোর সময় ভুল রেকর্ড করা হয়েছিল—

সুললিত বললে—না আমি তাও বলতে দেব না, আমার চাকরির জন্যে তুমি কেন মিথ্যে কথা বলবে?

সুললিতের বাবা বড় মুসকিলে পড়লেন।

বললেন—তা হলে এত ভালো চাকরিটা যে হাতছাড়া হয়ে যাবে। এত ভালো চাকরি যদি আর না-পাওয়া যায়?

সুললিত বললে—না পাওয়া যায় আমি বেকার থাকবো। আজকাল কি সবাই চাকরি পায়? আমি নাহয় চাকরি নাই পেলাম। চাকরি ছাড়া কি মানুষ বাঁচে না?

সামান্য ক'টা মাসের ব্যাপার! যদি সুললিত সেদিন মিথ্যে কথা বলতে পারতো তো আজ সুললিতের অন্যরকম অবস্থা হতো। সে হয়ত আমাদের সঙ্গে আর কথাও বলতো না। কিন্তু সেদিন সুললিতের রাগ দেখে সলিলও অবাক হয়ে গিয়েছিল মনে আছে।

মনে আছে আমরা না থাকলে হয়ত সেদিন সলিলকে খুনই করে ফেলতো সুললিত।

যখন একটু রাগ কমলো তখন সুললিত বললে আর কখনও তোরা মিথ্যাবাদী বলিসনি আমাকে। আর যা-কিছু বলিস মিথ্যেবাদী বলবে আমি তা সহ্য করবো না।

বলে হন্ হন্ করে সুললিত যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলে গেল।

সুললিত শেষের দিকে অঞ্জলির সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লো যে আমাদের সঙ্গে তার আর দেখাই হতো না।

সুললিত বাড়ির আদুরে ছেলে। শুধু আদুরে ছেলেই নয়, কৃতী ছেলেও বটে। কলেজ থেকে ভালো ভাবে স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছে, এমন ছেলের জন্যে সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের গর্বের শেষ থাকে না। তাছাড়া তাকে রোজগার করতে হবে এমন অবস্থাও তার নয়।

সুতরাং তখন সুললিতের একমাত্র কাজ শ্যামবাজারে ন্যাঠাবাবুর বাড়িতে যাওয়া।

সুললিতের জন্যে পরেশ ন্যাঠাবাবু বিকেল থেকেই অপেক্ষা করেন।

বলেন—হ্যাঁ রে অঞ্জলি, আজ যে সুললিত এখনও এল না—কাল তোকে কিছু বলে গিয়েছিল নাকি?

অঞ্জলি বলে—বারে, সুললিতের চলে যাবার সময় তো তুমি ছিলে। তোমাকেই তো বলে গেল আজকে বিকেল বেলা চারটের মধ্যে আসবে!

—তাই দিবিনি কাণ্ড! কী ভুলো মন সুললিতের। এখন যে ছ'টা বাজে রে।

ছ'টা বেজে গেল, সাতটা বেজে গেল। শেষ পর্যন্ত সেদিন পরেশবাবু আর অঞ্জলি দু'জনেই হাল ছেড়ে দিলেন।

পরেশবাবু বললেন—তুই কিছু বকিস না কেন বলতো সুললিতকে? এ-রকম করে রোজ কথার খেলাফ করলে পরে কী করবে? বিয়ে হবার পর তোর তো দেখছি ভীষণ জ্বালা হবে।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললে—তখন তুমি ওকে খুব বকবে।

পরেশবাবু বললেন—আরে, তখন আমি থাকলে তবে তো! অতদিন আমি বাঁচবো নাকি আর তোর বরকে তুই বকবি! আমি শ্বশুর হয়ে জামাইকে বকলে লোকে কী বলবে!

অঞ্জলি হাসতে লাগলো।

বললে—তোমার দেখছি সেই গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! কোথায় আমাদের বিয়ে তার ঠিক নেই, এরই মধ্যে তুমি সাত কাহন করছো!

—কেন?

পরেশবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল হঠাৎ। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বললেন—কেন? বিয়ে হবে না কেন? তুই যে বললি সব ঠিক হয়ে গেছে, একেবারে পাকাপাকি কথা দিয়েছে সুললিত?

অঞ্জলি বললে—এই দেখ, আমি আবার কবে তোমাকে বললুম পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে। তুমি দেখছি সত্যি বুড়ো হয়ে গেছ, তোমার আজকাল কিছু মনে থাকে না বাবা—

—সে কী রে? আমি কি তাহলে ভুল শুনেছি?

অঞ্জলি বললে—কার কাছে তুমি কী শুনেছ আর আমার নামে দোষ চাপাচ্ছ। সুললিত যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখন তুমিও তো সেখানে থাকো। বলো তুমিও তো তা শুনতে পেতে!

পরেশবাবু বললেন—তা হবে। আমার যেন মনে হচ্ছে তুই বলেছিলি ও তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে—

অঞ্জলি বললে—সত্যিই তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছো বাবা—

পরেশবাবু বললেন—তা আমি কি বলছি আমি ইয়ংম্যান? আমি কতদিন হলো রিটায়ার করেছি বল্ তো!

তা সত্যিই পরেশবাবু লক্ষ্ণৌ থেকে সবকিছু গুটিয়ে বাটিয়ে শেষজীবনটায় কলকাতায় এসে কাটাবেন বলেই ঠিক করে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন যে টাকা তিনি পেনশন্ পাবেন আর যে টাকা তিনি সারা জীবনে জমিয়েছেন তাই দিয়ে সব খরচই নির্ঝঞ্ঝাটে চালাতে পারবেন।

আর বাকি রইল শুধু অঞ্জলির বিয়েটা।

তা অঞ্জলির মত মেয়ের কি আর আটকে থাকবে কলকাতায়? তারপর যখন মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এলেন সুললিতদের বাড়ি, তখনই পরিচয় হলো সুললিতের সঙ্গে। তখনই পরেশবাবুর নজরে পড়লো জিনিসটা।

বাড়ি ফেরবার পথে পরেশবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন।

বললেন—হ্যাঁ রে, সুললিতকে কেমন দেখলি রে?

অঞ্জলি হাসলো।

বললে—বুঝতে পেরেছি, তুমি বুঝি ওকে জামাই করবার কথা ভাবছো?

পরেশবাবু বললে—তা সুললিত কি জামাই হিসেবে খারাপ?

অঞ্জলি বললে—তোমার ওই এক দোষ বাবা, আমি লক্ষ্ণৌতেও দেখেছি একটা ভালো সুন্দর ছেলে দেখলেই তোমার তাকে জামাই করতে ইচ্ছে হয় কেন বলো তো?

—বাঃ রে, তা তোর তো বিয়ে দিতে হবে একটা !

—তা আমি কি বলছি আমার বিয়ে দিতে হবে না ? কিন্তু যেখানেই যাবে সেখানেই একটা ভালো ছেলে দেখলে হাংলার মত জামাই করবার ইচ্ছে কি ভালো ?

তারপর একটু থেমে বললে—আর শুনলে না সুললিত কী বললে ?

—কী বললে ?

—ওই যে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাবে।

পরেশবাবু বললেন—তা ব্যারিস্টারি পড়লে তো ভালোই—কত ভালো ভালো ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে যায়—

অঞ্জলি বললে—না বাবা, তুমি তা বলে ব্যারিস্টারকে তোমার জামাই করতে পারবে না—

—কেন ? তাতে কী হয়েছে ?

—না। বাঙলা উপন্যাস যত পড়েছি সবগুলোর নায়ক কেবল বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে এসে নায়িকাদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়—

পরেশবাবু উপন্যাস-টুপন্যাস জীবনে কখনও পড়েন নি। ও-সব দিকে ঝোঁকও ছিল না কখনও, আর সময়ও ছিল না।

—তা তুই আবার উপন্যাস পড়লি কবে ?

অঞ্জলি বললে—বারে, হিষ্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইংরিজী যেমন পড়েছি, তেমনি তো আবার বাঙলা উপন্যাসও পড়েছি। লক্ষ্ণৌএর কত বাড়িতে বাঙলা বই আছে, তারা সব বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিল—

শেষকালে যখন একদিন সুললিতকে পরেশবাবু নেমন্তন্ন করলেন বাড়িতে সেদিন খেতে খেতে পরেশবাবু বললেন—সুললিত, তুমি নাকি বাবা ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে যাচ্ছো ?

সুললিত চমকে উঠলো।

বললে—আপনাকে কে বললে ?

পরেশবাবু বললেন—বারে, তুমিই তো বললে ! তোমার মনে নেই ?

সুললিত বললে—তা হয়ত বলেছি। ওটা আমার ইচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই ও ইচ্ছেটা আমার আছে—

পরেশবাবু বললে—না বাবা, তোমার বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া হবে না—

অঞ্জলি বললে—তুমি চুপ করো না বাবা, উনি খাচ্ছেন, ওঁকে খেতে দাও না—

পরেশবাবু বললেন—তা আমি কি ওঁকে খেতে বারণ করছি ? খেতে খেতেও তো কথা বলা যায়। যায় না ? আমি তো বরাবর খেতে খেতে কথা বলেছি। কথা বলতে বলতে খেলে খাবারটা ভালো হজম হয়—

সুললিত হেসে ফেললে। বললে—না না, আপনি বলুন আঙ্কলবাবু, অঞ্জলির কথা শুনবেন না—

পরেশবাবু বললেন—তুমি দেখলে তো বাবা, আমি যে-কথা বলবো অঞ্জলি সেই কথারই প্রতিবাদ করবে। আমি কিন্তু অন্যায় বলেছি, তুমিই বলো—

সুললিত বললে—আপনি কী বলছিলেন বলুন না—

পরেশবাবু বললেন—তুমি বাবা ব্যারিস্টারি পড়তে যেও না—ওটা খারাপ প্রফেশান্, বাঙলা উপন্যাস পড়ে অঞ্জলি দেখেছে সব নায়করা নাকি বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যায়—

সুললিত হো-হো করে হাসি থামিয়ে হেসে উঠলো।

পরেশবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি হাসছো যে?

সুললিত বললে আপনি নিজে বাংলা উপন্যাস পড়েন নি তাই ও-কথা বলছেন। অঞ্জলিও পড়েনি। আর যেগুলো পড়েছে সেগুলো সব সেকেলে বই! আজকালকার উপন্যাসের নায়ক ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, ক্লার্ক এই সব। ব্যারিষ্টার নায়ক এখন আউট-অব্-ডেট্—

—তাই নাকি?

পরেশবাবু চিন্তায় পড়লেন। তারপর অঞ্জলির দিকে চাইলেন:

বললেন—এর উত্তর কী দিবি রে! আমি উপন্যাস-টুপন্যাস জীবনে কখনও পড়িনি, বুঝলে। অঞ্জলিই লখনৌতে কাদের বাড়ি থেকে নাকি বই এনে পড়েছে, আমি জানতুমও না—

অঞ্জলি বললে—ও-সব কথা থাক্ বাবা, অন্য কথা বলো—

সুললিত বাধা দিয়ে বললে—না অন্য কথা কেন বলবেন জ্যাঠাবাবু, উনি তো অন্যায় কিছু বলেন নি। আমার যাতে ভালো হয় সেই কথাই তো উনি বলছেন।

পরেশবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি তো তোমার ভালোই চাই সুললিত? তা তোমার বাবা কী বলেন?

সুললিত বললে—বাবা আমার কথা কিছু ভাবেনই না—

—সে কী? বাবা ভাবেন না?

সুললিত বললে—না। বাবাও ভাবেন না, কাকাবাও কেউ কিছু ভাবে না। আমার কথা আপনি যেমন ভাবছেন এমন করে কেউই ভাবে না।

পরেশবাবু বললেন—শুধু আমি নয় সুললিত, আমিও ভাবি, আবার অঞ্জলিও ভাবে। কালকে তোমাদের বাড়ি থেকে আসবার পথে অঞ্জলি সমস্তক্ষণ কেবল তোমার কথা বলেছে—

অঞ্জলি লজ্জায় পড়লো।

বললে—বাবা তুমি কী সব বাজে কথা বলছো!

সেদিন কথার গল্পে অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ সুললিত দেখলে ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে।

বললে—এবার উঠি জ্যাঠাবাবু, কথায় কথায় খেয়াল ছিল না, অনেক রাত হয়ে গেছে—

—কটা বেজেছে? পরেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন?

—দশটা বেজে গেছে!

—তাই নাকি? এঃ, তাহলে তো তোমার বাবা খুব ভাববেন, তারপর বাড়ি পৌঁছোতেও তো তোমার অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সুললিত বাইরের দিকে যাচ্ছিল। পরেশবাবু বললেন—ওরে অঞ্জলি কোথায় গেলি? সুললিত চলে যাচ্ছে যে? ওকে তো তুই কই আবার আসতে বললি না? কোথায় গেলি তুই?

সুললিত ততক্ষণে বাইরের সদরে চলে এসেছে। এতক্ষণে অঞ্জলি কোথা থেকে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অঞ্জলিকে দেখে সুললিত বললে—তোমার ভয় নেই, তুমি যা পছন্দ করো না আমি তা করবো না—

—তার মানে?

—তুমি তো চাও না আমি ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেতে যাই। তুমি যখন তা চাও না তখন আমিও তা করবো না।

অন্ধকারে অঞ্জলির মুখটা —ই দেখা

হাসছে।

সুললিত জিজ্ঞেস করলে—তুমি হাসছো?

অঞ্জলি বললে—হাসবো না তো কি কাঁদবো?

সুললিত বললে—ঠাট্টা কোর না, আমি সত্যি কথাই বলছি তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। ছোটবেলায় কল্পনা লোকের মনে যে থেকে থাকে তো, তাই ভেবেছিলাম বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের চেয়ে বড় হবো। তা তুমি বলো আমি কী হলে তুমি খুশী হও?

অঞ্জলি তখনও হাসছে। হাসতে হাসতেই বললে—আমার কথার কী দাম? আমি কে যে আমার কথা শুনতে যাবে তুমি?

সুললিত থমকে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ।

তারপর বললে—এ কথার উত্তর আমি এখন দেব না। এত কম সময়ে সে-কথার উত্তর দেওয়াও যায় এর উত্তর মুখে বললে তুমি বিশ্বাসও করবে না।

—তবু শুনিই না।

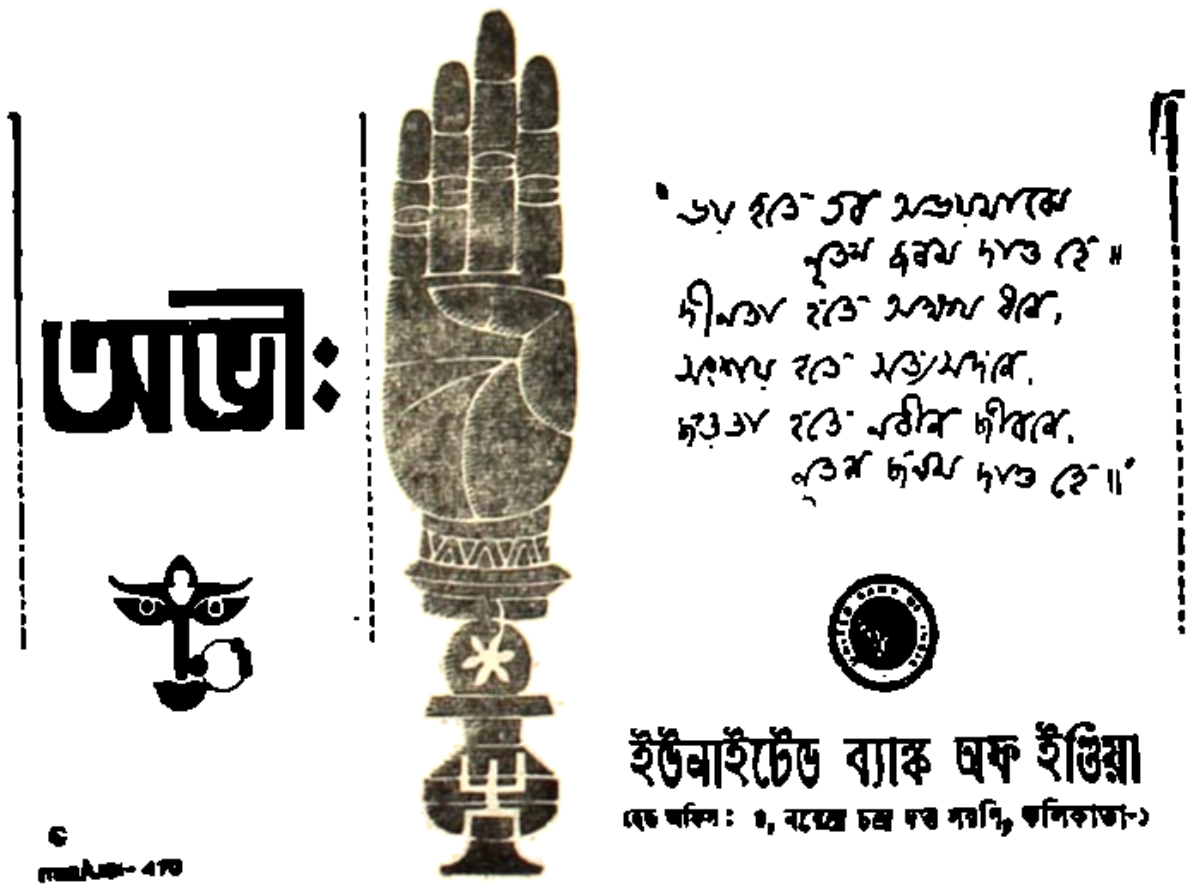

সুললিত বললে—আমার বাবা কাকারা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। তারা তাদের নিজেদের নিয়েও কখনও মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না। ঘামালে আমাদের বাড়ির অন্য চেহারা হতো। কিন্তু আজই প্রথম দেখলুম আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তবু একজন মাথা ঘামায়—

—কে? কাকে দেখলে?

সুললিত বললে—আবার কে, তুমি?

—আমি?

অঞ্জলি প্রশ্নটা করে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো।

তারপর বললে—আমি একটা সামান্য মানুষ, আমি কারোর ভালোর কথা ভাবলেই বা কী আর না-ভাবলেই বা কার কী এসে যায়!

সুললিত আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

বললে—আর কারো আসে-যায় কি না জানি না, আমার নিজের আসে যায়। আমি তোমাকে···

অঞ্জলি বললে—আঃ, কী করো, এখুনি যে বাবা শুনতে পাবে—

সুললিত আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি সদর পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর তারপর সেই রাত দশটার সময় আলো-অন্ধকারের মেশা রাস্তার নির্জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

★

এ-ঘটনা যদি এখানেই শেষ হতো তাহলে আর এ-কাহিনী লেখবার প্রয়োজন হতো না। একদিন পাঁজিতে শুভ লগ্ন দেখে দু'জনের চারটে হাতে মিলিয়ে দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে কাহিনী শেষ করতে পারতাম।

কিন্তু তা হয় না। হয় না বলেই আজো কিছু মানুষ এখনও উপন্যাস পড়ে। কারণ তারা তার মধ্যে বাস্তব জীবনের ছায়া দেখতে পায়।

প্রথমে আমরা এ-সব ঘটনা জানতাম না। কারণ এ-সব তো দোতলার দিকে সকলের চোখের আগোচরেই ঘটেছে। কারণ চোখের অগোচর ছাড়া এ-সব জিনিস ঘটেও না।

পরে সুললিতের কাছে শুনেছিলাম বলেই আজ এ-সব লিখতে পারছি। তখন সুললিতের জীবনও পাল্টে গেছে, অঞ্জলির জীবনও অন্য দিকে মোড় নিয়েছে।

আর শুধুই বা দোষ কী। সমস্ত পৃথিবীর মানুষই তো পালটে গেল তত্তদিনে। সমস্ত পৃথিবীময় যে ওলোট-পালোটটা হয়ে গেল তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

মনে আছে কলকাতায় তখন ব্ল্যাক-আউট্। জিনিসটা তখন সকলের কাছেই নতুন। আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়লাম তাই-ই কি আমাদের তখন হুঁশ ছিল!

সুললিতদের অত বড় বাড়িটা ফাঁকা হয়ে পড়ে রইল। দেখা-শোনা করবার জন্যে রইল শুধু একটা দু'টো চাকর-বাকর। আর সবাই বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে বিদেশে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিলে। কাকা এক জায়গায়, বাবা এক জায়গায়, কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই তখন। যে যেদিকে যেমন ভাবে পেরেছে প্রাণের তাগিদে সেখানেই পালিয়েছে। পেশাদার আর হাওড়া ষ্টেশন যাত্রুঘরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সহরে বোমা পড়বে। যেমন করে প্যারিস গুঁড়ো হয়েছে, বার্লিন গুঁড়ো হয়েছে, লন্ডন্ গুঁড়ো হয়েছে তেমনি করেই গুঁড়ো হয়ে যাবে আমাদের সাধের কলকাতা সহর।

কিন্তু সহর আগে না প্রাণ আগে ?

প্রাণ থাকলে সহর আবার গড়ে উঠবে। কিন্তু প্রাণ গেলে সহর গড়ে তুলবে কে ?

সুললিতেরা তখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। আশে-পাশের বাড়ির লোকেরা সবাই তখন চলে গেছে। কেউ গেছে মধুপুর, কেউ নিজের দেশে করিদপুরে, কেউ বা চাকায়, আবার কেউ কাশী, গোরক্ষপুর, পাটনা বা অন্যান্য অজ্ঞাত কোনও অজ্ পাড়াগাঁয়ে।

তখন একদিন দেখা না হলে সুললিত ছট্-ফট্ করে মরে। যুদ্ধের খবর যত ঘোরালো হয়ে আসে সুললিত আর অঞ্জলি তত অধির হয়ে ওঠে।

পরেশবাবু একদিন জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কোথায় যাচ্ছো বাবা সুললিত ? তোমার বাবা কী বলছেন ?

সুললিত বললে—কাকারা চলে গেছে ? বাবা-মা এখনও ঠিক করতে পারেন নি কিছু—

—কাকারা কোথায় গেছেন ?

—শুনলুম এক কাকা বেনারসে, আর এক কাকা মধুপুরে। বাড়ি ভাড়া করে চলে গেছে। জিনিস-পত্রও নিয়ে গেছে। বাড়ি প্রায় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

পরেশ জ্যাঠামশাই অনেক সাধ করে লখ্নৌ ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। অঞ্জলির বিয়ে দিয়ে এখানেই দেহ রাখবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন—কী হবে বলো তো সুললিত ? তোমার কী মনে হয় ? হিটলার জিতবে ?

সুললিত বললে—নানা লোকে তো নানা-রকম কথা বলছে—

—কী বলছে ?

—বলছে এবার ইংরেজদের আর কোনও চান্স নেই। জাপান যখন নেমে পড়েছে, তখন কিছু বলা যায় না। বার্মা গেল, সিঙ্গাপুর গেল, একে একে তো সবই গেল। সবাই বলছে ইণ্ডিয়াও এবার হাত ছাড়া হবে।

পরেশবাবু ভয় পেয়ে গেলেন।

বললেন—তুমি আজ আর বেশি দেরি কোর না সুললিত, চারদিকে ব্ল্যাক আউট্, শিগগির শিগগির বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো—

তারপর ডাকলেন—ওরে অঞ্জলি, কোথায় গেলি রে তুই ? সুললিত চলে যাচ্ছে যে—

সেদিনও সহর ধরবার অন্ধকারে এসে দাঁড়ালো সুললিত। একটুখানি অপেক্ষা করতে লাগলো।

অঞ্জলি আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে কোনও কথা নেই। সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

সুললিত জিজ্ঞেস করলে—কই, আজ কিছু বলবে না ?

অঞ্জলি বললে—কী বলবো ?

সুললিত বললে—দেখ আমি তোমার সব কথা রেখেছি। তোমার জন্যে বিলেতেও গেলাম না। কলকাতার বাইরে একটা চাকরি পেয়েছিলাম তোমার জন্যে তাও নিলাম না, পাছে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হয়! কিন্তু তুমি তো আমার কথা রাখলে না—

অঞ্জলি বললে—তুমি বাড়ি যাও সুললিত, তোমার হয়ত দেরি হয়ে যাচ্ছে—

—দেরি ?

সুললিত হাসলো। হাসিটা অঞ্জলির কাছে কান্নার মত লাগলো।

বললে—আর কত দেরি করবো বলো তো ?

—কিন্তু তার জন্যে কি আমি দায়ী ? কোথা থেকে এক যুদ্ধ এসে গেল তার জন্যে আমাকে দায়ী করছো কেন ?

সুললিত বললে—কিন্তু তোমার জন্যে কি জন্ম আটকে আছে, না মৃত্যু আটকে আছে ? তাহলে বিয়েটাই বা আটকে থাকবে কেন ?

অঞ্জলি বললে—সে প্রশ্ন করো তুমি তোমার বাবাকে ! তোমার মা'কে ! আর তা ছাড়া এই অবস্থায় বিয়ে হয়ই বা কী করে তাই বলো। সমস্ত সহর ছেড়ে লোক পালাচ্ছে, এ-সময় কোন্ বাবা-মাই বা মত দেয়।

—কিন্তু এ যুদ্ধ যদি চিরকাল চলে ?

অঞ্জলি বললে—তাই কখনও চলে নাকি ? আর ক'টা মাস একটু ধৈর্য ধরে থাকি না। আর তো মাত্র ক'টা মাস !

সুললিতের তখন যেন দেরি সহ্য হচ্ছে না। অঞ্জলি সুললিতের কাছে সরে এল। বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে একেবারে সুললিতের শরীর ঘেঁষে দাঁড়ালো।

বললে—লক্ষ্মীটি, তুমি অধৈর্য হয়ো না। আর একটু সবুর করো। এতদিনই সবুর সহ্য করেছি। আর মাত্র ক'টা মাস। তারপর তো

তারপর অঞ্জলি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু দূরে সরে এল।

সুললিত আর দেরী করলে না। হন্ হন্ করে সদর রাস্তা বেয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। আর ঠিক তার পরেই আকাশে বাতাসে সাইরেন বেজে উঠলো বিকট শব্দ করে।

অঞ্জলি ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—সুললিত—সুললিত

কিন্তু সাইরেনের তীব্র চিৎকারে অঞ্জলির ক্ষীণ মেয়েলি গলা কোথায় ভেসে গেল। ভেতরে তখন পরেশবাবু চিৎকার করছেন—ওরে অঞ্জলি, দরজা জানালা বন্ধ কর। কই কোথায় গেলি মা তুই ? ও অঞ্জলি—

এর পর আর দুদিন কেউ কোথাও বেরোতে পারল না। বিশেষ করে যাদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে তাদের খোঁজ নেওয়া গেল না।

সুললিত বেরোচ্ছিল। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাচ্ছো ?

সুললিত বললে—পরেশ আঢ়্যবাবুর বাড়ি—

বাবা বললেন—না না, দেখছো এখন কেউ কোথাও বেরোচ্ছে না। শুনলাম আজকেও নাকি আবার জাপানীরা বোমা ফেলবে—

মাও বড় ভয় পেয়েছিল। তাঁরা বাড়িতে থেকে থেকে তার ভয়টাও বেড়ে গিয়েছিল। বাবারও তো বয়েস হয়েছিল। দু'জনেই ভাবতেন ছেলে যেন সব সময় কাছে-কাছে থাকে। আর কখন যে কী হয় কেউ তো বলতে পারছে না। গুজব রটছে অনেক রকম। কেউ বলছে জাপানী প্লাইরা কলকাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আবার কেউ বলছে সুভাষ বোস নাকি জাপান রেডিও থেকে বক্তৃতা দিয়েছে।

কে জানে তার কথা সত্যি।

চারদিন পরে আর সুললিত ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারলে না। কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় বাস-ট্রামও পাতলা হয়ে এসেছে। নিয়ম করে কিছু চলছে না। দোকান-পাট অনেক বন্ধ। বড় রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ। সবাই সহর ছেড়ে চলে গেছে নিরুদ্দেশের সন্ধানে।

দু'তিনটে বাস বদলে যখন সুললিত শ্যামবাজারে গিয়ে পৌঁছলো তখন বিকেল। গঙ্গার দিকে সূর্য্য ভোবে ভোবে। এক দৌড়ে পরেশ জ্যাঠাবাবুদের বাড়ির সামনে গিয়ে অবাক।

সদর দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে।

সুললিতের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। তবে কি অঞ্জলিরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেল?

চারদিকে চেয়ে একটা চেনা লোকও নজরে পড়লো না। সবাই যে যার ধান্দায় ব্যস্ত।

—হ্যাঁ মশাই শুনছেন, এই বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁরা কি কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন নাকি?

ভদ্রলোক নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন—কী জানি মশাই, আমি অন্য পাড়ায় থাকি, এ-পাড়ার কোনও লোককে জিজ্ঞেস করুন।

বলে তিনি আবার নিজের কাজে চলে গেলেন।

তারপর আরো অনেক লোককে জিজ্ঞেস করলে সুললিত। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে বাড়িটার সামনে। কেউ যদি তাকে বলে দিত অঞ্জলিরা কোথায় গেছে তাহলে সেখানেই সে ছুটে চলে যেত! কিন্তু এত বড় পৃথিবী। এখানে কোথায় খুঁজবে সে?

শুধু সেদিন নয়। পরের দিনও আবার গেল। তার পরের দিনও গেল। আবার তারপরের দিন।

সেদিন যারা বললেন, আর কলকাতায় থাকা উচিত নয় গো, এ যে একেবারে শ্মশান হয়ে গেল সহরটা—

যা বললে—যেখানে হোক চলো, শেষকালে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে সবাইকে—

তারপর একদিন সুললিতরাও নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিলে আর সকলের মত।

এখানেই আমাদের আড্ডায় আর সম-বয়েসী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ্ পড়ে। কলকাতা সহরের সমাজ-জীবনের পক্ষে তখন যে সে কী রকম বিপর্য্যয় তা এখন বোঝা কিম্বা বোঝানো যাবে না। কত একান্নবর্তী পরিবার যে এসময়ে ভেঙে তচ্‌নচ্ হয়ে গেল তার হিসেব আর কেউ রাখলে না। কত লোক যে ছিন্নমূল হলো তারও হিসেব আর কারো খতিয়ান-খাতায় নেই যে কেউ তাই নিয়ে গবেষণা করবে। যারা বেকার ছিল তাদের কেউ কেউ চাকরি পেলো বটে, কিন্তু বেশির ভাগই নিঃস্ব হয়ে গেল। তার ওপর দুর্ভিক্ষ এলো কলকাতা সহরে। হাজারে-হাজারে লোক মরে পড়ে রইল রাস্তার ওপর না-খেতে পেয়ে।

বিপর্যয় কি শুধু একটা?

একটার পর একটা বিপর্যয় এসে বাঙলা দেশকে একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। তার চোটে একদিকে কোটি-কোটি লোক অনাথ হয়ে গেল। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ক'জন মিলিটারি ব্রিকেদার ফুলে-ফেঁপে লাল হয়ে গেল।

এ-সব কথা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। কত লোক সেই মানুষ-মারা টাকা দিয়ে দেশসেবক সেজে বসেছে, দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা হয়ে বসেছে তাও আজ কারো অজানা নেই।

কিন্তু আমরা ছিলাম সামান্য সাধারণ মানুষ। আমরা তখন ঝড়ের মুখে এঁটো কলাপাতার মতন জীবনের এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটের জল খেয়ে কোনও রকমে অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে উড়ে চলেছি।

তারপর ঝড় যখন থামলো তখন দেখলাম পরিচিতদের মধ্যে কেউ কোথাও নেই। কেউ রাউরকেলায় কিতু হয়ে বসেছে, কেউ রাঁচির কোন্ কারখানায় আবার কেউ বা মধুপুরে একটা স্টেশনারি দোকান দিয়ে কোনও রকমে দিন-গুজরান করছে।

এরই মধ্যে একদিন ট্রেণে দেখা সুললিতের সঙ্গে।

আমি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলাম।

—সুললিত না?

সুললিত আমাকে একেবারে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

বললাম—কী করছিস তুই?

সুললিত নিজের কথা বলে জিজ্ঞেস করলে—তুই কী করছিস?

নিজের কথা সবিস্তারে বললাম। কলকাতায় যে আছি সে-কথাও তাকে বললাম। তারপর সুললিতের কথাও শুনলাম।

সুললিত তখন আর ব্যারিষ্টার নয়, ইঞ্জিনীয়ার নয়, এমন কি মিলিটারি কনট্রাকটারও নয়। পুলিশের চাকরি তার। কিন্তু সাধারণ চাকরি নয় একেবারে! ছোট-খাটো একজন অফিসার মোটামুটি। শুনে একটু অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—শেষকালে পুলিশের চাকরি নিলি কেন?

সুললিত বললে—ভাই বাধ্য হয়ে নিলাম। পুলিশের চাকরিকে কোনও দিন সুনজরে দেখিনি আগে, কিন্তু তবু নিতে হলো নানা-কারণে—

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বললে—শেষ পর্যন্ত বাবা মারা গেল, দু'বছর পরে মা-ও গেল। তখন একেবারে একলা। বাবার রেখে যাওয়া টাকা-কড়ি সম্পত্তি-টম্পত্তি অনেক ছিল। কিন্তু তাতে আর ক'বছর চলবে? তারপর দিন-দিন সংসার-খরচের অঙ্ক যে-ভাবে বাড়তে লাগলো, তখন যে কোনও একটা চাকরি না নিলে আর চলছিল না।

তার ওপর বাধলো মামলা। সুললিতের জীবনে ওইটেই এক বিপর্যয়।

কাকারা তখন মারা গেছেন দু'জনেই। কিন্তু খুড়তুতো ভাই-বোনরা মামলা রুজু দিল পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি নিয়ে। সে এক বিপর্যয়কর কাণ্ড।

সুললিত বললে—উকিল-মোক্তার-পেশকাররা যে কী বস্তু সেই সময়েই তা প্রথম বুঝলাম। আমার

উকিল আমাকে যে-কথা কোর্টে বলতে পরামর্শ দিলে তা যদি বলতাম তো কলকাতার বাড়িটা ভাই আমার এমন করে হাতছাড়া হতো না।

—কেন, কী পরামর্শ দিলে?

—একটা জাল উইল তৈরি করে আমাকে হলফ্-নামা করতে বললে।

আমি বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—হলফ-নামাটা কী?

সুললিত বললে—তুই যেমন আমায় জিজ্ঞেস করছিস হলফ্-নামা কী, তেমনি আমিও আমার উকিলকে জিজ্ঞেস করলাম হলফ্-নামা কী? তার উত্তরে উকিল যা বললে তার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না।

উকিল বললে—তাহলে কিন্তু আপনার এই তিন লক্ষ টাকার সব অংশ আপনার বেহাত হয়ে যাবে।

সুললিত বললে—আপনি বেহাত হওয়ার কথা বলছেন কেন? আমি কি এ-মামলার ফরিয়াদী যে সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেলে আমার ক্ষতি হবে? আমি তো আসামী। আমার কীসের দায়?

উকিল-ভদ্রলোক তো সুললিতের কথা শুনে অবাক।

বললে—তাহলে আপনি মামলায় নামলেন কেন?

সুললিত বললে—আমি মামলায় নেমেছি কে বললে? বাদীপক্ষ তো আমাকে মামলায় নামিয়েছে।

—তাহলে আপনি আমাকে ব্রিফ্ দিলেন কেন ?

সুললিত বললে—ব্রিফ্ দিয়েছিলাম যাতে ন্যায়-বিচার হয়।

উকিল বললে—সম্পত্তি চেয়েছিলেন আপনি না ন্যায়-বিচার চেয়েছিলেন ? কোন্‌টা চেয়েছিলেন আপনি ?

সুললিত বললে—বা রে, ও দুটো কি আলাদা ? আমি কি বলেছিলাম জাল-উইল করে আমার শরিকদের মামলায় হারিয়ে দিন ? আমি কোর্ট-ঘর পছন্দ করি না তা আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম। আমি মশাই অবথা কোর্টে আসতে চাই না।

উকিল সুললিতের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়েছিল।

বললে—আমি মশাই এই চল্লিশ বছর প্র্যাক্‌টিশ করছি এ-রকম কথা আজ পর্যন্ত কোনও মক্কেলের কাছ থেকে শুনিনি। আপনি কলকাতায় সম্পত্তি করবেন আর কোর্ট পছন্দ করবেন না, তা কি হয় ?

সুললিত বললে—তাহলে না হয় না হবে—

—তাহলে ব্লক্-আমার সই করবেন না ?

সুললিত বললে—মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না, লক্ষ টাকা দিলেও না—

এই পর্যন্তই শেষ। সেই বিরাট বাড়ি যে-বাড়িতে আমরা কতদিন গিয়ে লুকোচুরি খেলেছি, গল্প করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সে বাড়িটা একটা সামান্য মিথ্যে কথা না-বলতে পারার জন্য তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে এখন কোথায় আছিস ?

সুললিত বললে—বিলাসপুরে। বিলাসপুর হচ্ছে আমার হেড-কোয়ার্টার্স। সেখানে থাকি আর সারা মধ্যপ্রদেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এই ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। আর মাঝে মাঝে আমার আফিসে যেতে হয় জব্বলপুর। জব্বলপুরেই আমার হেড্‌পুটি থাকে।

—তাহলে কলকাতা ? কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিস ?

সুললিত বললে—ত্যাগ না করে উপায় কী ? কলকাতায় তো আমার আর কেউই নেই—একটা পৈত্রিক বাড়ি ছিল, সেটাও খুড়তুতো ভাইরা মামলা করে কেড়ে নিয়েছে। আমি কলকাতায় যে যাবো থাকবো কোথায় ? অবশ্য কলকাতায় যাবার আমার তেমন দরকারও হয় না আর। আমি এখন মধ্যপ্রদেশে আছি। মধ্যপ্রদেশেরই লোক হয়ে গিয়েছি।

আরো অনেক কথা হলো দুজনে। অনেক দিন পরে দেখা, বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ-খবরও নিলে ও। সকলের খবর যতটা জানা ছিল দিলাম।

শেষকালে ওর নামবার সময় হলো।

নামনেই গন্‌ডিয়া ষ্টেশন আসবে। সেখানেই নামবে সুললিত।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললাম—সেই অঞ্জলির খবর কী রে ?

—অঞ্জলি !

নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও যেন কেমন করুণ হয়ে উঠলো সুললিত। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। এক মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

—বললে—তার কোনও খবর রাখি না—

—কলকাতায় আর কখনও যাসনি ?

—দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই যে একদিন পরেশ আঢ্যিবাবুরা কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আর তাঁরা ফিরে আসেন নি। এক বছর পরে যখন আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন গিয়ে দেখলাম সে-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে এসে গেছে। তাদের খবর আর কেউ জানে না। এদিকে আমিও এই চাকরিটা পেয়ে গেলাম, এ এমন কাজ যে এতে ছুটি-টুটি কিছু নেই—

—কী কাজ করতে হয় তোকে?

—ঘুষখোরদের ধরা আমার কাজ।

—ঘুষখোর?

আমি অবাক হয়ে গেলাম আবার জিজ্ঞেস করলাম—ঘুষখোর?

—হ্যাঁ, ঘুষখোর। সারা ভারতবর্ষেই ঘুষখোরদের রাজত্ব। কে ঘুষ খায় না তুই আমাকে বলতে পারিস? কোর্ট-কাছারিতে ঘুষ না দিলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট কথা বলবে না, ঘুষ না দিলে ট্রেনের টিকিট পাওয়া যাবে না, ঘুষ না দিলে একটা সামান্য চাকরি পর্যন্ত পাবার উপায় নেই। এমন একটা অচল অবস্থা হয়েছে এদেশে যে ঘুষ না দিলে জীবনই অচল এখানে। হাসপাতালে একটা বেড্ পেতে হলেও ঘুষ। ছোট ছেলে-মেয়েরা যেমন ঘুষ খায়, গরুরা যেমন ঘাস খায়, তেমনি মিনিস্টাররাও ঘুষ খায়। কোথায় যাবো আমরা বল্ তো?

জিজ্ঞেস করলাম—ক'টা কেস ধরেছিস? ঘুষখোররা ধরা পড়ে?

সুললিত বললে—একেবারে যে ধরিনি তা নয়, ধরেছি। কিন্তু সে চুনো-পুঁটি। কেউ পাঁচ টাকা কিম্বা দশ টাকা ঘুষ নিয়েছে। কিন্তু রাঘব-বোয়ালদের ধরতে পারিনি একটাও—

—কেন?

—রাঘব-বোয়ালদের খুঁটি খুব শক্ত। তারা পাতায় পাতায় ঘোরে। তাদের ধরতে গেলে দিল্লীর হোমরা-চোমরাদের পর্যন্ত আঁতে ঘা লাগে। যাদের খুঁটি বাঁধা দিল্লীতে তাদের পাকড়াও করা খুব শক্ত। তারা আমাদের কেয়ার করে না। তারা ভাই বেপরোয়া—

বললাম—তাহলে এ ডিপার্টমেন্টটা গভর্নমেন্ট করেছে কেন?

সুললিত বললে—লোককে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যে—

বলে সুললিত হাসলো—বললে তবু যতটা সম্ভব কাজ করছি। রাঘব-বোয়ালদের ধরতে পারিনি বটে, সে জন্যে আমার দুঃখ আছে, কিন্তু চুনো-পুঁটিরাও কম নয়, তাদের সংখ্যাও কোটি কোটি—

তারপরেই গন্তিয়া ষ্টেশন এসে গেল। সুললিত নেমে যাবার আগে বললে—যদি কখনও বিলাসপুরের দিকে আসিস তো আমার ওখানে উঠিস বুঝলি? আমি যদি বাড়িতে নাও থাকি তো আমার আর্দালি ভগীরথ আছে। তাকে আমি তোর নাম বলে রাখবো। সে তোকে খাতির আপ্যায়ন করবে—

গাড়ি তখন ছাড়ে ছাড়ে।

আমি দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম—বিয়ে? বিয়ে করিসনি তুই?

—বিয়ে?

সুললিত হাসলো হো-হো করে। সেই করুণ অথচ ম্যাড়ে পরা সুললিত আমার কথায় গলা কাটিয়ে হেসে উঠলো।

বললে—বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

বললাম—বা রে, জিজ্ঞেস করবো না? বিয়ে করাটা কি অস্বাভাবিক কিছু? ও তো সবাই করে থাকে?

ততক্ষণ ইঞ্জিন থেকে তীব্র হুইশলের শব্দ উঠলো। অর্থাৎ ট্রেণটা ছাড়ছে।

সুললিত বললে—বিয়ে করবার সময় পেলাম না—

আরো হয়ত কী বলতে কিন্তু হুইশলের শব্দে তা আর আমার কাণে ঢুকলো না। ট্রেণ ছেড়ে দিল। চেয়ে দেখলাম অন্যান্য অনেক যাত্রীর সঙ্গে প্লাটফরম দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেটের দিকে সুললিতের দীর্ঘ দেহ আর দেহের দীর্ঘতর ছায়াটা এগিয়ে চলেছে।

★

সেই সেবারেই আমার সঙ্গে সুললিতের শেষ দেখা। তারপরে আজ। এতদিন পরে দেখা হওয়ার আকস্মিকতা আমাকে যত না খুশী করেছিল, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত করেছিল তার চাকরি ছাড়ার খবরটা।

পরদিনই তার দেওয়া ঠিকানাটা খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হলাম।

ভেবেছিলাম তাকে পাবো না। কিন্তু দরজা খুলে যে অভ্যর্থনা করল সে আমার চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

আমি উত্তরে বললাম—তোমার নাম কি ভগীরথ?

সে বললে—হ্যাঁ বাবু।

—তুমি তো বিলাসপুরে সুললিতের আর্দালি ছিলে—

—হ্যাঁ বাবু।

তারপরে আমি আমার নিজের নাম বললাম। বলতেই তার চেহারাটা অন্য রকম হয়ে গেল। দরজা খুলে বসতে দিলে একটা ঘরে। ঘরের চেহারা দেখে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগতে লাগলো। চারদিকে ময়লা, নোংরা, অগোছালো অযত্নের ছাপ লেগে রয়েছে। এ-রকম তো ছিল না আগে সুললিত। সে তো বরাবরই ফিট-ফাট।

আমার মুখের ভাব দেখে ভগীরথ যেন সব কিছু বুঝতে পারল।

বললে—বড় নোংরা করে রাখেন আমার বাবু, কিছুতেই কিছু পরিষ্কার করতে দেন না—

বলে চেয়ারের ওপর থেকে ঝুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বাবু কোথায় গেছে ভগীরথ?

ভগীরথ বললে—হা ভগবান, বাবু আমার কোথায় গেছেন তাই যদি আমি জানবো তাহলে কি ঘর-দোরের এমনি দশা হয় বাবু! আমাকে যে কিছুই বলেন না মুখ ফুটে। কী খাবেন, কী পরবেন, সব বাবুর মুখ দেখে আমাকে বুঝে নিতে হবে—

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বাবু কি বরাবরই এই রকম?

ভগীরথ বললে—না বাবু, বরাবর তো এমন ছিলেন না। ইদানিং দেখছি যত দিন যাচ্ছে ততই কেমন বেতালা হয়ে যাচ্ছেন। বিলাসপুরে আমরা বেশ ছিলাম বাবু, সেখানে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। কেন যে বাবু চাকরি ছাড়লেন কী জানি, এখানে এসে আমি একলা আর সামলাতে পারছি না—

—কেন বলো তো এমন হলো ?

—কী করে জানবো বাবু ? আমি কত করে বললাম চাকরি ছাড়বেন না বাবু, তা আমি সামান্য মানুষ, আমার কথা তো কেউ শুনবে না। এখানে এসে আমি একা মানুষ কোন দিকটা সামলাই ? রেশনের দোকানে যাবো না রান্না-বান্না সামলাবো, না ঘর ঝাঁট দেব ? একা মানুষ আমি, আমারও তো বয়েস হচ্ছে, আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি, আমি কি আগেকার মত সব দিক সামলাতে পারি ? এখন চোখেও তেমন আর জোর নেই আগেকার মত—নুন আর চিনির তফাৎ করতে পারি না। সেদিন দুধে চিনি দিতে গিয়ে একবার নুন দিয়ে ফেলেছি, বাবু মুখে দিয়েই থু থু করে সব ফেলে দিলেন—

সুলক্ষিত সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শুনতে পেলাম ভদ্রমহিলার মুখ থেকে। কিন্তু আসল কথাটা শুনতে পেলাম না, কী কারণে অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল সুলক্ষিত।

কী জানি, আমার যেন কেমন মনে হলো সুলক্ষিত বোধহয় কোথায় আঘাত পেয়েছে। কিন্তু কে আঘাত দেবে সুলক্ষিতকে ? চাকরির আঘাত ? চাকরি মানেই তো আঘাত ! আজ পর্যন্ত কেউ কোনও চাকরিতে আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে পেরেছে ? সেই জন্যেই তো চাকরির আর এক নাম দাসত্ব। দাসত্ব করে যে লোক সুখ পায়, হয় সে নির্বোধ নয় তো বিবেকহীন। অথচ অর্থ এমনই জিনিস, সেই অর্থের লালসায় লোকে শেষ দিন পর্যন্ত চাকরি করতে লালায়িত। অনেকে আবার চাকরি থেকে অবসর নেবার পরও আবার এক্সটেনসন্ পাবার জন্যে দরখাস্ত করে। কিন্তু অধিকাংশ

আপনার
শারদোৎসবের দিনগুলি
মধুময় হোক।

ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী
৪১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪-৪৩৮৯

আপনার আনন্দময় মুহূর্তগুলি ধরে
রাখতে সহায়তা করবে।

প্রাণ বাঙালী সন্তান হয়ে সুললিত তার অত টাকা মাইনের চাকরি ছাড়তে পারলে কী করে? কোন আঘাত তাকে দিয়ে এমন কাজ করলো।

অনেকক্ষণ বসে বসে সেদিন ভগীরথের কাছ থেকে সুললিত সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম।

সে বললে—বাবু, আপনি আমার বাবুকে একটু শুধরে চলতে বলুন না—

বললাম—আমার কথা সে শুনবে কেন ভগীরথ? তোমার বাবু তো জীবনে কারোর কথাই কোনওদিন শোনেনি। অমন সত্যবাদী লোক তো আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ-ই ছিল না—

—তা ঠিক বাবু। আপনি তা যা বললেন তা ঠিক। বিলাসপুরে থাকতে কত রেলের লোক কত জিনিস ভেট দিতে আসতো, তা জানেন? বাবু সকলকে তাড়িয়ে দিতেন—আমাকে বলে দিয়েছিলেন আমি যেন কারোর দেওয়া কোনও জিনিস না নিই—

ভগীরথের কথায় আমি আরো কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

বললাম—সবাই বুঝি ভেট দিতে আসতো?

ভগীরথ বললে—হ্যাঁ বাবু, আমার বাবু তো ঘুষ ধরার চাকরি করতেন, আর রেলের বাবুরা সবাই ঘুষখোর ছিল। তাই বাবুকে খুশী করতে চাইতো নানা রকম ভেট দিয়ে। কেউ দিত চেয়ার টেবিল, কেউ খাবার দাবার, কত রসগোল্লা আর কত সন্দেশ যে খেতে দিত কী বলবো।

—তা বাবু না-ই বা খেত, তুমি খেলেই পারতে।

—ও বাবা, তাও বাবু খেতে দেবেন না, খাওয়া তো দূরের কথা, ছুঁতেও দেবেন না। বাবুর ও-দিকে কড়া নজর ছিল যে খুব।

বললাম—তাহলে বাবু কেন চাকরি ছেড়ে দিলেন?

ভগীরথ বললে—কী জানি বাবু, একটা রেলের লোককে বাবু ঘুষ-খাওয়ার জন্যে ধরলেন তার পরেই যে বাবুর কী হলো, বাবু বললেন আর চাকরি করবেন না—

—তা, তারপর?

—তারপর আর কী! তারপর বিলাসপুর ছেড়ে বাবু এখানে চলে এলেন বাড়ি ভাড়া করে। দেখছেন তো এ বাড়ির হাল। পুরোন বাড়ি, সিমেন্ট-বালি খসে পড়ছে। এই বাড়িরই ভাড়া পঞ্চাশ টাকা।

জিজ্ঞেস করলাম—এখন তো চাকরি নেই বাবুর, এ-সব কোত্থেকে চালাচ্ছেন তোমার বাবু?

ভগীরথ বললে—আমি চাকর মানুষ, ও-সব খবর বাবু কি আমাকে বলেন? বাবুর তো কোনও দিকেই হুঁশ নেই, রোজ এত কষ্ট করে রান্না-বান্না করে রাখি, বেশির ভাগ দিনই রান্না ফেলা যায়, কিন্তু মুখেই দেন না—

আমরা কথা বলছি হঠাৎ বাইরের সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

ভগীরথ সচেতন হয়ে উঠলো।

—ওই আমার বাবু এসেছেন—

বলে দরজাটা খুলে দিতে গেল।

খানিক পরে দেখি ভগীরথ ফিরছে! তার মুখে কেমন আতঙ্ক।

চেয়ে দেখি পেছনেই সুললিত। সুললিতের চেহারা দেখে আমি চমকে গেলাম। একী চেহারা

হয়েছে তার। সেদিন দিনের বেলা তো এ রকম চেহারা ছিল না তার। আমাকে যেন সে চিনতে পারলে না। কি-রকম ঢুলু-ঢুলু চোখ। জামা-প্যাণ্টের জায়গায় জায়গায় ময়লা লেগে আছে সে টলছে।

কাছে আসতেই আমাকে দেখতে পেয়েছে।

বললে—কী রে তুই?

কথাগুলো যেন কেমন জড়ানো জড়ানো মনে হলো

—তুই আমার প্রাণের বন্ধু ভাই, একেবারে প্রাণের বন্ধু! আমার কেউ বন্ধু নেই এখন।

বলে দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। আমার নাকে কড়া মদের গন্ধ এল। বুঝতে পারলাম সে মদ খেয়েছে।

বলতে যাচ্ছিলাম—তুই মদ খেয়েছিস সুললিত—

কিন্তু কথাটা মুখেই আটকে গেল। কেমন যেন ঘেন্না হতে লাগলো সুললিতের ওপর। এ কোন্ সুললিতকে দেখছি আমি। এ কি আমাদের সেই আগেকার সৎ-সত্যবাদী ঝরঝরিটে সুললিত যে একদিন মিথ্যে কথা বলতে না-পারার জন্যে ইংরাজীতে ফেল হয়েছিল। যে সুললিত একদিন রাধামাধববাবুর বাজারের থলি নিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল অত বড়লোকের ছেলে হয়েও। সেই সুললিত কিনা আজকে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছে?

আমি তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিন্তু সে তখন আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে বন্য আঁটুনি দিয়ে।

বললে—তোকে আমি আর ছাড়বো না ভাই, আজ তোকে আমার কাছে রাত্রে শুতে হবে—

বললাম—ছাড় ছাড়—ছাড় আমাকে—

আমি যত তাকে ছাড়তে বলি তত সে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে আমাকে। বলে—এতদিন পরে তোকে পেয়েছি, আমি কিছুতেই ছাড়বো না তোকে, আজ আমার সঙ্গে তোকে শুতে হবে।

বললাম—আজকে ছাড়, অন্য একদিন আসবো, এখানেই থাকবো, এখানেই শোব তোর সঙ্গে, আজকে ছেড়ে দে, আমি বাড়িতে বলে আসিনি—

সুললিত হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বললে—তোদের সব আছে ভাই, তোদের বাড়ি আছে, তোদের ঘর আছে, তোদের বউ আছে, তোদের সংসার আছে, আমার কেউ নেই রে, কেউ নেই আমার—

বলে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগলো সুললিত।

আমি বললাম—তুই সেদিন আসতে বলেছিলি তাই এলাম, কাঁদিসনি, আমি আর একদিন আসবো, আজ যাই—

তবু আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না সুললিত।

বললে—তুই কথা দে, কথা দে আমাকে আবার আসবি—

বললাম—আসবো, নিশ্চয় আসবো—কথা দিচ্ছি আসবো—

সুললিত ডাকল—ভগীরথ, এই ভগীরথ—

ভগীরথ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তবু এতক্ষণ সুললিত তাকে দেখতে পায়নি। ভগীরথ কাছে আসতেই সুললিত বললে—তুই কোথায় থাকিস? তোর দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল—বাবুকে কিছু খেতে দিয়েছিস?

ভগীরথ কিছু বলবার আগেই আমি বললাম—আমি আবার কী খাবো? আমি তো বাড়ি থেকে খেয়েই এসেছি—

কিন্তু আমার কথা কে শোনে। সুললিত ভগীরথকে এই মারে তো সেই মারে। ভগীরথের দিকে তেড়ে গেল সুললিত।

বললে—জানিস না এ আমার কতবড় বন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু এ। একে তুই কেন খেতে দিলি না বল্? বল্ কেন খেতে দিলি না?

আমি তাড়াতাড়ি সুললিতের হাতটা চেপে ধরলাম।

বললাম—ওকে কেন বকছিস? ও আমাকে খেতে বলেছিল, আমিই খাইনি। আমার জন্যে খাবার এনেছিল, আমি তা ফিরিয়ে দিয়েছি—

তখন যেন আমার কথায় একটু শান্ত হলো সুললিত।

আমি বললাম—আমি এবার যাই ভাই—

—তাহলে চল্ তোকে এগিয়ে দিই—

বলে সেই অবস্থাতেই আমাকে এগিয়ে দিতে আসছিল, আমি বাধা দিলাম। বললাম—তোকে এই অবস্থায় আসতে হবে না,—তুই পড়ে যাবি—

সুললিত বললে—কী বলিস তুই? আমি পড়ে যাবো? আমি মাতাল হয়েছি? জানিস আমি মদ খাই বটে, কিন্তু কেউ আমাকে মাতাল বলতে পারবে না, আমি মাতাল হই না—চার বোতল মদ খেলেও মাতাল হবো না—

আমি আর কী বলবো। শুধু বললাম—তোকে আসতে হবে না, আমি একলাই যেতে পারবো।

সুললিত বললে—তা'হলে বল্ আর কখনও মাতাল বলবি না আমাকে?

অগত্যা বলতে হলো—আর বলবো না—তুই খেয়ে নিগে যা—আমি যাই—

—তাহলে ভগীরথ তোকে এগিয়ে দিয়ে আসবে।

ভগীরথকে ডেকে সুললিত বললে—ভগীরথ, যা আমার প্রাণের বন্ধুকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়,—যা—

ভগীরথ আর কী-ই বা করবে। মাতালের কথার প্রতিবাদ করতে নেই। করলে আরো বিপদ। সুতরাং সে-ও আমার পেছন-পেছন আসতে লাগলো।

বাইরে এসে ভগীরথকে বললাম—তুমি যাও ভগীরথ, তোমাকে আর আমার সঙ্গে আসতে হবে না। বাবু যাই বলুক, আমি বলছি তুমি ফিরে যাও—

ভগীরথ বললে—দেখলেন তো বাবু, আমার কী হেনস্থা—

জিজ্ঞেস করলাম—বাবু কি এই রকম রোজ মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে?

ভগীরথ বললে—রোজ। আমার এক-একদিন বাড়িতেও ফেরে না আমি ভাত কোলে করে বসে থাকি—

জিজ্ঞেস করলাম—বাড়ি না ফিরে কোথায় থাকে?

ভগীরথ বললে—সে আর কী বলবো বাবু, লজ্জার কথা কাউকে বলবার নয়, কোথায় খারাপ পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় ঘাটে রাত কাটায়, এক-একদিন জামা-কাপড়েরও ঠিক থাকে না বাবুর—

—এ-রকম কবে থেকে হলো ?

ভগীরথ বললে—এই কলকাতায় ফিরে আসবার পর থেকেই, এখানে এসেই হঠাৎ বাড়াবাড়ি সুরু করে দিলে। যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে। অথচ বিলাসপুরে যতদিন ছিলেন একটা পান পর্য্যন্ত মুখে দিতেন না—সিগারেট বিড়ি দূরের কথা।

কিন্তু কেন এমন হলো বলো তো ?

ভগীরথ বললে—কী জানি বাবু, যতদিন চাকরি করতেন ততদিন কিছু হয়নি। চাকরিই বা কেন ছাড়লেন আর নেশাই বা কেন সুরু করলেন কে জানে। সেই কথায় জানেন যে যশচক্রে ভগবান ভূত, এও তাই হয়েছে বাবুর—

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

বললাম—তুমি যাও ভগীরথ, আমি চলি—

ভগীরথ বললে—আপনি কিন্তু আর একদিন আসবেন বাবু, আপনি এলে একদিন বুঝিয়ে বলবেন ও ছাই-পাঁশগুলো খাওয়া কি ভালো ? ও কি ওষুধে খায় ?

বললাম—কিন্তু আমার কথা কেন শুনবেন তোমার বাবু ?

ভগীরথ বললে—শুনুন আর না শুনুন, তবু আপনি একটু বলবেন। আপনারা সবাইমিলে বললে যদি বাবুর একটু তবু চেতনা হয়—

—ঠিক আছে আমি আর একদিন আসবো।

বলে চলে এলাম।

সেই সুললিতকে এই রকম অবস্থায় দেখে মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। জীবনে এত উত্থান আর এত পতন দেখেছি যে বিস্মিত হবার পর্য্যায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখ হয়েছিল অন্য কারণে। একদিন যে সুললিত একদিন একটা সামান্য অপরাধ দেওয়ার প্রতিবাদে সলিলকে খুন করে ফেলতে গিয়েছিল সেই সলিল আজ বেঁচে থাকলে কী বলতো ? সলিল একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বহুদিন আগেই চলে গিয়েছিল। সে বেঁচে থাকলে হয়ত সুললিতের মুখের সামনেই উপহাস করতো।

কিন্তু উপহাস করা যত সহজ উপলব্ধি করা তত সহজ নয়। যেমন খুব সহজে মানুষের কোনও ব্যবহারেই রায় দেওয়া যায় না, তেমনি মানুষের কোনও আচরণে উপহাস করাও উচিত নয়। সারা জীবন মানুষের সংসার মিলে এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে কোনও মানুষকে কষ্টিপাথর দিয়ে বিচার করবার মত দুর্বুদ্ধি যেন আমার কখনও না হয়।

তাই-ই যদি হতো তো বোধহয় সুললিতের সঙ্গে আর জীবনে কোনও দিন দেখাই করতাম না। আমার কৌতূহল তখন উগ্র হয়ে উঠেছে। এ কেন হলো ? এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে !

তাই দু'একদিন পরেই সকালবেলা গিয়ে সুললিতের বাড়িতে হাজির হলাম।

একটু ভয় ছিল যে কী রকম অবস্থায় দেখবো।

ভগীরথ দরজা খুলে দিলে। দেখলাম বেশ হাসি মুখ তার। বললে-আসুন—

জিজ্ঞেস করলাম—আজ তোমার বাবু কেমন আছে?

ভগীরথ বললে—সকালবেলা তো বাবু ভালোই থাকে। তবে এখনও ঘুমোচ্ছেন—

বললাম—কত রাত্তিরে এসেছিল?

—কাল রাতে আর আসেনি বাবু, ভোরের দিকে এসেছে—আপনি বসুন।

ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলাম। সেই সেদিনকার মত অগোছালো অপরিচ্ছন্ন ঘর। আমি বসতেই ভগীরথ পাখাটা খুলে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম· রাত্রে কোথায় গিয়েছিল বাবু?

ভগীরথ মুখে একটা খেয়ার ভঙ্গি করে বললে— কোথায় যাবে, গিছলেন সেই রাক্ষুসীটার কাছে—

—রাক্ষুসী! রাক্ষুসী আবার কে হলো?

ভগীরথ বললে—সে আপনার শুনে দরকার নেই বাবু, তার নাম করলেও পাপ হয়। সেই রাক্ষুসী আবার এক-একদিন এ-বাড়িতে আসে। আমার ইচ্ছে হয় তাকে ঝাঁটা মেরে আপদ বিদেয় করে দিই—

—কী নাম তার?

ভগীরথ বললে—বাবু তো তাকে অঞ্জলি বলে ডাকে—

অঞ্জলি!

আকাশ থেকে যদি তখন আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়তো তাহলেও আমি অত চমকে উঠতাম না। সেই অঞ্জলি? সেই পরেশ অ্যাটর্নীবাবুর মেয়ে! সেই যার সঙ্গে সুললিতের বিয়ের সব পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল?

আমি ভগীরথকে আর কিছু বললাম না।

শুধু বললাম - বাবুর ঘুম ভাঙলে ডেকে দিও—

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর এক সময় সুললিত হন্তদন্ত হয়ে এল।

বললে—কী রে, অনেকক্ষণ বসে আছিস?

মিথ্যে কথাই বললাম। বললাম—না—

সুললিত বললে—একটু বোস্, আমি মুখ হাত ধুয়ে আসি, কালকে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছি তাই ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হলো। চলে যাসনি যেন—

বলে সুললিত ভেতরে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সুললিতের ব্যবহার দেখে। সেদিনকার ব্যবহারের সঙ্গে কত তফাৎ। এই সুললিতকে দেখলে আর বোঝাই যায় না যে সেদিন রাত্রের সুললিত অত মাতাল হতে পারে। একেবারে সবল সুস্থ স্বাভাবিক সরল মানুষ। সেই আমাদের আগেকার সুললিত।

খানিক পরেই ভগীরথ চা জলখাবার দিয়ে গেল। তার খানিক পরে সুললিতও এসে সামনের চেয়ারে বসলো।

চা খেতে খেতে অনেক গল্প হতে লাগলো।

বললাম—তুই চাকরি ছাড়ার কারণটা বলবি বলেছিলি আমাকে, সেইটে বল্—

সুললিত কথাটা ভেবেই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ-চোখ কেমন থমথমে হয়ে গেল। এক মুহূর্তে অতীতের গহ্বরে তলিয়ে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে এলে বললে—জানি না তুই কী ভাবে নিবি ঘটনাটা, নিয়তি যে আমাকে অমন ভাবে অমন জায়গায় টেনে নিয়ে যাবে তা আমি তাই কল্পনাও করতে পারিনি—

বলে চা'য়ে চুমুক দিল।

ফিরে আবার বললে—পরে আমার ভগীরথ বললে তুই যেদিন বাড়িয়ে এসেছিলি আমি নাকি তোর সামনে খুব মাতলামি করেছিলাম। হ্যাঁ রে, সত্যি?

বললাম—তার জন্যে আমি কিছু মনে করিনি, কিন্তু খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—

—সত্যিই, অবাক তো হবিই। কিন্তু তুই যদি জানতিস আমার কী সর্বনাশ হয়েছে, তাহলে আর অবাক হতিস না। আমি নিজেকেই খুন করেছি, তা জানিস? আমি, যে-আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি সে-আমি আর সেই আগেকার আমি নই -

আমি চুপ করে রইলাম। এ-কথার আর কী উত্তর দেব?

সুললিত বলতে লাগলো—জানিস তো তুই, আমি অন্য কোথাও কাজ না পেয়ে পুলিশের চাকরি নিয়েছিলাম। আমি ছিলাম সেকশান অফিসার। আমার কাজই ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুঁষখোরদের ধরা। এমনি করে কত লোকদের যে ধরেছিলাম তার ঠিক নেই—

একে একে সুললিত তার সেই চাকরির জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে লাগলো! দিনের পর দিন ট্রেনে ঘোরা, ট্রেনেই ঘুমোন। আর যত গুণ্ডা বদমাইসদের সঙ্গে মেলামেশা। ওসব ভালো লাগতো না সুললিতের।

একদিন সন্ধেবেলা ট্রেনে চড়ে চলেছে সুললিত কাটনির দিকে।

হঠাৎ একটা কুৎসিৎ লোক এসে হাজির হলো।

সুললিত বুঝতে পারলে তাকেই চাইছে লোকটা। এ-সব লোকদের হাবভাব চেহারা দেখলেই চিনতে পারতো সুললিত।

—হুজুর আপনাকে একটা চুরির খবর দিতে চাই।

—চুরি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, গভর্নমেন্টের টাকা চুরি।

পরের ষ্টেশন আসতেই সুললিত তাকে নিয়ে আইস-চেম্বারের কামরায় চলে গেল। সেখানে লোকজন বিশেষ কেউ তেমন নেই।

খবরটা হলো এই: পরেশ মুখার্জি বলে রেলের একজন ইঞ্জিনীয়ার স্টাফের নাম করে অনেক টাকা চুরি করছে।

—কী করে চুরি করছে? তুমি প্রমাণ দিতে পারবে?

—হ্যাঁ হুঁজুর, আমি প্রমাণ দিতে পারবো। নিজে লাখ্খো টাকা মাইনে পায়, কিন্তু তার বউএর গায়ের গয়না যদি দেখেন তো অবাক হয়ে যাবেন! আর তাছাড়া বাড়ি সার্চ করলে কত টাকার নোট যে পাবেন তার ঠিক নেই। রেলের স্টাফকে দিয়ে নিজের বাড়িতে চাকরের কাজ করায়—

সুললিত বললে—কিন্তু টাকা চুরি করে কী করে সেটাকে আগে বলো—

লোকটা বললে—আমার মুখের কথা শুনে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ওঁর আন্ডারে প্রায় পাঁচশো লোক কাজ করে। কিন্তু তার মধ্যে আর্ধেক লোক ফুরো—

—ফুরো মানে?

লোকটা বললে—ফুরো মানে তাদের মধ্যে জন পঞ্চাশেক কাজই করে না, শুধু মাইনের দিন এসে মাইনে নেয়, মাইনে নিজেরা মাথা পিছু দশটাকা নিয়ে বাকিটা মুখার্জি সাহেবকে দিয়ে দেয়। এই রকম প্রত্যেক মাসে চলছে—

—তাদের নাম আছে মাস্টার রোলে?

—হ্যাঁ হুজুর, তা আছে—কিন্তু তারা সবাই অন্য জায়গায় চাকরি করে। সেখানকার মাস্টার রোলেও তাদের নাম আছে, সেখানেও তারা মাসে মাসে মাইনে পায়। তাহলে লোকগুলো একই সময়ে দু'জায়গায় কাজ করে তাই বলুন হুজুর?

সুললিত বললে—তোমার কথাটা যে সত্যি আমি বুঝবো কী করে?

লোকটা দাঁত বার করে বিকট হাসি হাসতে লাগলো।

বললে—তা প্রমাণ না পেলে কি আর আপনার কাছে এসেছি? প্রমাণ আমার হাতে আছে। আপনি পেওা রোডের স্টর ফ্যাক্টরির মাস্টার রোল দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। সেখানেও তারা হাজরে দিয়েছে। একই সঙ্গে আবার মুখার্জি সাহেবের হাজরে খাতায়ও সেই তারিখে হাজরে দিয়েছে। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে—

সুললিত কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ।

তারপর বললে—তুমি তোমার নালিশ লিখে জানাতে পারবে?

—খুব পারবো হুঁজুর। আপনি নালিশ লিখে দিন, আমি তার নিচের টিপ-ছাপ দিয়ে দেব।

—কিন্তু মুখার্জি সাহেবের বিরুদ্ধে তোমার এই নালিশ কেন? মুখার্জি সাহেব তোমার কী লোকসান করেছে?

—আজ্ঞে আমি হুঁজুর, কার্পেন্টার। ছুতোর। মুখার্জি সাহেবের আন্ডারে কাজ করি। কিন্তু মুখার্জি সাহেবের মেমসাহেব হুজুর আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। আমাদের যা-তা ভাষায় গালাগালি দেয়—

সুললিত বুঝল লোকটার নালিশের কারণ। তখনই একটা কাগজে লোকটার নালিশ লিখে নিয়ে সই করিয়ে নিলে। তারপর পরের ষ্টেশন আসতেই লোকটা নমস্কার করে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল—দেখবেন হুজুর, আমার নামটা যেন কারো কাছে প্রকাশ করবেন না—

*

এর দিন সাতেক পরেই পেওা রোড ষ্টেশনের প্লাটফরমের ওপর হঠাৎ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। ইলিতে তখন পে ডার্ক পাঁচশো কুলিকে এক এক করে নাম ধরে মাইনে দিচ্ছে। কোথাও কিছু নেই ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সবাই কোত্থেকে এসে পঞ্চাশ জন কুলিকে হাতে নাতে ধরে ফেললে। তারা তখন সত্ত সত্ত মাইনে হাতে নিয়েছে।

*

সব মানুষের জন্য আর সব কলমের জন্য

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রাইটিং ব্লু
ব্লাড ★ ব্রাউন
ওয়াশেবল :
রাইটিং ব্লু ★ রেড ★ গ্রীণ

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট :
ব্লু-ব্ল্যাক ★ ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেবল :
রাইটিং ব্লু
এমারেল্ড গ্রীণ
স্কারলেট রেড

সুলেখা
জেনারেল
পার্মানেন্ট : ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেবল :
রাইটিং ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

আপনার পছন্দমত যে কোনটি ব্যবহার করুন

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
সুলেখা পার্ক কলিকাতা-৩৭

*

*

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ইঞ্জিনীয়ার পরমেশ মুখার্জি।

ম্যাজিস্ট্রেট তার কাছে গিয়ে বললে—মিষ্টার মুখার্জি আপনিও এখন আণ্ডার এরেষ্ট আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করলাম—

মিষ্টার মুখার্জির মুখটা এক মুহূর্তে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

বললে—কেন ?

ম্যাজিস্ট্রেট বললে—সে কথা কোর্টে জানতে পারবেন। আপনি এখন জামিনের ব্যবস্থা করুন। এটা বেলেবল্ অফেন্স—

সে এক দিন গেছে সুললিতের, যে সুললিত সারা জীবন গান বাজনা আরেস আরামের মধ্যে—কলকাতা সহরের বিলাস-ঐশ্বর্য্যে দিন কাটিয়েছে তাকেই একজন ইনজিনীয়ারের জীবন নষ্ট করবার পাপের ভাগ নিতে হলো। কিন্তু পুলিশের চাকরি। কর্তব্য আগে না দয়ামায়া আগে। আর পাপীরও তো শাস্তি হওয়া দরকার। অপরাধীর যদি শাস্তি না হয় তো কীসের সভ্যতা ? কীসের জন্যে সুললিত এতদিন সত্যি-কথা বলে এসেছে। কীসের জন্যে শেষ পর্য্যন্ত সে পুলিশের চাকরি নিয়েছে ? শুধু কি টাকা ? শুধু কি জীবিকার তাড়না ?

এমন ঘটনা তো আগেও অনেকবার ঘটেছে সুললিতের জীবনে। কত লোক এ্যারেষ্ট হবার সময় কত কান্নাকাটি করেছে, কত পায়ে ধরে মুক্তি চেয়েছে।

সুললিত সকলকেই বলেছে—দেখুন, আমার পায়ে ধরে কোনও লাভ নেই, আমি আমার ডিউটি করেছি—

তারা বলেছে—হুজুর, আপনি যা চান আপনাকে তাই দেব, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি জেলে গেলে আমার বউ-ছেলে-মেয়ে সবাই উপোস করে মরবে—

এর উত্তরে সুললিত কিছু বলেনি। বড় জোর কখনও কখনও নিজের পকেট থেকে দুঃখী-পরিবারকে সাহায্য করবার জন্যে টাকা দিয়েছে, দাদোহারাও কখনও কখনও দিয়েছে।

কেউ-কেউ বা রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছে। গালাগালি দিয়েছে। জেলে যাবার আগে শাসিয়ে গেছে। ছাড়া পেলে আপনাকে দেখে নেব।

সুললিত এ-সব গম্ভীর মুখে সহ্য করেছে। তারপর যখন সুযোগ সুবিধে পেয়েছে তখন আবার আর একজনকে জেলে পাঠিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের ফাঁক গেয়ে ভালো উকিলের সওয়ালে অনেক দাগী আসামী ছাড়াও পেয়ে গেছে। তাতে সুললিতের সব পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে বলে তার মনে কিন্তু ক্ষোভ হয়নি। ভেবেছে মানুষের আদালতে তো সুবিচার হয় না। তার জন্যে শুধু শুধু ক্ষোভ করে কী হবে।

বললাম—তারপর ?

—তারপর পরমেশ মুখার্জির কেসটা একদিন কোর্টে উঠলো। এমনভাবে কেস সাজিয়েছিলাম যে শাস্তি অনিবার্য্য। রোজ কোর্টে যাই আর ফিরে আসি। হিয়ারিংএর সময় পরমেশ মুখার্জির মুখের দিকে চেয়ে দেখি। যত দিন যাচ্ছিল ততই মনে হচ্ছিল যেন সারা মুখে কালি পড়ে যাচ্ছে পরমেশ মুখার্জির।

সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসেছি। এই ভগীরথ আমার জন্যে চা তৈরি করে নিয়ে এল।

চা খেতে খেতে কেসটার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম পরের হিয়ারিং-এর দিন আমাদের উকিলকে কী-কী পয়েন্ট দাঙ্গাই করবো, হঠাৎ সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলো একজন মহিলা। একেবারে অচেনা মহিলা। সন্ধ্যের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম না মুখখানাকে।

জিজ্ঞেস করলাম—কে আপনি কা চাই?

মহিলাটি আমার সামনের চেয়ারে টপ্ করে বসে পড়লো। যেন মনে হলো খুব ক্লান্ত। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ছে।

ঘরের আলোটা জেলে দিলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বললাম—তুমি?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আমি। আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছ?

মনে হলো অঞ্জলির গালে ঠাস করে একটা চড় মারি। এতদিন পরে এসে আমার সঙ্গে পরিহাস!

বললাম—কত বছর ধরে খুঁজে খুঁজে যাকে পাইনি, সে আজ আমাকে এসে বলছে আমি তাকে চিনতে পারি কিনা? তোমার লজ্জা করে না—

অঞ্জলির সিঁথির ওপর সিঁদুরটা জ্বল্-জ্বল্ করছিল। সেটা আমার নজর এড়ায়নি।

অঞ্জলি আমার দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলে।

বললে—কী দেখছো?

—দেখছি তুমি বিয়ে করেছ।

—বিয়ে না করে এতকাল আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবো এ-কথা তুমি কল্পনা করলে কী করে?

আমি বললাম—এদিকে কোথায় এসেছিলে?

অঞ্জলি বললে—আর কোথাও না, তোমার কাছেই এসেছিলাম—

—আমার কাছে? আমার ঠিকানা জানলে কেমন করে?

অঞ্জলি বললে—পুলিশ-অফিসারদের ঠিকানা খুঁজতে কি অসুবিধে হয়?

আমার ভাই তখন আর মুখ দিয়ে যেন কোনও কথা বেরোচ্ছে না। আমি কী বলবো, কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। হোক পরস্ত্রী, কিন্তু সেই অঞ্জলিই তো। অঞ্জলির জন্যে যে সব কিছু করতে পারতাম।

বললাম—দাঁড়াও তোমার জন্যে আমার ভগীরথকে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলি গে—

—জলযোগ? তোমার বাড়িতে জলযোগ করবো এতে আমি 'না' বলতে পারবো না। এখানে আমারও একটা অধিকার আছে বলে আমি এখনও মনে করি। কিন্তু তার আগে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

ভগ্নকণ্ঠে শুধু বললাম—স্ত্রী নেই—

অঞ্জলি বললে—স্ত্রী নেই মানে? বিয়েই করোনি, না স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছেন?

বললাম—বলবার তো স্ত্রী নেই। স্ত্রী থাকলে তবে তো তার বাপের বাড়ি থাকবে।

—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি বিয়ে করেছি!

—সে তুমি না বললেও তোমার সিঁথির সিঁদুর দেখেই বুঝতে পেরেছি !

বলে আমি ভিতরে গিয়ে ভগীরথকে বললাম কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে। সারা-জীবন তাই ভগীরথকে যা কষ্ট দিয়েছি, স্ত্রী হলে কবে সহমরণে যেত। কিন্তু ও আমাকে ছোট বেলা থেকে দেখে আসছে তো, আমার যেজাজ ও যেমন জানে আর কেউ তা জানে না। তাই আমার কথায় খাবারের দোকানের সন্ধানে ছুটলো।

আমি আবার অঞ্জলির কাছে এসে বসলাম।

বললাম—এবার বলো, হঠাৎ কী মনে করে এলে ?

অঞ্জলি বললে—তুমি আগে স্থির হয়ে বোস ! আমার বাবা যারা গেছেন জানো না বোধহয়।

বললাম—কী করে জানবো ? তুমি কি খবর দিয়েছিলে ?

অঞ্জলি বললে—বা, বেশ তো উল্টোচাপ ! তোমার ঠিকানায় কত চিঠিই যে লিখেছিলাম, তার একটা চিঠিরও কি উত্তর দিয়েছ কখনও যে আজ আমাকে দোষ দিচ্ছ ?

—তুমি চিঠি দিয়েছিলে অঞ্জলি ? সত্যিই দিয়েছিলে ?

—সত্যি দিইনি মানে ? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি বলতে চাও ?

আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না অঞ্জলির কথাগুলো।

বললাম—ঠিক করে বলো, তুমি চিঠি দিয়েছিলে ?

অঞ্জলি বললে—চিঠি দিয়ে যখন উত্তর পেলাম না তখন একবার নিজেও গিয়েছিলাম কলকাতায়। গিয়েছিলাম তোমাকে খুঁজে বার করতে। গিয়ে দেখলাম তোমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, সেখানে কেউ নেই—তোমরা কোথায় গেছ কেউই বলতে পারল না। এর পর আমি কী করতে পারি বলো ? পৃথিবীতে আমার বাবা ছাড়া আর কে আছে বলো, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াই ?

বললাম—ভালোই করেছ—দেখ তুমিই একদিন ব্যারিস্টারি পড়তে বারণ করেছিলে, তাই ওপথ আর মাড়াইনি তোমার কথা আমি রেখেছি—

—তার বদলে তুমি পুলিশ হয়েছ।

বললাম—তোমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে কি আমাকে একটা খবর দিয়েছিলে ?

সেদিন যে আমি আত্মহত্যা করিনি সেইটেই তো বড় কথা। তার বদলে পুলিশের চাকরি নিয়েছি কি ঘুষে বদ্মায়েসের ঠিকেদারি করছি তাতে তফাৎটা কী হলো ? আমি যে এখনও বেঁচে আছি এটাই তো পৃথিবীর একটা অষ্টম আশ্চর্য্য—

ততক্ষণে ভগীরথ এসে জলযোগ সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল টেবিলের ওপর।

বলল—খাও—

—আর তুমি ?

—আমার বাড়ি এটা, আমাকে খেতে বলবারও কেউ নেই, না-খেলেও কেউ কিছু মনে করবে না।

—তবু তুমি না খেলে আমি খেতে পারি না। আমার ভিশ্ থেকেই তুলে নাও।

বললাম—আগে যদি এতটা খাতির করতে অঞ্জলি তাহলে আমি হয়ত খুশীই হতাম, কিন্তু এখন আর আমার কোনও অধিকার নেই তোমার ওপর।

—তাহলে যেটুকু আপ্যায়ন করছো আমাকে সবটাই নিছক ভদ্রতা ?

বললাম—তা ছাড়া আর কী হতে পারে ?

—কিন্তু অন্তরের টান দাবী করবার অধিকারও কি আমাকে আর দেবে না ?

বললাম—না।

—আর অন্য কোনও দাবী ?

—বলো তোমার কী দাবী ? দাবীটা না শুনে কী করে তা পূরণ করবো ?

—ধরো যদি আমি আমার স্বামীর মুক্তি চাই ?

— তোমার স্বামী ?

অঞ্জলি এবার আমার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইল।

বললে—হ্যাঁ আমি আমার স্বামীর মুক্তি দাবী করতে এসেছি তোমার কাছে।

—কে তোমার স্বামী ?

—যার নামে তুমি মামলা করছো।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা

কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী	৫·৫০
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় । রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব	৮·০০
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার । রবীন্দ্রনাথ ও তারতবিদ্যা	৩·০০
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় । The House of the Tagores	২·০০
ডক্টর নবীনাল সেন । A Critique of the Theories of Viparyaya	১৫·০০
শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার । রবীন্দ্র-সুভাষিত	১২·০০
✓হরিশ্চন্দ্র সান্যাল । চৈতন্যোদয় । ২·৫০ । জ্ঞানদর্পণ	৩·০০
ডক্টর বীরেন্দ্র দেবনাথ । রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু	৬·০০
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য । পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
শ্রীরতনমনি চট্টোপাধ্যায়, ✓প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীনির্মল কুমার বসু । গান্ধীমানস	৩·০০
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন । Indian Classical Dances	২৫·০০
✓গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । সঙ্গীতচন্দ্রিকা	১৫·০০
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় । Reform and Regeneration in Bengal (1774-1828)	১৬·৫০
ডক্টর সোভনলাল মুখোপাধ্যায় । Sociology of Planning	১৪·৫০

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা । সম্পাদক যতেন্দ্রনাথ মল্লিক। ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। বর্তমানে অষ্টম বর্ষ চলছে। প্রতি সংখ্যা। এক টাকা। বার্ষিক চাঁদা। চার টাকা (সাধারণ ডাকে) এবং সাত টাকা (রেজেস্ট্রী ডাকে)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা : ১এ কলেজ রো কলি-৯। ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলি-২৯

বললাম—আমি তো অনেক মামলা করছি। আসামীও তো আমার অনেক। তুমি কোন্ মামলার কথা বলছো?

অঞ্জলি বললে—যে-মামলার পরমেশ মুখার্জি আসামী।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। খানিকক্ষণের জন্যে আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। আমি অঞ্জলির সিঁদুরটার দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

—অমন করে আমার দিকে চেয়ে দেখছো যে?

বললাম—তুমি কি এই অনুরোধ করতেই আমার কাছে এতক্ষণ এত ভনিতা করলে!

অঞ্জলি বললে—আগে আমি জানতাম না যে তুমিই এই মামলা চালাচ্ছো। তাহলে আগেই তোমার কাছে আসতাম। সেই জন্যেই তোমার কাছে আসতে আমার এত দেরী হয়েছে।

কথা বলতে বলতে সুললিত এবার থামলো।

তারপরে বললে—ভাই, কিছু মনে করিস নি। আমি আর খালি পেটে এত কথা বলতে পারছি না। একটু খাই—

বলে উঠলো। তারপর আলমারি থেকে একটা বোতল আর খালি গেলাস বার করে আনলো। এনে আমার সামনে রাখলে। তারপর একটা সোডার বোতল এনে খুলে ফেললে।

বললে—ভগীরথ দেখলে আবার রাগ করবে। জানিস, ও আবার হয়েছে বউএর বাড়া। আমাকে আবার মদ খেতে বারণ করে। আমি হাসি। বলে কী জানিস? বলে—ও ছাই-পাশগুলো কেন খাও?

বললাম—ঠিকই তো বলে।

—তুইও ওই কথা বলবি ভাই? আমার অবস্থায় পড়লে তুইও খেতিস কি না বল্? বল্ তুই খেতিস কি না? অঞ্জলি মাথায় সিঁদুর দিয়ে আমার ঘরে এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা তুলে দিতে বলবে, আর আমি সৎ সাধু-পুরুষ হয়ে সেই কথা কান দিয়ে শুনবো? সে স্বামীর ঘুঁষের টাকায় গয়না গড়াবে আর তার স্বামীর টাকাকে গালাগালি দেবে, তবু তাকে আসামীর কাঠ-গড়া থেকে বেকসুর খালাস করে দেব? আমি কি এতই অমানুষ যে খালি পেটে ভাই বসে বসে শুনবো? আমার নিজের ওপর ঘেন্না হবে না? আর নিজের ওপর যখন ঘেন্না হয় তখন কারো বাঁচতে ইচ্ছে করে? তুই-ই বল্?

আমি কী বলবো! চুপ করে দেখতে লাগলাম সব।

আমার চোখের ওপর সে গেলাসের পর গেলাস চক্ চক্ করে শেষ করতে লাগলো।

বললে—তাই তো এখন মরবার পথ ধরেছি—ভাবছি বেঁচে থেকে তো এতদিন দেখেছি, এখন না হয় মরবার পথটাই খোলসা করে রাখি, তাতে হয়ত শান্তি না পাই সুখ পাবো—

বললাম—অনেক তো খেলি, আর খাসনি—

সুললিত বললে—আমায় ভগীরথও তোর মতন কথা বলে। বলে—ওটা খাওয়া ছেড়ে দাও। ও তো কিছু জানে না, তাই বলে। কিন্তু তুই তো সব শুনলি, তবু তুই আমাকে খেতে বারণ করবি?

বলেই আবার গেলাসে চুমুক দিল।

এতক্ষণে ভগীরথ এসে ঘরে ঢুকলো।

বললে—খাবার হয়ে গেছে, খাবে না?

সুললিত আমার দিকে চাইল। বললে—আজকে তুইও এখানে খেয়ে যা ভাই। একসঙ্গে দু'জনে ভাতটা ভাগাভাগি করে খাবো। ভগীরথের রান্না একবার খেয়ে দেখ্, তুই, দেখে যা কী খেয়ে আমি বেঁচে আছি—

আমি বললাম—কিন্তু আমার বাড়ির খাবার যে নষ্ট হবে—

ভগীরথ বললে—আমি দু'জনের ভাতই রান্না করেছি—

সুললিত বললে—ওই শোন, দেখেছিস, আমার বউ থাকলেও যা করতো ভগীরথও তাই করেছে। ভগীরথই আমার বউ, জানিস, ও আমাকে বউএর মতই সেবা করে—

সুললিতের পেটে তখন অনেকখানি বিষ ঢুকেছে। ও বেশ টলতে আরম্ভ করেছে। আমার হাত দু'টো ধরে টানাটানি সুরু করলে।

বললে—অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, আজ আর তোকে ছাড়বো না, আজ আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাটাবো ভাই। আয় আয়—

বললে—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে রে—

বললাম—তা হলে তুই ঘুমো, আমি বাড়ি যাই—

সুললিত আমার কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বললে—তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাবি? অঞ্জলি চলে গেছে, তুইও চলে যাবি?

বিরক্ত হয়ে বললাম—তুই যদি মদ খেয়ে সহ্যই করতে না পারিস তো ও-সব খাস্ কেন? তার চেয়ে বেরালিন তেল খেতে পারিস।

সুললিত আমার কথা শুনে নেশার ঘোরে হো হো করে হেসে উঠলো। সে হাসি আর থামতেই চায় না। বললে—ঠিক বলেছিস, এবার থেকে বেরালিন তেল খাবো, তুই ঠিক বলেছিস—

যেখানকার ভাত যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল সুললিত উঠে হাত ধুয়ে নিয়ে আবার এসে বসলো চেয়ারে। সে ঠিক বসা নয়, শোয়াই বলতে গেলে। সেই কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সোফাটার ওপর।

বললাম—এ তোর কী রকম খাওয়া বল তো? এ-রকম করে খেলে কদিন আর বাঁচবি?

সুললিত বললে—আমি তো খেতাম না। কিন্তু ওই যে অঞ্জলির কথা মনে পড়ে গেল। অঞ্জলির কথা মনে পড়লেই আমার কেবল খেতে ইচ্ছে করে।

প্রায় বিকেল হয়ে এসেছিল। সেই সকাল থেকে মাতালের সঙ্গে কথা বলে আমারও যেন কেমন ক্লান্তি এসে গিয়েছিল।

বললাম—এবার যাই রে—

সুললিত বললে—কেন, বাকিটা শুনবি না?

—কিন্তু তোর যে নেশা হয়ে গেছে। তুই কি আর বলতে পারবি? সুললিত ভেঙে উঠলো।

বললে—তুই কি ভাবিস আমাকে? আমি কি মেয়েমানুষ?

আমি দেখলাম মাতালের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

বললাম—তাহলে বল্, শুনি—

এসব বহুদিন আগের ঘটনা। এখন ভাবতে ভালো লাগছে সেদিন সুললিতের জীবনের শেষ পরিচ্ছেদটুকু পর্যন্ত শুনেছিলাম। নইলে কি আজ এমন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ সবকিছু লিখতে পারতাম।

মনে আছে সুললিতের কাছে শোনা সেই নাটকীয় ঘটনাটার কথা।

অঞ্জলি তখনও চুপ করে বসে আছে সুললিতের বৈঠকখানা ঘরে। সুললিতও চুপ করে বসে কী যেন ভাবছে।

হঠাৎ অঞ্জলি বললে—কই, কিছু বলছো না যে?

সুললিত বললে—কী বলবো?

—আমার স্বামী কি তাহলে সত্যিই জেলে যাবে? আমার ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি উপোস করবো তুমি থাকতে?

সুললিত বললে—আইনে যা বিচার হবে, তাই-ই হবে। আমি শুধু ডিউটি করে যাবো।

—কিন্তু আমার স্বামীর অপরাধ যদি কোর্টে প্রমাণ হয়ে যায়?

—প্রমাণ তো হবেই, আমি অনেক কষ্ট করে সে-সব ডকুমেন্ট জোগাড় করেছি, তা থেকে ফিস্টার মুখার্জির ছাড়া পাওয়া শক্ত।

—কিন্তু আমি? আমার মুখ চেয়েও কি তুমি এর কোনও বিহিত করবে না?

সুললিত হঠাৎ বলে উঠলো—তুমি আমার কে যে তোমার জন্যে আমি আমার কাজে ফাঁকি দেব?

—আমি তোমার কি কেউ-ই নই?

সুললিত বললে—না কেউ নও। তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই আর।

—এই কথা তুমি আজ আমাকে বলতে পারলে?

সুললিত বললে—এর চেয়ে আরো কড়া কথা বলিনি এইটেই তোমার সৌভাগ্য বলে মেনে নাও। আর আমাকে বিরক্ত কোরো না, তুমি চলে যাও—

—যদি না যাই?

অঞ্জলি যেন সেদিন যে-কোনও রকমে করবে বলে মনস্থির করেই এসেছিল। বললে তোমার কথা না নিয়ে কিন্তু যাবো না আমি আজ—

সুললিত বললে—তোমার এত জোর আমার ওপর?

অঞ্জলি বললে—তোমার ওপর জোর করবো না তো কার ওপর জোর করবো বলো? আমার আর কে আছে?

সুললিত বললে—কেন, তোমার কে নেই? তোমার স্বামী আছে, তোমার ছেলে-মেয়ে আছে? মানুষের আর যা কে থাকে সংসারে? কিন্তু তুমি তোমার নিজের কথাই বলছো। আর ভাবো তো আমার কথা।

অঞ্জলি বললে—তোমার কথা ভাববার আমার সময় নেই সুললিত। আমি এখন নিজের ভাবনাতেই অস্থির। তুমি যদি আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে পারো তো পরে তুমি যা চাইবে তাই আমি দেব।

সুললিত অঞ্জলির দিকে চাইলে।

বললে—আর দুবার যদি ওই কথা মুখে উচ্চারণ করো তো তোমাকে আমি জুতো মেরে তাড়িয়ে দেব। তুমি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে, বেরিয়ে যাও—

অঞ্জলি বললে—সুললিত, বিশ্বাস করো, একদিন তুমি তো আমাকেই চেয়েছিলে, সেই আমাকেই তুমি আবার পাবে—

সুললিত এবার আর ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারলে না। সোজা সামনে এগিয়ে গিয়ে অঞ্জলির গালে এক চড় মারলে।

বললে—কের ওই কথা বলছো? বেরিয়ে যাও বলছি আমার ঘর থেকে, বেরিয়ে যাও—

এতক্ষণে অঞ্জলির চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

বললে—তুমি আমাকে মারলে?

—আর একটাও কথা বলতে পারবে না তুমি, এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও—

—তাহলে আমি এমন কী বলেছি যে তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে আমাকে মারবে? আমি তোমার কাছে কী এমন অপরাধ করেছি?

সুললিত তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

বললে—তবু যাচ্ছো না?

For Quality and Distinction

KALI PROCESS

DESIGNERS, BLOCK MAKERS
AND COLOUR PRINTERS

2, NETAI BABU LANE, CALCUTTA-12

34-2136

অঞ্জলি বললে—আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু এও বলে যাচ্ছি এর প্রতিফল তুমি পাবে। আমার গায়ে তোমার হাত তুলতে এতটুকু বাধলো না। আমি মেয়েমানুষ বলেই আজ এই অপমান সহ্য করলাম, কিন্তু আমার স্বামী থাকলে তোমাকে এর শিক্ষা দিয়ে দিত—

বলে অঞ্জলি মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুললিত তখনও তেমনি করে সেখানে খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ অনেক কিছু ভাবলে। রাত বাড়তে লাগলো। ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজবার শব্দ হলো।

সুললিতের যেন খেয়াল হলো হঠাৎ।

ডাকলে—ভগীরথ—ভগীরথ—

ভগীরথ আসতেই বললে—আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে—

বলে বেরিয়ে গেল।

সেদিন যখন বাড়িতে ফিরলো সুললিত তখন ঘড়িতে রাতের প্রথম প্রহর কেটে তৃতীয় প্রহরে পৌঁছেছে। পায়ে হেঁটে চলবার আর ক্ষমতা নেই তার তখন?

ভগীরথ দরজা খুলে দিয়ে বাবুর চেহারা দেখে চমকে উঠেছে। সিঁড়িতে উঠতে গিয়েই পড়ে গেল টান হয়ে।

অনেক কষ্টে ভগীরথ বাবুকে তুলে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর সুললিতের আর জ্ঞান নেই।

★

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

সুললিত বললে—বাড়িতে থাকতে আর ভাল লাগছে না ভাই, চল্ বেরিয়ে পড়ি—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায়?

—চল্ না, পরে বলবো।

বললাম—এই অবস্থায় তুই যেতে পারবি?

—খুব পারবো—

বলে আমাকে নিয়ে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামলো। তারপর একটা খালি চলন্ত ট্যাক্সি দেখেই তাকে ডাকলে—ট্যাক্সি—

ট্যাক্সিতে উঠেই বললে—চলো—শ্যামবাজার—

ট্যাক্সি কোথা দিয়ে চলতে লাগলো টের পেলাম না। ট্রাম বাসের রাস্তা পেরিয়ে একটা রাস্তার মোড়ে আসতেই সুললিত বলে উঠলো—বাঁয়ে—

এই রকম বাঁ দিক ডান দিক করে যেখানে এসে ট্যাক্সিকে থামতে বললে সেটা একটা কুখ্যাত পল্লী। নানা রকম সাজ-পোষাক পরে মেয়েরা রাস্তায় ঝিলমিল করে বেড়াচ্ছে। পান-বিড়ির দোকান একটা। তার পাশেই ট্যাক্সিটা থামলো। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুললিত নামলো।

বললে—আয়—

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বললাম—আমি যাবো না—

সুললিত বললে—আসতেই হবে—

বলে আমার একটা হাত শক্ত মুঠিতে আটকে ধরল। মাতাল হলেও বেশবার তার গায়ে তখন শক্তি রয়েছে।

বললে—পালালে চলবে না। শেষটা শুনতেই হবে তোকে।

বললাম—শেষটা কাল শুনবো, আজ যাই—

সুললিত বললে—তোরা আমাকে সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির হিসেবেই জেনেছিস, কিন্তু যুধিষ্ঠিরও তো সেকালে নরক দেখেছিল, মহাভারতে আছে। আমিও নরক দেখতে এসেছি—বলে সেখান থেকেই চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—অতসি, অতসি—

দোতলার দরজা-বন্ধজাটা খুলে কে একজন মেয়ে বেরিয়ে এল। এসে সুললিতের সঙ্গে আমাকে দেখে যেন একটু থমকে দাঁড়ালো।

সুললিত বললে—এই দেখ কাকে এনেছি—

মেয়েটা যেন তখনও অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। সুললিত সেদিকে না চেয়ে আমার হাত ধরে

GALCUTTA UNIVERSITY PUBLICATIONS

1.	Asoka : Prof. D. R. Bhandarkar	Rs. 20·00
2.	Bhakti Cult & Ancient Indian Geography : Edited by : D. C. Sircar	Rs. 12·50
3.	Course of Geometry : By Dr. R. N. Sen	Rs. 25·00
4.	Classical Indian Philosophy : By Dr. Satish Chandra Chatterjee	Rs. 5·00
5.	Dictionary of Indian History : By Sachchidananda Bhattacharya	Rs. 40·00
6.	Educatian and the Nation : By Prof. Khagendra Nath Sen	Rs. 30·00
7.	Fundamental of Hinduism By Dr. S. C. Chatterjee	Rs. 5·00
8.	Foreigners in Ancient India and Lakshmi and Sarasvati in Art and Literature : Edited by D. C. Sircar	Rs. 12·00
9.	Ganges Delta : By Sri Kanan Gopal Bagchi	Rs. 2·50
10.	History of Sanskrit Literature : By Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De	Rs. 30·00
11.	Indian Feudalism By Sri Ram Saran Sarma	Rs. 15·00
12.	Illusion and Its Corrections : By Dr. Jatil Coomar Mukherjee	Rs. 20·00
13.	Light and Matter : By B. N. Sen	Rs. 3·00
14.	Nepali Language Its History and Development	Rs. 10·00
15.	Old Bengali Language and Text : By Dr. Tarapada Mukherjee	Rs. 12·00
16.	Philosophy of Mahatma Gandhi (2nd. Indian Ed.) By Dr. D. M. Datta	Rs. 5·00
17.	Poison and Poisoning (Khentamani-Nagendralal Memorial Lec. 1966) By Dr. K. N. Bagchi	Rs. 7·50
18.	Religious Essays : By S. K. Maitra	Rs. 10·00
19.	Studies on Indian Antiquities : Hem Chandra Raychoudhuri	Rs. 15·00
20.	Select Inscription (Bearing on Indian History and Civilization) By Dr. D. C. Sircar	Rs. 45·00

For Further Details Please Enquire :

PUBLICATION DEPARTMENT UNIVERSITY OF CALCUTTA

48, Harza Road, Calcutta-19.

হিড়-হিড় করে টানতে টানতে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো। ঘরের মেঝের এক কোণে মোটা কম্বল পাতা ছিল। সুললিত সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে পাশে বসালো।

বললে—এই দেখ অঞ্জলি, আমার বন্ধুকে নরক দেখাতে এনেছি—

মেয়েটি তখনও কী করবে বুঝতে পারলে না।

সুললিত ধমক দিয়ে বললে—হাঁ করে দেখছো কী? বোতল বার করো,—

মেয়েটা আর বাক্য ব্যয় না করে কাঠের আলমারি থেকে দুটো গেলাস আর একটা বোতল বার করলে। তারপর দুটো গেলাসে ঢালতে লাগলো।

বললাম—আমাকে দেবেন না, আমি খাবো না—

মেয়েটা অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে। যেন আমার মুখ থেকে এমন কথা শুনবে আশা করেনি।

সুললিত একটা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললে—আচ্ছা অঞ্জলি, তুমি তো জানো শেষকালটা, বলো তো, শেষকালটা একে বলো তো? বলো—

মেয়েটা বোবার মত আমার দিকে চাইলে।

আমিও কিছু বুঝতে পারলাম না।

—বলো বলো, শেষকালটা বলো। তোমাকে যখন পালে চড় মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিলাম, তুমি তখন কী করলে আমার বন্ধুকে বলো—

মেয়েটা বললে—আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলাম।

—তারপর? তারপরটা বলো?

মেয়েটা বললে—তারপর দিন কোর্টে আবার কেস উঠলো। আমার স্বামী পরমেশ মুখার্জি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। আর তুমি সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালে—

সুললিত মদ খেতে খেতে শুনছিল।

এবার বলে উঠলো—তারপর?

—তারপর তুমি কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিলে।

—কী মিথ্যে সাক্ষী দিলুম সেই কথাটা বলো। নইলে আমার বন্ধু বুঝবে কী করে? বলো?

মেয়েটা বললে—তুমি বললে যে আসামী নিরপরাধ। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি বলে সেই রাগে তুমি মিথ্যে করে আসামীকে ধরিয়ে দিয়েছ। আসলে ঘটনাই সাজানো কেস—

সুললিত চোখ বুঁজে সব শুনছিল।

বললে—তারপর?

—তারপর আমার স্বামী বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেল।

—আর আমি? আমি কী করলাম তাও বলো—

মেয়েটা বললে—সেইদিন থেকেই তুমি মদ ধরলে, আর চাকরিতে ইস্তফা দিলে—আমার জন্যেই তুমি জীবনে যা কখনও করোনি তাই করলে, মিথ্যে কথা বললে আর তার ফলে চাকরিও ছেড়ে দিলে।

সুললিত বললে—এবার শেষ কালটা বলো—ওটা কেন বলছো না?

মেয়েটা বললে—শেষকালে আমিও সেই স্বামী ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে এলুম—

সুলালিত সবটা শুনে এবার যেন খুশী হলো।

আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলি তো, এবার সবটা শুনলি তো? এখন বেখলি তো আমারই জয় হয়েছে, মিথ্যে কথারই শেষ পর্যন্ত জয় হয় বেখলি তো—

বলে সুলালিত নেশার ঘোরে হো হো করে হাসতে লাগলো।

আমি যেন এতক্ষণ এক অদ্ভুত অভিনয় বেখছিলাম। এ-রকম অভিনয় জীবনে আগে আর কখনও বেখিনি—

আস্তে আস্তে উঠলাম। সুলালিত আমায় বেখতে পেলে না। সে তখন চোখ বুঁজে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি, হঠাৎ পেছনে তার যেন পায়ের শব্দ হলো।

মুখ ফিরিয়ে বেখি সেই মেয়েটা। মেয়েটা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বললে—উনি কি আপনার বহুকালের বন্ধু?

বললাম—হ্যাঁ, ছোট বেলাকার। কেন?

মেয়েটা বললে—আচ্ছা বলুন তো অঞ্জলি কে?

বললাম - কেন, তুমি কিছু জানো না? তোমায় কিছু বলেনি সুলালিত?

মেয়েটা বললে—না, আমার নাম তো নীহার। কিন্তু উনি আমাকে কেবল অঞ্জলি বলে ডাকেন—কেন বলুন তো?

—তবে তুমি যে গড়-গড় করে এতক্ষণ সব কাহিনী বলে গেলে?

মেয়েটা বললে—ও সব তো ওঁর শেখানো। উনি যে-সব কথা বলতে শিখিয়ে বিয়েছেন সেই সব কথা ওঁকে রোজ শোনাতে হয়। উনি বলতে শিখিয়ে বিয়েছেন যে আমার স্বামীর নাম পরমেশ মুখার্জি; তিনি ইন্‌জিনীয়ার। তাঁকে উনি টাকা চুরি করার জন্যে ধরেছিলেন। তারপর যা-যা বললুম সবই ওঁর শেখানো। এখন আমি ওঁর বউ।

—তুমি কি সত্যিই ওর বউ?

মেয়েটি বললে—বউ হতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমাদের কাছে যখন যে বাবু আসে আমরা তখনই তার বউ। আচ্ছা সত্যিই কি ওঁর জীবনে অঞ্জলি বলে কেউ ছিল?

আমি এ কথার কোনও উত্তর বিলাম না। সোজা অন্ধকার রাস্তায় নেমে এলাম। আমার আর কিছু বলবার প্রবৃত্তিও ছিল না তখন। এমন করেই কি সুলালিতের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে হয়। সুলালিতের ভাগ্যবিধাতা কি ওর অন্য পরিণতির কথা চিন্তা করতে পারতেন না।

এর পরে সুলালিতের বাড়িতে আর একদিন গিয়েছিলাম। কিন্তু বেখলাম সে-বাড়ির সদর দরজায় তালা বেওয়া। পাশের ফ্লাটের ভাড়াটের কাছে শুনলাম সুলালিত তার চারদিন আগে মারা গেছে।

তিনটি শব্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যমতা-দির মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে সুষমাও ছিল। অধিকাংশ শ্মশান-যাত্রীই ছাত্রী ও সহশিক্ষিকা। কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল স্থানীয় যুব-ক্লাবের সভ্যেরা। যমতা-দি বিয়ে করেননি। আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না। কে এক-বোনলো হয়—মুখাগ্নি করলে।

শ্মশানে এলে সাময়িক একটা বৈরাগ্য জন্মায়। তাকে বলে শ্মশান-বৈরাগ্য। কিন্তু যে চেতনা সুষমাকে এখন আচ্ছন্ন করল তা ঠিক বৈরাগ্য বা অনাসক্তি নয়, তা জাগতিক অসারতা নিয়ে কোনো দার্শনিক মনোভাব নয়—সে নিজের সম্পর্কে এক অগাধ শূন্যতাবোধ।

এই তো যমতা-দি! একেবারে নির্বান্ধব নিরাত্মীয়। প্রায় ষাটের কাছে বয়েস, আপনজন বলে কোনদিন কাক মুখ দেখলেন না। চিরদিন একা-একা কাটালেন। শেষ অসুখের সময় তো নার্সদের হাতে ছিলেন—উপর-উপর যা দেখাশোনা করবার করেছে ছাত্রীরা। সহশিক্ষিকারা—বিশেষ করে সুষমা নিজে। শেষদিকে সুষমাকেই বেশি আঁকড়েছিলেন, তাঁর শয্যাশায়ী চিকিৎসায় বাবদ কী খরচ হতে পারে তার একটা বিরাট আন্দাজ করে বেশ কিছু টাকা রেখেছিলেন তার হাতে। সে টাকা সম্পূর্ণ খরচ হয়নি, কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সে অবশিষ্ট কাকে ফিরিয়ে দিতে হবে সুষমা জানে না। ও ছাড়াও তো যাতে তাঁর যে টাকা আছে তাই বা কার প্রাপ্য। শুধু টাকা কেন, তাঁর সুন্দর বাড়িখানারও বা ওয়ারিশ কে। কোনো উইল করে গেছেন কিনা, করলে সে উইল কোথায় আছে কেই বা তার কিনারা করবে? তাঁর ঘরে যে বড় আলমারিটা আছে তার চাবি কোথায়? কেই বা সেই আলমারি খোলবার হকদার?

মৃত্যুর ঠিক আগে যমতা-দি একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন দেয়ালের দিকে, তাঁর ঘরভরা নৈষ্কর্ম্যের দিকে। যেন কী খুঁজতে চেয়ে খুঁজে পেলেন না, বলতে চেয়ে পারলেন না বলতে। শেষে যে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করলেন সেটি দীর্ঘনিশ্বাস।

সুষমার জীবনেরও তো ঐ একই নমুনা। তার বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হোক না হবে—ষাটের আর বাকি কী! সে আজও নিষ্কুষ। এত দিন যখন নিঃসঙ্গে কাটল বাকি কটা দিনও একই ধারায় নিরুপদ্রবে কেটে যাবে। তার ভবিষ্যৎ—যতটুকুই তার আয়তন হোক, তার ললাটের মতই মসৃণ। তারও প্রত্যক্ষ ও সন্নিহিত কোনো আত্মীয় নেই। শেষ বয়সে কারও ঘাড়ের হবেনা সংকল্প করে

সেও হাউসিং স্কিমে একজনের মত ছোটখাটো একখানি বাড়ি করেছে। তারও অবস্থা কিছু অসচ্ছল নয়, তারও ব্যাঙ্কে একাউন্ট আছে! মধ্যবিত্ত ভদ্র আকাঙ্ক্ষাপূরণের ফরদা—শাড়ি কেনা, বই কেনা, গ্রামোফোন-রেকর্ড কেনা, সিনেমা-থিয়েটার দেখা—সব তার আয়ত্তের মধ্যে। তার যারা মোটামুটি ভালো—এখন পর্যন্ত ভালো—ছুটি-ছাটায় কাছে-দূরে তীর্থ-অতীর্থ যে কোনো জায়গা সে ঘুরে আসতে পারে। ইচ্ছে করলে সুখলাঞ্ছিত আলস্যে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতে পারে গোটা দিন। তার উপর কারু কোনো ভয় নেই তার নেই দায়দায়িত্ব নেই। তার এক দাদা ও দিদি আছে বটে সে শুধু কাগজে-কলমে, নববর্ষ ও বিজয়ার চিঠিতে। মরে যাবার পর হয়তো বিধবা থেকে বেরিয়ে আসবে দিব্যলোকে, ওয়ারিশির ভাগ নিতে। তারপর, কা কস্য পরিবেদনা, এসে দেখবে আমি সব কিছু আর কাউকে দান করেছি, উইল করে বিলিয়ে দিয়েছি যত্র-তত্র। কিন্তু, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফেলল না সুষমা—কিন্তু কাকে দান করব, কে সে অদৃষ্ট লোক যে আমার উইলে উপকৃত হবার অধিকার রাখে! এ কী বিশাল মরুভূমি—সারা পৃথিবীতে কারু প্রতি আমার বিন্দুমাত্র টান নেই। আমাকে কেউ ভালোবাসেনা এ অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু আমি কাউকে একটু স্নেহও করতে পারলাম না—এ কী দুঃসহ পরাভব!

সন্তান থাকলে বুঝি নিজের থেকেই টান আসত, স্নেহ সত্যি কী পদার্থ বুঝতে পারতাম! তখন উইল লাগত না, দানপত্রও অবান্তর হত। কিন্তু সন্তান থাকলেই মায়ের কৃতার্থতা আসত এর প্রমাণ কী? কত ক্ষেত্রে ছেলেই মায়ের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কত ক্ষেত্রে উইল লেখেছে ছেলেকেই বিত্ত-বিষয় থেকে বিচ্যুত করবার জন্যে। আর ছেলে আসবে তো বিয়ের মাধ্যমে। সুষমা চিরকাল বিবাহের বিপক্ষতা করেছে। বিয়েই মেয়ে-জীবনের বৈকুণ্ঠ—একথা কোনদিন সে মানতে চায়নি। বিয়ের বাইরে বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে একজন মেয়ের যে কীর্তি অর্জনের সম্ভাবনা আছে—বিবাহিত বন্দিত্বের মধ্যে তার অস্তিত্ব কতটুকু। কীর্তিই তো জীবনের চরিতার্থতা। আর চিরকাল কুমারী থেকে আদর্শ অহমারী কাল করে যাওয়াটাই তো বিশাল কীর্তি।

বিবাহ মানেই তো যাবজ্জীবন কারাবাস। শুধু প্রসব-উৎসব। কত এর বিরুদ্ধে লিখেছে সুষমা, বক্তৃতা দিয়েছে। কোন প্রথম যৌবনে মেয়ে পতিগৃহে গিয়ে ঢোকে, তারপর শুরু হয় তার একটানা ঘানি টানা। সেই খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়। জীবনে আর কোনো রোমাঞ্চ নেই, নেই আর কোনো নতুনের উদ্ভাবনা। হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি—শুধু কর্তব্য আর দায়িত্বের বেড়াজাল। নেই আর কোনো অভিযানের দুঃসাহস। শুধু একনায়কত্বের আঁতাকুড়ে পিষ্ট হওয়া—শোষিত হওয়া। সংসারে স্বামী হচ্ছে বুর্জোয়া আর স্ত্রী হচ্ছে প্রোলিটারিয়েট। এ অবস্থা সহনাতীত। অন্তত সুষমা যুপকাষ্ঠে মাথা গলাবেনা। সে একা থাকবে।

একাই থেকেছে সে পর্যন্ত—আজীবন থাকবে। এও বুঝি সেই খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়। এ পর্যন্ত তার জীবনে কোনো প্রেম এলনা—জানলা দরজা খুলে রাখলেও না—না বা কোনো পূর্বরাগের আভাস জাগল! মিলন বা স্বর্গের কথা দূরে থাক, একটা বিচ্ছেদ-বিসর্গও জুটল না। বাড়ি করার পর লুকিয়ে কাগজে সে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল কিন্তু লজ্জায় নিজেকে নিজের মুখ দেখাতে পারছে না সুষমা, একটাও সুতন্ত্র উত্তর পেলনা। রোজগেরে শিক্ষিকা বলে কেউ যদি বা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যখন দেখে সে মেয়ে নয়, মহিলা—পিছিয়ে যায়। বৃদ্ধ চিরকুমারও, খুঁজতে হলে তরুণী নয়তো কিশোরী

খোঁজে, প্রৌঢ়ার দিকে হাত বাড়ায় না। এক বিপত্নীক ভদ্রলোক শুধু জানিয়েছিল প্রৌঢ়াতে তার আপত্তি না থেকে বরং আগ্রহই বেশি, যেহেতু তার অপোগণ্ড দুটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ প্রৌঢ়াই ভালো করতে পারবে। কী লজ্জা বা অপমান, সে নিজে গিয়েছিল নিজের বিয়ের ঘটকালি করতে! ভাগ্যিস এটা বাইরে কোথাও জানাজানি হয়নি, নিজের দাঁতে কাটা নিজের জিভের ব্যথা নিজের মুখের মধ্যে রেখেই সে সারিয়ে নিয়েছে। তারপর আর ভাবেনি নিজের কথা মানে নিজের ভবিষ্যতের কথা। সে একা থাকতে এসেছে, সে একা থাকবে। একা থাকাই নিরাপদ থাকা।

সেই কলঙ্কমুক্ততা যে কী ভীষণ দায়, কাঠের স্তূপের মধ্যে মমতা-দিকে পুড়তে দেখে উপলব্ধি করল সুষমা। সুষমা মরে গেলে কে তাকে বয়ে করে শ্মশানে নিয়ে আসবে, জীবনের ভার না নিক মরণের ভার নেবে, কে তার মন বুঝে তার বিষয়-আশয়ের বিলিব্যবস্থা করবে, কাউকে দেখতে পেল না। কে বা বাড়ি গিয়ে নির্জনে বসে তার জন্যে একটু কাঁদবে, তার জীবনের দুটি ভালো কথা মনে করবে—নেই, নেই, কেউ নেই ত্রিভুবনে: স্বামী না জুটুক, সন্তান না জুটুক, প্রেমিক না জুটুক—একটি বন্ধুও তো জুটতে পারত। না হয় তাকে দিদি বলে ডাকত, না হয় কিছুই বলত না—তাকে তার নাম ধরে ডাকবে এমন লোক কোথায় কাছে-কাছে, তার ডাকনাম যে 'মুনু' ছিল তাই বা কে জানে?

'মুনু!'

সত্যি কেউ ডেকে উঠল নাকি আকস্মিক? ব্যস্ত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল সুষমা। কেউ নেই। এ শুধু শ্মশানভূমির দীর্ঘশ্বাস।

আগুনে মমতা-দির চুলগুলি পুড়ে যাচ্ছে তাকিয়ে দেখা যায় না। সুষমা এখানে কেন এসেছিল মিছিমিছি? শ্মশানে আসা মানেই নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলা। নিজের নিঃসঙ্গতা যে কী ভয়াবহ সেই চেতনার সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যাওয়া। সুষমা তাড়াতাড়ি শ্মশানের চত্বরের বাইরে নদীর ধারটিতে এসে দাঁড়াল। নদীস্রোতটিই বা কী নিঃসঙ্গ!

দেখল পায়ে ছোট-বড় উঁচু-নিচু নানারকম সমাধি- গায়ে-মাথায় কিছু না কিছু মৃতের পরিচিতি। নামধাম বয়স—কোথাও বা দু চার ছত্রে শোকার্ত কবিতা। ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল সুষমা। দেখল এক পাশে নিচু একটা সমাধি রয়েছে, উপরে ঘাস-মাটি-জঞ্জালের আবর্জনার জন্যে লেখাটা পড়া যাচ্ছে না। সব সমাধি সম্পর্কেই উপেক্ষার অভিযোগ করা চলে, কিন্তু এই বিশেষ সমাধি সম্পর্কে যে অভিযোগ করা উচিত, তা অবহেলার নয় তা নিষ্ঠুরতার।

কী মনে হল সুষমার, সে নিচু হয়ে বসে দুই হাতে সেই সমাধির উপর থেকে ঘাস-লতার জঞ্জাল পরিষ্কার করে দিল, দুই হাতে ঘন মাটির আস্তরণ সরিয়ে ভিতরের লেখার নাগাল পেল, কিন্তু অক্ষরের খাঁজের মধ্যে মাটি শক্ত হয়ে জমে যাওয়াতে স্পষ্ট পড়তে পারল না। তখন কোথাকার কার একটা পরিত্যক্ত ভাঙা নদীর জল নিয়ে এসে লেখাটাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলল। একটা কাজ করবে মনে হলে শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্ন না করে সুষমার নিস্তার নেই। কিন্তু পড়তে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—এ যে দেখি তার মায়ের নাম!

অবশ্য এ তার মায়ের সমাধি নয়—তার মা মারা গিয়েছে অন্য জায়গায়, অন্য দেশে—বলা যেতে পারে দূর দেশে—কিন্তু কী আশ্চর্য, নামটা মায়ের। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। কে এই হেমাঙ্গিনী জানবার উপায় নেই। কিন্তু নামটা দেখামাত্রই নিবিড় করে মায়ের স্মৃতি সুষমাকে আচ্ছন্ন করে ধরল।

এই তো সন্তানের চরিত্র! হেমাঙ্গিনী দেবীর সন্তানেরা কোথায়? যারা ঘটা করে এই সমাধি নির্মাণ করেছিল তারা বা তাদের বংশধরেরা কোথায়? সেই সমাধির এখন কী দশা তাকে জানবার আর কৌতূহল নেই। কেউ আর এখানে প্রদীপ জ্বালে না, ফুলের স্তবক দিয়ে তবু দুটি ফুল এনে রাখে না নিভৃতে। হেমাঙ্গিনীই যখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তখন তার সমাধিও লুপ্ত হয়ে যাবে এ আর বিচিত্র কী।

না, কিছুই লুপ্ত হবার নয়। 'হেমাঙ্গিনী' অক্ষর কটি উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই সুষমার মনে তার মায়ের স্মৃতি উদ্ভাসিত হল। মা যখন মারা যান তখন তার বয়স প্রায় দশ—মার কিছু স্মৃতি তার মনে তো বেশ জাগরূক ছিল, পরবর্তী জীবনে সেই স্মৃতিটুকুকে তো সে আর লালন করেনি, সময়ের স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে দিয়েছে। মায়ের একটা ফটো বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখেনি, রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে সেই ছবিকে প্রণাম করেনি—সুখে-দুঃখে সম্পদে-সঙ্কটে মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেয়নি আশীর্বাদ। মাকে একেবারে ভুলে করে দিয়েছে।

তার যদি সংসার হত, সন্তান হত—সেও তবে এমনি করে শোধ দিত। তার একটা ছবিরও খোঁজ করত না। দিনান্তে যামান্তে বৎসরান্তে একবারও চিন্তা করতনা কে তার মা ছিল, তাকে পৃথিবীতে দান করে দেবার জন্য কী কঠোর তপস্যা করেছিল একদিন!

নত হয়ে সমাধিকে প্রণাম করল সুষমা।

শ্মশানও সব নিয়ে নেয় না, কিছু আবার ফিরিয়ে দেয়। সে বৈরাগ্য নয়, শূন্যতা নয়, সে এক উপস্থিতি।

হাতা দিয়ে যাচ্ছে সুষমা, এক অপরিচিত বিধবা মহিলা হঠাৎ তার কাছাকাছি হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'বাছা, এখানে কোথাও ফুলের দোকান আছে?'

'ঐ তো, ঐ সামনেই তো ফুলের দোকান।' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সুষমা।

ভদ্রমহিলা দ্রুত পায়ে ফুলের দোকানের দিকে অগ্রসর হল।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছিল সুষমা, ভিড়ের মধ্যে ভদ্রমহিলাকে আর দেখতে পেল না। এত শিগগির কোথায় চলে গেল মনে ঔৎসুক্য জাগতে সুষমা ফুলের দোকানের দিকে পা বাড়াল।

দোকানে উঠতে যাচ্ছে দরজার সামনে মুখোমুখি এক ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—তার হাতে তিনটি শাদা গোলাপ ফুল।

কী মনে হতেই সুষমা দোকানে ঢুকে দোকানিকে জিজ্ঞেস করলে, 'গোলাপ আছে?'

দোকানি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'তিনটি ছিল, ঐ ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন।'

'ও তো শাদা নিয়ে গেলেন—লাল নেই?'

'না, আর কোনো রকম নেই।'

'আপনার দরকার?' ভদ্রলোক ফুল-হাতে ফিরে এল: 'বেশ তো, আপনিই নিন। আমার না হলেও চলবে।' ভদ্রলোক ফুলের প্যাকেটটা হস্তান্তর সুষমার হাতে গছিয়ে দিল।

সুষমা বিস্ময়ের মত তাকাল দোকানির দিকে। ব্যাগে হাত রেখে বললে, 'দাম কত?'

'দাম তো ভদ্রলোক দিয়ে দিয়েছেন।'

'সে কী কথা?' বিস্ময়ের মত সুমনা পিছন ফিরে তাকাল। কোথায় ভদ্রলোক? তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এল সুমনা। ও কী, দাম নিয়ে যান—

পরমেশ কোনো উত্তর দিল না। একটা ভিড়-ভর্তি বাস-এ উঠে পড়ল।

এটা কী রকম হল? অন্য লোকে দাম দিল আর তার ফুল কিনা আমার হাতে!

মনে হল শাদা গোলাপ যেন লাল হয়ে উঠেছে—লজ্জায় লাল! আচ্ছা সে লাল গোলাপ চেয়েছিল কেন? খোঁপায় পরতে? এখন সে এই শাদা গোলাপ দিয়ে কী করবে?

শাদা গোলাপ দিয়ে কী করবে মন স্থির করতে সুমনার দেরি হল না। সে এই ফুল হেমাঙ্গিনী দেবীর সমাধির উপর রেখে আসবে।

শ্মশান আবার টানল সুমনাকে। গিয়ে দেখল সেদিন যেমন পরিষ্কার করে রেখেছিল তেমনি পরিষ্কারই আছে। আরো সে একটু পরিচর্যা করল। তারপর ফুল তিনটি রাখল সে বেদীর উপর।

'তোমাকে এই ফুল দিলাম।' মনে মনে বললে সুমনা।

সুমনা জানে কতক্ষণ পরেই এই ফুল কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। ফুল দিয়ে সে কী করবে, ঘর সাজাবে না খোঁপা সাজাবে না আবার বেচে দেবে—কিছু আসে যায়না সুমনার। ভদ্রলোক যখন তাকে এই ফুল দিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেনি, তা দিয়ে সুমনা কী করবে? উঠে যাবার আগে সুমনা বেদীকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, কি, খুশি তো? অহেতুক ফুল পেলে কে না খুশি হয়? সুমনা খুশি হয়নি।

কোথা দিয়ে কী যে ঘটে গেল কোনো কার্যকারণ খুঁজে পেলনা সুমনা। তার ফুলের দোকানে যাবার যুক্তি কী? তার অকস্মাৎ ফুল কিনতে চাইবারই বা যুক্তি কী? আর এত ফুল থাকতে সে পছন্দ করল কিনা লাল গোলাপ? কী যুক্তি, প্রথমত লাল গোলাপের বদলে তার হাতে এল গভীর শাদা গোলাপ। আর তা কিনা সে অনায়াসে শ্মশানে রেখে এল—শুধু একটা নামের আকর্ষণে।

সত্যিই কোনো যুক্তি নেই। যুক্তি নেই রাতের অন্ধকারে তার ঘুমন্ত ঘর কেন গোলাপের গন্ধে ভরে যাবে?

কদিন পর ভগ্নী শিক্ষিকা আরতির সঙ্গে চৌরঙ্গিপাড়ার সিনেমা দেখতে এসেছে সুমনা। কলকাতার কোন উপকণ্ঠ থেকে আরতিই তাকে টেনে এনেছে। আরতির বয়েস মোটে বাইশ-তেইশ, যৌবনের উত্তাপে-উল্লাসে অনুক্ষণ করছে। কথা বলছে একরাশ, হাসছে একরাশ, বাস করছে যেন অন্তহীন দিগন্তের মধ্যে। আর তার পাশে সুমনা যেন এক ঘনীভূত প্রৌঢ়তা। শুধু সংযম নিয়ম আর নিবারণ দিয়ে গাঁথা।

সুমনা ভাবে তারও তো একদিন ঐ বয়েস ছিল, তখন কি সে এমনি আনন্দিনী ছিল? এমনি আশার ও স্বপ্নের পসারিণী?

হল-এ ঢুকতে যাবে এমন সময় রাস্তায় কাকে দেখে আরতি চমকে চেঁচিয়ে উঠল: 'আরে তুমি? কৌশিক?'

'কী আশ্চর্য, কটি, তুমি এখানে?'

'সিনেমার টিকিট কিনেছি, তুমিও একটা কাটো না।'

'হাউস ফুল হয়ে গিয়েছে, এখন আর পাওয়া যাবে না।'

'না, যাবে, তুমি দেখনা চেষ্টা করে।' আরতি আলাদা হয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'পেলেও লাভ নেই।' কৌশিক গলা নামাল: 'পাশাপাশি বসা যাবে না।'

'তাও যাবে। তুমি ব্যালকনির টিকিট কাটো। আমি পাশের লোকের সঙ্গে তোমার টিকিটটা বদলে নেবো।'

'তা এক পাশ বদলাবে, আর ওপাশে তোমার যিনি সঙ্গিনী, একমুখ থমথমে মেঘ, তাঁকে বদলাবে কী করে?'

'ও আমার সুরমাদি। এমনিতে হালকাটি দেখাচ্ছে কিন্তু অন্তর খুব ভালো—উনি কিছু মনে করবেন না।'

'তার চেয়ে সিনেমা রেখে আমার সঙ্গে চলো, একটা রেস্টুরাণ্টে ঢুকি, তারপর খেয়ে নিয়ে বেড়াই ট্যাক্সি করে।'

নিদারুণ আকর্ষণে আরতি ঝলমল করে উঠল: 'সত্যি?' তক্ষুনি ঘুরে গিয়ে সুরমার কাছে এসে বললে, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' কৌশিকের নাম আর চাকরি, সুরমার নাম আর চাকরির বিবরণ দিয়ে ভাসা-ভাসা পরিচয় করিয়ে দিল।

'তোমার নিজের পরিচয়টা দিলে না?' কৌশিক এগিয়ে এল।

'ও আমাকে রুটি বলে ডাকে। আমার আরতি নামটা ও ইংরিজি করে 'আর' 'ও' 'টি'-র উচ্চারণে 'আরোটি' বলে। আরোটি-র আ বাদ দিয়ে রোটি, আর রোটির বাঙালি সংস্করণ রুটি—'

'হ্যাঁ, দী ইজ মাই ব্রেড অব লাইফ।' অবলীলায় বললে কৌশিক।

সুরমা শুধু একটু হাসল।

'শোনো, সুরমা-দি, আমি আজ আর সিনেমায় যাব না, ওর সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল—কতদিন পরে দেখা—' আরতি তার সিনেমার টিকিটটা সুরমার হাতে গুঁজে দিতে চাইল: 'তুমি আমার টিকিটটা বেচে দিও। আমি ওর সঙ্গে যাই।'

অথচ আরতির নির্বন্ধেই সিনেমায় আসা। এমনও কিছু থাকতে পারে জীবনে যার আভাসের হাতছানিতে এত সাধের সিনেমাও পলকে অসার হয়ে যায়।

'তোমার টিকিটটা বেচবে কেন?' সুরমা স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'আমার টিকিটটা নাও। তোমরা দুটিতে দেখ। তারপর যেখানে যাবার যেও।'

'সত্যি?' আরতি আনন্দে একেবারে একটা সাতরঙা রামধনু হয়ে উঠল: 'সুরমাদি, আপনি কী ভালো, কী মিষ্টি!' দ্বিধা হাত বাড়িয়ে নিল সুরমার টিকিটটা: 'আপনি তবে এখন কী করবেন?'

'কী আর করব! বাড়ি ফিরে যাব।'

সুরমা যখন চলে যাচ্ছে কৌশিক আরতিকে বললে, 'ভদ্রমহিলা কেমন বঞ্চিতের মত চলে যাচ্ছেন।'

'এ ওর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।' হাসিমাখা লঘুস্বরে আরতি বললে, 'বয়েস তো কম হয়নি।'

'তা হলে বলছ ওর আর আশা নেই।' লঘুস্বরে কৌশিকও হেসে উঠল।

কত দূর গিয়েছে সুরমা, হঠাৎ এক বিধবা মহিলার সঙ্গে দেখা।

'আচ্ছা নিউ মার্কেটটা কোথায় বলতে পারেন?' সুষমাকে জিজ্ঞেস করলে মহিলা।

চৌরঙ্গি পাড়ায় এসেছে অথচ নিউমার্কেটটা চেনেনা এ কেমনতরো প্রশ্ন? হাত দিয়ে দেখিয়ে সুষমা পথনির্দেশ দিয়ে দিল। প্রশ্নকর্ত্রীকে নিয়ে আর মাথা ঘামাল না। ভিড়ের মধ্যে কোন দিকে মিলিয়ে গেল তার আর কে খোঁজ নেয়?

হঠাৎ সুষমার মনে ডাক দিল এ সেই ফুলের দোকান-খোঁজা ভদ্রমহিলা নয় তো? তবে কি ভদ্রমহিলা তাকে মার্কেটে যেতে বলছে? সেইখানে গেলে কি সাদা গোলাপের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হবে? সেদিনের সেই ক্ষণটা শোধ করতে পারবে?

কেন কে জানে সুষমার বুকের ভিতরটা শিরশির করে উঠল। সন্দেহ কি, সেই ভদ্রমহিলাকে খোঁজ করতেই তো সে ফুলের দোকানে ঢুকেছিল, আর ফুলের দোকানে ঢুকেই তো দেখা পেল ভদ্রলোকের আর এক মুহূর্তে ক্ষণে আবর্ত হয়ে গেল।

ক্ষণই তো জীবনের প্রথম বাবিত্রা। কে জানে এই ক্ষণই আবার পরম সম্পদ হতে পারে।

মার্কেটের দিকেই পা চালাল সুষমা। সামনের গেট দিয়েই ঢুকল আর ঢুকে ডানদিকে তাকাতেই দেখল—ঠিক যা ভেবেছিল, সেই ভদ্রলোক।

তবে কি ঐ মহিলা আর এই মহিলা একই মানুষ?

পরস্পর চোখোচোখি হতেই দুজনে অপার্থিব ভাবে হাসল। পরমেশ সবিস্ময়ে বললে, 'আপনি এখানে কী করতে?'

'ফুল কিনতে।' বলতে এতটুকু বাধল না সুষমার। উলটে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি?'

'আমিও তাই। সাদা গোলাপ। আপনার তো লাল পছন্দ।'

'না। সাদাই ভালো। স্নিগ্ধ। সেদিন দাম নেননি কেন?'

'আজ দিয়ে যেবেন।'

'হ্যাঁ, চলুন। শোধ দিতে না পেরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।' সুষমা চলতে শুরু করল।

'হবারই কথা। অনেক সময় আবার শোধ দিয়েও অস্বস্তি হয়।' মধুর করে হাসল পরমেশ।

'সত্যি, ভাবতেই পারিনি আবার দেখা হবে।'

'সত্যিই খুব আশ্চর্য লাগছে। সংসারে বিস্ময় ছাড়া আর আছে কী। আদিতে বিস্ময়, অন্তে বিস্ময়, প্রতি পদে বিস্ময়। বিস্ময়ই সেই বস্তু যার অন্ত নেই, বিরতি নেই, একঘেয়েমি নেই—'

'এমন কি মৃত্যুতাও বিস্ময়।'

ছটি সাদা গোলাপ কিনল সুষমা—তিনটি নিজের জন্যে, আর তিনটিতে ঋণ শোধ।

'আপনি ফুল নিয়ে কী করবেন?'

'শ্মশানে যাব। সেখানে আমার একটি আত্মীয়ার মৃতিতন্তে অর্পণ করব। কিন্তু আপনি?'

'আমিও আপনার অনুবর্তী। আমিও ফুল শ্মশানে নিয়ে যাব।'

'শ্মশানে?'

'হ্যাঁ, আমার নির্জন কক্ষে।' পরমেশ কঠিন মুখে বললে, 'হস্টেল সুপারইনটেণ্ডেণ্ট-এর ঘরকে আপনি শ্মশান বলবেন না?'

বলে পরমেশ তার নিজের পরিচয় দিলে।

কালো পাথর কুঁদে তৈরি করা বলিষ্ঠ মূর্তি। কোথাও যেন একটুও শৈথিল্যের প্রশ্রয় নেই। এককালে আগের রাজনীতি করে জেল খেটেছে। এখন একটা মিশনারি স্কুলে মাস্টারি করছে। একক আছে বলে হস্টেলে তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিতে অসুবিধে হয়নি। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হল—শ্মশান হতে আর দেরি কী। আমি মানুষটা বড় কঠোর, ছেলেরা আমাকে ভীষণ ভয় করে। আমার নিয়ম রক্ষা করো, আমি তোমাকে রক্ষা করব। নিয়মের বাইরে গিয়েছ কী, আমি নির্মম।

'কিন্তু ফুল তো নিয়মের বাইরে।' সুমনাও অলক্ষ্যে একটু মাস্টারি করল: 'ফলই উদ্দেশ্য, ফুল অবান্তর, অনিয়ম।'

'ঠিক বলেছেন। তাই তো ইভনিং ফুলের সঙ্গ করছি, যদি নিয়মের বাইরে ফলতার উদ্রেক হয়। সকলে বলে আমি বিয়ে-থা করিনি, আমার সন্তান হয়নি, তাই আমি রুক্ষ, নিষ্ঠুর। আচ্ছা, সন্ন্যাসীরাও তো সংসার করে না, তারা কি নিষ্ঠুর হয়?'

'তারা কেন হবে? তারা যে ভালোবাসে।'

'ভালোবাসে? সে আবার কী কথা? কাকে ভালোবাসে?'

'তারা ভগবানকে ভালোবাসে।'

হো-হো করে হেসে উঠল পরমেশ। বললে, 'আমার যে আবার ভগবানও নেই।'

'ঐ ফুল ধরেছেন ফুলেরই সঙ্গ করুন। ফুলই ঠিক চিনিয়ে দেবে।' বিদায় রেখায় সামান্য একটু হাসল সুমনা: 'আচ্ছা আসি।'

'কী, সেই শ্মশানে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শ্মশানে বেশি যাওয়া-আসা করবেন না। বেশি যাওয়া-আসা করলে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়।'

সুমনা গম্ভীর হল, বললে, 'ভয় তো আপনার। কেননা আপনার ঘরই ক্যাম্প শ্মশান, আর আপনি সেখানে দিবারাত্র বাস করছেন। আচ্ছা চলি।'

ফুল নিয়ে চলে গেল সুমনা।

ব্যথা লাগার মুহূর্তেই, সঙ্গে-সঙ্গেই, ব্যথাটা সজাগ হয় না, কিছুক্ষণ পরে সেটা সঞ্চারিত হয়। তাই সুমনার চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যথাটা অনুভূত হল না, অনুভূত হল রাত্রে যখন কী করে কে জানে ছোট তিনটি গোলাপের গন্ধে পরমেশের ঘর সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফুল তিনটি তাকে রেখেছে গন্ধ অত্যন্ত মৃদু—ফুলদানিতে রাখার ফলে তাদের গন্ধ এত তীব্র হবার কথা নয়, না, কোনো যুক্তিতে নয়—এ তীব্র গন্ধ তার অন্তরবেদনারই এক আশ্চর্য প্রকাশ।

ছি ছি, নিজেকে এখন শতধিক্কার দিতে লাগল পরমেশ। সে এত অসভ্য, এত অহঙ্কারী। ঠাট করে নিজের সম্বন্ধে এত পরিচয় দিল আর ওর কী নাম, ও কী করে, কোথায় থাকে, এই সামান্য খবরটুকুও নিলে না! পরমেশ বুঝি আশা করেছিল ও তার মতই বাচাল হয়ে নিজের থেকে নিজের কথাই পাঁচ কাহন বলে যাবে! ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করা যদি নিয়ম না হয় তবে আগ বাড়িয়ে নিজের কথা বলতে যাওয়াটা তুনিয়ম।

তারপর শ্মশানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হবার রসিকতা করাটা নিতান্তই অশোভন হয়েছে। ওর সিঁথিটা পাকা সেটা সে লক্ষ্য করেছিল বুঝি? এমনও হতে পারে ভদ্রমহিলা বিধবা, কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা—তাকে এ রকম পরিহাস করা তার পক্ষে মোটেই সমীচীন হয়নি। পরমেশের এখন উচিত তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। কিন্তু তাকে সে এখন কোথায় পাবে? সে এমন আকাট, মহামূর্খ, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ, কোনো ঠিকানাই সে জেনে রাখেনি। সে কি ভেবেছে ও নিজের থেকে তার স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখে ওর ঠিকানা জানাবে যাতে পরমেশ গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারে? বলিহারি পরমেশের বুদ্ধি! এই না হলে সে রাজনীতি ছেড়ে মাস্টারি ধরেছে।

ছি ছি ছি, সে শুধু অহঙ্কারী নয় সে ছোটলোক। সে কী বলে আজ সেই পুরোনো তিনটি ফুলের দাম আদায় করল? দাম যদি নেবেই প্রথম দিনই নিল না কেন? একটু ঋণ রেখে দিলে ক্ষোভের কী হত? বরং ঋণ একটু থাকলেই ও পক্ষের দেখা করার কিছু ঔৎসুক্য থাকত—এ যে একেবারে সমস্ত মুছে দেওয়া হল! শোধবোধ হয়ে গেলে জের টানবার আর কিছুই থাকে না। তা ছাড়া সে যে এত কৃপণ তা তার নিজেরই অজানা ছিল। আর যে ছটা গোলাপ কেনা হল তার জন্যে তার এক পয়সাও ব্যয় হয়নি, অথচ তার মধ্যে তিনটে তার নিজের ঘরে—যার তীব্র গন্ধে সে এখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

এখন তাকে পরমেশ কোথায় খোঁজে, কোন ঠিকানায়? আশ্চর্য, তার নামটাও জানে না যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে চেনে কিনা। নামটা জানা থাকলে সে নিজেও মনে মনে একটু ডাকতে পারত।

রাজনৈতিক জীবনে এককালে খোঁজেখাপিরিও পরমেশ কম করেনি, পুলিশ কোথায় কাকে ঘিরে কী ফাঁদ পেতেছে, কী করে পালাবার পথ করতে হবে তার সুলুক-সন্ধান বার করেছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিছু না কিছু নিশানা থাকত, তাকে ধরে এগুনো যেত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে নিশানা কই? কী ধরে সে অগ্রসর হবে?

একমাত্র নিশানা—শ্মশান।

শ্মশানে সে যেয়ে কোন এক বেদীতে ফুল দিতে আসে। কোন শ্মশান, কার বেদী, কবে-কবে আসে, কতদিন পরে, কিছুই জানা নেই। শুধু একদিন কাজকর্ম ফেলে পরমেশ শ্মশানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। না বেরিয়ে উপায় কই? গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে গেলেও তার গন্ধ যে ম্লান হয় না।

এবার থেকে পরমেশ তবে শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে বেড়াবে!

একদিন একা বিকেলবেলা সত্যি-সত্যিই এক শ্মশানে এসে হাজির হল পরমেশ। মহামূর্খের মত দেখতে লাগল চারদিক। এখানে-ওখানে কত চিতা কত সমাধি-বেদী কত পুষ্পস্তূপ। যে শ্মশানে যাবে সেখানেই এই দৃশ্য দেখতে পাবে। কিন্তু কোথায় তার অভিপ্রেতা? তার মানসবাসিনী?

বোকার মত বেরিয়ে এসে হেঁটে যাচ্ছে, পরমেশের পাশে একটি বিধবা মহিলা এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাউকে খুঁজছ বাছা?'

'হ্যাঁ, খুঁজছি।'

'কাকে খুঁজছ?'

'একটি মেয়েকে।' পরমেশ অসঙ্কোচে বললে।

'আমি বুঝেছি। বয়েস একটু বেশি হয়েছে, তাই না?'

'বয়েস কিছু নয়। মুখে-চোখে বুদ্ধির ছাপ। সুন্দর আছা—' পরমেশের গলায় অজান্তে কেমন একটু তত্ত্বজ্ঞানীর সুর লাগল: 'আসলে তো মেয়েদের আসল রূপ।'

'আমি বুঝেছি কাকে চাও? সেই মেয়েটি এখানে ফুল দিতে আসে। তাই না?'

'হ্যাঁ, সেই মেয়ে। আপনি চেনেন তাকে?'

'চিনি না? খুব চিনি।'

'তার নাম কী?'

'সুমনা—'

'পদবী কি?'

'পদবী জানি না। আত্মার আবার কোনো পদবী হয় নাকি?'

কী জানি কোনো ধার্মিক বা বৈরাগিক মহিলা হবেন হয়তো, পরমেশ আর ওদিক যাড়াল না। পদবীতে তারও আস্থা নেই। সেও তো একমাত্র পরমেশ।

পরের জরুরি প্রশ্নটা এবার জিজ্ঞেস করা যাক। পরমেশ সাহসে ভর করে প্রশ্ন করল: কুমারী, না, বিবাহিতা?'

যারা
বিস্কুট খেতে ভালোবাসে
তাদের তৃপ্তির জন্য সব সময়ই কেনা উচিত

বিস্কুটের সেরা ব্রিটানিয়া!

ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

'কুমারী। বিবাহিতা হলে তোমার সঙ্গে এত কথা বলব কেন?'

'এবার দয়া করে বলুন মেয়েটি থাকে কোথায়, তার সঙ্গে থাকে, কী করে?'

এবার মহিলা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারল না। বললে, শহরতলির কোন মেয়ে স্কুলে টিচারি করে। স্কুলের খুব দূরে নয়, নিজের থাকার জন্যে ছোট একখানি বাড়ি করেছে। আর যে বাড়িতে একা থাকা যায়, সেখানে তেমন একজন বাড়তি লোক পেলে তাকে নিয়েও স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। তখন তো আর একে-একে দুই হয় না, একে-একে সেই একই থাকে।

'আরো শুনুন—'

বিধবা মহিলা আর দাঁড়াল না, পাশের গলি দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

অনেক—অনেক চুপ পাওয়া গিয়েছে—সুমনা, শহরতলির স্কুল, অদূরে নিজের একটি ছোট বাড়ি।

রবিবার দেখে সকালে পরমেশ খুঁজতে বেরোয়। এক রবিবার ব্যর্থ হয় তো আরেক রবিবার। পশ্চিম নিস্ফল হয়তো পুবে চলো। দক্ষিণে নয় তো উত্তরে। শহর যে কত দিকে অকল মেলেছে পরমেশের আগে যেন হদিস ছিল না। কিন্তু মনটি যখন নুয় তখন তার ডাকটিও নির্ভুল হবে।

সেদিন তো ঘুরতে-ঘুরতে বিকেল হয়ে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে পরমেশের বেধে গেল বচসা। পরমেশ যত শর্ট কাট নিতে বলছে, ড্রাইভার ততই যাচ্ছে ঘুর পথে। বচসা যখন হাতাহাতির কাছাকাছি এসেছে তখন পথচারী কে এক বুড়ি চলতে দিয়ে হঠাৎ গাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘ্যাঁচ করে গাড়িটাকে থামিয়ে দিল ড্রাইভার, এ্যাকসিডেন্টটা হতে পারল না। বুড়ি পরমেশের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, 'নেমে পড়ো। ঐ সুমনার বাড়ি!'

পরমেশ তাকিয়ে দেখল শ্মশানের সেই বিধবা মহিলা।

ড্রাইভারের সঙ্গে আর বচসা নেই, তার মোল আনা প্রাপ্যের উপর আরো দু'আনা তাকে বকশিস দিল পরমেশ।

পরমেশ মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো ঠিকানাটা ভালোই জানেন, তবে আমাকে এত ঘোরালেন কেন?'

'না ঘুরলে চলবে কেন? ব্যাকুল না হলে কি পাবার মধ্যে আনন্দ থাকে?'

সুমনার বাড়িতে পৌঁছে অনেক কথার মধ্যে পরমেশ জিজ্ঞেস করলে, 'এ বাড়িতে আপনি আর আপনার মা থাকেন, তাই না?'

'আমার মা? কই না তো।'

'তবে যে বিধবা মহিলা আমাকে আপনার বাড়ি চিনিয়ে দিলেন তিনি কে?'

'বিধবা মহিলা? আমার মা তো সধবা মারা গেছেন।'

'আমাকে বললেন তুমি যাও, আমি বাজার করে ফিরছি।'

'দেখি কেমন কিনা।'

আরো অনেকক্ষণ বসল, অনেক কথা হল, কিন্তু সেই মহিলা আর ফিরল না।

আরো অনেকদিন এল পরমেশ, সেই মহিলার আর দেখা নেই। তখন ব্যাপারটা বোঝাল সুমনা। আমার মনে হয় তিনি দেবাঙ্গিনী দেবী। আর আমাদের ঘরে যে গোলাপের গন্ধ এ তাঁরই আশীর্বাদ।

দুজনে আরো অনেক কথা হল। চাকরির কথা, মাইনের কথা, গ্র্যাণ্টের কথা, ফাণ্ডের কথা, ইউনিয়নের কথা, বাড়ি ভাড়ার-ঘরের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা—এমন কি বিয়ের কথা, চিরক্ষণের কথা, খরচ-খরচার কথা, একে একে এক হয়ে থাকবার কথা—'কিন্তু,' সুমনা মৃদু করে হাসল : 'শুধু সেই কথাটাই বলা হবে না।'

'কোন কথা?'

'সেই তিনটি শব্দ দিয়ে তৈরি একটি সম্পূর্ণ কথা

'বলুন না সেটা কি?'

'তিনটি শব্দ। 'আমি' 'তোমাকে' 'ভালোবাসি'।'

'কিন্তু তিনটি শব্দ অন্তভাবে থাকবে।'

'কী ভাবে?'

'তোমাকে

সত্য কথা।'

'তাই বা কম কী।' চুপ্পিতে দুটি চোখ গাঢ় করল সুমনা :

'অনেক। তিনটি শব্দ নয় তিনটি গোলাপ। তাই তো তিনটি গোলাপ উপহার দিয়েছিলাম।'

'আর শব্দ কোনোদিন দুটি নেবে না।'

'যে শুধু বলবে তোমাকে আমার ভালো লাগে।"

একসূত্র

ওর আর আমি একই সময়ে এ লাইনে এসেছিলাম। তখন ও আসত বরানগর থেকে। আমি আসতাম ভবানীপুর থেকে। তখন আমার চাকরি অবশ্য একটা ছিল। খিদিরপুরে সাউথ ইস্টার্ন রেলের অফিসে কেরানীর চাকরি।

ওর বোধ হয় সেটুকুও ছিল না। কলেজে এক টগ্গার পড়ে ও আর পড়েনি। এদিক ওদিক থিয়েটার করে বেড়াত। তারপর টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় উঁকিঝুঁকি মারত যদি একটা চান্স লেগে যায় কোথাও।

ওই সময়ই দেখা।

'জনবাণী প্রডাকশানস' নতুন শিল্পী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তাই দেখে অফিস পালিয়ে আমি একদিন হাজির হলাম ওদের ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসে। ভিড়ে ভরতি, সব হবু তারকার দল। কেউ বেঞ্চে বসে, কেউ ফুটপাথে, কেউ সিঁড়িতে। ওর পাশে আমি বসেছিলাম। ও পকেট থেকে মেপোল সিগারেট বার করে নিজে ধরিয়ে আমাকে বলল, চলবে দাদা?

বুঝলাম, ছন্নছাড়া এখনও কেউ কেউ আছে। ঝাঁকড়া চুল, লম্বা মুখ, বড় বড় দুটো চোখ তরুণটিকে সেই থেকে ভালবেসে ফেললাম।

ও জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি অভিনয় টভিনয় করেন নাকি?

আমি বললাম, খুব সখ আমার অভিনয়ে। আমার বাবা সখের অভিনয় ভাল করেন। আমি আর আমার ভাই দুজনেই অভিনয় করি। তবে পাড়ার স্টেজ বেঁধে অভিনয়। না বলতে ভুলে গিয়েছি আমি একবার অফিস ক্লাবে দুটুবিহারী করেছিলাম। তবে জানেন, আমার এই রোগা চেহারা দেখে কেউ হিরোর পার্ট দিতে চায় না। বলে তালপাতার সেপাই। হিরো মানাবে আপনাকে। আপনার চান্স যাবে কে?

ও আমার মুখে প্রশংসা শুনে বল পেল। একটু গর্ববোধ করল। ওর মুখেচোখে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল।

—তারপর আমরা ইন্টারভিউ দিলাম।

—এবং কী আশ্চর্য, এ ছবিতে আমি কাজ পেলাম।

হিরো নয়—হিরোর ছোট ভাই। একান্নবর্তী এক পরিবারের কাহিনী।—আমি তো ভাবতেই পারিনি, প্রথমে এত বড় একটা কাজ পাব।

ও চান্স পেয়েছিল। কিন্তু হিরো নয়—হিরোর ভাইও নয়।

এক ডাক্তারের ভূমিকা। একবার মাত্র অ্যাপিয়ারেন্স। তাও একটিমাত্র কথা; 'এই ওষুধটা লিখে দিলাম, দিনে তিনবার খাওয়াবেন।' ব্যাস, শুধু এইটুকু।

ও কিন্তু রোজ আমার স্যুটিং দেখতে আসত। আর বলত, তোমার অভিনয় খুব ভাল হচ্ছে। তুমি একদিন বড় অভিনেতা হবে।

: আর তুমি?

: আমিও হব। জান, আমার ব্যাড্ লাক্। প্রথম চান্সেই একস্ট্রা হয়ে জন্মালাম। আচ্ছা, একস্ট্রা থেকে কেউ হিরো হয়েছে?

: হিরো হয়েছে কিনা জানি না। তবে হিরোইন হয়েছে যেমন গ্রেটা গার্বো। তুমি আশা ছেড় না।

ও তখন আমার কত আপনজন।

স্যুটিং সেরে আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে যেতাম রোডের দীপক কেবিন থেকে চা আর মেড়ো বিস্কুট খেয়ে নিতাম। অধিকাংশ দিন দামটা ওই দিতে চাইত। আমার কোন আপত্তি শুনত না।

—একদিন আমি ওকে বললাম, তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

: কার সঙ্গে?

: সে এখন বলব না। সেটা হবে একটা সারপ্রাইজ।

শমিতার সঙ্গে ওকে একদিন হঠাৎ পরিচয় করিয়ে দিয়ে সারপ্রাইজ দেব ভেবেছিলাম।

শমিতা সেদিন আমার অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া। সে আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যান। আমার পঁচিশ বছরের জীবন নাটকে সেদিন একটিমাত্র স্ত্রী চরিত্র: সে শমিতা।

আমি শমিতাকে ওর কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ও বলেছিল, তোমার সঙ্গে খুব ভাব বুঝি?

আমি বলেছিলাম, জান, ওকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

: আমার চেয়েও?

সন্ধ্যার অন্ধকারে শমিতাকে আরও কাছে টেনে বলেছিলাম, না তোমার চেয়ে একটু কম।

ও খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।

কি একটা টংরাঙ্গি ছবির টিকিট কেটেছিলাম। আগে থেকে ওকে জানাইনি শমিতা আসবে। হলের ভেতর অন্ধকারে আমার পাশে শমিতাকে দেখে ও বেশ অবাক হয়ে গেল। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে ফিস ফিস করে আলাপ করিয়ে দিলাম।

হল থেকে বেরিয়ে ও শমিতাকে বলল, দেখুন, কী সাসপেন্সে রাখতে পারে ও।

আমাকে প্রায়ই বলছে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমি ভেবেছি কে না কে।

শমিতা : এখন কী হতাশ হলেন?

ও : না, না, হতাশ হব কেন? বরং, বরং এতবড় প্রত্যাশার কথা আগে থেকে জানতে পারে মনে মনে এই কটা দিন বেশ খুশি অনুভব করা যেত।

আমি : প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু পেলে, পাওনাটা অনেক বেশী ভারী মনে হয়।

শমিতা : আপনারা সব এমন সিনেমার ডায়ালগের কথা বলছেন না—। আমার কিন্তু খুব হাসি পাচ্ছে।

ও : হাসুন না। হাসলে আপনাকে খুব ভাল দেখায়।

শমিতা আরও খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

শমিতা আমাকে একদিন বলল, ভদ্রলোক যেন না?

আমি বললাম, তোমার পছন্দ হয়?

শমিতা আমার পিঠে কিল মেরে বলল, যাঃ।

আমি বললাম, এই শোন, ওর লাকটা বড় খারাপ।

: কেন বল তো?

: বেশ স্মার্ট। কথাবার্তাও ভাল বলে। অথচ কোন ছবিতেই বড় রোলে চান্স পেল না। শমিতা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বেচারি!

আমার প্রথম ছবি ফ্লপ করল। হলে বসে নিজের অভিনয় দেখে নিজেরই লজ্জা পাচ্ছিল। ও কিন্তু পাশে বসে সমানে বলে গেল, দারুণ—দারুণ অভিনয় হয়েছে।

কি আশ্চর্য আর একটা ছবিতে চান্স পেলুম। এবার এক আদর্শবাদী যুবকের ভূমিকা। বেশ বড় রোল। ও কিন্তু এবারও কোন বড় রোলে মুখোশ পেল না। ও তাতে গ্রামের এক মুদির দোকানদারের পার্ট করেছিল। নেহাতই একটার রোল।

ও কিন্তু তাতেই খুশী। আমি যে আবার বড় রোল পেয়েছি এতে যেন ওরই কৃতিত্ব। ও বলল, দেখ, তুমি তো মুষড়ে পড়েছিলে। আমি বলেছিলাম, তোমার প্রতিভার স্বীকৃতি তুমি পাবেই। বইটা ফ্লপ করেছে কি তোমার জন্য?

এ ছবিটাও ফ্লপ করল। কলা গাছ আর ফুল লতাপাতা দিয়ে সিনেমা হল সাজানো হয়েছিল। ফুলপাতা শুকতে না শুকতে ছবি উঠে গেল। আমাকে পাঁচশ টাকা দেওয়ার কথা ছিল একশ আদায় করতে পেরেছিলাম। কিন্তু প্রডাকশান ম্যানেজারকেই আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

ও বলল, আমার টাকা কিন্তু মারতে পারে নি। পঁচিশ টাকা ঠিক আদায় করে নিয়েছি। হুঁ হু বাবা।

শুনে আমি হেসে বাঁচি না।

কিন্তু আমি এখন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। আমার যৌবন সরসীর নীরটুকু যত সরে যাচ্ছে, তত পাঁক দেখা যাচ্ছে। আমি এখন বিশ্বাস করি মানুষের কিছু করার নেই। কোটি কোটি যোজন দূরের গ্রহ-নক্ষত্ররা এ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্যক্তিগত আমি অসহায়, জলোচ্ছ্বাসের মুখে তৃণখণ্ডের মত।

সে সময় আমার প্রতি কোন গুরু বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছিলেন এখন আর অত মনে নেই। তবে ওই ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই সাফল্য এল। নতুন ছবির একস্‌পেরিমেন্ট করছিলেন এক তরুণ পরিচালক। প্রযোজকের হোটেল ব্যবসায়ে বেশ কিছু টাকা উৎচে পড়ছিল। তাকে ধরে রাখার জন্য এই নতুন এক্সপেরিমেন্ট। ঠিকানা বার করে সুবারবন রোডে আমাদের বাড়িতে পরিচালক মশাই এলেন। তারপর বললেন, তাঁর নতুন ছবির হিরো হতে আমি রাজি কিনা। হপ্তাহার টাকা চেয়ে ফেললাম। পরে ভাবলাম কি বোকামিই করেছি। বিশ গাইলেও পেতাম!

আমাকে দিয়ে পঞ্চাশ লিখিয়ে নেওয়া হল। ওইভাবে নাকি কালো শাদা হয়ে ফিরে আসে। এখনও আমি ওসব বুঝি না। মিঃ সেন আছেন—তিনপুরুষের ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার। রাজাকেও আয়কর বিভাগের কাছে ফকির করে দেখাতে পারেন, আমি তো কোন ছার।

পরিচালক মশাই আমাদের বাড়ির বৈঠকখানার ভাঙা বেতের চেয়ারে বসলেন। হাতলভাঙা কাপে ঘোলো চা খেয়ে বললেন, আইডিয়াল, আইডিয়াল। আমার ছবির হিরো এই রকম পরিবার থেকে এসেছে।

—আমি বললাম, আমার একটা নিবেদন ছিল।

পরিচালক : (সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে) বলুন।

আমি : আমার এক বন্ধু আছে। তাকে যদি একটা ছড় পার্টে চান্স দেন।

পরিচালক : পাঠিয়ে দেবেন। তবে কথা দিতে পারছি না।

ওকে বলেছিলাম। ও মহা উৎসাহে বলল, জানতাম, তুমি আমার জন্য করবে।

তারপর ও গিয়েছিল পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে। পরিচালক ওকে বলেছিলেন, আমার চাই টিপিক্যাল চেহারা। তোমার চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অথচ হিরোর পার্টেও তোমায় মানাবে না।

ও মুষড়ে পড়েছিল।

পরিচালক বলেছিলেন, জমতার একটি বৃত্তে তোমাকে পার্ট দিতে পারি। যদি কথা চাও, দু একটি ডায়ালগ্‌ বসিয়ে দিতে পারি।

সেই ছবিতে সে জমতার বৃত্তেই অনেক গ্রামবাসীর পার্ট করেছিল।

সেই ছবি হিট করল। তৃতিনটে প্রাইজও পেল। বার্লিনে পেল সার্টিফিকেট্‌ অব মেরিট। সস্ত্রীক প্রযোজক গিয়ে বার্লিন থেকে পুরস্কার নিয়ে এলেন। কোন এক ফরাসী পত্রিকায় তাঁর সচিত্র ইন্টারভ্যু বার হল।

আমার ভাগ্য ঘুরে গেল। পরপর সাত আটটা ছবিতে কনট্র্যাক্ট্‌। ইতিমধ্যে হুইস্‌কি ধরেছিলাম। তাতেই শরীরটা বেশ ভারি হল। এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি আমি রীতিমত সুপুরুষ। একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যায়ামবীরকে নিয়ে এসে যোগাসন শিখতে লাগলাম। বাড়তি মেদ মাংসটুকু সুবশভাবে ছড়িয়ে পড়ে আমার দেহকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিল।

এক বছরের মধ্যে আমি বাংলাদেশের হিরো। ছেলেরা আমার চুল ছাঁটার স্টাইলের নকল করে। মেয়েরা সিনেমা পত্রিকায় আমার ছবি দেখে হাহুতাশ করে। ইতিমধ্যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বিয়ে করেছি শর্মিতাকে।

ও বিয়েতে এসেছিল। শুধু আসা নয়, সারাদিন ধরে খাটাখাটনি করেছিল। কোমরে তোয়ালে বেঁধে লুচির ঝুড়ি নিয়ে এমনভাবে ছোটাছুটি করেছিল যে আমার আত্মীয়স্বজন সবাই জিজ্ঞাসা করেছিল, ও কে রে? আমি বলেছিলাম, আমার বন্ধু। ও একজন আর্টিস্ট।

একজন পরিচালক সেখানে ছিলেন, তিনি বুঝিয়ে দিলেন আরও খোলাখুলি করে। ও হল একজন একস্ট্রা।

একজন একস্ট্রা। এই তাহলে ওর পরিচয়। আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আরও দুঃখ পেয়েছিলাম যখন শর্মিতা বলেছিল কি নাম যেন তোমার ওই বন্ধুর—

: কোন বন্ধু?

: আরে ওই যে একস্ট্রা। তোমার বুঝব ফ্রেন্ড্।

আমি বলেছিলাম, ও আমার বন্ধুর চেয়ে অনেক বেশী।

শর্মিতা আমার কঠোরতায় অবাক হয়েছিল। আমি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি যত খ্যাতির শিখরে উঠছিলাম, ওর সঙ্গে আমার তত ব্যবধান বনিয়ে উঠছিল।

আমি তখন শিখরে উঠেই ক্ষান্ত ছিলাম না, শিখর থেকে শিখরে ছুটছিলাম। কাজ কাজ আর কাজ। একজন ভাল ইংরাজি জানা সেক্রেটারি রেখেছিলাম। শর্মিতার সঙ্গে দেখা হত গভীর রাতে। ও তখন ঘুমে অচেতন হয়ে থাকত। এক একদিন সেই নিথর নিস্পন্দ দেহে প্রাণ সঞ্চার করে আমি ওকে জানিয়ে দিতাম যে এখনও ওকে আমি ভালবাসি।

কিন্তু নদীর এ কূল গড়ে উঠেছিল ও কূল ভেঙে। আমার জীবন নদীর ওপারের পাড় খুব দ্রুত ভাঙছিল। আমি শর্মিতার ভালবাসা হারালাম। যেমন করে কোন অরণ্যে হাতের হীরে বসানো আংটি টুপ করে হারিয়ে যায়। শকুন্তলার আংটিটা যেমন গভীর নদীতে হারিয়ে গিয়েছিল। হারালাম আমার বন্ধুদের। হারালাম ওকে।

ওর সঙ্গে আমার আর ঘন ঘন দেখা হত না। মাঝে মাঝে দেখা হত। আমার নতুন বাড়িতে চারটে নেপালী দারোয়ান। দুটো অ্যালসেসিয়ান, একজন সেক্রেটারি।

তাদের ডিঙিয়ে যারা আসতে পারত আমার কাছে, তারা শুধু প্রয়োজক।

আমি দিনের বেলা পথে ঘাটে বেরুতে পারতাম না। কারণ সব জায়গাতেই আমার ক্যান্সের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাকে তাড়া করে ফিরত।

আমি কোন ক্লাবে যেতে পারতাম না। সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করত না। অনেক রাতে মাঝে মাঝে একা বেহালাটা নিয়ে বাজাতে বসতাম। ছাত্রজীবন থেকেই ওই একজন মাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল, বেহালা। বাজাতাম, আর ভাবতাম, ও যদি এ সময় পাশে থাকত!

কিন্তু ও একস্ট্রা আর আমি হিরো। আমি যখন স্টুডিওতে আসতাম তখন চারটে লোক এসে গাড়ির দরজা খুলে দিত। স্যুটিং এর অবসরে আমার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য উঠতি নায়িকাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও ওর সঙ্গে আর আগের মত সহজ হতে পারিনি। আমি তখনও এখনও সেই বয়ানদরে আছে। রোজ এসে কাজের আশায় এ স্টুডিও, সে স্টুডিও ঘুরে বেড়ায়।

একদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তখন রাত হয়ে গেছে। ছবির স্যুটিং সেরে নতুন হিরোইনকে আমার গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। মেয়েটির চটক আছে। লাইনে টিঁকবে মনে হয়। আমার গায়ে মাথা রেখে ও বসেছিল। আমার হাত ওর হাতে।

ধনা রোড ধরে চলছিল গাড়ি।

হঠাৎ ব্রেক। একটি লোক চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ড্রাইভার তাড়া দিয়ে উঠল। লোকটিকে দেখে এক নজরে চিনতে দেরী হল না—আরে ওইতো ও।

এ কী চেহারা হয়েছে ওর! কয়েকটি চুলে পাক ধরেছে। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে। মুখের চোয়াল ঠেলে উঠেছে।

দরজা খুলে ওকে ডাকলাম, ভেতরে এস।

ও হকচকিয়ে ওপরে উঠে এল।

হিরোইনের মুখ গম্ভীর। সারাক্ষণ সে জানালার দিকে চেয়ে রইল।

বললাম, কোথায় যাবে?

বলল, রাসবিহারী। (মিথ্যা বলল, পথে আমি পৌঁছে দিতে যাই)।

: কেমন আছ?

: ভালই তো। ও ম্লান হাসল।

কোন কোন ছবিতে কাজ করছ?

: প্রায় সব ছবিতেই এক্সট্রার কাজ করতে হয়।

কে যেন একটা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মারল,

: তোমার নিজের ছবি সব দেখ? ও আচমকা জিজ্ঞাসা করল।

: না।

অতুলনীয় ঐতিহ্যপূর্ণ

বাংলার তাঁত বস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করুন

॥ সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান ॥

● **দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড,**
৬৭, বঙ্গীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ও
শাখাকেন্দ্রসমূহ :—

● **গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়ম :** ৭/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা ; ১২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা ; ১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা ; ১৮/এ ; গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ) হাওড়া।

: দেখলে আমাকে দেখতে পেতে।

আমি যদি কোনদিন ছবি করি—তোমাকে বড় রোল দেব। নাও সিগ্রেট খাও।

আমি কিং অব কিংস বার করে নিজে ধরালাম, হিরোইনকে একটা দিলাম, ওকে দিলাম একটি।

সঙ্কুচিত হয়ে ও সিগারেট ধরাল।

বললাম, একদিন এস আমার বাড়ি। ডিনার খাওয়া যাবে।

ও বলল, তোমার বাড়িতে এর আগেও গিয়েছিলাম—দারোয়ান ঢুকতে দেয়নি।

আমি মনে মনে দারোয়ানের মুণ্ডপাত করলাম।

সিগারেটে টান দিয়ে সে কাশতে আরম্ভ করল। ভয়ঙ্কর কাশি। কাশি থামতে না থামতেই গাড়ি ব্রেক কষল।

রাসবিহারী। ও নেমে গিয়েছিল।

আমি সেদিনই বুঝেছিলাম ও অসুস্থ। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও মারা যাবে বুঝিনি। শুনেছিলাম ওকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

আমাদের অভিনেতা সমিতির কে একজন এসেছিল চাঁদার খাতা নিয়ে। অসুস্থ দুঃস্থ শিল্পীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য। তার মধ্যে ওর নামও ছিল। আমি তখন ব্যস্ত ছিলাম। সেক্রেটারিকে বলেছিলাম, একশ টাকা দিয়েদিও। মনে মনে খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম। তবুতো ওর কিছু উপকার করতে পারলাম।

তারপর একদিন ও ধীরে ধীরে ফুরিয়ে গেল। আমি শুনেছিলাম ও হাসপাতালে আছে। একবার দেখতে যাব কতদিন ভেবেছি। আমার প্রিয় হিরোইনকে একদিন বললাম, চলোনা দেখে আসি।

ও বলেছিল, হাসপাতালে গেলে আমার মাথা ঘোরে।

শমিতাকে প্রস্তাব দিতে ও বলেছিল, না, না, ও-সব ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে তুমি যেও না। মনে রেখ, তোমার জীবনের অনেক দাম।

আমিও তো তাই ভাবতাম। আমার জীবনের দাম টাকার অঙ্কে পরিমাপ হয় না। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আমাকে সোনার মেডেল দিয়েছেন। প্রযোজকরা দিচ্ছেন হীরের আংটি। এত ঐশ্বর্য একজনের জীবনে কি ভোগ করা যায়।

এইসব ভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে জীবনকে একদিকে যেমন একঘেয়ে লাগছিল অন্যদিকে তেমনি বহুমূল্য বলে মনে হচ্ছিল। গরীব যেমন একমাত্র ভাল শাড়ীটাকে প্রাণে ধরে কিছুতে পরতে চায় না, তেমনি আমার বহুমূল্য জীবনটাকে সহজে খরচ করতে ইচ্ছা করত না। তাকে কাগজে মুড়ে সিন্দুকে পুরে রাখাতেই আমার আনন্দ ছিল।

না, আমি যাইনি হাসপাতালে।

ওই হাসপাতালেই ওর অন্তশয্যা। এক চৈত্রের পলাশ-ঝরা ভোরে সে আর ঘুম থেকে উঠল না।

আমি টেলিফোন পেলাম হাসপাতাল থেকে। ডাক্তার জানালেন, ও মারা গেছে। খবর

আগে নাকি আমার কথা খুব বলত। ডাক্তার অবশ্য বিশ্বাস করেন নি। এ কী সত্য? সত্যি কি আপনার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল?

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। ওকে একবার শেষ দেখা দেখে আসব।

কি করে চাউর হয়ে গেল জানি না, হয়ত হাসপাতাল থেকেই জানাজানি হল। সেল কিছু প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতার কোন পেলাম। তারা বলল, আপনি নাকি হাসপাতালে যাবেন?

হ্যাঁ, সেখান থেকে শ্মশানে।

আমরাও যাব। আপনি যখন যাচ্ছেন, তখন আমাদেরও যাওয়া উচিত।

আমি আজ গাড়ি নিলাম না। সাধারণ পোষাক পরে ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালের কাছে যেতেই থেকে দেখলাম—বহু মানুষের ভিড়।

ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, কী ব্যাপার বল তো?

সে বলল, কে একজন একস্ট্রা মারা গেছে আজ ভোরে! হাসপাতালে সঞ্জয় কুমার আসবেন তাই এত ভিড়।

বুঝলাম ও আমাকে চিনতে পারেনি।

বললাম, তুমি কি করে জানলে?

: আমি যাত্রী নিয়ে এই কিছুক্ষণ আগে এসেছিলাম।

: তুমি ঠিক জান সঞ্জয় কুমার আসবেন?

: সবাই তাইতো বলছিল।

ট্যাক্সি গেটের আরও কাছে এল। হ্যাঁ, সত্যই ভিড়। ক্যামেরা হাতে কয়েকজনকে ধোরাঘুরি করতেও দেখলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা এসেছে আমাকে দেখার জন্য। ফোটোগ্রাফাররা এসেছে শোকযাত্রার বাংলার জনপ্রিয় নায়কের উদাস শোকার্ত মুখটাকে ধরে রাখার জন্য। জনতার এই যে এত ভিড়, তা শুধু আমাকে দেখতে।

এক মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। ড্রাইভারকে বললাম ঘোরাও গাড়ি।

: সে কী হাসপাতাল যাবেন না?

: না। অত ভিড়ের মধ্যে যাব না। আমাকে তুমি নিউ আলিপুর নিয়ে চল।

ওর মৃতদেহের পাশে, চিতাশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে শেষবারের মত আর একবার দেখতে আমি পারব না। অন্তত একটা দিনের জন্যও ও হিরো হবার সুযোগ পাক।

মনে মনে আমি ওকে বললাম, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর তুমি আমাকে। তোমাকে শেষ বারের মত যে আমি দেখতে গেলাম না সেটি আমার বুকে চিরদিন কাঁটা হয়ে ফুটে রইল। কিন্তু তোমার আত্মাকে যে আমি অপমান করিনি এটাই আমার এখন বড় তৃপ্তি।

———

একটি নাগিনী কন্যার অভিসার রজনী

(প্রাচীন চম্পা দেশের একটি কাহিনীর ক্ষীণ ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীসুধীন্দ্র ঘোষ

বহুদূর আগের কথা। প্রত্যূষের প্রথম আভা। সূর্য উঠছে দিগন্তরে। নদীর জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া। জবাকুসুম সংকাশ সূর্যোদয়ের দিকে চেয়ে স্নান সেরে আশীর্বাদ চাইলে সে দ্যুতিময় দেবতার কাছে। অন্ধকার ভেদ করে আকাশ পথে সেই সপ্তাশ্ববাহিত রথ গতিময় হয়ে উঠলো। চেয়ে দেখলে, ঘুমে কুটির দ্বারে দাঁড়িয়ে তার মা, উপোষিত লোচন নিয়ে—চোখে তাঁর জল, অঙ্গ থরথর কাঁপছে, কণ্ঠে নিবিড়তা। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সে মাতৃপদে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে বললে—এবার অনুমতি দাও মা, বহুদূর দেশে যাব, অনুচরেরা প্রস্তুত, কেন তুমি তো জানো। মা তাকে টেনে নিলেন বুকের মাঝে। দু'জনের মিলিত অশ্রুজলে ভিজে গেলো সব কিছু গ্লানিহর, ক্লান্তি, গ্লানি, দৈন্য। মা স্তব্ধ হয়ে রইলেন—দেহ মন একটি গভীর আবেগে উন্মথিত—এযে বিধিনির্দিষ্ট বিধান—এই তাঁর বহ্নিশলাকা ছেঁড়া ধন, তাঁর দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে তিলেতিলে গড়া তার তিলোত্তম—এই আকাঙ্ক্ষার ধনটিকেই পেয়েছিলেন তিনি যৌবন শেষে অনেক তপস্যায়, অনেক বিড়ম্বনা লাঞ্ছনা লাভের পর—লালন করেছিলেন শুধু বুকের মধু দিয়ে নয়, দেহের সামর্থ্য দিয়ে নয়, প্রবঞ্চিতের হাহ দিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতায়। শুধু বললেন—যাবে, যাও, সংসারে সবই পরে, সং সাজাই সার হয়, আমি মা, আশীর্বাদ করছি, তোমার শুভ হোক্, মঙ্গল হোক্, তুমি রাজরাজেশ্বর হবে।

যাত্রা হলো সুরু। উপল ব্যথিত দুর্গম পথের এক প্রান্তে একটি বৃদ্ধ বটের নিম্ন কোটরে চঞ্চুতে চঞ্চু মিলিয়ে বসেছিল একটি পক্ষীযুগল, লোকে যাকে বলে বিহঙ্গম বিহঙ্গমী বা ব্যাঘ্রমা-ব্যাঘ্রমী। আকৃতিতে পক্ষী হলেও প্রকৃতিতে সেই মানুষপর্ণী জ্ঞানবৃদ্ধবৃদ্ধা, ত্রিকালজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞা। প্রশ্ন করে একজন, উত্তর দেয় আর একজন—এ যেন হরপার্বতী সংবাদ, যার ইতিহাস আমরা পড়ি আগমে-নিগমে, যামলে তন্ত্রে, পুরাণে উপপুরাণে—শিব-হৈমবতী কথা যে অমৃত সমান।

সহসা বিহঙ্গমী আত্মগতভাবেই বললে—আহা, কার বাছারে, এই বয়সেই বিবাগী হয়ে জননী আর জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চলেছে। কিন্তু ওর মাথায় আমি দেখছি কনক রাজমুকুট, ওর কপালে জলজল করছে অদীমকালের রাজটীকা, ওর গলায় দুলছে প্রেমের পদ্মবীজের মালা। দেবাংশসম্ভূতা পদ্মিনী-নাগিনী কন্যা ওর কাহিনী।

বিহঙ্গম বললে—শোন্ তবে, শুনেছি তারপ্যাত বর্ম রাজবংশের কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় কম্বু—এক যে

ছিল রাজা, আর তার ছিল দুই রাণী, দুয়ো আর সুয়ো, জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা আর তাছাড়া বিহঙ্গমী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, আর শত শত অন্তঃপুরচারিণীর দল, সুনয়নী, সুগঠনী, তন্বী শ্যামা, ভোগ্যা, পণ্যা, দাসীভোগ্যা—আচ্ছা পুরুষদের এই মূল আকাঙ্ক্ষার কোনদিন শেষ হবে না—স্বয়ং কৃষ্ণ যিনি পুরুষোত্তম তাঁরও শুনি ষোড়শ সহস্র গোপিনী ছিল বৃন্দাবনে, ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিল দ্বারকায়, আবার তিনিই পার্থসারথি হয়ে গীতার প্রবক্তাকার মহাভারতে।

বিজ্ঞ বিহঙ্গম হেসে বললে—মূলে সবই যে একের প্রকাশ—রাধার শক্তিই হ্লাদিনী—সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথেরও ঐ একের পরতলেই রসপ্রস্থান, রস আস্বাদন। চন্দ্রকে ঘিরে থাকেন তারার দল, কিন্তু নামে তিনি খ্যাত হলেন রোহিণীপতি।

বিহঙ্গমী ক্ষেপে উঠলো, বললে—শুকপত্নী হয়ে তাঁর বাধ্য নেই, থাক দরকার নেই দেবমানবের কীর্তি শুনে, মানব মানবীদেরই কথা বলো, তবে আমি একপতিব্রতা ওসব নানা ঘাটের কামিনী রমণীর কথা শুনতে চাই না।

বিহঙ্গম বললে তুমি একাই গৌরবে বহুবচন হতে চাও— বেশ কাব্যে ইতিহাসে গাথায় এই ব্যাভচারী দম্পতী বলে গণ্য হবে, শুধু পক্ষীকুল সমাজে নয় মনুষ্যসমাজে।

বিহঙ্গমী বললে আমরা আসলে মানুষের, পুরুষ আর প্রকৃতি হর পার্বতীর লীলা সম্ভোগের সাক্ষী হবার জন্য পক্ষীরূপ ধারণ করে কৈলাসে গিয়েছিলাম মনে নেই—অভিসম্পাত দিয়েছিলেন ত্রিজগৎজননী ক্রুদ্ধতম শম্ভু হয়েছিলেন বাম। তাই কলাস্ত অপেক্ষা করতে হবে শাপমোচনের জন্য। মূর্তিটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি আমরা দেখেছি—মানুষের মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি কেন সে অতো সহজে স্নেহাই দেয় না ভগবানকে—কারণ সে সৃষ্টি করতে জানে—তার দৃষ্টি আছে—সে গড়ে ভাঙে নিজের মনে, সে ভালবাসে, সে তন্ময় হয়, ময়য় হয়, মুগ্ধ হয়, চিন্ময় যে সেই ধুলোতেই—রসে বশে, ধ্যানে ধারণায় গানে তানে, সুরের স্বরের লহরীতে মূর্ছনায় ব্যাকুলায়। অনির্বাণ বেদনার দেওয়ালি উৎসব তার বুকে, সেই স্নেহই তাঁর দীপশিখার অক্ষয়ত্ব উৎস।

বিহঙ্গম বললে—আরে, আরে, তুই যে অপর প্রসঙ্গে, পতিব্রতা ছিলি, তাতো জানি, জাতিস্মরাও তুই—ঋষিকন্যা, আমাদের বেদপাঠ শুনতিস্ বসে, বসে,—তাইতো—

হ্যাঁ, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে ভগবান অন্তরের বর কতোটা সার্থক হয়েছিল দেহের আধারে—যাদের লম্পটের দল, কামুক ভোগী নিজেরাও যেমন, দেবতাও তেমনি বেছে নিয়েছে।—ইন্দ্র চন্দ্র কৃষ্ণ যাদের উর্বশী রম্ভা গোপী না হলে চলে না—

না, বাপু গল্পটাই বলি—পতিভোগ্য নহি বরাননে,

তুমিই বলো—

সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ভারতের এক অরুণবরণ তরুণ চলেছে নিজের দেশ ছেড়ে গিরিস্থরী পার হয়ে, দেশান্তরের মাঠ বেয়ে। সাগর পারের সুবর্ণভূমি তাকে পথ ছেড়ে দেয়, চম্পা, শ্যাম, কম্বু তাকে ডাকে, নাগিনী কন্যারা তাকে মুগ্ধ করে লুব্ধ করে। সে যে শিববর সজ্ঞার্ত। বিহঙ্গম বললে—ঐ রাজার ভাণ্ডার ছিল ভরে সবাকার দানে, পণ্যসম্ভার ছিল প্রচুর, ধনিমানিক্য বৈদূর্য এনে দিতো শ্রেষ্ঠীরা রাজকোষে। মন্ত্রণা প্রবীনদের উপদেশে রাজ্য চালাতো অমাত্যরা, আর দক্ষ সেনানায়কদের অধ্যক্ষতায় দেশরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহের ভার ছিল বীর্যবান কিরাত নিষাদ পুলিন্দ শবরদের উপর। রাজাকে প্রায়ই দেখা

যেতো না রাজসভায়, কবিতা আর বনিতা ছাড়াও ছিল অগনিত পরিচর্য্যাকারিণী, তাম্বূল করঙ্কবাহিনী কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই, মন্ত্রীদের চিত্ত চঞ্চল, প্রজারা ক্ষিপ্ত—রাজা প্রৌঢ় হতে চললেন কিন্তু রাজবংশ প্রদীপ কোথায়? পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হ'ল, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চরুভক্ষণ। কিন্তু হা হতোঽস্মি—ফল হ'লনা কিছুই—বংশলোপ হলে উত্তাল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে রাষ্ট্রপোতেই যে বানচাল হবে। এমনি সময় একদিন এলেন এক তেজঃজ্যোতিসম্পন্ন আকাশের মত গম্ভীর, পৃথিবীর মত ধীর এক বীর সন্ন্যাসী, মহাতান্ত্রিক: পুংশ্চরণ করে বললেন—আপনার বীর্যে অন্য মহিষীদের গর্ভে পুত্র সংকেত নেই ললাটে, আছে এই আমার, তাও আপনারা দুজনে যদি একুশ দিন পূর্ণ সংযম পালন করে এই পুংসবন মন্ত্রটি পাঠ করেন অষ্টোত্তর শতবার, আর দেবী যেন শিবপূজা করেন প্রত্যহ আর সন্তান কামনা করেন একমনে—তারপর যজ্ঞে আহুতি দিয়ে এই ফলটি ভক্ষণ করলে পুত্রবতী হবেন রাণী—সে হবে রাজাধিরাজ—কিন্তু পঞ্চম বর্ষে উপনীত হলেই তাকে আমি নিয়ে যাবো, ফিরিয়ে দেবো দ্বাদশবর্ষ পরে, তাকে শিক্ষা দেবো বেদ-উপনিষদে শুধু নয়, কাব্যে পুরাণে, জ্যোতিষে বিজ্ঞানে, রণকৌশলে; তাকে সর্ব বিদ্যাময় করে তুলবো—সে হবে শুধু আপনার ঔরসজাত নয়, আমারও মানসপুত্র, যে সসাগরা অধিপতির অধীশ্বর শুধু হবে না, জ্ঞানে বীর্যে প্রেমে, তপস্যায় চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান শ্রদ্ধাবানও হবে—রাজী আছেন?

হ্যাঁ—

মা, আপনি?

হ্যাঁ, বললেন রাণী।

যজ্ঞ হলো, ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত, সন্ন্যাসী গেলেন চলে মন্ত্রদান করে। গর্ভবতী হলেন রাণী—দশদিন দশমাস পরে ঘর আলো করে উদিত হিল একটি জ্যোতির ধারা—এই রাজকুমার সেই। রাজাও পুত্র, পুত্র করে তন্ময়। সুয়োরাণী অপেক্ষাকৃত তরুণী, বড়রাণীর এই সৌভাগ্য উদয়ে সে শুধু ক্ষুব্ধই নয় প্রতিহিংসা-পরায়ণা হয়ে উঠেছে। নারীর সহজাত বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝেছে যে রাজার পুত্রলাভের বাধা রাজা নিজেই, কিন্তু সন্ন্যাসীর সুচিকিৎসায় আর মন্ত্রৌষধি গুণে যদি বীর্যবতীই হলো কোন মহিষী, তবে সেটা ঘুটলো না কেন তার ভাগ্যে। সংশয়ের বীজ সন্দেহের অবকাশ সৃষ্ট হলো এখানেই। তার অনুগত কয়েকজন রাজঅমাত্যও ছিল—তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও ছিল। রাজা শিকারে গেলে তারা প্রমোদ রজনী যাপন করতো এই রাণীর বাহুবন্ধনে। হাবভাব হাস্যলাস্য কটাক্ষ কামকলার সবকিছু সাহায্য নিয়ে রাণীও রাজাকে সম্পূর্ণ হস্তগত করেছিলেন। বড় রাণী পুত্রলাভের পর থেকেই রাজার প্রমোদবাসর সজ্জা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন—তিনি আর প্রিয়া নন, তিনি ছায়া জননী মা—সন্তানকে মানুষ করবার দায়িত্ব তাঁর। পুত্রগতপ্রাণ এই জ্যেষ্ঠাকে নিয়ে সুয়োরাণীর মহলে নিন্দা কটূক্তি, অন্যায় অপবাদ কিছুরই অভাব ছিলনা। পঞ্চমবর্ষে উপনীত হতেই সন্ন্যাসী এলেন তাকে নিয়ে যেতে। বড়রাণী পুত্রস্নেহে কাতর, কিন্তু কথা দিয়ে কথার নড়চড় তাঁর হয়না—রাজা রাজমন্ত্রীদল, প্রজারা সবাই মুহ্যমান তাদের উপযুক্ত রাজকুমারকে বিদায় দিতে হবে—শুধু দ্বিতীয়াই উল্লসিত, রাজাকে প্ররোচিত করতে থাকেন—সন্ন্যাসী ভণ্ড রাণী দুশ্চরিত্রা, ঐ পুত্র তোমার ঔরসজাত নয়, ও ক্ষেত্রজ ইত্যাদি। বড়রাণী সত্যের মর্যাদার জন্য দিয়ে দিলেন সন্ন্যাসীকে তাঁর পুত্রকে, আর বললেন—আমিও যাবো, আপনার তপোবনের একপ্রান্তে কুটীর বেঁধে আমি থাকবো, দিনান্তে শুধু একটিবার পুত্রকে দেখবো যখন সে গোচারণে মাঠে যাবে বা নদীতে করবে স্নান। আর ভগবান ভূতভাবনের নয় দিন আমার কানে, আমি আজ থেকে শিবরাণী—তাঁরই প্রসাদে পুত্র পেয়েছি—তাঁরই

আশীর্বাদ নিয়ে সেই শেষের দিনের জন্য অপেক্ষা করবো, যেদিন মহাকাল উপস্থিত হবে—ক্রতো স্মর, কৃতস্মর।

সন্ন্যাসী নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন তাঁকে, রাজা কিন্তু দ্বিতীয়ার প্রয়োচনায়, সভাসদদের পরামর্শ না শুনে বললেন—তথাস্তু। দুয়োরাণী আর তার পুত্র চলে গেলো রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে। দ্বিতীয়ার তখন সাধ ও সাধ্য হলো কি করে পুত্রবতী হওয়া যায়—কি করে এই বৃদ্ধ রাজার স্নেহাবসানে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, ছলে, বলে, কৌশলে। ভাগ্য তার সহায় হলো কিছুদিন পরেই সে হলো গর্ভবতী—লোককে বলে বেড়াতো যে তার পক্ষই ছিল বড়বাণী, সেই ভাইনী মন্ত্র সাহায্যে তার পুত্রলাভ সম্ভাবনাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে নিজেই পুত্রবতী হয়েছিল ঐ ভণ্ড সন্ন্যাসীর সাহায্যে, যাতে এই বৃহৎ রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী হয়ে সে থাকতে পারে। রাজা তখন প্রৌঢ়, ভুক্তিরাসক্ত, মাদক ও আসব পানে ও তান্ত্রিক আচার-বিচার অভিচারে ক্ষীণবুদ্ধি, ভ্রান্ত বিপর্যস্ত—দ্বিতীয়া মহিষীর কামকলা ও ছলাকৌশল তাকে নিস্তেজ করে রেখেছিল—রাজ ঘোষণা করলো—প্রথম রাজকুমার প্রকৃতপক্ষে রাজপুত্র নয়, তিনি রাজ্যের অধিকারী হবেন না, তাঁর মাতা ও তিনি নির্বাসিত—দেশে পুনরাগমনের চেষ্টা করলে তাঁদের হবে প্রাণদণ্ড। রাজানুচর গিয়ে জানিয়ে দিলে রাজাজ্ঞা—রাণী শুনলেন স্তব্ধ হয়ে, আকাশের দেবতাকে জানালেন মনের ব্যথা, পুত্র তখন ঋষির তপোবনে—বেদপাঠ করছে। অন্ধকার বনচ্ছায়ে ঘুরি বৌন তনয়ী কুটীরে পুত্র যখন ফিরলো মায়ের কাছে, তখন সব কথা খুলে বললেন মাতা—তার শিক্ষার দ্বাদশবর্ষ তখন অতীত হয়েছে, সে তখন দ্বিতীয় যুবক, সে তো রাজপুত্র, সে তো প্রায় ভস্মহীনা অঙ্গারার ক্রোড়েই জন্মেছে। আচার্য তাকে আজ দীক্ষা দিয়েছেন, বলেছেন—তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, তুমি চলে যাও এগিয়ে, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত হয়ে—ভগবান পিনাকপাণি তোমায় আশীর্বাদ করবেন—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার পথ আরো দক্ষিণে, সমুদ্র-পর্বতচুম্বিত চম্পা রাজ্যে—বৎস আশীর্বাদ করি। আর তাছাড়া, তোমার পিতার মৃত্যু আসন্ন—দেশে ঘটবে শুধু বহিরাক্রমণ নয়, অন্তর্বিপ্লব নয়, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি মহামারী—তোমার বিমাতা আশ্রয় নেবে এক প্রৌঢ় নায়কের বাহুর অন্তরালে যে ঐ ভগ্নরাজ্যের মধ্যেই একটি উপরাজ্য গড়ে তুলবে। তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নামেই হবে রাজা। তোমার বিমাতার পরামর্শেই তুমি নির্বাসিত, সে তার যৌবনবিলসিত নগ্ন দেহে রাজাকে আচ্ছন্ন করেই বলেছিল—আগুনের শেষ রাখতে নেই—আমার সপত্নীপুত্র লালিত হচ্ছে সীমান্তের ওপারে ঋষির আশ্রমে, প্রজারা ওকেই চাইবে, রাজবংশের তিলক ওকেই পরাবে—তোমার ললাটের সংকেত অভ্রান্ত—তুমি রাজরাজেশ্বর হবে। তোমার পিতা দেহরক্ষা করবেন আজ রাত্রেই,—কাল ভোরে তাঁর মৃত আত্মার সদ্গতির জন্য উল্কাজ্বালি দিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো শুভযাত্রায়—নক্ষত্রের দল তোমায় ডাকছে। তোমার মা ঐ কুটীরেই থাকবেন, তাঁর শেষজীবন নিবেদিত হোক মহাদেবতার পাদপদ্মে। এই সেই রাজপুত্র।

বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর গল্প হোল শেষ, কিন্তু শেষ নেই সেই অশেষের। পথের নেই শেষ, যাত্রার নেই ক্লান্তি। দেশ জুড়ে অরাজকতা, দুর্বিপাক, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ—অরাজকে বহু লোক ছড়িয়ে পড়েছে পূর্বে পশ্চিমে, উত্তরে, কনৌজ কোশল মগধে, সুহ্মে, পৌণ্ড্রবর্ধনে তুক্তিতে, কামরূপে মণিপুরে। রাজপুত্রেরও সহচর জুটে গেলো বহু যারা বিত্তের বিড়ম্বনায় ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছে! এসেছে তারা গঙ্গার তীর থেকে, যমেশ্বরীর ধার বেয়ে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্য দিয়ে, হিমমজ্জিত পর্বতের অধিত্যকা অতিক্রম করে অনভিব্যক্ত আশার তাড়নায়। তারা মনে মনে আওড়াতো—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলাটাই ধর্ম, শুয়ে থাকাটাই কলি, জেগে উঠলেই দ্বাপর, দাঁড়ানোই হচ্ছে ত্রেতা। অতএব কদম কদম তারা এগিয়ে চলে—

চলছে নবযৌবনের। আশা বিশ্বাস প্রেম বীর্যশক্তি শৌর্যভক্তি তাদের সম্বল। অস্ত্রবলে শস্ত্রবলে তারা সুসজ্জিত না হয়েও তারা বলবান, শুধু বাহুবলে নয়, অন্তরের শক্তিতে, সাধনায় একাগ্রতায়। মৃত্যু বিপদকে ওরা তুচ্ছ করতে জানে সকলের সম্মিলিত সকলমান উল্লাস বেগে। ওরা মহামৃত্যুঞ্জয়ের উপাসক, নব আতঙ্কের দল—ওরা চিরজীবিত—ওরা ঘোষণা করে মানুষের জয়। তাদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান হল না ভেরী বাজল না গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে। একদিন সেই পথের হল শেষ, পদযাত্রার হল ছেদ, অরণ্যের শিশিরসিক্ত পল্লবগুলি ঝলমলিয়ে ওঠে। ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়ায় মর্মরিত মাদবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে দেখে, মনে। শালসংকুল গিরি অরণ্যের বৃহৎ বনস্পতিদের ছায়ায় বিশ্রম্ভ ভয়াংশবিকীর্ণ দুর্গম পথের শেষে এক বৃহৎ নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন ভারতের রাজপুত্র ও তাঁর অনুচরবর্গ। নদীর নাম মেকং, তার উদার আতিথ্য যেন বিশ্বরাগিনীতে ঝংকৃত। ওপারে দাঁড়িয়েছিল নাগরাজ্যের নারীরক্ষী বাহিনী সর্পপ্রতীক চর্মবর্ম নিয়ে—তাদের অধিনায়িকা এক চিরযৌবনা নাগকন্যা। সংবাদ প্রেরিত হলো, সীমারক্ষী তাক্ এসে জিজ্ঞাসা করলে—কে তোমরা কি চাও, এই দুর্গম অরণ্যানীর মধ্যে নাগরাজ্যে হানা দিয়েছো কেন? নাগপুরুষ দক্ষ বা তাক্ ছিল কুহকিনী বিদ্যায় সিদ্ধ সে ভবিষ্যৎ দেখতে পেতো—তাকের বচন আজও প্রসিদ্ধ। সে থাকতো গভীর বনানীর মধ্যে সন্ন্যাসীর মতো—একদিন রাত্রে সে স্বপ্নে দেখলে যে কে যেন তাকে একটি বীজ দিলে, বললে—বড় নদীর ধারে পলিমাটিতে ছড়িয়ে দিয়ো—নূতন এক শস্য উৎপন্ন হবে, ফলমূল খেয়ে আর উদরপূর্তি করতে হবে না, আর আর্য দেশ থেকে আসবে এক রাজপুত্র—সর্প দেবতাদের দেবতা অর্থাৎ মহাদেব শিব মহানাগেশ্বর তাকে পাঠাবেন—তাকে নদীর ওপারে নাগরাজ্যে পৌঁছে দিতে হবে, যেখানে এখনও পর্যন্ত কোন মানুষ যেতে পারেনি, পারেনা রাজগোক্ষুর সর্পসেনানীদের ভয়ে—যেখানে নাগরাজ পর্বতগুহায় সমাসীন। তাক্ পত্নীর ক্রন্দনে কলরোল উঠলো গ্রামে—সে কী, কোন মোহে চলেছে তাক্ ঐ নাগরাজ্যে—নিশ্চয়ই সে আর ফিরবে না, কোন কুহকিনী মায়াকালিনাগিনীর বশ্যতে পড়ে জীবনযৌবন বিসর্জন দেবে। তাক্ শুনেছে অসীমের অপরূপের আহ্বান—সে রইলো না ঘরে। 'প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল, পথ করিল না সম্ভ্রম পর্বত।' তাক্ রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলে—কে তুমি?

রাজপুত্র বললে—আমি আর্যদেশের এক পরাক্রান্ত নৃপতির পুত্র, শিবোপাসক। সেই ত্রিপুরারির চরণ সম্বল করেই আমার অনুচরদের নিয়ে চলে এসেছি এই নূতন দেশে—এই নদীর ধারেই আমরা উপনিবেশ স্থাপন করবো, করবো চাষবাস, কারুর সঙ্গে থাকবে না দ্বেষ, রোষ, হানাহানি কাটাকাটি। নাগরাজকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন দিয়ো—কিন্তু তোমার হাতে এ কিসের বীজ?

তাক্ বললে—ভাই, এ হচ্ছে স্বপ্নাদ্য ঔষধ—নাগদেব স্বপ্নে বলছেন এই একটি বীজ থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের আহার্য জুটবে—এই বর তিনি দিয়েছেন—

দেখি, দেখি এ যে বীজ ধান, শুকুল—এই নদীর ধারে, সরস মৃত্তিকায় এই বীজই হবে আহার্য—বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায়। বিদেশী রাজপুত্র বললে—নিয়ে চলো তোমাদের রাজার কাছে—স্বপ্নের কথা মনে হলো তাকের—যার জন্য সে ছেড়ে এসেছে নিজের ছোট্ট গ্রামকে, আত্মীয়দের প্রেয়লোকে—নূতন করে বাঁচবে সে, কে জানে কোন নাগকন্যার আলিঙ্গনে আবার নবরূপায়নে নবযৌবন লাভ করবে কিনা?

দক্ষ বা তাক আর কথা চললো নাগদের প্রিয় ভূমিতে—তুঙ্গীপর্বতমালার মানস সরোবর পেরিয়ে যেমন যেতে হয় কৈলাসে। সে এখন এক শৈলরাজ্য যেখানে দারুণ অগ্নিবাণে সমস্ত চরাচর হচ্ছে ভস্ম।

তাক্ বললে—তুমি যাও ভাই—আমি এই গুহামুখেই রইলাম, তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় যদি না

তোমার মৃত্যুহীন যেন নাগরাজ—উনিই সৃষ্টির কর্তা, চরাচরের অধীশ্বর, দেবপ্রধান চির অমর। তবে নাগ কন্যারা রসিকা, মায়াবিনী তুমি তরুণ, তুমি রূপবান, যদি রাজকন্যার দৃষ্টিপথে পড়ে যাও নাগমন্ত্রী হয়তো জীবনদান করতে পারে যৌবনের বিনিময়ে। তিনিই রাজ্য পরিচালনা করেন, তিনিই মহানাগকন্যা চিরাঙ্গদা চির-প্রেয়সী চির নবীনা,আর কানে কানে বললে—তিনি তৃষিতা তিনি অপেক্ষা করে আছেন অনির্বাণ কামনা নিয়ে এক মহানায়কের আবির্ভাবের জন্য, যে তাঁকে রতিরণে শুধু পরাস্ত করবে না, প্রেমে উদ্ভাসিত করবে যুগ থেকে যুগান্তরে। মরণশীল মর্ত্য মানুষ কবু স্বয়ম্বরকে নিয়ে গেলো প্রহরীর দল মহানাগের কাছে—চতুর্দিকে শুধু হিস্ হিস্ শব্দ, হিংসার, জ্বালার। একটি সপ্তশির পোক্ষুরের মূর্তি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তারই অলক্ষ্যে আছেন রাজা, পারিষদ, সভাসদ, সৈন্য, নাগকন্যার দল। চতুর্দিকে জ্বলছে শত শত মণিমাণিক্য বৈদূর্যখচিত।

মহানাগ বললে—মানুষ, মর্ত্যবাসীর এই নাগদেশে আসবে এটা ছিল কল্পনার বাইরে—তুমিও পারতে না—অসংখ্য সর্পবাহিনী তোমায় ও তোমার অনুচরদের ঘিরে ফেলতো, কিন্তু দুটি কারণে তা ঘটেনি—প্রথম তুমি সর্বদেবদেব মহেশ্বরের উপাসক—তিনি যদিও আমাদের দেবতা নন্, তবু তিনি সর্পদল পছন্দ করেন, তাঁর গলায় শঙ্খনাভির মালার সঙ্গে দোলে সর্পদল। তাঁর সঙ্গে আমাদের নাগরাজ্যের মিতালী—আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমার কন্যা নাগিনী, যৌবনবতী, সে তোমার রূপে মুগ্ধ, তুমি রাজপুত্র—সে তোমায় পতিত্বে বরণ করতে চায়, কিন্তু তুমি তো সর্পরূপ ধরতে পারবে না, সে মুগ্ধকিনী সে মানবীমূর্তি ধারণ করে তোমার সেবা করবে—আশীর্বাদ করি তোমাদের মিলিত জীবন সুখের হোক্, সমৃদ্ধির হোক তোমার নূতন নগর (আংকর) স্থাপন করো নূতন রাজ্য সাম্রাজ্য।

হঠাৎ বেরিয়ে এলো সপ্তশত সর্পনটীসহ এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তরুণী—উর্বশীর মত নৃত্য করতে করতে,

এসে আরতি করলে রাজপুত্রকে সাতশো প্রদীপ দিয়ে— উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার প্রেমকোমল সেবার অনুভবগুলি, কণ্ঠে দুললো মালা—

সভায় সর্প সমস্বরে হিস্ হিস্ শব্দে জানালো—সাধু, সাধু।

রাজপুত্র বললে—

আমি ভিন্ দেশী, আশ্রয়প্রার্থী।
মিনতি মম শুন হে সুন্দরী
আর একবার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নেহি মাথে
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে
এবার আমি আনিনি ডালি ধরিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে
এনেছি শুধু বীণা
দেখোতো চেয়ে আমায় তুমি চিনিতে পার কিনা?

নাগকন্যা বললে—প্রিয়তম একমাত্র মানুষই মরণশীল হয়েও অমর। সেই মানুষই পারে দেবতার সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হতে—নিজের স্বর্গ সে নিজে গড়তে পারে, কামনার নন্দনে ভাসিয়ে দিতে পারে দিক্-বিদিক—তার কল্পনা আছে, তার ধ্যান আছে তার স্বপ্ন আছে—সৃষ্টি তার করায়ত্ত। চিরযৌবনের ধরিত্রীর নাগপাশ থেকে

আমি ক্ষণিকের তরেও মুক্তি চাই, তোমার বীর্য আমায় অন্তর্বর্তী করো, তোমার কামনা দিয়ে আমাকে উজ্জ্বল করো, তোমার ধ্যান দিয়ে আমাকে সম্রাজ্ঞী করো, প্রিয় তুমি প্রিয়তর প্রিয়তম। নাগকন্যার কামনাকে প্রেমের মহৎ অভিধায় ভাসিয়ে তোলো, লালসাকে মুক্তি দাও। শুনেছি উর্বশী গেছলেন মন্দার মালা হাতে নন্দনবনে অর্জুনকে বরণ করতে। অনিন্দিত মাধুরী দিয়ে ছাত্র উর্বশী চেয়েছিল দেবলোকের অমৃত বাণীতে পিপাসার বার্তা আনতে, মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে দেবদুর্লভ একটু আকাঙ্ক্ষা। মর্তের অমৃত অক্ষয় ধারা। আমি চাই শুধু সেইটুকু।

রাজপুত্র মালা হাতে এগিয়ে গিয়ে বললে—আমি যে দেশ থেকে আসছি সে দেশের মন্ত্র মনকে রিক্ত করে না, নগ্নও করে না, যৌবনকে অস্বীকার করে না, পঙ্গুও করে না কামক্লান্ত লীলালাস্যে, আমরা ধন অপহরণ করতে আসিনি, ভস্মমূলশল্য নিক্ষেপ নয়, চিত্তবৃত্তিকে খর্ব করে বিরোধ নয়, তাকে শিবময় করে গ্রহণ—আমি সেই 'শিবম্'-এরই উপাসক যেখানে রুদ্র হবেন ভদ্র, ভয়ঙ্কর হন শংকর, দুই মিলিয়ে যায় একে যেমন মেশে শ্রৌষিক শ্রৌষিকাতে, অর্ধনারীশ্বর দেবতাতে। আমরা দুর্বাস্ত দস্যুদল নই, পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান মানুষের গান গাইতে এসেছি, গড়ে তুলতে এসেছি একটি স্বপ্ননগর, যেখানে চতুর্মুখ শিবকে দেখবো মহোত্তম রূপে, শুধু নাগদেবতা নয়, তিনি যে সর্বেশ্বর সর্বতোভদ্র, মহাবিষ্ণু, প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, গরুড়বাহন রূপেও পরম বোধিরূপেও।

সভাসদরা, সখীরা সকলেই গর্জন করে উঠলো, শন্ শন্ শব্দে—না, না, আমাদের রাজকন্যা আমাদের পুরলক্ষ্মী—আমাদের নারী পণ্যা নয়, ভোগ্যা নয়, দাসী নয়, বিলাসিনী নয়—সে বীর্যশুল্কা—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে—সেই ভর্তা হয় তার।' প্রেমে সে অপরিণী, তাকে অঙ্কশায়িনী করা অতো সহজ কাজ নয়—তাছাড়া তুমি মানুষ—তোমার যৌবনান্তে জরা আসবে, তুমি প্রথমবৃন্ত ফলের মত ঝরে পড়বে মৃত্যুতীর্থের মহাপারাবারে সে কেন পতিহীনা বিধবা হবে—না, না—এ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, হবে না।

বেশ, অনুমতি দাও, আমি চলে যাচ্ছি—নাগকন্যার যৌবনের প্রতি আমার লোভ নেই, আমি দেশান্তরে চলে যাবো পরিণত শস্য স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলে, সমুদ্রতীরে, যেখানে মৃদুমধ্যমনিষাদ তালে তরঙ্গে তরঙ্গে বাজবে মৃদঙ্গ—আরো দূরের দেশে, শুনেছি শৈলেন্দ্র নরপতিরা সেখানে আছেন।

নাগকন্যা কিন্তু এগিয়ে বললে—আমার কিন্তু লোভ আছে রাজপুত্রের পৌরুষের প্রতি, তার কল্পনাকে সফল করবার ইঙ্গিতে আর একটি মন্দিরময় আংকর বা নগর গড়ে তুলতে—এ হচ্ছে বিনিদ্রনিদ্রিই পরিকল্পনা—যুগ যুগ ধরে বসে আছি এরই প্রতীক্ষায়—ভারতের রাজপুত্র আসবে, আমার তৃষিত বুক ভরে উঠবে সোনার স্বপ্নে, অমৃতের মাদুর্যে, গানের তানে, সুরের লহরে আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তুলবো আমরা দু'জনে এক অপরূপকে। আজ সেই প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। অমর্ত্যবাসিনী নাগকন্যা হয়েও আমি মানবী শরীর গ্রহণ করেছি। মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মত তপস্যা করেছি মদনের ও বসন্তের যাতে তাদের হয়ে রতিরণ নিপুণা হতে পারি, অমর সর্বসহিতায় ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস তুলতে পারি, হলাহলহীনা হয়ে প্রেমের তপস্যা করতে পারি—কামনার নির্মম দহন নয়। সর্বহারা শিবের মাথায় জল দিয়েছি—উদকাঞ্জলি—পতিকামনা করে। নাগকন্যার সিন্ধল তুমিই ভাঙতে পারো, প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, কাম দিয়ে, গান দিয়ে।

রাজপুত্র বরণ করলেন কন্যাকে—নাম নিলেন যশোবর্মন, নূতন নগরের হল নতুন নাম যশোধাপুর—নগর থেকে অপভ্রংশে হ'ল নকর, পরে আংকর। রাণীর নাম হল 'সীমা'। রাজা প্রিয় মহিষীর নামে নির্মাণ করলেন একটি মন্দির—নাগিনী কন্যার নামে—অপ্সরারা নৃত্য করছে সেখানে—আর নৃত্যের তালে

তালে নটরাজ নাচছেন ধীরে ধীরে। সপ্তাব্দীর পর সপ্তাব্দী কোনচক্রের অন্তরালে লুপ্ত হয়ে রইলো নগরতট, বা আংকরভাট, নগরদ্বার বা আংকরথম তাদের অভিনয় নৃত্যগীত সুরছন্দ, 'বায়ন' মন্দিরে চতুর্মুখ 'শিব'। তারপর 'পানপান্' আর চু-দাদের চৈনিক লিপিতে শুধু শোনা যেতো এক অপূর্ব দেশের কথা, রাজপুত্রের কথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী যিনি মৃত্যুতীর্থ উত্তীর্ণ হয়ে আবার প্রস্তরীভূতা সর্পকন্যা হয়ে একেশ্বরী হয়ে আছেন এক অদ্ভুত গিরিগুহার অন্ধকার গহনে। অনেক অনেক দিন পরে এক সন্ধানীর চোখে ধরা পড়লো সেই অরূপের রূপরেখা অপরূপ হয়ে—সহসাত সপ্তাব্দীর কড়কড়া জল বৃষ্টিভিজিৎ জটাজালের মধ্যে যা দাঁড়িয়েছিল দুর্ভেদ্য হয়ে মহাকালের কোলে। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন (Four Faces of Siva —Robert J. Casey P. 90)—No miracle seems entirely incredible here in the shadow of Angkor-Vat. The old factotum of the palace at Pnom-Penh, babbling of the golden gods, has the advantage of a suitable setting for his tale. A modern who would attempt to find an answer in the sphinx—like face of Siva or in the black maze of the Bayon must wonder if, after all, the ancient's dream may not be true.

ইতিহাস থেকে কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্—কাহিনী থেকেই গড়ে ওঠে গল্প—রাজা ও রাণী সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন—মানুষের আয়ু সীমার মধ্যে আবদ্ধ—কালের নির্দেশ এলো—রাণী কিন্তু মৃত্যুহীনা, তার বিনাশ নেই—তবু তিনি স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিলেন—বললেন—রক্তে মাংসে মেদে মজ্জায় আর আমি থাকবো না—আমি হবো প্রস্তরীভূতা—যুগযুগ ধরে আমি হবো অমর—বজ্র থেকে কল্পান্ত পর্যন্ত —শুধু কি হস্তীযূথপতি থাকবে, বিষ্ণুবাহন গরুড় থাকবে, আমার প্রিয়তমের স্মৃতি তার পুত্র-পৌত্র অনাগত বংশধরদের মধ্যে থাকবে। প্রতিটি রাজার মুখ্য মহিষী হবেন এই মৃত্যুহীনা নাগনন্দিনী। প্রতিটি নরপতির সঙ্গে তাঁর হবে অভিষেক। তিনিই থাকবেন প্রধানা হয়ে, তবে রাজার বিলাস ভবনে নয়, সুশীতল কোমল শয্যায় নয়, আরাম নিকেতনের পুষ্পবিতানে নয়—ঐ মন্দিরে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজাকে আসতে হবে তাঁকে সঙ্গ দিতে, পরে তিনি যেতে পারবেন অন্য কোন মহিষীর মহলে। রাজ্যের চিরন্তনী মহিষী তিনি —পাটরাণী।

বিহঙ্গম বললে—আজ সে রাজাও নেই সে অযোধ্যাও নেই—কিন্তু তিনি আছেন—চির-নারী—সত্যভূতা সনাতনী।

বিহঙ্গমী বললে—তারপর—

তারপর আমার গল্পটি ফুরুলো, বটে গাছটি মুড়ুলো।

ভারতের নানা জায়গা দেখেছি, দেখেছি নানা তীর্থ ও জনপদ। ভ্রমণকাহিনীও অনেক লিখেছি। কিন্তু পরের মুখে ভ্রমণের কাহিনী শুনতে যে এত ভাল লাগে তা জানতাম না। মনে হয় যে দেখা জায়গাগুলো যেন আবার দেখতে পাচ্ছি, চোখের সামনে ভেসে উঠছে অনেক পুরনো দৃশ্য। অনেক নতুন কথাও জানতে পাচ্ছি, যা নিজে দেখিনি, নিজে শুনিনি আগে।

গত বছর গঙ্গোত্রীর পথে উত্তর কাশীতে আটকা পড়েছিলাম কয়েকদিন। পাহাড়ে হঠাৎ প্রবল বর্ষণের পরে পথ ভেঙ্গে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে বাস চলাচল। যাত্রীরা ফিরে আসছে। এই খবর পেয়ে আমি আর এগোলুম না, উত্তর কাশীতেই রয়ে গেলুম কয়েকদিন।

অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল, জজ সাহেব ও পুলিশ সাহেবের সঙ্গে। মাতাজীর সঙ্গেও পরিচয় হল তাঁর কুঠিয়ায়। উত্তেজিত আরও অনেক সাধু-মহাত্মার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। একদিন শুনলুম যে সাধুজী এসেছেন একটি আশ্রমে। তিনি তাঁর হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সকলকে শোনাবেন।

হিমালয় বললে আমরা একটি পাহাড় ভাবিনা, ভাবি একটা বিরাট তীর্থ। হিমালয়ের নামে দেবতার কথা মনে আসে। মনে হয় যে দেবতার দর্শন পেতে হলে হিমালয়েই যেতে হবে। যুগ যুগ ধরে তাই ভারতের সাধকেরা হিমালয়ে আছেন তপস্যারত। এই তপস্যার শেষ কোনদিন হবে না। দেড়হাজার বছর আগে মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন, দেবতাত্মা হিমালয়। আজও হিমালয় এই নামেই পরিচিত।

কিন্তু হিমালয় কোন ছোট পাহাড় নয়। পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত উত্তরসীমান্ত জুড়ে আছে হিমালয়। কিন্তু দেবতাত্মা বলতে আমরা সাধারণভাবে উত্তরাখণ্ডকেই বুঝি। গঙ্গা যমুনার জন্ম হয়েছে যেখানে আর শিব ও বিষ্ণু যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন প্রতিটি গিরিশৃঙ্গে, সেই অঞ্চলই হিমালয়ের সেরা তীর্থ। এছাড়াও কয়েকটি তীর্থস্থান হিমালয়ের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন স্বমহিমায়। আমি

ভেবেছিলাম যে সাধুজী বোধহয় শুধু উত্তরাখণ্ডের কথাই বলবেন। কিন্তু পরে দেখলাম যে তিনি হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থের কথাও বললেন।

যথাসময়ে আমি আশ্রমে এসে একটুখানি বসবার জায়গা সংগ্রহ করেছিলাম। সাধুজী ভিতরেই ছিলেন। সময় মতো বেরিয়ে এলেন। সুন্দর প্রসন্ন মানুষ, বিদ্যা ও বিনয়ের ভারে অবনত। কোন ভূমিকায় সময় নষ্ট করলেন না। প্রথমেই শুরু করলেন কাশ্মীরের অমরনাথের কথা।

✝ অমরনাথ ✝

সত্যযুগে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণরত মহর্ষি ভৃগু। কাশ্মীরে তখন তক্ষক নাগের রাজত্ব। মহর্ষি কশ্যপ তার আগে জলদৈত্যকে ধ্বংস করে এই উপত্যকাকে বাসোপযোগী করেছিলেন। ভৃগু একটি দণ্ড তক্ষকের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, অমরনাথের দুর্গম তীর্থে যাত্রার জন্যে এই অভয় দণ্ড রাখো। এই দণ্ড নিয়ে যাত্রা করলে পথে কোন বিঘ্ন হবে না।

এই পর্যন্ত বলে সাধুজী আমাদের দৃষ্টিতে কী দেখলেন তিনিই জানেন। বললেন: এই কাহিনী সত্য না কল্পিত সে প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমানে কাশ্মীরের ধর্মার্থসংঘের মোহান্ত একটি রৌপ্য-দণ্ডের অধিকারী। তার প্রচলিত নাম ছড়ি। প্রতি বছর শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ছড়ি সামনে নিয়ে অমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হয়। দায়রাপীঠের শঙ্করাচার্য থাকেন সকলের আগে। দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রীরা এসে শ্রীনগরে আশিয়া কদলের নিকটে দশনামী আখড়ায় সমবেত হয়। তৎপর হয়ে ওঠেন কাশ্মীর রাজ্য সরকার। পথ-ঘাট ও পুল মেরামত, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা। ধর্মার্থ বিভাগের কর্মীরা এই দশহাজার যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করেন।

এখন শ্রীনগর থেকে শুধু সাধু-সন্তরাই ছড়ি নিয়ে যাত্রা করেন, আর সাধারণ কয়েকজন যাত্রী। তবু সবাই মোটর বাসে পহলগাঁও-এ চলে যান। পহলগাঁও থেকে ঘোড়ায় তিন যাত্রা। অমরনাথের আসল দর্শন হল শ্রাবণের রাখী পূর্ণিমায়। লোকে আষাঢ় ও ভাদ্র পূর্ণিমাতেও যায়। পূর্ণিমায় তুষার লিঙ্গের পূর্ণ অবয়ব। কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে ক্ষয় হতে হতে অমাবস্যায় তিন অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার শুক্লপক্ষ থেকে দিনে দিনে তাঁর বৃদ্ধি। প্রায় তের হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গুহার ভিতরে চন্দ্রকলার সঙ্গে ক্ষয় বৃদ্ধি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি নিজের চোখে দেখেছেন?

সাধুজী বললেন: ক্ষয় বৃদ্ধি দেখিনি, অমরনাথে তো রাত্রিবাস করা যায় না, দর্শন করেই ফিরে আসতে হয়। আর সেই দুর্গম তীর্থে কোন যাত্রী দুবার গেছে বলে শুনিনি।

যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বললেন: তাহলে পথের কথাও বলুন।

সাধুজী বললেন: হিমালয়ের কোন তীর্থ তো মিথ্যে আখড়া নয়, পথের কথাই হল তীর্থের কথা। এতো আর রামেশ্বর বা সোমনাথ নয় যে ট্রেন থেকে নেমে ঘুলো পায়েই দর্শন করা যায়। অমরনাথের জন্য একটা উদ্যোগপর্ব আছে। তাঁবু চাই, রাস্তার দান-সত্রগুলায় খাদ্যদ্রব্য পরম কাপড় ওষুধপত্র, কী না চাই। সবই ভাড়া পাওয়া যায়, আর তা বইবার জন্যে আছে কুলি আর ঘোড়া। পয়সা থাকলে নিজেও ঘোড়ায় চেপে কিংবা মানুষের কাঁধে যাওয়া যায় ডাণ্ডিতে চেপে।

পহলগাঁ থেকেই যাত্রা শুরু। প্রথম পড়াও চন্দন বাড়ি, সাড়ে ন'হাজার ফুট উঁচু। লোকালয় শেষ হয়ে গেলে উপত্যকাও সংকীর্ণ হয়ে যায়। একদিকে নীলগঙ্গা ও অন্যদিকে পাহাড়—এক পায়ে-চলার পথ—অশ্বতর। একজনের পিছনে আর একজনকে চলতে হয় সন্তর্পণে। প্রথমে ঘোড়া চলে, তারপরে তাদের রক্ষী, সবার পিছনে যাত্রী। চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগোলেই পাহাড়ের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দেড় হাজার ফুটের একটা চড়াই। পিছল পথ, পা হড়কালে গড়িয়ে একেবারে নিচে। ঘোড়া নয়, ভাক্তি নয়, নিজের পা দুখানাই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়। এ চড়াইয়ের নাম পিস্সুঁটির চড়াই। এ নাম কেন হল, তা নিয়ে একটা পৌরাণিক গল্প আছে।—

দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে। পাহাড়ের উপরে দেবতারা অমরনাথের ঘাঁটি আগলাচ্ছেন, আর নিচে থেকে দানবরা বলছে যে তারাও অমরনাথ দর্শনে যাবে। দু'দলে তুমুল যুদ্ধ বাধল। কিন্তু দেবতারা উপরে, দানবরা তাদের সঙ্গে পারবে কেন! দেবতারা পিষে ফেললেন তাদের। সেই থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে পিস্সুঁটি। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু।

তারপর বৃষ্টি ঘাঁটির চড়াই পার হয়ে শেষনাগ হ্রদ। পুকুরের মতো ছোট হ্রদ কিন্তু তার অপরূপ রূপ। চারিদিকের বরফের পাহাড় থেকে বরফের নদী নেমে এসে এই হ্রদে পড়েছে। এখান থেকে বেরিয়েছে শেষনাগ নদী। এই দৃশ্য দেখেই স্বামী অভেদানন্দ বলেছিলেন—চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রি চূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক। আর ঐ তুষার নদী হচ্ছে তাঁর জটা।

শেষ নাগ থেকে বাহুজান ফের মাইল ঘুরে। কেউ বলে ওয়াচ জান, আর ঘোড়াওয়ালারা বলে তাওজান। একটা খোলা মাঠের মধ্যে ঘর আছে, চারিদিকের পাহাড় খানিকটা ঘুরে। কিন্তু সারাক্ষণ প্রবল বাতাস বইছে। লোকে বলে, আগে এই জায়গাটা আরও অশান্ত ছিল। সন্তপাক নিয়ে এক শিবভক্ত দৈত্য এখানে বাস করত। দেবতারা তার অত্যাচারে কাতর। বিষ্ণু শেষ নাগকে পাঠিয়েছিলেন তার বধের জন্যে। তার মৃত্যুর পরেই ঐ জায়গাটা কিছু শান্ত হয়েছে।

তাওজান থেকে পঞ্চতরণী। উঁচু নিচু পথ। তুষারপাতের জন্যে পিছল হয়ে থাকে। দু'হাজার ফুটের চড়াই পার হতে হয়। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে মহাগুনস্ এই পথের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। নিঃশ্বাসে টান ধরে, অনেকে বমি করে। অসুস্থ হয়ে ফিরেও যায় অনেকে। শুধু মনের জোরেই পৌঁছতে হয় মহাগুনসের শীর্ষে। সেখানে বসে আছেন নগরপাল, বাবা অমরনাথের দ্বারপাল। তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের এগোতে হয়।

মন্দিরের কোন দেবতা নন এই দ্বারপাল, বিরাট এক শিলাখণ্ড। লোকে বলে, এক ঋষি ঐ পাহাড়ের মাথায় চারিদিকের শোভা দেখতে বসেছিলেন। এখনও বসে আছেন। তুষারে আবৃত শিলা হয়ে আছেন তিনি। নানা রঙের ফুল ফুটছে তাঁর চারিধারে।

এর পরে আর চড়াই নেই। একে একে পাঁচটি নদীর বালি আর জল পেরিয়ে পঞ্চতরণীর প্রশস্ত মাঠ। পহলগাঁও থেকে প্রায় তেইশ মাইল পথ। বিদেশীরা ঘোড়ায় চেপে একদিনে আসে। আর ভারতীয়রা আসে তিনদিনে। যারা দুবেলা হাঁটতে পারে, তারা আসে দুদিনে। লাদাখের সীমান্ত এখান থেকে ন মাইল।

পঞ্চতরণী হল অমরনাথের পথের শেষ পড়াও। ফের হাজার ফুট উঁচুতে অমরনাথে তো মানুষ কাজেই সকাল বেলায় যাত্রা করে অমরনাথ দর্শন করে তখনই ফিরে আসতে হয়। প্রথমে

বৈভব ঘাট পাহাড়, তারপর অমরনাথ পাহাড়। মাঝখানে অমরাবতী নদী। বরফের পুলের উপর দিয়ে এই নদী পেরোতে হয়, নিচে দিয়ে স্রোত বইছে। কেউ জুতোর নিচে কাঁটা লাগায়, কেউ বাঁধে জুতোর সঙ্গে। তারপর হাতের লাঠি ঠুকে সন্তর্পণে নদী পেরোয়। এই অমরাবতী নদী মিলেছে অমরগঙ্গার সঙ্গে। তার লাল জল দেখে অনেকে বলে রক্ত গঙ্গা। তারপর আবার খানিকটা চড়াই ভেঙে অমরনাথের বিরাট গুহা দেখতে পাওয়া যায়।

এতবড় গুহা সচরাচর দেখা যায় না। চওড়া প্রায় পঞ্চাশ ফুট। আর পঁচিশ ফুট উঁচু। গুহার মুখ থেকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট তলাতে অমরনাথের লিঙ্গ-মূর্তি প্রায় তিন ফুট উঁচু। তার দুদিকে আরও দুটি স্তূপ আছে। তা পার্বতী ও গনেশ রূপে পূজিত। আর আছে দুটি পায়রা। পায়রা তো নয়, শিবের অনুচর, নন্দী ও ভৃঙ্গী পায়রার রূপে অমর হয়ে আছেন।

এই পায়রার কিংবদন্তীও সাধুজী আমাদের বললেন; দেবর্ষি নারদ শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ ব্যাপারে চেয়েছিলেন। পার্বতীকে বলেছিলেন, শিবের গলার মুণ্ডমালাটি কিনের তা জেনে নেবেন তো। পার্বতী সেই কথা শুধোলেন শিবকে। শিব বললেন, এযাবৎ তোমার যত জন্ম হয়েছে তার হিসেব। পার্বতী এই কথা শুনে বললেন। তবে আমাকে তুমি অমর করছনা কেন! শিব বললেন। একটা শর্তে তা করতে পারি। আমি সারারাত ধরে গল্প বলব। আর তুমি যে জেগে আছ তা জানাবার জন্যে হুঁ বলবে। পার্বতী সম্মত হলেন এই প্রস্তাবে। আর শিব গল্প বলা শুরু করলেন। কিন্তু গভীর রাতে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়লেন। দরজার বাহিরে, ছিলেন নন্দী ও ভৃঙ্গী। তাঁরা দেখলেন যে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই তাঁরাই হুঁ দিতে লাগলেন। দিনের আলোয় শিব দেখলেন যে পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবে হুঁ দিল কে! জানতে পারলেন যে নন্দী ও ভৃঙ্গীর এই কাজ। তাই পার্বতীর বদলে অমর হলেন তাঁরা। কিন্তু সেই অমর কাহিনী যাতে প্রকাশ হয়ে না যায়, তার জন্যে তাদের পায়রা করে দিলেন। আজও সেই অমরনাথের গুহায় আছে অমর পায়রা। যাত্রীরা তাদেরও দেখতে পায় গুহার ছাদে।

অমর গঙ্গায় স্নান করে যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে বরফ তোলে। পূজা করে অমরনাথের। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ দাঁড়িয়ে থাকে স্তম্ভিত হয়ে। প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফল পেয়েছে তারা। জীবন সার্থক হয়েছে। এই অভূতপূর্ব আনন্দ নিয়েই সবাই ফেরে।

✦ জালামুখী ✦

অমরনাথ দর্শনের পর জালামুখী দেখার কোন অসুবিধা নেই। অমরনাথের বাস পাঠানকোট ষ্টেশনে আসতেই হবে। কেউ দিল্লী থেকে আসে অমৃতসরের উপর দিয়ে। আবার অনেকে কলকাতা থেকেও আসে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে চেপে। অমৃতসর থেকে বাসে বা মোটরেও অনেকে আসে। পাঠানকোটের একদিকে যেমন জম্মু ও কাশ্মীর ভূস্বর্গ নামে পরিচিত, তেমনি অন্য ধারেও কয়েকটি সুন্দর উপত্যকা—চাম্বা কুলু ও কাংড়া। জালামুখী কাংড়া উপত্যকায়। জাম্মো গেজ ট্রেনে চেপে জালামুখী রোড ষ্টেশনে নেমে বাসে জালামুখী যাওয়া যায়। তার চেয়ে পাঠানকোট থেকে বাসে যাওয়াই বেশি সুবিধাজনক, সময়ও কম লাগে। সরাসরি বাস যায় কিনা আমার জানা নেই, আমি বৈজনাথের বাসে চেপেছিলাম বলে যাবপথে আমাকে কাংড়ায় নেমে পড়তে হয়েছিল। মোটর বাসের এ একটি বড় অসুবিধা। পাঠানকোটের বাস কুলু ও মানালি যাচ্ছে বৈজনাথের উপর দিয়ে, আর ধর্মশালার বাস জালামুখী যাচ্ছে কাংড়ায়

উপর দিয়ে। এইরকম একটা বাসে চেপে আমি জ্বালামুখী পৌঁছে গিয়েছিলাম। পথ বেশি নয়, সকালে এসে বিকেলে ফিরে যাওয়া যায়।

জ্বালামুখীর পথ তত মসৃণ নয়। মোটর বাসও আরামদায়ক নয়। বিশেষতঃ কাশ্মীর থেকে ফিরে এই অসুবিধার কথা বেশি বোঝা যায়। কাশ্মীরের পথ যেমন সুন্দর। বাসও তেমনি আরামদায়ক। জ্বালামুখীতে তাই বাস থেকে নেমে বেশ আরাম বোধ হয়।

পাহাড়ের উপরে জ্বালামুখীর মন্দির। নিচে সাধারণ বাস। ধর্মশালা আছে নিকটে। পাণ্ডাও অনেক। জ্বালামুখী পীঠস্থান। জিহ্বা পীঠ। সতীর জিহ্বা পড়েছিল এইখানে। শিবও আছেন, তাঁর নাম উন্মত্ত ভৈরব। যে পাহাড়ে মন্দির তার নাম কালী ধর। মন্দিরে ওঠার পথ কাউকে চিনিয়ে দিতে হয়না। এপথে গাড়ি ওঠেনা কোন যানবাহনও চলেনা। হেঁটে উঠতে হয় পাহাড়ে। অশক্ত মানুষের জন্য হয়তো ডাণ্ডি ডুলির ব্যবস্থা আছে কিন্তু বেশি উঁচু নয় বলেই সকল যাত্রীই হেঁটে ওঠে।

এই পীঠস্থান আবিষ্কারের একটি কিংবদন্তী আছে। সত্যযুগে ভূমিচন্দ্র নামে এক রাজা জানতে পেরেছিলেন যে এই পাহাড়ে সতীর জিহ্বা পড়েছে এবং দেবতাদের তেজে তা জ্বলছে। তিনি সেই স্থান নির্ণয়ের জন্য অনেক অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হলেন। তারপর নগরকোটে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করলেন। একদিন একজন গোয়ালা রাজাকে সংবাদ দিল যে সে পাহাড়ের এক জায়গায় আগুন দেখেছে। রাজা এসে নিজেও তা দেখলেন এবং সবই বুঝতে পারলেন। তখনই তিনি এই জ্বালামুখীর মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। আর পূজার জন্য দু'জন ব্রাহ্মণ আনালেন শাক দ্বীপ থেকে। এখনও নাকি এই দুই ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই দেবীর পূজা করছেন। এরা বলে যে দ্বাপরে পঞ্চ পাণ্ডব এসেছিলেন এখানে। এই মন্দির বড় করেছিলেন তাঁরাই।

এখানকার ব্রাহ্মণদের কাছে একটি ঐতিহাসিক গল্পও শোনা যায়। ফিরোজ তুঘলক নাকি এই মন্দির ধ্বংস করতে এসেছিলেন। দেবীর মহিমায় লক্ষ লক্ষ মৌমাছি তাঁকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। দেবীর মাহাত্ম্য দেখে আকবর বাদশাহ এখানে একটি ছত্র নির্মাণ করে দিয়ে যান। আর ঔরাঙ্গজেব বাদশাহ কাংড়া থেকেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন।

মন্দিরের শিখর খুব উঁচু নয়, নিচু মন্দির। তেমন প্রাচীন বলেও মনে হয় না। পরিচ্ছন্ন মন্দিরের প্রাঙ্গন, কিন্তু পরিবেশ নির্জন। যাত্রীর ভিড় এখানে দেখিনি।

সাধুজী একটু থেমে বললেন: এই তীর্থ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা শুনেছিলাম। সকল যাত্রীর কাছেই অলৌকিক মনে হয়, আমারও তাই মনে হল। মন্দিরের দেওয়ালে নানা জায়গায় আগুনের শিখা অনির্বান জ্বলছে। মনে হয় যে এ আগুন পাহাড়ের দেহ থেকেই জ্বলছে। মূল মন্দিরের মাঝখানে একটা ছোট কুণ্ড, তারও চারিধারে আগুন জ্বলছে। কোন মূর্তি নেই, কোন চিত্র নেই, কোন ঘট মঙ্গল-কলসও নেই। কোন অলঙ্কার আভরণ নেই, নেই কোন বিচিত্র বিজ্ঞাপন। পূজারী ব্রাহ্মণ বলেন, এই হলেন দেবী জ্বালামুখী, এখানেই প্রণাম করুন। বলে কুণ্ডের জলেও আগুন দেখিয়ে দেন।

এক রকমের গম্ভীরভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। কৌতূহলী যাত্রীকে ব্রাহ্মণেরা দেখিয়ে দেন যে আগুনের কোন শিখা নিবিয়ে দিলেও আবার জ্বলে ওঠে। যাদের বৈজ্ঞানিক মন অবিশ্বাসী, তারা বলাবলি করে যে এ নিশ্চয়ই কোন গ্যাসের ব্যাপার। কিন্তু মন্দিরের ভিতরে

এ সব আলোচনা ভাল লাগে না। সেই বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাস নিয়েই তো দেশটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখি। এই বিশ্বাস কেউ কেড়ে নিতে চাইলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এবারে অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সাধুজী। প্রশ্ন করে তাঁকে চেতনায় জগতে ফিরিয়ে আনতে হল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন: আর কিছু দেখবার নেই আলামুখীতে?

সংক্ষেপে সাধুজী বললেন: আছে।

তারপরে সহজভাবে বললেন: একটি কুণ্ডকে কেউ বীর কুণ্ড বলে, কেউ বলে যোগিনী কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করে নাকি অনেক বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়েছে। সেজন্য জগদম্বার চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ দু'রকমের মূর্তি আছে। উন্নত ভৈরব যাবাত্মক মন্দির শিবশক্তি যোগ শিবালয় সিদ্ধ নাগার্জুন অধিকেশ্বর সীতারাম মন্দির কপিলমুনি তারা দেবীর মন্দির অষ্টভুজী দেবী—এই সব এখানকার দর্শনীয় স্থান।

এত সব দেবদেবীর নাম সাধুজী মনে রাখলেন কী করে, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। কিন্তু সাধুজী তখন একটি গানের কলি আবৃত্তি করেছিলেন গুন গুন করে:

চলো চলো সব মিলকর ভক্ত মা আলাকে স্থান কো।
আদি শক্তিকে দর্শন পাবে জীবন সুফল বানান কো।

✦ যমুনোত্রী ✦

উত্তরাখণ্ডে আছে চার ধাম—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী কেদার ও বদরী। যাত্রীরা একে একে এই চার ধাম দর্শন করে। একবারে না পারলে দুবার আসে। কিন্তু এই দর্শনের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে—যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রী, তারপর কেদার নাথ, ও সবার শেষে বদরীনাথ। যখন পায়ে হেঁটে এই চার ধাম দর্শন করতে হত, যাত্রীরা তখন সংক্ষিপ্ত পথে যাতায়াত করত। এখন মোটর বাসে এই তীর্থ পরিভ্রমণ অনেক সুগম হয়েছে। আরও হবে।

এই চার ধাম দেখতে হলে পাঠানকোট থেকে কলকাতা রেলের পথে লাকসারে নেমে হরিদ্বারে আসতে হয়। হরিদ্বার থেকে ট্রেনে বা বাসে হৃষীকেশ। সেখান থেকে যমুনোত্রীর বাস সোজা উত্তরে চলে। এ পথে নরেন্দ্রনগর হল প্রথম শহর। হৃষীকেশ থেকে দশ মাইল দূরে প্রায় চার হাজার ফুট পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর শহর। আরও ছেত্রিশ মাইল উত্তরে টেহরি শহর ভাগীরথী ও ভীলাঙ্গনা নদীর সঙ্গমে। দেবপ্রয়াগ থেকে একটা হাঁটাপথ এখানে এসেছে ভাগীরথীর তীরে তীরে, কেদার-বদরীর পথে শ্রীনগর থেকে এসেছে মোটরের পথ, আবার মসুরির পাহাড় থেকেও এসেছে মোটর পথ। এই সব পথ ছাব্বিশ মাইল উত্তরে ধরাসু পর্যন্ত গিয়ে দুভাগ হয়েছে। বাঁ দিকের পথ গেছে যমুনোত্রী, আর গঙ্গোত্রী গেছে ডানদিকের পথ।

ভাগীরথীর তীরে ধরাসু গ্রামটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে। সেখান থেকে বড় কোট গ্রামটি আরও ছাব্বিশ মাইল। বসুরী শহর থেকে আজকাল যমুনার পুল পেরিয়ে মোটর বাস আসছে এই গ্রামে। এখান থেকেও মোটরের পথ আরও মাইল সাতেক এগিয়েছে। বড় কোট থেকে গঙ্গোলি গ্রামখানি একেবারে যমুনার ধারে সাত হাজার ফুট উঁচুতে। একটি কুণ্ডের ধারে মন্দির আছে। তাই গঙ্গোলিও তীর্থ বলে পরিচিত। যমুনোত্রী এখান থেকে বাইশ মাইল দূরে। বাসে চেপে আরও চার মাইল এগিয়ে হাঁটতে হয়।

যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম হল ফরপালি। ফলহারের আট দো ফুট উঁচুতে রাত্রিবাস করা যায় বলে পাণ্ডাদের বাস এই গ্রামে। যমুনার অপর পারে আছে বীকা গ্রাম, তার নাম মার্কণ্ডের তীর্থ। একটি উষ্ণ প্রস্রবন থেকে গন্ধকের জল বেরোয়।

ফরপালি থেকে যমুনোত্রী বার মাইল ঘুরে। এক মাইল সমতলের পরে ছয় মাইলের শেষ চড়াই, তার পরে আবার সমতল। যমুনোত্রীর মন্দিরে পৌঁছে সমস্ত ক্লেশের অবসান হয়ে যায় সৌন্দর্য দেখে। সামনে বন্দর পুঞ্চ পর্বতের উদার বিস্তার। তারই তলদেশ দিয়ে যমুনার ধারা গলে নেমে আসছে। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা বলেই এ জায়গাটি খুব ঠাণ্ডা। কয়েকটি গরম জলের কুণ্ড আছে বলেই যাত্রী ও পাহাড়ী কুলিরা বেঁচে আছে। তারা এই গরম জলের কুণ্ডেই চাল, ডাল ও আলু সিদ্ধ করে নেয়। গামছায় বেঁধে জলে ফেলে দিলেই সিদ্ধ হয়ে যায়।

বিস্ময়ের সুরে একজন বললেন: এরই নাম তীর্থ!

সহাস্যে সাধুজী বললেন: যারা ঠাকুর দেখতে যায়, তারা একটা ছোট মন্দিরের মধ্যে যমুনার মূর্তি দেখে। কিন্তু দেবতা তো এখানে বড় নয়, বড় এই সুন্দর পৃথিবী। যা সুন্দর, তাই তীর্থ। সুন্দরের সাধনা করেই আমরা দেবতাকে পাই। দেবতাও যে সুন্দর!

বলে সাধুজী থামলেন। তীর্থের এই সংজ্ঞা শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

✦ গঙ্গোত্রী ✦

গঙ্গোত্রীর কথাও একই রকম ছিল। কিন্তু এ বছর শুনছি বাসে চেপেই গঙ্গোত্রী দর্শন করে আসা যাবে। যখন পায়ে হাঁটতে হত, যাত্রীরা তখন যমুনোত্রীর পথে সিমলি থেকে গঙ্গোত্রীর পথে নাকোরি আসত। সেখান থেকে উত্তর কাশীর উপর দিয়ে গঙ্গোত্রী। কিন্তু এখন বাসে চেপে ধরাসু এসে অন্য বাসে উত্তর কাশী আসছে যাত্রীরা। নতুন নিয়মে উত্তর কাশীতে অনুমতি পত্র নিয়ে এগোতে হয়। তার জন্য কোন ঝঞ্ঝাট হয়না। থানায় গিয়ে দরখাস্ত করতে হয়, একদিনেই পাওয়া যায় অনুমতি পত্র তারপর আবার যাত্রা।

উত্তর কাশীকেও একটি তীর্থস্থান বলা চলে। বিশ্বনাথের মন্দির আছে শহরের মাঝখানে, শক্তি একাদশ রুদ্র পরশুরাম ও কালীর মন্দিরও আছে। আর আছে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ভারতের আর কোথাও যা নেই। গঙ্গোত্রী যাবার পথে এই উত্তরিতে বহু সাধু মহাত্মা কুটিয়া নির্মাণ করে সাধন ভজন করছেন। অনেক আশ্রম আছে সাধু সন্ন্যাসীর, নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন আছে। জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষার প্রয়োজন কারও নেই। কালী কমলি ওয়ালা ও পাঞ্জাব সিন্ধু ক্ষেত্রের সদাব্রতেই তাঁদের চলে যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে তীর্থ করতে এসে বাবা কালী কমলীওয়ালার নাম জানতেই হবে। একখানা কালো কম্বল ব্যবহার করতেন বলে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের এই নাম হয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হৃষিকেশে তিনি যে ক্ষেত্র স্থাপন করেন, সে এখন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই উত্তরাখণ্ডে তাঁদের নয়টি ধর্মশালা, পঞ্চাশটি সদাব্রত, মন্দির, চিকিৎসালয়, গোশালা, অনাথাশ্রম, পাঠশালা। কী নেই তাদের।

মোটর গাড়ি এদেশে তো বেশিদিন আসেনি, আর গত শতাব্দীর মানুষ বোধহয় ভাবতেও পারেনি যে গাড়িতে চেপে কোনদিন পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হবে। এদেশে রেলগাড়ির ইতিহাস তো একশো বছরের।

তাই মানুষ যখন তীর্থযাত্রায় বেরোত, তখন ঘরে ফেরার আশা নিয়ে বোধহয় বেরোতনা। উত্তরাখণ্ডের তীর্থপথ কত দুর্গম ছিল সে কথা ভাবতেই ভয় করে। আজও কি সকলের সে ভয় গেছে! মানস-সরোবর ও কৈলাসের পথ এখনও বিভীষিকাময়, অমরনাথের পথও দুর্গম। কিন্তু উত্তরাখণ্ডের তীর্থপথ প্রিয় হয়েছে যারা কালি কম্বলিওয়ালার জন্য। পথের ধারে ধারে অগণিত ধর্মশালা স্থাপন করে যাত্রীদের রাত্রিবাসের দুর্ভাবনাকে একেবারে দূর করে দিয়েছেন। এইসব ধর্মশালা যখন ছিলনা যাত্রীরা তখন কোথায় আশ্রয় নিত, সে কথা ভাবলে বুক কেঁপে ওঠে। বছরের অর্ধেক সময় তো সবই বরফে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, বাকি অর্ধেক সময়েও কী দুর্ভোগ শীত! গ্রামবাসীরা আশ্রয় না দিলে মানুষ বোধহয় জমে বরফ হয়ে যেত।

সাধুজী বললেন : উত্তর কাশীর নিকটেই ছিল মহাভারতের বারণাবত, জতুগৃহ দাহ হয়েছিল এইখানে।

এখানকার উচ্চতা চার হাজার ফুট নয়। ডাটোয়ারি ছ হাজার ফুট উঁচুতে, তার নাম তালব প্রয়াগ। তারপর গামলামি, সেখানে ভবিষ্যৎ নামে একটি পবিত্র জলের কুণ্ড আছে। সুখী ও ঝালার পরে তার প্রয়াগ ও গুপ্ত প্রয়াগ। হসিলের অন্য নাম হরিপ্রয়াগ। লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির ও আপেলের বাগানের জন্য এই জায়গাটি যাত্রীদের প্রিয়।

হসিল থেকে ভৈরো ঘাঁটি পর্যন্ত পথ অতি সুন্দর। ভৈরো ঘাঁটি গঙ্গোত্রীর ছ মাইল নিচে ভাগীরথীর সঙ্গে জাহ্নবী বা জাড় গঙ্গার সঙ্গমের কাছে। এই সঙ্গমের উপরে বাঁয়ের দিকে আছে ভৈরবের মন্দির। বিশাল পাহাড় আর দেবদারুর বন দেখে যাত্রীরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এখান থেকে একটি পথ গেছে মানস সরোবর ও কৈলাসের দিকে। সেই দুর্গম তীর্থে যেতে হলে ঘরিয়াল পাইক সঙ্গে নিতে হয়। তারা থাকে ধরালি নামে একটি গ্রামে। হসিলের মাইল তিনেক পরেই এই গ্রাম। ধরালি নামে একটি নদী ঐরাবত পর্বত থেকে নেমে ভাগীরথীর অপর পারে মুখ্য মঠ। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা থাকেন এইখানে। আর শীতের ছ'মাস এইখানেই গঙ্গা পূজা হয়।

ন'হাজার ফুট উঁচু ভৈরো ঘাঁটিতে শীত খুব বেশি নয়। দেওদার বনে ঘেরা এই জায়গাটিতে গরুক আছে বলেই কিনা কে জানে। তারপরেই গঙ্গোত্রী, তার উচ্চতা দশ হাজার তিনশো ফুট। হৃষীকেশ থেকে এইখানে দূরত্ব একশো আঠাষট্টি মাইল। যমুনোত্রী এর চেয়ে নিকটে, তার দূরত্ব একশো চৌত্রিশ মাইল। তবু এখনও মোটর গাড়ির পথ যমুনোত্রী অব্দি করেনি। অব্দি করেছে গঙ্গোত্রী।

এর কারণ আছে। যমুনোত্রীর পথ তীর্থের পথ, কেদারনাথের মতো। কিন্তু গঙ্গোত্রীর পথ বদ্রীনাথের মতো শুধু তীর্থের পথ নয়, দেশ রক্ষার প্রয়োজন আছে এই পথ নির্মাণে। এই দুই পথের প্রান্তে ভারতের সীমান্তে পৌঁছানো যায়। ভারত সরকার গঙ্গোত্রীর পথেই বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাই সঙ্গে ছাড়পত্র না থাকলে এপথে আসা যায়না।

এরপরে সাধুজী গঙ্গোত্রীর কথা বললেন। গঙ্গা এখানে উত্তর বাহিনী বলেই নাম গঙ্গোত্তরী বা গঙ্গোত্রী। যমুনোত্রীতেও তাই। যমুনাও সেখানে উত্তর বাহিনী বলে যমুনোত্তরী বা যমুনোত্রী বলা হয়। কিন্তু যমুনোত্রীর মতো গঙ্গোত্রী গঙ্গার উৎস নয়। গঙ্গার উৎস এখানে দেখা যায়না। অত্যন্ত দুঃসাধ্য পথে চৌদ্দ মাইল ঘুরে আরও আড়াই হাজার ফুট উপরে উঠলে গৌমুখ নামে এক গুহার সামনে পৌঁছনো যায়। মনে হয় যে গঙ্গার জন্ম সেই গুহা থেকে, কিন্তু আসলে তা নয়। বদ্রীনাথের কাছে চৌখাম্বা নামের তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গগুলি থেকে আরম্ভ করে গৌমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গোত্রী হিমবাহ। সাড়ে তের হাজার ফুট উঁচু এই হিমবাহের কোন্ স্থানে গঙ্গার জন্ম হয়েছে তা দেখা যায়না। যারা তিব্বতের দিক থেকে

আগে তারা বলে যে গৌমুখ থেকে চল্লিশ মাইল দূরেও ভাগীরথী গঙ্গাকে দেখা যায়। কিন্তু আমরা গৌমুখকেই গঙ্গার উৎসস্থল ভাবি। অশেষ কষ্ট স্বীকার করে পথহীন সেই দুর্গম স্থানে গাইডের পিছনে পিছনে যাই প্রাণ হাতে করে। বড় বড় পাথরের উপরে ছোট পাথর সাজিয়ে যে পথের নিশানা। তা শুধু গাইডরাই বুঝতে পারে। এই জনহীন স্থানে একটি রাত্রি বাস করতেই হয়। আর তিনদিনের পথ চলা। তার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করেই অগ্রসর হতে হয়। দল ভারি না হলে এ পথে কেউ পা বাড়ায় না।

কেদারনাথ থেকে যে কেদার গঙ্গা বেরিয়েছে তা গঙ্গোত্রীতে এসে মিলেছে ভাগীরথীর সঙ্গে। পাহাড়ের উপরে গঙ্গা ভাগীরথী নামেই পরিচিত। গঙ্গা নাম হয়েছে সমতলভূমিতে। স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনেছিলেন ভগীরথ। সগর বংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে আনতে হয়েছিল। তার জন্যে তিনি এই গঙ্গোত্রীতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গা সম্মত হয়েছিলেন স্বর্গ থেকে অবতরণ করতে, কিন্তু তাঁর বেগ কে ধারণ করবে! ভগীরথ আবার তপস্যা করে মহাদেবকে এই কাজে রাজী করেছিলেন। মহাদেব তাঁর জটায় গঙ্গাকে ধারণ করে আবদ্ধ করে রাখলেন। মনে মনে গঙ্গাও মহাদেবকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি মহাদেবের জটায় বন্দী হয়ে রইলেন। পুনরায় তপস্যা করে ভগীরথ গঙ্গাকে মুক্ত করে নেন। এখানে তাই ভগীরথের নামেই গঙ্গার নাম ভাগীরথী।

পৌরাণিক যুগে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল এইখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পঞ্চপাণ্ডব আত্মীয় বন্ধুজনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই তীর্থে এসে যজ্ঞ করেছিলেন। এখন এখানে একটি মন্দির আছে। গঙ্গার মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন অমর সিং থাপা। যমুনোত্রীর মতো নির্জন নয় গঙ্গোত্রী। এখানে বাসস্থান বেশি, দোকানপাটও আছে। সাধু সন্ন্যাসী পাণ্ডা পূজারী ও যাত্রী সমাগমে বছরের ছটি মাস এই তীর্থ মুখর হয়ে থাকে।

✝ কেদারনাথ ✝

গঙ্গোত্রীর পরে কেদারনাথের কথা। যখন পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিলনা, যাত্রীরা তখন অন্য পথে আসত কেদারনাথে। বড় কষ্টসাধ্য সেইপথ। গঙ্গোত্রী থেকে ভাটোয়ারির দু মাইল দক্ষিণে যাত্রা চটির দূরত্ব হবে চল্লিশ মাইল। তারপর থেকেই পথ দুর্গমতর। সাতাশ মাইল দূরে বৃদ্ধ কেদার। আরও ছাব্বিশ মাইল এগিয়ে পানওয়ালি পাস এগার হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। সেখান থেকে চোদ্দ মাইল এগোলেই ত্রিযুগী নারায়ণ। কেদার নাথের যাত্রীরা এই ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন করে এগিয়ে যান।

কিন্তু একালের যাত্রীরা এপথ বর্জন করেছে অনেকদিন আগে। এপথে চলবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মোটর বাস চলছে কেদারনাথের পথে। এ বছর ফাটা চটি পর্যন্ত বাস চলেছে। সামনের বছর ত্রিযুগী নারায়ণের যাত্রীদের বড় রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়ে বাস সোম প্রয়াগ পর্যন্ত যাবে। ফাটা চটি থেকে ত্রিযুগী নারায়ণ এক বেলার পথ। বাস আরও এগোলে দু'এক ঘণ্টায় পৌঁছনো যাবে। একদিন হয়তো ত্রিযুগী নারায়ণ ঘুরেই যাবে কেদারনাথের বাস।

এখন গঙ্গোত্রী থেকে ফিরতে হয় উত্তরকাশী টেহরি হয়ে শ্রীনগর। শ্রীনগর প্রধান রাজপথের উপরে। হৃষীকেশ থেকে সমস্ত বাস শ্রীনগরের উপর দিয়ে কেদার বদরীর পথে যায়। কেদারনাথ যেতে হলে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে উত্তরের পথ ধরতে হবে। হৃষীকেশ থেকে কেদারনাথের দূরত্ব একশো আটাশ মাইল। সকাল বেলায় হৃষীকেশ থেকে যাত্রা করলে মোটর বাস দেবপ্রয়াগ কীর্তিনগর শ্রীনগর রুদ্রপ্রয়াগে থেমে সন্ধ্যার আগেই ফাটা চটিতে নামিয়ে দেবে।

দেব প্রয়াগে অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। এখান থেকেই ভাগীরথীর নাম হয়েছে গঙ্গা। হৃষীকেশ থেকে বিয়াল্লিশ মাইল ঘুরে এই ছোট শহরটি প্রায় বেড়হাজার ফুট উঁচুতে। বদ্রীনাথের পাণ্ডাদের বাস এখানে। রঘুনাথজীর বিরাট মন্দির আছে। বেড়শো বছর আগে ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল এই মন্দির। নতুন করে গড়া হয়েছে। রাবণ বধের পরে ব্রহ্মহত্যার পাপ খালনের জন্য রাম এইখানে তপস্যা করেছিলেন দীর্ঘকাল। সেই স্মৃতিরক্ষার জন্যই এই মন্দিরটি এখানে নির্মিত হয়েছে।

দেব প্রয়াগ থেকে একুশ মাইল ঘুরে কীর্তি নগর। টিহরি গাড়োয়াল রাজ্যের মহারাজা কীর্তি শাহের নামে এই শহরের নাম, একসময় রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখন সে গৌরব আর নেই। অলকনন্দার পরপারে তিনমাইল ঘুরে শ্রীনগর এর চেয়ে বড় শহর। পুরাকালে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। গত শতাব্দীর শেষে গহনা লেকের বন্যায় শহরটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে নতুন করে আবার গড়ে উঠেছে।

কমলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী এখানে প্রচলিত আছে। রাম যখন এই শিবের পূজা করতেন, তখন তাঁর নাম কমলেশ্বর ছিলনা। সহস্রাক্ষ রুদ্ররূপে শিবের পূজা করবার জন্য তিনি একহাজার পদ্ম সংগ্রহ করলেন। কিন্তু শিব তাঁর ভক্তি পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ম হরণ করলেন। এক একটি করে রাম সেই পদ্ম দেবতাকে নিবেদন করে দেখলেন যে একটি পদ্ম কম হয়েছে। তিনি কোন দ্বিধা না করে তখনই নিজের একটি চোখ উপড়ে সেই অভাবটি পূরণ করলেন। সেইদিন থেকেই শিবের নাম হল কমলেশ্বর। শীতের প্রারম্ভে বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীর রাতে এই মন্দিরে একটি উৎসব হয়। সন্তান কামনায় নারীরা এসে শিবের প্রদীপ হাতে মন্দিরের চারিদিকে দাঁড়ায়। সেই দীপ শিখা যদি সারারাত ধরে জ্বলে তাহলে দেবতার কৃপা হয়েছে বলে সবাই বিশ্বাস করে।

কে একজন অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন : সত্যি ?

সাধুজী হেসে উত্তর দিলেন : সন্তান হয় কিনা জানিনা, কিন্তু উৎসবটি সত্য। এই উৎসব দেখতে যদি যান তো কীর্তিনগর থেকে তিনমাইল ঘুরে শ্রীনগরে নদীর পরপারে কিলকিলেশ্বরে আর একটি পুরনো মন্দির দেখতে পাবেন।

রুদ্র প্রয়াগ এখান থেকে বাইশ মাইল ঘুরে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গমে। সুন্দর পাহাড়ী শহর। রুদ্রনাথ শিবের নামে শহরের নাম হয়েছে রুদ্র প্রয়াগ। দেবর্ষি নারদ এখানে রুদ্রনাথ দর্শনের জন্য তপস্যা করেছিলেন। এইখান থেকেই কেদার-বদরী পথ ভিন্ন হয়েছে। বদ্রীনাথের পথ এগিয়েছে অলকনন্দার উপত্যকা ধরে। আর মন্দাকিনীর ধারে ধারে এগিয়েছে কেদারনাথের পথ। শহর ছেড়েই অলকনন্দার পুল পেরিয়ে টানেলের ভিতর দিয়ে পাহাড় অতিক্রম করে মন্দাকিনীর সুন্দর উপত্যকা।

এগার মাইল ঘুরে অগস্ত্যমুনির উচ্চতা প্রায় তিন-হাজার ফুট। ঋষি অগস্ত্য এইখানে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর একটি মন্দির আছে। এমনি কত মন্দির আছে পথের ধারে ধারে তার হিসেব নেই। যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটে কেদারনাথে যেত, তখন এইসব মন্দিরের জীর্ণ দশা ছিলনা। যাত্রীরা দাঁড়াত,

বিশ্রাম করত, পূজার্চনা করত দেবদেবীর, তারপরে আবার এগোত। এখন বাসে চলেছে যাত্রীরা। বাস বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। স্নান খেকে নেমে মন্দির দেখে আসার সময় নেই। প্রয়োজন ও নেই। যারা কেদারনাথ দেখতে যাচ্ছে, তারা পথে কী দেখলো তার খবর রাখেনা।

সাধুজী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : আরও এগার মাইল এগিয়ে কুণ্ড চটি। এইখান থেকেই দুটি পথ দুটি পাহাড়ে উঠেছে। মন্দাকিনীর ওপার থেকে যে পথ উঠেছে, তা উখীমঠ ও গোপেশ্বর হয়ে চামোলি যাবে। চামোলি বদ্রীনাথের পথে। এই পথের ধারেই তুঙ্গনাথ, অনসূয় ও রুদ্রনাথ। কেদারনাথের পথ অন্য। সে পথ মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে গুপ্তকাশীতে উঠবে। নদীর ধারে থেকে মাইল দুই পথ গুপ্তকাশী, কিন্তু দুরন্ত চড়াই। চার হাজার আটশো পঞ্চাশ। এই পথের ধারে চন্দ্রাপুরীতে চন্দ্রা নদী মিলিত হয়েছে মন্দাকিনীর সঙ্গে। চটিতে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গার মন্দির আছে। গুপ্তকাশীতে আছে দুটি প্রাচীন মন্দির। তার মধ্যে একটি চন্দ্রশেখর মহাদেবের অন্যটি অর্ধ-নারীশ্বরের। এই গুপ্তকাশী থেকে উখীমঠ দেখা যায় স্পষ্টভাবে। মন্দাকিনীর এপারে গুপ্তকাশী, ওপারে উখীমঠ, মাঝখানের দূরত্ব হবে আড়াই মাইল। মাইল খানেক এগিয়ে নানা চটি থেকে উখীমঠে যাবার রাস্তা।

গুপ্তকাশীর পরে মাতাদেবী নারায়ণ কোটি ও বৈষ্ণবীর মহিষমর্দিনীকে বাসে বসেই প্রণাম করে যাত্রীরা ফাটা চটিতে এসে নামে। এগারোও নেমেছে। (১৯৭০ সাল থেকে আশা করছে সোম প্রয়াগে নেমে একদিনেই দশমাইল হেঁটে কেদারনাথে পৌঁছবে।)

ত্রিযুগী নারায়ণ ঠিক কেদারনাথের পথের ধারে নয়, একটুখানি পথ ঘুরে যেতে হয়। এইজন্যেই যাত্রীরা এই তীর্থ দেখে যেতেই চায়। কিন্তু পঞ্চকেদারের অন্যতম মধ্যমেশ্বর দর্শনে কেউ যায়না। গুপ্তকাশী থেকে কাশীমঠ মাইল তিনেক দূরে। মন্দাকিনীর সঙ্গে কাশী নদীর সঙ্গম স্থল থেকে কিছুদূরে কাশীনদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে আছে মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, গৌরীশঙ্কর মহাদেব ও ভৈরব। বশিষ্ঠ ও ব্যাসদেব এই তীর্থের উল্লেখ করে গেছেন বলে জনশ্রুতি আছে। মধ-মহেশ্বর এখান থেকে চোদ্দ মাইল উত্তরে চৌখাম্বা শৃঙ্গের নিচে মধ্যমেশ্বর নদীর মুখে। এর উচ্চতা কেদারনাথের চেয়ে কিছু কম হলেও বদ্রীনাথের চেয়ে বেশি, প্রায় সাড়ে এগার হাজার ফুট উঁচু। গুপ্তকাশী থেকে ছ'হাজার ফুটেরও বেশি উঠতে হবে শুধু একটি তীর্থ দেখবার জন্য। তারপরে কেদারনাথ আছে, তুঙ্গনাথ আছে। তুঙ্গনাথ তো কেদারনাথের চেয়েও বেশি উঁচু।

মধ্যমেশ্বরে শিবের একটি মন্দির। দুরন্ত শীতে বন্ধ থাকে এই মন্দির। পাথরের শিব লিঙ্গ মন্দিরে ফেলে রাখার মহাদেব নিয়ে পূজারীরা নেমে আসেন উখী মঠে। তখন মধ্যমেশ্বর শিবের পূজা হয় সেখানে। কাশীমঠ থেকে উখী মঠে আসবার জন্য গাড়ে চলার পথ আছে। মধ্যমেশ্বরের যাত্রীরা এই পথেই যাতায়াত করে।

ত্রিযুগী নারায়ণের পথটো রাজপথ। কেদারনাথের যাত্রী ফাটা চটি থেকে হাঁটতে শুরু করে রামপুরে আসে তিনমাইল ঘুরে। আরও দেড় মাইল এগিয়ে পাঠাপড় থেকে ত্রিযুগী নারায়ণের পথ পাহাড়ের উপরে উঠেছে। তিন মাইল চড়াই ভেঙে ত্রিযুগীনারায়ণ প্রায় ছহাজার ফুট উঁচুতে। পথে শাকম্ভরী দেবী বা যমনা দেবীর মন্দির। ত্রিযুগীনারায়ণে পৌঁছে উত্তর দিগন্তের দিকে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকতে হবে। বরফের অপরূপ রূপ দেখে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে মন। তারপর মনে পড়বে দেবতার কথা।

ত্রিযুগীনারায়ণ বলেন তিন যুগের সাক্ষী নারায়ণ। হরপার্বতীর বিবাহ দিয়েছিলেন এইখানে। আজও

সেই অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। যাত্রীরা এই অগ্নিকুণ্ডে কাঠ কিনে দিচ্ছে, কিংবা কাঠের দাম দিয়ে যাচ্ছে সেই কাঠ পোড়াবার জন্যে। এই অগ্নিকুণ্ড কোনদিন নিভবে না, যাত্রীদের ভক্তিতেই চিরকাল জ্বলবে এমনিভাবে।

আরও চারটি কুণ্ড আছে ত্রিযুগীনারায়ণে। সেগুলির নাম হল ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড। এই সব কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান তর্পণ করেন। ত্রিযুগীনারায়ণে ধর্মশালা আছে। দোকানপাটও আছে। রাত্রিবাসের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যাত্রীরা সাধারণতঃ এখানে রাত্রিবাস করেন না। সকাল বেলায় কাটা চটি থেকে যাত্রা করে সকালবেলাতেই এখানে এসে পৌঁছায়। দেবতার দর্শনের পর দুপুরের আহার সেরে এগিয়ে যায় কেদারনাথের দিকে।

সাড়ে তিন মাইল উৎরাই-এর পর সোনপ্রয়াগ। সোন বা বাসুকি নদী এখানে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে সোনপ্রয়াগকে সোনপ্রয়াগও বলে। নদীর উপর পুল আছে; নিচে নেমে এই পুল পার হয়ে আবার উঠতে হয় গৌরীকুণ্ডের দিকে। মূল কাটা গণেশ এখান থেকে মাইল খানেক দূরে।

পথ চলতে চলতে যখন কষ্ট বোধ হয়, তখনই একটা চটি দেখতে পাওয়া যায় সামনে। চটি মানেই আশ্রয়। দুধও বলা যায়, চা খাবার পাওয়া যায়, প্রয়োজন হলে রাত্রিবাসও করা যায়। যারা পদব্রজে চলে, চটি দেখলেই তারা হাতের লাঠি পাশে রেখে বসে পড়ে। এক গেলাস চা খায়, পকৌড়া বা জিলিপিও খায় অনেকে। তারপর নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করে।

সোনপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড মাত্র মাইল তিনেক পথ। উঁচুনিচু রাস্তা প্রায় সাত হাজার ফুট উপরে পৌঁচেছে। গৌরীকুণ্ড এ পথের একটি বড় জায়গা। যাত্রীদের জন্যে অনেক বাসস্থান আছে, অনেক দোকানপাট। লাল জলের একটি কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড। গৌরী নাকি স্নানুষ্ঠান করেছিলেন এই কুণ্ডের জলে। জল খুব শীতল। তাই যাত্রীরা এখানে স্নান করে না। তারা মন্দাকিনীর নিকট আর একটি কুণ্ডে স্নান করে। তার উষ্ণ জলে পথ চলার ক্লান্তি দূর হয়। ব্যথা বেদনার উপশম হয়। এই জলে স্নান করবার জন্য ভিড় লেগেই আছে।

গৌরীকুণ্ডে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরের গৌরবময় মূর্তির কাহিনী। বৃদ্ধ ঋষি রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর তপস্যার কথা।

কেদারনাথ এখান থেকে সাত মাইল। কিন্তু এই সাত মাইল পথ যেন ফুরোতে চায়না। এগার হাজার সাত শো ফিটের ফুট উঁচুতে কেদারনাথ। শুধু চড়াই। তাই বাহকেরা যাত্রীকে নামিয়ে বারে বারে বিশ্রাম নেয়। কাঁধি বাহকেরা একজনকে বহনকরে পিঠে। তারাও যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে খানিকটা হাঁটতে অনুরোধ করে। যাদের ঘোড়া আছে, তারা ঘোড়ার পিঠে চলেছে ধীরে ধীরে। যাদের ঘোড়া নেই তারাও একটা বাহন খোঁজে চারিদিকে। পায়ে হেঁটে আনন্দ পাচ্ছে, এমন যাত্রীরও অভাব নেই। লাঠি ঠুকে তারা বীরের মতো এগোচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে পাকদণ্ডি দেখলেই উঠে পড়ছে তাই দিয়ে। তাদের আগ্রহ দেখে ফিরতি পথের যাত্রী সহাস্যে বলছে, জয় কেদার। যারা উপরে উঠছে তারাও শুকনো মুখে বলছে, জয় কেদার। পথের উপরে কোথাও রৌদ্র, কোথাও অরণ্যের ছায়া। কোথাও বা মন্দাকিনী একটা রূপোর মতো জ্বলে পড়ছে।

চার মাইল দূরে রামবাড়া একটি বড় চটি। খুব শীতল স্থান। কেদারনাথে রাত্রিবাস করতে যারা ভয় পায়, তারা থাকে এখানে। ভোর বেলায় বেরিয়ে কেদার দর্শন করে ফিরে আসে বিকেল বেলায়। বড় বড় বাড়ি এখানে লেগেই আছে। পথ চলতে চলতে দেখা যায় যে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে

জমে আছে। আরও গরম না পড়লে সেই বর্ণা জল হয়ে নিচে নামবেনা। এমনি বরফের বর্ণা পেরিয়ে এগোতে হয়। পথের উপর থেকে বরফ সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে বরফ। হাত দিয়ে গুঁড়ো করা যায় সেই চিনির মতো বরফ, দলা করে খেলা করা যায় বলের মতো।

রামবাড়া থেকে জীবন মরণ পণ করে দু' মাইল পথ উঠতে হয়। চড়াইএর মাথায় দেব দেখলি। সেখানে দাঁড়িয়ে কেদারনাথের মন্দির দেখা যায় মাইল খানেক দূরে। পেছনের বরফের সঙ্গে মিশে আছে এই মন্দির। দিনের আলোয় রূপার মতো ঝকঝক করে। যাত্রীরা প্রথমে হত বুদ্ধি হয়ে যায় এই দৃশ্য দেখে, তারপর প্রাণের আবেগে চেঁচিয়ে উঠে। জয় কেদারনাথ কি জয়।

আহুর মতো দেহের সমস্ত ক্লান্তি এক নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়। নূতন উদ্যমে আবার তারা অগ্রসর হয়। এবার আর চড়াই নয়। উঁচু নিচু পথে খানিকটে এগিয়ে গিয়ে মন্দাকিনীর পুল। সেই পুল পেরিয়ে উপরে উঠলেই কেদারনাথ। মন্দির নয়, শহর। ছোট একটি জনপদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। যাত্রীগৃহ ধর্মশালা সেই হাউস দোকান পাট পাণ্ডাদের আস্তানা—এইসব পেরিয়ে গিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে হল মন্দির। তারপরেই চিরতুষার মণ্ডিত পর্বত শ্রেণী।

মস্ত উঁচু ভিতের উপরে কেদারনাথের মন্দির। সামনে গঙ্গা। সেখানেই মন্দির। তার পিছনে ঘো চালা নাট মন্দির। পিছনে গর্ভগৃহ। তার চতুষ্কোণ শিখর ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে কোন বিন্দুতে মেলেনি। তার উপরেও একটি চালা আছে, তার উপর চূড়া। সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মন্দিরই এই রকম। কারও নাট মন্দির আছে। কারও নেই। কোন নাটমন্দির পাথরের। কোনটা বা টিনের। এ অঞ্চলে একটি মন্দির দেখলে সব মন্দিরই দেখা হয়ে যায়।

তারপর পাণ্ডা মন্দিরের দেবতার কথা বললেন: দেবতা তো নয়, বিরাট এক খণ্ড পাথর। শিব-লিঙ্গ নয়। ত্রিকোণাকার। প্রাণের আবেগে যাত্রীরা সেই পাথরের গায়ে ঘি মাখাচ্ছে, আর জড়িয়ে ধরে নতি স্তুতি করছে। যাঁরা শিব পূজা করেন, তাঁরা বাহিরে গনেশের পূজা করে ভিতরে আসেন। কেউ গঙ্গোত্রীর জল এনেছেন অভিষেকের জন্য, কেউ বেল এনেছেন দেশ থেকে। সাধারণ যাত্রীরা পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন সামনের দোকানে। শুকনো ফুল আর বেলপাতা, বাসি মিষ্টান্ন। আর পাণ্ডারা ব্রহ্ম কমলের কথা বলেন। ব্রহ্ম কমলের সময় হলে সেই আশ্চর্য ফুলে কেদারনাথের পূজা হয়। অসময়ে পাণ্ডারা শুকনো ব্রহ্ম কমল দেন নির্যাস্য বলে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।

কেদারনাথের প্রতিষ্ঠা হয়েছে দ্বাপরের শেষে কলিযুগের প্রথমে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বজন হত্যার পাপ হয়েছিল পাণ্ডবদের। সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁরা কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁদের দর্শন দেবেন না বলে পালিয়ে এলেন হিমালয়ে। পাণ্ডবরাও তাঁকে অনুসরণ করে এখানে এলেন। যুধিষ্ঠির ধ্যানে সব দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে বিশ্বনাথ মহিষের রূপ ধারণ করে অন্যান্য মহিষের সঙ্গে মিশে আছেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে সেই মহিষটি দেখিয়ে দিতেই ভীম দেখলেন যে বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে ভূমর্ভে প্রবেশ করছেন। বাধা দিলেন ভীম। মহিষের পিছনের অংশটাই শুধু বাহিরে রইল। বিশ্বনাথ এই রূপেই এখানে অধিষ্ঠান করলেন।

কেদারনাথে শঙ্করাচার্যের একটি মর্মর মূর্তি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য বোধহয় তাঁর জীবনের শেষ সময়ে এখানে এসেছিলেন। তারপরে কোথায় হারিয়ে গেছেন তা কেউ জানেনা।

গঙ্গোত্রীর মতো সাধু মহাত্মাদের বাস এখানে অসম্ভব। তবু এখানে কলাহারি বাবা কী ভাবে সাধা বছর থাকেন তা সকল যাত্রীরই বিস্ময় উৎপাদন করে।

আরও অনেক কিছু এখানে দেখবার আছে। পাহাড়ের উপরে বাসুকি নাগের কথা আমি বলছি না, সে বড় দুর্গম স্থান। আমি কেদারনাথের কথাই বলছি। সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার নামে ধীরে ধীরে, মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে থেমে যায়। নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে যায় পৃথিবী। তখন এই দৃশ্য দেখা যায়। কখনও পেঁজা তুলোর মতো, কখনও চিনির দানার মতো বরফে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় স্থানে স্থানে যে বরফের দলা দেখা গেছে, তারই উপরে জমবে নতুন বরফ। কখনও পাথরের উপরে শব্দ হবে পাথরের মুড়ি পড়ার মতো। পাতার কাছে ভাঙা করা জেপের নিচেও বুকটা গুড় গুড় করে কেঁপে ওঠে। তবু যদি সাহস করে ঘরের দরজা খুলে বেরোনো যায়, তবে মনে হবে যেন স্বপ্নের জগতে এসেছি। বাহিরে যদি জোৎস্না থাকে আর আকাশে চাঁদ, তবে শীতের কথা আর মনে থাকবেনা। মনে হবে যে আমাদের স্বপ্নের দেশ কৈলাসে এসে পৌঁছে গেছি। স্থির হয়ে তপস্যায় বসতে পারলে শিবকে দেখতে পাব চোখের সামনে। ঐ মন্দির থেকেই তিনি বেরিয়ে আসবেন। অগণিত যাত্রীর মধ্যে তবু কয়েকজন পাগলকে দর্শন দেন কেদারনাথ শিব।

✦ বদ্রীনাথ ✦

কেদারনাথের কথা শেষ করে সাধুজী থামলেন না, বললেন : কেদারনাথের পরে বদ্রীনাথের কথা। মন্দাকিনীর উপত্যকায় যখন মোটর বাস চলত না, যাত্রীরা তখন এক দুর্গম পথে বদ্রীনাথের দিকে যেত। কেদারনাথ থেকে নামবার সময় গাল চটি থেকে মন্দাকিনী পেরিয়ে ঊখী মঠে যেত। ঊখীমঠ হল কেদারনাথের শীতাবাস। শীতের সময় ঊখীমঠেই কেদারনাথের ছয়মাস পূজা হয়। শিবের মন্দির আছে এখানে, কিন্তু মূর্তি সব ধাতুর। শিব পার্বতী মান্ধাতা অনিরুদ্ধও ঊখা। বাণাসুরের কন্যা নাকি এইখানেই তপস্যা করেছিল। ঊখার নামেই ঊখী মঠ। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল।

এখানে নবদুর্গার মূর্তিও আছে; আর আছে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ। বদ্রীনাথ মন্দির কমিটির দানে এই বিদ্যাপীঠ চলছে। চার হাজার তিনশো ফুট এই শহরের উচ্চতা। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বলে এই শহরের উন্নতি হচ্ছে। উন্নতির আরও একটি কারণ আছে। পুরনো পার্বত্য পথ ছিল দুর্গম। সেই পথ এখন মোটর চলাচলের উপযোগী হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চামোলির বাস চলেছে ঊখী মঠ হয়ে। ঊখী মঠ থেকে চামোলি মাত্র সাতাশ মাইল পথ, আর বদ্রীনাথ চুয়াত্তর মাইল। চামোলি জেলার প্রধান শহর গোপেশ্বর হল এই পথের ধারে।

ঊখীমঠ থেকে প্রায় পনর মাইল দূরে তুঙ্গনাথের পথ সোজা তিন মাইল উপরে উঠেছে। কঠিন চড়াই। কিন্তু উপরে উঠে জীবন সার্থক মনে হবে। বারো হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু এই পাহাড়ের নাম চন্দ্রশিলা। উপর থেকে চোখের সামনে দেখা দেবে যমুনোত্রী থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ গিরি শ্রেণী।

তুঙ্গনাথ হলেন পঞ্চকেদারের অন্যতম। কেদারনাথ প্রসঙ্গে মহিষের যে গল্প, সেই গল্প নিয়েই পঞ্চ কেদার। মহিষের পশ্চাদ্ভাগের পূজা হয় কেদারনাথে। তুঙ্গনাথ আর রুদ্রেশ্বরে হয় মুখ আর জটার পূজা।

রুদ্রনাথ এই অঞ্চলে। তুঙ্গনাথ থেকে নামবার সময় মণ্ডল চটি পাওয়া যায়। রুদ্রনাথ যেতে হলে মণ্ডল চটিতে বিশ্রাম করে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। রুদ্রনাথ কেদারনাথের মতো উঁচু। যাত্রীর যাতায়াত কম, পথও দুর্গম, কিন্তু দু মাইল দূরে সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে দেবী অনসূয়ার মন্দিরটি ভারি সুন্দর। গভীর অরণ্যের মধ্যে এই মন্দির। খানিকটা তফাতে মন্দিরের নিচে অমৃত কুণ্ড নামে একটি মস্ত জলপ্রপাত। রুদ্রনাথ এখান থেকে পাঁচ মাইল। পাঁচ মাইলে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উঠতে হয়। পথ নেই বলেই পথের কষ্ট বেশি।

ছমাসের জন্য রুদ্রনাথকেও নিচে নামতে হয়। কিন্তু তিনি উখী মঠে যান না। কেদার-বদরী মন্দির কমিটির অধিকার নেই রুদ্রনাথের উপর। তিনি শীতের ছমাস থাকেন গোপেশ্বরে।

আর কল্পেশ্বর ?

কল্পেশ্বর দর্শনের জন্য বেশি পরিশ্রমের দরকার নেই। যোশীমঠের উপর দিয়ে বদ্রীনাথের বাস যাচ্ছে। যোশীমঠ পৌঁছবার আগেই হেলাংএ নেমে পড়তে হয়। তারপরে নিচে নামতে হয় অলকনন্দার তীরে। সে জায়গার নাম ত্রিবেণী। একটি পাহাড়ী নদী আর ঝর্ণা আছে একটি। তাদেরই জন্যে বোধহয় ত্রিবেণী নাম হয়েছিল। ত্রিবেণীতে অলকনন্দার পুল পেরিয়ে পাঁচশত মাইল দূরে কল্পেশ্বরেই পঞ্চম কেদার।

কিন্তু এখানে পৌঁছবার আগে গোপেশ্বরেও একটি প্রাচীন শিবের মন্দির আছে, আর মন্দিরের প্রাঙ্গণে আছে একটি ত্রিশূল। তার গায়ে যে লিপি আছে এখন আর তা পড়া যায় না।

গোপেশ্বর থেকে তিন মাইল দূরে চামোলি হল সদর রাস্তার উপরে। হৃষীকেশ থেকে বদ্রীনাথের সব বাস চামোলির উপর দিয়ে চলে। জায়গা বড় হলেও বাস বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, সেট খোলা বন্ধের জন্য খানিকক্ষণ শুধু অপেক্ষা।

উত্তরাখণ্ডের বাসে চাপতে হলে সেট কথাটি সকলের আগে জানতে হবে। রাস্তা চওড়া হলেও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য এই গেট সৃষ্টি হয়েছে। হাতে বাঁশি নিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। পিছনে মোটর বাস ট্যাক্সি লরির সারি। প্রথম গাড়িতে লাল নিশান, আর সবুজ নিশান শেষ গাড়িতে। একদিক থেকে গাড়ি এসে আটকে যাচ্ছে বন্ধ গেটে। তারপরে অন্য দিকে লাল নিশানওয়ালা গাড়ি ছেড়া যাবে। যে যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে নিচে দাঁড়িয়েছিল, তারা লাফিয়ে উঠবে গাড়িতে। সেট আসছে। ড্রাইভার কণ্ডাক্টরও একে একে লাফিয়ে উঠবে নিজেদের গাড়িতে। গেট মিস্ হলেই সর্বনাশ। পরের গেটের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে দেখতেই সবুজ নিশানওয়ালা গাড়ি এসে পড়বে, আর পুলিশের বাঁশি বাজবে। তখন আর কথাবার্তা নেই, উর্ধ্বশ্বাসে ছোট। স্টার্ট দিতে দেরি করলেই গেট বন্ধ। পুলিশ কোন কান্নাকাটি শুনবে না, বলবে পরের গেটে যাও। অসতর্ক যাত্রীকে পিছনে ফেলেই বাস ছুটে চলে যাবে।

সাধুজী একটু থেমে বললেন : বদ্রীনাথ দর্শনের জন্য আজকাল কোন কষ্ট স্বীকারের দরকার নেই। ট্রেনে হৃষীকেশ এসে বদ্রীনাথের বাসে চেপে বসলেই হল। একশো পঁচাশি মাইল পথ। পথে এক রাত্রি বাস। ভোরবেলায় যাত্রা করলে পরদিন সকালবেলায় বদ্রীনাথ দর্শন।

প্রথমে সেই কেদারনাথেরই পথ—দেবপ্রয়াগ কীর্তিনগর শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। তারপরে নূতন রাস্তা। চোদ্দমাইল দূরে গৌচার আর ছ'মাইল এগোলে কর্ণপ্রয়াগ। পিণ্ডারি নদী বেরিয়েছে পিণ্ডারি হিমবাহ থেকে, কর্ণপ্রয়াগে সেই নদীর সঙ্গম অলকনন্দার সঙ্গে। কিন্তু কর্ণপ্রয়াগ নাম হয়েছে

মহাভারতের কর্ণের জন্ম, তিনি নাকি এখানে সূর্যের তপস্যা করেছেন। কিন্তু সূর্য বা কর্ণের মন্দির নেই এখানে। সঙ্গমের কাছে আছে উমাদেবীর মন্দির।

কর্ণপ্রয়াগ থেকে রাণীক্ষেতের পথে আদি বদরী নামে একটি জায়গা আছে। পথের ধারেই আদি বদরীর ছোট মন্দির। মন্দিরটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি। যেমন পঞ্চ কেদার, তেমনি পঞ্চ বদরীও আছে। এটি আদি বদরী। শ্রীনাথের প্রতিষ্ঠা এইখানেই হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত কেন তাঁর প্রতিষ্ঠা এখানে না হয়ে বদ্রীনাথে হল, সে গল্প আমার জানা নেই।

আর তিনটি বদরী কোথায় ?

বলে একজন তাকালেন সাধুজীর মুখের দিকে।

সাধুজী হেসে বললেন : অনেক কষ্টে মনে রেখেছি এই কথা। এইসব বদরী বিশাল বদরীর পথে। যে বদ্রীনাথ আমরা যাই, তিনিই হলেন বিশাল বদরী। পুরাকালে যাত্রীরা যখন হেঁটে যেত তখন তারা ধ্বনি দিত, বদরী বিশাল কি জয়। সমস্ত যাত্রা পথে এই ধ্বনি এখন আর শোনা যায় না, শোনা যায় শুধু বদ্রীনাথেই।

আদি বদরীর কথা বলেছি। বিশাল বদরীর পথে বৃদ্ধ বদরী ভবিষ্য বদরী ও যোগ বদরী। পিপল কোটি যোশী মঠের পথে আদিমঠে বৃদ্ধ বদরী। যোশীমঠ থেকে আট মাইল দূরে ধৌলি নদীর উপত্যকায় ভবিষ্য বদরী আর বদরীনাথের পথে পাণ্ডুকেশ্বরে যোগ বদরী। মূল গাছকেই বদরী বৃক্ষ বলে।

ষাটোর্ধ্ব বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বদ্রীনাথে। তিনি দেখলেন যে অধার্মিকেরা মন্দির ভেঙে ফেলে বিগ্রহমূর্তি অলকনন্দার জলে ফেলে দিয়েছে। তপ্ত কুণ্ডের ধারে যে গরম গুহা সেই গুহায় বসে শঙ্করাচার্য তপস্যা করেছিলেন। স্বপ্নে তিনি জানতে পারলেন যে দেবতার বিগ্রহ পড়ে আছে নারদকুণ্ডে। তিনি সেই বিগ্রহ উদ্ধার করে একটি বদরী বৃক্ষের নিচে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বদরী বৃক্ষের জন্য নারায়ণের নাম হল বদরী নারায়ণ বা বদ্রীনাথ।

সাধুজী আবার পথের কথায় ফিরে গেলেন। বললেন : কর্ণ প্রয়াগের পর নন্দপ্রয়াগ তেরো মাইল দূরে। উত্তরাখণ্ডে প্রয়াগও পাঁচটি। দেবপ্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগের কথা বলেছি, এই নন্দ প্রয়াগ ছাড়িয়ে বিষ্ণু প্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগে মন্দাকিনীর সঙ্গে নন্দাকিনী নদীর সঙ্গম। এই ছোট নদীটি ত্রিশূল পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। পুরাকালে নাকি কণ্বমুনির আশ্রম ছিল এইখানে, আর এখানেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন হয়েছিল। কয়েকটি মন্দিরও আছে—চণ্ডিকাদেবী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাদেব ও গোপালজীর মন্দির। এখন রাণী ক্ষেত থেকে মোটর বাস কর্ণ প্রয়াগে আসছে, একদিন যে আলমোড়া থেকে নন্দপ্রয়াগে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। পাহাড়ের উপরে মোটরের পথ প্রতিদিন এগোচ্ছে।

তারপরে বললেন : বদ্রীনাথের বাসে চেপে এলে কর্ণপ্রয়াগে নামতে হয় না। সাত মাইল এগিয়ে চামোলিতেও না। পিপলকোটি দশ মাইল দূরে, আরও উনিশ মাইল এগোলে যোশীমঠ। এই যোশীমঠ একটি ছোট পাহাড়ী শহর, চ'হাজার ফুট উঁচু। বছর কয়েক আগে যোশীমঠকে উপেক্ষা করে বদ্রীনাথ যাবার উপায় ছিল না। যাত্রীদের তখন এখানে বাস থেকে নেমে রাত্রিবাস করতে হত। তারপর উনিশ মাইল পথ চড়াই উৎরাই ভেঙে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পৌঁছবে বদ্রীনাথে। সেখানেও কেদারনাথের মতো দেব দেখনি বলে একটা জায়গা আছে—প্রথম দর্শন হত বদ্রীনাথের। কিন্তু এখন আর এ জায়গা চেনা যায় না। যোশীমঠ থেকে বাসে উঠে সাতাশ মাইল পথ অতিক্রম করে একেবারে বদ্রীনাথ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছনো যায়। যোশীমঠেও যে নরসিংহ বাসুদেব ও নবদুর্গার মন্দির আছে, এখনকার যাত্রী তা জানতে পারে না।

সাত ফুট লম্বা বিষ্ণুর কষ্টিপাথরের মূর্তি কেউ দেখতেই পায় না পাহাড়ের উপরে আধ মাইল উঠে পঞ্চরাচার প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠ এখন আর কেউ দেখে না।

ট্যুরিস্টরা কিন্তু এই স্থানটি উপেক্ষা করে যেতে পারে না। হিমালয়কে আবিষ্কার করতে হলে যোশীমঠে এসেই ব্যবস্থা করতে হবে। হেমকুণ্ড-লোকপাল ও ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স দেখতে হলে বদ্রীনাথের পথে গোবিন্দ ঘাট থেকে হেঁটে যেতে হবে। মানস সরোবর ও কৈলাসের পথ দেখতে হলে ধৌলি নদীর উপত্যকা দিয়ে সিতি পাসের দিকে যেতে হবে। যাদের হাঁটতে ভাল লাগে, তারা তপোবন ঘুনারা হয়ে কুয়ারি গিরিপথের ভিতর দিয়ে গহনা লেক হেঁটে বিরেহী নদীর ক্রিকে চামোলি বা গিপল কোটের বাস ধরতে পারে। এই অঞ্চলেই রূপ কুণ্ড গিত্তারি হিমবাহ ত্রিশূল নন্দাদেবী রোণগিরি পর্বত। ট্যুরিস্টের স্বর্গ।

কিন্তু আমরা তীর্থযাত্রীরা এসব দেখি না। বাসে বসে গড় গড় করে বিষ্ণুপ্রয়াগে নেমে যাই। দু'ঘাটলে দেড় হাজার ফুট নামতে হয়। ধৌলি নদী এখানে অলকনন্দার সঙ্গে মিলেছে। গোবিন্দঘাট পাঁচ মাইল দূরে। হেমকুণ্ড লোকপাল ও ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স এখান থেকে বারো মাইল দূরে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে আমরা বাসে বসেই উপরে উঠতে থাকি। এক মাইল দূরে পাণ্ডুকেশ্বর। একটি যোগ বদরীর বিষ্ণু মন্দির, আরেকটি বাসুদেবের। দুটিই খুব প্রাচীন। পাণ্ডবদের তৈরি বলে জনশ্রুতি। পাণ্ডবদের নামেই পাণ্ডুকেশ্বর নাম।

চার মাইল দূরে হনুমান চটি আট হাজার ফুট উঁচুতে। ছোট একটি হনুমানের মন্দির আছে। তারপরে কাকন গঙ্গা পেরিয়ে চড়াই এর মাথায় দেব দেখনি। যাত্রীদের যখন হাঁটতে হত, তখন সকল কষ্টের অবসান হত এইখানে। বদ্রীনাথ পুরী দেখা যেত এইখান থেকে, আনন্দে সবার মন প্রাণ ভরে যেত। এখন বাস এসে দাঁড়ায় শহরের জনহীন উপকণ্ঠে। মানুষের বাস এখানে নেই, আছে বাসের আড্ডা আর কিছু দোকান পাট। বিরাট এক প্রান্তর পেরিয়ে অলকনন্দার তীরে বদ্রীনাথ পুরী। নদীর এপারে ঘরবাড়ি আছে, রেষ্ট হাউস গোটাকিস ডাক বাংলো। সরকারী বাস ও ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে এইখানে। মন্দির নদীর পরপারে। পুল পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে উঠলেই বদ্রীনাথের মন্দির দেখা যাবে নীলকণ্ঠ পর্বতের কোলে। বরফে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই পাহাড়, নিচে অনেক দূর পর্যন্ত এই বরফ নেমে এসেছে। শীতের সময় শহর ও মন্দিরও বরফে ঢেকে যায়। দেবতার পূজা হয় যোশীমঠে।

বদ্রীনাথের উচ্চতা কেদারনাথের চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। এর উচ্চতা দশ হাজার দুশো চুয়াল্লিশ ফুট। উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ যেমন শৈবদের বদ্রীনাথ তেমনি বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠতীর্থ। অতি প্রাচীন তীর্থও বটে। বেদে এই তীর্থের নাম আছে কিনা জানিনা, পুরাণে এর অজস্র উল্লেখ। সত্য পথ বা সত্যপথ বদ্রীনাথ থেকে পনর মাইল দূরে। নন্দপ্রয়াগ থেকে সত্যপথ পর্যন্ত বদরী বিশালক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে বলত বদরিকাশ্রম। লোকে বলে যে বেদের কিছু শ্লোক ও উপনিষদের অনেকাংশ এইখানেই প্রথম রচিত হয়েছিল। অসম্ভব নয় সত্যযুগের অনেক মুনি ঋষির বাস ছিল এইখানে। বদ্রীনাথের কাছে মানাগ্রামে আছে ব্যাস গুহা। ব্যাসদেব নাকি সেখানে বসেই বেদ বিভাগ করেছেন, আর পুরাণও রচনা করেছেন। এতো আগেরের কথা। তখন কৃষ্ণার্জুনের সময়। এই কৃষ্ণ ও অর্জুন তাদের পূর্বজন্মে ছিলেন নারায়ণ ও নর ঋষি। এখানকার গন্ধমাদন পর্বতে তাঁরা তপস্যা করেছিলেন। দুটি পাহাড়ের নাম এখনও নর পর্বত ও নারায়ণ পর্বত। এই স্থান যে তপস্যার অত্যন্ত অনুকূল ছিল, নরনারায়ণ ঋষিরা তা প্রমাণ করে গেছেন।

বদ্রীনাথে বাসস্থানের অভাব নেই। অনেক ভাল ধর্মশালা আছে, টেম্পল কমিটির গেস্টহাউস, পাণ্ডার বাড়ি, পছন্দ মতো জায়গা খুঁজে নেওয়া যায়। অলকনন্দার পুলটি বেশি প্রশস্ত নয়। যানবাহন চলাচল করে না। হেঁটেই ওপারে যেতে হয়, তারপরে ধাপে ধাপে খানিকটা উপরে উঠলেই মন্দিরের পথ। ডান দিকে ফিরলেই মন্দিরের বিপুলায়তন গেট চোখে পড়বে। পথের ধারে দোকান পাট আর ঘনবসতি। ছোটখাট একটি শহর বলে মনে হবে।

যাত্রীরা এখানে এসেই স্নান করতে ছোটেন। মন্দিরে ঢোকবার আগে স্নান করে নেন সবাই। তপ্তকুণ্ড আছে, উষ্ণপ্রস্রবণ। কাজেই স্নান করতে কোন যাত্রী ভয় পায় না। অলকনন্দার উপরে এই কুণ্ড। মন্দিরের সামনে যে পথ, সেখান থেকে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়। স্নানের ব্যবস্থা আছে। গরমজলে স্নান করে পথশ্রম দূর হয়। এ কতকটা কেদারনাথের পথে গৌরীকুণ্ডের মতো।

বদ্রীনাথের মন্দিরটি একেবারে ভিন্ন ধরণের। যারা কেদারনাথ তুঙ্গনাথ দেখে এসেছেন, তাদের কাছে বদ্রীনাথের মন্দির বড় আশ্চর্যের জিনিষ মনে হবে। মন্দিরের চূড়া বা লাট মন্দির দেখা যাবে না, মন্দিরের সিংহদ্বারের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে খানিকক্ষণ। দোতলার সমান উঁচু বিশাল এই সিংহদ্বার। পথ থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে দরজায় পৌঁছতে হয়। তারপরে মন্দিরের প্রাঙ্গণ। চারিধারে আরও কয়েকটি মন্দির ও কমিটির অফিস ঘর।

যে মন্দিরের গর্ভগৃহে বদ্রীনাথ আছেন সেখানে কোন যাত্রীর প্রবেশের অধিকার নেই। দক্ষিণ ভারতের মতো দূর থেকে দেবতাকে দর্শন করতে হয়। শঙ্করাচার্যের দেশের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা এখানে পূজারীর কাজ করেন। প্রধান পুরোহিত হলেন রাওল সাহেব। পূর্বে আজন্ম ব্রহ্মচারী ব্রতি সন্ন্যাসীরা পূজা করতেন বলে শুনেছি, এখনকার কথা সঠিক বলতে পারি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাধুজী বললেন: এখানে দেবতাকে দর্শন করে আমার মন ভরেনি, তাই কতকটা ভগ্ন মনোরথে আমি ফিরে এসেছিলাম।

কেন?

দক্ষিণ-ভারতে আমার যে অভিযোগ এখানেও তাই। দূর থেকে দেবতাকে ভাল দেখতে পাইনি। শুনেছিলাম যে বিষ্ণুর এখানে পদ্মাসন মূর্তি, যেন যোগে বসেছেন। কিন্তু ভাল দেখতে পাইনি। যাত্রীরা সামনের দোকান থেকে শুকনো ফল মিষ্টি কিনে দেবতাকে ভোগ দিতে আসছে। সেসব দেবতার কাছে পৌঁছচ্ছে না। একজন লোক সেগুলো ঢেলে নিয়ে বাকিটা প্রসাদ বলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। কোন যাত্রী প্রতিবাদ করছে না। মন্দিরের নিয়ম মেনে নিজে বেদনার্ত বুকে, প্রণাম করে ফিরে যাচ্ছে। দেবতার মূর্তি দেখে আমাদের বোধহয় মন ভরে না, দেবতাকে আমরা বুঝি বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই, চোখের জলে তাঁর অভিষেক করতে চাই, পায়ে মাথা ঠুকে মনে হয় যে দেবতার স্পর্শ পেলাম। কেদারনাথে আমরা এই সুযোগ পাই, শিবের দেহ অপবিত্র হয় না যাত্রীর স্পর্শে। শিব বোধহয় তাই আমাদের মনের ঠাকুর, আর বিষ্ণু অধিষ্ঠান ঠাকুর ঘরের সিংহাসনে।

বদ্রীনাথে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে। লক্ষ্মীর মন্দির ও ভোগ মূর্তি। পঞ্চশিলা ও পঞ্চ তীর্থ আছে। নারদকুণ্ডের মধ্যে নারদ শিলা, শীতের সময় নারদ পূজা করেন বদ্রীনাথের। অলকনন্দায় আছে বরাহ শিলা। বরাহ অবতার এইখানে বদ্রীনাথের পূজা করেছিলেন। আদি কেদারেশ্বরের মন্দিরের কাছে গরুড় শিলা। মার্কণ্ডের শিলা তপ্তকুণ্ডের নিচে। নরসিংহ শিলাও ঘুরে নয়।

তপ্তকুণ্ডের নাম বহ্নিতীর্থ। তারপর প্রহ্লাদ কুণ্ড, নারদ কুণ্ড, সূর্য ধারা ও অগ্নিগঙ্গা। বদরীনাথে এই পাঁচটি তপ্ত প্রস্রবণতীর্থ। এছাড়াও আছে সূর্যকুণ্ড, ব্রহ্মকপাল ও গান্ধীঘাট।

বদরীনাথে দু'একদিন থাকলে আরও অনেক কিছু দেখা যায়। মাইলখানেক দূরে শেষনেত্র, চরণ পাদুকা অলকাপুরে। নীলকণ্ঠ পর্বতের পাদদেশে ভগবানের পায়ের চিহ্ন আছে একটি পাথরের উপরে। উত্তরে মাইল দুই দূরে মাতামূর্তি বদরীনাথের মায়ের মন্দির মানা গ্রামের ঊর্ধ্বোদিকে।

কিন্তু নীলকণ্ঠই আমার কাছে সবচেয়ে বড় তীর্থ বলে মনে হয়েছে। প্রভাতে এই পাহাড় দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সাড়ে একুশ হাজার ফুটেরও বেশি এই গিরিশৃঙ্গ, বদরীনাথ থেকে চক্ষে গেলে মাইল পাঁচেক দূরে। তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গটি শুধু দেখা যায়, সামনের পাহাড়ে ঢাকা আছে আর সবটুকু কিন্তু আমার মনে হল যে সোনার মুকুট পরেছে হিমালয়। কিন্তু একটু বেলা হতেই সোনা রূপা হয়ে গেল, ঝকমক করে উঠল প্রভাতের প্রথম রৌদ্রে। নিচের পাহাড়ে তখনও অন্ধকার আছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শহরের ঘরবাড়ি আর বদরীনাথের মন্দির। বিদেশীরা নাকি সাতবার চেষ্টা করে নীলকণ্ঠকে জয় করতে পারেনি, কিছুদিন আগে এই পর্বত জয় করেছে রাজস্থানের এক স্কুল মাস্টার, নাম তাঁর ও. পি. শর্মা। আমার মনে হয়েছে যে তিনিই পেয়েছেন বদরীনাথের দর্শন, আর আমরা তাঁর পাথরের রূপ দেখে ফিরে এসেছি।

✦ পশুপতিনাথ ✦

সাধুজী বললেন: পীঠস্থানের তালিকায় দেখা যায় যে নেপালও একটি পীঠস্থান। সতীর জানু পড়েছিল নেপালে। দেবী মহামায়া, তাঁর ভৈরব কপালী। কিন্তু নেপাল কোন শহর বা গ্রাম নয়। নেপাল একটি স্বাধীন দেশ। এই দেশের কোনখানে জানু পীঠ তা নেপালের লোকও জানেনা। আমিও নেপালে পীঠস্থান আবিষ্কারে যাই নি, আমি গিয়েছিলাম পশুপতিনাথ দর্শনে। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে যে এই তীর্থ, এ কথা আমার জানা ছিল। প্রতিবছর শিবরাত্রির সময় ভারত থেকে অগণিত যাত্রী যায় সেখানে। ভীড় হয় যানবাহন, বাসস্থানেরও অভাব হয়। একথা আমার জানা ছিল। বৈদ্যনাথের মতো পশুপতিনাথকেও পীঠস্থানের ভৈরব বলে জানতাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কারও মুখে এ কথার সমর্থন পেলাম না। তার বদলে অন্য একটি পীঠস্থানের নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই পীঠের ভৈরবের নাম কেউ জানেনা, বলল দেবীর নাম। সতীর গুহ্য মণ্ডল পড়েছিল বলে দেবীর নাম গুহ্যেশ্বরী। পশুপতি নাথের মন্দিরের সন্নিকটেই গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির।

তারপরে তিনি নেপাল যাত্রার কথা বললেন: নেপাল যাত্রা আজ কাল খুব সহজ হয়ে গেছে। শৈশবে শুনেছিলাম যে তিনটি পাহাড় ডিঙিয়ে কাঠমণ্ডু পৌঁছতে হয়। ভারতের সীমান্তে রক্সৌল ষ্টেশন থেকেই নাকি হাঁটতে হত যাত্রীদের। বন জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে এই দুঃসাধ্য পথ যেতে হত। ভারত ও নেপাল একই বৃটিশ শাসনে থাকলেও সে যুগে যাতায়াতের অসুবিধার জন্যেই দুই দেশের সম্বন্ধ ছিল শিথিল। কষ্টসহিষ্ণু যাত্রীরাই শুধু পশুপতিনাথ দর্শনে যেতেন কেদার-বদরী দর্শনের মতো কষ্ট স্বীকার করে। তারপরে ছোট লাইনের ট্রেন বসল নেপালে। খেলনার গাড়ি। নেপাল ভারত সীমান্তে নেপালের শহর বীরগঞ্জ থেকে সমতল ভূমির উপর আঠারো-কুড়ি মাইল মাত্র পথ। যাত্রীরা রক্সৌলে এসে হেঁটে চলে যেত দু-তিন মাইল দূরে বীরগঞ্জে। বীরগঞ্জ থেকে ট্রেনে চাপলে একদিনের পথ সংক্ষেপ হত।

নেপাল যাত্রা এখন আরও সহজ হয়ে গেছে। কাঠমণ্ডুতে এয়ারপোর্ট হয়েছে, এয়ারপোর্ট হয়েছে বীরগঞ্জের কাছেও। ভারত পাকিস্তান ও নেপালের উড়োজাহাজ প্রতিদিন যাতায়াত করছে। ঢাকা থেকে, কলকাতা থেকে ও পাটনা থেকে সোজা কাঠমণ্ডুতে আসছে এয়ারপ্লেন। বীরগঞ্জ থেকেও প্লেনে চেপে আসা যায়। আবার বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে মহেন্দ্র ঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে পরপারে পালেজা ঘাট থেকে ট্রেন পাওয়া যায়। রাতে সেই ট্রেনে উঠে ভোর বেলায় রক্সৌলি জংশন, সেখান থেকে রক্সৌল এক ঘণ্টারও কম পথ। কলকাতা থেকে এলে সমস্তিপুরে গাড়ি বদল করে রক্সৌলে ট্রেনে উঠতে হয়। সকালবেলায় রক্সৌলে পৌঁছলে সন্ধ্যাবেলায় কাঠমণ্ডু। রক্সৌল ষ্টেশনেই নেপালগামী বাসের টিকিট পাওয়া যায়। যাত্রীরা কেউ হেঁটে, কেউ রিক্সায় বা টাঙ্গা চেপে নেপাল বর্ডারে এসে বাসে চাপে।

শিবরাত্রির সময় ছাড়া অন্য সময় একটা অনুমতি পত্রের দরকার হয় শুনেছি। এয়ারপ্লেনের যাত্রীদের নাকি এটাই 'ছাড়পত্র'। কিন্তু ট্রেণের যাত্রীদের এই অনুমতি পত্রের দরকার হতে দেখিনি। বাসে কেউ দেখতে চায় না, নেপালেও না। এ শুধু একটা নিয়মের কথা। নিয়ম পালন করাই উচিত। জেলা শাসকের অফিস থেকে এই পত্র পাওয়া যায়। টাকা পয়সা বদলাবারও কোন অসুবিধা নেই। ভারতীয় টাকা ও নেপালের টাকার-তফাৎ কম। নেপাল বর্ডারে টাকা বদল করবার অফিস আছে, নেপালেও ব্যবস্থা আছে। দোকানদার ও হোটেলওয়ালারাও ভারতীয় টাকা নিতে আপত্তি করে না। যা বিরক্তিকর, তা হল খানাতল্লাসী। ভারতীয় সীমান্তে একবার, নেপাল সীমান্তে আর একবার। কেয়ার পথে আর একবার তাগেলা।

কিন্তু তীর্থযাত্রীদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। আঠারো বা কুড়ি টাকা দিয়ে বাসের একখানা টিকিট কাটলেই নিশ্চিন্ত। ভারত সরকার রক্সৌল থেকে কাঠমণ্ডু পর্যন্ত একশো কুড়ি মাইল রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। ত্রিভুবন রাজপথে অসংখ্য বাস ট্রাক চলছে। সকাল আটটায় বাসে উঠলে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছনো সম্ভব।

পশুপতিনাথের মন্দির ঠিক কাঠমণ্ডু শহরে নয়, শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে বাগমতী নদীর তীরে। বাসে গেলে হাঁটতে হয় খানিকটা পথ, ট্যাক্সি একেবারে মন্দিরের দরজায় পৌঁছে দেয়। হাঁটার অভ্যাস থাকলে হেঁটেই যাওয়া যায়। সমতল ভূমির উপরে মন্দির। পাহাড়ের মতো উঁচু জমি আছে পাশে, তার উপরে উঠলে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। আর বাগমতীর উপর থেকে মন্দিরের দৃশ্য দেখা যায় সুন্দর ভাবে। ওপারে যাবার জন্য পুল আছে। একটু ঘুরে যেতে হয়। বাগমতী নদী মন্দিরের পিছনে, নদীর জল পর্যন্ত ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। যাত্রীরা স্নান করে উপরে মন্দিরে আসে।

পশুপতি নাথের মন্দির ভারতের কোন মন্দিরের মতো নয়। প্যাগোডার মতো আকার এই মন্দিরের কিছু বৌদ্ধ প্রভাব আছে। নেপালের সর্বত্র এই রকম। প্রত্যেক আছে মন্দিরে মন্দিরে, কিন্তু ভারতের মন্দিরের মতো একটিও মন্দির নেই। মন্দিরে গম্বুজ নেই, শিখর নেই কোন, তার বদলে চতুষ্কোন ছাদ আছে তিনতলা। সূর্য কিরণে সোনার পাত ঝকমক করে। নিচে চারিটি দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের নিয়ম নেই। সকল যাত্রীকে দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে দেবতাকে দর্শন করতে হয়, প্রণাম করতে হয় বাহির থেকেই। পূজারী ভিতরে দাঁড়িয়ে থেকে ভোগ নিবেদন করে ফিরিয়ে দেয়। এ নিয়ম যেন শিবের মন্দিরের মতো নয়।

পশুপতিনাথের লিঙ্গ মূর্তি বৈদ্যনাথ বা কেদারনাথের মতো নয়। ভারতের কোন শিবলিঙ্গই

এরকম নয়। চারি ধারে চারিটি মুখ আছে শিবলিঙ্গের পঞ্চম মুখটি বোধহয় উপরে। শিব তো পঞ্চবক্ত্র, চার দরজা দিয়ে তাঁর চারটি মুখ দেখা যায়, মাঝের মুখটি বাহিরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা কেউ বলেন চার মুখ, কেউ বলেন পাঁচ। আরতির সময় নাকি পাঁচ মুখে পাঁচটি মুকুট পরানো হয়।

দেবতার বাহন নন্দীর স্থান বাহিরে। বিরাট নন্দী। অন্য মন্দিরে বীর ভদ্র আছেন। আরও অনেক দেবদেবী। নেপালের রাজাদের মূর্তিও আছে।

এই মন্দির থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ী নদীর ধার দিয়ে খানিকটা পথ উপরে উঠে গেলে গুহেশ্বরী মন্দির। নিচের রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠেছে উপরে, তারপরে দরজা। দরজা মন্দিরের নয়, মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকবার দরজা। এই দরজা পেরিয়ে ভিতরে গেলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তার মধ্যেই গুহেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান। কোন মূর্তি নয়, চিত্র নয়, একটি কুণ্ডের মধ্যে আছে জল। সেই জলের উপরেই দেবীর পূজা হচ্ছে। হাতে দেবীর ভোগ বা প্রসাদ থাকলে যাত্রীদের সতর্ক হতে হয়। বড় বড় বাঁদর আছে মন্দিরের এলাকায় যাত্রীদের উপরে তারা লাফিয়ে পড়ে।

কাঠমণ্ডু থেকে কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণ কালীর মন্দিরও আছে। এই সব মন্দিরে বলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে। শুধু ছাগ বলি নয়, মুরগি ও ডিম বলিও আছে। দেবতার সামনে ডিম ভাঙলেই তা বলি দেওয়া হল। এখানকার ছাগবলি কতকটা জবাই করার মতো। একজন যাত্রী বলেছিলেন যে পশুপতিনাথের সামনেও ছাগ বলি হয়। কিন্তু নিজের চোখে আমি তা দেখিনি।

সাধুজী বললেন: কেদারনাথে যে আনন্দ পেয়েছি, পশুপতিনাথ দর্শনে তা পাইনি। মহাভারতে পড়েছি যে অর্জুন এসেছিলেন পশুপতিনাথ দর্শনে। এই প্রাচীন তীর্থে আমি ভক্তি সহকারেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরেছি বেদনা নিয়ে। সেই এক দুঃখ বদ্রীনাথের মতো। দেবতার কাছে যেতে পারিনি। ছুঁতে পারিনি দেবতাকে, তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে মনের আনন্দ বেদনা জানাবার সুযোগ পাইনি। অতৃপ্ত মন নিয়েই তাই আমি নেপাল থেকে ফিরে এসেছিলাম।

+ মানসসরোবর ও কৈলাস +

সাধুজী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: ভারতবাসী আর কোনদিন বোধহয় মানসসরোবর ও কৈলাস দর্শনে যেতে পারবে না। তিব্বতে এই তীর্থ, তার উপর চীনাদের অধিকার। চীনের সঙ্গে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কৈলাস দর্শনের আশা আমাদের দুরাশা। অথচ একদা এই অঞ্চল বিশাল ভারতের অন্তর্গত ছিল। বিশ্রবা মুনির পুত্র কুবেরের পুরী ছিল এই কৈলাসে আর আমাদের প্রিয় দেবতা শিবের আবাসভূমিও কৈলাস।

অনেকদিন আগে আলমোড়া থেকে আমরা কৈলাস যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু আলমোড়া থেকে এখন আর হাঁটতে হয়না। আলকোট নামে একটি পাহাড়ী শহর পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। নেপাল সীমান্তে এই শহর। ট্রেনে টনকপুর এসে বাসে পিথোড়া গড়ের উপর দিয়েও এখানে আসা যায়। এর পরেও সীমান্ত বাজারের পথ গেছে লিপুলেক পাসের দিকে। এই গিরিবর্ত্ম চিরতুষারাবৃত। জৈষ্ঠের শেষে বরফ গলতে শুরু করে। তখন শুরু হয় মানুষের যাতায়াত। ভেড়া ও টাট্টুর পিঠে পাহাড়ী বণিকেরা

আগে যেতে বাশিয়ার ভয়। এপারে ভারত, ওপারে তিব্বত, মাঝখানে লিপুলেক পাস। শুনেছি মাঝখানে হয়ে মানস সরোবর ও রাক্ষসতালের মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ।

মানস সরোবর ও কৈলাস দুজনের কাছেই একটি স্বপ্নময় স্থান। সমগ্র কৈলাস পর্বতটি শুনেছি একটি শিবলিঙ্গে তুষারাবৃত জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত। অনন্ত বিস্ময়ের প্রতীক হয়ে যাত্রীদের চোখের সামনে চিরকাল অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য কল্পনার অতীত। স্বপ্নের অতীত। এই তীর্থের নামে যে অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতিতে বেহুঁশ হয়ে যায়। তাই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কারও মন ভরল না। সবাই তাঁকে বিশদভাবে বলবার জন্য অনুরোধ করলেন।

সাধুজী বললেন : কেদার যাত্রার সঙ্গে কৈলাস যাত্রার অনেক তফাৎ আছে। যারা অমরনাথে গেছে, তাদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ নয়। কেদারনাথের পথে কোন আয়োজনের দরকার নেই। পথের ধারে ধারে চটি আছে। খাদ্য দ্রব্যের অভাব নেই কোথাও। যেখানে শীত বেশি সেখানে লেপও ভাড়া পাওয়া যায়। সমস্ত পথ যাত্রীর আনাগোনায় সারাক্ষণ মুখর হয়ে আছে। অমরনাথের যাত্রী যায় দল বেঁধে। তিন চারদিনের যাত্রা শুরু করতে না করতেই শেষ হয়ে যায়। কৈলাস যাত্রার যেন শেষ নেই। চলছি তো চলছিই। একদেশ থেকে আর এক দেশের উপর দিয়ে পথ। সতর হাজার ফুট উপরে লিপুলেক পাস চির তুষারে আবৃত। সেই বরফের উপর দিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে হিমালয়ের এপার থেকে ওপারে যেতে হয়। এপারে পার্বত্য পথ চড়াই আর উৎরাইএ যাত্রীদের শক্তির পরীক্ষা নেয় পদে পদে, ওপারের প্রশস্ত মালভূমি রুক্ষ শীতার্ত ও জনমানবহীন। এরকম অঞ্চল নেই ভারতে। তাই কৈলাস যাত্রার জন্য একটা প্রস্তুতির পর্ব আছে।

রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু সঙ্গে নিতেই হবে। পথে কোন চটি বা ধর্মশালা নেই। কোন কোন গ্রামে যদি বা আশ্রয় পাওয়া যায় তো সেই পরিবেশে রাত কাটানো প্রায় অসম্ভব। নোংরামি আর দুর্গন্ধই তার প্রধান কারণ। তারপর সঙ্গে প্রচুর শীতবস্ত্র চাই। শুধু গরম জামা কাপড় নয়, মাথায় কান ঢাকা টুপি, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা ও পায়ে মোজার উপর জুতো, মানে গরম কাপড়ের পট্টি। শোবার জন্য লেপকম্বল দুইই। পোষাকপত্র দু-সেট চাই। কেননা পাহাড়ে কখন বৃষ্টি হবে তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ভিজতেই হবে। ছাতা ও ওয়াটারপ্রুফে শরীরের উপরের দিকটা বাঁচানো যায়, কিন্তু নিচের দিক বাঁচেনা। উপরের দিক ভিজলে আরও ক্ষেলেঙ্কারী। শীতে একেবারে জমে যেতে হবে। বিছানাপত্র ও খাবার জিনিষের বোঝা বাঁচাবার জন্যেও ওয়াটারপ্রুফ বা রবার জাতীয় জিনিষ সঙ্গে রাখতে হবে।

এরপর খাদ্যদ্রব্যের কথা। ভারতের সীমানা লিপুলেক পাসের এধারে গার্বিয়াং আর ওধারে তাকলাকোট। এই পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য কিছু পাওয়া যায়। ঘি আটা গুড় নতুন চাল আর মসুর ডাল। অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে নিতে হয় আচার শুকনো ফল বিস্কুট চা। স্টোভ্, স্পিরিট লণ্ঠন কেরোসিন টর্চ ব্যাটারি মোমবাতি দেশলাই হাতা বাসন প্রভৃতি যাবতীয় রান্নার ও বাতি জ্বেলে কাজ করার জিনিষ। একটা ওষুধের বাক্স নিতেই হবে। তার মধ্যে জ্বরের ও পেটের অসুখের ওষুধ। মাথা ধরার বড়ি, পায়ে বেদনার মালিশ, ঘায়ের মলম, মুখে মাখার ক্রীম। একজোড়া কালো চশমাও চাই, আর আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক বা পিস্তল।

বন্দুক পিস্তলের নামে ভয় পেয়েছিলেন অনেকে। তাই দেখে সাধুজী হেসে বললেন তিব্বতে ডাকাতের ভয় প্রবল। দল বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে আসে তারা। নিজেদের পিঠে আছে পুরাকালের গাদা বন্দুক।

আধুনিক বন্দুক পিস্তল না দেখলে তারা ভয় পায়না। ঘোড়ার চড়া তিব্বতী দেখলেই হাতে পিস্তল নিয়ে লোফালুফি করতে হয়। তাতেই আত্মরক্ষা হয়। খেলনার পিস্তল হলেও বোধহয় ক্ষতি নেই।

আস্কোটে আমরা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। কৈলাসের পথে এরকমের ছোটখাটো ধর্মশালায় আশ্রয় পাব, এ আশা আমাদের ছিলনা। শুনেছিলাম যে এই ধর্মশালাটি এখানকার রাজওয়াড়া সাহেবের তৈরি। তাঁদের দুখানা সুন্দর বাড়ি আছে ধর্মশালার উত্তরে পাহাড়ের গায়ে। সমৃদ্ধ গ্রাম এই আস্কোট—অনেক দোকানপাট। অনেক ঘরবাড়ি। পাহাড়ের মাঝখানে এক প্রশস্ত ভায়গা জুড়ে ছোটখাট শহরের মতো গ্রাম। মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের প্রধান পথ। মোটর বাস এখন আস্কোট ছাড়িয়ে গারবিয়াঙের পথে এগিয়েছে কিনা জানিনে। আমরা এখান থেকেই পদযাত্রা শুরু করেছিলাম।

আস্কোটের পরে একটা পাহাড় যেন জয়েই নিচু হয়ে গেছে। তিন চার মাইল উৎরাইএর পর গৌরীগঙ্গা নদীর পুল। পশ্চিম তিব্বত হতে চওড়া এই নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। দুদিকেই পাহাড় উঠেছে আকাশ পর্যন্ত। নদী পার হয়ে কিছুদূর চড়াই ভাঙবার পরে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারত ও নেপাল সীমান্ত দিয়ে বয়ে আসছে কালী নদী। তারপর ছেলিডুধি গ্রামের পাশে গৌরী-গঙ্গার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর পরে, কালী নদীর তীরে তীরে পথ সোজা উত্তরে গেছে। ভারতের মাটির উপর দিয়েই পথ। নদীর পরপারে হিমালয়ের এক গিরি শ্রেণী নেপালের সীমান্ত রক্ষা করছে।

এর পরেই ধারচুলা। আর এখান থেকেই কৈলাসের আসল যাত্রার আরম্ভ। কৈলাসের সকল যাত্রী এখান থেকেই একত্র হয়ে চলেন। কেউ আগে, কেউ পিছনে। কিন্তু রাত্রিবাস করেন একসঙ্গে, ঘুম থেকে যাঁরা আগে ওঠেন, তাঁরা আগে চলেন। অন্যরা অনুসরণ করেন তাঁদের। একদলের লোকের সঙ্গে আর একদলের লোকের দেখাসাক্ষাৎ হয়। একজন যখন বিশ্রাম করতে বসেন, তখন আর একজন একটু মিষ্টি হেসে কিংবা দুটোকথা বলে এগিয়ে যান। নতুন পরিচয় হয় পুরাতন পরিচয় হয় অন্তরঙ্গ। পথের আনন্দ পথের কষ্টকে কখনও বড় হতে দেয়না। কঠিন চড়াই ভাঙবার সময় ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। উৎরাই দেখে ঘোড়া থেকে অনেকে নেমে পড়েন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। ঘোড়ার অত্যাচার পিত্তর কারণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু সেসব কথা কেরার পরে মনে থাকেনা। অপার আনন্দ দিয়ে হিমালয় এই পথের কষ্টের কথা পথেই ভুলিয়ে দেয়। মনে থাকে একটা সুখ স্বপ্নের মতো আনন্দের স্মৃতি।

ধারচুলার দু'মাইল দূরে শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন একটি আশ্রম। গারবিয়াং এখান থেকে পাঁচদিনের পথ। নিজের পায়ের উপরেই বেশি ভরসা, আর ভরসা মনোবলের উপর। খেলার চড়াই পার হয়ে পঙ্গুর পাহাড়, সেও দুঃসাধ্য। খেলায় রাত্রিবাস করে সকালে যাত্রা। মাইল দু'য়েক উৎরাই এর পরে গৌরি গঙ্গা। তারপর পঙ্গুর পাহাড়। উপরে আছে পঙ্গু নামে গ্রাম; এইসব পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়না যে আমরা এই চড়াই ভেঙে উপরে পৌঁছতে পারব। এই পাহাড়ের পরপারেও কিছু আছে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নেই। বাঁকাবাঁকা পথে যাত্রীরা কোমর বাঁকা করে লাঠির উপরে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে যায়। আমরাও উঠি, কষ্টের শেষ নেই। একজন আর একজনকে উৎসাহ দিতে পারিনা। উৎসাহের উৎস ফুরিয়ে যায়। একটা চড়াই শেষ হলে আর একটা চড়াই আসে একটা উৎরাইএর পরে আর একটা উৎরাই। কিন্তু সমতল পথ নেই সম্মুখে।

কালী নদীর কূল আমরা দুবার পেরিয়েছি। একবার পেরলে নেপাল রাজ্য, আর একবার পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ফিরে আসা। পাহাড় থেকে অনেক ঝর্ণা এই কালী নদীতে এসে পড়েছে। পথে তার গর্জন শুনতে শুনতে এগোতে হয়। কোথাও এই ঝর্ণা সংকীর্ণ পথের উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। কঠিন পিচ্ছিল পথ। নিঃশ্বাস বোধ করে এইপথ পেরুতে হয় পা টিপে টিপে পাহাড়ের দিকে ঝুঁকে। নিজেকে যখন পার হতে হয়, ঘুমে তখন কথা সরেনা। তারপরে পেরিয়ে গিয়ে ওপরে থেকে পিছনের যাত্রীকে সতর্ক করতে হয়।

দিনের বেলায় হাঁকে আক্রমণ করে ঘোড়ার ভিতর থেকে রক্ত শুষে খায়। রাতে শিশু পোকার কামড়ে ঘুম হয়না। এদিকে তাঁবু খাটাবার দরকার হয়না। গ্রামে আশ্রয় পাওয়া যায় কোনখানে, কখনও বা বর্ষাতি মাথের দুর্গন্ধযুক্ত এক নোংরা ঘরে, কখনও ভাক-হরকরার ঘরে, কখনও বা দোকানে বা প্রার্থনাগৃহের দোরালে। এক এক জনকে এক এক জায়গায় উঠতে হয়। যাঁরা আগে পৌঁছল তাঁরা ভাল জায়গাটি দখল করে আগেভাগে। নিজেদের জন্য দুধ ও খাদ্যদ্রব্যও তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করে ফেলে। তীর্থের পথে বেরিয়েও স্বার্থত্যাগ করতে কেউ পারেন না। যাঁরা যত পিছিয়ে পড়েন, তাঁদের দুর্গতি তত বেশি। তবু আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চললাম। একদলে যাত্রার বিধিকে গভীর ভাবে সন্ধান করি।

এমনি করেই আমরা গাবিয়াং পৌঁছেছিলাম। গাবিয়াং ভারতের সীমান্তে শেষ বসতি গ্রাম। অনেকগুলি দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই। হাতে বোনা আমাকাপড়ও পাওয়া যায়।—ভুটিয়া মাথের কম্বল, পশমের মোজা ও জুতো। তাঁবুও তাড়া পাওয়া যায়। গাবিয়াংএ শুধু গাড়োয়ালী নয়, ভোটিয়া আর দুনিয়ারাও আছে। দুনিয়ারাই ভাল গাইড, ও দোভাষী।

গাবিয়াং থেকে আমাদের যাত্রা কিছু সহজ হয়েছিল। ঘোড়া ও কুলি পাওয়া যায় এখানে। দুর্গম পার্বত্য পথে কুলি বড় বিশ্বস্ত সঙ্গী। মাল ও যাত্রী দুইই বহন করে। প্রথমটায় খুব সাবধানে চাপতে হয়। নাকের দড়ি টেনে না ধরলে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে পারে। আর একটা আশ্বাসের কথা এই যে গাবিয়াং থেকে মানসসরোবর ও কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরে আসতে দিনকুড়ি সময় লাগে। তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারলে কিছু সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব। দুর্গম পথে চলবার সময় এ একটা মস্তবড় আশ্বাস। কষ্টের শেষ কবে হবে তা জানা থাকলে কষ্ট সহ্য করবার বল পাওয়া যায়।

কালীনদীর ধারে ধারে পথ ক্রমেই উপরে উঠেছে। দু'হাজার ফুট উপরে কালাপানি। কিন্তু এপার মাইলে এই পথ উঠতে হয় বলে চড়াই তেমন দুঃসাধ্য মনে হয়না। কালাপানিতে একটা রাত কাটাতে হয়। আর প্রথম তাঁবু খাটাতে হয় এইখানে।

গাবিয়াং থেকেই হিমালয়ের চেহারা বদলায়। এ আমাদের পরিচিত হিমালয় নয়। আলমোড়ায় যে পাহাড় দেখি, তা হিমালয়ের প্রথম স্তরের। তারপরের স্তর তত উঁচু নয়। এই দ্বিতীয় স্তরে আমরা শিবোড়াপর আরোহণ পেয়েছি। গাবিয়াং তৃতীয় স্তরে। এই স্তর ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে তিব্বতের দিকে নেমে গেছে। হিমালয়ের সমস্ত তুষার শৃঙ্গগুলিই এই তৃতীয় স্তরে অবস্থিত। ষোল হাজার সাতশো আশি ফুট উঁচু লিপুলেক গিরিবর্ত্ম পার হলেই হিমালয়ের পরপারে আমরা তিব্বতে পৌঁছই। এই পথটুকু পার হবার কষ্টের কথা আমরা গাবিয়াংএই শুনেছিলাম। বাতাস ক্রমে হাল্কা হবে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে, ঠাণ্ডায় পা ভারি হবে পাথরের মতো। এর নাম নাকি বিষ চড়া। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়,

দেহের অনাবৃত অংশ পুড়ে যাবার মতো জ্বালা করে। মাথা ঘোরে, চোখ জ্বলে, মনে হয় যে জ্বর এসেছে কাঁপুনি দিয়ে। এ শীতের কাঁপুনি।

কালাপানিতে রাত কাটাবার সময়েই এই শীতের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। গরম জামা কাপড় সব গায়ে চাপিয়ে আগুন জ্বালিয়েও কাঁপনি থামেনি। লিপুলেক পাস অতিক্রম করবার আগে আর একটিরাত আমাদের কাটাতে হয়েছিল এপারে। সে জায়গার নাম গড়চিঙ। কালাপানিতেও দুচার ঘর মানুষ দেখেছি, কিন্তু গড়চিঙে জনমানব নেই। পাঁচ মাইল পথ ঘণ্টাতিনেকে অতিক্রম করে দুপুরেই সেখানে পৌঁছেছিলাম। এগোবার সময় ছিল, কিন্তু এগোইনি। সময় হাতার ছুটেই আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম। কিন্তু নির্জন নিস্তব্ধ রাতে আমরা ঘুমোতে পারিনি। দুরন্ত শীত, আমরা কয়েকজন যাত্রী ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। পাখির ডানার শব্দ নেই, ঝিঁঝির ডাক নেই, ঝর্ণার কলতানও সেখানে শোনা যায়না। এখানে শুধু প্রহর গণনা করে রাত কাটানো।

স্থির হয়েছিল যে শেষ রাতেই যাত্রা করা হবে। সূর্যের আলোয় লিপুলেকের বরফ গলতে শুরু করে, অসতর্ক হলে বরফের স্তূপে পা ডুবে যায়। তাই আমরা শেষ রাতেই যাত্রা করেছিলাম। তাড়াতাড়ি চলবার উপায় নেই। ঠাণ্ডায় পা চলেনা, দেহ অবশ হয়ে আসে। এখানেও জল নেই, শুধু বরফ। পাহাড়ে আর গাছপালা নেই, সম্পূর্ণ অনাবৃত উলঙ্গ পাহাড়। তার শিখরগুলি চির তুষারাবৃত। সামনেই লিপুলেক পাহাড়, তার চূড়ার নাম লিপুধুরা। আমরা তার উপর দিয়ে যাব। কিন্তু তার পরেও যে পৃথিবী আছে, তা বোঝা যায়না। হিমালয়ের এই নগ্নরূপ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এরূপের তুলনা আর কোথাও নেই।

সাধুজী একটু বিশ্রাম নিলেন এই সময়ে। তারপরে বলতে শুরু করলেন: বরফের উপর দিয়ে খানিকটা পথ আমরা পেরিয়ে গেলাম। তারপরে লিপুধুরা। ধীরে ধীরে এই পর্বতের শিখরেও আরোহন করলাম। পথের ধারে একটি শুকনো গাছ, তার ডালে পাতার বদলে রঙীন কাপড়ের টুকরো বাঁধা, আর গোড়ায় কিছু পাথর সাজানো। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা তিব্বতের দিকে প্রথম তাকিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন আমরা সাহারার মতো একটা মরুভূমি দেখছি। কোন গাছপালা নেই, কোন জনবসতি নেই, নেই কোন মানুষের বসতির চিহ্ন। দূরে দিগন্তে শুধু ছোটবড় পাহাড় দেখতে পেয়েছি। নানা রঙের পাহাড়—সাদা নীল ধূসর ও গৈরিক। আর দেখেছিলাম গুরেলা মান্ধাতা পাহাড়। তারপর বরফে আচ্ছন্ন পথ ধরে সন্তর্পণে নিচে নেমেছি। এর পরে পুরাঙ পর্যন্ত শত মাইল প্রায় সমতল পথ।

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে ধারে এগোচ্ছিলাম। এই ঝর্ণাটিই ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে নদীর মতো দেখাচ্ছিল। এই রকমের অনেকগুলি ঝর্ণার ধারা গিয়ে ঝর্ণালী নদীতে মিশেছে। ঝর্ণালীর তিব্বতী নাম ঘার চু। চু মানে জল। পুরাঙ গ্রাম এই নদীর দুই তীরে বিস্তৃত। পুরাঙকে ভারতীয়রা তাকনাথার বা তাকনা কোট বলে। ভারতের সীমান্তের কাছে এই তিব্বতী জনপদে আগে ভারতের সঙ্গেই ব্যবসা ছিল। নিজেদের প্রয়োজনীয় বিনিময় পত্রের বিনিময়।

এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে আমরা যবের চাষ দেখেছিলাম। কিছু কড়াইশুঁটির চাষও আছে। এসব আমাদের রবিশস্য, শীতকালে হয়। কিন্তু হিমালয়ের পরপারে দেখেছি যে আমাদের বর্ষাকালেই সেখানে এ সবের চাষ হচ্ছে। তিব্বতে তখন কোন্ ঋতু তা আমাদের জানা ছিলনা। রৌদ্র বড় তীব্র, আর বাতাস শুষ্ক। ঠোঁট শুকিয়ে ফাটতে শুরু করেছিল।

পাহাড়ের উপরে একটা প্রাচীন দুর্গ। সেখানে থাকেন স্থানীয় শাসন কর্তা ছুপাল পুরো। পুরনো একটি গোম্ফাও আছে, আর নানাবর্ণের ছিন্ন ধ্বজাবলি। এখানকার বর্ণালী নদী নেপালের ভিতর দিয়ে ভারতে এসেছে। তার তীরে একটি তীর্থস্থান আছে, তার নাম কোরওনাথ। এদেশের ভাষায় বলে কোরর যো, আর ভারতীয়রা বলে খোজরনাথ। যাতায়াতে কুড়ি মাইল পথ। তিব্বতী নারীরা সেখানে হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে। বিষ্ণুর দুই পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি।

নদীর বুক প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত, কিন্তু জল নেই সবখানে। কাঠের পুলের উপর দিয়ে জল পেরিয়ে আমরা নদীর তীরেই রাত কাটালাম। গাবিয়াঙের বন্ধু ও ঘোড়া বিদায় দিয়ে তিব্বতী জানোয়ার নিতে হল এইখানে।

পরদিন প্রভাতে আমরা মানস সরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথের পরিমাণ পুরাঙেই জেনে নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনে রাবণহ্রদে পৌঁছব, তারপর দিন মানস সরোবর। কৈলাস দেখতে পাব চতুর্থ দিনে। কৈলাস পরিক্রমা করে পুরাঙে ফিরতে আমাদের দশবারো দিন সময় লাগবে।

মন আমাদের অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। এ পথে কঠিন চড়াই উৎরাই আর নেই। চমনীর উপত্যকা ছেড়ে গ্রামের প্রশস্ত শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সামান্য উঁচু নিচু পথ, চলতে কষ্ট হয়না একেবারে। যাত্রীরা বেশির ভাগই এখানে হেঁটে চলেছেন। মানস সরোবরের পথে রত্নহ্রদ আছে বলে যাত্রীরা পুরাঙের মহাজনের কাছে টাকাকড়ি জমা দিয়ে একখানা রসিদ সংগ্রহ করেছেন, আর সামান্য কিছু তিব্বতী তঙ্কা, আধা ও সিকি তঙ্কা রেখেছেন সঙ্গে। হাসতে হাসতে এই মহাজন বলছিলেন, পুরী পরদা, সরোবর দাতু। তার মানে পুরী যেতে পয়সার দরকার, আর মানস সরোবরের জন্য চাই শুধু হাতু।

রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ সোজা উত্তরে গেছে। ঘুরে ঘুরে পর্বতের শিখর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তুষারধবল। এমনি একটি পর্বতের নাম গুরলা মান্ধাতা। আমাদের পথ গেছে তারই পাশদিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে, তার পূর্বে মানস সরোবর। অনেক যাত্রীদল মানস সরোবরে না গিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে তীরেই কৈলাসে চলে যায়, কেবল পথে দেখে মানস সরোবর। আমরা মানস সরোবর দেখে কৈলাসে যাব। মানসের পবিত্র জলে স্নান করে দর্শন করব দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাস।

মধ্যপথে আমাদের একটি রাত কাটাতে হয়েছিল। কোন লোকালয় নেই। আমরা নিজেরাই একটি লোকালয় সৃষ্টি করে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস করলাম। প্রত্যূষে আবার যাত্রা, অসহ্য শীত, বাতাস আরও অসহ্য। সমস্ত গরম কাপড়ের বোঝা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অসাড় মনে হচ্ছে হাত পা। পথ চলার পরিশ্রমেই খানিকটা আরাম পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ঝর্ণার ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে জলপান করে। কয়েকগুলো ঘাস নিচু হয়ে শুধু জলই খায়না। জলের ধারে তৃণগুল্মেরও সন্ধান করে। কাঁটার মতো শক্ত তৃণ। মাঝে মাঝে পাথরের ফাঁকেও এই রকমের কাঁটা দেখতে পাওয়া যায়।

এক সময় একটা চড়াই পাওয়া গেল। এরকম চড়াই আমাদের পরিচিত নয়। এখানে একজনের পিছনে আর একজনকে উঠতে হয়না, পাশের অবলম্বনটি ধরে গড়িয়ে পড়বার ভয় নেই। এ চড়াই এমন প্রশস্ত যে সবাই পাশাপাশি উঠতে লাগলাম। যাঁরা আগে ছিলেন, তাঁদের আনন্দধ্বনি শুনতে পাওয়া

গেল। আমরাও তাড়াতাড়ি উপরে উঠে সেই আনন্দের সন্ধান পেলাম। সামনে বামদিকে দেখলাম খানিকটা নীল জল। আকাশের নীলের চেয়েও ঘন ও গাঢ়। তারই পরপারে কৈলাসের তুষার শুভ্র স্বল্প মেঘাবৃত।

এ জল মানস সরোবরের নয়, এ জল রাক্ষস তালের। রাবণ হ্রদ। তিব্বতীরা কেউ বলে লাংচো, কেউ বলে লাগাং। কিন্তু সবাই ভয় পায় এই রাক্ষস তালকে। এই সরোবরে নাকি রাক্ষসেরই বাস। এর জল পবিত্র নয়, এর তীর নয় নিরাপদ। চোরাবালিতে পা পড়লে মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। নরম সুন্দর শুভ্র বালির নিচেই জীবন্ত মানুষের সমাধি হয়ে যাবে। তবু আমরা রাবণ হ্রদের তীরে পৌঁছবার জন্য দ্রুত পায়ে নিচে নামতে লাগলাম।

উপর থেকে মনে হয়েছিল যে রাবণ হ্রদ খুব কাছে। কিন্তু তা নয়। অনেকটা পথ অতিক্রম করে একটা জায়গায় এসে এই হ্রদের সমগ্র রূপ দেখতে পেলাম। দিনের আলো তখনও নিবে যায়নি, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে রাবণ হ্রদ। জলের মধ্যে দুটি ছোট পাহাড় আছে দ্বীপের মতো। আলোয় রাঙা দেখাচ্ছিল একটি। আর একটির বিচিত্র বর্ণ। বাতাসে হ্রদের জল দুলছিল। আমাদের মনও দুলে উঠেছিল। রাত্রিবাসের জন্য আমরা এই হ্রদের তীরেই তাঁবু ফেলেছিলাম।

রাবণ হ্রদের উৎপত্তি কী করে হল, সাধুজী আমাদের সে গল্পও শোনালেন। বললেন: বড় ভাই কুবেরকে জয় করবার জন্য দশানন রাবণ এসেছিলেন কৈলাসে। তারপর তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর পুষ্পক রথ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এইখানে তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হল। রথ থেকে নেমে রাবণ বললেন, ব্যাপার কি? সামনে ছিলেন শিবের অনুচর নন্দী, তিনি বললেন, দশানন, মহাদেব এখানে পার্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, এপথে যাবার অধিকার এখানে কারও নেই। এই উত্তর শুনে দশানন রেগে গেলেন, বললেন, এই পর্বতটাকেই আমি নিয়ে যাব। বলে তাঁর বিশ হাতে গোটা পর্বতটাকেই নাড়া দিলেন। কৈলাস পর্বতবাসী শিবের সমস্ত অনুচর ভয় পেল, ভয় পেলেন পার্বতী। কিন্তু শিব সহাস্যে তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠে একটু চাপ দিলেন। তাতেই দশানন হলেন প্রবলভাবে পীড়িত। নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্বেদাক্ত হলেন, দরদর ধারায় তাঁর ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। সেই ঘামেই উৎপত্তি হল এই রাবণ হ্রদের।

কিন্তু অনেকে বলেন, না। দশানন এখানে সহস্রবর্ষ রোদন করেছিলেন। তাঁর সেই সরব রোদনের জন্য নাম হয়েছিল রাবণ। আর তাঁর চোখের জলেই এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। রাবণ এখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

রাবণ হ্রদের তীর থেকে প্রত্যূষে যাত্রা করলে সন্ধ্যাবেলাতেই কৈলাসের পাদদেশে তারবেনে পৌঁছানো যায়। কিন্তু মানস সরোবরে স্নান করে গেলে একটা দিন বেশি সময় লাগে। একটা রাত পরক্রু নালার উপরে অতিবাহিত করতে হয়। পরক্রু নদীর উৎপত্তি মানস সরোবরে। সেখান থেকে রাবণ হ্রদে এসে পড়েছে। তারপরে রাবণ হ্রদ থেকে বেরিয়ে তীর্থপুরীর পাশ দিয়ে গারাবে প্রবেশ করেছে। রাবণ হ্রদের চেয়ে মানস সরোবরের উচ্চতা প্রায় বিয়াল্লিশ ফুট বেশি, সমতল থেকে পনর হাজার আটাশ ফুট। কৈলাস পরিক্রমার পথে আঠারো হাজার ছশো ফুট উঁচুতে গৌরীকুণ্ড, আর কৈলাস শৃঙ্গ প্রায় বাইশ হাজার ফুট উঁচু।

রাক্ষসতাল থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব এক বেড় মাইলের। কিন্তু পথ অসমতল বলে যেতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। এই অঞ্চলে বন্যজন্তুগুলো প্রায়ই হারিয়ে যায়। রাতে চরতে গিয়ে সকালে আর

ফিরে আসে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঘরে এসে যাত্রা করতে দেরি হয়ে যায়। এক একটি করে তিনটি চড়াই অতিক্রম করে মানসের তটে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমরা গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ যেন বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিরাট নয়রূপ, নিরাবরণ পৃথিবী এখানে প্রাণ পেয়ে বিজ্ঞাময়তা। ভোগের বাসনা এখানে জাগে না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো আজীবন তপস্যার কথা মনে আসে। সত্যিই এরূপের কোন তুলনা নেই।

মানস সরোবরকে তিব্বতীরা বলে সো মাফম, আর একে সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। পাঁচ ছ'দিনে এই হ্রদের পরিক্রমা করে বলে যে এর পরিধি হবে পঞ্চাশ ষাট মাইল। অনেকে একশো মাইলও বলে। জল যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানটা হল প্রায় আড়াইশো ফুট।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: স্নান করেছিলেন আপনি?

সাধুজী হেসে উত্তর দিলেন: শীতল জলে স্নান করবার একটা কায়দা আছে। জলে নেমে আর ইতস্তত: করতে নেই। তরতর করে এগিয়ে গিয়ে দু'তিনটে ডুব দিয়ে উঠে আসতে হয়। সমস্ত শরীর প্রথমে অবশ হয়ে যায়, তারপর পরমতৃপ্তিতে মন যায় ভরে। অনেক যাত্রী এখানে স্নান তর্পণ করে বালির উপরে বসে সন্ধ্যা বন্দনা করেন। ঝড়ের মতো বাতাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তীরের উপরে আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের মতো গর্জন নেই। আছে গানের মতো একটা মিষ্টি সুর। কুবেরের পুরী থেকে যেন নৃত্যগীতের ধ্বনি ভেসে আসছে।

সাধুজী বোধ হয় বাহিরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইলেন এই তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী, বললেন: কৈলাস তিব্বতীদেরও পরম তীর্থ। তারা বলে থাক রিম পোছে। বারো বছর পর পর তাদের কুম্ভের মতো যোগ আসে। তখন সমস্ত তিব্বত থেকে ধার্মিক লামারা আসেন কৈলাস দর্শনে। সাধারণ তিব্বতী আসে মানৎ করে, ধন খেটে, ঘুমি মেপে তারা কৈলাস পরিক্রমা করে কুড়ি বাইশ দিনে। গৌরীকুণ্ডের বরফের ধারে কেন জমে যায় না, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

মানস সরোবরের চারি দিকে ও কৈলাস পরিক্রমার পথে অনেক গোম্ফা আছে বৌদ্ধ লামাদের। লামাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেই সব গোম্ফায়। তীর্থযাত্রী তিব্বতীদেরও সাক্ষাৎ মেলে। আর দেখা হয় তিব্বতী বন্যুদের সঙ্গে। কাঁধে গাদা বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে তারা আসে। যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করে দেখে, জিজ্ঞাসাবাদ করে ডোডাখী বনিয়া বা ভোটিয়াদের সঙ্গে। তারপর বন্দুক বা পিস্তলের সংবাদ পেলেই সরে পড়ে।

কৈলাস পরিক্রমার আরম্ভ তারবেন থেকে। ত্রিশ মাইল পথ পরিক্রমা করতে তিন দিন সময় লাগে। কষ্ট সহিষ্ণু হলে দুদিনেই এই পথ অতিক্রম করে তারবেনে ফিরে আসা যায়। যারা রাবণ হ্রদের তীর ধরে যায়, তারা ফেরে মানস সরোবরের ধার দিয়ে। আর যারা মানস সরোবর হয়ে যায়, তারা রাবণ হ্রদের ধার দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

শীতের জন্য আমরাও খুব তাড়াতাড়ি পথ চলেছিলাম। মানস সরোবরের তীরে একরাত্রি বাস করেছিলাম তার রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য, আর একরাত্রি বাস করেছিলাম তারবেনে। তারপরে, দুদিনে কৈলাস পরিক্রমা শেষ করে রাক্ষসতালের পথে ফিরে এসেছিলাম। কষ্টের কথা বলবনা। বলব আনন্দের কথা। গৌরীকুণ্ডকে তিব্বতীরা বলে গোলটাখা। অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম গৌরীকুণ্ডের। আধ মাইল পরিধির এই কুণ্ডটি সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উপরে পুরু বরফ ভেদে জল পাওয়া যায়।

তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ স্নান করেন কনকনে ঠাণ্ডা জলে, শিশিতে জল ভরে নেয়, বেশিক্ষণ দাঁড়ানো এখানে নিরাপদ নয়। তুষারের স্রোত বয়। কিছু দিন আগে এলে নাকি চার পাঁচ মাইল পথ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হত। আমরাও বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি, মাথায় একটু জল ছিটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

কৈলাস হল কঠিন তুষারে আবৃত একটি শিলিঙ্গ। ধাপড়া শিবলিঙ্গের মতো তার আকার। তারি পাশ দিয়ে বরফের পাহাড় এসেছে নেমে, তারনাম শিনাব। এই শিনাব এসে গৌরীকুণ্ডের প্রান্তে মিশেছে।

কৈলাসের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মন আমার ভরেনা। যোগেশ বাবুও মনই ভরেনি। তা বুঝতে পেরে সাধুজী বললেন: চলার পথে কৈলাস যেদিন প্রথম দেখতে পাই, সেদিন সেইক্ষণে মনে হয়েছিল যে এতদিন যা দেখেছি সব মিথ্যা, সত্য শুধু এই কৈলাস। এর আগে অনেক দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে যে এমন রূপ বুঝি এর আগে আর দেখিনি। সেদিন ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিক্রমার পর মনে হয়েছিল যে কৈলাসের চেয়ে সুন্দর তীর্থ আর দেখিনি। তীর্থ আর দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন। ধর্ম আর সৌন্দর্য। এই তো আসল তীর্থ।

রাজা বদল

— আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কালো বুড়ো গরুটার দিকে চেয়ে সুরমান বলে,

—আজে ইয়ার শোক্ত কি হবেক? বিলকুল হাড্ডি। তাই বল্লায় দু'কুড়ি টাকার বেশী দিতে লারবো।

শেষ দাম হেঁকে সুরমান কালো কাপড়ের উপর সাদা খান লাগানো ছাতাটা নামিয়ে একটু দম নিল। ভেবেছে এই দামেই গরুটা পেয়ে যাবে সে।

হঠাৎ ওদিক থেকে বোমাফাটার মত ভারি একটা আওয়াজ ওঠে,

—কে রে? এ্যাই বিনে কে এসেছে গোয়ালে?

বিনে রিয়র চাটুয্যের বাড়ির পুরোনো মুনিষ, এ বাড়িতেই মানুষ হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। পরিবারের একজন হয়ে গেছে। বিনে ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গিন্নীমার দিকে ঘোরিয়ে বলে,

—আজ্ঞে, বুঝি গাইটা আর বিয়োবেক নাই, বয়স হইছে তাই বল্লেন মাঠান—উটা বিচেদে। গোয়াল যোড়া করে খামাকাই থাকবেক কেনে!

—এ্যা! গিন্নীগাইকে বিচে দিতে হবে? তাহলে এবাড়ির গিন্নীকেও যে পথ দেখতে হবে রে?

গিন্নী জানে স্বামীর মুখের আগড়াক নেই। তাই শাসনাবার চেষ্টা করে,

কি বলছো তুমি?

রিয়র চাটুয্যে গোনায়—ঠিকই বলছি। আর সুরমান—যা, যা বলেছিস তার জন্যে তোকে বাটা হুকো পেটা করতে হয়।

সুরমানও চেনে চাটুয্যে কত্তাকে। তাই সে আমতা আমতা করে,

—আজ্ঞে আর গোটা পাঁচেক ট্যাকা দিব।

—এ্যাই। চাটুয্যে রেগে যায় চট্ করে। কলকে নামিয়ে হুকো তুলে এগিয়ে আসে—টাকা! এঁ্যা! টাকা দেখাতে এসেছিস রিয়র চাটুয্যেকে? ও টাকায় আমি পেচ্ছাব করি। বলদায় গরু বিচবোনা। যা-যাতুই।

সুরমান ভেবেছিল তবু কুলভাল দিয়ে গিন্নীমার কাছ থেকে গাইগরুটা বের করে নিয়ে গিয়ে মিনেন শতখানেক টাকায় বিচতো, খদ্দের ঠিক করা আছে, বায়নাও নিয়ে এসেছে। কিন্তু কোন ফাঁকে রিয়র চাটুয্যে এসে ঢুকেছিল তা জানেনা।

সুরমান সরে গেল। চাটুয্যে তখন গিন্নীকে বলে ওঠে,

—এতদ্দেও যদি না কুলোয় ওই বুড়োর কাছেই যেতেপারো গিন্নী। আরামে থাকবে। গুনছি গাড়িও করেছে। বুড়োবয়সে রঙীন শাড়ি পরে রং লাগিয়ে গাড়িতে ঘুরবে। টাকা! টাকার জন্য গিন্নী-গাইটাকে বিচবে নাকি?

গিন্নী বলবার চেষ্টা করে—এত কাণ্ড হবে তা জানতাম! ভেবেছিলাম বিচে দোব।

—থাক, ও!

চাটুয্যে বুড়ি গাইটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। অনেকদিন আগেকার সখ করে কেনা গরু এটা। আজ এরই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে উঠেছে, গোয়াল ভোরে উঠেছে। ওর বয়স হয়েছে, আর ক'দিনই বাঁচবে গরুটা! তাই ওকে রাখতে চায় হৃদয় চাটুয্যে।

ওই বুড়ি গাইও কেমন যেন বুঝতে পেরেছিল সেটা। তাই চাটুয্যেকে কথা বলতে দেখে গরুটা ভাগর কালো দুচোখ মেলে চেয়ে থাকে। ওর হাতের ছোঁয়ায় গরুটা ল্যাজ নাড়ে কান খাড়া করে ওর কথাগুলো শুনছে অবলা ওই প্রাণী।

চাটুয্যে গিন্নী ততক্ষণ সরে গেছে। চাটুয্যে এইবার বিশেকে নিয়ে পড়বে তা জানে, বিশে তাই কখানা বাড়িয়ে খামারে গিয়ে গোয়াল গুলো গাদা দিতে থাকে। গজগজ করছে সে।

বুড়ি গাইটাকে নিয়ে তারও জলুনি কম নয়, বয়স হলে অথর্ব হয়ে গেলে বেঁচে থেকে লাভ কি? বিশেও তাই ভেবেছিল গরুটাকে নিয়ে আর তাকে ঝুলতে হবেনা। কবরেজ বাড়ি বয়ে গিয়ে বহড়াপাতা কুচি ছাল এসব আনার পাটও চুকবে।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল। হিরণ চাটুয্যে যা ভাববে সেটাই ঠিক। তার থেকে ওকে একটুও নড়ানো যাবেনা।

নামে হিরণ চাটুয্যের হাল আজ বদলে যেতো। কিন্তু আপোষ করে নি সে কোথাও তাই দু'দশখানা গাঁয়ে ও দুর্বাসা মুনি হয়েই রয়ে গেল।

হিরণ চাটুয্যেও জানে সেটা। কিন্তু তার মনে ওই অন্যায়গুলো কেমন জ্বালা ধরায়। নিজেরই বিশ্রী লাগে। এককালে গাঁয়ের মধ্যে বনিষ্ঠ সুন্দর একটি অগ্নিময়ে মেতে উঠেছিল। বাপের একমাত্র ছেলে ওই হৃদয় দুবার চাটুয্যে। তাদের অবস্থা ভালোই ছিল। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ তার বাবা গদাধর চাটুয্যে পাঁচ গাঁয়ের মাথা। সেকালের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। তাই তার বসবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল রাজা রাণী আর লাট সাহেবের ছবি। গদাধরওয়ালারাও প্রায় আসতেন। হৃদয়কে সেইজন্যই গদাধর চাটুয্যে ইংরাজী পড়িয়েছিল—কলেজে পাঠিয়েছিল।

আর তার পরই বাবার ওই খোলামুদি বৃত্তিটাকে হৃদয় সেদিন কঠিনভাবেই ঘৃণা করেছিল।

গদাধর চমকে ওঠে—কি বলছিস এসব?

—সাহেবদের আমরা সহ্য করবোনা। দরকার হলে এক একটি খুঁজে খুঁজে আমরা শেষ

গদাধর চমকে উঠেছিল, তখন ভাবতে পারেনি তারই ছেলে এমনি বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

তবু বলে সে,—একি বলছিস হিরণ? পুলিশে ধরবে যে।

—ধরুক, বলছিনা, কাজেও করছি। দরকার হলে ইংরেজের দালাল যারা আছে তাদেরও শেষ করবো আমরা। তোমাকেও তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

সে আজ কতো দিনের কথা। হৃদয় সেদিন বাড়ি থেকে বেরোয় হয়েছিল, বিষয় সম্পদ টাকা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিন্ত জীবন কোন কিছুই তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। একলাই সে ওই দুর্গমপথে পা বাড়িয়েছিল।

মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামী হয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর জেল খেটে বিভিন্ন দূর মুহাফতের থানায় রাজবন্দী অবস্থায় আটক থেকে ফিরে এসেছিল, তখন সে অন্য মানুষ।

দেশ স্বাধীন হয়েছে তারপরও সেই মানুষটা কেমন বদলে গেছে। সংসারী হয়েছিল। ভেবেছিল সেও আরও পাঁচজনের মত সংসার করবে। কোথায় শিক্ষকতা করছিল কিন্তু সেই কাজের মধ্যে দেখেছে অনেক ফাঁকি। চটে উঠেছিল হৃদয় চাটুয্যে। তাই সে কাজও ছেড়ে এসেছিল।

একমাত্র ছেলে সুভাষ তখন স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ছে। কৃতি ছাত্র। সেবার জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়ে বৃত্তি পেয়েছে, প্রেসিডেন্সীতে পড়ছে।

রমা বলে, কাজ কর্ম করবেনা? ছেলেকে মানুষ করতে হবে তো।

হৃদয় জানে তার অভিজ্ঞতাত যা আছে তাতে দুটো মানুষের চলে গিয়েও বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। তাই বলে,—ওসব ঠিকই হবে গিন্নী। কারও গোলামী করতে পারবোনা এই বয়সে। করলেতো তখনই করতে পারতাম—এ্যাডিনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-এর অনেক উপরেই উঠতাম।

রমার লোকটাকে কেমন বিচিত্র লাগে। শুনেছে ওর সম্বন্ধে সেই কথাগুলো। কঠিন একটি মানুষ, কোন সাহেবকে স্যেরেছে। বোমা পিস্তল নিয়ে তখনকার দিনে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরেছে এখনও তবু কথায় ইস্পাতের মত কঠিন রয়ে গেছে। ও বলে,

—ভেবোনা গিন্নী সুভাষ নিজেকেই নিজে তৈরী করবে দেখো।

তার কথা ওইখানেই সত্যি হয়েছে।

সুভাষ বরাবরই ফার্স্ট হয়ে উঠেছে। বি-এস-সি পাশ করে শিবপুরে ঢুকেছিল, সেখানের ফার্স্ট ক্লাশ পাবার পর কোথায় চাকরী নিয়ে নিজেই বিলেত গেছে ফরেন কোয়ালিফিকেশনএর জন্য। হৃদয়-এর এইখানেই বেধেছিল।

হৃদয় তখন গ্রামের ইস্কুল নিয়ে পড়েছে। এতকাল লালডাঙার ওদিকে গ্রামের বাইরে খড়ের চালের ঘরটা মাইনর স্কুল হয়েই পড়েছিল। সেইটাকে বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে হৃদয়। গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরছে যার টাকা পয়সা কাঠ খড়ও দিচ্ছে সকলে যার যেমন সাধ্য। তাই নিয়েই কাজ সুরু করেছে সে। বাপে হারার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হবে।

রমাও লোকটাকে বলে কয়েও পারেনি সংসারে মন দেওয়াতে। সুভাষ এমনি দিনে বিলেত যাবার কথাটা জানাতে আসে বাড়িতে। রমা খুশী হয়। তার একমাত্র সন্তান মানুষ হয়েছে, আজ সে বিলাত যাচ্ছে। তাই আশীর্বাদ করে,

আরও বড় হবি বাবা!

কিন্তু হৃদয়ের কোথায় বাধে। সে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে স্কুল থেকে। আজ তার কাজ এগিয়ে চলেছে। স্বাধীন দেশের সরকার কর্তৃপক্ষ তার অনেক সহকর্মী। সেদিনকার পরিচিত বন্ধুরা আজ দেশ শাসনের ভার নিয়েছে। তারাই ওকে ভরসা দিয়েছে।

হৃদয় ছেলেকে বলে—ওদেশে না গেলে শিক্ষা পুরোপুরি হবে না?

সুভাষ বাবার দিকে চেয়ে থাকে। ও জানে বাবার সেই মতবাদ, আজীবন একটা জাতকেও ঘৃণার চোখে দেখলনা, তবু বলে সুভাষ,

—তাদের অনেক সদ্গুণ আছে। জাত হিসাবে ওরা অনেক পারফেক্ট অনেষ্ট। হৃদয়েরও বাবার সঙ্গে একদিন মুখোমুখি ঝগড়া হয়েছিল অতীতে। সেদিনের তরুণ হৃদয় বাবাকে বলেছিল কথাগুলো।

আজ সেই ঘটনাটা মনে পড়ে হৃদয়ের। তার ছেলের মুখে চোখে প্রতিবাদের কাঠিন্য নয়, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লোভ ওই চোখে মুখে, ওর কথায়। দেশের জন্য নয় নিছক নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ওরা আজ উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হৃদয়ও দেখেছে তার ছেলের চোখে মুখে সেই লোভটা।

রমা বলে—তুমি আবার ঝামেলা দিয়োনা, কতো ভাগ্যি যে আমার ছেলে এই সুযোগ পেয়েছে। তুমি তো কিছুই করোনি ওর জন্যে।

হৃদয় স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। ওই মেয়েটিকে ও দেখেছে। সেদিনকার মায়েদের মত ছেলেকে দেশের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারেনি। ওরা চায় অর্থ মান প্রতিষ্ঠা। বিরাট লোকের মা হতে। তাই হয়তো সহীব হৃদয়কেও স্বামী হিসেবে মর্যাদা দিতে কোথায় বাধে তার স্ত্রীর। প্রকাশ্যে সেই প্রতিবাদ ফুটে না উঠলেও মনে মনে সেটা রয়ে গেছে রমার।

হৃদয় একটু হাসল। ওই হাসিতে ফুটে ওঠে কি হতাশার বেদনা। ওরা তা অনুভবও করতে পারেনা। সেই মন তাদের নেই, আজকের অনেক পাওয়ার স্বপ্নে ও সেই সত্যকে ভুলে গেছে প্রতিবাদ করা নিষ্ফল।

তাই হৃদয় বলে তোমাদের কাজে আমি বাধা দেবনা।

সুভাষ বাবার দিকে চেয়ে থাকে। বেশ বুঝেছে সে বাবা এটাকে সমর্থন করেননি। কিন্তু তার বাবার সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে, তাই বাবার এই সেকেলে আদর্শের ফুলটাকে সে প্রশ্রয় দেবেনা। দিন এগিয়ে চলেছে বাবা বোধহয় সেটা বুঝতে চান না।

হৃদয় আর কথা বলেনি। তার একমাত্র ছেলের পথও তার জীবনের পথ থেকে সরে গেল অন্য দিকে। এখানেও আপোষ করতে পারেনি হৃদয়। একটার পর একটা আঘাতই জমেছে তার বুকে, সেই তেজস্বী মানুষটা প্রতিবাদ করেনি। ভীষ্মের মত সব নীচতা আর শক্তির দম্ভকে নীরবে দেখেছে মাত্র, চুপ করে গেছে।

বেলা হয়ে গেছে। অলস মধ্যাহ্নের রোদ গ্রামের গাছগাছালির বুকে শুস্কতা আনে। ক্লান্ত দুপুরে সেদিন হৃদয় চাটুয্যে জীবনের কি অপরিসীম শূন্যতাকে দেখেছিল। স্বাধীনতার পর দেশকে দেখেছে, দেখেছে সেই মানুষগুলোকে। একদল ক্ষমতা পেয়েছে, অন্যদল আঘাত অপমান বুকে নিয়ে কোথায় অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

সেদিন তাই নিরাপদদাকে দেখে অবাক হয়েছিল সে। ও ছিল মেদিনীপুর বার্জ হত্যার অন্যতম নেতা, শুধু বার্জ কেন সারা মেদিনীপুরের সেই আন্দোলনের প্রধান ছিল সে। বাঁকুড়া ষ্টেশনে ওকে দেখে চিনতে পারেনি। দীর্ঘ দেহী ইস্পাত কঠিন মানুষটার কোমর দুইয়ে পড়েছে, চোখের কোলে কালির দাগ লাঠিতে ভর দিয়ে চলছে। পরণে ছেঁড়া একটা গেরুয়া পাঞ্জাবী ময়লা ধুতি আর পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো তাও আঙুলটা বের হয়ে পড়েছে ছেঁড়া জুতোর ফুটো দিয়ে।

—হৃদয় না? আমি নিরাপদদা। চিনতে পারো?

—নিরাপদদা তুমি! ওর দিকে চেয়ে থাকে হৃদয় বিস্মিত বেদনাহত চাহনি মেলে।

আজ ওকে কেউ চেনেনা একদিন ওর মাথার দাম দিয়েছিল বিদেশী সরকার দশ হাজার টাকা। ওকে কতো লোক খুঁজেছে হন্যে কুকুরের মত। আজ সে প্রায় ভিখারীর মত ঘুরছে পথে পথে। আজ ওর কোনো দাম নেই—বাতিল ব্যর্থ একটি জীব।

হর নিয়ে নিরাপদদা বলেন—ভি. এম এর কাছে এসেছিলাম যদি কিছু পেন্সন এর ব্যাপারে একটু হেলপও করেন হোম ডিপার্টমেন্টে! কলকাতায় গিয়েও ওদের দু'এক জনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বুঝলে হরর অনেকে চিনতেই পারল না।

হরর চুপ করে থাকে,

জীবনটাই এমনি—নিরাপদদা বলেন,

তোমার ছেলো তো এখন বিলেতে, কোন কার্মের নাকি বড় ইঞ্জিনিয়ার। বুঝলে হরর, মনে হয়—একটা বিরাট ভুলই করেছিলাম সেদিন।

হরর এটাকে বিশ্বাস করেনা। ও বলে—কিছু পাবো এ আশা নিয়ে সেদিন বিদ্রোহ করিনি নিরাপদদা। দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়েছিলাম, কিন্তু এই হবে তার রূপ তা ভাবিনি ভুলটা সেইখানেই।

নিরাপদদাকে সেদিন পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে দিয়েছিল হরর।

—এটা নিন।

—হিজো? বৃদ্ধ ব্যর্থ বিপ্লবীর চোখে জল নামে। ও ঠকে গেছে কোথায়।

ঠকে গেছে হরর ও। তার ছেলেও তাকে ঠকিয়েছে, স্ত্রীও। আর ঠকিয়েছে তাকে সমাজের মানুষ দেশের অনেকেই। আজকের যুগে ত্যাগ সততার কোন দাম নেই।

স্কুল এর বাড়ি উঠছে, সরকার থেকেও টাকা আসছে অনেক।

হঠাৎ হরর আবিষ্কার করে সেখানে একটা কাণ্ড হতে চলেছে। একটা বড়যন্ত্রের জাল ঘনিয়ে উঠছে।

—চাটুয্যে মশায়।

নিরাপদদা ডাকছে, চাটুয্যেমশায় দুপুরের বিশ্রাম-এর পর আবার স্কুলের দিকে আসে। তার আগেই পদ গিয়ে হাজির হয়েছে।

চাটুয্যে মশায় ওর দিকে চাইল—কি রে? ছেলেটিকে সে বিশ্বাস করে, স্কুল তৈরীর দেখাশোনার কাজ দিয়েছে।

পদ বলে—আজ্ঞে ঘতদের বিভূতি নোকুল মাষ্টার প্রিয়র মুখুজ্যে সকলেই দল পাকিয়ে দরখাস্ত দিয়েছে উপরে যে বাড়ী তৈরীর টাকা নাকি তছরূপ হচ্ছে অনেক। আপনার নামেও কি সব লিখেছে শুনলাম।

—এঁ্যা! রাগে চাটুয্যেমশায় এর পিত্তি জ্বলে ওঠে। এতদিন নিজে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরেছে। নিজের জমির ঘর ঘরের পয়সাও গেছে অনেক সদর আর কলকাতা যাতায়াত করতে। সেদিন কেউই তার পিছনে আসেনি। বরং বলেছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো হরয়েরই সাজে।

আজ সেখানে ক্ষুর লোভে অনেক ভীমরুল অবধি জুটেছে টাকা আদায় সঙ্গে সঙ্গে।

পদ বলে,

—আজ্ঞে তলে তলে মুরলীই সব করাচ্ছে। আর নবমীবাবু রয়েছেন পিছনে।

—মুরলী! হেডমাষ্টার মুরলীবাবুর কথা বলছো?

পদ মাথা নাড়ে। নবমীবাবু বর্তমানের একজন নামকরা দেশসেবক সেজেছে। সেই ভরসা নিয়ে ভোটে জিতে এম. এল. এ হয়েছে এ এলাকার। তারপরই দিন বদলে গেছে তার। ব্যবসা ফেঁদেছে সে, বাঁকুড়া সদরে বাসকট পেয়েছে। ঝকঝকে বিরাট একটা বাস এনেছে সেই রুটে।

নিরাপদবাবুর কথা মনে পড়ে হৃদয়ের। ওরা প্রাণ হাতে নিয়ে বিপ্লব করেছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্য। আজ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিখারীর মত, আর সাজারাজার দল ঠিক গজিয়ে উঠেছে। তারাই আজ শোষণ সুরু করেছে সবচেয়ে বেশী। মানুষের সব আশাকে ব্যর্থ করে তারাই স্বাধীনতার ফল ভোগ করছে।

পরু বলে—আপনাকে মিটিং-এ ডাকছেন তারারা? হিসাবপত্তর দিতে বললেন।

হৃদয়ের সেই চাপাপড়া কাঠিন্য হঠাৎ জ্বলে ওঠে।

—কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমাকে? ওদের কাছে?

হঠাৎ মুরলী আর দু'এক জনকে আসতে দেখে হৃদয় চাটুয্যে চাইল ওদের দিকে।

মুরলী বলে—মানে, কথাটা শুনেছেন তাহলে। তাই বলছিলাম হিসাবটা যদি পেশ করতেন ভালোই হতো। দুচার রকম কথা উঠছে।

হৃদয় জানে সব খরচার হিসাব ওই মুরলীই রাখে। তার হাত দিয়েই খরচা হয় টাকাকড়ি। ওইই চিট দিয়ে টাকা নেয়। আজ বেমালুম যেন সব ভুলে যেতে চায় মুরলী।

হৃদয় বলে—হিসাব তোমার কাছেও আছে, আর হিসাব দাখিলের কথা বলছো? ওটা কালই সদরে গিয়ে ডি আইকে দিয়ে আসবো। তোমরা জেনে নিও সেখান থেকে। তিনিই টাকা দিয়েছেন তাঁকেই হিসাব চুকিয়ে দিয়ে আসবো।

মুরলী একটু অবাক হয়। চাটুয্যেমশায়কে চেনে সে, শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু এই কাজটা তাকে করতে হয়েছে শুধু নবনীবাবুর জন্যেই। তাঁর দু'চারটে কথা ইতিমধ্যেই মেনে নিতে হয়েছে। স্কুলের কেরাণী হয়েছে নবনীবাবুর ইস্কেপনে কাজ করা ছেলেদের দুজন; মাষ্টারও রাখতে হবে তার জানাশোনা বংশবদ দু'একজনকে, তাছাড়া এতগুলোটাকা তাঁর জিম্মায় থাকলে বোধহয় ওই ব্যবসার সুবিধে হবে নবনীবাবুর।

তাই নবনীবাবু চান হৃদয় চাটুয্যেকে সরানো হোক আর সব কর্তৃত্ব নেবে সে। মুরলী জানে তাতে ওর বিপদ বাড়বে, আর কর্তৃত্বও কমে যাবে। তবে নবনীবাবু বলছেন তাকে পুষিয়ে দেবেন!

তাই হৃদয়কে একথাটা বলতে এসেছিল নবনী মাষ্টার।

হৃদয় বলে—কালই সব হিসাব নিকাশ আর ব্যালেন্স ক্যাস ডি আই অফিসে দিয়ে দিচ্ছি মুরলী। তবে স্কুল নিয়ে নোংরা রাজনীতি করোনা—ওটাকে গড়ে তুলো। ওপথে আমি বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। আমি এপ্রেসিডেন্টের পদে রেজিগনেশন দিলাম।

হৃদয় চাটুয্যে কোন ঘৃণায় সরে এসেছে ওই নোংরা পরিবেশ থেকে। দেশসেবা সমাজসেবা রাজনীতি এসব আজ পেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। আজ কিছু স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ওখানে বাকী লোক আসানা গেড়েছে।

ওসব থেকে তাই হৃদয় চাটুয্যে নিজের চারিদিকেই একটা কঠিন আবরণ গড়ে তুলেছে। কথাটা বলেছিল মুরলীই সেদিন ওকে।

—ওই নবনীবাবুর ওখানে একটু গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন স্যিরমুড়ো, জানে জানেন তো, এম-এল-এ হয়েছেন, উনি চান আপনারাও ওখানে যান টান একটু উঠ বস করুন।

হৃদয় চাটুয্যে হকোটানা বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে। হৃদয়ের মনে হয় ওদের মনের লোভটা আজ কালো ছায়া মেলে সব আলোকে ঢেকে ফেলেছে। তাদের আমলে মাস্টার মশাইদের দেখেছে। সেদিন

তাঁরা ছিলেন ত্যাগী, তপস্বী। আর তাই সেদিনের সমাজে মানুষ গড়ে উঠেছিল, সেই মানুষ যারা হাসি মুখে সর্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে গেছল স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের জন্য। আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে স্বার্থপর-লোভী বেহদও বিহীন একটি পদলেহী অপদার্থ—আজকের ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ গড়ার দায়িত্ব তার উপর।

হৃদয় ওকে দেখছে, ওর চোখের সেই ঘৃণার জ্বালাটা মুরলীবাবুর দৃষ্টি এড়ায় না।

হৃদয় বলে,

—আপোষ আমি কোথাও করি না মুরলী, তাছাড়া স্বার্থ আমার এখানেও কিছু নেই, তাই সরে এলাম।

ওই মুরলী আজ শিক্ষক আর দেশসেবক ওই নবনী। লোভী স্বার্থপর একটা মানুষ, যে শুধু নিজের উন্নতির জন্যই ওই সেবকের মুখোস পরে লোককে ঠকাচ্ছে এই স্বাধীনতার জন্যই নিরাপদবাবুর মত আজ মৃত্যুর দিন গুণছেন পথে পথে। কথাটা মনে পড়লে দারুণ মন জ্বলে ওঠে হৃদয়ের।

মুরলী তবু বলে—নবনীবাবুর ইনফ্লুয়েন্স এখন অনেক। ওঁকে চটানো ঠিক হবে না রিস্ক থেকে যাবে।

হাসল হৃদয়। বললে,

—বুঝলে মুরলী, যেখানে অন্যায় বলে যাকে জানি তার প্রতিবাদ না করতে পারি অন্ততঃ তাকে অস্বীকার করবো। আর শেষ দিনে পালে খাল কেটে রেখে যেবো।

মরবার আগে শেষ চেষ্টা করে পাল দিয়ে সেই খালে মৃতদেহটাকে ছিটকে ফেলে নিজের শেষকৃত্য নিজেই সমাধা করে যাবো। কাউকে চাই না। হাসছে হৃদয় সেই দৃশ্যটা কল্পনা করে।

মুরলী চুপে চুপে সরে এলো। এহেন ব্যক্তিকে নড়ানো যাবেনা তা বুঝেছে সে।

হৃদয় চাটুয্যে তবু বেঁচে আছে ও যেন একক একটি সত্তা। প্রতিবাদের কাঠিন্য আছে তার বহিঃপ্রকাশ নেই, নিজের জগতেই থাকে সে, বিশেই তার সঙ্গী। ওই একটি মানুষকে দেখেছে যে সৎ আর নির্লোভ।

বলে হৃদয়,

—তুই ব্যাটা বোকা—গাড়ল।

বিশে তামাক সাজতে সাজতে বলে—কেনে গ'! সেটি বলছো কেনে?

—বল্লাম ব্যাটাকে এইবেলা ওই মুরলীকে ধরে নবনীর কারখানায় ঢুকে যা। নিদেন বাড়ির কাজেও লেগে যা, তবু কিছু পেয়ে যাবি।

বিশেরও বয়েস হয়েছে, এক সঙ্গেই ওরা গাঁয়ের পাঠশালে পড়েছে। সেই দিনের বন্ধুত্ব আজও ঘুচে গেছে। বিশের মনে ঘুরে গেছে ওর জন্যে শ্রদ্ধা। ও দেখেছিল ওই তরুণটিকে। সেদিন সব কিছু ছেড়ে সে বের হয়ে গিয়েছিল, যুদ্ধ করেছে সাহেবদের সঙ্গে। পনেরো বছর জেল বাস করেছে—তবু এতটুকু ক্ষোভ নেই তার মনে।

আজকের মানুষগুলোর সঙ্গে ওদের মেলে না।

তাই বলে বিশে,

—তিন কালে বেয়ে এককালে ঠেকেছে, আর ঝকমারি কেন গ' বেশ রইছি।

—তবে মর শালা বাগী! হৃদয় চাটুয্যে হাসে ওর কথায়।

চাটুয্যে চাষবাসও সব ভাগেই দিয়ে রেখেছে। অনেকটি চাষীকেই দিয়ে রেখেছে জমি তারাও

কর্তার আমলে তখন গোয়ালে কয়েকজোড়া বলদ ছেলে থাকতো, আর চাষের জমিও ছিল বেশ কয়েকজন। কর্তা মারা যাবার সময় থেকেই চাষবাস ওই নীলু কটিক আর গুপী বাউরীর হাতেই।

সেই ব্যবস্থা এখনও চলে আসছে।

গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে লাঙল যার জমি তার। নবনীবাবুও দলবল নিয়ে সেদিন হাটতলায় মিটিং করে তারপরে ঘোষণা করেন কথাটা, হাততালি পড়ছে, ওরা বলে নবনীবাবুর মতন লোক হয় না। কতো কি করছেন আমাদের জন্যে।

বিশে শোনায় বাড়ি এসে—খবরে শোনলাম ব্যাপারটা। জমি তমা আর থাকবেক নাই। লাঙল হাল যার জমিই তার আজা হয়ে যাবেক।

হাসছে হরু চাটুয্যে। বলে ভোটের ব্যাপারে! সত্যি হলে তো কথা ছিল।

—মানে। সত্যি নয় তালে? এ্যাঁ।। বিশে ভাবতে পারে না নবনীবাবুর মত লোক মিছে কথা বলবে।

—ভোট হাও আর কি। নবনীবাবুর কত বিঘে জমি তাগে আছে রে?

বিশে কথাটা ভাবে। মনেহয় তাহলে সত্যিই সর্বনাশ হবে ওর। জেনে শুনে লোকটা বাজে কথাই বলছিল, নবনীবাবুর মত লোক নিজের এত ক্ষতি কোনদিনই সইবে না।

হরু চাটুয্যের মনের কোণে তবু একটা আশা ছিল। সুভাষ বিলেত থেকে ফিরবে, আরও বেশী মাইনে হবে। একটি গরীবের ঘরের লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েকে বৌ করে আনবে, ছেলের কাছে তার কোনো প্রত্যাশা নেই, ও চায় ওরা সুখী হোক।

গিন্নীও বলছিল কথাটা—তুমি বরং খোঁজ খবর করো। টাকা পয়সা দিতে হবে না, মেয়ে যেন লেখাপড়া থেকে ভালো হয়।

কথাটা হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। হরু চাটুয্যের নাম ডাক আছে এখানে। তাছাড়া সুভাষের কথাও অনেকে জানে, তাই সময় থেকে, এদিক ওদিক থেকেও অনেকে আসছে মেয়ের বিয়ের জন্যে।

গিন্নী রমারও ইচ্ছে বৌমাকে সে নিজে দেখে পছন্দ করবে তাই বলে কর্তাকে—তুমি এগিয়োনা, আমি দেখে আসবো তবে কথা হবে।

হরু বলে—তবু ছেলেকে জানাও, তোমার আমার পছন্দ তার চোখে লাগবে তো?

আমরা হলাম সেকেলে মানুষ, এ যুগের বাতিল প্রাণী।

রমা বলে—বাপ মায়ের উপর কথা বলবে সুতো? এমন ছেলেই সে নয়।

অনেক আশা করেছিল ওরা দুজনে দু'একজায়গায় কথাবার্তা চলছে, সুভাষ দেশে ফিরছে। যা-ই বলেছিল—এইবার বাড়ি এসে বিয়ে করে বৌমাকে নিয়ে নোতুন চাকরীর ওখানে যাবে, সুভাষকে এই ভাবেই লিখে দিলাম।

হঠাৎ চিঠিখানা এসেছিল ফটো সমেত।

তখনও চুপুর হয়নি হরু চাটুয্যে হিসাব করছে চাষীদের সঙ্গে চাষবাস এর খরচার ব্যাপারে। ওরাও বাবড়ে গেছে জমি যদি মালিক নিয়ে নেয় তাহলে পথে বসবে তারা। গ্রামের অনেকেই জমি চাষীদের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে। এইটুন একজোড়া এঁড়ে দামড়া কিনে তারা চাষ চাইছে যদিও তা হবে পুরো লোকসানের ব্যাপার, তবু জমি ছাড়বে না তারা।

হরু বলে—তোরা যেমন করছিস কর।

পিওন চিঠিখানা দিয়ে গেছে। ওটা খুলতেই চমকে ওঠে হৃদয় চাটুয্যে। চশমাটা ভালো করে চোখে লাগিয়ে আবার পড়তে থাকে, এ খবর মিথ্যে নয়। সুতাষ ফেরে ফিরেছে ব্যাঙ্গালোরে বড় চাকরী নিয়ে। ট্রেন থেকে বোম্বাই-এ নেমে সোজা সেখানে চলে গেছে সঙ্গে আছে তার নববিবাহিতা স্ত্রী।

একটি ইংরাজ মেয়ে গাউনপরা, লম্বা মুখখানা পাতলা গড়ন এই তার পুত্রবধূ! মাথায় ঘোমটা নেই সিঁদুর নেই সিঁথিতে, শাড়িপরা কল্যাণময়ী কোন মেয়ে নয়, তাদেরই চিরশত্রু সেই ইংরেজের একটি মেয়ে যে তাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে চেয়েছিল—না পেরে তার যৌবনের দীর্ঘ পনেরোটা বছর কেড়ে নিয়েছিলো—তারই ছেলে তাদেরই একটি মেয়েকে পুত্রবধূ করে এনেছে, ঘৃণার রাগে বৃদ্ধ হৃদয় চাটুয্যে জ্বলে উঠেছিল।

স্বাধীনতার পর এই তাদের মনোবৃত্তি! এই তাদের দেশপ্রেম!

কি হল?

রমা কর্তার দিকে চেয়ে অবাক হয়। বৃদ্ধের দুচোখ জলে ভরে উঠেছে।

—কি গো। সুতোর চিঠি? ভালো আছে তো?

হৃদয়বাবু চিঠিখানা ছেঁড়িয়ে দিয়েছিল টেবিলের উপরে। ওটা হাতে তুলতেও তার ঘৃণা বোধ হয়। রমা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

—সেকি! সুতো শেষে এই সর্বনাশ করল, আমাদের একমাত্র সন্তান।

হৃদয় চাটুয্যে বলে,

আমার সন্তান সে নয় রমা। তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক আমার নেই।

স্থির নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে রমা। মায়ের মন আর্তনাদ করে ওঠে।

—ওগো না-না!

হৃদয় চাটুয্যে দুবার কথা বলে না। সে শেষ কথা শুনিয়ে উঠে গেল। জাত বিপ্লবী সে, নিজের হাতে তার ভবিষ্যৎ তার স্বপ্ন সবকিছুকে সে তছনছ করে দিয়েছে। ছেলের কাছেও তার কোন প্রত্যাশা ছিল না। তবু এই ব্যবহারটাই তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে সব থেকে বেশী। এ আঘাতও সইবার সামর্থ তার আছে।

রমা বলে,

তবু চিঠি দেবে না তুমি? আশীর্বাদ করবে না?

হৃদয় বলে, দরকার হয় তুমিও যেতে পারো ছেলের কাছে।

—তুমি!

হৃদয় চাটুয্যে জবাব দিল না। রাখা বাহুল্য মাত্র। তার পথ সে ঠিক করে নিয়েছে, আজ মনে হয় সব মিথ্যা; স্বাধীনতার রূপ বদলে গেছে মানুষ সমাজ কোন কিছুকেই তারা গড়ে নি, ইংরেজের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরই অন্তর্দল রাজ্যকে গ্রাস করেছে; গড়ে উঠেছে অর্থলিপ্সু নোতুন একটি সমাজ যারা মানুষ হতে পারেনি। সুতো-তার ছেলেই সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে সেও ওদের দলে মিশে গেছে।

তবু হাসির ধারা ওর মুখথেকে মুছে যায়নি। হৃদয় যেদিন গলাতক অবস্থা থেকে ধরা পড়ে ফাঁসীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল সেদিন কোন দারোগাবাবুর ভুড়ি দেখে হেসেছিল প্রাণ ভরে।

উকিল বলে ওঠে,

—কনটেম্পট্। কনটেম্পট্ অব কোর্ট ইওর অনার।

—কোর্টের অপমান। হৃদয় চাটুয্যে হেসে উঠেছিল আরও জোরে। তার ফাঁসীর আসামীর আর

কনটেম্পট অব কোর্টএর ভয়ও আছে নাকি? তবে তার ঘোষণাবাবুর ভুড়িটা দেখে ঘুষড়োর কথা মনে হল কিনা তাই হাসছি।

আজও সেই কথাটা মনে পড়ে। বিশে খাবার জন্ত কলাপাতা কাটছিল খামার বাড়িতে। হৃদয় চাটুয্যের কলাপাতায় খাওয়ার অভ্যেস। ওটা তার ভালো লাগে। কলাগাছও লাগিয়েছে অনেক। বিশে কাস্তে দিয়ে পাতা কাটছিল, কলার পাতা থেকে কাস্তেটা হড়কে গিয়ে একটা কলস্ত কলার কাঁদিতেই বসে গেছে।

হৃদয় চাটুয্যে হা হা করে হেসে ওঠে। বিশেও বেকুব বনে যায়।

ফলকে গেল কলার পাতাথেকে যে গ'।

হৃদয় চাটুয্যে বলে,

—অ গিন্নী দেখে যাও। বিশের কাণ্ডখানা দেখে যাও।

রমা বের হয়ে এসেছে ওই ধাক্কাতে।

হৃদয় চাটুয্যে বলে ওঠে,

—ব্যাটা বিশে কিনা ছেলের নাড়ি কাটতে গিয়ে ধনই কেটেই ফেলেছে গো। কলাপাতা কাটতে গিয়ে কলার কাঁদিতেই কাস্তে বসিয়েছে এঁ্যা!

রমার এত দুঃখেও হাসি আসে ওই অপরূপ তুলনা দেখে। জানে তার স্বামীর জীবনের সব কাঠিন্যকে সে এমনি হালকা করে নেয়, তবু তাকে ভোলে না, তাকে ভোলানও যায় না।

তাই ষোলবছর হৃদয় চাটুয্যে মনে মনে আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। তার বয়সও বাড়ছে, ততই সে যেন একা আর নির্জনতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে তার আগামী দিনের উত্তাল একটি যুগ।

এই মানুষের পুঞ্জীভূত লোভ আর অন্যায়ের শেষ একদিন হবেই। এই সমাজকে এই দুর্নীতির মূল্য শোধ করে দিতে হবে কড়াক্রান্তির হিসাবে।

স্কুল বাড়ির খবর আর রাখেনি হৃদয়। নবনীবাবুও ভোটে এবার জিতেছে, বিপুল ভোটে জিতেছে। হৃদয় চাটুয্যে দেখেছে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের সেই উৎসাহ। ক্ষেতমজুর চাষী ভূমিহীনের দলও চলেছে শোভাযাত্রা করে। তারা কি মিটিং এ শুনেছে এবার তারা জমি পাবে আরও অনেক কিছু পাবে।

নবনীবাবু ভোটে জিতে আবার সহরে ফিরে গেছেন, সেখানের ধানকল তেলকল চলছে। দুর্গাপুরে কি একটা চিনামাটির কারখানা হবে, দিল্লীতে ধরবার করতে গেছেন, টাকাও ষোলহয় পেয়ে যাবেন, শিক্ষা উন্নয়ন বাবদ। মুরলীবাবুর ছেলে ভাইপোকে কোথায় চাকরী করে দিয়েছে, মুরলীও গুছিয়ে নিয়েছে। ইস্কুলের বিল্ডিং এর সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িও পাকা হয়ে গেছে। নবনীবাবুর ভোটে জেতার জন্ত সে প্রাণপাত করে দিয়েছে। তাই নবনীবাবু তাকে ওই সুযোগ দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে একটা প্রতিবাদের আগুন ঝিকি ঝিকি জ্বলে ওঠে। কোথায় জমি কোথায় বা ভাক্তারখানা কোথায় বা কি। নবনীবাবু সরে গেছে। নিজের আখের গুছোতে ব্যস্ত।

গ্রামের, আশপাশের গ্রামের সকলেই ধরে মুরলীবাবুকে। আমাদের সেই যাকে তাই ন। বলেছিল জমি পাবি-কবি লোন পাবি—বীজধান পাবি। তা কুথায়, গেল সিসব? তুমিও তো বলেছিলা মাষ্টার?

মুরলীবাবু ওদের ভাগিয়ে দেয় যা যা, আইন হবে, সময় লাগবে তো!

—ততদিনে মরে যে ভূত হয়ে যাবো? তুমরা বাঁচবে, ব্যস্ তাহলেই সব হয়ে গেল।

ওদের কাম নেই, ভাগের জমিও চলে গেছে ওই হজুকে।

উপোস দিয়ে ওদের চোখ জ্বলছে।

কে বলে ওঠে,

—তবে মরবার আগে তোমাদিকেও মেরে যাবো মাষ্টার।

—কে বললি ও কথা? কে?

তাদের দেখা যায় না। ওই শক্তি জন্ম নেয় অনেক অত্যাচার আর প্রতারণার অন্ধকার অতলে: ধীরে ধীরে তারা মাথা তোলে। এতদিনের স্বাধীনতার পরও ওদের আশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই নোতুন একটা শক্তি জেগে উঠছে ওদের গড়ে তোলা লোভের জগতের অতলে। ওরা সে খবর জানে না। দু'একজন তবু প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

হৃদয় চাটুয্যে দেখছে সব। নির্বিকার নিরাসক্ত মন নিয়ে চোখ দিয়ে সে দেখেছে এই লুণ্ঠনপর্ব আর প্রতারণাকে। দেখছে সন্ত্রস্তাগ্রস্ত সেই প্রতিবাদকে।

রমার মন তবু মানে না। মায়ের মন নিয়ে সে সব বিচার করেও দুর্বলতাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। স্বামীর উপর রেগে উঠেছে মনে মনে। কি দিয়েছে সে তাকে; সুখ শান্তি প্রাচুর্য কোন কিছুই না! ভোটে দাঁড়ালে তখন এম-এল-এ হতো। চাই কি মন্ত্রীও হতে পারতো। গাড়ি-বাড়ি-সম্মান অর্থ কোন কিছুরই অভাব হতো না। নবনীর বৌকে দেখেছে, সংসার ওর সুখ সমৃদ্ধিতে উথলে উঠেছে। আর, সে!

রমা ঠকে গেছে।

সব সময়ে সরে স্বামীর আদর্শ আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে একমাত্র সন্তানকেও দেখবার উপায় নেই। সুতো তবু বারবার চিঠি দিয়েছে বাবাকে, ক্ষমা চেয়েছে। জানিয়েছে সে সুখী হয়েছে এ বিয়েতে। তার ঘরে আসছে রমার বংশধর। মায়ের মন কেঁদে ওঠে কি ব্যাকুলতায়! আর ততই মনে হয়েছে রমার তার স্বামীর অপদার্থতার কথা; নিজের মন বার বার বিদ্রোহী হতে চেয়েছে। তুমি তবু চিঠি লিখবে না সুতোকে? রমা বলে।

হৃদয় চাটুয্যে পড়ছিল। আজকাল বই জগতের মধ্যে ডুবে গেছে। সে ভাবে এখন নোতুন জগতের নোতুন মানুষের পথনির্দেশের কথা। মনে হয় তাদের বিপ্লব ছিল প্রথম স্তরে, তারপর আর একটা বিপ্লবের প্রয়োজনও হতো, সেটা মানুষের চিরন্তন অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আজ তারই প্রস্তুতি চলেছে দিকে দিকে। বিরাট একটা প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অতীতের তার সেই বিপ্লবী মন।

—সুতোকে চিঠি দেবে না?

রমার দিকে চাইল হৃদয় চাটুয্যে। ওরা সেই সংস্কার আঘাত আর দুর্বলতাকে নিয়ে বেঁচে আছে। ও আরও অনেক কিছু পেতে চায়। মাতৃস্নেহের নাম দিয়ে সেই স্বার্থপরতাকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছে।

হৃদয় চাটুয্যে বলে,—

সুতোর কথা বলছো? তোমার ছেলে?

রমা স্বামীর দিকে চাইল, ওর সব ধৈর্যের যেন সীমা অতিক্রম করেছে। বলে সে,

একথা বলতে পারলে তুমি ? সে তোমার কেউই নয় ?

—না।

—তবে তোমার জীবনে কি রইল বলতে পারো ? রমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

হৃদয় ওর দিকে চাইল। রমা জানেনা তার অনেক আগেই হৃদয়ের অপমৃত্যু ঘটে গেছে। আদর্শ আর সত্যের কাছে ও বলিপ্রদত্ত। তার মরার কথা ছিল আগেই ফাঁসির দড়িতে। এখন সে কাউ জীবনটুকু বয়ে নিয়ে চলেছে, বাকী সব তার হারিয়ে গেছে।

জবাব দেয় হৃদয়,

—আমার তো সবই হারিয়ে গেছে রমা, যা আছে তাও যাবে। বাকীটুকু আমি নিজের হাতে মুছে দিয়ে যাবো। শূন্য রিক্ত হয়ে এসেছিলাম সেই ভাবেই ফিরে যাবো। তবে আগুনের শিখার মত একটা উত্তাপ শুধু থাকবে।

রমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। তার মতের সঙ্গে কোথাও মেলেনা ওর। ওই লোকটার অনেক কিছু নষ্ট করেছে, সে আজ মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

হৃদয় সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। সেদিন ওদের জমায়েৎ হয়েছে হাটতলায়।

গ্রাম গ্রামান্তরের ভাগচাষী ভূমিহীন কৃষক খেতমজুরের দল জমেছে। এতদিন তারা আবেদন নিবেদন ইত্যাদি করেছে। কোনফলই হয়নি তাই তারা আজ যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

এইখানেই হৃদয় চাটুয্যে আজ কথাটা জানায়।

ওরা ওকে চেনে, শ্রদ্ধা করে। দেখেছে সাধারণ মানুষ স্কুল কমিটি থেকে সরে এসেছে লোকটি বিনা প্রতিবাদে, নবনীবাবুর কাছেও কোনদিন যায় নি।

নিজের ছেলে চারহাজার টাকা মাইনে পায়—তবু সেই সন্তানকে সে ক্ষমা করেনি, তার কপর্দকও গ্রহণ করেনি—ক্ষুব্ধ দৃপ্তের একটি মানুষ—

বিপ্লবে বিশ্বাস করেছিল যৌবনে—আজ বার্দ্ধক্যেও যেন সেই তেমনিই রয়ে গেছে।

হৃদয় জানায়—আমি ঠিক করেছি—ভাগচাষীর কাছ থেকে সিকি ভাগই নোব, আর বাড়তি জমি যা আছে তা ওই নীলে-বিঘের মধ্যেই বিলিয়ে দোব। যাদের আরও অনেক বেশী জমি আছে ওদেরও দিতে বলো তোমরা, দাবী জানাও।

বাক্যের স্ফুলিঙ্গে যেন আগুন লেগেছে। মানুষগুলো চীৎকারে ফেটে পড়ে। এই দাবী তাদের মানতেই হবে। হাজারো কণ্ঠের গর্জনে সচকিত হয়ে ওঠে চারিদিক !

কথাটা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে। একটি মানুষই আজ ওদের এই চাওয়াকে পূর্ণ করেছে স্বেচ্ছায়, এত দিনের দাবেকী সেই কঠিন প্রথাকে সে ধ্বংস করছে। আর ওরাও মেতে উঠেছে সেই দাবী পূরণের লড়াই-এ।

মুরলীবাবুও শুনেছে কথাটা। গ্রামের দুচারজনও শিউরে উঠেছে। ওরা দেখছে হাজারো মানুষের এই মত্ততাকে—নবনীবাবুও খবর পেয়েছেন যে ওই হৃদয় চাটুয্যেই চাষী সাধারণ মানুষ খেতমজুরদের ওই আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছে। দিকে দিকে আওয়াজ ওঠে—নবনীবাবু জবাব দাও। ধাপ্পাবাজী চলবে না।

শুধু নবনীবাবুই নন, আশপাশের গ্রামের আরও কয়েকজন সঙ্গতিপন্ন জোতদারের বিরুদ্ধেও তাদের এই আক্রোশ ফেটে পড়েছে। এতদিন তারা মুখ বুজে সব অন্যায় সহ্য করে এসেছে, আজ তারা সহ্য করবে

না। মুরলীবাবুও বাবড়ে গেছে। তাকেও বাদ দেবে না তারা, চোখের উপর ক'বছরে মুরলীবাবু মাথা তুলেছে। তাই ওই মানুষ ক'টিও গোপনে যেন শপথ নিয়েছে ওদের এই আন্দোলনকে ধ্বসাতেই হবে। বাঁচা মরার এই সংগ্রামে তারাও জবাব দেবে।

রমা দেখেছে তার স্বামীকে। লোকটির মনে কোথায় কঠিন সেই সত্তাটা আবার জেগে উঠেছে কি শপথ নিয়ে! জীবনের শেষ প্রান্তে এসেই তার বিপ্লবী মন কি আলার বারুদের মত জ্বলে উঠেছে।

রমা বলে,—একি সর্বনাশা খেলা তোমার? নিজের সব দিয়েছো—তবুও থামবে না? কারোও জন্ত এতটুকুও তুমি ভাবো না?

হাসে হৃদয়,—আমার কেউ নেই রমা। শুধু আছে সত্য তার জন্ত আপোষহীন সংগ্রাম। সেখানে আর কিছুর ঠাঁই নেই।

ওরা তার জবাবও দিয়েছিল, কঠিন আঘাত হেনেছিল ওই হৃদয়কে। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ ওর বাড়িটা জ্বলে ওঠে, রমাকে বন্ধ করা ধোঁয়া—আর আগুনের ওই লেলিহান শিখার মধ্য থেকে রমাকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল হৃদয়! এতদিনের ঘর ওই খামারের সোনাধানের পালুই—ওই বাগান সবুজ প্রসাধি সব ওদের হিংসার আগুনে পুড়ছে: ছাই হয়ে গেল পুড়ে পুড়ে।

হৃদয় কঠিন একটি সত্তার মত দাঁড়িয়ে থাকে। লোকজনের কলরব ওঠে, ওরা আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। রমার চোখে জল, তবু হৃদয় টলেনি। ও জানতো এরও মূল্য দিতে হয়। তবু থামবে না সে।

খবর পেয়ে সুভো এসেছে। এখন সে মস্ত লোক। দেখেছে সুভো বাড়ির এই ধ্বংস স্তূপটাকে। সব কিছু পুড়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। ও বলে,—চলুন বাবা, এখানে থেকে কি হবে? সবই তো গেল।

হৃদয় চাটুয্যে মাথা নাড়ে,—তোমার মাকে নিয়ে যাও সুভো।

—আপনি। অবাক হয় সুভাষ।

—আমার যাওয়া হবে না সুভো। যেতে পারবো না। এখানে আমার অনেক কাজ রয়েছে।

সুভো কঠিন মানুষটির দিকে চেয়ে থাকে। বারবার সে শুধু আপোষহীন সংগ্রামই করেছে। তার জন্ত সর্বস্ব বিসর্জন দিতেও ওর দ্বিধা নেই।

শ্মশানের চিতাভস্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে কোন রুদ্র সন্ন্যাসী, দুচোখে ওর পিঙ্গল রুদ্র দৃষ্টি। হৃদয়ের সামনে আজ আবার সেই যৌবনের অগ্নিমন্ত্রের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, সেখানে শুধু সংগ্রাম। তার কেউ নেই, কিছু নেই। ওই সর্বহারাদের সেও একজন, তার আদর্শ আর সত্যের জন্ত সব ত্যাগ করে সে এগিয়ে যাবে।

—বাবা। সুভো ওকে ডাকছে।

হৃদয়ের কোন সাড়া নেই। বহু বৎসর আগে কোন রাত্রি নিশীথে নিজের রক্ত দিয়ে তিলক এঁকে যে হৃদয় চাটুয্যেকে সর্বহারার বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল, আজও সেই শপথের কথাই মনে পড়ে। কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে।

তারই প্রায়শ্চিত্ত করবে আজকের এই হাজারো মানুষের সঙ্গে অতীতের সেই হৃদয়হীন বিপ্লবী হৃদয় চাটুয্যে।

আজও সে বাধাহীন বন্ধনহীন একটি চিরমুক্ত বিপ্লবীই। তার জন্তে ঘরের আশায় নেই স্ত্রী পুত্র কেউ নেই। সে শুধু একা।

আশ্বিন লম্বা ঘাসের বন। জলের ধারে জন্মেছে তারা, ঝুঁয়ে নদীর জলে ছায়া রেখে নির্জন প্রান্তরকে হরিৎ শোভায় সজ্জিত করে দিয়েছে। উবড়ো-খেবড়ো পতিত জমি গঙ্গার তীরে। বাংলার প্রাণধরূপা জাহ্নবী বয়ে গেছে অদূরে কলধ্বনি তুলে। ঝোপ আছে, কাঁটা ঝোপ, মানুষ সমান। ওখানে মানুষের লুকিয়ে থাকা চলে। তীক্ষ্ণ ধারা বাতাস শীতের প্রথমে গায়ে দংশন করে, আবার বসন্তে চামর বুলোয়। পিছল কখনও তটভাগ, উঁচু-নীচু। সোজা চলতে পা হড়কে জলে পড়িবের ভিজে: ওঠে।

প্রান্তরে সবুজ ঘাসের ওপর বসেছিলাম আমি। যেমন অনেকে বসে গেছে, বসবেও। আকাশে নীল অপরাজিতার রং মেশা ধরার মনে। ঘোলাটে দাদা গঙ্গার জলের অপর তীরে ধোঁয়া। কলকারখানার চিমনীর ধোঁয়া। মন উদাস হয়ে ওঠে। হঠাৎ পার্থিব জগতের পারিপার্শ্বিক আর আনন্দ দেয় না। বন্ধন ছিন্ন করে মন পতাহুগতিকের।

অমনি উদাস হয়ে উঠবে আপনারও মন, যদি আপনি ওখানে একা অলস অপরাহ্নে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। পুরনো দিনে যারা এখানে এসেছিল, অথচ আমরা যাদের চিনি নাই, তাদের স্মৃতি কেন আকাশ বাতাস এনে ধরে দুহাতে ?

কেন উমনা করে দেয় ?

আমি এমনি প্রান্তরে বসেছিলাম। আবার উঠে জলের ধারে কাঁটা ঝোপের পাশে এগিয়ে গেলাম। পর্যটকের দৃষ্টি আমার।

ঘন ঘাসে ঢাকা ; শাদা, চকের মত শাদা কি একটা ? ওখানে ঘাস গজিয়েছে প্রচুর। নীচু হয়ে হাতে তুললাম।

করোটী ! একটা নরকঙ্কালের খুলি।

এখানে এল কেমন করে ? কতদিন পড়ে আছে না জানি ! কাঁটাঝোপের আড়ালে ঘন ঘাসের স্তূপে আত্মগোপন করে পড়ে আছে কতদিন কে জানে ?

মনে পড়ে গেল সংস্কৃত অমর শ্লোকটি :—

"ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে, অপরাধা কি ভবিষ্যতি ?"

এই নরকঙ্কালটিকে যদি প্রশ্ন করি সে উত্তর দেবে—

যেখানে সেখানে ভোজন করি ;
হাটের মধ্যে শয়ন করি ;
গঙ্গার তীরে সহজে মরি ;
আর কি এমন ঘটতে পারে ?

বেশ কথা ! কিন্তু ঘটতে অনেক কিছুই পারে, ঘটেও থাকে। তুমি অস্বীকার করলেও জানি আমরা। এই যে তার প্রমাণ।

হাতে তুলে নিলাম একটা রূপোর পদক। জলে মাটীতে আর রৌদ্রে নেই তার, সীসার অধম হয়ে গেছে। পদকটির ওপর এনামেলে এক মূর্তি খচিত।

নারীমূর্তি। তবে রং উঠে উঠে এমন হয়েছে যে সেটি দেবীমূর্তি কিম্বা মানবীমূর্তি বোঝা যায়।

হয়তো একটা সুতোয় গলায় থাকত, আংটা যখন রয়েছে। সুতো জীর্ণ হয়ে মৃত্তিকাসাৎ হয়ে গেছে, ধাতব বস্তু বলে পদকটি রক্ষা পেয়েছে।

তবে, জীবনের স্পন্দনবিহীন করোটী, তোমার একটা গল্প আছে। নৈর্ব্যক্তিক অস্থির খাঁচায় যে প্রাণ, সে ফেলে গেছে চিহ্ন তার এই লালে। সে জীবনে নিশ্চয় ইতিহাস রচনা করেছিল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্যের 'ডিজিমা কমেডিয়া' অবলম্বনে 'ছায়াময়ী' কাব্য লিখেছিলেন। কয়েকটি পংক্তি কানে ভেসে এল :—

১ম প্রেত। "চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।
২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল,
শ্মশানে দিয়েছে ফেলিয়া।"

রাজা বা রাখাল ? বেশ। জীবনে দুয়ের এক সকলেই হয়ে থাকে। কিন্তু হয় রাজা, নয় রাখাল—নয়, একসঙ্গে রাজা ও রাখাল, এমন লোক আছে কোথাও ?

আমি হাত রুমালে মুছে এগিয়ে বসলাম। হাতটা কেমন অশুচি মনে হ'ল। পদকটি ধোওয়া যায়নি, রূপোর হলেও।

সুতরাং হত্যা নয় লোভে। আত্মহত্যাও হতে পারে। দেবীমূর্তি হয়তো নয়, মানসীর প্রতিমূর্তি। তাকে বুকে করেই—

কিন্তু এই নির্জন জাহ্নবী তীরে এল কেন সে? এখানে আকাশ যে স্বপ্নভাবাতুর, বাতাস মাধুর্য এখানে হত্যা বা আত্মহত্যা কোনটাই মানায় না।

যে করোটী বা কঙ্কাল আজ, সে মানুষ ছিল। তার একটা গল্প আছে।

আমি কি করে জানব সেই কাহিনী?

আমি সাহিত্যিক, আমার ভয় নেই। ধ্যানে কল্পনার তৃতীয় নয়ন আমি উন্মীলন করলাম। অমনি পটচিত্রের মত খুলে গেল থাকে থাকে ছবি।

একটা একটা করে ছবি খুলছি। একের পর এক, যেন এক কোম্পানি খুলে ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর পর্যটককে দেশ চেনাচ্ছি।

একটা ছোট ঘরে প্রথম দেখা পেলাম। লোকজনের ভিড় ঠেলে প্রধান অট্টালিকার পেছনের সুঁড়ি পথ ধরে চলে গেলাম। আরো অন্ধকারে কত হড়িদড়া, তক্তা, ক্যানভাস্।

হোঁচট খেয়ে ঠেলে এলাম দরজায়।

ভেতরে বাইরের অস্পষ্ট আলোকে পরিহাস করে উগ্র-তীব্র একাধিক আলো।

উজ্জ্বল দর্পণের তিন দিকে তিন উগ্র বিজলীবাতি। চেয়ারে বিরক্ত ভাবে অনুপম রূপবান একব্যক্তি আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন আয়নার অতি কাছে নিজের মুখ ধরে।

যা দেখছেন তাতে তিনি যে সন্তুষ্ট নন টানা চোখের কুঞ্চনে, বয়ঃপক্ষ ভ্রূভঙ্গে পরিলক্ষিত।

কাছে অপরাধী ভাবে দণ্ডায়মান দু'জন। একজনের হাতে রংতুলী, পোষাকে রঙের ছটা, অন্যের হাতে তোয়ালে। অপরাধী ভাবে তারা সবিনয়ে অপেক্ষা করছে। পুরুষ গর্জন করে উঠলেন, "এই পৃথ্বীরাজের মেকাপ্ হয়েছে? যে কোনও একখানা মুখ আমার মুখে বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল, না?"

ছোকরা মুখ কাচু করে সভয়ে বলল, "সময় হয়ে গেছে।" হাকিম ধমক দিলেন, "যা যা বলগে এখন পর্দা উঠবে না। আমার সাজ হয়নি।'

ছোকরা পালিয়ে বাঁচল।

পুরুষের নিজস্ব চাকর এক কাপ গরম কোকো নিয়ে এল সযত্নে একটা পুরনো জাঁকধরা রূপোর ছোট ট্রের ওপর বসিয়ে। ওঁর ব্যবহারের বাসনপত্র সব আসে বাড়ী থেকে।

কোকোর পেছনে কম্পিতকলেবর ষ্টেজম্যানেজার।

"স্যার, সময় হয়ে গেছে। অডিয়েন্স অধির হয়ে উঠছে।"

"তা কি করা যাবে? অপরার্ধের দল পুরনে এমনি হয়। আমার চেহারা বুড়োর চেহারা করে দিয়েছে। পৃথ্বীরাজ কি বুড়ো ছিল না কি? আসের যে লোকটি মেকাপ্ দিত, তাকে খবর দেবেন। আমি পৃথ্বীরাজ আগে করেছি, এখনই প্রথম করছি না।"

পেন্টার ও সহকারী পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দুই বৎসর পরে এ থিয়েটারে 'পৃথ্বীরাজ' নাটক নেমেছে। নূতন এলেও জানে তারা। তখন এই অভিনেতা পৃথ্বীরাজের রূপসজ্জায় নিজের যে প্রতিবিম্ব দেখতেন, এখন সেটা যে সম্ভব নয়, কে বলতে যাবে?

অসংযত জীবনে দুই বছর পাঁচ বছরের সমান। ষ্টেজ ম্যানেজারের পেছনে এবার এলেন খোদ ম্যানেজার, "পোনেরো মিনিট হয়ে গেছে। আমার থিয়েটারে এমন হয় না কখনও।"

ম্যানেজারের অমন গম্ভীর স্বরের উত্তরে কেউ কথা বলল না।

"কি ব্যাপার?" এবার তিনি ষ্টেজম্যানেজারকে প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে, সুরের মেকাপ্ পছন্দ হচ্ছেনা।" সবিনয়ে ষ্টেজম্যানেজার জানালেন।

"অ!" ধূর্ত দৃষ্টি মেলে বয়স্কাত ম্যানেজার চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ওধারে ওঁরাও এসে গেছেন—তানদিকের বক্সে।"

এবার পুরুষটির কঠিনতায় চিড় ধরল, তিনি নর্ত্তকীকে বকে দিলেন, "দাঁড়িয়ে দেখছ কি চাঁদ? এগিয়ে এসে হাত লাগাও। চোখের কোন দুটো আরও টেনে দাও। ঠোঁটের কোন দুটোর লাইন ওপর দিকে তোল। ধূতনীর এধারে একটা তিল আঁকো। কই, মুক্তোর মালা কই?"

সশব্যস্ত হয়ে উঠল সকলে মুহূর্ত্তে।

টানাটানি ধাঁধাধাঁধির পর, তরবারী বাঁধা, মুকুটপরা, চোখ ঝলমলানো পোষাকে তিনি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হলেন তখন দর্শক বিলম্ব বিরক্তি ভুলে গেল।

তানদিকের জনবহুল বক্সের দিকে একবার চেয়ে তিনি উদাস প্রেমিক কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

সংযুক্তা! সংযুক্তা!
সেই এক নাম শুনি পবনপ্রবাহে,
সেই এক নাম আঁকা নীলিম আকাশে,
তরুগুল্ম মর্ম্মরিত এক মধু নাম,
বাহিরে কি আর কব?
হৃদয়ে আমার,
শুনি কান পেতে আর আবেশে শিহরি,—
সংযুক্তা! সংযুক্তা!
—তুমি মুক্ত চিত্তে এই।

শুভ্র হস্তের উত্থান-পতন, দুর্লভ গম্ভীর মধুর স্বরনিয়ন্ত্রণ। পুরাণের সেই বীর অথচ প্রেমিক রাজাকে রক্ত মাংসে চোখের উপর দেখে মুগ্ধ দর্শক করতালির অভিনন্দন জানাল। হ্যাঁ, ইনিই বিখ্যাত মহাভিনেতা মৃগাঙ্ক দত্ত। তানদিকের বক্সে মন দৃষ্টিক্ষেপ অভিনেতার। ইহাদেরই জমিদার-পরিবার এসেছেন। ছেলেটি বন্ধু, বাড়ীতেও মৃগাঙ্ক যান মধ্যে মধ্যে। ওঁর অভিনয় থাকলেই ওঁরা আসেন দেখতে। কখনও একাধিক বারও এক নাটক দেখে যান।

দৃষ্টি কিন্তু বন্ধুর দিকে নয়। পাশে বসা উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীটির প্রতি। বন্ধুর অনূঢ়া ভগ্নি ঊর্ম্মিমালা।

যৌবন, প্রেম ও বীরত্বের অভিনয়ে ষ্টেজ কাঁপিয়ে দিলেন মৃগাঙ্ক।

দামী স্নোপাউডার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল উইংসের ধারে। ঝোকো ঠাণ্ডা হচ্ছে। উত্তেজনায় অথবা ঘেরীর বেতু খেয়ে গেলেন না বাবু।

এর পরে চাইছি নিয়ে আবার ডাকে দাঁড়াতে হবে। এক একটা ঘুমের পরে এক একটা ছিপ।

কিন্তু দাগ যে ধরে গেছে।

শুধু রূপোর পাত্রে নয়।

বয়স-লাঞ্ছিত কালো কেশে লেগেছে শমনের ধাবা, ভ্রূভঙ্গের পাশে কুঞ্চন, দাঁত নকল, একটা একটা করে।

আনে শুধু সন্ধ্যাকার, আনে শুধু রূপকার।

ভদ্রলোককে এখন রূপের প্রশংসায় খুশী করা চলে না, শুনে শুনে তিনি অভ্যস্ত।

এখন বলতে হয়, "বাঃ, আপনাকে কি ইয়াং দেখাচ্ছে। পঁচিশ বছরের ছেলেও আপনার মত তরুণ নয়। আপনি স্যর, মেকাপ্ দিয়ে দাঁড়ালে ওরা একদম মিছে যায়। ছোঃ! দাতখানা নাড়তে দেখেনি।" কিন্তু—

"ছেহপট সনে নট
সকলি হারায়—"

সেই একই থিয়েটারের ড্রেসিংরুম।

সেই ঘরটি নয় অবশ্য। আলো এখানে স্তিমিত, আলখাব পত্র পুরনো, ঘর। এখানকার আয়না ছোট।

সেই একই মুখ এখানে কয়েক বছর পরে।

সেই অসন্তুষ্ট দৃষ্টি, অতৃপ্ত ভাব! কিন্তু আজ তিনি একা। কেউ নেই চারপাশে তোয়াজের জন্য।

"মহেশ, মহেশ, বিধু, বিধু!" ডাক চড়ালেন ব্যক্তি।

অনেক ডাকাডাকির পরে একজন অনিচ্ছুক ছোকরা ভৃত্য দেখা দিল।

"অনাদিকে ডাক না। আমায় না ব'লেই চলে গেল কোথায়?"

"ধীরেনবাবুর ওখানে গেছে।" অবহেলায় উত্তর।

"ওঃ," হঠাৎ মিইয়ে গেলেন ব্যক্তিটি, "ওঁর তো নিজের গেস্টার, আছে।"

"ঠিকমত পারছে না। তাই সবাই গেছে।"

ধীরেন মিত্র নবাগত নায়ক। তরুণ যৌবনের দাবণ্যে নূতন নায়ক আবার দর্শকমনের পুতুলি।

মোটা ভারী আওয়াজ চলে গেল মৃগাঙ্কের ঘরের সম্মুখ দিয়ে ওপাশের ঘরে। ম্যানেজারের পায়চারিতে। আগে কারণে অকারণে এই ঘুরতো ঘামত মৃগাঙ্কের চৌকাঠে। এখন পাশ করে চলে যায়, আসে।

মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলেন। ম্যানেজার অংশীদারও বটে, অন্য অংশীদারও তাঁর নখদর্পণে ধৃত। একটু দেরী তো হলই। কিন্তু ধীরেনের যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

বাইরে এসেই ম্যানেজারের মুখোমুখী। নায়কের ঘর থেকে আপ্যায়ণ সেরে আসছেন উনি তাকে তাগিদ দিয়ে। এককালে যা মৃগাঙ্কের জন্য করা হ'ত।

"তুমিও দেরী করছো হরদা! পুরনো লোক। নায়কের এক আধটু সময় লাগেই। কিন্তু তোমার?"

মাথা নাড়িয়ে মৃগাঙ্ক বললেন, "অনাদি আমার ঘরের কাজ না সেরেই চলে গেল ধীরেনের ঘরে।"

অভিযোগের ঘর, কিন্তু পূর্বের কণ্ঠমাধুর্যবিহীন ঘরে ম্যানেজারের মত, তেজ নেই।

ম্যানেজার একান্ত দীনমূর্তি এই অভিনেতার দিকে চেয়ে বিস্ময়ের বললেন, "তোমার তো হয়েই

পেছে। দরাজের ভূমিকায় আর কি সাজ দেবে? অনাদি বলছিল, ক্রমেই তোমাকে মেকাপ দেওয়া শক্ত হয়ে উঠছে। তুমি পুরোপুরি বুড়োর মেকাপ, নিতে চাওনা।"

"সে কি? এই তো দেখুন। তবে দরাজ এতবুড়ো না হলেও চলে। আমার রাসবিহারী পার্টি থেকে একদম ছাড়িয়ে দরাজ দিলেন!"

"গতবছর তুমি রাসবিহারী করেছ। বিজয়া বলছে যে ওর তোমার সঙ্গে বেশীক্ষণ অভিনয় করতে অসুবিধা হয়। তুমি বড় পুরনো ঘাঁচে চালাও।"

"কি আশ্চর্য," যে মেয়েকে এককালে তিনি, মৃণাল দত্ত অনুকম্পা করে ছোটখাটো পার্টে কখনও বা একত্রে অভিনয়ে এক-আধ মিনিট বেশিয়েছেন চেয়ে, সে আজ তাঁকে শেখাচ্ছে অভিনয়! স্পর্ধা কি!

এবার সাহেবী পোষাক পরা নায়ক নরেন্দ্র রায় ঢুকল।

তৎক্ষণাৎ ম্যানেজার এগিয়ে গেলেন।

পা চালিয়ে সঙ্গ নিয়ে মৃণাল আবেদন জানালেন, "বিজয়ায়' ভালো রোল্ পেলাম না। শরৎচন্দ্রের পরের বইখানায় যেন পাই।"

"পরের বই 'পল্লীসমাজ' নামাব। এতেই হতভদ্বা এত অধৈর্য্য হচ্ছ, শেষপর্য্যন্ত সেখানে ধর্মদাসের ভূমিকা পেলে ভাগ্য মানবে।"

"সে কি?" হতবাক মৃণাল। এমন কথা মাত্র কয়েকবছর আগের বিখ্যাত নায়ক মৃণাল দত্তকে কে বলতে পারে?

পরিহাস নয় তো?

কিন্তু ম্যানেজারের কুমীরের মত মুখে ভোবা-ভোবা চোখ দুটোয় হিংস্র ঝিলিক। এ মায়া মমতা জানেনা, যার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তাকেই সরিয়ে দেয়। নিজের পথ কাটতে ব্যস্ত কুমীর অন্যের দুর্বলতায় অসহিষ্ণু। একটু যেন মুখের কয়েকটা রেখা নরম হল ম্যানেজারের। বললেন, "এ হচ্ছে শো বিজনেস্, এটা চালাতে হলে যা দর্শক চায় তাই আমাকে দিতেই হবে। দত্তজা, বহুদিন নায়ক ছিলে। এতদিনে গুছিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।"

তিনি তারী পদক্ষেপ তুলে হতভাগ্য পতিত অভিনেতাকে ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

গুছিয়ে নেওয়া! এক দুরন্ত স্বর্ণ-যুগ তাঁকে প্রলোভন ও দুরাশায় মন অরণ্যে ছুটিয়ে মেরেছে। মন স্থির করে সংসার বাঁধতে পারেননি। একের পর এক মৃগনয়না ইঙ্গিতে আশা জাগিয়ে অবশেষে বড় চাকুরের গলায় মালা দিয়েছে। রঙ্গমঞ্চের পেশাদার অভিনেতাকে তারা চায়নি, শুধু যেটুকু মুখোস মুখে আঁটা থাকত, রাজবেশের যেটুকু মায়কতা, তারা তাই ভালবেসেছে।

ইহাহাটীর কিশোরীর পশ্চাতে পুরী-দার্জিলিং ছুটে মরেছেন সর্বস্ব ক্ষয় করা অনুসরণে। কিন্তু অভিভাবকেরা সন্ধাহান হয়ে তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়ে দিলেন। সমান ঘরের অধিকার তনয়, সদ্য ব্যারিষ্টার।

বন্ধুকে বলে কল হয়নি। সে ভিত কেটে বলেছিল, "ছিঃ, একথা মুখেও এনোনা। আমাদের কত বড় ঘর। তোমাকে আমরা ভালবাসি বলে তো আর জামাই করা চলেনা। তাছাড়া আমার বোন তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এমন ভাব তোমার মনে আসাও উচিত নয়।"

অভিনেতা এক প্রহরের রাজা হলেও জীবনে সে রাখাল ভিন্ন কেউ নয়। অভিনেতাকে ভালবাসা যায়, কল মুহূর্তে প্রদর্শনে বাধা নেই। কিন্তু সমকক্ষ সে নয় কখনও।

বুকে সুতোয় কোলানো রঙীন তারা মূর্তি। রঙার হলেও অপরূপা মীনার মনোজ্ঞ। এনে দিয়েছিল হাতে গোপনে ইছাচারীর অধিবাসকন্যা দেশভ্রমণ থেকে। "দেখবেন এর কত পর। আপনার আরো, আরো নাম হবে। আপনি আরও, আরও সুন্দর হবেন।"

কপোলে রক্তোচ্ছ্বাসে বিব্রত লাবণ্যময়ী কিশোরী মূর্তি এখনও মনে গাঁথা। হয়তো অপরিণত বয়সের অপরিণামদর্শী মোহে সে তাদও দেখেছিল রক্তের রাজপুত্রকে।

কিন্তু পরিণাম নিরাশা।

কতদিন আগে! কালো অন্ধকারে কাঁপা গলায় সে মূর্তি দুলিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন একদিন মূর্তিদাত্রীও সেখানে মালা পরাবে। আশা তখনও তীব্র।

সেদিন অজস্র করতালি পড়েছিল। প্রতাপের ভূমিকায় বঙ্কিমের প্রতাপ রূপমকে নেমে এসেছিল। আর খোলেননি মূর্তি আঁকা পদকটা। ওঁর মাস্কট্।

কিছুই করতে পারলেনা জীবনে। দাগধরা রূপোর পাত্র পোড়াতের সিন্ধুকে। পুরনো ভৃত্যটি অন্নাজীর্ণ দেহে কোনমতে ডাল-ভাত নামিয়ে দেয়। সামান্য বেতনে চলেনা। অথচ খরচ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

অনাহারে, অনটনে, দুশ্চিন্তায় জরাজীর্ণ দেহ, প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্তি পায়নি, অথচ যৌবনের ছিপ্‌ছিপে ভাবের সুষমা হারিয়েছে।

আজো উইংসের পাশে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ দয়াল।

ম্যানেজারের টেবলে ঠক্ করে চায়ের কাপ নামিয়ে বিয়েটারের কর্মচর বলল, "মৃগাঙ্ক বাবু দেখা করতে চান।"

ভ্রূকুঞ্চিত করলেন সুধীর, "দাঁড়া, চা-টা খেয়ে নেই। তারপর নিয়ে আসিস।"

মৃগাঙ্ক দেখা পেলেন। পাসবোর্ড দিয়ে তাঁকে ছোট পাস করে 'No Admittance' লেখা ম্যানেজারের ঘরে ঢোকাল। "বসুন, ভদ্রতা। তারপর কেমন আছ?"

ক্ষীণ কণ্ঠে (হায়, তাঁর একদা মিটোল কণ্ঠস্বর!) বললেন মৃগাঙ্ক, "একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। দু'মাস হয়ে গেল। একটা ছোট পার্টও পেলাম না।"

মুচকিলে ফেললে ভদ্রতা। এত রোজগার করলে, সব উড়িয়ে দিলে! আমি কি করতে পারি? নট নড়ন চেহারায় বসে থাকা উচিত। কোন পার্টেই এখন মানায় না।"

মৃগাঙ্কের কালো রাগে ভর্তি চড়ানো গাল যেন, ঈষৎ রক্তের জোয়ারে উজ্জ্বল হয়ে উঠল (হায়, তাঁর একদা অনুপম রূপময় দেহসৌষ্ঠব!)। আবার একদম পাংশু।

"একটু বয় করলেই আবার"—চুপ করলেন তিনি।

ম্যানেজার বলেন, "আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।"

"দুদিন বাদে খবর নিও।"

প্যাকেটাদের পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে গেলেন। সাট হাতে প্রম্পটার ঢুকছিল। নমস্কার জানাল।

মাথা একটু উঁচু করে বা'র হ'লেন মৃগাঙ্ক।

ম্যানেজার প্রোডিউসার—ডিরেক্টরকে ডাকালেন।

"মৃগাঙ্ক দত্তকে একটা পার্ট দিন।"

"সব পার্ট বিলি হয়ে গেল যে।"

"আহা, ওসব পার্ট নয়। সন্ন্যাসী যদি থাকে, জনতার দৃশ্যে, বা ভিখিরি।"

"ভিখিরি" শিউরে উঠলেন ডিরেক্টর। মৃগাঙ্ক দত্তের অনেক ভূমিকা তিনি দেখেছেন কিনা পূর্ব্বে।

"আহা, ভিখিরি কি আর? ওই ধরণের যা হয়। দু'চার টাকা যা পায়। বে-থা করলেনা, বেলেল্লাগিরি করে সব উড়িয়ে এখন অচল অবস্থা। আমার মত হাল হয়েছে। হুঁ!"

মৃগাঙ্ক থিয়েটার থেকে বাড়ী ফিরলেন না সোজা। বেলেঘাটার গলিতে মাতঙ্গিনী দাসীর বাড়ী গেলেন।

মাতঙ্গিনী ওরফে মতঙ্গ থিয়েটারে নথীর পার্ট করত ও নাচত। মোটাসোটা শ্রীযুক্ত চেহারা। সামান্য মাইনের চলত না, বাবু ছিল তার। সেদিক থেকে বুদ্ধিমতী বলা যায়।

থিয়েটারের কাজ গেলেও মতঙ্গ পতঙ্গের মত অগ্নিদাহে প্রাণ দিল না। বরঞ্চ তার পতঙ্গ গোলাধারবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁধা রাখল তাকে। মায়া পড়ে গেছে তখন।

টানের ঘর করে দিল বাবু, সামনে দুখানি ভাড়ার দোকানঘর। কখনও বাবুর মাসমাইনে বন্ধ হ'লেও অচল হবে না।

মতঙ্গের রান্নাঘরের সম্মুখে টুল পেতে বসলেন মৃগাঙ্ক। আগে এ সময় স্থানে পদার্পণ তিনি করতেন না। কিন্তু সম্প্রতি নেমে এসেছেন। একবার মতঙ্গ এক প্রাচ্যমান্ যাত্রাদলে কয়েকদিনের কাজও জুটিয়ে দিয়েছিল।

ক্লান্ত দেহ। বিকালে এক কাপ চা জোটেনি। আশা ছিল ম্যানেজার এক কাপ চা খাওয়াবেন। তা-ও হল না। পকেটে একটি পয়সা নেই। পায়ে হেঁটে পদাতিক সৈন্যের মত তিনি সংগ্রাম করছেন।

"দত্তবাবুর চ্যাহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। চা খাবেন?" মতঙ্গ সাগ্রহে প্রশ্ন করল। এককালে ছকের সব মেয়ের মত সে দত্তবাবুকে প্রাণ সমর্পণ করেছিল। তখন দত্তবাবু বড্ড গুমোরে ছিলেন। তাদের দিকে ফিরেও দেখেননি।

প্রথম যেদিন এ বাড়ী এলেন দত্তবাবু মতঙ্গ অবাক। এখন সয়ে গেছে তার। পূর্ব্বের সে দত্তবাবু এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মধ্যে হারিয়ে গেলেও মতঙ্গ এক ঐতিহ্য আশ্রয় করে এঁকে আদরযত্ন করে। রঙ্গমঞ্চের অধিতীয় সেই অসামান্য নায়ক মৃগাঙ্ক দত্তকে সে ভোলে কেমন করে?

এক কাপ চা হাতে এল। আগে এ চা স্পর্শ করার কথা মৃগাঙ্ক ভাবতে পারতেন না। আজ যেন বন্ধুর স্নেহে চা-কাপটি হাতে পেলেন।

উষ্ণ চায়ের চুমুকে বিস্বাদ, কেমন একটা গন্ধ! তবু তো চা। দেহের নির্জীব রক্তকণায় প্রাণ এনে দেয়।

মৃগাঙ্ক তাকিয়ে মতঙ্গের রান্নার আয়োজন দেখলেন। আজ শনিবার। বাবু রাত্রে মোচ্ছব খাওয়াবে। আয়োজন সুপ্রচুর। থালা ভর্ত্তি কোটা কাঁকড়া, হাড়ার বেগাতি নিয়ে। উনুনে বড় বড় হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে।

তাঁর বাড়ীতে নৈশাহারে কি অপেক্ষা করছে? ভাত, ফিকে ডাল, দু'টুকরো আলুর চচ্চড়ি। অথচ বৃদ্ধের দোষ কি? রান্নার উপকরণ কোথায়?

চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠল। কতদিন, পেট ভরে এমন সব সুখাদ্য খাননি উনি?

মতঙ্গ দু'একবার মৃগাঙ্কের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, "একটু ডিমের ঝোল চেখে দেখুন না, দত্তবাবু। আমার হাতের রান্না। এটা নামিয়ে কাঁকড়া চাপাব, সেটাও হয়ে যাবে।"

লাজলজ্জা, ঘিরা বিসর্জন দিয়ে তরসেট সুখাদ্য বহুদিন পরে খেলেন মৃগাঙ্ক সেদিন। আগে মতঙ্গের বাড়ী বসে খাবার কথা কল্পনায়ও আনতে পারতেন না। তাঁর রূপমুগ্ধ এক শতঙ্গ মতঙ্গ এলা যেমনেই তিনি খুসী থাকতেন। এমন অনেক ছিল। কিন্তু উঁচু ডালে হাত বাড়িয়েছিলেন মৃগাঙ্ক।

"বৃথা সে দুরাশাযোহ মরীচিকাছল,
বঞ্চিত যাহার আশে মনুজসকল।"

বেরিয়ে যাবার মুখে কি মনে হল মনের কথাটি মতঙ্গের কানে দিলেন, "যদি তোমার রান্না পেট ভরে খেতে পারতাম, মতঙ্গ, তাহলে হয়তো শরীর ফিরত।"

নগণ্য রূপোপজীবিনীর চোখে আলো জ্বলে উঠল, সেই প্রথম যুগের আলো। যখন সে লাবণ্যময়ী যুবতী রূপে আধো আধো গলায় বলত, "বুঝে, আমাদের রাই মান করেছে গো। শ্যামকে ডেকে আন।"

চাপা গলায় প্রৌঢ়া বৃদ্ধকে বলল, "যদি তখন পায়ে ঠাঁই দিতেন, তবে সারা জীবন কত রান্না করেই খাওয়াতাম!"

এ কথায় মৃগাঙ্কের গা জ্বলে উঠল না, স্পর্ধা মনে হল না এখন। গলায় ঝুলোনো রূপোর পদক শুধু ধাতুখণ্ড, আর তাতে প্রাণ নেই। একদিন জামার উপর দিয়ে বুকে হাত রেখে অনুভব করতেন এক সুদুর্লভা নিজের হাতে এনেছে উপহার কল্যাণকামনা সহ। অন্য সুলভারা তার কাছে অস্পৃশ্য। বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হত দেহে পদকের অনুভবে।

আর আজ? মাসকাই বা ভাগ্য প্রতীক ভাগ্য হারিয়েছে। মতঙ্গের বাঁধা বাবুর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে মিটমিটে গ্যাসের আলোয় পথ চলতে লাগলেন মৃগাঙ্ক। এ রাস্তায় বিজলী নেই।

জীবনে প্রথম নির্বুদ্ধিতার জন্য আপশোষ জমাল।

রাজার ভূমিকায় অভিনয়ে নামলেও তিনি রাখাল বই নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পরে অবশ্য অভিজাত সমাজে বিচরণের আশায় ও প্রয়োজনে কিছু লেখাপড়া ও ইংরেজি রপ্ত করেছিলেন।

অভিনেতা তিনি, তাঁর আত্মায় এখানেই ছিল। ভুল করে তিনি ছিটকে গিয়েছিলেন এমন সমাজে, যারা তাঁর সঙ্গে মিশে সম্পর্কে লোককে জানান দেয়, কিন্তু তাঁকে অস্পৃশ্য হিসাবে দেখে।

মৃগাঙ্ক মতঙ্গের এখানে আসাই উচিত ছিল। অভিনেতা তিনি, কিন্তু অভিনয়ের গণ্ডিসীমানার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে চাননি। আলেয়ার ডাকে নিজের স্থানচ্যুত হয়েছিলেন।

মতঙ্গকে গ্রহণ করলে কি নিরাপদ নিশ্চিন্ত দিনযাত্রা বয়ে চলত! ভিখারী শিবের মত অন্নপূর্ণার দ্বারে তিনি অন্নভিক্ষা করে আরামে দিন কাটাতেন। তাঁর রক্ত ছিল বিশুদ্ধ, মাতঙ্গিনীর রক্ত অশুদ্ধ। কি আসে যায়? অভিনেতার আবার পাপপুণ্য আছে না কি! একমাত্র অভিনয়ই ধর্ম, মঞ্চাভিনেত্রী বাস্তব সত্য!

দিন কিছু চলে না, চলে না।

যে নাটক করে, তার জীবননাট্যও নটরাজের সুদক্ষিণ দৃষ্টিপ্রসাদ-বঞ্চিত হতে পারে।

ছোটখাটো পার্টও মেলে না। থিয়েটারের নবনায়ক বীরেন নায়িকার সখী মেয়েটিকে নিয়ে উধাও। নাটক বন্ধ হয়ে গেল।

অন্যান্য থিয়েটারেও সুবিধা হয় না। এক-আধটা পার্ট কদাচিৎ পাওয়া যায়। যাত্রার দলও চায় সতেজ লোক, চেঁচিয়ে যে আসর মাতাবে।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে মৃগাঙ্কের। কেউ নিতে চায় না।

দু'খানি ঘর ছেড়ে একটি ঘর, বুড়ো চাকর কাঁদতে কাঁদতে ছেলের বাড়ী চলে গেল।

হোটেলে আলু ভাতে-ভাত, তা-ও জোটে না।

মতন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে। এ হেন দুর্দিনেও সে বিমুখ নয়। তবে তারও আয় কমেছে। বাঁধা বাবুর আয় কমায় টাকা কম দিচ্ছে সে। দোকান দুটো ছিল, তাই চলছে।

যাওয়া মাত্র চা মেলে, যা থাকে খেতেও দেয় সযত্নে। তবে বাঁধাবাবুর চোখে বেশী কিছু না পড়ে, সেজন্যও চিন্তা আছে মতন্তের। সে তো স্বাধীন নয়।

আজ ঘুরতে ঘুরতে এসে বারান্দায় বসেছেন মৃগাঙ্ক। হাতের কাজ ফেলে মতন্ত চা আর দুখানা বিস্কিট ধরে দেয়।

"আজ বোধহয় খাওয়া হয়নি?" বেলা তখন চারটে বাজে।

"না, রাঁধবার সময় পাইনি। এ চেহারায় অভিনয় লাইন আর হবে না জানি। তাই অফিসপাড়ায় ছুটে বেড়াই আজকাল। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ না শুনে কেউ কথাই বলে না।"

মতন্ত ততক্ষণ রুটীর আটা মেখে বেলতে বসে গেছে।

ধুঁধুলের ছেঁচকী সহ রুটি খেয়ে প্রাণ পেলেন মৃগাঙ্ক।

"মতন্তবাবু, আপনাকে আর চেনা যায় না। সেই আপনি আর এই আপনি!"

বিষাদের হাসি হেসে মৃগাঙ্ক বল্লেন, "আমিই নিজেকে চিনতে পারিনে, তুমি চিনবে কেমন করে?"

"একটা কাজ দেখে নিন। অত নামডাক ছিল আপনার।"

একখানা কমেডির দু'টো লাইন উদ্ধৃত করলেন মৃগাঙ্ক তখন, সে নাটকে মতন্তও ছিল।

ন্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াটাকে
বল সখি, কিনবে কে?

মতন্তের চোখে জল এল। আঁচলে চোখ মুছে সে আস্তে আস্তে বলল, "ঘরটা ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আসুন। আমার দোকানঘরের মেজেয় শোবেন। অবিশ্যি বাবুর মত একবার নিতে হবে।"

"কিন্তু খাব কি? না খেয়ে মরে গেলেও তোমার ওপর বসে খাব না। তুমিই বা পারবে কেমন করে?"

"সে কথাও ভেবেছি। এতদিন সাহস করে আপনাকে বলিনি, আপনার যোগ্য কাজ নয় বলে। ছোট কাজ।"

"বলো, বলো", রুদ্ধশ্বাস মৃগাঙ্ক। তিলমাত্র দেরী সয়না আর।

"পাশের ঘরটা আমাদের ছেলে-ছোকরার ক্লাব হয়েছে। ওরা পোষ্টার লিখবার, রেওয়াজে মারাবার মত লোক খুঁজছে। একটু লেখাপড়াজানা আর হাতের লেখা ভালো হলেই হয়। তবে খাটুনীর কাজ। রোজে রোজে ঘোরা। এই দেহ নিয়ে—"

তরুণ যুবকের মত লাফিয়ে উঠলেন মৃগাঙ্ক, "খুব পারবো। বলেছিলাম, তোমার রান্না খেলেই আমি আবার আগের মত হয়ে যাব। মাইনে কত? কোন কাজই ছোট নয়।"

আপনার যোগ্য নয়, মাত্র পঞ্চাশ দেবে এখন। পরে বাড়িয়ে দেবে কাজকর্ম দেখে। আমি থিয়েটারে কাজ করেছি শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, পেন্টার বা পোষ্টার লেখার লোক আছে না কি।"

একবার মনটা দমে গেল মৃগাঙ্কের বেতনের বহর শুনে। কিন্তু পঞ্চাশটা টাকাই তাঁকে দিচ্ছে কে? পঞ্চাশটা টাকা মানে কড়কড়ে পাঁচখানা দশটাকার নোট। মাসের প্রথমে হাতে আসবে। তাছাড়া ঘরভাড়া পনেরো টাকাও বেঁচে যাবে।

আমি খুব রাজী। যে টাকা পাবো তোমাকে ধরে দেব। তুমি শুধু পেট ভরে খেতে দিও। এখুনি ওদের কাছে নিয়ে চলো। কিন্তু—দ্বিধা এল, "তোমার বাবু আমাকে থাকতে দিতে রাজী হবেন তো?"

বিলোল কটাক্ষের ঢেউ তুলে মতঙ্গ বলল, "সে ভার আমার। আপনি ভদ্রলোক, বিপদে পড়েছেন। কেউ নেই আপনার। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন। বাবুর মনে দয়া খুব। আজ ওরা চলে গেছে কাল আসবেন। নিয়ে যাবো।"

রাস্তায় চলতে চলতে সেদিন মৃগাঙ্ক প্রকাশ্যে দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করলেন।

ঘরভাড়া তিনমাস বাকী পড়েছে। খাওয়া বন্ধ প্রায়। এ হেন সময়ে আশ্রয়, আহার্য্য দুইই হাতের ওপর এনে দিলেন ঠাকুর।

মতঙ্গের মত বন্ধু কে আছে?

অথচ একদিন একেই অবজ্ঞা করেছিলেন তিনি!

ঈশ্বর, তুমি আছো।

কিন্তু ঈশ্বর, তুমি নির্দয়। তোমার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ কখনও মানুষকে দেও না তুমি। আভাসেও তাকে ইঙ্গিত দাওনা যে অন্বেষণের শেষপ্রান্তে তুমি থাকবে। মানুষ কেমন করে আশ্বাস পাবে।

সিগারেটের ধোঁয়ার ঘন্য থেকে কয়েক জোড়া চোখ চেয়ে দেখল মৃগাঙ্ক মতঙ্গকে।

তাঁর নাম এরা শুনেছে কেউ কেউ।

"এমন অবস্থায় পড়লেন কি করে? আপনাদের নিজস্ব কোনও মিড্, নেই, ইউনিয়ন নেই, তাই এমন দশা হয় আপনাদের।"

বিজ্ঞ ভাবে পুরুচশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে বলল এক তরুণ।

"কিন্তু আপনার পক্ষে কাজটা উপযোগী নয়। আমরা একটু কম বয়সের লোক খুঁজছি।" আর একজন নিরাপক্ষ—নির্দয় ভাবে বলল।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মৃগাঙ্ক। যশোর হাটে তিনি বাতিল, কিন্তু এখানেও তাই? পোষ্টার লেখা, হেওয়ালে লাগানোর কাজেও কি অচল?

অবশেষে মৃগাঙ্কের ইতিহাস শুনে, মতঙ্গ ও মৃগাঙ্কের সমবেত চেষ্টায় ছেলেরা কাজটি ওঁকে দিতে সম্মত হয়ে গেল। চশমাধারী বিজ্ঞ তরুণ বলল, "আমরা পলিটিক্স্ করতে এসেছি। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি সংযুক্ত। মানুষের হিতের ইচ্ছা আমাদের মনে। এখন এঁকে এই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। পরে আমরাই এঁর উপযুক্ত কাজ খুঁজে এঁর পুনর্বাসন করাব।"

মৃগাঙ্ক কৃতার্থ হয়ে গেলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি কথাগুলো তিনি শুনেছেন, পত্রিকায় পড়েছেন কিন্তু মাথা ঘামান নি। অভিনেতার নীতি ভিন্ন। বৃহত্তর মানব সমাজের চেয়ে পিট গ্যালারি, বক্সের, বাল্‌কনির লোকগুলো তাঁর অনেক প্রয়োজনীয়। তাদেরি না চাওয়ার মাঝখানে তিনি মেপে এখানে এসেছেন।

প্রোসেনিয়ামের বাইরে যে জগৎ প্রেক্ষাগৃহে শুরু হয়, সেটাই তাঁর জগৎ। গ্রীণ ড্রাপারি উঠে গেলেই তিনি সেই জগতের সঙ্গে সংযুক্ত।

বৃহত্তর, মহত্তর জগৎ তাঁর বিষয় চিন্তা করতে পারে, এহেন, তথ্যের পরিচয়ে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গেলেন তিনি। রজপতি বলে চলল, "একজন অভিনেতার শক্তি কত। জনগণকে সে ওঠাতে বসাতে পারে। আপনি চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথা সকলকে জানালেন না, কেন? কাগজে আপনার দেশবাসীর কাছে আপনার দুর্দশার খবর প্রচার করলেন না কেন? এটা প্রচারের যুগ।"

মৃগাঙ্ক সবিনয়ে স্বীকার করলেন যে এমন কথা মনে আসেনি।

"আমরা আপনাকে ব্যবহার করব, আপনার প্রচার দেব। বুর্জোয়া সভ্যতায় অভিনেতাকে এমনি করে ফেলে দেয়।"

ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়াল, "অরুণ, তুমি জোরালো নাটক লেখ এঁকে নায়ক করে। আমরা বুড়োদের নিয়েই নাটক চালাব। এঁরা বৃদ্ধ হলেই বাতিল হয়ে যাবেন বুঝি? তরুণ-তরুণীর নাটক অন্যেরা করুক, আমরা ফেলে দেওয়া লোক কুড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করব। একটি লোককেও নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। সকলকেই ব্যবহার করতে হবে আজ।"

মৃগাঙ্কের মন আনন্দে নেচে উঠল। হারী কাজ, আজন্ম আহার্য, বাঁধাগৎ, যাই কেন না বলুন, মনের অবচেতনে সেই মন শ্রীণ্‌রুম্‌ মাখা দিনগুলো, সেই অবেলার বেহালা, সুইচ্‌বোর্ড খুঁজে খুঁজে মরছিল। জনতার অভিনন্দন মুখর দিনগুলো, যখন মঞ্চে তিনি রাজা কি রাখাল সেজে করতালি কুড়িয়েছেন।

সেই তাঁর একমাত্র জীবন।

মতঙ্গ মৃগাঙ্কের বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, "আপনারা কথা বলুন, আমি যাই। রান্না চড়াতে হবে।"

"আপনাকেও আমরা নেব। দেখিয়ে দেব বুড়োবুড়ীকে নিয়েও যে লেখা যায়।" ভাবী নাট্যকার অরুণ সাগ্রহে মতঙ্গকে বলল।

"না বাবা, আমার অভিনয়ের সখ নেই, ও আমার আসেনা। পেটের দায়ে যে কদিন থিয়েটারে কাজ করেছিলাম, সে নরক যন্ত্রণা গেছে। তোমরা মৃগাঙ্কবাবুকে নিয়ে যাই নাচাও। উনি জাত অভিনেতা। তোমাদের পিকনিক্ হ'লে ডেকো, আমি রান্না রেঁধে দেব।"

মতঙ্গ চলে গেলে কৃতকৃতার্থ মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করলেন, "তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে ?"

"আমরা বিপ্লবী দল, সশস্ত্র বিপ্লবে আমাদের বিশ্বাস।" দলপতি এইটুকুই বলল।

কোনে বসে কাল ড্রেন্‌পাইপ আর শার্ট পরা এক কিশোর নিশ্চিন্তে সিগারেট ধ্বংসে মত্ত ছিল, সে এগিয়ে এসে বুক চিতিয়ে বলল, "রক্ত চাই, রক্ত। রক্ত দিতে পারবেন ?"

চমকে উঠলেন মৃগাঙ্ক। আম্‌তা-আম্‌তা করে ভয়স্বরে বল্লেন, "আমার শরীরে আর কতটুকু রক্ত ?"

দলপতি কিশোরকে তিরস্কার করল, "যাঃ, কি হচ্ছে ? তুমি ভাল কর্মী বলে তোমাকে দলে রেখেছি, নীরোদ। তবে তুমি বড় দায়িত্বজ্ঞানশূন্য। কোথায় কি বলতে হ'বে মোটেই জান না।"

মৃগাঙ্ককে আশ্বাস দিল সে, "নীরোদের কথায় কান দেবেন না। ছেলেমানুষী ওর গেল না। সবাইকে রক্ত দিতে হবে কেন ? যার যা কাজ সে তাই করবে। আপনার কাজ রক্ত দেওয়া নয়। আপনার কাছে রক্ত চাইব কেন ?"

"এই দেখুন", কতকগুলি পোষ্টার দেখাল সে।

"সব সময় ছাপানো হয়ে ওঠে না। লাল কালি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটতে হবে।"

"সব দেওয়ালে ?"

"না, না। একা আপনি সব দেওয়ালে সাঁটতে পারবেন ?"

হা-হা করে হেসে দলপতি বলল, "যে যে দেওয়ালে আমাদের বিরোধীপক্ষের পোষ্টার পড়ে, সেইসব দেওয়ালে। ঘাবড়ে যাবেন না। এলাকাগুলো বলে দেব। মাস দুই আমরা ব্যস্ত আছি। এখন আমাদের এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। এরপরে নাটকটাও লেখা হয়ে যাবে, আপনাকে একাজ করতে হবে না। আবার আপনি হিরো হবেন।"

কাজ পাবার আনন্দে না হোক, আবার হিরো হ'বার আশার আনন্দে বাতাসে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এলেন মৃগাঙ্ক।

মতঙ্গকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খবরটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন।

জামা-কাপড় গেলেও বিছানাটা এখনও ছিল, পূর্বযুগের দামী বিছানা।

সেটা বাড়ীওলা তিনমাসের ভাড়ার বদলে আটকে রেখেছিল, "কিছু মনে করবেন না, স্যার্, আপনার মত লোককে অবিশ্বাস করি নে। কিন্তু আমার ব্যবসা এই। একজনকে ছাড়লে সবাইকে ছাড়তে হয়।"

"ঠিক আছে," সগর্বে মৃগাঙ্ক বাড়ীওলাকে জানিয়ে দিলেন, "আমি শিগ্‌গির এসে নিয়ে যাব। আবার থিয়েটারে নামছি দু'মাসের মধ্যেই।"

না বলে পারলেন না তিনি।

"ও:", মৃগাঙ্কের হাড়সার চেহারা, তোবড়ানো মুখের দিকে অবিশ্বাস ভরে চেয়ে বাড়ীওলা বলল।

"বেশ তো বেশ। একখানা পাস্ দিতে ভুলবেন না স্যর।"

"নিশ্চয় দেব।"

ভাঙা স্যুটকেশ হাতে পথে নামলেন তিনি।

পকেটটা গেছে, পাইস্ হোটেল ভরসা ছিল। নইলে নিয়ে গেলে মতঙ্গের কাছে দিত। আগুন

তাতে বেচারীর কষ্ট হয়। মনে মনে সংকল্প করলেন, নাটকখোলা মাত্র পয়সা পেলেই বাজারের সবচেয়ে দামী স্টোভটাই তিনি কিনে দেবেন মতঙ্গকে।

ওর আব্দার আর তিনি ছাড়বেন না। মতঙ্গ একমাত্র ব্যক্তি যে চরম সময়ে ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে : মতঙ্গ না থাকলে তিনি এতদিনে কীটপতঙ্গের খাদ্য হ'তেন।

দরকার হলে, চীনের বাড়ী ওর পাকা করে দিয়ে, বাড়িয়ে নিয়ে তবু ওখানেই থাকবেন।

আঃ, কিভাবে টাকা নষ্ট করেছেন দু'হাতে!

যদি টাকাগুলো থাকত, তিনি তো বাঁচতেনই, মতঙ্গের কত উপকার করা যেত।

তাঁর খাতার খাজে-খরচলেখা মতঙ্গ!

অপস্রিয়মান মৃগাঙ্ক-মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে সবিদ্রূপে বাড়ীওলা বলে উঠল, "সেই আশাতেই থাকো। এখন 'মহুয়ের প্রেতাত্মা' ছাড়া কোন্ পার্ট তোমায় মিলবে?"

মৃগাঙ্কের কর্মজীবন আরম্ভ হ'ল। মতঙ্গ চট-বেঞ্চ-কাভার ইত্যাদি দিয়ে কোনমতে বাড়ীর দোকানের মেঝের শোবার জায়গা করে দিল।

দুর্গন্ধ ও শুমোটে ছট্‌ফট্ করে রাত কাটালেন উনি। কিন্তু সকালে একবাটী মুড়িমাখা ও এক পেয়ালা গরম চা খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

কতদিন জলখাবারবর্জিত সকালের অন্তে এমন সমৃদ্ধ পরিবেশন।

মতঙ্গের গোলাদারবাবু জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মধ্যে প্রণয়ের সন্দেহের পাত্র না পেয়ে কোনও আপত্তি জানাল না। বয়স এতবড় নায়কাভিনয়ের ভালোজাতের অভিনেতাকে আশ্রয় দিতে পেরে আত্মপ্রসাদ পেল।

সেটুকু ঠিক, কিন্তু কাজে নেমে হয়রাণ হয়ে উঠলেন মৃগাঙ্ক।

হাতে ধরে ধরে পোস্টার লেখা। তাগিদ আছে, "ও মৃগাঙ্কবাবু, এতদেরী হচ্ছে কেন? ওদের পোস্টার যে দুদিন ধরে ঝুলছে।"

অতএব রাতজেগে লিখতে হত। আঙুলে ব্যথা, ঘাড়ে টন্‌টনানি নিয়ে দোকানঘরের মেঝের শুয়ে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখে সহ্য করে যেতেন বর্তমানকে মৃগাঙ্ক।

কোণের টেবলে অরুণ খাতা, কলম নিয়ে বসেছে, তিনি দেখেছেন।

এরাধে হাঁটতে হাঁটতে জীর্ণ দেহ আরও জীর্ণ।

ওরা মাসের পয়সা দেয়, কিন্তু তাতে তো হয় না। এক একবার নেমে তারপর অলিতে-গলিতে হেঁটে যেতে হয়।

আর ফিরে কি এত পায়?

মতঙ্গের রান্না লাউঘণ্ট বুচোচিংড়ির ঝোল এক লহমায় অদৃশ্য!

ফিরতে সন্ধ্যা হলেও ওরা চায়ের পয়সা দেয় না। চাইতে লজ্জা!

বাড়ীতে মতঙ্গের সত্র খোলা আছে, কিন্তু পথে পয়সা চাই।

সহ্য করে যান সব। কর্মে তিলমাত্র ফাঁকি দেননা। যারা তাঁর দুঃখে এত সহানুভূতিশীল, যারা

তাঁকে জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, তারা তাঁর দেবতা। কিন্তু, এরা নিজেরা যতটা কর্মমাহাত্ম্য বর্ণন করে, কই ততটা কর্ম নিজেরা করে কোথায়?

টেবল ঘিরে বসে চা ছুরোটসহ কর্মের খিয়োরি নিয়েই এরা মত্ত।

এক বৃদ্ধ পায়ে হেঁটে পোষ্টার লাগিয়ে ফিরছে, ব্যস্, সমস্ত প্রোগ্রাম সম্পাদিত হয়ে গেল।

নাটক দুপাতার বেশী এগোয় না অরুণের কলমে। টেবলে বসে কলম কামড়ায়, লাইন দুয়েক লেখে।

অতঃপর হাল ছেড়ে চায়ের আড্ডায় যোগ দেয়। মৃগাঙ্ক অনুনয় করেন, "বাবা অরুণ, একটু কলম চালাও। আমি যে আশা করে বসে আছি।"

ওই নাটক তাঁর সোনার বঁড়শী, টেনে তুলবে তাঁকে বিলুপ্তির গহ্বর থেকে।

খান না খান, আবার ঘরে উঁকিতে চান মৃগাঙ্ক। অরুণ মুরুব্বী গলায় বলে, "ওই তো দোষ আপনাদের। অনুপ্রেরণা ছাড়া লেখা চলেনা। মূড না এলে লিখতে বসা পাপ। তাই আজ আমাদের সাহিত্য এত দীন হয়ে গেছে। পুরনো যুগে ওঁরা এই করে গেছেন।"

এরা কারণে অকারণে উপদেশ শোনাতে ভাল বাসে। পুরনো যুগের সমস্ত কিছুতে যাদের অনাস্থা, তারা সেই পুরনো যুগের মৃগাঙ্ক দত্তকে নিয়ে কোন নাটক লিখবে? অথচ ওঁরই জীবন নিয়ে সুরু হয়েছে নাটক। কল্পনাশক্তি এদের কম, বাস্তব সম্মুখে না থাকলে লেখা আসেনা। ঘাস শেষ হয়।

ফলপতি ত্রিশটি টাকা হাতে দিল মৃগাঙ্কের।

"বাকী কুড়িটাকা পরে দেব, মৃগাঙ্কবাবু, পার্টির অবস্থা বড় খারাপ। টাকা নেই।"

"কিন্তু, আমার অবস্থা যে আরও খারাপ,—"একপলা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে বলেন মৃগাঙ্ক। হাড়-ভাঙা খাটুনী খাটলেও মনে আশা ছিল পুরো টাকাটা পাবেন।

"আপনার তো খাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাদের নেই তাদের কি অবস্থা? সহ্য করতে হয়। অসহিষ্ণু হলে চলেনা।"

ফলপতি নিজে অসহিষ্ণু।

"কিন্তু অন্নের ওপরে খাকা খাওয়া—"

বাধা দিয়ে ফলপতি বলল, "হুঁ, কিন্তু চক্ষুলজ্জা করলে চলবে না। চক্ষুলজ্জা গতযুগের কুসংস্কার। আপনার নাটকটা নামিয়ে দিলেই আপনাকে পায় কে? এখন একটু কষ্ট করুন।"

"কিন্তু একমাসে নাটকের যে একটি অঙ্কও লেখা হলনা।"

হতাশ মৃগাঙ্ক বলেন।

"হবে হবে। না হয়ে যাবে কোথায়? এই কয়েকটা দিন গেলেই আমাদের পোষ্টারের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে। তখন নাটকের প্রোগ্রামে নামতেই হবে।"

মৃগাঙ্ককে অগত্যা চুপ করতে হল।

মৃগাঙ্ক টাকা কয়েকটি মতঙ্গের হাতে দিয়ে ঘটনাটা বলেন।

মতঙ্গ বলল, "এমনধারা নাটক লেখা শুনিনি। আমাদের থিয়েটারে যাত্রিক মশাই ঘরে দোর দিয়ে দুদিনে, তিনদিনে নাটক লিখে দিতেন দিব্যি। ও টাকা আপনি রাখুন, একটা জামা না করলে চলবে না আপনার। জুতোটাও ছিঁড়ে গেছে।"

জোর করে কুড়িটি টাকা মতঙ্গকে নেওয়াতে পারলেন মৃগাঙ্ক।

তবু আশায় বুক বেঁধে রক্তপদ্ম মার্কা পোষ্টার লাগিয়ে ফিরতে লাগলেন। পোষ্টারের প্রোগ্রাম শেষ হল প্রায়। এবার নাটক ছাড়া এদের অন্য প্রোগ্রাম নেই।

ইতিমধ্যে একটি নিদারুণ ঘটনা ঘটল।

পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে গুলী খেয়ে নীরোদ মারা গেল। অতি চতুর, ছেলেমানুষ কিশোরটি।

শোকসভা হল ধুমধামে আবহাওয়ায়। কালো ব্যাজ লাগিয়ে মৌন মিছিলের সংখ্যা বাড়ানো হল।

সবটাতে যোগ দিতে হ'ল মৃগাঙ্ককে। কিন্তু তিনি ভীত ও চকিত হয়ে উঠলেন।

আন্দোলনের অন্য রূপটি চোখে পড়ল। মঞ্চের কৃত্রিম রক্তপাত দেখে অভ্যাস মৃগাঙ্কের।

অভিনীত ভীষণতা দেখেছেন তিনি, বাস্তব ভয়াবহ কিছু দেখেননি।

তিনি জাত অভিনেতা, তিনি শিল্পী।

রক্তপাতে তাঁর ভয়, তাঁর জুগুপ্সা।

এতদিন যেসব নিরীহ প্রচারপত্র লাগিয়েছেন, তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোধগম্য হল।

মনে ভেবে ভেবে অনেক কিছু পেলেন মৃগাঙ্ক। কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করছেন তাঁকে লক্ষ্য করে অনুসরণ করছে কয়েকটি লোক।

ক্রূর মুখভাব, চলাফেরায় সোপনতার ছাপ। দলপতিকে বললেন।

অতি বিষন্ন আবহাওয়ায় নির্বাক হয়ে ওরা বসেছিল। নীরোদের অভাব তারা ভুলতে পারছেনা।

দলপতি বলল, "আপনাকে ফলো করছে? তাতে ক্ষতি নেই। ওরা সকলকেই বিনা কারণে ফলো করে থাকে। আপনি বৃদ্ধ, সেখানেই ভরসা। আপনাকে কিছু বলবে না।"

ভরসা না পেলেও মৃগাঙ্ক সঙ্কোচ বোধ করে কথা বাড়ালেন না।

যারা তরুণ জীবনের মায়া না রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' যাদের, নিজের বুড়ো হাড় কয়খানার মায়া নিয়ে ওদের সম্মুখে আশঙ্কা প্রকাশ করতে লজ্জা হল তাঁর।

মতঙ্গকে বললেন।

মতঙ্গ সায় দিল, "আমারও মনে হয় আপনার ভয়ের কারণ আছে। নীরোদের ঘটনা শুনে বাবু বলছিল যে রত্নবাবু যেন ও কাজ ছেড়ে অন্য কাজ খোঁজেন। আমরা যতদিন আছি তাল তাত দিয়ে রাখতে পারব।"

মৃগাঙ্কের চোখে জল এল। মাথা নামিয়ে তিনি বল্লেন, "মতঙ্গ, তোমার আর তোমার বাবুর ঋণ আমার কখনও শোধ হবেনা। কিন্তু কাজ যে খুঁজলে পাওয়া যায়না সে তুমি দেখেছ। কত খুঁজেছি! এ বয়সে কাজ পাব কোথায়? একটা কাজই জানি। কিন্তু সেখানেও বাড়িল। আমি আপদ আছি এরা নাটকে আমাকে সুযোগ দেবে। তাই বুকে বল পাচ্ছি। ছেড়ে গেলে এটুকুও যাবে।"

"তাহলে রত্নবাবু, এক কাজ করুন না," রসলা পিষতে পিষতে মতঙ্গ বলল।

বারান্দায় টুলে বসে মৃগাঙ্ক তালের বড়া খাচ্ছিলেন। বাবু তাল এনেছিল। তালমানে তালের বড়া খেতে হয়।

"কি?"

"ওই যে ওরা প্রথম দিন বলছিল, না? আপনি আমাকে পরে বল্লেন না, বেশ ধারনাটা। মোড়ে-মোড়ে

আপনি ধাক্কিয়ে আছি করুন। লোকের চোখে পড়বে, হয়তো যাত্রাদলে কি থিয়েটারে ঢুকে নেবে। এখন সিনেমাই চলে। সিনেমার ডিরেক্টরের চোখেও পড়া আশ্চর্য্য কি? ওপাড়ার হাবি তো অমনি করেই সুযোগ পেয়ে গেল। বুড়োর পার্টেও লোক লাগে হরদম। সেদিনেরি থিয়েটারে আপনি ওই ধরণের পার্টই করতেন।"

মৃগাঙ্ক প্রথমে দ্বিধাভরে বললেন, "একা একা অ্যাক্টো কি ভাবে করব?"

ওরাপরেই মনে লেগে গেল পরিকল্পনাটা। বলে উঠলেন, "ঠিক আছে। আমি আবৃত্তি করে যে যে নাটকে নেমেছি, বড় পার্টগুলো একা একা আউড়ে যাব।"

ঠকাস্ করে বন্ধার বাটিটা নামিয়ে তিনি লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে মুলদিত আবৃত্তি করলেন:

"দেখ, দেখ মন,
কত তোরে নাচায় বদন—"

বিশ্বমঙ্গলের ভূমিকায় একদিন যত মাত করে দিয়েছিলেন। "এইতো দেখছ কেমন মনে আছে? হবেনা? রাত্রে ঘরে শুয়ে আমি মনে মনে আওড়াই যে। শোন শোন—"

"সম্রাট নন্দিনী, সত্য, সত্য যা কহিলে
বাতুল হয়েছি আমি;
মান-গর্ব্ব-বীর্য্য সব ফেলি অবহেলি,
কিন্তু সে তোমারি প্রেমে।
দিল্লীশ্বরী, শাহাজাদি, হৃদয়-ঈশ্বরী
করুণা কি হবেনা তোমার?"

বুঝলে মতঙ্গ, ভক্তিয়ার খিলিজী, 'রিজিয়া নাটকে'?

"ওঃ, সে কি হাততালি, ছুলের ডোঙ্গা! ছেঁড় ফেটে পড়ে। ম্যানেজার বললেন, 'মৃগাঙ্কবাবু, আজ 'নব্যবঙ্গ থিয়েটার' তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ধন্য হল।"

কোটরাগত চোখ দুইটিতে সেদিনের স্বপ্নের একবিন্দু ছোঁয়া লেগে একটু যেন পুরাতন বাহার ফিরে গেল।

মতঙ্গ মশলার শীলপাটা ফেলে হনুদ মাখা হাত দুইটি জোড় করে চিবুক রেখে হাসি হাসি মুখে শুনছিল।

ভেবেচিন্তে বলল, "কিন্তু, এ সমস্ত তো পুরনো বই, ছড়ায় লেখা। আজকাল অন্যরকম হয়, না?"

"তা-ও তো জানি। 'রমায়' রয়েণ, 'বোড়শীতে' জীবানন্দ দেখেছি। কিন্তু গদ্যলেখা একা একা জমবে না। কবিতার একটা সুর আছে কিনা। শুনলে ভাল লাগে।"

মতঙ্গের ভাব লেগে গেছে।

ভাঙা-বসা গলায় সে ধরল সখীসাজা আমলের গান:

"শাশুড়ী মেরেছে ঠোনা,
শ্বশুরবাড়ী যাব না।
বলতে দিদিলো, যা করে
ঘরে চুল ধরে টানে,

আবার আদর করে, সোহাগ করে বলে,
'একটা কথা রাখবে ?'

জংবরা বুড়ো গলায় চটুল গান চয়ন হাস্যকৌতুক শোনাল।

মৃগাঙ্ক শুধু তারিফ জানালেন, "বা, গলাটি বেশ রেখেছো।"

"একটু রেওয়াজ করনা কেন ? আমি তাহলে কাল থেকেই লাগি। কিন্তু, এরা কি ভাববে ? নাটকে চান্স্ যদি না পাই ?"

স্থির হল, এদের কাছ থেকে দিনদুই ছুটি নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখা যাবে কি হয়।

"যাবার আগে আদা-চা দিতে ভুলোনা, মতন্ধ।"

মৃগাঙ্ক উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

পরের দিন শহরের লোক এক অভিনব দৃশ্য দেখল। নূতন পাঞ্জাবী, ছেঁড়াধুতি, পুরণো চটী পরা এক জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ চারযাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছেন।

"পাগল না কি রা ?"

কয়েকজন এগিয়ে গেল। ওদের দেখে মৃগাঙ্ক উৎসাহ ভরে গলা ছেড়ে সুরু করলেন :—

"জয় রৈবাস্ত কিন্তু যদুকুল করায়ত্ত মোর—"

নগরের রাজপথ ভুলে তিনি দ্যুতপুত্র কর্ণের ভূমিকা ধরে যেতে লাগলেন এক তরফা।

ক্ষীণ গলা, অনাহারে, পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে গেছে। গলা ওঠে না, প্রাণপণে চীৎকার যারা লোক জড় করার প্রয়াসে মুখ দাদ ; গলার শিরা কাছির মত স্ফীত হয়ে ওঠে। যেখানে গলা অসহযোগ করে, হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা পান।

বেলা নটা জনবহুল প্রহর বলে বেছে আরম্ভ করেছিলেন। এখন রোদ অতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। ছাতা নেই তাঁর, থাকলেও এখানে কাজে লাগত না।

লোকজন প্রথমে কৌতূহলী পরে টিটকারী প্রবণ হয়ে একটু দেখে যে যার পথে গেল। ব্যাপারটা কেউ বুঝতেই প্রায় পারছিল না। দু'চারজন দয়াপরবশ কয়েকটি পয়সা ফেলে গেল। পায়ের কাছে মতন্ধের পাতের সুতো-তুলে বানানো চটের আসনখানা এনে পাতা হয়েছিল কিনা।

লোকজন সরে গেলে পয়সা কয়টা কুড়িয়ে মৃগাঙ্ক আসন নিয়ে একটা গাছের তলায় একটু জিরিয়ে নিলেন।

মাত্র আনা চারেক পয়সা।

এক কাপ চা খেতে প্রাণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। অতিকষ্টে লোভ সংবরণ করলেন।

চালাই যতক্ষণ পারি। একেবারে অচল হলে খেতেই হবে। আর একটা মোড় বেছে অন্য রসের অভিনয় ধরলেন তিনি।

এবার স্বয়ং রামচন্দ্র। সবকে ফেলে বাৎসল্য রসের উদ্দীপনা "তবে তুমি সীতার তনয় ?"

কম্প দিয়ে আত্মনিক নবকে ধরে তিনি কাঁপাতে কাঁপাতে বলতে লাগলেন—

"সেই মুখ, সেই চোখ
আহা কি বিধাতা
নিরবিছে পাশাপাশি দুই ছবি রেখে—ইত্যাদি।"

একদিন এখানে সহস্র দর্শকের চোখের জলের ধারার কলকণ্ঠের কোলাহল শোনা যেত, আজ হাস্যরোল উঠল।

পাড়ার বকবাজ ছেলেরা হাসির খোরাক পেয়েছে। অগত্যা সে রোড ছেড়ে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে যেয়ে আবার ধরলেন নূতন নাটক। কাঁপা দুর্বল কণ্ঠে তিনি রাণা প্রতাপের ভূমিকায় নামলেন। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র। যদি কারুর চোখে পড়ে যান? চোখে পড়লেনও।

প্রযোজকের গাড়ীতে স্বনামধন্য অভিনেতা।

"এ কি?" অভিনেতা অবাক হলেন।

"চার্লি চ্যাপলিনের 'লাইম লাইট'। এক পতিত অভিনেতা।"

পাইপ মুখে টেনে বললেন ডিরেক্টর।

"আহা, তা এই বইখানাতে বুড়োর পার্ট আছে। এঁকে নিয়ে নিন না।"

"তরুণকে মেকাপ দিয়ে বুড়ো সাজানো সোজা। ভোবড়ানো গাল বুড়োকে বুড়োর পার্টও দেওয়া চলে না।"

নির্লিপ্ত ডিরেক্টর।

গাড়ী একটু ধীর হয়েছিল। আবার জোরে চলল।

একটু খাবান। ওঁকে কিছু দিয়ে যাই না।"

গাড়ী অনেকটা এগিয়ে গেছে। কেরাতে গেলে স্যুটিংএ বিলম্ব হয়ে যাবে।

সুদর্শন যুবকের কাঁধে হাত রেখে ডিরেক্টর বললেন, "এ কুপাটুকু নিজের জন্যে তুলে রাখুন, তরু। পরে কাজে লাগবে।"

চমকে অভিনেতা ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন। নির্মম পৃথিবীর চোখ, মায়া-মমতার চিহ্ন নেই।

অভিনেতার সর্বদেহে হিমশীতল শরকের স্রোত বয়ে গেল।

রোদে বেগুনপোড়া হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলেন মৃগাঙ্ক। সারাদিন একটা টাকাও জোটেনি। পাঁচ পয়সা কয়। টাকাটা মতলবকে দিতে গেলেন।

মতলব বাধা দিল, "আপনি রাখুন। গলার যা অবস্থা, ওই মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে অষুধ নিয়ে আসুন গে যান।"

"না, মতলব, দশটা টাকা কেরৎ দিয়েছিলে। পাঞ্জাবী কিনেও কিছু আছে। এটা ধরো। কিছুই দিতে পারছি না।"

মতলবের বাবু ঘরের মধ্যে চুল কেরাচ্ছিল। আজকাল মৃগাঙ্কের সঙ্গে যেন আলাপ হয়ে গেছে।

পুরুষবর্জিত গৃহে একজন সংসারীর লোক পেয়ে সাড়া আসর বসে। রকমফের প্রতি দুর্বলতা আছে বাবুর, যার ফলে মতঙ্গকে সে গ্রহণ করেছে। সেই মকের একদা সার্থক অভিনেতা মৃগাঙ্ক।

আজও রান্নাঘরে মাদুর পাতা। বাবু বসলেন।

পাঞ্জাবী ছেড়ে ফোস্কা পড়া পায়ের চটী খুলে মুখে হাতে জল দিয়ে মৃগাঙ্কও বসলেন।

গোলাধারবাবু ব্যবসা চালানো বুদ্ধি বাৎলায়, "টাকা পয়সা কামানো সোজা না। একটু ম্যাকাপ দিলে তবে না লোকে চায়।"

"না, বাবু, মেকাপেও হবে না, আরও বাঁদর সাজা দেখে লোকে হাসবে। আমার দিন গেছে। এখন ভরসা, যদি আমাকে নিয়ে লেখা নাটকে মানিয়ে যাই।"

চিঁ-চিঁ করে বললেন মৃগাঙ্ক। গলায় ব্যথা, শরীর গ্লানিতে কেটে পড়ছে।

"কালকে ছুটী নেওয়া আছে। বরফ ওয়ে কাটাই।"

"আপনি ঝাকপাক্ করবেন না। মতঙ্গ আপনারে দাদার মতন দেখে। সে সুবাদে আপনি আমার শালা। কি কও, মতঙ্গ? এখানে বারমাস থাকেন, পয়সা দেওয়া লাগবে না। দেহচে, এনারে 'শালা' কইয়া বিলায়।"

নিজের রসিকতায় বাবু দাঁত বার করে হাসতে লাগল। এই স্থূল রসিকতা আজ যেন অমৃতবারি হয়ে নেমে এল মৃগাঙ্কের কানে।

সজল চক্ষে তিনি বললেন, "ভাই, তোমরা আছ, তাই আমি আছি এখনও।"

"এডা কি কন? ভগবান আছেন না? তিনি সকলকার। তিনি আছেন মাথার উপরে।" বাবু সবিনয়ে বলল।

"মিথ্যা কথা, ভগবান নেই।" মৃগাঙ্ক সজোরে বলে উঠলেন।

"আরে ছি, রামো। কন কি? তিনি আছেন বলে না এই মতঙ্গ বুড়া হয়া গেলেও আমি ছাড়ি নাই। সকলেই তাঁরে পায়।"

"কিন্তু কি করে জানব যে পায়?" অসহায় আক্ষেপে মৃগাঙ্ক বলে উঠলেন, "তিনি একবারও জানিয়ে দেন না, আসা দেন না। এত কষ্টের পরে যদি তাঁকে না পাই তবে কিসের ভরসা আমার? কেমন করে পথ চলব, যদি না জানি পথের শেষে ঈশ্বর আছেন।"

অত্যাসাহযায়ী বুকে হাত দিয়ে তারামূর্তির পরশ অনুভব করলেন মৃগাঙ্ক।

তারপরে আবার পুনর্মূষিক।

আবার পোষ্টার লেখা, পোষ্টার সেঁটে পথে পথে ঘোরা।

অশনকে সান্ত্বনায় বলেন, "ভাই, নাটকখানা লিখে ফেল এবার! আর পেরে উঠছি না।"

নীরোদের মৃত্যুর পরে সকলেই বিমর্ষ, চুপচাপ। অশনের পরিবর্তন চোখে পড়ে।

টেবলে খাতা-কলম নিয়ে বসে অন্যমনস্ক হয়ে ডুবে যায় ভাবলহরীর মধ্যে। একটা লাইনও লেখা হয় না

অরুণ বলল, "পোষ্টারের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে এল। আর কটা দিন কষ্ট করুন। এরপরে নাটক ছাড়া আমাদের অন্য প্রোগ্রাম নেই।

"কিন্তু বাবা, নাটক না লিখলে প্রোগ্রাম করবে কেমন করে?"

"লিখব। মনটা ভালো নেই।"

অরুণ আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তায় ডুবে গেল। নিরুপায় মৃগাঙ্ক কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাড়া-তাড়া পোষ্টার কখনও লেখা, কখনও ছাপা, গোটা দিনের মধ্যে কাবার করে আনতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে মৃগাঙ্ক আরও হতশ্রী। এখন তাঁর নিজের ভূমিকাতেই (নাটক লেখা চ'লে অবশ্য) তাঁকে মানাবে বিনা সন্দেহ।

গোলাধার বাবু বুদ্ধি দেন, "কোপেঝাড়ে বাড়ির ধরে ফেলে দিয়ে আসুন।"

মৃগাঙ্ক শিউরে ওঠেন, "সাতজন্মের মহাপাপে এ জন্মে এমন দশায় পড়েছি। আর ফাঁকি দিতে পারব না। তাছাড়া, উপায় নেই। যে-যে এলাকা বলে দেয় সেখানে আবার নিজেরা বেরে দেখে আসে।"

"ওমা, আপনাকে বিশ্বেস করে না?"

পেয়ারী ভাজতে ভাজতে মতঙ্গ অবাক।

"না, ঠিক অবিশ্বাস নয়। ওরা কাজ খুঁজে পায় না তো, অথচ পার্টি করেছে। তাই ঘোরাঘুরি করে করে পার্টি বজায় রাখে।"

ভাদুরে বর্ষা এসেছে। আরও বিপদ, ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই। জুতোটাও ভিজে ভিজে ঢোল হয়ে এলিয়ে গেছে।

হলপতি কয়েক দিন বাইরে গেছে।

কাকে বলবেন ভেবে না পেয়ে অরুণকেই বললেন। লিখুক না লিখুক, মৃগাঙ্কের জীবনের নাট্যকার সে।

"অরুণ, গত মাসের বাকী বৃত্তিটা টাকা না পেলে চলছে না। ছাতা চুলোয় যাক, জুতো না পেলে হাঁটা চলবে না আর। তোমাদেরি কাজের ক্ষতি।"

অরুণ মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর জরাজীর্ণ আকৃতি, অতি হীন বেশভূষা লক্ষ্য করল।

নাট্যকার আজ প্রথম তার সৃষ্টির উপাদানকে চেয়ে দেখল। "নৈনাকরা বাইরে গেছেন টাকা আনতে। অমৃতসরে অবাঙালী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু নৈনাকরাকে আমি সমর্থন করি না। টাকা নেই বলে একজনের ওপর সুযোগ নেবেন তাকে অন্যায় ভাবে খাটিয়ে! লোকের দুঃখ দূর করব বলে আমরা রাজনীতির মধ্যে নেমেছি। অন্যকে দুঃখ দিয়ে কাজগুছিয়ে নেবার উদ্দেশে নয়। এ অন্যায়!"

মৃগাঙ্ক বিস্মিত হলেন। এতদিন এরা একসুরে গান গাইত, আজ তালের চিড় লেগেছে নাকি?

অরুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, "এই যে নীরোদ মারা গেল কোন কাজটা এগোল? আমাদের জীবনের মূল্য কি?' যারা একটা আদর্শ চেয়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে, তারা শহীদের সম্মান পেয়ে অমর হয়ে রইল। আর আমরা মরলে, সমাজবিরোধী একটা মরল বলে সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।"

মৃগাঙ্ক কিছু বলা ভালো মনে করলেন না। নীরব রইলেন। যার যারমৃত্যুর কথা শুনে মনে হ'ল তারও যে দিন ঘনিয়ে আসছে। এই তরুণের হলও মৃত্যুর কথা ভাবতে শিখেছে, তবে তিনি কোথায় যাবেন?

আরও মনে পড়ে গেল, গতকালও নিশেষচরণ কে একজন অনুসরণ করেছে ওঁকে। অনিবার্য্য নিয়তির দুর্ব্বার গতি নিয়ে সেই পদশব্দ অন্ধকার থেকে গলির পর গলি ওঁর পশ্চাৎধাবন করে ফিরেছে। 'হাউজ অফ্ হেভেন্'!

অরুণ পকেট থেকে একখানা পাঁচটাকার নোট বা'র করে দিল, "এখন এইটে রাখুন। রাস্তায় রবারের হাউই দু'টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। জলে হাঁটবার সুবিধা হয়। মৈনাকদা টাকা নিয়ে ফিরলে আগে যাতে আপনি পান আমি দেখব।"

মৃগাঙ্ক হাসা মনে বাড়ী ফিরলেন, সেদিন। সহানুভূতিশীল আর এক বন্ধু তিনি পেলেন। কিন্তু পার্টি টিকবে? ভাঙনের সুর, প্রতিবাদের সুর তিনি অরুণের মুখে শুনলেন আজ।

মতঙ্গ ও বাবু ওকে কাজ ছেড়ে দিতে বলছে বার বার, বিশেষ করে নীরোদের মৃত্যু ঘটনার পর অনুসরণকারী পেছনে ঘুরছে শুনে আরও বলছে। তারা তো আছে, ভাবনা কি?

তারা আছে ঠিকই। দিনের অন্তে মতঙ্গের বারান্দার মানুষ, চায়ের কাপ, গোলাপবাবু সাজানো আছে। আঃ, কী আরাম, কী আশ্বাস সেখানে। দার্জিলিং-এ টাইগারহিলের সূর্য্যোদয় সিকং-এর ঝরণা, পুরীর সমুদ্র-স্নানে এত আনন্দ পান নি। জলের মত অর্থব্যয় করে রেসের মাঠ, নাইট্ ক্লাব যথা নারী সবই পেয়েছেন। কিন্তু প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ ভরা তুচ্ছ গৃহকোণ তিনি পান নি। নায়ক সেজেছেন অবাস্তব ছকে, প্রকৃত জীবনস্রোত পাশ কাটিয়ে মহাসমুদ্রে মিশেছে। তিনি রমাপতি মুখ আর নকল মুক্তোর মালা নিয়ে জীবনের হাসি ও কান্নার নকল করে গেছেন। নকল শুধু নকল! আসল মাল ওঁর ভাণ্ডারে জমা পড়তে পারেনি।

মনে পড়ে গেল, মুগ্ধ বিস্ময়ে নটগুরু শিশির কুমারের কাছে ছুটে যেতেন। প্রাক্ অধ্যাপক শিশির কুমার মুখে মুখে সুললিত আবৃত্তি দ্বারা তরুণের মনোরঞ্জন করতেন।

তিনি একদিন আবৃত্তি করেছিলেন, মনে আছে।

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages."

সাতদফায় নরনারী জীবন ঘরে অভিনয় করে থাকে, শৈশব থেকে জরা পর্য্যন্ত। তাদের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রিত। প্রস্থানের সময়ে আকাশে একটি তারাও যেতে না, মানুষের অন্ত,—"signifying nothing."

শিশির কোন অবদান নেই। এই শূন্যতার মধ্যে সত্য সেই মাটির ঘর, আর দিনান্তে মাটির মানুষীর স্নেহজড়িত সেবা। তিনি পূর্ব্বে এত সাধারণ বস্তুতে মূল্য দিতে শেখেন নি।

প্রেয়সী যা থাক গৃহিণী থাকতে পারত।

সেদিন নূতন আশায় কাজে বার হলেন। জুতো কেনা হয়েছে পায়ে স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন। বাড়ী

টাকাটা মতঙ্গকে দেন নি। একদিন যোড়ের অভিনেতা সেজে শরীরের যা অবস্থা হয়েছে, চারপয়সার মুড়ি পথে কিনে না খেলে আর খোরা চলবে না।

যত বিপদই থাকুক, বাকী ক'টা দিন চালিয়ে যাবেন। অরুণ সময় হয়েছে। টাকাও আদায় হয়ে যাবে, নাটকও এবার সে নিশ্চয় লিখে ফেলবে।

পোটা চারেকের সময় এক ব্রাইও লেনে হাজির হলেন। এটা নির্দিষ্ট করা ছিল।

রক্তপদ্ম বয়ে গেছে দেওয়ালে। বিরুদ্ধ দলের প্রচারপত্র। তার ওপরে তিনি রক্তপদ্ম বওয়াতে লাগলেন নূতন করে।

কাঁধে শক্ত কঠিন হাত।

ওঁর মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে কর্কশ স্বর বলল, "এসব হচ্ছে কি? বুড়ো হয়ে মরতে বসেছ, বজ্জাতি যায় না?"

কেঁপে উঠে দেখলেন মৃগাঙ্ক—দুটি লোক। একটির বয়স অল্প, অন্যটি চোয়াড়ে মর্দ।

"আমি—আমি চাকুরী করি মাত্র! আমি কিছু করিনি।"

থরোথরো কম্পিত গলায় বললেন মৃগাঙ্ক।

"বটে! বলি, হাতের লেখাটা কার?" এবার প্রশ্ন করল চোয়াড়ে লোকটি।

ওরা যা লিখে দেয়, রাত জেগে বড় বড় লাল কালির অক্ষরে কপি করে মৃগাঙ্ক পোষ্টার বানান।

"আমার লেখা, কিন্তু—"

কথা শেষ হবার আগেই মুখে ঘুঁষি পড়ল! একটা অবশিষ্ট দাঁত খসে গেল পথের ধুলোয়। পাঞ্জাবী রক্তে ভেজা।

"উঃ", বসে পড়লেন মৃগাঙ্ক গালে হাত চেপে। জীবনে কোনও স্থায়ী বস্তুতে বিশ্বাস ছিল না মৃগাঙ্কের বার বার আঘাত পেয়ে। মতঙ্গের আশ্রয়ে ভরসা ছিল না। হয়তো শেষ পর্যন্ত সেটাও হাতছাড়া হবে।

এখন একমাত্র সত্য সেইটা চোখের সামনে। সেই বারান্দায় মাদুর পাতা, গোলাধারবাবু আর মতঙ্গ। কোনমতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। টলতে টলতে চলবার চেষ্টা করলেন।

কোনমতে যেয়ে পড়তে হবে সেখানে।

রক্তরক্ত নয়, টীনের ঘর।

এবার ছোকরা রুখে গেল, "শালা পালাচ্ছ কোথায়? দিনের পর দিন তুমি আমাদের পোষ্টারগুলো নষ্ট করে দিয়ে সরে পড়ছ? কেন? শুনি কেন?"

দুহাতে কিলচড় মারতে লাগল সে।

কোনমতে জড়িত স্বরে মৃগাঙ্ক বলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, আমি কোন দলের নই।"

"শালা, তুমি ওদের দলের না হ'লে কাজে এত আঠা লাগে?"

চোয়াড় কোমরে হাত দিয়ে দেখছিল। বলল, "এ কী করছ? এখনই লোকজন এসে পড়বে। এ বুড়ো পাকা ঘুঘু। চলো, মুর্গীটাকে সরাই।"

নাকে মুখে রুমাল পড়ল। আর মনে রইল না কিছু মৃগাঙ্কের।

চোখ খুলে দেখলেন শহরের বাইরে গঙ্গার তীরে তাঁকে এনেছে। হয়তো ট্যাক্সি বা অন্য গাড়ী করে।

"বুকে হাত দিলে শালা, সত্যি কথা বল ? কতদিন পার্টিতে আছিস ?"

"আমি পার্টির—নয়", অতিকষ্টে কথা তিনটা বার করলেন। বুকে হাত দিলেন। রক্ষাকর্ত্রী তারাদেবী দুলছেন এখনও।

"সত্যিকথা বলবি না ?" ক্রুর-নৃশংস হিংস্র মূর্তি চোয়াড় এগিয়ে এক ধাক্কা দিল। কোপের আড়ালে মৃগাঙ্ক পড়ে গেলেন।

চোখে নির্দয় দীপ্তি জেগে উঠল চোয়াড়ের, "বুকে হাত দিচ্ছে শালা! বুকে ব্যথা নাকি ?"

কতদূর থেকে গোলাধারবাবু যেন 'শালা' বলে ডেকে উঠল। কত মিষ্টি ছিল সেই ডাকটি ?

সী করে গুলি বার হ'ল।

আমি ভাক্তিই, বা ম্যাসোকিষ্ট, কোনটাই নয়। সে রক্তাক্ত দৃশ্য বর্ণনা করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

মৃগাঙ্ক দত্তের জীবন শেষ হয়ে গেল।

গ্রীক নাট্যকার মঞ্চের বাইরে হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান রাখেন।

আমি প্রেক্ষাগৃহে যবনিকার প্রধান পর্দা ফেলে দিলাম। কিন্তু গ্রীকনাটকে হত্যার ফল পরিণাম রেখে যাকে। এখানে তা-ও নয়।

কিন্তু একটা প্রশ্ন তো আছে।

একটা প্রশ্ন জাজ্বল্যমান।

মানুষ মঞ্চের নায়ক সেজে আসে পৃথিবীর বুকে। প্রবেশ, প্রস্থান নিয়ন্ত্রিত।

সেই মানুষের জীবনের মূল্য আজ অর্থহীন। যেখানে সেখানে যখন তখন সেই জীবনের অবসান।

তবু মানুষ হয়ে জন্মানোর জন্য কয়েকটা অধিকার থাকে তার, যাকে কি রাখাল বা সেজেই সে মঞ্চে আসুক না কেন।

ঈশ্বরকে মৃগাঙ্ক পেয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমি যে ভরসা পাচ্ছি না। আমার যে বিশ্বাস চলে যাচ্ছে।

সাধারণ একজন মানুষ। অন্তিম মুহূর্তে মুখে একবিন্দু জল, দেহান্তে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া এই সামান্য অধিকারটুকুও মৃগাঙ্ক পেলেন না কেন ?

ঈশ্বর, তুমি আছো কিনা জানি না। আজকের এই মৃত্যুমহোৎসবে, এই ধ্বংসতাণ্ডবে, আমি শুধু জানি, তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

এ দুঃখের একটা বলি আমার নিরন্তর প্রত্যয়।

সদা বৈরাগী

—চিত্তরঞ্জন মাইতি

সদা বৈরাগী খুব ছোটবেলা থেকেই বাপের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বাউল রামদাস ছেলে সদানন্দকে সাজিয়ে দিত বাউলের আলখাল্লায়। ছিমছাম সুন্দর চেহারার ছেলেটি যখন বাপের পেছন পেছন একতারাটি হাতে নিয়ে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে পথ চলত তখন বাড়ীর গিন্নিবান্নি বউঝিরা তাকে ঘরে না ডেকে পারত না। তার মিঠে গলায় গান বাজত, আর ছোট দেহখানা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ চলত। সে এক দৃশ্য। ছেলেকে নিয়ে রামদাস বেরোলেই তার ঝুলি ভরে উঠত। পাড়ার পড়ুয়া ছেলেগুলো ওকে দেখলেই ভাবত, আহা এমন করে যদি আমাদেরও দিনগুলো কাটত। ইস্কুল নেই, পণ্ডিত নেই, সারাদিন মনের সুখে পথে পথে ঘুরে বেড়ান।

সদানন্দ যত বড় হতে লাগল গলা যেন তার ততই খুলে গেল। বাউলতত্ত্ব শিখল সে। নিজে নিজে গান বাঁধতেও পারল। এখন সে একা একাই পথ চলে। গাঁয়ের বিয়ের যুগ্যি মেয়েগুলো সদানন্দের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। চোখ ফেরাতে পারে না। সবুজ পাতার ফাঁকে যেন রুক্ষচূড়া ফুল ফুটেছে। আজকাল মৃদু হেসে গলায় মধু ঢেলে গান গায় সদা বৈরাগী।

ও আমার মনের মানুষ পেলাম না
যে মানুষ পথেঘাটে ভবের নাটে
তাদের হাটে পেলাম না
তাই মনের মানুষ পেলাম না।

মেয়েরা গান শুনত আর মনে মনে সদা বৈরাগীকে মনের মানুষ ভাবত কিনা না কে জানে। দু'দিন সদানন্দ ভিনগাঁয়ে গেলেই সকলের মনে হত যেন সদা বৈরাগী কত দিন আসেনি।

এ হেন সদানন্দ একদিন সত্যিই ডুব মারল। জমিদার গোমাশীবাবু যাকে দেখলে বলতেন, ছোঁড়াটা গাঁয়ের সোমত্ত মেয়েগুলোকে খেপাচ্ছে, তিনি ক'দিন থেকে খোঁজ খবর শুরু করে দিলেন। কোন

মেয়েকে নিয়ে ভাগল নাকি রামদাসের ব্যাটা। বলা যায় না, চেহারাখানা নয়তো, একদম আগুন। ব্যাটা সবজুক। কিন্তু ওঁর গণনায় গ্রাম বিগ্রামের কোন মেয়ে পোয়া গেছে বলে ধরা পড়ল না।

সেবে একদিন সকলের জল্পনা কল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে হাজির হল সদা বৈরাগী। জানা গেল কোন এক মেলায় যখন সদানন্দ গান ধরেছিল তখন কলকাতার একদল বাবু তার গান টেপ রেকর্ডে তুলে নিয়েছিলেন। ওঁরা নাকি বছর বছর কলকাতায় মেলা করেন, সেখানে সদানন্দকে যাবার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। পরে তাঁদেরই লোক এসে সদানন্দকে নিয়ে যায় সেখানে।

সদানন্দ তখায় কথায় বলল, খাতির খুব, হলে কি হয় এমন খোলা মাঠ আর পাখনা ঝাপটা নেই গো।

সদানন্দ গান গেয়েছে সেখানে, লোকে হাততালি দিয়েছে, কিন্তু দুদিনের বেশী সে টিকতে পারেনি হাঁফিয়ে উঠেছে।

সদানন্দ তেমনি গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে। লোকের ভাল লাগে কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার ডাক আসে কলকাতা থেকে। সদা বৈরাগীর মনে কীস একটা আপত্তি জাগে কিন্তু মুখ ফুটে সে বলতে পারে না শহরে বাবুদের ডাকে সে আবার এসে পড়ে মহানগরীতে। এমনি করে কয়েক বছর আসা যাওয়া করতে গিয়ে কেমন যেন একটা নেশা ধরে গেছে তার। বছরের সেই নির্দিষ্ট সময়টা এলেই সদা বৈরাগী কিসের যেন প্রতীক্ষা করে। সেই ট্রেনে চড়ে যাওয়া, হাজার লোকের হাততালি কুড়িয়ে পাওয়া, এ যেন এক ভিন্ন জগৎ অন্য নেশা।

কয়েক বছর এমনি আসা-যাওয়ার পর, একবার সেই যে গেল আর ফিরল না সদা বৈরাগী। কলকাতার বড় মানুষের ঘরে ঘরে তার নাকি রোজের নিমন্ত্রণ। হাসিগান খাওয়া-দাওয়া। পাওনা গণ্ডাও ছুটতে লাগল। পর পর। বেহেসেবী বাউল হিসেবী হল এত দিনে।

শহরে বাবুরা আজকাল নতুন কিছু করার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। আগেকার দিনে পায়রা আর ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল। বাইজীকে নিয়ে গানের আসর পাতা হত সে সব ধীরে ধীরে উঠে গেল। তারপর বসল ওস্তাদ গাইয়ে আর নাচিয়েদের ডেকে ডেকে সারারজনীন কনফারেন্স। উঁচু মানের কালচারকে এমনি করে জিইয়ে রাখতে হবে। এই কনফারেন্সের সঙ্গে আজকাল যোগ হয়েছে আর এক জিনিস। বাংলা দেশের লোক-সংস্কৃতি, যা ছড়িয়ে আছে বাউল বৈষ্ণবের গানে, কবির লড়াই আর পটুয়ার পটে তাকে নিয়ে আসতে হবে মহানগরীতে। শোনাতে হবে শহরে মানুষকে প্যাণ্ডেল বেঁধে। বাবুদের সময় কই শহরের বাইরে গিয়ে মেলায় মেলায় ঘুরে গান শোনার। তাই মহানগরীতেই বসছে আজকাল বাংলা সংস্কৃতির হাট।

সেই হাটে বিকিয়ে গেল সদা বৈরাগী। বড় বড় কনফারেন্স, বড় বড় বাড়ীতে ঝকঝকে গাড়ী করে যায় সদানন্দ। গান শুনিয়ে বাহবা কুড়োয়না শুধু, অনেক ইনামও মেলে তার। গাড়ী চড়ে চড়ে আজকাল পা চালাতে কষ্ট হয় সদা বৈরাগীর। যাত্রা মাটির পথ সে ভুলেছিল অনেকদিন, এখন যাত্রা মাটির যে ছটটুকু লেগেছিল তার মনে সেটুকুও মুছে গেল কখন তা সে টেরও পেল না।

ইতিমধ্যে সদা বৈরাগীর সঙ্গে বৈষ্ণবী সঙ্গের ষোটা টাকায় একটা কনট্রাক্ট হল। বৈষ্ণবী গঙ্গা যাবে

বিদেশ ভ্রমণে। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করে বেড়াবে তারা। সদানন্দও গান গাইবে। বাংলা দেশের বাউল গানের সুর আর কথা সে ছড়িয়ে দেবে বিদেশের বাতাসে।

এমনি করে একদিন মেঠো পথের বাউল চলল দেশ বিদেশে দিগ্বিজয়ে।

সোভিয়েট দেশটা ভারি সুন্দর। তাদের খাতির যত্ন আদর আপ্যায়নের তুলনা হয় না। এদেশের প্রতিটি শিল্পীর জন্যে তখানকার মৈত্রী সঙ্ঘ ব্যবস্থা করেছেন দো-ভাষীর। বাইরে বেড়াতে বের হলেই দো-ভাষী এক একটি মেয়ে যাবে সঙ্গে। তাদের ব্যবহার ভোলার নয়। সদানন্দ বিদেশিনী মেয়েটির মুখে বাংলা শুনে তো তাজ্জব। পরিচয় হয়। মেয়েটি উজবেকীস্তানের। অনেক প্রাচ্য দেশের ভাষা সে এই অল্প বয়সে শিখে ফেলেছে। সদানন্দকে সে তাদের দেশটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। জিজ্ঞেস করে তার সুবিধে অসুবিধের কথা। সদা বৈরাগীর মন টলেছে। এতদিন সদানন্দ গাইত।

'বল সাঁই
মনের মানুষ কোথা পাই।'

এখন সেই সদানন্দের মনে হল, এতদিনে তার মনের মানুষ মিলেছে। আর মনের মানুষের খোঁজে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

এক সন্ধ্যায় ওরা বসেছিল একটি ফাঁকা প্রান্তরে। ঢেউ খেলান উঁচু নীচু জমীন। সদা বৈরাগীর মনটা হু-হু করে উঠল। গলায় গান বেজে উঠল তার। সেই ডুব সূর্যের আবছা আলোয় শুরু হল তার নাচ। সদানন্দ ঘুরে ঘুরে নাচে আর দরাজ গলায় গান গায়। গান থামলে শুরু করে গানের ব্যাখ্যা। এতদিন প্রাণের ভেতর চাপা ছিল যে সহজ সুরের সুরধুনি, সেই গঙ্গায় আজ বাঁধ ভেঙেছে। সদানন্দ ছন্দ মেলে সেদিন নাচল আর গাইল। বিদেশিনী উজবেকী দুহিতা সে গান শুনল, সে নাচ দেখল। সে আরও শুনল সদানন্দের মুখে তার দেশের কথা। যে দেশ শহর থেকে দূরে, রাঙামাটির রাস্তা ধরে অনেক উঁচু নীচু ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে যেতে হয়। সেখানে অনেকগুলো তালগাছের ঝটলার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর।

মেয়েটি প্রেমে পড়ল সদানন্দের। মনটা ছিল তার কবির। তাই শহর থেকে দূরে সদানন্দের পৈতৃক ভিটে জেনে তার বড় ভাল লাগল। কথা রইল, ওরা দেশে ফিরে গেলে সে এক সময় সুবিধে মত আসবে সদানন্দের দেশে। সদা বৈরাগী ফিরে এল কলকাতায়। মন রইল তার উজবেকী সুন্দরীর কাছে পড়ে।

একদিন সদানন্দের টানে এল সেই সুন্দরী। তখন সদানন্দের বাসা হয়েছে কলকাতায়, টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে। নতুন প্রণয়িনীকে নিয়ে সদানন্দ উঠল গিয়ে সাজান এক ফ্লাট বাড়ীতে। সদা বৈরাগী আলখাল্লা ফেলে স্যুট ধরেছে। যখন কাশানে যায় তখন পরে নেয় বাউলের পোষাকখানা সে পোষাকও আবার গয়নার কাপড়ে তৈরী।

কয়েকদিন কাটল আনন্দে। কিন্তু গোল বাধাল মেয়েটি। সে তো শহর দেখতে বা শহরে থাকতে আসেনি, সে এসেছে ফাঁকা মাঠের খোলা হাওয়ায় মনের মানুষকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়াতে।

মেয়েটি বলে, আমাকে নিয়ে চল তোমার সেই খোলা মাঠের দেশখানে।

সদানন্দ বলে, যাওয়া শুরু হয়েছে। গাঁও মাটির বুকে বইছে রক্তের নদী, এখন কি সেখানে যাওয়া যায়।

মেয়েটি মন মরা হয়ে থাকে। যদি শহরেই থাকবে তাহলে তার দেশেই তো সে থাকতে পারত।

একদিন মেয়েটির টানে সদানন্দকে শহরের গাতভাড়ি গুটিয়ে গাঁয়ে আসতে হল। পৈতৃক ভিটেখানাই শুধু পড়েছিল, তারওপর বাঁশ ঝড়ের ছাউনি পড়ল। সদানন্দ সেই যে ঘরের ভেতর ঢুকল সে আর বড় একটা বেরোতেই চায়না। সদা বৈরাগী ফিরেছে শুনে গাঁ ভেঙে এল ছেলে বুড়ো বৌ ঝি এরা। সঙ্গে এনেছে বিদেশিনী, সে কি কম মজার ব্যাপার।

সদানন্দ সবার সঙ্গে কথা বলল শহুরে মানুষের মত। বাউলের সেই প্রাণখোলা হাসি গান বাজল না সদানন্দের গলায়।

কিন্তু বউটিতো বেশ। বিদেশিনী হয়েও সে কোমর জড়িয়ে শাড়ি পরেছে। একেবারে এদেশী মেয়েদের মত। মুখে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। ঠিক বাউল বৈষ্ণবী বউ ঝি-এর আদল। বড়টুকু বাদদিলে কে ওকে বলবে বিদেশী মেয়ে। দু'একবার সদানন্দ বউ নিয়ে বেরল গাঁ ঘুরে আসতে। অবশ্য মেয়েটিই তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল তাই। ঘরে ঘরে আদর ছুটল। নতুন মেয়েটিকে লুফে নিল অন্দর মহলের বৌ-ঝি-এরা। গোমাধীবাবুদের বড় গিন্নিমা মেয়েটির হাসিভরা মুখখানা তুলে ধরে বললেন, তুমি আনন্দময়ী।

সেই থেকে মেয়েটির নাম হল আনন্দময়ী।

মেয়েটি কখনো সদানন্দের সঙ্গে কখনও বা একা একা মাঠে ঘাটে গাঁয়ের পথে বৈষ্ণবীদের মত হাত ঘুরে বেড়ায়। সে কিছু গানও শিখে নিয়েছে। তাই গায় সে বাড়ী বাড়ী গিয়ে। বাউলের ভাবের রসে মেয়েটি একেবারে মাতোয়ারা। ও যখন গান করে তখন মেয়েরা সব ভীড় করে আসে ওর চারদিকে। ওর ভাঙা বাঙলা উচ্চারণ আর অদ্ভুত টান ওকে সবার কাছে আরও প্রিয় করে তুলল।

প্রথম প্রথম ওর এই ঘুরে বেড়ানতে সদা বৈরাগী কিছু বলত না, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে আপত্তি তুলল।

সদা বলে, তুমি যে রোজ রোজ এমন করে গাঁয়ে বেরোয় এতো ভাল কথা নয়।

মেয়েটি অবাক চোখে তাকিয়ে বলে, একথা বলছ কেন?

সদা বলে, এ দেশের মানুষগুলোর চোখের দৃষ্টিটা ভাল নয়, তাই বলছি।

মেয়েটি কৌতুকে কথাটার গুরুত্ব লঘু করে দিয়ে বলে, সে তো তোমার চোখের চাউনি দেখেই বুঝেছিলাম গো।

তারপর খিল খিল করে আপন রসিকতায় আপনিই হেসে ওঠে।

গম্ভীর হয়ে যায় সদানন্দ। মেয়েটি সদা বৈরাগীর হাত ধরে টান দেয়। বলে, ওঠ বৈরাগী, পোষাকখানা পরে নাও। বাইরে চাঁদের আলোয় যে বান ডেকেছে। চল দুজনে মিলে মাচি আর গান করি।

সদা বলে, তোমার মাথা খারাপ। শিশির পড়েছে। শিশিরে ভিজলে ব্যারামে পড়ে মারা পড়তে হবে যে।

মেয়েটি বলে, তবে ঘরের দাওয়ায় এসো নাচি গাই।

অগত্যা বেরোতে হয় বৈরাগী সদানন্দকে। কিন্তু নাচ তার জমে না, গানে লাগেনা প্রাণের জোয়ার।

মেয়েটি বলে, দেখ আমি কেমন নাচি।

এই বলে সে শুরু করল তাদের উত্তরেকী লোকনৃত্য গান। যেন মাতাল হাওয়ায় কাঁপছে পাতা, লুটিয়ে পড়ছে ফুল। চাঁদের আলোয় স্নান করে শিশিরের কোঁটা গায়ে মেখে যখন ঘরে উঠল মেয়েটি তখন মনে হল যেন চাঁদের দেশ থেকে সদ্য নেমে এসেছে মাটিতে। মেয়েটির নাচ দেখছিল এতক্ষণ সদানন্দ। মেয়েটি থামলে সদানন্দের উথলে উঠল মনের আবেগ। সে অমনি শুরু করল তার নাচ। ঘুরে ঘুরে ডুগডুগি আর একতারা বাজিয়ে নাচল সে। গানের সুর ভাসিয়ে দিলে শেষ অগ্রহায়ণের কাটা ধানের মাঠে মাঠে। মেয়েটি হাতে তালি দিয়ে বলল, কি সুন্দর তোমার নাচ আর গান। এর লোভেই তো আমি ঘর ছেড়েছি।

পরের দিন সদানন্দের অন্য মূর্তি। কিছুই আর ভাল লাগেনা তার। ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে এমনি কতদিন আর বসে বসে খাওয়া যায়। বছর ঘুরে আসে। সদানন্দ চঞ্চল হয়ে পথের দিকে তাকায়। শিয়ন এসে একদিন চিঠি দিয়ে গেল একখানা। চিঠি পড়ে খুশিতে ভরে উঠল সদানন্দের মুখ। ডাক এসেছে তার। কমলারেলে গান গাইবার ডাক। সঙ্গে বিদেশিনী মহিলাটির জন্যেও বিশেষ আমন্ত্রণ। আনন্দময়ী গিয়েছিল পাড়ায়। সে ফিরে এলে তার কাছে কথাটা পাড়ল সদা বৈরাগী। রাজী হতে চায়নি মেয়েটি। বলে, ঘর ছেড়ে কে শ্মশানে যেতে চায় বল।

সদা বলল, শ্মশান বলছ কাকে! সহর কি শ্মশান হল, সে যে সব সময়েই সরগরম।

মেয়েটি বলে, অত কথায় কাজ কি ঠাকুর, ভাল লাগেনা আমার গাঁ ছেড়ে থাকতে।

শেষে সদানন্দের দিক থেকে চলল অনেক অনুরোধ উপরোধ। মেয়েটি রাজী হল।

সেদার জোড়ায় নাচল ওরা। ঘন ঘন করতালি। একেবারে বাজী মাৎ। বড় বড় আসরে পড়তে লাগল ডাক। পয়সাও মিলল প্রচুর।

সদানন্দ বলল, দেখলে তো, গাঁ ছেড়ে আসতে চাইছিলে না। গাঁয়ে থাকলে মিলত তোমার এত সম্মান। তাছাড়া কবির কথাটাও তো ভাবতে হবে।

আনন্দময়ী বলল, দোহাই তোমার, আর একবর্ণও নয়। এখানে হাঁফ ধরেছে আমার। চল ফিরে যাই গাঁয়ে।

সদানন্দ এবার রাগে ফেটে পড়ে, বলি খাবে কি সেখানে?

মেয়েটি হেসে বলে, দুটি গাই গরু আছে। দুধ বেচব আর খাব। দরকার হলে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধ নিয়ে গান গেয়ে সিধে কুড়োব।

সদা বৈরাগী চীৎকার করে ওঠে, সাধে বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি।

আনন্দময়ী বলে, সত্যি কথা বলি, এই শহরে মানুষগুলো তোমার চেয়ে যেন আমাকে চাইছে আমি সেটা চাইনে।

আনন্দময়ীর কথা শুনে রাগে গজরাতে থাকে সদা বৈরাগী। সে এই বুদ্ধিহীনা মেয়েটাকে কি করে বোঝাবে যে যা কিছু সুখ সব এই শহরে। দু'জনের যাকে দেখেই যাতুক লোকগুলো তাতে তার কি এসে যায়। হাতে নোটের তাড়া এলেই হল।

সন্ধানন্দ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ডাক এসেছে রাজধানী থেকে। সেখানে দু' একদিনের ভেতরেই রওনা হতে হবে। সে আসরে মন্ত্রীরাও আসবেন আমি জানতে পেরেছি তাঁরা আমাকে 'ভারতীয় লোক সংস্কৃতি পরিষদের' বড় অফিসারের পদ দিতে পারেন। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়।

আনন্দময়ীর গলায় কান্নার সুর। সে সন্ধানন্দের হাত ধরে চোখের জল ফেলে বলল, চাইনে আমার সোনাদানা, চাইনে রাজার সম্মান শুধু তুমি আমার গাঁয়ের বাউলটি হয়ে থাকো। ওগো, আমি আর তুমি একতারা বাজিয়ে গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াব, আর কোনদিন পা বাড়াব না শহরের পথে।

এক ঝটকায় সদা বৈরাগী আনন্দময়ীর হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ভাগো, উজবুক, উল্লুক

শাল কাঠের যে শক্ত চেয়ারে পার্থ বসেছিল, তার মেরুদণ্ড বোধহয় তার চেয়েও দৃঢ়। ২ ঘণ্টা ধরে একটানা জেরা চলেছে, পার্থর মেরুদণ্ড একটু বাঁকা হয় নি।

সে লোকটার দিকে চোখটা ফেরায় নি।

সামনে বিস্তৃত জলা, অর্ধেকের বেশী কচুরি-পানায় আচ্ছন্ন। ধারে ধারে বুনো গাছের ঝোপ।

পার্থর নিষ্পলক দৃষ্টি সেই দিকে।

আপনি তো গ্র্যাজুয়েট। বেশ ভালভাবে বি. এস-সি পাশ করেছেন। দরখাস্ত দিন, ভাল চাকরি আপনার হয়ে যাবে। সরকার আপনাদের মতনই ছেলে খুঁজছে।

পার্থ মুচকি হাসল.

খুঁজছে বুঝি। ঠিক আছে জানা রইল, যখন চাকরির দরকার হবে, আপনার কাছে দরখাস্ত দিয়ে যাব।

ঠিক আধঘণ্টা হবে আর একটা চেয়ারে পুলিশ অফিসার।

হাতে মাঝারি আকারের একটা ছড়ি। কথা বলবার সময় সেই ছড়িটা উরুরওপর আছড়াচ্ছে।

পুলিশ অফিসর সামনে ঝুঁকে পড়ল,

আচ্ছা, আপনাদের কি সত্যি এই ধারণা যে কটা বোমার ভাঁওা আওয়াজ করে এদেশ থেকে ইংরাজ তাড়াবেন ?

কবে আপনার কানে কানে বলতে গেছি এসব কথা !

পার্থ পা নাড়াল। মশার উৎপাত শুরু হয়েছে। এই জন্যই কলাবেই হয়তো। পুলিশের চেয়েও মশার উপদ্রব বড় কম নয়।

কানে কানে আর বলবেন কি ? তাই তো করে বেড়াচ্ছেন। রংপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন কেন ? তাঁর দোষটা কি ?

আমি ছুঁড়লাম ?

গায়ে আপনি না ছোঁড়েন, আপনার অন্য ভাই ব্রাদার ছুঁড়েছে। ওই একই হল।

পলকের জন্য পার্থর মুখের রং আরক্ত হয়ে উঠল।

মনে হ'ল সে নিজেকে সামলে নিল।

একটু যেন হাসিও ফোটাল মুখে,

একটা কথা বলব ?

পুলিশ অফিসর সোৎসাহে বলল,

আরে বলুন, বলুন। এতক্ষণ ধরে তো আপনাকে কথা বলাবার চেষ্টাই করছি। কিন্তু নতুন বৌয়ের মতন চুপচাপ বসে আছেন, কি বলবেন, বলুন ?

পরাণ তেলীর বৌকে তার বাড়ী থেকে বের করলেন কেন ? পরাণের সংসার একেবারে ভেঙে গেল।

পুলিশ অফিসর দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা চেপে ধরল। কপালের ওপর ত্রিশূলের মতন তিনটে শিরা ফুলে উঠল। হাতের ছড়িটা হাঁটুর ওপর বার বার আস্ফোলিত হ'ল,

এসব আবার কি বেসুরো গান গাইছেন মশাই ?

কেন বেসুরো কেন ? চরহাটির কেসটা তো আপনার জানিলে থাকবার কথা।

একটু ভাববার ভান করে পুলিশ অফিসর বলল,

আরে সেই কেস। কি উদ্বোর-পিণ্ডি বুধোর-ঘাড়ে চাপাচ্ছেন মশাই। সে তো এস. আই তারাপদ নস্করের কাজ।

একটু আগে আপনিও তো এমনই উদ্বোর-বোঝা বুধোর-ঘাড়ে চাপাচ্ছিলেন।

পুলিশ অফিসর হাসল। হাসি মিশে বলল,

আপনি বেশ রসিক ছোকরা মশাই। যাত্রার দলে ঢুকে যান, নাম হবে।

হঠাৎ বোধ হয় পুলিশ অফিসরটির কণ্ঠস্বাভাবিক প্রখর হয়ে উঠল।

গলায় গাম্ভীর্যের প্রলেপ মাখিয়ে বলল,

আপনি সত্যচরণ বক্সিকে তাহলে চেনেন না ?

সত্যচরণ, মিথ্যাচরণ কাউকেই চিনি না মশাই।

এ শহরে এসেছেন কেন ?

বলেছি যে চাকরির চেষ্টায়।

কলকাতা ছেড়ে এখানে চাকরি ?

গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে চাই। সেই খোঁজই করছি।

চাকরি যদি করতে চান, চলে চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি।

আপনাকে ধন্যবাদ, সরকারী চাকরি আমাদের বংশে সহ্য হয়না।

পুলিশ অফিসর এবার উঠে দাঁড়ান।

ক্লান্ত ভঙ্গীতে হাতটা নেড়ে বলল,

যেতে পারেন, তবে একটা কথা ··

বলুন।

যতদিন এ শহরে থাকবেন, সকাল বেলা থানায় হাজিরা দিয়ে যাবেন।

চলতে চলতে পার্থ বলল, তথাস্তু।

থানা থেকে বেশ কিছুটা এসে পার্থ থামল।

পিছন ফিরে দেখল।

এদের বিশ্বাস নেই। আপাতার পারা পাবার জন্য পিছন পিছন হয়তো চর পাঠিয়ে দিয়েছে। সাদা পোশাকে কাউকে।

না, কেউ নেই। নিরীক্ষণ করে পার্থ দেখল।

তারপর রাস্তা ছেড়ে চালু জমি বেয়ে নীচে নেমে পড়ল।

পতিত জমি। চালতা আর ঘেঁটু-নিমের জটলা।

এক সময়ে কারো কুঁড়ে ছিল, এখন চালাটা সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এদিক ওদিক চেয়ে পার্থ চালার মধ্যে সন্তর্পণে হাত ঢোকাল।

একটু পরেই তার হাতে নতুন ঝকঝকে একটা পিস্তল উঠে এল।

দামী জিনিস।

পার্থ পিস্তলটা কোমরে বাঁধা বেল্টের সঙ্গে আটকে নিল।

আর রাস্তায় উঠল না।

ওঁড়ি দিয়ে আগাছার জঙ্গল ভেদ করে ছুটতে লাগল।

ঠিক সময়ে পৌঁছতেই হবে।

মাইল তিনেক।

পার্থ কিছুটা ছুটল, কিছুটা হাঁটল।

একটা ভাঙা দালান। সামনে অযত্ন-বর্ধিত আগাছার জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা সাপ-খোপের নিরঙ্কুশ রাজত্ব।

পার্থ দালানের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

জানলা আছে, কপাট নেই।

ভিতরে টিম টিম করে জ্বলছে কেরোসিনের প্রদীপ। আলোর চেয়ে অন্ধকার ছড়াচ্ছে বেশী।

জানলার কাছে গিয়ে পার্থ বলল,

দাদা আমি।

একটা আধভাঙা তক্তপোষে কম্বলের একটি লোক শুয়েছিল। তার মাথার কাছে উপবিষ্ট আর একটি তরুণ।

দুজনের পরণে আধময়লা খদ্দরের পোশাক।

যে তরুণটি বসেছিল, সে এগিয়ে এসে দরজা খুলেদিল।

পার্থ ভিতরে ঢুকে তক্তপোষে বসল।

কি খবর পার্থ?

তক্তপোষে শোয়া লোকটি উঠে বসে প্রশ্ন করল।

লোকটিকে যতটা শীর্ণকায় ভাবা গিয়েছিল, সে কিন্তু মোটেই ততটা দুর্বল নয়। বাড়তি মেদ নেই, কিন্তু পেশীবহুল শরীরের আভাস পাঞ্জাবির ওপর দিয়েও বোঝা গেল।

তীক্ষ্ণ নাক, প্রশস্ত ললাট, জলন্ত দুটি চোখ, দৃষ্টির সামনে মাথা নীচু হয়ে আসে।

সত্যদা, তোমার এখানে আর থাকা চলবে না।

সারা বাংলার ত্রাস সত্যচরণ বক্সি। অবশ্য ত্রাস ইংরাজ সরকারের, স্বাধীনতাকামী মানুষদের কাছে দেবোপম।

কেন কি হ'ল?

সত্য মুচকি হাসল।

পার্থ বলল,

আমার থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

বটে!

এমনভাবে সত্য কথা বলল, সমস্ত ব্যাপারটা যেন খুব কৌতূহলোদ্দীপক।

তুমি আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাও। ওদের সন্দেহ যখন একবার হয়েছে তখন কুকুরের মতন ঘুরে ঘুরে তোমার সন্ধান করবে।

এবার সত্য অন্য লোকটির দিকে ফিরল,

তুমি কি বল করিম?

পার্থ যা বলছে তাই করুন। এখান থেকে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ুন।

কিন্তু যাই কোথায়?

সত্য কাউকে উদ্দেশ করে নয়, স্বগতোক্তি করল।

পার্থ আর করিম দুজনেই জানে, এটা একটা কথার কথা।

কোথায় আত্মগোপন করতে হবে তার নির্দেশ সত্য তার সহকর্মীদের কাছ থেকে চায় না।

পাহাড়-বন-মশালেরা এই বিশাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে সত্যর লুকোবার ঠাঁই আছে। দলের লোক সর্বত্র ছড়ানো।

যাদের সঙ্গে সত্যর মতের মিল নেই, তারাও সত্যর অসম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তার জন্য তাকে শ্রদ্ধা করে। প্রদেশের হাজার বাহু সত্যকে ঘিরে রাখবে। শাসকদের চোখে পড়তে দেবে না।

এই আপাতশান্ত লোকটি একটি আগ্নেয়গিরি বিশেষ। উত্তপ্ত লাভা বুকে নিয়ে তথাগতের মতন মৌন।

কিন্তু যখন জ্বলে ওঠে, তখন আশপাশের সবকিছু ছাই করে দেয়।

দিন পনের আগে ঠিক এমনই জলে উঠেছিল :

জলপাইগুড়ির এক চা-বাগান।

ম্যানেজার আর্থার বুথ।

চা-বাগানের বাইরে যে কোন জগত আছে, সে জগতে আইনশৃঙ্খলা থাকতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করত না।

নির্বিবাদে কুলিদের ওপর অত্যাচার চালাত। অকথ্য ভাষায় গালাগালি।

চা-বাগান এলাকায় মদের দোকানে পিকেটিং করতে একদল ছোকরা এসেছিল। অহিংসবাদী।

আর্থার বুথ মোটর থেকে নেমে চাবুকের আঘাতে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল।

বলেছিল, ব্লাডি সোয়াদেশী, আমার এলাকায় আর কোনদিন দেখলে গুলি করে খতম করে দেব। অল বাস্টার্ডস্।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিরাট একটা-চ্যালেঞ্জ।

এ চ্যালেঞ্জ অহিংসবাদীরা মাথা পেতে নিলেও, সত্যাগ্রহের বল নেয় নি।

সে সময় সত্য শিলিগুড়িতে ছিল।

তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাথায় খদ্দরের টুপি। অঙ্গে খদ্দরের পোশাক।

আর্থার বুথের ক্লাব থেকে ফেরার পথে সত্য অপেক্ষা করছিল।

আগেই খবর নিয়েছিল, ন'টা নাগাদ এ পথে বুথ ফেরে।

সত্যর একমাত্র ভয় ছিল, বুথ যদি হলবল নিয়ে ফেরে, অন্য চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে, তাহলেই মুস্কিল।

সত্যর ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

অপেক্ষা করে করে সত্য যখন বিরক্ত হয়ে উঠেছে, তখন গাছপালার ফাঁকে মোটরের হেডলাইটের তীব্র দ্যুতি দেখা গেল।

সত্য রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়াল।

যান্ত্রিক একটা শব্দ করে মোটর থেমে গেল। সত্যর এক ফুট দূরে। মোটর খালি। শুধু চালনচক্র হাতে আর্থার বুথ।

ইউ নিগার, ক্লিয়ার আউট!

সত্য জানলার কাছে এগিয়ে গেল।

সাহেব এখানে মদের দোকানটা কোথায়?

হোয়াই?

বুথের গর্জনে ঝিঁঝিঁর আওয়াজও থেমে গেল।

সেখানে পিকেটিং করার নির্দেশ আছে।

পিকেটিং? ব্লাডি সোয়াইন।

পরমুহূর্তেই আগুনের ঝলক। একটু আর্তনাদ।

আর্থার মুখ দীটের একপাশে হেলে পড়ল।

সত্য বিদ্যুৎবেগে বনের মধ্যে ঢুকে দৌড়াতে শুরু করল।

অনেকটা পথ যাবার পর একটু দাঁড়াল।

একটা গাছের ডালে পোশাক ঝুলছিল। নিজের পোশাক ছেড়ে সত্য নতুন বেশ অঙ্গে জড়াল। কালিঝুলি মাখা খাকি পোশাক।

হাত দিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিল।

বনের পরিধি শেষ হয়ে আসছে। সামনে ছোট এক শহর।

শহরের রাস্তায় পা দিয়েই সত্য জড়ানো কণ্ঠে গান শুরু করল।

ঠিক যেন তেলকলের শ্রমিক মদ পান করে ফেরার দিয়ছে।

তারপর আত্মগোপনের একটানা কাহিনী।

সত্য পার্থর দিকে চেয়ে বলল,

তুমি কি করবে পার্থ? থানায় হাজিরা দেবে তো?

পার্থ হাসল,

দিন কয়েক তো দিতেই হবে, যতদিন তুমি এদের নাগালের বাইরে যেতে না পার। কাল থেকে যদি থানায় যাওয়া বন্ধ করি, তাহলেই দারোগা সাহেব সন্দেহ করবে, কাছাকাছি নিশ্চয় সত্য বসু রয়েছে।

ঠিক আছে, যা ভাল বোঝ কর। আমি বিহারের দিকে যাব। হাজারীবাগের কাছাকাছি। করিম তুমি আমার সঙ্গে চল।

খুব ভোরে, অন্ধকার কাটবার আগে সত্য আর করিম বেরিয়ে পড়ল।

পার্থ নীচু হয়ে সত্যকে প্রণাম করল।

আবার কবে দেখা পাব সত্যদা?

আমি কি আর দেখা দেবার মালিক। আমরা কেউ কিছুর মালিক নই। অদৃশ্য এক শক্তি আমাদের চালিত করছে। তাঁর ইচ্ছা হলেই আবার আমরা মিলিত হব।

সত্যর কথাবার্তায় চিরদিনই এমনই এক দার্শনিকের সুর।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

সকালে নিজে একটু চা তৈরি করে খেয়েছে।

রাস্তাথে গাছের কোঁকরে পিস্তলটা রেখেছিল।

হন হন করে হেঁটে থানার মধ্যে গিয়েই অপ্রস্তুত হয়েগেল।

বাইরে যে পুলিশ থাকে প্রহরায়, সে নেই।

একটি মেয়ে ভিতরে একটা চেয়ারে বসে আছে।

দৃষ্টি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে, তাই পার্থ তার মুখটা দেখতে পেলনা।

পরণে লাল পাড় শাড়ী, কুঞ্চিত কেশের রাশ পিঠ ছাপিয়ে। দুটি হাত কোলের ওপর।

পার্থ একটু ইতস্তত করল।

এ মেয়েটিকে কি থানায় হাজিরা দেবার কথা বলি!

ঢেকে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পার্থ চেঁচাল,

দারোগাবাবু আছেন?

মেয়েটি চমকে ফিরে দেখল।

আয়ত দু'টি চোখ ময়তায় উজ্জ্বল। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ।

কাকে চাই?

দারোগাবাবুকে।

বাবা তো নেই।

নেই?

না, পলাশপুরে একজন খুন হয়েছে। বাবা ভোরবেলা সেখানে চলে গেছে।

তাহলে তো বড় মুস্কিল হ'ল দেখছি।

কি মুস্কিল?

মানে, আপনার বাবা আমাকে আসতে বলেছিলেন।

মেয়েটি বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

পার্থ আবার প্রশ্ন করল,

আপনার বাবা কখন ফিরবেন?

কি জানি, বাবার ফেরার কথা বলা মুস্কিল।

কথাটা বলে বোধ হয় মেয়েটির খেয়াল হল। সে বলল,

আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

সামনের চেয়ার টেনে পার্থ বসল।

আপাতত বাইরে কোন কাজ নেই। অন্তত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। তাছাড়া, এভাবে মেয়েটির মুখোমুখি বসতে পার্থর ভালও লাগছে।

ইতিপূর্বে দারোগা সে কিছু দেখেছে, কিন্তু দারোগার মেয়ে এই প্রথম।

আপনাকে বাবা কেন আসতে বলেছিল, সে কথা আমায় বলে যেতে পারেন। অবশ্য ব্যাপারটা যদি খুব গোপনীয় না হয়।

গোপনীয়? পার্থ এরপর কি বলবে মনে মনে ভেবে নিল, তারপর একটু হেসে বলল,

আমাকে রোজ থানায় হাজিরা দিয়ে যেতে বলেছেন।

থানায় হাজিরা—

তার মানে আপনি কি সন্দেহজনক ব্যক্তি?

কি জানি। সেটা আপনার বাবাই বলতে পারবেন।

মেয়েটি একটু হাসল,

কি করেন আপনি? চোরা চৈরী না ইংরাজ বিদেন?

পার্থ কষ্টে নিজেকে সামলে বলল,

আমাকে দেখে আপনার কি সেই রকম ভয়ানক জীব মনে হয় ?

এবার মেয়েটি শাড়ীর আঁচল মুখে চেপে জোরে হেসে উঠল,

চেহারা দেখে লোক চেনা গেলে আর ভাবনা ছিল কি। জানেন, এই হাজতে একটি লোক এসেছিল। গলায় পৈতে, ধবধবে গায়ের রং, দেখলে ভক্তি হয়। ভোরবেলা উঠে চীৎকার করে চণ্ডী পাঠ করত। পরে বাবার কাছে শুনলাম, লোকটি তিনটে খুন করেছে, নির্বিকার চিত্তে!

পার্থ উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল।

একজন পুলিশ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

কি চাই বাবু ?

এরই বোধ হয় পাহারায় থাকার কথা। কিন্তু সে যে ছিলনা, তার প্রমাণ পার্থ নির্বাধার ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছে।

মেয়েটি উত্তর দিল,

তুমি যাও। আমি বাবুর সঙ্গে কথা বলছি।

পুলিশ কপালে হাত ঠুকে সেলাম করে বলল,

ঠিক আছে।

পুলিশ সরে যেতে মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল,

কই বললেন না কি আপনার অপরাধ ?

আপনার বাবাকেই বরং জিজ্ঞাসা করবেন।

বাবা বলবে না। নিজের জীবিকার কথা বাবা আমার সঙ্গে আলোচনা করে না। আপনিই বলুন।

পার্থ হাসতে হাসতে বলল,

আপনার বাবা আমাকে সন্দেহ করেন।

সন্দেহ ?

হ্যাঁ, সন্দেহ করেন যে আমি স্বদেশী।

স্বদেশী মানে ?

আপনি দারোগার মেয়ে, স্বদেশী শব্দটার মানে আপনার অজানা থাকবার কথা নয়। স্বদেশী তারাই যারা মাতৃভূমিকে ভালবাসে, যারা মাতৃভূমির ওপর বিদেশী পুরুষের চরণ-লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারেনা।

এক কথায় যারা মাতৃভূমিকে কলঙ্কমুক্ত করতে চায়, বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি দিতে চায়, তাই না ?

এবার পার্থ সাবধান হয়ে গেল।

এতক্ষণ যে সে বুঝতে পারেনি, এটা ভেবেই লজ্জিত হয়ে পড়ল।

ইচ্ছা করেই দারোগা আজ অনুপস্থিত। পরিবর্তে তার মেয়েকে রেখেগেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে হাতার কথা বলে পার্থকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। পার্থর মুখ থেকেই স্বীকার করা যে সে স্বাদেশিকতার উপাসক।

পার্থ উঠে দাঁড়াল,

আজ আমি উঠি। আপনার বাবাকে বলবেন, যে তাঁর নির্দেশমত আমি হাজিরা দিয়েগেলাম।

কিন্তু সে জন্য আপনার নামটা তো আমার জানা দরকার।

পার্থ সেন।

মেয়েটির চমৎকার দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এল,

পার্থ, পার্থ মানে তো অর্জুন।

হুঁ।

একমাত্র লোক যাকে শ্রীকৃষ্ণ গীতার শ্লোক শোনাবার আধার বলে মনে করেছিলেন।

মাপ করবেন, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি পারদর্শী নই। চলি।

শুনুন।

পার্থ কয়েক পা এগিয়েও ফিরে দাঁড়াল,

বলুন।

আমি ভীষণ একলা। আমার কথা বলবার মতন কেউ নেই। মাকে মনে পড়ে না। আমি যখন খুব ছোট, তখন মা মুছে গেছেন আমার জগত থেকে। বাবার কাছে শুধু খুন, খরম, ডাকাতির কথা শুনে শুনে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

পার্থ আর একটু এগিয়ে চেয়ারে ভরদিয়ে দাঁড়াল।

পাড়ার কেউ দারোগার মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে চায় না! আমি আলাপ করতে গেলেও, ভয়ে পালিয়ে যায়।

পার্থ খুব মনোযোগ দিয়ে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করল। তার চোখের মুখের, কপালের হাজার রেখা।

মেয়েটি কি অভিনয় করছে! যা নয় তাই বলে প্রকাশ করতে চাইছে নিজেকে? ছলনার জাল বিস্তার?

একটা কাজ করুন।

পার্থ বেরিয়ে আসতে আসতে বলল।

কি কাজ?

আপনার বাবাকে বলুন, একটি সুপাত্রে আপনাকে অর্পণ করুন। নতুন জীবনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিন।

পার্থর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও কিছুটা এগিয়ে এসেছিল।

দরজার পাল্লায় একটা হাত রেখে বলল,

আপনার উপদেশটা মনে রাখব।

পার্থ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে এসে ফিরে দেখল, দরজার পাল্লায় হাত রেখে মেয়েটি একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নিষ্পলক নেত্রে পথের দিকে চেয়ে।

পথে নেমে পার্থর খেয়াল হ'ল, সে ক্ষুধার্ত। কোন একটা দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে না নিলে, সে আর চলতেই পারবে না।

সার সার অনেকগুলো দোকান।

একটার মধ্যে পার্থ ঢুকে পড়ল।

খেতে খেতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মেয়েটিকে যে কথা বলে এল, সেটা কি তার নিজের জীবনের কথা নয়।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী সন্তান। গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে এল শহরের কলেজে। সেখানেই নতুন দীক্ষা। বিপ্লবের অক্ষরে তার বুকের মাঝখানে অগ্নিদীপ্ত কথা কে লিখে দিয়েছিল। দেশকে ভালবাস। যারা তোমার জন্মভূমির অমর্যাদা করে, তারা তোমার শত্রু। তাদের ধ্বংস কর।

ঠিক এই সময়ে বনানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া সামান্য। বুদ্ধি বিবেচনা কিন্তু সামান্য নয়।

সন্ধ্যার পর বিলের ধারে কিংবা কাঁকনডাঙার মাঠে দুজনে দেখা হ'ত।

হাতে হাত রেখে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি।

কিন্তু শ্যেনচক্ষু এ দৃশ্য ঠিক দেখতে পেয়েছিল।

পার্থর ডাক পড়েছিল গোপন ডেরায়।

শঙ্কর, ছাত্রনেতা শঙ্কর, পার্থকে বলেছিল,

পার্থ তোমার এসব বিলাসিতা ছাড়তে হবে।

বিলাসিতা!

পার্থ নিজের পোশাকের দিকে চোখ বোলাল।

আধময়লা ধুতি আর পাঞ্জাবি, দুইই খদ্দরের।

পোশাকের বিলাসিতার কথা বলছি না পার্থ, তোমার জীবনের বিলাসিতার কথা বলছি।

জীবনের বিলাসিতা! তাই বা কোথায়!

আমাদের জীবন দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত, এ জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, থাকতে পারেনা।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না শঙ্করদা।

পার্থ থেমে থেমে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল।

বনানীকে তোমার ছাড়তে হবে পার্থ। ওসব ভাব-বিলাসের অবকাশ আমাদের নেই।

পার্থ দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছিল।

শঙ্কর ছাড়া আরও তিনজন রয়েছে।

কিন্তু তাদের মুখের ভাব পাথরের মতন কঠিন।

এরা কি অন্তর্যামী। দূর গ্রামান্তের গোপন কাহিনীর খোঁজ এরা কি করে জানতে পারে!

বনানীকে ছাড়তে হবে!

বনানী পার্থর দেহের অংশ, মনের দ্বিতীয় সত্তার সাক্ষিণ হয়ে গেছে। এই অবিচ্ছেদ্য অংশকে কি করে পার্থ বাতিল করবে!

আমাদের এসবের সময় নেই পার্থ। প্রেমের গুঞ্জরণের অবকাশ সন্ন্যাসীর নেই।

সন্ন্যাসী?

তা'ছাড়া আর কি? অন্ধে ত্যাগের বিভূতি, কানে বীজমন্ত্র আমার দেশ, আমার দেশ। সন্ন্যাসীর চিন্তা যেমন পরমাত্মিক উন্নতি, আমাদেরও চিন্তা দেশকে বীজাণুমুক্ত করা। এছাড়া অন্য চিন্তা আমাদের থাকতে নেই, থাকা উচিত নয়।

সে রাতে পার্থর ঘুম হয় নি। বিছানায় ছট্‌ফট্ করেছে।
বনামী কেউ নয়। সে তপস্যায় বাধা। তাকে ত্যাগ করতেই হবে।
পার্থ বেশে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।
মাকে বলেছিল পড়ার চাপ বেশী। এখন বাড়ী যেতে পারবে না।
মা কিছু বলে নি।
কিছু দিন বাদে পর পার্থর মাকে একটা চিঠি এসেছিল।
খামের চিঠি। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লাইন পনেরোর চিঠি।
একটি কিশোরীর উত্তাপ ভরা। তার আবেগে রঙীন।
চিঠিটা বুকে চেপে পার্থ চোখ বন্ধ করেছিল।
তারপর নিজেকে বুঝিয়েছে সন্ন্যাসীর এ অনুভূতি অর্থহীন।

কয়েকদিন পরেই অবশ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছিল।
প্রবল বন্যায় তৃণখণ্ড যেমন বিপুল বেগে ভেসে যায়, তেমনই পার্থ ভেসে গিয়েছিল।
স্কুল-কলেজ ছেড়ে দাও। পরাধীন জাতির একমাত্র সাধনা দেশকে স্বাধীন করা। অধ্যয়ন বিদ্যাশিক্ষা এসব গৌণ।
দলে দলে ছাত্ররা পথে বেরিয়ে এসেছিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সেদিনের আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।
পার্থকে পাঠানো হয়েছিল মেদিনীপুরে। বিলেতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার জন্য।
সেখানেই পার্থ গ্রেপ্তার হয়েছিল।
দোকানীরা পুলিশে আগেই খবর পাঠিয়েছিল।
পার্থরা গিয়ে দেখে লাঠি আর বন্দুক হাতে পুলিশ মজুত।
কিন্তু প্রাণ নেবার নয়, প্রাণ দেবার মন্ত্রই তাদের জানা ছিল।
সবাই একসঙ্গে দোকানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
পার্থর জ্ঞান ছিল না।
মাথায় লাঠির আঘাত লেগে অচেতন হয়ে পড়েছিল।
যখন চোখ মেলল, দেখল হাসপাতালে শুয়ে আছে।

বাবু, আর কিছু নেবেন?
পার্থ চমকে মুখ ফেরাল।

দোকানের ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পার্থ বসে বসে পুরোনো দিনের রোমন্থন করছে।

পয়সা দিয়ে পার্থ উঠে দাঁড়াল।

চলতে চলতে আবার ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ল।

পার্থের গোত্রান্তর হ'ল।

অহিংস থেকে সহিংস।

দলের একটা অংশ বেরিয়ে এল।

এভাবে পুলিশের মার খেয়ে দেশসেবা করা চলে না। গান্ধীবাদ দর্শনের নতুন অধ্যায় হিসাবে হয়তো জনগ্রাহী, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা সামান্যই।

নতুন যে দল ছিটকে বেরিয়ে এল, তার নেতা শঙ্করদা।

শঙ্করদা বলেছিল, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশের মুক্তি অসম্ভব। যুগে যুগে দেশে দেশে তাই হয়েছে।

কিন্তু অস্ত্র কোথায়?

বাংলাদেশের খুটিনের তরুণদের হাতে কে অস্ত্র তুলে দেবে? সে অস্ত্র কেনার রসদই বা কোথায়!

সব আছে। সব হবে।

আন্তরিকতার মূল্য অপরিসীম। বিপ্লব ব্যর্থ হতে পারে না।

এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের যোগাযোগ শুরু হয়ে গেল। দেশ থেকে দেশান্তরেও ছুটল বার্তা।

অস্ত্র এল। চোরা পথে। কিছু থানাদিঘের হাতে, কিছু বিপ্লবীরা উপজাতিদের কাছ থেকে যোগাড় করল।

কিন্তু সে আর কতটুকু!

বৃটিশ শাসনের শিকড় এদেশের অনেক গভীরে চলে গেছে। তন্তুজাল ছড়িয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ধরেছে সর্বস্তরের মানুষকে।

অনেক লোকই কোন আন্দোলন চায় না। নেপাতুর মানুষের মতন চুপ হয়ে থাকতে চায়। দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই থাক।

আলিয়ানওয়ালাবাগ, হিজলী বন্দীশালার ব্যাপারও এদের চেতনা আনতে পারে নি।

পার্থ পথ ছেড়ে বিপথে নামল।

এপাশে জঙ্গল। মাঝখানে পায়ে চলা সরু পথ।

মা মারা যাবার খবর গাঁয়ের লোকের মুখে পেয়েছিল;

তখন পার্থ জেল থেকে খালাস পেয়ে বাইরে এসেছে।

গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল।

গিয়ে দেখে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়রা বাড়ী দখল করেছে। পার্থকে দেখে তারা মোটেই খুশী হয় নি।

পার্থ থাকতেও আসে নি। উদ্বাস্তু বিদ্বেষের কোন মানে হয় না।

নিজের সাতপুরুষের ভিটেয় একটু বসে পথের মানুষ আবার পথে বেরিয়েছিল।

বিকালে একবার বনানীদের বাড়ীর সামনে গিয়েছিল।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে হয় নি। তার এক ভাইয়ের কাছেই খবর পেয়েছিল। বনানী নেই। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

বনানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অনেক পরে।

উত্তরবঙ্গে সর্বনাশা বন্যায় মানুষের দুঃখ চরমে উঠল। এক দল নিয়ে পার্থ জলপাইগুড়ি গেল ত্রাণকার্য করতে।

এ ধরণের জনহিতকর কাজ এক ধরণের মুখোস। অন্য সবাইকে জানানো হয়, যে একটা নিছক সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান। রাজনীতির সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই।

জলপাইগুড়ি শহরে দেখা হয়েছিল।

পার্থ আর তিনজন ছেলে একটা চাদর টান করে মেলে ধরে বাড়ী বাড়ী ঘুরছিল।

যার যতটুকু সাধ্য দিতে কেউ কার্পণ্য করেনি।

কিন্তু এক বাড়ীতে বাধা পেল।

ঈষৎ স্থূলকায় একটি লোক। হাতে তাগা, আঙুলে অনেক আংটি। রুক্ষ মুখ চোখের ভাব।

দরজা খুলেই বলল,

আপনারা বৃথাই চেষ্টা করছেন মশাই। এ হচ্ছে ভগবানের মার। আপনারা বাড়ী বাড়ী জিনিস কুড়িয়ে আর কতটুকু সাহায্য করতে পারেন?

পার্থ হাসল,

এ ছাড়া আর উপায় কি বলুন? মানুষের দুঃখে মানুষই তো এগিয়ে আসে। যদি এ দেশে স্বাধীন সরকার থাকত, তাহলে অন্যরা হ'ত। আমাদের কিছু করবার দরকারই হ'ত না।

এবার লোকটি মোক্ষম কথা বলল,

তারপর এই যে মশাই দলটা হল চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে। পয়সা, চাল, কাপড় অনেক কিছু সংগ্রহ এসব ঠিক জায়গায় যায় কিনা, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পার্থের সঙ্গের ছেলেরা ঘারমুখী হয়ে উঠল,

আস্পর্ধা লোকটার। এমন ইতর অভিযোগ করে কি করে?

পার্থ তাদের থামিয়ে দিল।

ঠিক আছে, আপনার যখন সন্দেহ হয়েছে, তখন আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু নেব না।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

পার্থ তার দল নিয়ে ফিরে যেতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল।

একটু দাঁড়াল।

এদিকের গলির দরজার মুখে অবগুণ্ঠনবতী একজন।

পার্থরা দাঁড়িয়েছিল।

পোটাছয়েক পুরানো কাপড়, একটা থালায় চাল, আলু, আর একটা পাঁচ টাকার নোট।

ছেলেরা এগিয়ে গিয়ে সেগুলো চাষীর ছেলে নিয়েছিল।

ওর কথায় আপনারা কিছু মনে করবেন না। উনি অমনি মানুষ।

প্রায় ফিস ফিস করে মেয়েটি বলেছিল।

পার্থ হেসে উত্তর দিয়েছিল,

না, না, ওসব কথায় আমাদের কিছু মনে করলে কি চলে! আমরা প্রত্যেকের দরজায় খুশি পেতে দাঁড়াব। তাদের নিন্দা প্রশংসা যাই জুটুক।

মেয়েটি চমকে মুখ তুলেছিল। ঘোমটা খসে পিঠের ওপর।

পার্থদা!

বনানীকে চিনতে পার্থর একটুও দেরী হয় নি।

কিন্তু কোন কথা বলতে পারে নি।

পাশের জানলা খুলে দিয়েছিল।

জানলার ওপারে গৃহস্বামী। সম্ভবত বনানীর স্বামীদেবতা।

দরজা বন্ধ করে বনানী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

রাস্তায় এসে একজন ছেলে প্রশ্ন করেছিল,

মেয়েটি কে পার্থদা?

আমাদের গাঁয়ের।

বড় কড়া হাতে পড়েছে। আমার তো মনে হয় আমাদের এ সব দেবার জন্য তাকে জাহান্না সহ্য করতে হবে।

পার্থ কোন উত্তর দেয় নি।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, এতদিন পরে বনানীর সঙ্গে দেখা, এ সাক্ষাৎ তার মনে কোন আলোড়ন তোলে নি। বনানী শুধু গাঁয়ের মেয়ে নয়, মনেরও মেয়ে। একদিন ছিল যখন পার্থ ভাবত, বনানীকে ছাড়া তার জীবন কল্পনা করাও অসম্ভব।

আজ দুজনের জীবনের স্রোত দু'মুখী। প্রায় বিপরীত ধারায় বয়ে চলেছে।

মনে আছে, সেদিন বিকালেই কাজের অজুহাতে পার্থ জলপাইগুড়ি ছেড়েছিল।

এ শহরে থাকতে তার আর সাহস হয় নি। কিছু বলা যায় না, পথে ঘাটে যদি বনানীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায়!

নিজের হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা করে।

পার্থ সোজা খালের ধারে চলে এল।

পাড়ে নলখাগড়ার বন। চাপ চাপ কাদা।

মাঝখান দিয়ে বোট চলেছে। কোনটায় ইট বোঝাই, কোনটায় বালি।

এদিকে রোদের তাপ কম।

আমতাওড়া আর শিউপাছের জটলা। তাছাড়া খালের ওপর দিয়ে যে হাওয়াটুকু আসছে, তাতে ভিজে আছেন।

পার্থ গাছের নীচে বসল।

হাত ঘড়িতে সময় দেখল। প্রায় বারোটা। আর এক ঘণ্টা।

বারোগাঁর মেয়েটির কথা আবার মনে হল।

মেয়েটির কথাবার্তা ভারি আন্তরিকতাপূর্ণ। আলাপ করার লোক পায় না বলেই বুঝি পার্থকে ছাড়তে চাইছিল না।

আজকেই হয়তো শেষ দিন।

নির্দেশ পেলে পেলে আজকেই এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।

কোথায় তাও আগে থেকে জানা পার্থর পক্ষে সম্ভব নয়।

এ দেশ স্বাধীন হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ।

কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ অত্যাচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে।

নিরক্ষরতার বিষ, সঙ্কীর্ণতার বিষ থেকে অব্যাহতি।

এ দেশের মানুষ এ দেশ শাসন করবে।

পার্থ কি দেখে যেতে পারবে দেশের এই স্বর্ণোপম অবস্থা!

অনেক রক্তপাতের পর স্বাধীনতা, শান্তিও আসবে।

পার্থ না থাকলেও লোকরা পার্থদের নাম স্মরণ করতে পারে।

শহীদ হিসাবেও।

হঠাৎ মেঠো গানের সুরে পার্থর খেয়াল হল।

বালি বোঝাই একটা নৌকা পারের দিকে আসছে।

মাঝি গান গাইছে। দেহতত্ত্বের গান।

পার্থ বোটের দিকে চোখ রাখল।

খুব ধীরে, নলখাগড়ার গাছগুলোকে ওইয়ে ফেলে, বোট এগিয়ে এল।

পার্থর বুকের স্পন্দন দ্রুততর।

সে উঠে দাঁড়াল।

বোটের ওপর থেকে মাথায় গামছা বাঁধা একটা লোক কাদার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

পার্থর সামনে এসে হাতজোড় করে বলল,

জয় হায়জীকি।

এটাই সাঙ্কেতিক শব্দ।

পার্থ উত্তর দিল,

হায়জীকি জয়।

লোকটা আবার বোটে ফিরে গেল। ছোট একটা কাঠের বাক্স হাতে নিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পার্থর কাছে এগিয়ে এল।

বাক্সটা পার্থর হাতে তুলে না দিয়ে সামনে মাটির ওপর রাখল। পার্থ ক্ষিপ্রহাতে বাক্সটা তুলে নিল।
হাত দিয়ে তালাটা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই খুশী হ'ল।
লোকটার দিকে ফিরে বলল,
ঠিক আছে।
লোকটা আবার বোটে গিয়ে উঠল। আস্তার ওপর লগি ঠেলে ঠেলে জলের ওপর বোট ভাসাল।
একটু একটু করে বোটটা খালের ধারখানে চলে গেল।
মোটা একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে পার্থ মাটি খুঁড়ল।
বেশ একটু গর্ত হতে বাক্সটা সাবধানে নামিয়ে রাখল।
ধারেকাছে কেউ নেই। এই আগাছার জঙ্গলে কেউ বড় একটা আসে না।
জঙ্গল পার হয়ে পার্থ রাস্তার দিকে চলতে শুরু করল।
ভাল জিনিস হাতের মধ্যে এসে পড়েছে, সেইজন্য মন খুব প্রফুল্ল।
এখন রাত্রে একসময়ে এসে বাক্সটা তুলে নিয়ে যেতে হবে।

ধনানীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।
বিয়ের পর সেই প্রথম, সেই শেষ।
তারপর আর ধনানীর কথা পার্থর মনে পড়বারও অবকাশ হয়নি।
উষার মতন ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে।
শঙ্করদা নিজের হাতে রিভলভার তুলে দিয়েছিল,
পার্থ, যেমন করেই হোক ইনস্পেক্টর মজুমদারকে খতম করতে হবে। আমাদের দলের দুটো ছেলের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি বলে।
জানে, পার্থ সব জানে।
দীপক আর বলাই। বয়স ষোল সতেরোর বেশী নয়। দলের খবরাখবরের ভার ছিল তাদের ওপর।
সন্দেহবশে পুলিশ ধরল।
ইনস্পেক্টর মজুমদারের কাছে নিয়ে এল।
সবাই বলত, মজুমদার সাপের চেয়েও ঠাণ্ডা, বাঘের চেয়েও হিংস্র। যে প্রশ্নগুলো শুধু মারার জন্য মারা, সে প্রশ্নগুলো মজুমদারের পছন্দের ছিল না।
দীপক আর বলাইয়ের দুটো পা কড়িকাঠে বেঁধে মাথাটা নীচু করে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তার ওপর চাবুকের পর চাবুক।
দুজনেরই মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল।
হাতের নখে পিন ফোটানো, পায়ের পাতায় গরম লোহার স্পর্শ।
কিন্তু একটি কথাও তাদের মুখ থেকে বের করতে পারেনি।
পাঁচদিন পর যখন ছেড়েছিল, তখন তাদের আধমরা অবস্থা।
সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পুলিশের গায়েই ঢলে পড়েছিল।

দিন দুয়েক পর হাসপাতালে যারা গিয়েছিল।

সেই থেকে শঙ্করদার প্রতিজ্ঞা মজুমদারকে পৃথিবী থেকে সরাতেই হবে।

দু'একবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

এসব বিষয়ে মজুমদার নেকড়ের চেয়েও ধূর্ত। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। তাই শঙ্করদা বলেছিল, শপথ নাও পার্থ, মজুমদার জীবিত থাকতে তুমি অস্ত্রগুল গ্রহণ করবে না।

নিলাম শপথ।

স্নিগ্ধভাবে স্পর্শ করে পার্থ বলেছিল।

তারপর দু'দিন কেটেছে নিরুদ্ধ অবস্থায়। মজুমদারকে বাগে পায় নি।

পার্থ শেষ চেষ্টা করেছে।

মজুমদারের বাড়ী টালিগঞ্জ।

অবশ্য প্রয়োজনে মজুমদার বাড়ীও বদলেছে।

রাত ঠুকে পার্থ বাড়ীর কাছে একটা শিরীষগাছের ডালে বসে রইল।

তার সাইকেলটা ডালপালা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখল গাছের গুঁড়ির পাশে।

মশার কামড় খেতে খেতে শরীর প্রতীক্ষা।

বেশ রাতে বুটের শব্দ হতে পার্থ টান হয়ে বসল।

আবছা চাঁদের আলো। পরিষ্কার কিছু নয়, তবে একেবারে অস্পষ্ট নয়।

একেবারে কাছে আসতে চেনা গেল।

মজুমদার।

পুলিশের পোশাক নয়, পরণে সুতী আর গেঞ্জী। শুধু পায়ে বুট, সম্ভবত রাস্তার কাদার জন্য।

শিরীষগাছের কাছাকাছি আসতেই দুটো গুলি। অবশ্য একটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পার্থ সুযোগ হারাতে চায় নি।

একটা বুকে আর একটা কপালে।

অব্যক্ত একটা আর্তনাদ করে মজুমদার মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছিল।

পার্থ আর অপেক্ষা করে নি। গাছ থেকে নেমে সাইকেল তুলে নিয়ে বিদ্যুতগতিতে ছুটেছিল।

মাত্র মাইল খুরে একটা পড়ো বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে আর দাঁড়াতে পারে নি। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়েছিল।

শঙ্করদা বাইরে এসে পার্থকে পাঁজাকোলা করে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল।

গরম দুধ পান করার পর পার্থ একটু ধাতস্থ হয়েছিল।

পার্থ চোখ খুলতেই শঙ্কর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,

মজুমদার।

জড়ানো গলায় পার্থ উত্তর দিয়েছিল,

খতম।

তার পরের দৃশ্যের কথা পার্থর আজও মনে আছে।

সংবাদ শুনে শঙ্কর নাচতে শুরু করেছিল।

পরেরদিন যে কাবলীওয়ালাটি চৌরঙ্গীর পথে বেড়াতে বেড়াতে হকারদের চীৎকার শুনছিল, সে যে শঙ্করদা, সেটা পার্থর জানা।

প্রথম পাতাতেই মজুমদারের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ফটো প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের হুমকি,

সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদ করতেই হবে। একজন মজুমদারের জন্য একশ' জন সন্ত্রাসবাদীর প্রাণ চাই।

শঙ্করের পরামর্শে পার্থ নাগপুর চলে গিয়েছিল।

তার সাইকেলটা মাঝগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কে একজন বিবৃতি দিয়েছে, গুলির শব্দের অব্যবহিত পরেই একটা লোক সাইকেলে দ্রুত পালিয়ে গেছে।

লোকটার মুখে বিরাট দাড়ি।

সেই নকল দাড়িও পার্থ মাঝ-দরিয়ায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।

তারপর থেকে অত্যাচার চরমে উঠেছিল।

জোয়ান ছেলেদের বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর শুরু করেছিল। নিরপরাধ ছেলেদের বন্দী করে রেখেছিল হাজতে।

ঘুরে বসে নিষ্ফল আক্রোশে পার্থ নিজের হাত কামড়েছিল।

যদি শক্তি থাকত, যদি কোনদিন হাতে শক্তি পায়, তাহলে এই বুটিশের পদলেহী কুকুরদের শায়েস্তা করবে।

পরের দিন সকালে পার্থ আবার থানায় গিয়ে হাজির।

যতদিন নির্দেশ না আসে, ততদিন এখানেই থাকতে হবে, এবং ততদিন থানাতেও হাজিরা দিতে হবে। নাহলেই সন্দেহ করবে।

এবারে মেয়েটি নেই। স্বয়ং দারোগা হাজির।

পার্থ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দারোগা বলল,

কি, কাল বুঝি বিজয়ার সঙ্গে খুব গল্প করে গেছেন?

জেনেও পার্থ না জানার ভান করল,

বিজয়া কে?

দারোগা দুচোখ কুঁচকে পার্থর দিকে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর বলল,

বুঝতে পারছেন না?

আপনার মেয়ে?

এত দেরী হ'ল বুঝতে? স্বদেশীওয়ালাদের মাথা খুব সাফ শুনেছিলাম।

স্বদেশীওয়ালা হলে তাই হ'ত।

পার্থ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,

বসুন মশাই, বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। হাতের কাজটা সেরে নিই। দারোগা বিরাট জেনারেল ডায়রির ওপর ঝুঁকে পড়ল।

প্রায় আধ ঘণ্টা।

পার্থ চুপচাপ বসে রইল।

হঠাৎ ভিতর থেকে পাহারাওয়ালা দু' কাপ চা নিয়ে এসে, এক কাপ দারোগার সামনে, আর এক কাপ পার্থর সামনে রাখল।

দারোগা মুখ তুলল,

সর্বনাশ, এ যে দেখছি বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। মেয়ে ভিতর থেকে আপনার জন্যও চা পাঠিয়ে দিল। এক দিনে খুব জমিয়েছেন তো মশাই।

দারোগার বলার ভঙ্গীতে পার্থ লজ্জা পেল।

ছি, ছি, কি বলছেন? আপনার নিজের মেয়ে না?

নিজের মেয়ে হ'লে আর কি হবে মশাই, হয়েছে একেবারে মায়ের মতন। জানেন।

তখন আমি ছোট দারোগা। স্বদেশীদের ধরবার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হৌড় ঝাঁপ করছি, সেই সময় স্বদেশীর চাইকে যশোদা ভাতের থালা ধরে দিচ্ছে। যশোদা আমার পরিবার বুঝলেন। পাড়ার লোকের কাছে খবর শুনে একদিন খুব গালিগালাজ করলাম। তা বললে কি জানেন?

পার্থ কোন উত্তর দিল না। যেমন চুপচাপ বসে ছিল, তেমনই রইল।

বললে, কি জানি স্বদেশী টদেশী বুঝি না। ওদের দেখলে মায়া হয়। আমার একটা ছেলে যদি এসে খেতে চাইত, না বলতে পারতাম?

বললাম, ছেলেই বটে, ওরা সব কালনাগিনীর বাচ্চা। ইংরেজ আমাদের বাপের সামিল। অন্ন দিচ্ছে, আর ওরা তারই উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করছে। কি হল, চা খাচ্ছেন না?

খাব কিনা ভাবছি।

ভয় নেই মশাই, ওতে বিষ দেওয়া নেই। স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

না, সেজন্য ভয় নেই। খানায় বিষও অমৃত হয়ে যায়। চা খাওয়া তেমন অভ্যাস নেই।

দারোগা সজোরে হেসে উঠল।

ছোট-খাট অভ্যাস করুন মশাই, বড় অভ্যাস ঠাঁই পাবে না। নইলে মধ, মেয়েছেলের অভ্যাসে পেয়ে বসবে।

পার্থ চায়ের কাপে মুখ দিল।

আর কদ্দিন আমাদের জ্বালাবেন?

মানে?

মানে কদ্দিন থাকবেন আমার এলাকায়। আপনাদের তো বিশ্বাস নেই, দিব্যি আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন, সুযোগ পেলে আমার ওপরই পিস্তলের টিপ পরীক্ষা করবেন।

জামার হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে পার্থ বলল,

জায়গাটা বেশ লাগছে। ভাবছি থেকেই যাব, যদি অবশ্য স্কুলের চাকরিটা হয়।

দারোগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পার্থর আপাদমস্তক দেখল।

আপনি তো ভুলে যাননি তো?

কে বললে? এই দেখুন।

পার্থ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দেখাল।

এই যে রসিদ।

দারোগা হাসল,

না, মশাই, আপনারা চালাক লোক, সব দিক বেঁধে কাজ করেন।

পার্থ উঠে দাঁড়াল।

চলি, হাজিরা দেওয়া তো হ'ল।

বসুন না মশাই। একটু সঙ্গ ক'রি। এই নিন।

দারোগা একটা সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল।

পার্থ হাতজোড় করল,

মাপ করবেন। সিগারেট আমার চলে না।

'ও' ভুলে গিয়েছিলাম। বিলেতী জিনিস আপনারা স্পর্শ করবেন না।

কি যে বলেন।

খুন খারাপী নিয়ে কারবার। দিনরাত এই নিয়েই আছি। আপনাদের মতন ভাললোকের সাক্ষাৎ পাচ্ছি কোথায়। দেশকে আমরাও ভালবাসি মশাই। ছেলেবেলায় গানও শিখেছি, বন্দ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ। কিন্তু বোমা বারুদের কারবার কেন মশাই? এ আবার কি রকম দেশাত্মবোধ!

নমস্কার। চলি, আবার কাল আসব।

পার্থ একেবারে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল।

কিছুটা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখল।

মনে হ'ল চকিতের জন্য একটা ফিকে নীল শাড়ী যেন জানালা থেকে সরে গেল।

তার মানে বিজয়া দাঁড়িয়ে ছিল।

বিজয়া তার মায়ের মতন হয়েছে। স্বদেশীদের প্রতি গোপন সহানুভূতি।

এ দেশে মায়েরা দিনদিনই বিচিত্র চরিত্র।

ছেলেদের মরণ মহোৎসবে যোগ দিতে পাঠায়। রাত্রির অন্ধকারে ঘরছাড়া সন্ন্যাসবালীদের মুখের অন্ন এগিয়ে দেয়। নিজের আঁচল কেটে রক্তের তিলক এঁকে দেয় বিজয়ীর ললাটে।

যে ছেলেকে স্নেহাঞ্চলে ঢেকে রাখে, আবার প্রয়োজনে তাকেই বিপদের মুখে ঠেলে দেয়।

পার্থ খালের ধারে এসে বাক্সটা তুলে নিল।

রাত্রের অন্ধকারে এসব জায়গায় আসতে সাহস হয় না। সাপখোপের আস্তানা। পিস্তল তো দূরের কথা প্রাণ নিয়েই ফিরতে পারবে না।

দিনের আলোয় সামান্য অসুবিধা আছে, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। অনন্তকাল এ জিনিস মাটির নীচে চাপা দিয়ে রাখাও যায় না।

গামছা দিয়ে পার্থ বাক্সটা পেটকাপড়ের সঙ্গে বাঁধল। সামান্য উদরের ক্ষীতি। খুব সন্দেহজনক কিছু নয়।

রাস্তায় না উঠে আগাছার জঙ্গল দিয়ে এগোতে লাগল।

এ অবস্থায় পুলিশের হাতে পড়লে বাঁচবার কোন পথ নেই। একেবারে রসালসমেত গ্রেপ্তার।

এমন সুযোগ দারোগা ছাড়বে না।

রাস্তা দিয়ে কিছু লোক চলেছে। বেশীর ভাগই দিনমজুর কিংবা গরুর পাল সামনে নিয়ে রাখাল ছেলের দল।

তাদের কোন দিকে নজর নেই। হন্ হন্ করে নিজেদের পথে চলেছে।

পার্থ আর একটু জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

যখন পোড়ো বাড়ীতে গিয়ে পৌছল, তখন পার্থর সারাদেহ ঘর্মাক্ত। পিস্তলের বাক্সটা দেয়ালের ইট খুলে গর্তের মধ্যে রেখে দিল।

তিনদিন এখানে থাকবে। তারপর লোক আসবে নিতে।

ততদিন পর্যন্ত পার্থর দায়িত্ব।

পার্থ বিছানায় শুপর বসল।

এই সময়টা বড় ক্লান্ত লাগে। কর্মহীন, অলস দিনের সময়।

এরচেয়ে যখন কাজ থাকে কিছু করার নির্দেশ, তখন রোমন্থনের অবকাশ থাকে না। রক্তের গতিতে ছুটোছুটি শুরু হয়। মৃত্যু আর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

সবুজ কল্পনা মনের মধ্যে ভীড় করার সময় পায় না। অনেকদিনের পুরোনো একটা মনে পড়ে গেল।

পুলিশে তাড়া করেছে। পাগলের মতন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পার্থ ছুটেছে। সঙ্গে আরো দু'জন ছিল, তারা কোনদিকে ছিটকে পড়েছে, পার্থ খেয়াল ক'রে নি।

পার্থর বুকে পিঠে কার্তুজের গোছা। ধরা পড়লে নিজে তো বিপদে পড়বেই। কার্তুজও বরবাদ হয়ে যাবে।

দু'একটা বাড়ীতে পার্থ দরজা ঠেলেছে।

কেউ দরজা খোলে নি। অদেশীদের প্রশ্রয় দিতে কারো সাহস হয় নি।

গ্রামের কোণে গোটা চারেক চালা ঘর।

রাত এগারোটা। গ্রামের পক্ষে অনেক রাত।

সেই রাতেও পার্থর মনে হ'ল দরজার কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে গিয়েই পার্থ থমকে দাঁড়াল।

কপালে কাঁচ পোকার টিপ শরীরে সস্তা ডুরে শাড়ী জড়ানো। দু'চোখের ভঙ্গীতে জৌলুসের ইতিহাস লেখা।

পার্থ বুঝতে পারল গুপ্তাদের ডেরাকলের মজুরনী এগিয়ে আসে আত্মবিনোদন করতে।

আসুন বাবু, আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি।

আমার অপেক্ষা?

পার্থর ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

ঘরের মধ্যে আসুন বাবু।

পার্থ স্থির করল চালাঘরের পাশ দিয়ে পুকুরের ধার ঘেঁষে দৌড়ে পালাবে, কিন্তু পিছনে চীৎকার শুনতে পেল।

এইদিকে গেছে। সোজা।

আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে পার্থ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিল।

তুমি আমাকে বাঁচাও! আমাকে পুলিশে তাড়া করেছে।

পুলিশ।

বিস্ময়ে মেয়েটির দু'টি চোখ কপালে উঠল।

কি আমার রাতের মাগর রে! একেবারে পুলিশ পিছনে নিয়ে এসেছ। এখন বামেলা পোয়াতে পারব না বাবু! দরজা খুলে দিচ্ছি, কেটে পড়।

সব ভুলে পার্থ মেয়েটির একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

ভয় পেও না, আমি চোর ছ্যাচড় নই।

বটে তো পুলিশ পিছু নিয়েছে কেন?

আমি দেশের কাজ করি।

মেয়েটি টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,

মানে, স্বদেশী।

পার্থ ঘাড় নাড়ল।

বাবা, সঙ্গে বোমা বারুদ নেই তো।

না, না, আমি শুধু লেকচার দিয়ে বেড়াই।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসল,

লেকচার দিয়ে লালমুখো সায়েব তাড়াবে?

পার্থ উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল।

দরজার বাইরে জুতোর শব্দ।

মেয়েটি ছুটে এসে পার্থর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। তারপর তাকে টানতে টানতে বাড়ীর পিছন দিকে নিয়ে গেল।

খড়ের পাহাড়। পার্থ তার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এদিকে দরজায় শব্দ। মনে হ'ল কে যেন মোটা লাঠি দিয়ে ঠুকছে।

মেয়েটি একটু ভয় নিয়ে দরজা খুলে দিল।

দুজন পুলিশ। একজনের হাতে টর্চ।

এ ঘরে লোক ঢুকেছে?

মেয়েটি আঁচল কোমরে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াল,

চুকেছে সে মুখপোড়া। বলে, চারদিন একটা লোকের সাক্ষাৎ নেই। কি করে পেট চলবে, তাই ভাবছি। মাঝরাতে হরজা ঠেঙিয়ে রসিকতা হচ্ছে।

আমরা ঘর সার্চ করব।

কি করবি ?

ঘরে ঢুকে দেখব।

মেয়েটি একপাশে সরে দাঁড়াল।

বেশ দেখ। কিন্তু কাউকে যদি না পাস তো খাবার পেটা করব।

পুলিশ দুটো ঢুকে পড়ল।

টর্চের আলোয় ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তক্তপোশের তলা পর্যন্ত।

উঠানের ওপরও আলো ফেলল।

পিস্তলটা মুঠোর মধ্যে ধরে পার্থ খড়ের গাদার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে রইল।

কোন কথা না বলে পুলিশরা বেরিয়ে পড়ল।

পার্থ বের হল তার অনেক পরে।

মেয়েটিই এসে তাকে ডাকল,

কই, এবার বের হও।

দেহ থেকে খড়ের কুটো ঝাড়তে ঝাড়তে পার্থ নেমে এসেছিল।

বেরিয়ে যাবার মুখে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল,

হা গা বাবু, দেশ স্বাধীন হবে তো ?

অদ্ভুত প্রশ্ন।

পার্থ বলল,

হবে, এই আশাতেই তো আমরা রক্ত দিয়ে চলেছি, সংগ্রাম করছি।

মেয়েটি দুটো হাত যোড় করে কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে বলেছে,

তাহা হোক, হোক। তোমাদের পরিশ্রম সফল হোক।

তারপর মুখটা করুণ করে প্রশ্ন করেছিল,

দেশ স্বাধীন হলে আমাদের অবস্থা ভাল হবে তো ? পোড়া পেটের জন্ত এই ছ্যাচড়ামো আর ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, পরণের শাড়ী গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ি। সব সমস্যার সমাধান হোক, তাও পারি না। ভয় করে। দিনরাত কেবল নিজের জ্বালায় জ্বলছি।

কথা বলতে বলতে মেয়েটির দুটি চোখ জলে ভরে এসেছিল।

পার্থ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। পাশ কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে মিশে গিয়েছে।

এখনও অবসর সময়ে কথাটা মনে পড়ে।

দেশের ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ সকলের কথা ভেবেছে। স্বাধীন দেশে সকলের অবস্থা উন্নত হবে, কিন্তু বারবিলাসিনীদের কি হবে ? আইন করে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়াই তো আর সমস্যার সমাধান হয় না।

সামাজিক ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন করতে হবে যাতে সমাজের এই বলিদের এ পথে নামতে না হয়।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব!

বিকাল হ'তেই পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

এই পোড়ো বাড়ীর ধারে কাছে লোকালয় নেই। কারো যাওয়া আসার পথও নয়। সেদিক দিয়ে নিরাপদ।

কিন্তু কিছু বলা যায় না।

রাখাল ছেলেরা গরু ছেড়ে এদিক ওদিক করে।

পোড়ো বাড়ীর মধ্য থেকে লোক বের হতে দেখলেও সন্দেহ করবে।

জানাজানি হয়ে গেলেই সর্বনাশ।

পার্থ কিছুক্ষণ দাঁড়াল।

না, কেউ নেই।

পার্থ আগাছার মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

কিছু লোক—বেশ কিছু লোকের ধারণা অহিংসবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসবে। শাসকদের অত্যাচার করে করে অত্যাচারের হাত পঙ্গু হয়ে যাবে। তাদের জেলখানায় আর জায়গা থাকবে না। হিংসা দিয়ে অহিংসার মোকাবিলা করা যায় না।

পার্থর দল এ মত পোষণ করে না।

শক্তি দিয়ে যন্ত্রের আসন ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। শাসকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে হবে।

দিকে দিকে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলে শাসকদের নাস্তানাবুদ করতে হবে।

এর জন্য অনেক রক্ত, অনেক প্রাণের প্রয়োজন।

সেই রক্ত, সেই প্রাণ দেবার লোকের অভাব নেই।

রাস্তায় পা দিয়েই পার্থ থমকে দাঁড়াল।

অনেক লোক চলেছে দল বেঁধে।

পার্থ একজনকে জিজ্ঞাসা করল,

কোথায় যাচ্ছ গো?

লোকটা একটু থেমে বলল,

আজ মহিমপুরের মেলায়। আজ সকাল থেকে মেলা বসেছে যে। তিনদিন থাকবে।

মহিমপুর কতদূর?

লোকটা আর পিছন ফিরল না। যেতে যেতেই বলল,

এই তো মাইল দু'য়েক।

ভিড়ের মধ্যে পার্থ নিজেকে মিশিয়ে দিল।

এখন কোন কাজ নেই।

পিস্তল নিতে লোক যদি আসে তো গভীর রাতে। তারাই খবর আনবে।

যেতে যেতেই পার্থ শুনল।

অনেক বছর আগে। এক ফকির এসে বটগাছতলায় আস্তানা গেড়েছিল। ধুনি জ্বালিয়ে একান্ত সাধনা।

মাথার ওপর গাছের ডালে একদিন একটা কাক অস্বাভাবিক স্বরে ডেকে চলেছিল। ফকিরের সাধনায় ব্যাঘাত হতে সে ক্রুদ্ধ চোখে কাকের দিকে যেতেই আশ্চর্য কাণ্ড। কাকটা ছটফট করতে করতে মাটির ওপর পড়ে গেল নিশ্চল হয়ে।

তালের রস মাথায় নিয়ে একটা লোক কোনাকুনি মাঠ পার হচ্ছিল, ব্যাপার দেখে সে তো অবাক। গাছের নীচে বসে পড়ল।

আরো কিছু দেখার বাকি ছিল।

ফকির কিছুক্ষণ পর ধুনি থেকে ছাই তুলে কাকের ওপর ছিটিয়ে দিল। মরা কাক জ্যান্ত হয়ে কা কা করতে করতে উড়ে গেল।

ততক্ষণে লোকটা ফকিরের দুটো পা জড়িয়ে ধরেছে। ঠাকুর আমাকে বাঁচাও।

ফকির বিরক্ত চোখে তার দিকে যেতে বলেছে :

তোর কি হয়েছে ?

মূত্রবেদনা ঠাকুর। যখন হয়, কাটা ছাগলের মতন ছটফট করি।

ফকির আবার ধুনি থেকে ছাই নিয়ে তার পেটে মাখিয়ে দিয়েছে।

চলতে চলতেই লোকটা ব্যথাটা অল্প অল্প অনুভব করছিল, সে ব্যথা মুহূর্তে চলে গেল।

ব্যস, আশপাশ থেকে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক এসে হাজির হ'ল। আদি ব্যাধির কিরিস্তি নিয়ে।

মেলা বসে গেল।

ফকির আর নেই। বহু বছর আগে মারা গেছে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মেলা বসে। আগে এক মাস মেলা থাকত, এখন তিনদিন।

পার্থ যখন মেলার মাঠে গিয়ে পৌঁছল, তখন বেশ ভীড়। মেলার সব উপকরণই হাজির। সারি সারি দোকান বসেছে, হাঁড়ি কলসি থেকে অলঙ্কারের দোকান। এ ছাড়া খাবারের দোকান তো আছেই।

পার্থ ঘুরে ঘুরে দেখল। শুধু সময় কাটানো।

তৃপ্তির সঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করল, কোথাও কোন বিদেশী জিনিস নেই, সবই এদেশের গ্রামজাত।

মেলার শেষ দিকে একটু ফাঁকা জায়গা।

পরিশ্রান্ত মানুষ সেখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

একটা গাছের তলায় পার্থও বসে পড়ল।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল।

বিজয়া ঘুরছে। পিছনে একটা পুলিশ।

বিজয়ার হাতে একটা ঠোঙায় পাপড়। চলতে চলতে পাপড়ের টুকরো মুখে দিচ্ছে।

পার্থর বাঁদিকে অলঙ্কারের দোকান।

কেরিকেলের গয়না থেকে কাঁচের চুড়ি।

বিজয়া এগিয়ে এসে কাঁচের চুড়ি বাছতে লাগল।

কিনে নীল রংয়ের চুড়ি। তার ওপর সোনালী ছিট।

অনেকক্ষণ বেছে বেছে বিজয়া পছন্দ করল।

তারপর দরাদরি শুরু হল।

এই সময় পুলিশ একটু এগিয়ে এসে বলল,

মা, বলেন তো বেটাকে এক চড় মেরে জিনিস কেড়ে নিই। দর করা ঘুচিয়ে দিই একেবারে।

বিজয়া ভ্রু কুঞ্চিত করল,

না, না, ছি। এখানে তোমাকে জোর জুলুম করতে হবে না। তোমার কাছে কিন্তু বাড়তি পয়সা হবে?

পুলিশ ঘাড় নাড়ল।

না মা, পয়সা নিয়ে বের হই নি।

আঁচলের গিঁট খুলে বিজয়া নিজের পয়সাগুলো একবার গুনে নিয়ে বলল,

মুস্কিল হয়েছে। আরো ছ আনা দরকার। রোজ রোজ তো আসতে পারব না।

পুলিশ পরামর্শ দিল:

আমি বরং কাল এসে নিয়ে যাব মা। এই চুড়ি তো?

ইতিমধ্যে পার্থ উঠে দাঁড়িয়েছে। বিজয়ার পাশে এসে গেছে।

কত কম পড়েছে?

পার্থর কণ্ঠস্বরে বিজয়া চমকে মুখ ফেরাল।

আরে আপনি?

মেলা দেখতে এসেছি। কই কত কম পড়েছে বললেন না?

বিজয়া মুখ নীচু করে কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলল,

ছ' আনা।

এই নিন।

পার্থ পকেট থেকে পয়সা বের করে বিজয়ার দিকে এগিয়ে দিল।

বিজয়া তখনই পয়সাগুলো নিল না। পারল না নিতে। বলল,

আপনি কেন দেবেন?

নিন, নিন, দেরী করবেন না। দেরী করলে আপনার পছন্দসই চুড়িগুলো অন্য কেউ কিনে নেবে।

বিজয়ার চুড়ি কেনা হ'তে সে জিজ্ঞাসা করল,

আপনি কি এখন যাবেন?

পার্থ দ্রুত চিন্তা করে নিল।

বিজয়ার সঙ্গে যাবার অসুবিধা অনেক। স্বভাবতই সে কোথায় থাকে এমন প্রশ্ন উঠবে! কি বলবে পার্থ?

যদি কোন ঠিকানা বলে, তাহলে দারোগা সেই ঠিকানায় অনুসন্ধান করে তাকে না পেলেই সন্দেহ করবে।

তাই পার্থ বলল,

আমি একটু থাকব। ওদিকটা আমার এখনও দেখা হয়নি।

তাহলে আমি যাই।

বিজয়া রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

পার্থ দাঁড়িয়ে দেখল।

রাস্তার ধারে চই ঢাকা একটা গরুর গাড়ী। বিজয়া সেটাতে গিয়ে উঠল। পুলিশ বসল গাড়োয়ানের পাশে।

গরুর গাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পার্থ মেলা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

দলে দলে লোক ফিরে চলেছে। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নানারকম গল্প শুনতে শুনতে পার্থর হাঁটতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

হঠাৎ জঙ্গলের দিকে যেতে দেখলে পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে, তাই পার্থ ন্যাকড়া একটা গাছের তলায় বসল। যেন বিশ্রাম করছে।

তারপর অন্ধকার গাঢ় হতে চলতে আরম্ভ করল।

দিকে জ্যোৎস্না রয়েছে। টর্চ জ্বালবার কোন প্রয়োজন নেই। সাবধানে পা ফেলে কাঁটাগাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পার্থ পোড়োবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

গভীর রাত।

হঠাৎ ঠুক ঠুক শব্দে পার্থ চমকে উঠে বসল।

কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

জীর্ণ দরজা। সজোরে একটা লাথি মারলেই ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। এখানে ওখানে অনেক ফুটো।

ফুটোয় চোখ রেখে পার্থ দেখল।

অস্পষ্ট একটা কাঠামো। লোক চেনা গেল না।

পার্থ দরজার ওপর আঙুল দিয়ে সাঙ্কেতিক শব্দ করল।

ওপার থেকে লোকটির কণ্ঠ শোনা গেল,

বন্ধে মাতরম।

পার্থ দরজা খুলল।

লোকটি ভিতরে ঢুকেই বলল,

জিনিসটা পেয়েছেন?

পার্থ কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা বুঝল।

ভিতরের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পার্থর হাতে দিয়ে বলল,

আলো ?

কাছেই একটা তাকের ওপর টর্চ ছিল। সেটা জেলে পার্থ কাগজটা পড়ল। এতক্ষণে নিঃসন্দেহ ঠিক লোকই এসেছে।

দেয়াল থেকে ইট সরিয়ে বাক্সটা লোকটার হাতে তুলে দিল।

তারপর জিজ্ঞাসা করল,

পঙ্কজদা ?

ভাল আছেন। তিনি আশ্রমের দিকে চলে গেছেন। কাল রাত্রে আপনি ঘাটের কাছে থাকবেন। আপনাকে নিতে বজরা আসবে।

ঠিক আছে।

লোকটা বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখল, তারপর আধো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাকি রাতটা পার্থর ঘুম এল না। বিছানায় বসে কাটাল।

এখানকার আস্তানাও এবার ওঠাতে হবে।

অবশ্য এখানে এমন কিছু আকর্ষণও ছিল না। পার্থর মন অন্য কোথাও চলে যেতেই চাইছিল।

পঙ্কজদা আসবে। সেখান থেকে এবার নির্দেশ আসবে।

একাধে একজন দুজনকে হত্যা করে কার্য সিদ্ধি হবে না। ব্যাপক আঘাত হানতে হবে। ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে।

লোক আছে যারা সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের বিষ ছড়াবার চেষ্টা করছে। যদি সফল হয় তাহলে, সৈন্যরা বিদ্রোহ করবে। বৃটিশদের পক্ষে এ দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি রক্ত করে তুলবে।

লজ্জার কথা, শাসকরা এদেশের মানুষ দিয়েই দেশকে পদানত করার চেষ্টা করে। জনগণ এখনও নিস্পৃহ। তাদের মধ্যে চেতনা আসেনি। স্বাদেশিকতার চেতনা।

একরাশ মূঢ়, অশিক্ষিত মানুষ। পশুপালের মতন একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে বেড়ায়। শত আঘাতেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।

পশ্চিম আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হয়েছে।

হিটলার নিজেকে আর্য সভ্যতার প্রতীক হিসাবে খাড়া করিয়েছে। মারাত্মক বিরোধি। যারা বিশুদ্ধ আর্য নয় তাদের বাঁচবার অধিকার নেই।

যদি যুদ্ধ বাঁধে, ভারতকে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

বিব্রত বৃটিশকে পিছন থেকে আক্রমণ করে নাজেহাল করতে হবে।

কিন্তু এজন্য বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন।

দেশ কি প্রস্তুত !

খুব ভোরে পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

পথের পাশের এক চায়ের দোকানে চা-রুটি খেয়ে খালার দিকে পা চালাল।

আজ শেষ হাজিরা।

কাল থেকে দারোগা আর পার্থর খোঁজ পাবে না।

থানার সামনেই দারোগার সঙ্গে দেখা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল।

পার্থকে দেখে বলল,

এত শুভ বস্ত হওয়া তো ভাল নয়। ভোর না হতেই হাজিরা।

পার্থ হাসল।

বেশ তো বলুন না, চলে যাচ্ছি।

আরে না, না, বসুন, আমি আসছি। আপনাদের মতন সাধুসঙ্গ দুর্লভ।

পার্থ ভিতরে গিয়ে বসল।

টেবিলের ওপর বাসি খবরের কাগজ। তাই ওলটাতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দারোগা এসে ঢুকল।

কি বুঝছেন? লড়াই একটা বাঁধবে বলেই মনে হচ্ছে।

পার্থ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

কি জানি, আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

দারোগা উল্লসিত।

আমার সঙ্গে? দাঁড়ান একটু চায়ের কথা বলে আসি। হরোয়াজা!

একজন পুলিশ এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

ভিতরে বল দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।

পার্থ বাধা দিল। আমার দরকার নেই। আমি একটু আগে চা খেয়ে আসছি।

আরে চা তো আর বিদেশী জিনিস নয়। খাঁটি স্বদেশী। তারপর বলুন, আপনার কি কথা?

আপনি একটা চাকরির কথা বলেছিলেন।

আপনার জন্ত?

হাঁ। স্কুলের চাকরিটা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

কাপড়ের দোকানে কাজ করবেন?

কেন করব না। কিছু একটা না করলে চলবে কি করে।

দারোগা আড়চোখে পার্থর আপাদমস্তক দেখল। তাহলে দারোগা কি ভুলই করেছে? ভুল খবর পেয়েছে? ছোকরা স্বদেশী নয়, এদেশের অগণিত শিক্ষিত বেকারদের একজন।

খালের ধারে মদনীয়ার তোলামলের দোকান। দেখতে দেখতে ব্যাটা ভুলে ফেঁপে লাল হয়ে আমি বললেই দিয়ে দেবে আপনাকে।

বেশ তো দেখুন না। আজ বিকালে একবার আসব আপনার কাছে?

বিকালে আসার দরকার নেই। বিকালে আমি ওর দোকানে যাব আপনি কাল সকালেই আসবেন।

পার্থ কি বলতে গিয়েই থেমে গেল।

দরজার পাশে চুড়ির রণরণ শব্দ। কাঁচের চুড়িরই হয়তো।

সে শব্দ দারোগার কানেও গিয়েছিল।

পুলিশের দিকে চেয়ে বলল,

এই চা-টা নিয়ে আয়।

দু কাপ চা এল।

দারোগা নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, আঃ।

পার্থ অত তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেল না। এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

আজ চলি। আপনি কিন্তু আমার চাকরির কথাটা ভুলবেন না।

গোঁফের চা মুছতে মুছতে দারোগা বলল,

আরে না, না। অত তাড়াতাড়ি সবকিছু ভুলে গেলে সরকারের এতবড় চাকরি করতে পারতাম! কাল ঠিক সময়ে আসবেন।

পার্থ খানা থেকে কিছুটা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবু, ও বাবু!

তারি জুতার শব্দ। কে যেন ডাকছে।

পিছন ফিরে দেখল থানার একজন পুলিশ।

আমাকে?

পার্থ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

ততক্ষণে পুলিশ তার কাছে এসে গিয়েছে।

পকেটে থেকে পয়সা বের করে পার্থর দিকে এগিয়ে দিল।

কিসের পয়সা?

ওই যে কাল মেলায় চুড়ি কিনে দিয়েছিলেন।

থানার পিছন দিকের দরজা খোলা।

তার পিছনে শাড়ীর আভাস।

বিজয়া দাঁড়িয়ে আছে।

পার্থ একবার ভাবল, পয়সাগুলো ফেরত দিয়ে দেয়। বলে, পয়সা চাই না। ও চুড়ি আমি তোমার দিদিমণিকে দিয়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক কবে গড়ে উঠল?

কি ভাববে পুলিশ? মুখ মুচকে হাসবে, তারপর সময় আর সুযোগ পেলে কথাটা দারোগার কানেই তুলে দেবে।

দারোগার সঙ্গে পার্থর দেখা হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। কিন্তু বলা যায় না, এর জন্য বিজয়ার ওপর যদি নির্যাতন চলে!

পার্থ হাত পেতে পয়সাগুলো নিল, তারপর চলতে শুরু করল।

মনের মধ্যে ফিরে দেখবার একটা দুর্বার কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে সংবরণ করল।

পিছনে পুলিশ রয়েছে। কিছু ভাবতে পারে।

পার্থ চৌরাস্তা পার হ'য়ে গেল।

পার্থ যখন বাড়ী ছাড়ল তখন গভীর রাত।

পার্থকে চেনবার উপায় নেই। তার বিচিত্র সাজ।

পরণে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে আধময়লা গিরাণ। মাথায় গামছা বাঁধা। পিঠে বোঁচকা।

ছোট দাড়ি। হাতে লাঠি।

এত হাতে পথে লোক থাকবার কথা নয়। তবু সাবধানের মার নেই। জঙ্গলের পথ দিয়ে পার্থ হাঁটতে লাগল।

ঝোপে ঝোপে জোনাকির গুচ্ছ। মাঝে মাঝে পায়ের কাছে সর সর শব্দ। সরীসৃপ চলেছে

নিকষ কালো আকাশ। একটি তারার লণ্ঠনও কোথাও নেই।

বালের নির্দিষ্ট জায়গায় যখন এসে পৌছাল, তখন তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত।

এদিক ওদিক চেয়ে পকেট থেকে টর্চ বের করে একটা গাছের তলা ভাল করে দেখে নিয়ে সে বসল।

এখনও দেরী আছে। অন্তত আধঘণ্টা।

একটু বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কাছে চুড়ির শব্দ হতেই চমকে জেগে উঠল।

বিজয়া কি করে তার সন্ধান পেল? এত রাতে কেনায় কেনা চুড়ি পরে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে!

একটু পরেই খেয়াল হল।

না চুড়ির শব্দ নয়, সজারু ছুটেছে কাঁটা ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে। ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন।

পার্থ সামনের দিকে চোখ ফেরাল।

আকাশের পটভূমিকায় ঘন অন্ধকার ছায়া।

বজরা এগিয়ে আসছে।

পার্থ উঠে দাঁড়াল।

একটু পরেই বজরা পারে লাগল। কাদায় চপ চপ শব্দ। কে একজন এগিয়ে আসছে।

পার্থ এগিয়ে গেল।

একজন বেহারী মাঝি।

পার্থর কাছে এসে বলল,

চলিয়ে।

তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হবার জন্ত পার্থ জিজ্ঞাসা করল।

কোথা থেকে আসছ?

জয়ন্তমাতা বন্দর।

মাঝি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

পার্থ আর দ্বিরুক্তি না করে মাঝির পিছন পিছন চলতে আরম্ভ করল। খুব সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে।

কিন্তু ভীষণ কাদা। অনেক জায়গাতেই গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যেতে লাগল।

বজরায় উঠে পার্থ ছইয়ের মধ্যে চলে গেল।

কিছুটা বালি কিছু ইট।

জন চারেক মাঝি মাল্লা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লগি ঠেলে ঠেলে বজরাটা সরিয়ে নিয়ে এল, তারপর দাঁড় বাইতে শুরু করল

বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে পার্থ শুয়ে পড়ল।

কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে হাতের কাছে রাখল।

একটু পরেই গভীর ঘুমে অচেতন।

আচমকা শরীরে ধাক্কা লাগতে পার্থ উঠে বসল।

একজন মাঝি তাকে ঠেলা দিচ্ছে।

কি হল?

বাবু জল পুলিশের লঞ্চ।

কোথায়?

একটু আগে। মনে হচ্ছে এ-বজরা আটকাবে।

তাই নাকি?

পার্থ দুইয়ের মধ্যে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হ'ল।

আকাশে ফিকে জ্যোৎস্না। খালের বুকে কুয়াশার পাতলা আস্তরণ।

লঞ্চের একটা অস্পষ্ট কাঠামো দেখা গেল। পুলিশের লঞ্চ।

পার্থ আবার দুইয়ের মধ্যে ফিরে এল।

কাপড় আর জামা খুলে ফেলল। ভিতরে হাফ প্যান্ট।

পিস্তলটা গামছার সঙ্গে মাথায় বাঁধল।

বজরার পিছনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বজরা মন্থরগতিতে এগিয়ে চলল।

কিন্তু পার্থর জলে পড়ার শব্দ ঠিক পুলিশের কানে গিয়েছিল।

লঞ্চ তীরবেগে বজরারদিকে ছুটে এল।

প্রাণপণ শক্তিতে পার্থ সাঁতার কেটে চলল।

তীর খুব দূরে নয়।

পিছনে দুম করে শব্দ।

অনেকটা দূরে কিছুটা জল ছিটকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পার্থ বুঝতে পারল, পুলিশ আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে। তার সন্ধান পায় নি। বজরার আড়ালে পার্থ সাঁতার কেটে চলেছে।

তীরের কাছ বরাবর এসে পার্থ পিছন ফিরে দেখল।

বজরা বেশ দূরে। লঞ্চ বজরার গায়ে লেগেছে।

সম্ভবত বজরা খানাতল্লাসী করবে।

করুক। কিছুই পাবে না।

বোঁচকাটা যে মাঝিদের নয়, সেটা বুঝতে পারবে না। বোঁচকার মধ্যেও তেমন কিছু নেই।

পার্থ কাদার ওপর শুয়ে পড়ল। অবসন্ন দেহ। শিরায় শিরায় অসহ্য যন্ত্রণা।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল।

মাথার ঘন। ঘন ঝাঁপ ঝাড়। আধ অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। হয়তো কাছে বসতি থাকতে পারে।

পারে উঠে মাথার গামছা খুলে পার্থ নিজের শরীর মুছে নিল।

এ পোশাকে লোকালয়ে যাওয়াও মুস্কিল। লোকে পাগল বলবে।

কোমরে বেল্টের সঙ্গে ছোট একটা ব্যাগ।

ব্যাগ খুলে পার্থ গুনল।

টাকাপয়সা যা রয়েছে, তাতে কিছুদিন চলে যাবে।

ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

পার্থ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল।

অন্ধকার তরল হ'ল। সব কিছু দৃশ্যমান।

বাঁশ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল দেখা গেল।

দু একজন লোক চলাচলও শুরু হল।

চাষা মজুরই হবে।

একজনকে পার্থ হাত নেড়ে ডাকল।

লোকটার কাঁধে বাঁক। তাতে শাকসব্জী।

এ গাঁয়ের নাম কি?

লোকটি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পার্থর অপূর্ব বেশ দেখল, তারপর বলল,

গাঁয়ের নাম চণ্ডীগড়।

পার্থর পরণে প্যান্ট, গায়ে গামছা।

শিস্তলটা সে প্যান্টের পকেটে সরিয়ে রেখেছে।

এ গাঁয়ে কাপড়ের দোকান আছে?

আজই তো হাট, হাটেই কাপড় পাবে।

তুমি একটা কাজ করতে পার?

কি কাজ?

আমি তোমায় টাকা দেব, আমাকে একটা ধুতি এনে দেবে।

লোকটা এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করল,

তোমার এ অবস্থা কেন?

আর ভাই অবস্থা! প্রাণে বেঁচেছি এই ঢের। নৌকাডুবি হয়েছিল। কাপড় চোপড়, বাক্স প্যাটরা সব ডুবে গেছে। আমি কোন রকমে সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।

লোকটা কি ভাবল, তারপর বিচক্ষণের মতন বলল,

এই খালে ঘূর্ণি আছে যে, প্রত্যেক বছর একটা নৌকাডুবি হয়। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?

আর কেউ নয় ভাই, আমি একলা। মাঝির কি হল কিছুই জানিনা।

দাও টাকা দাও।

পার্থ টাকা দিল।

আধঘণ্টার মধ্যে লোকটা ফিরে এল। হাতে কোরা ধুতি। কাঁধের বাঁকটা লোকটি পার্থর কাছে রেখে গিয়েছিল।

পার্থ প্যান্টের ওপর ধুতি জড়িয়ে নিল। গায়ে গামছা।

তুমি যাবে কোথায় ?

আমি যাব প্রতাপপুর।

প্রতাপপুর ! সে আবার কোথায় ?

এখানে রেল স্টেশন আছে ?

হ্যাঁ, মাইল দুয়েক দূরেই চন্দ্রীপুর ষ্টেশন। এই রাস্তা ধরে চলে যাও।

প্রতাপপুর বলে কোন জায়গায় খোঁজ পার্থর নিজেরই জানা নেই। কিন্তু একটা বলা দরকার এই ভেবেই বলা।

পার্থর ভাগ্য ভাল। স্টেশনে আসা মাত্রই ট্রেন এসে দাঁড়াল। পার্থ উঠে বসল।

এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া প্রয়োজন। বলা যায়না, পুলিশের লোক ওকে ওঁকে এখানে চলে আসতে কেউ একজন বজরা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এটুকু পুলিশ বুঝতে পেরেছে।

তার ওপর এই ছোট গঞ্জগ্রামে এমন পোশাক আর এমন চেহারার মানুষ লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।

অনাবশ্যে নিজেকে মিশিয়ে না দিতে পারা পর্যন্ত পার্থর শান্তি নেই।

কিছুদূর যেতেই পার্থর খেয়াল হ'ল। টিকেট কাটা হয়নি। চেকার ধরলেই সর্বনাশ।

পরের ষ্টেশনে ট্রেন আসতেই পার্থ গার্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্যার, তাড়াতাড়ি টিকেট কেনা হয়নি।

কোথায় যাবেন ?

কলকাতা।

গার্ড খস খস করে একটা কাগজে লিখে কাগজটা পার্থর হাতে দিয়ে বলল, চার টাকা ছ' আনা।

পার্থ পয়সা দিয়ে ট্রেনের কামরায় ফিরে এল।

কলকাতায় অনেক সুবিধা। লোকে নিজের নিজের জীবন নিয়েই এত ব্যস্ত যে অন্য কারো খোঁজ রাখা সম্ভবপর হয়না।

তারপর এই বিরাট মহানগরীতে আত্মগোপন করার আস্তানার অভাব নেই। অথচ সংবাদপত্র মারফৎ প্রতিটি দিনের খবর সহজ লভ্য।

সব চেয়ে বড় সুবিধা, এখানে জলের গোটা তিনেক ঘাঁটি আছে। সেখানে নিশ্চিন্তে থাকা চলে।

হাওড়া স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, তখন পার্থ গভীর নিদ্রামগ্ন।

একটা কুলি ঠেলে তুলে দিল।

পার্থ গেট দিয়ে পার হ'লনা। লাইন ডিঙিয়ে কোণের প্ল্যাটফর্মে চুপচাপ বসে রইল।

ভীড় কমেগেলে আস্তে আস্তে বাইরে এল।

হাওড়া স্টেশনে সাদা পোশাকে প্রচুর পোয়েন্দা ঘোরাফেরা করে। চলিত কথায় টিকটিকি।

তাদের কেউ পার্থকে চিনতে পারলেই সর্বনাশ।

পার্থ বাসে উঠে বসল।

বার তিনেক বাস বদলে পার্থ তিনজনার কাছাকাছি নামল।

সারি সারি চীনাদের টানাবাড়ি। দু'একটা বাড়ীতে কাবুলীও আছে।

চৌকাঠে বসে দু'জন কাবুলী গল্প করছিল, পার্থকে দেখে সরে বসল।

ভিতরে ঢুকতেই বাহার সঙ্গে দেখা হল।

এখানকার বহু পুরোনো চাকর।

তার মা আর বোন দুজনেই মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। বাহা চাকরের কাজ শুধু করে না, অবসর সময়ে খোঁজ খবরও নিয়ে আসে। পুলিশের গতিবিধির।

বাহা হাসল,

এবার কিন্তু অনেকদিন পরে এলেন।

হুঁ।

পার্থ আরো ভিতরের দিকে চলে গেল।

দরজা খুলেই সে চমকে উঠল।

আয়নার সামনে যে লোকটা মুখে গোঁফ দাড়ি আটকাচ্ছিল, সেও ফিরে দেখল।

শঙ্করদা?

কি খবর, তুমি এ সময়ে, এখানে?

পার্থ এগিয়ে গিয়ে শঙ্করের পাশে বসল।

তুমি আসামে ছিলে না?

পরশু পর্যন্ত ছিলাম, আজ সকালে ফিরেছি। তুমি?

পার্থ তার নিজের কাহিনী শোনাল।

খুব বেঁচে গেছ। ব্যাটারা বড্ড পিছনে লেগেছে। যাদের ধরছে তাদের ওপর তো অত্যাচার করছেই, এমন কি তাদের আত্মীয়স্বজনের ওপর পর্যন্ত নিপীড়ন চালাচ্ছে।

শঙ্করদা, এ বেশে কোথায়?

এক পুলিশ পুঙ্গবের ওপর নজর রাখতে হবে। তার হালচাল বিশেষ নাকি ভাল ঠেকছে না। তার কে এক আত্মীয় নাম ভাঁড়িয়ে আমাদের দলে এসে ঢুকেছে, তাকে চুপি চুপি সব খবর যোগাচ্ছে।

সর্বনাশ!

শঙ্কর চাটাইয়ের তলা থেকে একটা অটোমেটিক বের করে দেখাল।

লোকটার সঙ্গে মোলাকাত হলে তো বেঁচে যাই। পৃথিবীর ভার একটু লাঘব করি।

পার্থ চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে বলল,

ভীষণ খিদে পেয়েছে শঙ্করদা, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

বাহাকে ডেকে বল না।

বাহাকে ডাকতে হ'ল না, সে দুধ আর রুটি তরকারি নিয়ে দাঁড়াল।

পার্থ গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে শঙ্করের গোঁফদাড়ি লাগানো শেষ। সে উঠে কাবুলীর পোশাক পরল।

খাওয়া শেষ করে পার্থ শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল।

সাজসজ্জা শেষ হ'তে শোয়ালে বলল,

বাঃ, চমৎকার, ঠিক মনে হচ্ছে একেবারে খাস আফগানিস্থান থেকে আসছ। কার সাধ্য তোমাকে চিনতে পারে।

তুমি বিছানায় উঠে শুয়ে পড়। আমি আজ নাও ফিরতে পারি।

পার্থ তক্তপোষের ওপর উঠল।

চোখ দুটো বোজাবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে একেবারে অচেতন।

ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারল না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা হয়েছে।

চোখ মেলেই পার্থ অবাক হয়ে গেল।

মেঝের ওপর পাশাপাশি পাঁচজন শুয়ে রয়েছে। ঘোর নিদ্রামগ্ন।

তাদের কাউকেই পার্থ চিনতে পারল না।

শুধু এটুকু বুঝল সবাই এক পথের পথিক। সকলের হাতেই বাঁধা এক সর্বনাশের রাখী।

শঙ্কর কিরল দুপুর নাগাদ।

পার্থ ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল। অন্য লোকেরা একে একে বেরিয়ে গেছে।

শঙ্কর পার্থর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল,

কি খাওয়া হয়েছে?

পার্থ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, হয়েছে।

শঙ্কর বলল, তাহলে একটু বস। আমি খেয়ে আসি।

মিনিট কুড়ির মধ্যে শঙ্কর ফিরে এল।

হাতে একটা টাইপ করা কাগজ।

কাগজটা পার্থর হাতে তুলে দিয়ে বলল,

নাও, পড়।

পার্থ পড়ল।

তলায় কোন নাম নেই। এসব ইস্তাহারে নাম থাকেও না। ভাষাটা অগ্নিগর্ভ। ইংরাজের ওপর চরম আঘাত হানবার জন্য দলের সবাইকে প্রস্তুত থাকবার আহ্বান।

প্রতি প্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হবে। কেউ কোন খাজনা দেবে না। ইংরাজের আদালতে বিচারের প্রার্থী হবে না। ইংরাজের স্কুল কলেজে ক্রীতদাসের বিদ্যা অর্জন করতে যাবে না।

হিংসার হাতিয়ার হিংসা। এ ছাড়া ইংরাজকে খায়েল করার অন্য কোন অস্ত্র নেই।

পড়া শেষ হ'তে পার্থ বলল,

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কবে শুরু হবে শঙ্করদা?

হবে, হবে। ইংরাজ প্রবল শত্রু, তার ওপর তারা শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালাবার আগে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

শঙ্কর হঠাৎ গলাটা খুব গম্ভীর করে বলল,

তোমার ওপর একটা কাজের ভার আছে পার্থ।

বল ?

তুমি আজ রাতেই জলপাইগুড়ি চলে যাও। সেখানে ষ্টেশনে আমাদের লোক থাকবে। সেই তোমাকে নির্দেশ দেবে।

ঠিক আছে।

কাজ শেষ হলে তুমি কোন চা বাগানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থেকো। তোমার কাছে ফিরে আসার খবর না পেলে কিছু করবে না। অপেক্ষা করবে।

বেশ।

পার্থ ঘাড় নাড়ল।

তোমার কাছে টাকা আছে ?

কিছু।

বেশী কিছু টাকা নিয়ে যেও। আমিই দেব। কারণ কতদিন তোমাকে অজ্ঞাতবাস করতে হয়, তার কিছুই ঠিক নেই।

পার্থ কিছু বলল না। কোন প্রশ্ন করা রীতি নয়। সৈনিকদের মতন মাথা নীচু করে শুধু আদেশ করে যেতে হয়।

সেই রাত্রেই পার্থ রওনা হয়ে গেল।

একেবারে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাক, পকেটে হেয়ার-কোপ। চা বাগানের ডাক্তার। নতুন চাকরি পেয়ে কাজে যোগদান করতে যাচ্ছে।

জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

সার্ট আর প্যান্ট পরা একটি ছোকরা বাতির নীচে দাঁড়িয়েছিল। যাত্রীদের ভীড় কমতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

নমস্কার ডক্টর সেন, আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

পার্থ প্রতি নমস্কার করে কিছুক্ষণ ছেলেটিকে দেখল।

কদমছাঁট চুল, সাধারণ চেহারা, আর ময়লা পোশাক।

পার্থ শুধু বলল, চলুন।

দু'জনে ষ্টেশনের এলাকা পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

পুরোনো মডেলের একটা মোটর দাঁড়িয়েছিল।

দুজনে তার মধ্যে উঠল।

ছেলেটি চালকের আসনে। পার্থ পাশে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মোটর যেখানে থামল, পার্থ উঁকি দিয়ে দেখে বুঝতে পারল, সামনে এক নদী। পাশে ছোট একতলা বাড়ী।

মোটর থেকে নেমে দুজনে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

অপরিসর কক্ষ। কোথাও কোন আসবাব নেই ! মেঝের ওপর বিছানা পাতা।

ছেলেটি দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর এসে বসল। পার্থকেও বসাল।

একটি গুপ্তচরকে খতম করতে হবে।

ছেলেটি সোজাসুজি পার্থকে বলল।

কবে?

কাল পরশুর মধ্যে।

কোথায়?

লোকটি থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে। আমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে অপেক্ষা করব। কাজ শেষ করেই আপনি মোটরে ফিরে আসবেন। আমি আপনাকে চাঁদমারি চা বাগানে পৌঁছে দেব।

পার্থ কিছু বলল না। মাথা নাড়ল।

পরের দিন দু'জনে জায়গাটা দেখেও এল।

থানা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে। দু'পাশে আগাছার ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গুলি করতে লোকটা সাইকেলে ফিরবে।

পার্থ বুঝতে পারল, তাদের দলে যেমন গুপ্তচর আছে তেমনই পুলিশদেরও আছে। এইসব লোক অন্য কাজ করে। কোন খবর থাকলে চুপি চুপি থানায় বিক্রি করে যায়। কোন পলাতক, স্বদেশীর গতিবিধি কিংবা সন্দেহজনক কোন লোকের আমদানী।

কাজটা এমন শক্ত কিছু নয়। রাস্তা খুব প্রশস্ত নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এইসব ঘৃণিত ছুছুন্দরের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পার্থ সব সময়েই আগ্রহী।

পরের দিন সাতটার একটু আগে দুজনে বের হ'ল।

দুজনেরই অঙ্গে খাকি পোশাক। মাথায় টুপি।

হঠাৎ দেখলে পুলিশ অফিসার বলেই ভুল হয়।

মোটরটা কাশবনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হ'ল। যাতে বাইরে থেকে কারো দৃষ্টিগোচর না হয়।

ছেলেটি মোটরেই রইল। পার্থ নেমে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁকড়া একটা গাছের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দৃষ্টি পথের দিকে। হাতে উদ্যত অটোমেটিক।

কিছুক্ষণ পরেই পার্থ বুঝতে পারল দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব।

ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে আক্রমণ শুরু করল।

প্যান্ট আর শার্টের মধ্য দিয়া হুল ফোঁটাতে শুরু করল।

প্রায় আধঘণ্টা।

পার্থ যখন প্রায় অতীষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন গানের শব্দ ভেসে এল।

ভাষাসঙ্গীত।

পার্থ গাছের সঙ্গে মিশে গেল।

বাঁকের মুখে একটা সাইকেল। আরোহী প্রাণ খুলে গান গাইছে। বেসুরো গলা কিন্তু মিষ্টার অভাব নেই।

পার্থ অটোমেটিক তাক করল।

ঠিক গাছের সামনে আসতে গর্জে উঠল অটোমেটিক। বং

ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

সাইকেলটা পাগলের মতন টলতে টলতে জঙ্গলের ওপর কাত হয়ে পড়ল। লোকটা ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর।

পার্থ এক মুহূর্তও দেরী করল না। গুঁড়ি দিয়ে আগাছার জঙ্গল থেকে বের হয়ে মোটরের দিকে ছুটল।

মোটরে স্টার্ট দেওয়াই ছিল।

পার্থ উঠতে মোটর বিদ্যুৎগতিতে চলতে শুরু করল।

চমৎকার রাস্তা। জনবিরল। দু'পাশে ঝোপ।

সেই মসৃণপথে মোটরের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল।

মাঝরাতে মোটর বাঁধানো শড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় ঢুকল।

কিছুটা যাবার পরই একটা টর্চের আলো দেখা গেল।

আলোটা একবার জ্বলছে আর নিভছে।

মোটর থামল।

ছেলেটি পার্থর দিকে ফিরে বলল,

আপনি মেয়ে এর সঙ্গে চলে যান।

পার্থ নামল। মেয়ে বলল, আপনি?

আমি ঘুটারের দিকে চলে যাব।

পার্থ একটু চিন্তান্বিত হ'ল।

কিন্তু মোটরের নম্বর যদি কারো নজরে পড়ে থাকে?

ছেলেটি হাসল।

তা হলে ডেপুটি কমিশনারকে গ্রেপ্তার করবে।

পার্থ কথাটা বুঝল।

এসব কাজে সব সময়ই নকল নাম্বার প্লেট ব্যবহৃত হয়।

যান আপনি আর দেরী করবেন না। আমি মোটরের রংই পাল্টে ফেলব।

পার্থ টর্চের আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

ঝাকড়াচুল সারা মুখ ভাঙা, পরণে সুট, লোকটা পার্থকে বলল,

আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

খুব সরু রাস্তা। দু'পাশে ছোট ছোট ঝোপ। পরে অবশ্য পার্থ জানতে পেরেছিল সেগুলো চা গাছ।

ঝনঝনে ঠাণ্ডা হাওয়া। অন্ধকারে বোঝা না। তবে কাছে বোধহয় পাহাড় আছে।

বাঁশে বাঁশে উঠে একটা ঝোরানো সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লোকটি আবার বলল,

ওপরে চলুন।

সাবধানে পার্থ ওপরে উঠল।

মাঝারি সাইজের ঘর। কোণে একটা ক্যাম্পখাট।

বাড়ি জানালাতে সব দেখা গেল।

লোকটি দরজার খুলে ফেলল।

গৌরবর্ণ, দীর্ঘ চেহারা।

পার্থবাবু আপাতত এই আপনার আস্তানা।

তার নাম লোকটির জানা দেখে পার্থ একটু বিস্মিত হ'ল।

পার্থ ক্যাম্পখাটের ওপর বসে পড়ল।

এটা কোন জায়গা?

যে জায়গায় আপনার আসার কথা। চাঁদমারি টি এস্টেট। আমি এখানকার ডাক্তার রণধীর বসাক।

পার্থ দু'হাত যোড় করে নমস্কার করল।

আমার ভাইকে বোধ হয় আপনি চিনতে পারেন?

রণধীর বসাক গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

কি নাম আপনার ভাইয়ের?

সুবীর বসাক।

সুবীর বসাক? যিনি দিনাজপুরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ করার সময়?

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আলাপ ছিল?

আমরা বহরমপুর জেলে এক সঙ্গে প্রায় আটমাস ছিলাম।

রণধীর বসাক দুটোহাত পিছনে রেখে একটু পায়চারি করল, তারপর বলল,

এখনও চোখ বন্ধ করলে ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহটা আমি দেখতে পাই। পাশকরের ওপর ঘৃণা আমার এ জীবনে যাবার নয়।

তারপর রণধীর বসাক বলল,

আপনি পরিশ্রান্ত, শোবার আয়োজন করুন। আর এ ঘর থেকে একদম বের হবেন না। আপনার যা প্রয়োজন সবই এ ঘরে দিয়ে যাবে। পাশেই বাথরুম। এটা অবশ্য পাওবর্জিত জায়গা, তবু সাবধানের মার নেই। জানলাতেও দাঁড়াবেন না।

রণধীর দরজা ভেজিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই, পার্থ উঠে দরজা বন্ধ করে দিল।

অটোমেটিকটা বালিশের তলায় রেখে, আসনার রাখা তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

জলে যেন বরফের স্পর্শ। অঞ্জল নিয়ে পার্থ চোখে মুখে দিল।

উত্তেজনা যেন একটু প্রশমিত হ'ল।

বিছানায় শুয়ে মনে হ'ল, ঠিক লোককেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো? এমন তো নয় অন্য নিরীহ লোক আগ্নেয়াস্ত্রের বলি হ'ল।

অবশ্য জীবন-মরনের এই হোলিখেলায় কিছু নিরপরাধ লোকও শেষ হয়ে যায়। যেমন ফাঁসির মঞ্চে এমন অনেক ছেলে প্রাণ দেয়, যারা এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ঘটনাচক্রে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

দু একদিন নয়, পরের দিনই জানা গেল।

ডাক্তার বসাক রাত্রে যখন এল, তার হাতে খবরের কাগজ।

কাগজটা পার্থর সামনে ফেলে দিয়ে বলল,

কাল রাতে করেছেন আপনার। রেবতী সান্যাল শেষ।

কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে পার্থ সংবাদ পড়ে ফেলল।

স্টেটমেন্টের কর্মচারী রেবতী সান্যাল গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত। আততায়ী নিখোঁজ।

ডাক্তার বসাক বলল।

সাংঘাতিক লোক ছিল মশাই। কত খবর যে পুলিশের কানে তুলে দিয়েছে তার ঠিক নেই। বহু ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছে। নিজের মাসতুতো ভাইকে পর্যন্ত পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। আপদ গেল।

পার্থ কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ বসে রইল।

একটার পর একটা অনেক কাঁটা তো তুলে ফেলা হল, কিন্তু পথ মসৃণ হ'লনা। এখনও সামনে বহুদূর পথ।

কবে এই কণ্টকময় যাত্রার শেষ হয়ে এদেশের মাটি পূত হবে, কে জানে!

আমরা চা বাগানের মজুরদের মধ্যেই ঘুণার বিষ ছড়াচ্ছি। ইংরাজের প্রতি ঘৃণায় পরদা। খুব যে কাজ হচ্ছে, এমন নয়।

পার্থ প্রশ্ন করল।

কেন?

ওই যে মদের নেশা। প্রত্যেক চা বাগানের কাছাকাছি ভাটিখানা। ব্যস, মজুররা কাজের পরে গিয়ে আকণ্ঠ পান করছে। দেশের কথা, নিজেদের কথা সুরার ফেনিলস্রোতে কোথায় তলিয়ে যায়, ঠিক আছে।

মদের দোকানগুলো জ্বালিয়ে দিলেই তো পারেন।

দোকান জ্বালালে কি হবে, নেশার অবসান তো তাতে হবে না। এ দোকান গেলে, আরো দূরের দোকানে গিয়ে সবাই জুটবে। কিভাবে বুটের তলায় এদের চেপে ধরে ইংরাজ ম্যানেজার কাজ করছে দেখলে আপনি আশ্চর্য হবেন।

হঠাৎ বাইরে খুট করে একটা শব্দ হতেই ডাক্তার বসাক চমকে উঠল। জানলায় উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক দেখল। তারপর ফিরে এসে বলল,

আপনি জানলার ধারে কি বারান্দায় যাচ্ছেন না তো?

না, না।

সাবধানের মার নেই। কুলিরা নতুন লোক দেখলেই সন্দেহ করবে। হয়তো ম্যানেজারকে গিয়ে বলবে, তা হলেই সর্বনাশ।

হাই তুলে পার্থ জিজ্ঞাসা করল।

আর কতদিন আমায় এভাবে থাকতে হবে?

খবর না আসা পর্যন্ত। কেন, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট মানে, বাড়ী থেকে একেবারে বের হতে পারছি না।

খবর এল দিন সাতেক পর।

ডাক্তার বসাকই নিয়ে এল।

নিন মশাই, তৈরি হয়ে নিন। চা বাগানের বাইরে মোটর অপেক্ষা করছে।

পোশাক পরে ডাক্তার বসাকের পিছন পিছন পার্থ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

ঘুট ঘুটে অন্ধকার, নিজের হাত পা দেখার উপায় নেই। কেবল এধার ওধারে জোনাকির ঝাঁক।

সরু রাস্তা ধরে প্রথমে ডাক্তার বসাক তার পিছনে পার্থ।

বেশ কিছুটা দূর আসার পর ডাক্তার বসাক পার্থর হাতটা চেপে ধরল,

গুড বাই। আমি আর যাবনা, ওই আপনার মোটর দাঁড়িয়ে আছে। আপনাকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। যদি দুজনেই বেঁচে থাকি তাহলে একদিন হয়তো দেখা হবে। একটা কথা আপনাকে বলি, শীঘ্রই ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধবে। এখানকার টংরেজ মহলের খবর। ছাপে জেনেছি।

লড়াই?

হ্যাঁ জার্মানীর সঙ্গে। হিটলারের সব চেয়ে বড় শত্রু ইহুদী, তারপর ইংরাজ। যান, আপনার দেরী হয়ে যাবে।

পার্থ গিয়ে মোটরে উঠল।

মোটর ছাড়তে পিছন ফিরে দেখল। জমাট অন্ধকার। কিছু দেখা গেল না। কোন মানুষকে নয়।

যখন জলপাইগুড়ি গিয়ে পৌঁছাল তখন গভীর রাত।

ড্রাইভার তার হাতে একটা রুমাল দিয়ে বলল,

সামনে যে আনন্দ হোটেল আছে, সেখানে গিয়ে উঠুন। পরে খবর আসবে।

পার্থ রুমালে হাত দিয়ে বুঝতে পারল, তাতে নোট বাঁধা।

এত রাত্রে হোটেলের লোককে ডেকে তুলতে বেশ কষ্ট হ'ল।

ম্যানেজার উঠল খাতায় নামসই করতে হল। অবশ্য ছদ্ম নাম।

কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল, এত রাত্রে আসার।

পার্থ বলল,

আমি বনবিভাগের কর্মচারী। পথে মোটরের টায়ার ফেটে যাওয়ায় দারুণ দুর্ভোগ হয়েছিল। মেরামত করে তবে আসতে হল। মোটর নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

ম্যানেজার আর কিছু বলল না। বলবার মতন অবস্থা তার নেই। দু চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে।

পরের দিন সকালে পার্থ বের হয়ে পড়ল।

রেবতী সান্যালের হত্যাকারী ধরা পড়েনি। পুলিশ চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। রেবতীবাবুর শত্রুসংখ্যা অপরিমিত। প্রায় সকলের সঙ্গেই তার ঝগড়া। কাজেই ঠিক কে যে এ কাজ করেছে নির্ণয় করা কঠিন।

স্বদেশী বাবুদের পুলিশ সন্দেহ করে নি।

অনেকক্ষণ এদিকওদিক ঘুরে পার্থর হঠাৎ খেয়াল হ'ল সে বনানীর বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বারোটা বেজে গেছে। শীতের রোদ তাতটা কড়া নয়।

পার্থ হিসাব করে দেখল, এই সময় বনানীর স্বামীর অফিসে থাকার কথা।

দোতলা গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে গেল।

দরজার ওপারে বনানী।

পার্থদা!

পার্থ কিন্তু কথা বলতে পারল না।

নিষ্পলকনেত্রে বনানীর পাড়হীন কাপড় আর শূন্য সিঁথির দিকে চেয়ে রইল।

একি? এ অবস্থা কবে হ'ল?

আঁচল দিয়ে বনানী দুটো চোখ ঢাকল।

মানুষটা অফিস থেকে ফিরছিল সাইকেলে, কে পিস্তলের গুলিতে শেষ করে দিয়েছে। অনেককেই টাকা ধার দিত। তাগাদা করত। লোকটা একটু কটুভাষী ছিল। মাঝে মাঝে এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিও হত। আমার মনে হয় তাদের মধ্যেই কেউ এই সর্বনাশ করেছে।

বনানীর কথাগুলো পার্থর কানে গেল না।

চোখের সামনে গাঢ় কালো একটা যবনিকা। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। অসংখ্য বৃশ্চিক দংশনের মতন।

বনানী যখন বলল,

পার্থদা একটু বসবে না।

পার্থ ততক্ষণে সদর রাস্তায় পৌঁছে গেছে। চোখের জলে সামনের পথ ঝাপসা। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা যন্ত্রণা।

বিপ্লবীদের চোখের জল ফেলতে নেই। সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায় তারা সমান। কিন্তু পার্থ দুঃসহ বেদনায় যেন ভেঙে পড়ছে।

তারপরের দিনগুলো ঘূর্ণাবর্ত নিয়ে এল।

পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হ'ল। প্রবল প্রতাপ হিটলার দুর্জয় বিক্রমে একের পর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র গ্রাস করতে লাগল। সে আগুনের লেলিহান শিখার স্পর্শ এ দেশে এসেও পৌঁছাল।

তারপর জাপানীদের পার্লহারবারের ওপর আকস্মিক আক্রমণ, যুদ্ধকে ভারতের দ্বারে নিয়ে এল।

এই সুযোগ।

বিব্রত, চিন্তিত বৃটিশকে পর্যুদস্ত করার প্রকৃষ্ট সময়।

বেতারে নেতাজীর কণ্ঠস্বর। রক্তের পরিবর্তে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি।

ইংরাজ চালে ভুল করল।

মতিচ্ছন্ন হলে যা হয়।

নেতারা অতর্কিতে বন্দী হলেন।

অহিংসার পূজারীর কণ্ঠে ধ্বনি উঠল,

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

প্রদেশে প্রদেশে আগুন জ্বলে উঠল।

এমন সুযোগ এক যুগেও আসবে না।

নেতাজী ভারতীয় বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন বটিকাগতিতে। ভিতর থেকে যদি শাসন যন্ত্র পঙ্গু করে দেওয়া যায়, তাহলে তাঁর আগমনের পথ সুগম হবে।

যুদ্ধের ইতিহাস কেবল ইংরাজের পশ্চাদপসরণের ইতিহাস।

সিংহ ভীত সন্ত্রস্ত। আত্মগোপনের জন্য গুহার অনুসন্ধান করছে।

পার্থর কাছে নির্দেশ এল।

মেদিনীপুর যাও। সেখানে সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

পার্থ যখন মেদিনীপুর গিয়ে পৌঁছাল, তখন মেদিনীপুর জ্বলছে।

সমস্ত টেলিগ্রাফের পোষ্ট উপড়ে ফেলা হয়েছে। থানা ভস্মীভূত। কাছারি, সরকারি দপ্তরের ওপরে তে-রঙা পতাকা।

মানুষ যেন পাগল হয়ে গিয়েছে।

শত্রুরা, মিত্ররা সবাই ছিল। নেতৃত্ব অন্তর্ধান।

মধুচক থানা আক্রমণ করা।

পার্থর কাছে হুকুম এল।

পার্থর পিছনে দুশো যুবক প্রস্তুত।

তাদের চোখে সংকল্পের বিদ্যুৎ, অধরোষ্ঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

মধুচক কোথায় জানা ছিল না পার্থর, তাই সে প্রশ্ন করল,

মেদিনীপুরের ছেলে কে আছেন?

জন দুই যুবক এগিয়ে এসে পার্থকে ঘিরে দাঁড়াল।

মধুচক কোথায় আমি জানি না। আমাদের পথ চেনাবার ভার নিল একজন।

তেরো বছরের একজন সামনে এসে দাঁড়াল।

হাতে বর্শা। মাথায় কাপড় জড়ানো।

ঠিক আছে তুমি পথ দেখাও।

কিশোর এগিয়ে চলল। পিছনে আর সবাই।

মাইল চারেক যাবার পর সবাই থামল।

এখনও ষোল মাইল।

কিছু বিশ্রাম করা প্রয়োজন।

জঙ্গলের মধ্যে সবাই বসে পড়ল।

শাসকদের কোন সৈন্য আর এখানে নেই।

মেদিনীপুরে গণগোল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পালিয়েছে।

সারা বাংলা দেশটাকেই তারা বাতিল করে দিয়েছে।

এখন সব এরোড্রোম তৈরি করছে বিহার আর সংযুক্ত প্রদেশে।

ইংরাজরা ভেবে নিয়েছে বাংলা তাদের ছাড়তে হবে।

তবে মাঝে মাঝে খুব উঁচু দিয়ে প্লেন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। ইংরাজের বিমান। হয়তো পরিস্থিতি পরিদর্শন করছে।

ভোরে উঠে সবাই চলতে শুরু করল। সৈনিকের কায়দায় একসঙ্গে পা ফেলে।

তার আগে প্রাতরাশ সারা হয়েছিল।

এমন ভাবে চলতে হবে যাতে সন্ধ্যার মোঝে মধুচকে পৌঁছানো যায়। গভীর রাতে থানা আক্রমণ করতে হবে।

একপাশে কানাল, অন্যদিকে বিরাট বিরাট গাছের সারি।

পার্থ বার বার নিজের অটোমেটিক পরীক্ষা করতে লাগল। কাজের সময় যেন অসুবিধা না হয়।

এতদিন পরে দেশ স্বাধীন হবে।

আর স্বাধীন হবে অহিংস নীতির মাধ্যমে নয়, সংঘর্ষ করে।

এই কথাই তো পার্থর দল এতদিন বলে এসেছে।

স্বেচ্ছায় কেউ ক্ষমতা ত্যাগ করে না। অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হয় অত্যাচার দিয়ে। হিংসার অস্ত্র হিংসা। আঘাত নিরস্ত করা যায় প্রত্যাঘাত করে।

যে সব শহীদের শোণিতে এদেশের মাটি সিক্ত হয়েছে, পার্থর বিশেষ করে তাদের কথা মনে পড়ল। তাদের দেহাংশ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। দেশের মাটি হয়ে গেছে।

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে পার্থর বিশেষ বিশ্বাস নেই। না হলে সে ভাবতে পারত, পরলোক থেকে বিদেহী আত্মারা অসীম আগ্রহে সব কিছু নিরীক্ষণ করছে।

বন্দেমাতরম।

সমুদ্র-কল্লোলের মতন গম্ভীর নিনাদ।

স্থল, জল, অন্তরীক্ষ যেন কেঁপে উঠল।

সামনের দিকে কারা গান ধরেছে :

চলরে, চলরে, চলরে, চল,
ঊর্দ্ধে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল।

নিজের অজান্তে পার্থও কখন গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিয়েছে :

উষার দুয়ারে হানি আঘাত,
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত।

দুপুরবেলা আবার বিশ্রাম।
আশপাশ থেকে কৃষক-রমণীরা অকল ভরে চিঁড়া, মুড়ি, গুড় নিয়ে এল। কেউ কেউ গাছের কলা।
অদ্ভুত এক উন্মাদনা।
দুশো বছরের পুরানো জীর্ণ শৃঙ্খল আজ খুলে পড়ছে।

অনেকে শঙ্খধ্বনি করে আবাহন করল।
অনেক দূরে দূরে আকাশের গায়ে অগ্নিশিখার ঝিলিক।
সারা আকাশ রক্তের মতন লাল।
কোথায় ইংরাজের দম্ভের গড়া বনিয়াদ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।
ঐ উপমহাদেশ থেকে তাদের উপনিবেশ গুটাতেই হবে।
ভেদ নীতির কুৎসিত যন্ত্র আউড়ে আর রাজ্যশাসন চলবে না।
চলা সম্ভব নয়।
মানুষের জাগ্রত বিবেক তার কণ্ঠরুদ্ধ করে রেখে।

মধুচক খানা।
জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল।
আক্রমণ যে হবে এ খবর আগে থেকেই পেয়েছিল, তাই গোটা দশেক পুলিশ বন্দুক নিয়ে একেবারে তৈরি।
পার্থ দাঁড়িয়ে পড়ল।
সকলকে দাঁড় করিয়ে বলল,
এখান থেকে দু ভাগ হয়ে যেতে হবে। একদল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্যানালের পাশ দিয়ে থানার পিছন দিকে চলে যান। সেদিকে আক্রমণ চালান। ইংরাজ শাসনের এইসব তেরাগুলো আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। এখন কোন চীৎকার নয়, তাহলে ওরা টের পেয়ে যাবে। একেবারে অতর্কিতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।
একটা দল নিঃশব্দে ক্যানালের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। আর একটি দল দাঁড়িয়ে রইল ঝোপের আড়ালে।

বন্দেমাতরম্ ।

বন্দেমাতরম্

সারাটা দল উত্তপ্ত হয়ে উঠল । তীর বেগে এগিয়ে গেল থানার দিকে ।

সেই প্রবল বন্যার সামনে পুলিশের ক্ষীণ প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ।

পুলিশরা প্রাণভয়ে এদিক ওদিক ছুটল ।

জনতা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল ।

আর একদল লাঠির আগায় পেট্রোল মাখিয়ে আগুন জালিয়ে দিল ।

বাতাসের স্পর্শে শিখা লেলিহান হয়ে উঠল ।

থানার জানলা দরজা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির অন্ধকার নিমেষে ঘনীভূত হ'ল ।

বন্দেমাতরম্ ।

বন্দেমাতরম্ ।

কিছু লোক আগুন অগ্রাহ্য করে থানার মধ্যে ঢুকে গেল ।

অফিস ঘর থেকে টেনে টেনে চেয়ার টেবিল, ফাইলপত্র সব বাইরের আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল ।

থানার কাছেই একটা গাছের নীচে পার্থ দাঁড়িয়েছিল ।

অনেকদিন আগে দোকান থেকে বিলাতী কাপড় টেনে টেনে স্বেচ্ছাসেবকের দল জলন্ত বহ্নির মধ্যে ফেলেছে । তার মধ্যে পার্থও ছিল ।

বিলাতী বস্ত্র নিশ্চিহ্ন করার শপথ নেওয়া ছিল । আজ আগুনে পুড়ছে ইংরাজের সুশাসন চালাবার উপকরণ ।

সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক ।

নতুন দেশে নতুন বিধান গড়ে উঠুক ।

ঐক্য সাম্য আর ভ্রাতৃত্বকে কেন্দ্র করে ।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের চীৎকারে পার্থ চমকে উঠল ।

এ পাশের জানলায় একটি নারীমূর্তি ।

স্থির নয়, আগুন থেকে বাঁচবার জন্য ছুটোছুটি করছে ।

দু এক মিনিটের দ্বিধা তারপরই পার্থ ছুটে ভিতরে চলে গেল ।

দরজা দিয়ে যাবার উপায় নেই ।

কাঠের ফ্রেমগুলো পুড়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে । জলন্ত অবস্থায় ।

তার নীচে দিয়ে যাওয়া যাবে না ।

পার্থ জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ।

ততক্ষণে সর্বগ্রাসী আগুনের শিখা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে । জানলার রাখা কাপড়গুলো জ্বলে উঠেছে । জ্বলে উঠেছে শয্যাও ।

মেয়েটি আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করছে ।

পার্থ মেয়েটিকে টেনে বাইরে নিয়ে আসার পথ খুঁজল ।

চীৎকার করে মেয়েটিকে কি বলল।

কিন্তু জনতার উন্মত্ত কোলাহলে তার কণ্ঠ শোনা গেল না।

পার্থর মুখে চোখে আগুনের উত্তপ্ত স্পর্শ।

মেয়েটির আঁচলে আগুন ধরেছে।

যত সে ছুটোছুটি করছে, আগুন তত ছড়িয়ে পড়ছে।

আর দ্বিধা না করে পার্থ আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে গেল।

মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে যখন বাইরে নিয়ে এল, তখন তার নিজের জামা-কাপড়ও জ্বলছে।

কানালের পাশে কাদার স্তূপ। পার্থ মেয়েটিকে নিয়ে কাদার ওপর গড়াগড়ি দিল।

আগুন নিভল কিন্তু মেয়েটির কোন সাড়া নেই।

পার্থ কাছের একটি লোকের হাত থেকে মশাল নিয়ে এসে মাটিতে পুঁতে মেয়েটির দিকে চোখ ফিরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল :

বিজয়া! বিজয়া!

তার বাপ তাহলে মধুচকের এই থানার বদলি হয়েছে।

বিজয়ার মুখের একটা দিক পুড়ে গেছে। হাতের অনেকটা। প্রায় সব চুল।

বিজয়ার মাথাটা কোলের ওপর রাখতেই পার্থ বুঝতে পারল, বিজয়া সব সেবাযত্নের অতীত।

পরণের শাড়ীতে কি একটা বাঁধা খুলেই পার্থ চমকে উঠল। সেই বেনায় কেনা ক'গাছা চুড়ি। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

পার্থের চোখের জল মশালের আলোয় হীরের টুকরোর মতন জ্বলে জ্বলে উঠল।

• • •

স্বদেশ প্রেমের যে উজ্জ্বল আহ্নীবায় আধুনিককালের দেশনায়কগণ দেশের দিকে দিকে সঞ্চারিত ক'রে পরাধীনতার পাপ পঙ্ক থেকে দেশকে উদ্ধার করেছেন, একদা দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র রামকৃষ্ণ হিমাদ্রীর তুষার মৌলী হ'তে তাকে গঙ্গোত্রীর ভূমিতে অবতরণ করিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

আদর্শের রিক্ততায়, সদুপদেশের অভাবে দেশ আজ বিপর্যস্ত, দেশের যুবকবৃন্দ দিক্‌ভ্রান্ত; পথের সন্ধান না পেয়ে বিমূঢ় নরনারী অন্ধকারে ধাক্কা ঠোকাঠুকি করে মরছে। এই সঙ্কটের অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদীপ্ত জীবন হ'তে অনুপ্রেরণার দু'একটি স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করতে পারলে জীবনের পথ আলোকিত হবে, এবং সেই আলোকরশ্মি প্রভাবে কিংকর্তব্যের স্বরূপ দেখতে পেয়ে দেশের যুব শক্তি সুষ্ঠ এবং সবলভাবে যথার্থ পরিণতি লাভ করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মূল্য

ক্ষুদ্র গ্রামের নির্মল অন্তর টুকু চিনিয়া লইতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হয় না। চক্ষু বুজিয়া অনায়াস কল্পনায় তাহার নদী প্রান্তর—বন কুটীর—তাহার সকাল সন্ধ্যা দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রত্যেকটি মধুর বৃন্তে ফুটাইয়া তুলা যায়। সহরের মত সে অনন্ত অংশের অসংখ্য জটিলতা লইয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে না। কিন্তু নিষুপ্ত পল্লীর প্রাণের স্পন্দন সহরের বুকেই কম্পিত হইয়া থাকে। পল্লী যেন মা—নাড়ীর টান তার প্রতি লতায়, বৃক্ষে, ধূলিকণায়। সহর নামহীন বেশভূষা রমণী; মায়ের স্নেহ আছে কিন্তু উদাসীন, মুহুর্মুহু কিন্তু কাহারও নহে। সহরের সম্পদের মধ্যে অকুণ্ঠিতের অকুণ্ঠিত চিত্তে মিশিয়া যাও—কিন্তু আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিড়ম্বিত হইও না। শোষণই ইহার ধর্ম এবং এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে স্বার্থ পুরোহিত।

অমর দরিদ্র বলিয়া এক নিমেষে ইহার মর্মখানি চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার অভাবের উপর সহানুভূতি আসিয়াছে অজস্র, কিন্তু মুখের দুঃখ প্রকাশে জ্বালা করিয়াছে মাত্র। শুষ্ক মুখে হাত দাড়িতে ওই দরদভরা কথাগুলির মধ্যে এমন একটি অমর্যাদা আসিয়া জমে যাহাকে মুষ্টিবদ্ধ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

সে প্রতিদিন দেখে সরল সহজ পথের চারিধারে প্রতিনিয়ত প্রতারণার কুয়াশা ঘনাইয়া উঠে। ভয় মনোহর বেশে আজও ত্যাগের প্রলোভনে কতই না ভোগের সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে। এই সৌধের প্রান্তে যদি কোন জীর্ণ কুটির এখনো বাঁচিয়া থাকে তো তাহার অন্তরে ধন গর্বিতের নির্মম নখরাঘাত কেমন কোমল আবরণে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে—তাহার সন্ধান কয়জনেই বা রাখিয়া থাকে? ভোগের বিষপ্রাণী ক্ষুধা প্রতিদণ্ডে সহজ সরলকে গ্রাস করিয়া—সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রশস্ত নবনির্মিত রাজপথের অন্ধ প্রত্যন্তে কত দরিদ্র অনাথের বুকের রক্ত নিষ্ফল হইয়া আছে; কত তুচ্ছ সুখ দুঃখের ইতিহাস ইহার ঘাতপিষায় প্রকাশ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে কে বা জানে?

সহরের ব্যতিক্রম মলয়। একই কলেজে দুজনে পড়ে, একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে। অমরের চেয়ে অবশ্য তাহার সম্বল। সহরে বাড়ী আছে, পল্লীতেও কিছু জমিজমা আছে। বৃষ্টিত লাঞ্ছক সহপাঠিটিকে

সে একটু মমতার চক্ষেই দেখিয়াছে এবং এই মমতার ফাঁকে যে একটি শুভ্র বন্ধন রেখা পড়িয়াছে—তাহাকে বন্ধুত্ব বলিলে ভুল করা হইবে না।

স্নেহশিশ ও এই বন্ধুত্বে অনেক প্রভেদ। বিলাতী ও দেশীর তফাৎ এইটুকু যে,—বাহ্য প্রকৃতির উপর একটি সক্রিয়, অন্যটি অন্তর্মুখী।

মলয়ের ভাষায় বলিতে গেলে—আমরা সত্যিকারের বন্ধু হতে চাই—ভাকামি করতে চাই না। কেমন? ভাল? এই জিজ্ঞাসার পর মুহূর্তে উত্তর শুনিবার ব্যগ্রতাটুকু যারা বহন করে না—তারা কিসের বন্ধু। শুধু নিজের জ্ঞান বিদ্যার পরিচয় দিতে—শুধু আপনার স্তুতিবাদ শুনতে—এমন অনেক শ্রোতাই তো পাওয়া যায়! আমরা তা হতে চাইনা। আমরা স্নেহও নই—বন্ধু নই,—ভাই।

এ কথা শুনিয়া অমর তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে নাই, তাহার হাতখানি লইয়া সজোরে মর্দন করিয়া উৎকট উল্লাসও প্রকাশ করে নাই, শুধু নীরবে একটু হাসিয়াছিল।

অমরের আত্মীয়স্বজন পরিপূর্ণ স্নেহ হইতে মলয় তাহাকে প্রায়ই আপনাদের বাড়ীতে টানিয়া আনিত। অমর দেখিত—ও সংসারের অযাচিত স্নেহ যত্ন সতত নবাগতের জন্য পরিচর্য্যা উন্মুখ হইয়া আছে। হাসি আনন্দেরও বিরাম নাই। একটি হৃদ্দীপ্ত তারুণ্যের মত জীবনটাকে আনন্দ লক্ষ্যে উড়াইয়া ইহারা কৌতুক অনুভব করিয়া থাকেন। সে কৌতুক বয়সের তারুণ্যে বা বিজ্ঞতার পরে কখনো বিদ্ধ হয় নাই।

অমরের মত আর একটি নবাগত ও বাড়ীতে নিত্য আতিথ্য গ্রহণ করিত। খাস মজলিসে চায়ের পেয়ালা পরিবেশনে সেই অহঙ্কারী। উৎপলা। নামটি কবিজনোচিত কিনা সে বিচার অমর করে নাই—তবে নামের পূর্ব্বভাগ টুকু বাদ দিলে প্রতিমধুর বলিয়াই বোধ হয় এবং সেই কারণেই ও বাড়ীর সকলে তাহা ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

পলার মধ্যে কোথাও সঙ্কোচ বা জড়তা ছিলনা। অকুণ্ঠিত ললিত—বাক্যালাপে সে এমন একটি সহজ আচরণের সৃষ্টি করিত—যাহার কাছে লজ্জাহীনতার অশোভনতাটুকু কোন দিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

অমরের দুঃখ সহিষ্ণুতাকে সে শ্রদ্ধা করিত।—কহিত,—সেকালের বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা আপনাকে দেখলেই মনে পড়ে।—!

মলয় হাসিয়া বলিত,—ও কিন্তু ঘোর গৃহস্থ।

পলা হাসিয়া উত্তর দিত,—শুনেছি চারটি আশ্রমেই গৃহীর অধিকার। যা অর্জ্জনের জন্য একাগ্রচিত্তে সাধনা করতে হয় তাকেই বলে ব্রহ্মচর্য্য।

মলয় বলিত,—ব্যাখ্যাটা বড় আধুনিক হয়ে পড়লো, পলা।

সেকালে গুরুগৃহে বাস—ইত্যিস্থায় গ্রহণ—

পলা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া বলিত, মাপ করুন মশায়—অতীতকে আর বর্ত্তমানের মধ্যে টেনে আনবেন না। অরণ্য কেটে সহর যখন আমরা বসিয়েছি—তখন না হয় হোটেলকেই আশ্রম মনে করে ব্যবস্থা সুরু করা গেল।

—সকলেই হাসিয়া উঠিত।

রাজনীতির উষ্ণ তর্ক সমাজনীতির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অবশেষে পাঠ্যনীতির প্রবাহে ভাসিয়া যাইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিত তাহাদের দেশবিদেশের—জ্ঞান বিজ্ঞান—সাহিত্য শিল্প—শান্তি ও যুদ্ধের আলোচনা।

মলয় ছিল পরিবর্তন প্রয়াসী। জগতের বর্ত্তমান ধারায় গা ভাসাইয়া দিয়া চলাকেই—সে জীবনের কাম্য বলিয়া মনে করিত। পলা করিত তার প্রতিবাদ। নিতান্ত বাধ্য না হইলে অমর ওই সব বিষয়ে কখনো মতামত প্রকাশ করিত না। তার সাধনার জগতে একটিমাত্র দীপশিখা দিবারাত্রির জন্য জ্বলিত। তার দুঃখভারাতুর চিত্ত মৃদুমৃদাঙ্গ সঙ্কিত তিমিরপুঞ্জ ঠেলিয়া—আত্ম পরিজনের সুখ কল্পনার স্বপ্নজাল বুনিত; তাই জগতকে ভালবাসিবার সময় তার ছিলনা। যে কয়টি প্রাণীকে লইয়া তাহার জগত তাহাদের সুখ দুঃখেই সে ছিল বিভোর।

পলা যদি তাহাকে যথার্থ মানিয়া বলিত, আপনি কি বলেন, অমরবাবু?—

—অমর অন্যমনস্কে হয়ত বলিয়া উঠিত,—তা বৈকি।

পলার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিত; সে মলয়ের পানে জয়তৃপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিত —কেমন শুনলেন ত?

মলয় হাসিয়া বলিত,—এ কথাটা অমরের খুব দুরস্ত দেখছি।

অমর আরক্ত হইয়া কহিত,—কিসে বুঝলে?—

মলয় হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিত,—কিছু না বুঝেই—!

পলা কোমর বাঁধিয়া হয়ত নূতন তর্কের সৃষ্টি করিত।

মলয় তেমনি নিঃশব্দ হাসির বাণে বিদ্ধ করিয়া কহিত,—তর্কের একটা গুণ আছে পলা; তা তীক্ষ্ণ এবং শাণিত। বিকৃত যুক্তিকে কাটাবার জন্যই তার আগ্রহ অধিক।—

পলা হাসিয়া বলিত,—সেটা উভয়ত।—

অমর তৎক্ষণে—অন্য চিন্তায় ডুব দিত।—

ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অমরের চিত্ত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হইয়া উঠিতেছিল। দুঃখকে সে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু যতক্ষণ এখানে থাকিত—কোন চিন্তাই অন্তর হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিত না। এই নিশ্চিন্ততার এমন একটি নিরিপ্ত সুখ লুকানো ছিল—যাহা শিথিল কামিনী ফুলের মতই মৃদুস্পর্শ সহ্য করিতে একান্ত অক্ষম।

সেদিন মির্জ্জাপুর পার্কে সত্যাগ্রহী সৈন্য সংগ্রহের বক্তৃতা চলিতেছিল।—

মলয় অমরকে কহিল,—চল শুনে আসি।

অমর কহিল, না, থাক।

মলয় কহিল,—তুই বলিস কি?—আমাদের প্রধান সমস্যা—

অমর ম্লান হাসিয়া বলিল,—নির্য্যাতিতের সমস্যা যে অনেক দিকেই তাই। আমার উন্নতির উপর একটি সংসারের সমস্ত সমস্যা নির্ভর করছে।

মলয় বলিল,—তোদের মত সংসার ত বাংলায় শতকরা ৮০টি; তা বলে তারা—সেই মায়ায় জড়িয়ে পড়ে থাকবে?

অমর বলিল,—যার প্রতীকারে আমি সামান্য সাহায্যও করতে পারবো না—তার অক্ষমতা নিয়ে কেন মিছে নূতন বেদনার সৃষ্টি করি! আমার দুঃখ আমারই থাক।

মলয় উচ্চস্বরে বলিল,—কিন্তু এই দুঃখও আমাদের পরিহার করতে হবে।

অমর ম্লান হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল,—কোন উত্তর দিল না।

চায়ের টেবিলে কথাটা উঠিলে পলা বলিল,—যাই বলুন অমরবাবু—দুঃখকষ্ট আমাদের যতই থাকুক—ওই - অক্ষমতার অপরাধ কি সবচেয়ে বেশী নয়। আমরা কি চিরটা কাল হীনতা বয়ে—মাথা নীচু ক'রে—লাঞ্ছিত হ'য়ে—দীন জীবন যাপন ক'রবো।

অমর শান্তস্বরে কহিল,—তাত নাই—মূল্য আমাদের দিতেই হবে। জগতের মুখোমুখি হয়ে পরিচয় আমাদেরও নিতে হবে। গতির সঙ্গে নিশ্চেষ্টতা নিয়ে মিতালী পাতাতে গেলে—তা যে বড়ই অশোভন হবে—হয়ত আমাদের অস্তিত্বই লোপ পাবে।

পলা উৎসাহিত হইয়া বলিল,—আর ক্ষুদ্র দুঃখকে বৃহৎ দুঃখের পাশের ভাসিয়ে দিতে হবে।

অমর কহিল,—দুঃখ মনের বিকার মাত্র, দুঃখ অপব্যয়ী ছাড়া—এ সবই মানি, কিন্তু তাকে কাটিয়ে উঠতে পারি না। জানি,—এ আমার দুর্বলতা। জন্মের সঙ্গে দুঃখ আমার ললাটে রাজটীকা এঁকে দিয়ে এমন একটি দুর্বল মমতা মনে সঞ্চারিত করেছে—যাকে পরিহার করবার মত শক্তি আমি খুঁজে পাই না। সুখের মত এও একটা বিলাস হয় ত।

মলয় বলিল,—একে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

অমর বলিল,—আগাছা আর বটমূল শিকড়ের কোন বুকে যে অনেক তফাৎ ভাই। মনে প্রাণে সব জেনে বুঝেও এগুতে পারি না—শুধু এই অকারণ মমতায়! একে উৎপাটন করতে হ'লে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া উপায় কি?—

পলা বলিল,—তাতেই নবজীবনের বীজ লুকানো থাকে অমর বাবু।

অমর ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল,—আজ রাত্রি হয়েছে—এসব আলোচনা থাক।—

পলা মলয়ের পানে চাহিয়া কহিল,—শুনলেন ত। এই আলোচনা যেন অবসর যাপনের একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

মলয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অমর ঠিক কথাই বলেছে পলা। আমরা কি এই দুঃখকে যথার্থই মনের মধ্যে নিতে পেরেছি? তর্কের খাতিরে শুধু তর্ক করে যাচ্ছি বৈ ত না।

পলা লজ্জিত হইয়া কহিল,—তা ঠিক। মাপ করবেন অমরবাবু আজ আপনার অনেকখানি ক্ষতি করলাম।

অমর উঠিতে উঠিতে বলিল,—আমাদের জীবনটাই যে ক্ষতির ব্যবসা, পলা দেবী। আজ যে তর্ক উঠেছিল—তাই হয়তো লাভের;—যাক ওসব কথা। নমস্কার। অমর চলিয়া গেল।

পলা কহিল,—ওঁকে দেখলে আমার কি মনে হয় জানেন মলয়বাবু—যেন ছাই চাপা আগুন। ওঁর অন্তরে একটি তেজ আছে, শক্তি আছে, বাইরের দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে মাত্র।

মলয় হাসিয়া বলিল,—দুঃখ বড় মায়াত্মক সামগ্রী পলা—! জানো ত মহাকবি কালিদাসের কথা।

পলা অন্যমনস্কে বলিল,—কিন্তু আগুনের ধর্ম্ম প্রকাশে—কতক্ষণ সে ছাই চাপা থাকে বলুন।

মলয় হাসিয়া বলিল,—আমি ও বিষয় তোমায় অভয় দিচ্ছি পলা। ওর মত ঘোর সংসারী কখনো সংসার ছাড়তে পারে না।

পলা উত্তর না দিয়া অবনত মুখে কি ভাবিতে লাগিল।

গ্রীষ্মের রাত্রে বাড়ী আসিয়া অমর সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল—সহরের একটা আবর্ষণ আছে। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে দীর্ঘ নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা অসহ্য বলিয়া মনে হয়। গ্রামের

প্রান্তে বনলতা ঘেরা ক্ষীণ নদীটির জীবনাবেগ অনুভূত হয়না ; সরু কালির মত একটা কম্পনহীন রেখামাত্র পড়িয়া আছে। সন্ধ্যার অবসানে আকাশের কোনে চাঁদের যতটুকু প্রকাশ পায়,—তাহার ম্লান আলোকে স্তিমিত নদীপ্রান্তর যেন বড়ই ম্রিয়মাণ। অন্ধকারের বুকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা তীব্র শব্দ,—পাখীদের কূলায় ফিরিয়া আসিবার কলরব, দূর হইতে কোন দেবমন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা আরতির ঘোষণা করিয়া হয়তো—বাজিয়া উঠে! পশ্চাতের আম্রকাননে ফলভারাবনত বৃক্ষমূলে অস্থায়ী কুটীরে উদ্যানরক্ষকের কর্কশ কণ্ঠও কয়েক প্রহরের জন্য থামিয়া উঠে এবং তাহার হারানো গাভীর হাম্বারব—বহুদূর বনপ্রান্ত হইতে শোনা যায়। নদীর ওপারে দূ-দূ মাটির রুক্ষ বুকে অযত্নরক্ষিত আগাছাগুলিকে শস্য শষ্পাদ বলিয়াই মনে হয়।—তবু মনের তৃপ্তি আসে না।

চাঁদের প্রত্যাশী সে নহে, কিন্তু সেই টেবিলটি ঘিরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় আলাপ আলোচনায় যে রমণীয় মুহূর্তটি রচিত হইয়া উঠিত, তাহা জীবনের অনেকখানি স্থানই অধিকার করিয়া লইয়াছে।

শূন্য প্রান্তরের মতই প্রতিদিন শূন্য মনে সে গৃহে ফিরিয়া আসে।

দুখানি খড়ের চালা—পাশাপাশি। একখানির দেওয়ালে কয়েকটি মোনা আতার খুঁটি উপরের পাতার আচ্ছাদনটি বহিয়া যে ক্ষুদ্র ঘরের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহাতেই রন্ধনের কার্য্য হইয়া থাকে। বড় চালার পাশে কালি-এতটুকু দাওয়া ; তাহা লণ্ঠন জ্বালাইয়া ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ছোট ভাই দুটি মণিং স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেছে। ছোট বোনটি মায়ের সঙ্গে রান্না ঘরে বসিয়া প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের গল্প করিতেছে। ...বড় ঘরের চালার ফাঁক দিয়া আকাশের ম্লান চন্দ্র কিরণ উঁকি দিতেছে। সামনে বর্ষা, সুতরাং ভাবনাও ইহার জন্য যথেষ্ট।

অমর দাওয়ায় উঠিয়া ছোট ভাই দুটির পাশে বসিল। তাহার মধ্যে একজন মাকে ডাকিয়া বলিল,—মা—দাদা এসেছে।

রান্নাঘর হইতে মা অবিলম্বে একখানি ছোট কলাইকরা জিমে খানকয়েক লেপে, দুটি আম ও খানিকটা গুড় লইয়া পুত্রের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ। বিকেলে একটু জল খেয়ে বেরুস নি।

অমর হাসিল, কহিল,—মা, এবার—চালা তো না ছাওয়ালে নয়।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সবই ত দেখছি বাছা,—কোথা থেকে যে কি করি। যাক,—এবারটা কেটে যাবে কোন রকমে। চৌকিটা না হয় উত্তর দিকে টেনে নেব'খন।

অমর বলিল, আমার আর পড়তে ইচ্ছে হয় না, মা। যা জোটে একটা চাকরী খুঁজে নিই।

মা দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—তা কি হয় বাবা। তোর পড়ার খরচ ত আমাদের দিতে হয় না—উল্টে তুই-ই আমাদের কিছু সাহায্য করিস।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—একটা কথা ক'দিন থেকে ভাবছি অমু!

অমর কহিল, কি, মা!

মা বলিলেন,—বরাতপুরের নন্দীরা বড় ধরেছে। বলছে ঘর-বসত সবশুদ্ধ হাজার টাকা দেবে। বিয়েটা আমাদের শ্রাবণে দেওয়াই তাদের ইচ্ছে।

অমর বিস্মিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত মায়ের পানে চাহিয়া রহিল। পরে হাসিয়া কহিল,—তুমিও বোধহয় আশা ক'রে আছ তাদের টাকা পেলে খড়ের চালাটা সারাবে—ধানের জমি ক'বিঘে খালাস ক'রে নেবে—আর—

মা ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন,—তারা বড়লোক বলে তুই অমত করেছিলি—তাই আমি কথা দিতে পারিনি।

অমর বলিল,—বেশ ক'রেছ মা। অবস্থার ওপর উঠতে গেলে লাভ হয় না—ক্ষতিই সইতে হয়। কাজ কি মা পরের দান নেবার। আমাদের ক্ষমতায়—যা কুলোয় তাই ভাল।

মা বলিলেন,—পাড়ার পাঁচজনে বলছিল—কাজটা ভালই হ'তো, ছেলে তোমার মানুষ হ'তো।

অমর বলিল,—তা হ'তো। তবে তোমার সাধ কতটা মিটতো বলতে পারি না। সে বড়লোকের মেয়ে কি তোমার এই ভাঙা কুঁড়েয় এসে সংসার পাততো,—না তার বড়লোক বাপ তাকে এখানে পাঠাত? লাভ হতে মানুষ করা ছেলেটি হ'য়ে যেত পর। বলিয়া অমর হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মা-ও হাসিয়া বলিলেন,—তা মিথ্যে নয়। তবে কাল তাদের জবাব দিয়ে দেব।

পরদিন প্রত্যূষে কে একজন অমরদের উঠানে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন তাহাকে ডাকিতে লাগিল। অমর চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিতেই সে ব্যক্তি হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বাবা শীঘগির এস,—তোমার খুড়ীমাকে বুঝি আর রাখতে পারি না। অমর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল,—কি হয়েছে তাঁর? সে ব্যক্তি তেমনই আকুল কণ্ঠে কহিল,—তোর রাত্তিরে দু'বার ভেদ বমি হ'য়েছে। চক্ষু বসে গেছে—কথা হাঁড়ীর ভেতর ঢুকেছে; কি হবে বাবা?

—বলিয়া শিশু বালকের মত সে কাঁদিতে লাগিল।

অমর তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, আপনি চুপ করুন। একটু ঠাণ্ডা হোন, মা জিজ্ঞেস করব সব খুলে বলুন দেখি।

কিন্তু অমরের প্রশ্নে সে ব্যক্তি ব্যাকুলতা ছাড়া অন্য কিছুই প্রকাশ করিতে পারিল না।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া অমর কহিল, দেখুন, শশী ডাক্তারকে একবার ডাকলেন না কেন? আমি বিশেষ কিছুই জানি না,—সামান্য একটু আধটু বই প'ড়ে—

সে ব্যক্তি শশী ডাক্তারের উদ্দেশে একটা অকথ্য গালি উচ্চারণ করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল,—গিছলুম রাত্তিরে তার বাড়ী। হারামজাদা ব্যাটা এমনি চামার,—কি ব'লবো বাবা—বলে কিনা—দুটি টাকা নগদ না পেলে এক পাও নড়বো না। এক কৌটা ওষুধ দেব না। গেল মাসে ছেলেটার অসুখে এক শিশি জল দিয়ে দু'আনা বিল ক'রেছিল—টাকাটা এখনও দিতে পারিনি,—তাই।

জানো ত বাবা আমাদের অবস্থা। পরশু একবেলা খাওয়া—বলিতে বলিতে সহসা সে কথা চাপিয়া গিয়া আকুল হইয়া কহিল,—কিন্তু আর দেরী ক'রলে তোমার খুড়ীমাকে যে ফিরে পাব না, বাবা।···তুমি যে ওষুধ দেবে—তাই আমার ধন্বন্তরী হবে। এসো বাবা।

ঔষধের বাক্স আনিতে ঘরের মধ্যে আসিতেই মা বলিলেন,—তোর তো ওখানে যাওয়া হ'তে পারে না, অমর। তুই হয়ত ভুলে গেছিস—কিন্তু আমি ভুলিনি। ওঁর সৎকারের সময় প্রায়শ্চিত্ত হয় নি ব'লে—এক প্রাণীও রাত্রিতে দাহ ক'রতে আসেনি।

অমর বলিল,—আমারও মনে আছে, মা। বিধু খুড়ো হল পাকিয়ে বাবার শ্রাদ্ধটাও পণ্ড করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের ক'বিঘে জমি বন্ধক দেওয়ার মূলেও ওর সেই মিথ্যা মোকর্দ্দমা।

মা কহিলেন,—তবে? তুই ওঁকে স্পষ্ট ব'লে দে আমার দ্বারা কিছুই হবে না। তাকুন শশী ডাক্তারকে। একটা গৃহস্থকে উচ্ছন্ন ক'রবার জন্য যে জলের মত টাকা খরচ ক'রতে পারে, তার ডাক্তারের কী দু'টাকা জোটে না।

অমর ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত' হাতে হাতে ক'রেছে মা। এখন একবেলা জোটে—একবেলা হয়'ত দু'মুঠো জোটেও না। পরনে দেখলাম—শতছালি দেওয়া কাল কাপড়—মাথায় চুল রুক্ষ। না, মা,—মানুষের বিচার—মানুষ হ'য়ে আমরা করি কেন?—তুমি আমায় যেতে বল'।

মা কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া কি চিন্তা করিলেন। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—ভগবান ওদের মঙ্গল করুন—তুই যা।

অমর মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিল।

অমরের চিকিৎসা গুণেই হউক—কিংবা ভাগ্যলিপি বলিয়াই হউক—রোগিনী সারিয়া উঠিল।

দিন দুই পরে—ঔষধ দিয়া বাহিরে আসিবার সময় অমর বলিল,—আর আমার দরকার নেই—ভয় কেটে গেছে।

বিধু আনন্দের আতিশয্যে ক্ষণকাল মুহ্যমান হইয়া অমরের পানে চাহিয়া রহিলেন—; পরে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—আমায় মাপ কর, বাবা।

অমর কুণ্ঠিতস্বরে বলিল,—আপনি অমন ক'রবেন না,—স্থির হোন।—ভুলভ্রান্তি আছেই।

তিনি আকুল কণ্ঠে কহিলেন, ভুল? না বাবা, সে আমার ইতরামি! আমি মহাপাপী—তেমনি শাস্তিও হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন—এক সময়ে হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন,—সমাজ!—সমাজের ভয় দেখিয়া শাসন করেছিলাম! তেমনি আইবুড়ো মেয়ে গলায় বেঁধে সমাজ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। হবে না?—ওরে—কাঠার মাপ—হাতে হাতে শোধ।

অমর সান্ত্বনার কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া—একবার দাওয়ার পানে চাহিল। সেখানে প্রতিদিনকার মতই বিষণ্ণ মুখখানি লইয়া শুভা দাঁড়াইয়া আছে।

কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে;—অর্থাভাবে পাত্র জুটে নাই। রূপও তাহার নাই। কে জানে—কোন কালে সমাজের বিভীষিকা কাটাইয়া এই বাংলার কোন একখানি গৃহে মাথা গুঁজিবার এতটুকু ঠাঁই উহার মিলিবে কি না।

অমর দেখিয়াছে—আহার নিদ্রা ভুলিয়া—প্রতিক্ষণটি সে সেবা-নিপুণ করে নিবিষ্ট মনে রোগিনীর পরিচর্য্যা করিয়া যাইত। শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চক্ষু বিষণ্ণ চিন্তায় ম্রিয়মাণ বোধ হইত।—সেই অসহায় মমতাময় দৃষ্টিতে সমাজের তাড়না চিহ্নও হয়ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। কিন্তু রূপহীনাকে যাচিয়া বরণ করিতে কুটীরবাসী—একাহারী দরিদ্রও কেহ আসে নাই। রূপ—রূপ! রূপের মরীচিকায় বাংলার প্রাসাদ, প্রান্তর, কুটীর,—অরণ্য বিভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে!—এই রূপের দাবানল জ্বালিয়া সমাজ আজ মনুষ্যত্বের যে অবশিষ্টটুকু ভস্মসাৎ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, হয়ত একদিন ইহার জন্য মূল্য তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে! অর্থ এবং রূপ বিনিময়ে কুমারী কন্যা চিরজীবনের পরম আশ্রয় লাভ করিতেছে। যাহার এই দুটি সম্পদ নাই—বাংলার ধূলিকণায় তাহার স্থান মেলে না।

শুভা পাশুর মুখখানি অবনত করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে চলিয়া গেল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অমর ভাবিল,—হায় কন্যাদায়, অর্থাভাব, স্বার্থলোলুপতা, সঙ্কীর্ণতা—কত না সমস্যায় ছিন্ন বাঙ্গালীর সাধনার চন্দ্রাতপখানিকে ছিন্নময় করিয়াছে।

পরদিন মন্দরের নিকট হইতে সে একখানি পত্র পাইল। মন্দর লিখিয়াছে—

বিদায় বন্ধু। দেশের ডাক উপেক্ষা করতে পারলুম না—অহিংস সংগ্রামের স্বেচ্ছা সৈনিক হ'য়ে

আজ যাত্রা করেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যেন এই যাত্রা আমাদের জয় যাত্রা হয়। পল্লা আমায় হাসিমুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে। তার অশ্রুপ্লাবিত দুটি চোখের অভয় ইঙ্গিতে—আজ কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।—জয়ী হ'য়ে ফিরবার মুখে জয় মাল্য তার হাত থেকেই পাব—আশা আছে।

পড়িতে পড়িতে অমরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।—ভারতের মুক্তি—জগতের মুক্তি।—অমর আজ সেই গৌরবময় মুক্তি সৈন্যের সৈনিক। তার চারিদিকে বিজয়দুন্দুভি, তার সম্মুখে আলোকদীপ্ত লক্ষ্যপথ, পশ্চাতের-পার্শ্বের—জয় কোলাহলে দেহের প্রতি রোমকূপটি পর্য্যন্ত রোমাঞ্চিত। ললাটে ত্যাগের হোমটীকা, অধরে দৃঢ় সঙ্কল্পের নির্ভীক হাসি, বক্ষে দুর্জ্জয় সাহস, পদে দুর্ব্বার গতি,—কণ্ঠে ব্যোমভেদী জয়ধ্বনি। আর দূর দিগন্ত হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোলে যমুনা গীতি গাহিয়া—বাল সূর্য্যের রক্তদ্যুতি—বিজয় বাহিনীর সেনাপতির পুরোভাগে পদপ্রান্তে লুটাইয়া প্রণতি জানাইতেছে। সে মহিমময় নির্ব্বাক ভাষায় প্রাণ যেন জগতকে ডাকিয়া বলিতেছে,—দেখ,—চাহিয়া দেখ। তোমার সৃষ্টিকাল হইতে এমন হিংসাশূন্য পরম সত্যময় মহাযুদ্ধের কাহিনী আর কেহ কি রচনা করিয়াছে? তোমার অন্ধকারময় যুগের গর্ভেও ইতিহাসের এমন অমূল্য অধ্যায়ের কল্পনা ছিল না। তোমার জ্ঞান মহিমামণ্ডিত প্রত্যক্ষ সত্যও এতবড় মহত্তর সত্যের সমুখীন কখনো হয় নাই। তুমি এই ব্রতে দীক্ষা লও—তোমার অসংখ্য কোটি সন্তান—এই অনন্ত কল্যাণের পথে যাত্রা করুক। জগত অক্ষয় শান্তির—নূতন ইতিহাস পাঠ করিয়া সর্ব্ব সংশয় মুক্ত হউক।

স্বপ্ন! অমর ক্ষণকাল ওই মহান স্বপ্নে বিভোর রহিল। পরে তাহার মুখের হাসি ম্লান হইয়া গেল। সে দেখিল,—কুটীর দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া চারিদিকে অভাব দুঃখের তাড়না লইয়া ও স্বপ্ন সংসারীর সাধ্যে না! সংসার—নির্ম্মম নিষ্ঠুর সংসার!

কেন এই মায়ামোহ?—কেন এই বন্ধন? ভাই-ভগিনীর মমতা তাহার চারিদিকে নিগড় রচনা করিয়াছে! বিশ্বের অনন্ত প্রবাহে—কেন আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মায়ার সূক্ষ্ম গলায় দোলাইয়া বাঙ্গালীর জন্মগতি নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে? তার সর্ব্ব অভাবকে ছাপাইয়া জীবন ধারণের সমস্যাই কি এতবড় হইয়া উঠিল। পিতৃ ঋণ—মাতৃ ঋণ—স্নেহের ঋণ—ভালবাসার ঋণ-শুধু ঋণ লইয়া তাহার কারবার। সকলের মূলধনকে বাদ দিয়া এ ঋণের বিধি কে তাহার শাস্ত্রের পাতায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? এই ঋণ ভারে জর্জ্জরিত দেহ আজ দুর্ব্বলতার সহায়তায় সর্ব্বদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ—করিয়াছে। তাহার চিন্তায়—বাক্যে—আচরণে, তাহার ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে, তাহার লক্ষ্যে—সাধনায়—মুক্তিতে একটা গ্রন্থিবদ্ধ হীনতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে;—তাহা পশুতারই নামান্তর।

—অমু—কি ভাবছিস রে। আজ ও বাড়ীর বিনুবুড়ো তোকে নেমতন্ন ক'রে গেছেন—এই বেলা নেয়ে নে। আহা!—এতদিন পরে মেয়েটার বোধহয় একটা হিল্লে হ'ল।—

অমর মায়ের পানে চাহিল।

মা বলিতে লাগিলেন,—পাত্র দোজবরে—বয়সও তেমনি হয়েছে। তা হোক,—বেচারার জাত ধর্ম্ম রক্ষা হবে ত। বুঝতে পাচ্ছিস না,—শুভাকে আজ আশীর্ব্বাদ ক'রতে আসবে।

অমর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—জাতি ধর্ম্ম!—

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। শুভার চির জীবনের করুণাময় আত্মসমর্পণকে দেখিয়া অমরের মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিয়া স্তম্ভিত হইল যে, পলিতকেশ শক্তিহীন এই মৃত্যুপথ যাত্রীর অন্তরে বসন্তের

মধ্যে স্পর্শ, ধর্ম রক্ষার অছিলায় একটা লালসার উত্তেজনা যোগাইয়া—সে আগুনে আর একটি অনাঘ্রাত অজ্ঞান যুবককে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে সঙ্কুচিত হয় না। তাহার দণ্ড যাক আইনে হয়ত নাই; কিন্তু মানুষ কি করিয়া ওই কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে হাসিমুখে গলা বাড়াইয়া দেয়—এতবড় অন্যায়কে অনায়াসে সহ্য করিয়া যায়। সমাজের অত্যাচার হইতে তিলে তিলে দুর্বানলে দগ্ধ হইবার এই মহাপাপময় বিধান বাংলার সমাজ ছাড়া আর কোন সমাজে নাই।

সেদিন বিবাহের একটা লগ্ন ছিল। সম্প্রতি সহ্য আইনের বিভীষিকায় বাংলার আকাশ-বাতাস যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের যে ক'টি লগ্ন পাঁজির পাতায় লেখা আছে—তাহার সব ক'টিই হাজার হাজার কুমারী কন্যার গৌরী অথবা কন্যা দানের পুণ্যফলে সার্থক হইয়া উঠিতেছে। এই ক্ষুদ্র পল্লীখানিও সহসা আপন রোগ-শোকের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া এই পরম উৎসবে মাতিয়াছে। বয়সের কোন তারতম্য নাই, এক হইতে যে কোন বয়সের কন্যা—আইনের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া হিন্দুধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া স্বামিগৃহে যাইতেছে। তাহারা কাঁদে নাই—সে জন্য তাহাদের দুঃখ নাই; হাসেও নাই কারণ সে জিনিষ কি ভাল বুঝে নাই এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হাসি কান্নার সীমা অতিক্রম করিয়া এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিবে, যেখানকার তীব্র উত্তাপে হাসি কান্না নহে, মানবীয় যতকিছু সুকোমল বৃত্তি—জ্বলিয়া পুড়িয়া অনুভূতিহীন জীবনের কর্মফল বলিয়া জগতে ঘোষণা করিবে।

রাত্রি দ্বি-প্রহরে কাহার আর্তস্বরে অমরের নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। সে বাহিরে আসিতেই বিধুখুড়ো তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন.—তোমার মা কোথায় বাবা? তাঁকে ডাক, আমার সর্বনাশ হয়।

চীৎকারে মায়েরও নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়াছিল, তিনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া দ্বারের পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

বিধুখুড়ো সেই দিকে চাহিয়া আকুল কণ্ঠে বলিলেন,—আমায় বাঁচাও বৌদি, সর্বস্ব বুঝি যায়।

তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—কি হয়েছে, ঠাকুরপো?

বিধুখুড়ো বলিলেন,—এ আমার পাপের ফল—পাপের ফল। টাকা কম হয়েছে বলে বর উঠে যাচ্ছে, বরযাত্রীরা আমায় শাসাচ্ছে।···কেউ এক পয়সা দিলে না। তুমি যদি বৌদি—

কথাটা শেষ না করিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

অমরের মা প্রশান্তস্বরে কহিলেন,—ভয় নেই ঠাকুরপো,—ওঠো।—স্থির হও। টাকা আমি দিতে পারবো না সত্য—সে অবস্থাও আমার নয়—

বিধুখুড়ো তেমনি আকুল কণ্ঠে কহিলেন,—টাকা ছাড়া আর যে কোন উপায় দেখছি না, বৌদি! হাত পোয়ালে আমার শুভা যে চিরদিনের জন্য—

অমরের মা স্থির স্বরে কহিলেন,—কলঙ্ক মুক্ত হবে। ভয় নেই—শোন। আমার টাকা নেই—, কিন্তু ছেলে আছে। অমরকে তোমার পছন্দ হবে কি ঠাকুরপো?

বিধুখুড়ো দারুণ বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ উচ্চারণ করিলেন না। পরে অকস্মাৎ অমরের মায়ের পা দুখানির উপর আপনার মাথাটি রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—এ যে আমার মহত্ত সম্মান। স্বপ্নেরও অগোচর।

অমর আর বাধা নিষ্পত্তি করিবার সময় পাইল না। নত মুখে মায়ের আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

অপেক্ষের তরে তাহার মনে কলিকাতার কথা জাগিয়াছিল কি? সেই বন্ধু বান্ধব, মুক্তির কল্পনা, দেশের দুর্দশা, জীবনের সমস্যা, মনের তাগিদ, পলার স্মৃতি?

তখন না জাগিলেও—পরে জাগিল। জাতি রক্ষার অপূর্ব আত্মপ্রসাদের এককোণে—ধীরে ধীরে জীবনের আশা মুখ তুলিয়া চাহিল।...ইহা আর নূতনই বা কি? শৃঙ্খলের উপর আর একটি নূতন শৃঙ্খলের সংযোগ হইল।

বিবাহান্তে অমর কলিকাতায় চলিয়া আসিল। তখনও ছুটির কয়েকদিন বাকী ছিল, কিন্তু গ্রামের স্পর্শ তাহার সহিতেছিল না, নদী-প্রান্তর বনপথ শস্যক্ষেত্র সর্বত্রই রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধনের মাঝে এই অনাহূত বন্ধন বড়ই কষ্টকর—কঠোর বলিয়া মনে হইল।

পলার সঙ্গে দেখা। চায়ের টেবিল উঠিয়া গিয়াছে। পলা বলে,—চায়ের জলে দেশী লোকের হতে হতে জনে জনে আহুতি যেওয়া জীবনী রস মিশিয়া আছে। বুকের রক্ত দিয়া যে প্রতিষ্ঠানের হর্ম্যসৌধ তাহারা গড়িয়া তুলিতেছে, তন কতক ধনী পরম বিলাসে তাহাই অবহেলায় উড়াইয়া দিতেছে। এ অপচয় নিবারণে বিরাট বিদ্রোহের চেয়ে আপন আপন ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞা ঢের বেশী উপযোগী। অমর তাহা স্বীকার করিল।

পরে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—মলয়ের খবর?—

পলা হাসিমুখে উত্তর দিল,—তাঁদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, অনেকদূর গেছেন। কাগজে পড়েন নি, মাঝে কি একটা হাঙ্গামা হয়েছিল? তাতে কয়েকজন সেবকের—কিছু কিছু দৈহিক ক্ষতি হয়েছে। কারো পা গেছে, কারো গেছে হাত—কারো কারো বা চোখ।

অমর ব্যঙ্গস্বরে বলিল—মলয়?—

হাসিমুখে পলা বলিল,—তাঁর শুনেছি একটা চোখ নষ্ট হয়েছে।—

অমর আতঙ্কে অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল।

পলা মৃদু হাসিয়া বলিল—তাতে কি? দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা মেনেই ত তাঁরা এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর একটি চোখের কৃতিত্বে যদি হাজারটা চোখে আজ জল আসে, তার চেয়ে মহৎ লাভ যে আর কিছুতে নেই, অমরবাবু! সে যে তাঁর গৌরব।

অমর ক্ষণকাল কোন কথা বলিতে পারিল না। কি যেন একটা ব্যথা—কিসের যেন হীনতা—তাহার সারা মনে জাগিয়া উঠিল।

সে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিল।

পলা কহিল, কি ভাবছেন? বন্ধুর কথা? না,—না, ওসব ভাববেন না। তাঁরা সকল ভাবনা চুকিয়ে এগিয়ে গেছেন। আমরা কেন মিছে ভেবে মন খারাপ করি। তারপর, আপনার খবর কি? চেহারাও ত বিশেষ সুবিধার ব'লে বোধ হচ্ছে না।

অমর ম্লান মুখ উঠাইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, আমি আজ বড় অসুস্থ পলা দেবী।—আমায় মাফ করুন।

পলা স্নিগ্ধস্বরে বলিল, সত্যই আপনি অসুস্থ। যান, যেয়ে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

পরদিন অমর পলার সাক্ষাতে অকপটে আপনার কাহিনী—সমস্ত বলিয়া গেল।

পলা শুনিয়া স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্বরে কহিল, তা হোক, সংসারের প্রতি কর্তব্য অবহেলা করাও পাপ। আপনি এক বালিকার জীবন রক্ষা ক'রেছেন।

অমর বলিল,—কিন্তু নিজেকে হত্যা ক'রেছি।

পলা বলিল,—দেখুন, একটা কথা বলি আপনাকে। একদিন আপনার কথা নিয়ে আপনার বন্ধুর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন,—ও ঘোর সংসারী,—শিকল কাটা ওর পক্ষে অসম্ভব। আমি বলেছিলাম, ওঁর মনের মধ্যে এমন একটি তেজ অহরহ জ্বলছে—যার ত্রিসীমানায় পৃথ্বলের অস্তিত্বও থাকতে পারে না। বাইরের বাঁধন যতই শক্ত হোক, ওঁর মনের ছায়াও তা স্পর্শ ক'রতে পারবে না।

—অমর শুষ্কস্বরে কহিল,—আজ দেখছেন তো কতখানি অযোগ্য ধারণা করেছিলেন!

পলা হাসিয়া বলিল,—না অমরবাবু, আজ আপনার বন্ধুরই পরাজয়। আপনার মনের ভিতরকার সে অনির্বাণ তেজ—আরও যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

অমর ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিল, এ আপনার নিষ্ঠুর পরিহাস, পলাদেবী।

আশ্চর্য্যে পলা বলিল,—নিষ্ঠুর পরিহাস!

পরে গম্ভীর হইয়া কহিল,—অতে এতটুকু অসত্য নেই,—অমর বাবু—। আজ না বুঝুন—একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, দেখুন, বাঁধন যারা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করে তাদের কাছে তা মুক্তির অগ্রদূত। ভুলে যাওয়াকেই আমি বলি—পরাজয়।

অমরের মনের মধ্যে কিসের একটা বিদ্যুৎরেখা চকিতে খেলিয়া গেল। বেদনার কারণ ভুলিয়া হাসিমুখে সংসারের সুখস্রোতে সে গা ভাসাইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অহরহ অনুতাপ জ্বালাইয়া তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার কি দাম? না জীবন—না মৃত্যু,—না উদ্বেগ—না—নিশ্চিন্ততা,—এ বৃত্তির পরিণতি কোথায়? আলো অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী এই যে লক্ষ্যহীন পথ—এপথে পথিকের চলার সার্থকতা কোথায়? এ শুধু গতানুগতিকা প্রবাহে—গা ভাসাইয়া অসংখ্য—বুদ্বুদের মত—ফুটিয়া উঠিয়া—মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইবার প্রয়াস!

পলাকে নমস্কার করিয়া সে কহিল,—আপনি কি ভাবেন—জানি না। কিন্তু আমি জানি—কতবড় কৃপার পাত্র—আমি।—

পলা কোন উত্তর দিল না, নীরবে হাসিল।—

অমর চলিয়া গেলে পলা নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে আপন মনে গাহিতে লাগিল,—

"নাহি নাহি ভয়,—হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার;
জানি জানি তোর—বন্ধন তোর—ছিঁড়ে যাবে বারে বার—।
ওরে ওরে তুই—হারায়ে চেতনা—ভুলি নিজের করিবি বাসনা—
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।—"

মেঘের মুক্ত কক্ষে শুইয়া অমর ভাবিতে লাগিল, আজ যদি সে মরণ হইত—ত—তাহার চেয়ে সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে কেহ থাকিত না। একটু পূর্ব্বে তাহার চক্ষু নষ্ট হওয়াতে অমরের মনে কষ্ট হইতেছিল। এখন ভাবিল—দুঃখ কেন?

পলা ঠিকই বলিয়াছে—একটি চক্ষুর বদলে যদি হাজারটি অন্ধ সজল হইয়া উঠে!

দূর প্রাসাদের সন্ধীশ্বরূপ—একটি তীব্র মরণ ইচ্ছা অহরহ তাহার জীবনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া কর্ম্ম পথের অগ্রে অগ্রে আলোক বিকীর্ণ করিয়া চলিতে থাকে,—ও তাহার উদ্যমকে আঘাত করিতে পারে এমন প্রচণ্ড শক্তি পৃথিবীতে নাই। অমর হাসিমুখে এই শুভ কামনামণ্ডিত জয়শ্রীকে বরণ করিতে এক একটি অঙ্গ কাটিয়া দিতে পারে। মরণ বন্ধু! তুমিই ধন্য—! এমন গৌরবময় যাত্রার সঙ্গে পশ্চাতে স্মৃতি-সৌরভিত অমূল্য কোহিনুর মণি লইয়া চলিয়াছ।

উৎসাহে অমর শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আমিই বা এই গৌরব রচনা না করি কেন? সংসারের বন্ধন আছে সত্য, তার মধ্যে মুক্তি ত আবাধ্যনহে—। শুভা তার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী—অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী। সে কি মহৎ ধর্ম্ম পথটিতেই চলিবার জন্য বাধ্যনয় হইয়াছে। কর্ম্মের কণ্টকময় বন্ধুর পথে দুর্য্যোগের রাত্রিতে কেন সে সঙ্গচ্যুত হইবে?—কেন সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অমরের মত সেও তাহার জয়মাল্য রচনা করিয়া লইবে।

মহা আনন্দে অমর গ্রামে ফিরিল। যাইবার কালে কক্ষ গ্রামের মুখে অপ্রসন্ন বিষণ্ণতার ছায়া নামিয়াছিল, আজ প্রভাত—অরুণালোকিত বৃক্ষপল্লবশীর্ষ কোমল হাসির আবেগে বুঝি—মৃদু মৃদু কাঁপিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। নব জীবনের নবীন কর্ম্মক্ষেত্র শান্ত—মনোরম—তৃপ্তিময়।

শুভাকে নির্জ্জনে পাইয়া অমর কহিল,—দেখ, এসব বিলিতী কাপড় আর প'রো না। আমি ত গান্ধী মহারাজের আদেশ?

শুভা বিস্মিত হইয়া অমরের পানে চাহিল। পরে মাথা নীচু করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তিনি কে?—

অমর নিরাশ না হইয়া বলিল,—এই ভারতের সন্তান তিনি। আজ দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কৌপীন পরেছেন।

শুভা তেমনই মৃদু কণ্ঠে কহিল, কেন?

অমর বলিল,—দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত ক'রবেন বলে।

শুভার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, কহিল,—সে আবার কি?—

অমর ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইল—কিন্তু স্ত্রীর অজ্ঞতায় রাগ করিল না। ধীরে ধীরে সংক্ষেপে দেশের ইতিহাস বলিয়া গেল। শুভা কোন প্রশ্ন না করিয়া নীরবে অমরের কথা শুনিতে লাগিল।

বাক্য শেষে অমর বলিল,—এখন বুঝলে?

শুভা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু পাছে অমর দুঃখিত বা কষ্ট হয় এই ভাবিয়া—ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—বুঝিয়াছে।

খুসী হইয়া অমর বলিল,—এখন বল দেখি—আমাদের এমন কোন কাজ করা উচিত কি,—যাতে দেশের গৌরব ম্লান হয়?

শুভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না উচিত নহে।

অমর উৎসাহে শুভার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল,—এমনি সহধর্ম্মিণী আজ বাংলার ঘরে ঘরে জন্মাক। শুভা, আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

এ কথায় শুভা সায় দিতে পারিল না। ম্লান মুখে কহিল, কোথায় যাবে?

—অনেক দূর।

—কবে ফিরবে?

—না-ও ফিরতে পারি। হয়ত জন্মের মত—

শিহরিয়া শুভা দুই হাত দিয়া অমরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, ছি,—ছি, একথা বলোনা, আমার কষ্ট হয়।

অমর সবিস্ময়ে দেখিল,—শুভার দুটি চক্ষু জলভারে টল্‌টল্ করিতেছে।

কহিল,—পাগল! কাঁদছ কেন? এইত একটু আগে বললে যাতে দেশের গৌরব ম্লান হয়—এমন কাজ করা উচিত নয়।

শুভা আর সহ্য করিতে পারিল না। ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, আমি মূর্খ—কিছুই বুঝিনি। তুমি ওসব হাইটস্ব কথা আর ব'লো না।

অমরের এত আশায় কে যেন নিমেষে আগুন ধরাইয়া দিল।

শুভার যৌবন-তরঙ্গিত দেহের পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল, পাত্রের ধর্ম ও জীবনের ধর্মে কত প্রভেদ! একটির সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ অনিবার্য। ধর্ম রক্ষার আত্মপ্রসাদে সে একদিন গৌরব বোধ করিয়াছিল। আজ জীবন ধর্মের গৌরবে সে হীনতি পতিয়ানে হইয়া গিয়াছে। জীবনের পাশটিতে আসিয়া যে-ধর্ম আশ্রয় লইতে না পারিল, পথের সাথী না হইয়া শুষ্কভাবে যে মাথায় চাপিয়া বসিল, কালের গতিমুখে তরঙ্গ আবর্তে তরণী হইয়া যে সম্মুখে না ভাসিল, আলোর পরিবর্তে প্রচুর ধূম যাহার শিখার উদ্গারিত হইল সে নিখিল ধর্ম হইলেও মানুষের প্রয়োজনের বাহিরে।

আবার সে শুভাকে বুঝাইতে লাগিল।

শুভা কাঁদিতে লাগিল—পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিল—আপনাকে হীন বলিয়া শত সহস্রবার ধিক্কার দিল, কিন্তু কিছুই বুঝিল না।

তাহার ধারণা হইল—তাহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিয়া স্বামীর এই তীব্র বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। দেশপ্রেম একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অমর বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই সরলা পল্লীবালা দেশ জানে না- জানে সংসার। পত্নীর উপর তাহার যেটুকু মমতা সঞ্চিত আছে—তাহা এই সংসারকেই উপলক্ষ্য করিয়া।

আবরণহীন গৃহকোণে—স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র দীপটি জ্বালিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে হৃদয়বৃত্তির সুকোমল দিকটা চর্চা করিলে ললিত মধুর কিছু মিলিতে পারে, কিন্তু চলিবার পথে তা অহর্নিশ আলোকে প্রয়োজনহীন। বাহিরের অন্ধকারময় পথে—বিবাদ ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড বেগ এই ক্ষীণ আলো মুহূর্ত মাত্র সহিতে পারে না। ইহারা স্ত্রী এবং সহধর্মিণীও হয়ত—কিন্তু সঙ্গিনী নহে।

সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল,—শুভা, আজ বড় আশা তুমি ভেঙে দিলে। তোমার কাছে আমি ঢের বেশী প্রত্যাশা ক'রেছিলাম।

শুভা কাঁদিতেছিল—কোন উত্তর দিল না; স্তোত্রের বেগ বন্ধিত হইল মাত্র।

ইহার কয়েকদিন পরে অমর কলিকাতায় চলিয়া আসিল। তাহার মন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ভবিষ্যতের উন্নতি আশায় পড়িবার স্নেহ ও সহিষ্ণুতা সে হারাইয়া ফেলিল। কয়েকদিন কলেজে যাওয়ার পর —সে একদিন চাকুরীর আশায় অফিসে অফিসে আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিল। সংসারের প্রয়োজন সে তার মতই মিটাইবে।

চাকুরী মিলিল—৪০টি টাকা। অমর পাঠ্যপুস্তকগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিল। সে মেস ত্যাগ করিয়া অন্য মেসে আসিয়া উঠিল এবং ৯টায় তাড়াহুড়ি নাকে মুখে দুটি গুঁজিয়া পথের জনতা বৃদ্ধি করিয়া অফিসে যাইতে লাগিল।

পল্লীর সঙ্গে আর দেখা করিল না।

কয়েকটি মাস এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। সংসারের অভাব কিন্তু মিটিল না। মা, পত্র ছাড়িয়া দিবার জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছিলেন। অবশেষে সংসারের অভাব অভিযোগের কথা একে একে জানাইতে লাগিলেন।

পাঠ্যপুস্তকের অন্তরালে এই সমস্ত এতদিন আত্মগোপন করিয়াছিল, এখন চাকুরীর সুযোগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

—ঘরের চালা ছাওয়া, ভাই-ভগিনীর পাঠ্যপুস্তক জামা কাপড়, নব বধূর সামান্য একটু অলঙ্কারের কর্ণ, বারব্রতের খরচ—ঠাকুর দেবতার পূজা দেওয়া—বাৎসরিক খাজনা—এমনি ছোটখাট কত না অভাব ৬০টি টাকার মর্ম্মান্তিক করিয়াছে।

—ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় তাহার ললাটে কুঞ্চিত রেখা ফুটিয়া উঠিল, আশাস্ফীত বক্ষ শুকাইয়া গেল, যৌবন যাহা শ্রীপূর্ণ দেহ—অকাল পাণ্ডুতায়—মলিন হইল।

সেদিন হাটের পর নতমুখে একরাশ চিন্তা বুকে পুরিয়া অমর আপন মনে ফুটপাতের জনস্রোতে মিশিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। মধ্যপথে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল। অমর মুখ তুলিয়া চাহিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই—তাহার পৃষ্ঠদেশে কে দু'খানি হাত রাখিয়া ডাকিল,—অমর।

অমর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—মলয়।

চিনিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। সর্ব্বাঙ্গে মোটা খদ্দরের আধময়লা কাপড় জামা—মাথায় গান্ধীটুপি। দেহের সে লাবণ্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, একটি চোখ বাঁধা—চিরদিনের তরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাম হাতখানিও কেমন যেন জখম বলিয়া বোধ হইল। চিনিবার পক্ষে আছে শুধু কুঞ্চিত কালো চুলের গুচ্ছ—ও মুখের সেই মৃদু হাসিটি।

সে বলিল—তোকে যে আর চেনাই যায় না, মলয়।

মলয় বলিল,—আমারও ঠিক এই কথা। আরশী থাকলে প্রমাণ করিয়ে দিতাম। এই ক মাসে পুরোদস্তর গোলাম ব'নে গেছিস যে!

অমর ম্লান হাসিয়া বলিল,—যা স্বরূপ তাই দেখছিস। এই শাশ্বত রূপটি যে আমাদের চিরন্তন।

মলয় কহিল, আমি ও কথা মানলেও পলা তা মানতে রাজী নয়।

অমর কহিল. পলাদেবী বোধহয় জানেন না—

মলয় বলিল,—জানেন বৈকি। তোমার চাকুরী গ্রহণ—পুনঃ বেশ পরিত্যাগ—সমস্ত সংবাদই তাঁর হিসাবের খাতায় লেখা আছে। তিনি এখনও তর্ক করেন—

অমর ঈষৎ রুষ্ট হইয়া উত্তর দিল, কিন্তু তুমি ত দেখছ মলয়,—তাঁর সব তর্কের নিষ্পত্তি আমি ক'রে দিয়েছি।

মলয় হাসিয়া বলিল,—আমার বিশ্বাস ও তাঁর বিবেচনায় তফাৎ অনেক।

—আয় চল আমাদের বাড়ীতে।

অমর ম্লান মুখে বলিল,—না, মলয়।

—কেন? কিসের আপত্তি?

অমর বলিল,—কি জানি, তোদের ওখানে যেতে আমার কেমন ভয় হয়। যে জীবন ফেলে এসেছি—তা যেন তোদের সেই চায়ের টেবিলটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মলয়—আমায় মাপ কর।

অমর পথ চলিতে লাগিল।

মলয় অগ্রসর হইয়া কহিল,—সে চায়ের টেবিল তো উঠে গেছে। আমি বুঝেছি—পলাকে দেখা দিতে তোর লজ্জা হচ্ছে।

অমর উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিল।

অমর পুনরায় কহিল,—কিন্তু পলারই বিশেষ অনুরোধ। ভাল কথা, তোকে শোনানো হয় নি। তোর যে কিছু খাওয়া পাওনা আছে আমার কাছে। পলাদেবী আমার জীবনের সঙ্গিনী হয়েছেন।—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

অমরও হাসিল। কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই মুহূর্তে কিসের যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত পাক খাইয়া সারাদেহ কাঁপাইয়া তুলিল। চলিতে চলিতে সে পথের পার্শ্বে টলিয়া পড়িতেছিল,—এক পথিকের দেহে বাধা পাইয়া সামলাইয়া লইল। সেই দ্রুত গমনশীল পথিক একবার রোষপূর্ণ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।—

অমর শুষ্ককণ্ঠে উঁচু গলায় বলিল, তবেত যেতেই হবে একদিন।

—একদিন নয়—আজই—বলিয়া মলয় তাহার হাত ধরিল।

পলা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল।—

কহিল, স্বাগতম্।

অমর বিবর্ণ মুখখানি তুলিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল—কিন্তু পলার মুখে সেই পুরোনো প্রীতিময় হাসিটি দেখিয়া তাহার উত্তর যোগাইল না। মাথা নীচু করিল।

পলা কহিল,—আর কতদিন বাকী,—অমরবাবু?

অমর সবিস্ময়ে কহিল,—কিসের?

—এই সাধনার শেষ হতে!

এই কথায় অমর অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বার বার তাহার অক্ষমতা লইয়া উপহাস! নিজে সে যে জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে, তাহা বারবার অকপট কণ্ঠে পলা কেন টানিয়া তুলিতে চাহে?

সে কঠোরেই কহিল,—পলাদেবী,—বড় আপনার সহিষ্ণুতা, বড় আপনার বিশ্বাস! দেখছেন না,—কোন্ সাধনার পথে কতখানি এগিয়েছি? আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন,—রোগশোক আধি ব্যাধির কাহিনী শোনাব। দু'বেলা হাড় ভাঙা খাটুনি, সংসারের অভাব অভিযোগের ঢেউ, সাহেবের খিঁচুনি, বড়বাবুর ব্যঙ্গময় হাসি, সহকারীদের টিট্‌কারী, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় এখনও যে কেন পাগল হ'য়ে যাই নি—তাই সময়ে সময়ে ভাবি! এ-জীবনকে—জীবনপ্রবাহ ভেবে কেন আর আঘাত—ক'রছেন, পলাদেবী!

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর দুঃখ হতাশার অশ্রুবাষ্পে অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

পলা উত্তর না দিয়া নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া সে কি যেন লেখা পাঠ করিতে ব্যগ্র দুই চক্ষুর আকুলদৃষ্টি সেদিকে ন্যস্ত করিয়া রাখিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চক্ষু আনন্দ জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে টেবিল হারমোনিয়ামটার সামনে বসিয়া গাহিল—

হে মোর চিত্ত—পুণ্য তীর্থে—জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের—সাগর তীরে।

অমর আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—থামুন, থামুন—পলাদেবী। নয়ত আমিই উঠছি।

তাহাকে সত্য সত্যই উঠিতে দেখিয়া পলা অমরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার একখানি হাত ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, চারিদিকে আগুন জলতে দেখলে হরিণ এমনি ভয় পায়, অমরবাবু। কিন্তু সমুদ্রে যার বাস—তার শিশির বিন্দুতে ভয় ক'রলে চলবে কেন? দুঃখকে জয় করাতেই না গৌরব!

বলিতে বলিতে আবার সে মৃদুস্বরে গাহিতে লাগিল,—

সেই হোমানলে—হের আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা
হবে তা সহিতে মর্ম্মে রহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুঃখ দহন—কর মোর মন—শোনরে একের তাক
হত লাজ ভয় কর কর জয়—অপমান দূরে যাক।—

অমর উত্তেজিত পদে সেই কক্ষে খানিক পদচারণা করিল, পরে অস্থির পদে বাহির হইয়া গেল।—

মলয় পলাকে কহিল, ভাল করলে না, পলা। সংসারের আশা ভরসা তুমি নিষ্ঠুরের মত নষ্ট ক'রে দিলে।

পলা কোন উত্তর না দিয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিল—

এসেছে সে একদিন—
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জাগে—না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন।

দিন দুই পরে।

অমর হাসিমুখে আসিয়া পলাকে নমস্কার করিয়া কহিল, দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে আজ চল্লাম,—পলাদেবী।

পলা দেখিল তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত। দুঃখ সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় দিয়া যে সাধনার দীপখানি অন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠপ্রান্তে তাহারই বিকীর্ণ আলো হাসি হইয়া ফুটিয়াছে। দুঃখ ক্ষোভের লেশমাত্র সেখানে নাই। যেন একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মদল—অরুণ আলোকে অনুরঞ্জিত হইয়া প্রীতি সরোবরে অন্তরের বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

সে পরম পুলকিত হইয়া কহিল,—এতদিনে আমার সাধনা সার্থক। এই মূর্ত্তি দেখব ব'লেই প্রতি নিয়ত আপনাকে আঘাত দিয়েছি। অমর হাসিয়া উত্তর দিল,—তাত আমি অনেকদিনই শুনেছিলাম, পলাদেবী,—কেবল পাথের যোগাড় ক'রতে পারি নি।

পলা বলিল,—কিন্তু বড়ই কঠিন মূল্য হয়ত দিতে হ'ল আপনাকে।

—অমর হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না। কহিল, তাত জানি না। তবে যা দেবার—তা দিয়েছি। মলয়ের সাধনা ছিল, আমার হয়ত তা-ও নেই।—কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বিষণ্ণ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত কিরণচ্ছটা বারেকের তরে পলার মুখে আসিয়া পড়িল। জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সে উত্তর দিল,—সব সাধনার মূল্য ত দেওয়া যায় না, অমরবাবু। চোখের চোখে যা দেখা যায়, তার চেয়েও বড় জিনিষ যে দৃষ্টির অন্তরালে থাকে।

অমরের মুখ সহসা আনন্দের দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া পলাকে কি বলিতে গিয়া দেখিল মলয়ের একখানি হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া পলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছে—চুপ ক'রে রয়েছ যে।—আজ কিন্তু তোমার পরাজয়।—

মলয় হাসিমুখে উত্তর দিল,—পরাজয়ের মধ্যেই আমি অমরকে পেয়েছি, পলা,—আর ভাবনা কি বলিয়া তাহার হাতখানিতে মৃদু একটি চাপ দিল।—

অমর উৎফুল্ল মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল।

সফর

সুকোমল বসু

জগদীশ সিংহ আগেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করেছেন। পাঠানকোট রেল-স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের বড় কামরাটার একপ্রান্তে রেক্সিন-মোড়া আরামদায়ক কৌচে দেহ এলিয়ে এবং ঠ্যাং দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ নিবিষ্ট মনে পাম্পলেট গোছের একটা বই পড়ছিল যুবক। পরণে ট্রেন-পাইপ প্যান্ট ও হাওয়াই-শার্ট। পায়ে ছুঁচলো-মুখ জুতো। বাঁ হাতের কব্জিতে স্টেইনলেস্ ঘড়ি, ডান হাতে স্টিলের কড়া। একঝোড়া জুলপী গালের চোয়াল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। ছেলেটিকে বাঙালী বলে সনাক্ত করতে জগদীশের একটুও দেরি হয়নি, যদিও বহুকাল প্রবাস-বাসের ফলে আধুনিক যুবক-বাঙালীর সাজ-পোশাক বা রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষজ্ঞান সামান্যই। কিন্তু আর কোনও ঔৎসুক্যের উদয় হয়নি। উচ্চ, মধ্য ও অধোবিত্তের গাদা গাদা বাঙালী কাশ্মীর যাবার জন্য পাঠানকোটে হাজির হয় প্রতি সীজনে। পাঠানকোট স্টেশনে বাঙালী-দাক্ষাৎ কোন বিশেষ ঘটনা নয়।

'ডাকো না ছেলেটিকে', জগদীশ-পত্নী মনোরমা সহসা বলে উঠলেন, 'শুধু এক পিস্ টোস্ট আর চা দিয়ে গেল চায়ের দোকানের ছোকরা এসে। নিশ্চয়ই বেশি কেনবার পয়সা নেই। নইলে কেউ ব্রেকফাস্টে এত সামান্য খায়?...'

এইসব হাল্কা সৃষ্টি করে বলেই শাস্ত্রকারেরা বলেছিলেন, পত্নি নারী বিবর্জিতা।—জগদীশ মনে মনে ভাবলেন। অথচ অবসর গ্রহণের পর প্রতি গ্রীষ্মে এবং শরতে তাঁরা দিল্লীর বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়েন। পাহাড়ে যান, তীর্থে যান, সমুদ্র-সঙ্গমে যান। জীবনের মেয়াদ আর খুব বেশি নেই, যতটা পারেন দেখে নিচ্ছেন। এই পরিক্রমায় মনোরমা অপরিহার্য্যা। শাস্ত্রকারের পরামর্শ উপেক্ষা করতেই হয়।

বলতে পারতেন, খিদে নেই বলেও লোকে কম খায়। আর কেউ কম খেলে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা তাদের দায়িত্ব নয়। কিন্তু জানেন, এসব তর্কে কোনও লাভ নেই। শেষ পর্য্যন্ত মনোরমার ইচ্ছাই জয়ী হবে। অগত্যা তিনি নিজস্ব কৌচটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে হাঁকডাক করলে অনর্থক অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

'কিছু মনে করোনা বাবা, তোমাকে বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। আমার অনুমান কি সত্য?'

'ঠিক'। যুবক পুস্তিকা থেকে মুখ উঠিয়ে সেকেণ্ড খানেক চুপ থাকবার পর জবাব দিলে। বেশ ভদ্রির পরিবর্ত্তন হলোনা সামান্যতমও।

'খুব ভেসে বাঙালী দেখে আমার স্ত্রী বললেন,' জগদীশবাবু জানালেন, 'ডাকো না ছেলেটিকে।

আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার আছে, ওকে কিছু খাওয়াই। এসো বাবা, চেয়ারটা আমাদের কাছে এনে বসো। তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে করো না। এটা বুড়োদের প্রিভিলেজ

'ওতে কোনও তফাৎ করে না।' ছোকরা জবাব দিলে। 'তবে ক'বছর আগে জন্মানোর কোনও প্রিভিলেজ জন্মার তা স্বীকার করিনে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনও প্রিভিলেজকেই স্বীকার করিনে। চলুন, খেতে, কোনই আপত্তি নেই···'

বাঙালী বলে তাঁর স্ত্রীর কাছে ইনি যে বিশেষ প্রিভিলেজ পেয়েছেন, সেকথার উল্লেখ না ক'রে জগদীশ যুবককে ডেকে নিলেন। আধুনিক ছেলেরা কেমন হয়, একটু দেখে নিলে মন্দ কি? এমন সুযোগ সব সময়ে আসে না। এতে সেকেলে সম্মান যদি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়, হোক না।

'কোথায় যাবে, বাবা? কাশ্মীর!' প্লেট-ভর্তি মিষ্টি অতিথির সামনে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে মনোরমা প্রশ্ন করলেন।

'সে রকমই ইচ্ছে।' প্লেটে হাত বাড়িয়ে ছোকরা জবাব দিলে।

'কলকাতা থেকে আসছ?'

'হুঁ,' মুখ ভরা থাকতে ওর বেশি জবাব দেওয়া মুস্কিল।

'কি জানি নামটা?'

'ধরুন, রুধির।' সিঙ্গাড়ার বাধাপ্রাপ্ত কণ্ঠস্বর। 'রুধিরকান্তি।'

'মা বাবা দুজনেই আছেন?'

এবার শুধু ঘাড় নাড়া। মুখের চর্বা শেষ হতে আর মিনিটখানিক লাগল। তারপর: 'ওই যে কি বলে ওটার নাম, ওটা আর আছে মাসিমা?···ওই যে হিন্দীর মিঠাই, বেশ বড় সাইজের···'

'কলাকন্দ? হ্যাঁ আছে বৈকি।' মনোরমা তাড়াতাড়ি আরও দুটো কলাকন্দ বেশ ক'রে "ধরুন, রুধির"-এর প্লেটে রাখলেন।

পলকে সে দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

'চা আছে কি? স্টেশনে তেতো চা খেয়ে মুখটা বেয়াড়া হয়ে গেছে।' খাদ্যের শেষ কণিকাটুকু নিঃশেষ করে রুধিরবাবু নতুন দাবি পেশ করলেন।

সেই থেকে এখানেই বসে আছে ছোকরা। সাড়ে বারোটার বাস্-এ জগদীশ ও মনোরমা ডালহৌসী রওনা হবেন। জগদীশ গোসলখানায় ঢুকে স্নানাদি সেরে এসেছেন, মনোরমা স্নানে গেছেন। ছোকরা বসেই আছে। বাঁ হাতে চটি-বই, ডান হাতে সিগ্রেট। বয়সের কোনও প্রিভিলেজ আছে বলে স্বীকার করে না। তাই ষাট বছরের জগদীশবাবুর মুখের উপর নিঃসঙ্কোচে ধোঁয়া ছাড়ছে।

'ডালহৌসী কদ্দূর এখান থেকে?'

'মাইল পঞ্চাশেক।'

'তবে তো সেখানে যাওয়াই ভালো ছিল,' রুধির বই ও সিগারেট মুখ থেকে সরিয়ে বললে। 'কিন্তু ওকে তো বলা হয়নি, নইলে আপনাদের সঙ্গে চলে যেতাম···'

'আর কেউ আসছে বুঝি?'

'আমার বন্ধু। গার্ল-ফ্রেণ্ড। মাধবী। যাইহোক, আপনাদের ডালহৌসীর ঠিকানা দিয়ে যাবি। ওর পৌঁছতে কাল সন্ধ্যে।' বলে ছোকরা প্যান্টের পকেট থেকে ছোট একটা নোট বই টেনে বার করলে।

শঙ্কিত হলেন জগদীশ সিংহ। এর সাদা অর্থ এই যে, প্রয়োজন হলে ছোকরা গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে তাঁরই ঘাড়ে ভর করবে। মনোরমার ইঙ্গিতগুলিই এই বিপদের সৃষ্টি করেছে!

'দেখি, কোন্ হোটেলে উঠি।' অস্পষ্ট জবাব দিলেন দূরদর্শিতা হিসাবে।

'আপনাদের সঙ্গে গিয়ে, তারপর কেয়ৎ বাসে চলেও আসতে পারি।' রুধিরকান্তি নেপথ্যকে জানাল। 'কিন্তু ঠিক আছে। দরকার হলে আপনাদের খুঁজে নেব। মনে হচ্ছে, তেমন মন্দ লোক নন। কি করতেন রিটায়ার করার আগে? বাম্বে দিল্লীর লেবেল দেখছি। সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্টে কাজ করতেন কি? ক' হাজারী?…

সামান্য দু'তিন হাজার।' ভেরার মুখে জগদীশ একটু ভয়ে ভয়েই জবাব দিলেন।

'বেশ সলভেণ্ট্ লোক! এক্সপ্লয়টার বলব না। তবে প্রিভিলেজড্ ক্লাস।' অনুকম্পার সঙ্গে স্বগতোক্তি করলে রুধির কান্তি।

'তুমি কি কর? পড় না চাকরী?' জগদীশ আক্রমণাত্মক নীতিই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করে প্রশ্ন করলেন।

'পড়ি। য়ুনিভার্সিটিতে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট।'

'গার্লফ্রেণ্ডও কি একই সঙ্গে পড়ে?'

'কে? মাধবী? না, সে অন্য কোর্সে।'

'তোমার সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছে, এতে তার বাড়ীর আপত্তি নেই।'

'আপত্তি থাকবেই। বুড়ো-হাবড়াদের আপত্তি থাকবে না! সেই জন্যই তো ছলনা করতে হয়—যদি না ডিভোর্স করার সাহস থাকে।' রুধির কান্তি মন্তব্য করলেন। 'একদিন দেরিতে পৌঁছচ্ছে তো এরই জন্য। ওদের কলেজ থেকে এক্সকারশনে যাচ্ছে নৈনিতাল। মাধবী বাড়ীতে বলেছে, ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। একেবারে নিরাপদ প্রস্তাব। কিন্তু রওনা হ'তে হবে একদিন দেরিতে—ওরা এক্সকারশনে বের হবার তারিখ একদিন পিছিয়ে দিয়েছে তা আমাকে সময়মত জানাতে পারেনি। তাই বুকিং পাল্টানো যায়নি।'

'বিয়ে করছ তাকে?' জগদীশ প্রশ্ন করলেন।

'কে বললে? হাজার ছেলে যে হাজার মেয়ে নিয়ে ঘুরছে। সবাই কি গার্লফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে? আমার আরও মেয়ে বন্ধু আছে। মিনতির কাছ থেকে লেকচার নোট টুকে আনছি বা মনীষা জ্বরজ্বিনে ভুগেছে বলে যাকে ধোঁকা দিয়ে সন্ধ্যাবেলাটা তারা বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কাটিয়ে যায় মাত্র। বিয়ে করার দায়ি ওঠেই না…'

'শাঁসালো পাত্র দেখে পরে মা-বাবা বিয়ে দেবেন, এই ভরসায় কি?'

'হতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের লোকসান নেই। বন্ধুত্ব আর প্রেম এক নয়—যেমন প্রেম আর সেক্স এক নয়…মর‍্যালিটির কন্‌সেপ্‌শনই বদলে গেছে…'

জগদীশ আর ঘাঁটাতে সাহস করলেন না। মুখের উপর খবরের কাগজখানা তুলে ধরলেন। খুব খুঁটকে টাইপের লোক তিনি নন। আপতিক নিয়মে যুবক ও যুবতী কাছে আসতে চাইবে এটা স্বাভাবিক। এখন পর্দা আর নেই। মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাইরে আসছে, চাকরি করছে। রোমান্সের অবকাশ বাড়বে এটা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এক অল্প বয়সী তরুণ তারই মত এক অবিবাহিতা তরুণীকে নিয়ে অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে হলি-ডে করতে বের হয়ে এসেছে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে। দুজনের

মধ্যে আর কোনও লোকের ব্যবধান নেই, হোটেলের একটা ঘরে হয়তো এরা রাত কাটাবে। এই জিনিষটা জগদীশের সংস্কারে বাধা লাগাল। অথচ ছেলেটার একথা জানাতে কোনও সঙ্কোচ নেই। বাজে টাইপের বখা ছোকরা এ নয়। তা জগদীশের বুঝতে বাকী হয়নি। যুক্তি ও বুদ্ধির ছাপ এর মধ্যে সুস্পষ্ট। হয়তো নবীনদের মধ্যে নীতির মাপকাঠি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সবই বদলে যায়। এক যুগে যা অন্যের যুগ পরিবর্তনে তা হয়তো হাস্যকর হয়ে ওঠে। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ জোর করে বলা যায়না। শুধু বলা যায়, পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তন হবে। যে চোঙাপ্যাণ্ট ঋষিরকান্তি সগর্বে পরে বেড়াচ্ছে, এক শতাব্দী আগে সেটাই ফ্যাশন ছিল। সেই ফ্যাশন বদলে গেল। এলো অক্সফোর্ড ব্যাগ্‌স। চব্বিশ ইঞ্চি ঢিলে পা প্যাণ্টের। সেই চব্বিশ ইঞ্চি ছোট হ'তে হতে এখন এগারো ঘারোতে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই রকম রীতিতেই বদলাচ্ছে নীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি,—সর্ব করবারও কিছু নেই, আক্ষেপ করবারও কিছু নেই।' মহাকালের রথের চাকা ঘুরে ঘুরে আবার এক সময় আগের জায়গায়ই এসে পৌছচ্ছে···

'শুনছেন, জগদীশবাবু, বইটা একটু তুলে দিন তো মেঝে থেকে। হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে ।'

জগদীশ সিংহের দার্শনিক চিন্তা বাধা পেল তাঁর সম্মুখবর্তীর জরুরী তাগিদে। দেখলেন, ছোকরার হাতের প্যাম্পলেট-গোছের বইটা কিছুটা দূরে মেঝেতে লোটাচ্ছে। এতটুকু ছেলে তাঁকে নাম ধরে ডাকবে, এটাই প্রথম আঘাত দিয়েছিল। তার উপর নির্লজ্জ ফরমাস! 'বইটা একটু তুলে দিন তো মেঝে থেকে।' ধৃষ্টতার একটা মাত্রা থাকা উচিত!

'প্রিজ, কিছু মনে করবেন না।' জগদীশকে নিশ্চেষ্ট দেখে ঋষিরকান্তিকে বলতে হলো, 'থ্রেইন পাইপ পরে মেঝে থেকে জিনিষ তোলা প্রায় অসম্ভব কিনা। তাই অনুরোধ করছি··· ।'

ইতিমধ্যে জগদীশ তাঁর সেন্স্ অব্ হিউমার পুনরুদ্ধার করেছেন। কথাটা সত্য। উঠে গিয়ে অনুরোধ রক্ষা করলেন।

'কমিউনিষ্ট বলে মনে হচ্ছে।' প্যাম্পলেট পুনরুদ্ধার করে বইয়ের শিরোনামা পড়ে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেবার পর নিজের আসনে এসে জগদীশ আবার আরেকটুকু সুড়সুড়ি দেবার সিদ্ধান্ত করলেন।

'কেন, অন্য কিছু মনে করেছিলেন নাকি?' দ্রুত পাল্টা জবাব এলো। 'আমার তো একবারও সন্দেহ হয়নি আপনি কংগ্রেস নন। সব মজবুত হয়ে বসা লোকই কংগ্রেস-যেমন কিনা পুঁজিপতিরা, কারখানার মালিকেরা, জমি আর বাড়ীর উপসত্বভোগীরা···সব কায়েমী স্বার্থ চুরমার হবে। তার আর বেশি দেরি নেই···

'ট্যাক্স কি এরজন্যই পোড়ান হচ্ছে, বোমা মারা হচ্ছে

'এসব প্রতীক মাত্র। সব কিছুই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে···

'তারপর কি দু'চার মাসেই আবার গড়া যাবে? জাগতিক সম্পদ সঞ্চিত করতে বহু শতাব্দী লেগেছে। চুরমার না ক'রে কিছুটা অদল-বদল ক'রে নিলে হয় না?

'স্টেট সোস্যালিজম্? নাম-ভাঁড়ানো পুঁজিবাদী ভাঁওতায় ভোলবার দিন অনেকদিন চলে গেছে। স্বার্থপর লোভীদের সিটাডেল ধূলিসাৎ করতে হবে। তবেই আমাদের মতো ক'রে সমাজ গঠন করা সম্ভব। আপনারা তো সবকিছু 'বাদল্' করেছেন, এবার সরে পড়ুন ..এক্স্‌কিউজ্ মি, তুলে নেব একটা কলাকন্দ? মাসিমা এখনও স্নান সারতে পারেন নি কিনা তাই···'

জগদীশ ছোকরার লোভ-সংবরণের ক্ষমতায় চমৎকৃত হয়ে অনুমতি দিলেন।

বারোটার আগেই রেলের রিফ্রেশমেন্ট রুমে দুপুরের খাওয়া সারতে যেতে হলো! কবির তখনও বসেই আছে। তাকেও আমন্ত্রণ করতে হলো। দু'বার অনুরোধ করতে হলো না। আতিথেয়তা সম্বন্ধে মনোরমা খুবই সজাগ। কবিরকান্তি একই পদ একাধিকবার চেয়ে নিলে, দু'একটা অতিরিক্ত কোর্স সম্বন্ধেও ইচ্ছাপূরণে সমর্থ হলো!

'তুলে দিয়ে আসতাম আপনাদের ডালহৌসীর বাস-এ,' আহারান্তে বিশ্রামাগারে ফিরে এসে যাত্রা-উন্মুখ জগদীশকে সম্বোধন করলে কবিরকান্তি। 'কিন্তু বাইরে বড় কড়া রোদ। স্টেশনের বাইরেই তো বাস-স্টেশন। বাসে চড়ে বসলে আর কষ্ট নেই। এই কুলি, ভালো করে তুলে দিস। এক টাকা বকশিশ পাবি!···নমস্কার। ধন্যবাদ। হয়তো দেখবেন একদিন ডালহৌসীতেই গিয়ে হাজির হয়েছি···।'

কামরার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে কবিরকান্তি বিদায় জানিয়ে এলো সিংহ-দম্পতিকে।

ডালহৌসী পৌঁছেও এই ছেলেটি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন জগদীশ ও মনোরমা। জগদীশ মজা ক'রে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু মনোরমার কাছে তা তুচ্ছ। বাংলাদেশ থেকে আসা অজানা ছেলেটি তাঁর কাছে খাবার চেয়ে নিয়েছে, মাসিমা বলে ডেকেছে, আত্মীয়ের মত হেসে হাত নেড়ে বিদায় দিয়েছে, এ-সবই আনন্দময় স্মৃতি। তার মতবাদের ধার ধারেন না তিনি। গার্লফ্রেণ্ডের কাহিনীটি জগদীশ স্ত্রীর কর্ণগোচর করেন নি। কিন্তু তাঁর সন্দেহ নেই, এটাও মনোরমা সহজেই বরদাস্ত করে নিতেন।

'যাই বলো, ছেলেটি বেশ চটপটে আর মিশুকে।' মনোরমা রায় দিলেন।

'তবে সাধারণ মানুষের মতোই লোভ, স্বার্থপরতা, অপরের ঘাড়ভাঙা বা এক্সপ্লয়টেশনের স্বভাব জগদীশ গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন। ইচ্ছে স্ত্রীর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করে, আনন্দ পাওয়া।

'সে আর এমনি কি কথা। মানুষের তো মানুষের স্বভাব থাকবেই।'

'কিন্তু ওরা তো এগুলিরই অবসান ঘটাতে চায় বড় ক'রে—বিপ্লবের ভেতর দিয়ে।' পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন জগদীশ। 'ভাবছি, দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারলে কেমন হয়। নিশ্চয়ই তবে বিপ্লব আনবার ইচ্ছে চলে যাবে···সব অসন্তোষের মূল আন্-এমপ্লয়মেন্ট···।

'তা দাও না ভেঙ্কটরমণকে ধরে একটা চাকরি করে। ভেঙ্কট তো তোমারই আণ্ডার সেক্রেটারি ছিল। বললে নিশ্চয়ই শুনবে।' উৎসাহিত হয়ে বললেন মনোরমা।

'কিন্তু এরকম করে ক'জনকে চোকান যায়।' জগদীশ বুঝিয়ে বললেন। নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি করতে হবে ইণ্ডাস্ট্রি বাড়িয়ে, কৃষি বাড়িয়ে, নানাদিকে কর্মপ্রচেষ্টা বাড়িয়ে। এজন্যই প্ল্যানিং-এর এতো বড়ো ভূমিকা। যারাই পরিবর্তন আনতে চাক, পরিকল্পনা ঠিক না থাকলে আর তা রূপ দেবার মতো যোগ্য লোক না থাকলে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ভাবছিলাম, কবিরদের মধ্যে সে রকম লোক আছে কি, না ভাঙার মোহে, ব্যর্থতায়, অধৈর্যে ঈর্ষায় ওরা শুধু ভাঙার কথাটাই বড় ক'রে দেখছে।'

সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই জগদীশ ও মনোরমা তাদের কাচারির রাস্তার হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। সুন্দর লাগে তাদের এই পার্বত্য জনপদ ডালহৌসী। চুপচাপ শান্ত জায়গা অথচ আধুনিক

আরাম আয়োজন সবই আছে। উর্ধ্বে ধবলাধরের তুষারমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ, নিচে বিস্তৃত উপত্যকা কোথাও অরণ্যসঙ্কুল, কোথাও অরণ্যমুক্ত। উপরের স্তরের বৃত্তাকার রাস্তাটা প্রায় সমতল, বয়স্ক লোকের হেঁটে বেড়াতে কষ্ট নেই। এর আগেও একাধিকবার তাঁরা এসেছেন এখানে। এর শিচ-মসৃণ, উকীষধারী উঁচু গাছের পাহারা-দেওয়া, মাথার উপর ও পায়ের নিচে বিভিন্ন স্তরে নিঃশব্দ বাঙ্ময়তায় শোভিত রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াতে বড় ভালো লাগে। যান নেই, বাহন নেই, গান্ধী চক আর সুভাষ চক এই দুই বাজার অঞ্চল ছাড়া রাস্তায় চলবার লোক পর্যন্ত সামান্য। দু'চারটি ভেড়ে-আসা পাঞ্জাবী পরিবার চোখে পড়বে। কাঠকয়লার বস্তা পিঠে নিয়ে দড়ি দিয়ে কপালের সঙ্গে তা বেঁধে হাতে ট্যানজিস্টার রেডিয়োর গান বাজাতে বাজাতে কোনও পরিতৃপ্তমুখ পাহাড়ী পরিবার কাঠ কয়লা বেচতে যাচ্ছে। আর নয় তো আলখাল্লাপরা দু' পাঁচজন তিব্বতী পরদার্থী মালা জপতে জপতে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে মন্থর গতিতে।

'তা হলে তুমি যাও। জিনিষগুলি গান্ধী চকে আমাদের দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসো। ওরা ঠকায় না। আমি মিসেস বর্মার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি।' সার্কিট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে মনোরমা বললেন।

তাই স্থির ছিল। মনোরমা নিচে যাবার রাস্তা ধ'রে নেমে গেলেন। জগদীশ সিধা এগিয়ে গেলেন গান্ধীচকের দিকে।

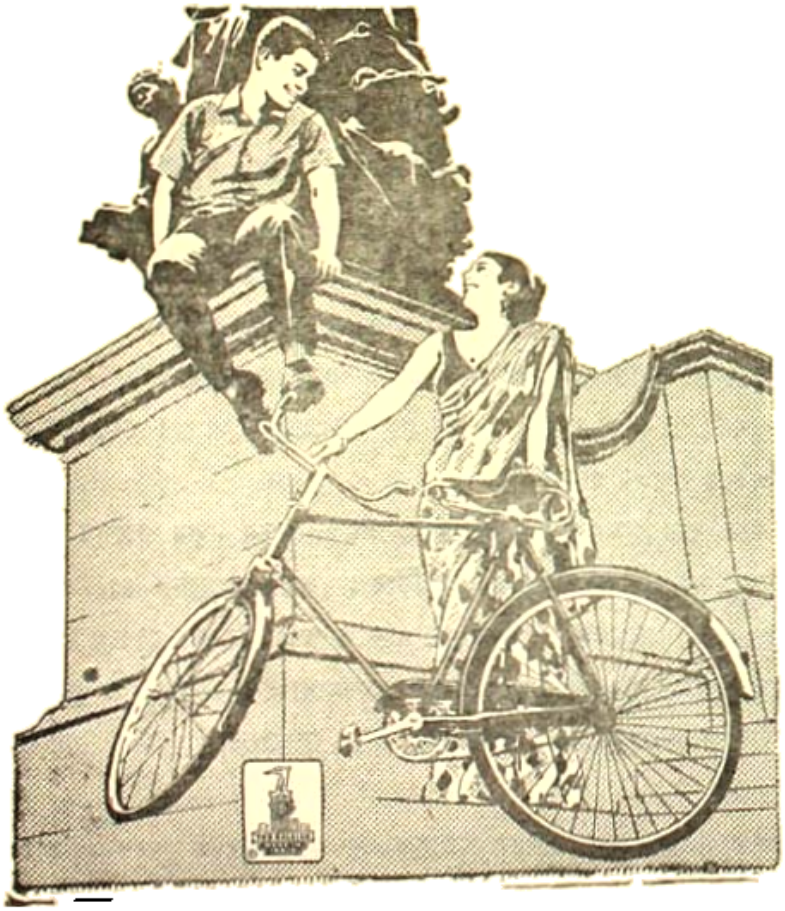

রূপে যেমন
গুনে তেমন-
জগৎজোড়া
খ্যাতি

র‍্যালে

ভারতের সবচেয়ে প্রিয় সাইকেল

পরনে যেমন দুরন্ত, কাজেও তেমনি শক্ত-সমর্থ। তাইতো ভারতের সবচেয়ে প্রিয় সাইকেল। সেরা-মালমশলা নিখুঁত ওজনে মাপাই করে এই সাইকেল তৈরি করা হয়েছে যাতে বন্ধুরে মসৃণ আর চড়াইতেও সবচেয়ে বেশিদিন। তাইতো ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন সাইকেল। সাইকেল চড়ার আনন্দ সবচেয়ে বেশি র‍্যালেতেই। আপনি নিজেও একবার পরখ করে দেখুন না।

আটত্রিশের সেরা চলনে সেরা র‍্যালেই পাবেন হাতে

® Regd. User

সাইকেলের জগতে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য নাম

'এই যে জগদীশবাবু। আপনারই খোঁজ করছি। কাল বিকেল থেকে এহেন স্থান নেই যেখানে আপনাদের তালাশ করিনি

আওয়াজটা চেনা-চেনা। স্নান গাম্ভীর্যের চওড়া অঞ্চলের উপকণ্ঠ। উৎপত্তিস্থল এখনও নজরে আসেনি।

'আমি জানতাম ঠিক খুঁজে নেব।' বলে কবিরকান্তি চন্দ্রহস্ত হয়ে কাছে হাজির হলো।

'কি খবর তোমার? এরই মধ্যে হাজির হয়েছ!' জগদীশ নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন। একবার কাছাকাছি তাকিয়ে নিলেন। তারপর পুনশ্চ হিসাবে জুড়ে দিলেন! 'সার্জেন্ট কোথায়?'

'সেই তো সর্বনাশ করেছে। নইলে এমন করে ছুটে আসতে হ'তো না। মাসিমা কোথায়? বের হননি? আচ্ছা বসুন এই বেঞ্চিটাতে। আপনাকেই বলছি

ঘরের ধারে মিউনিসিপ্যালটির পায়খিআনাকক্ষটির এক বেঞ্চে বসে এবং বিপরীতদিকের পাহাড়টার দিকে মুখ ক'রে কবিরকান্তি তার কাহিনী বলে গেল।

মাধবীর পৌঁছনোর কথা শিয়ালদহ-পাঠানকোট এক্সপ্রেসে। তন্নতন্ন ক'রে তার প্রতিটি কামরা খুঁজেও কবির তাকে দেখতে পেল না। সহযাত্রীদের একজন বললে, হয়তো অমৃতসর হয়ে আসছে। সে রকম কথা নয়। কিন্তু লম্বা প্রাটফর্মের যে অংশে দিনে বহুবার অমৃতসর থেকে ট্রেন এসে দাঁড়ায় সেখানে বাকি সকালটা সে কাটিয়ে দিলে মাধবীর খোঁজে। কোনই ফল হলো না। সিদ্ধান্ত করলে, কোনও কারণে সময় মত রওনা হ'তে পারে নি। ট্রেন মিস্ করেছে এইসব। হয়তো কালকের ট্রেনে এসে পৌঁছবে। কে একজন বললে, অমৃতসর থেকে পাঠানকোটে কিছু পরে পরেই বাস্ পৌঁছায়। ট্রেনের দেরি থাকলে অনেকে বাস্-এ চলে আসে। অমৃতসরের বাস্ যেখানে এসে থামে, সে জায়গা স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়। কবির একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে বেলা সাড়ে বারোটার কড়া রোদে বাস্ স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলো।

স্টেশনের গায়েই কাশ্মীর সরকারের যাত্রীসহায়তাকেন্দ্র। তার আশেপাশে বহু বাঙালীর জটলা। একটা যাত্রী-ঠাসা বাস্ রওনা হবার উপক্রম করেছে। যতটা কবিরের নজরে পড়ল তার প্রায় সবই বাঙালী। কাশ্মীর বাঙালীর কাছে এতটা জনপ্রিয় কলকাতায় বসে সে তা ধারণা করতে পারত না। সহসা ধড়াস ক'রে উঠল তার বুকটা। পেছনের ডানদিকের আসন জোড়াতে কে ওই মেয়েটি? মাধবী! আর তার পাশে বসে কে ওই ছেলেটা? স্টুডেন্ট কনসারটিয়মের সেক্রেটারি দীপু দত্ত!

কবির আরও কাছে পৌঁছবার আগেই কাশ্মীরের বাস্ পেছন দিকে এক ঝলক কালো ধোঁয়া ছেড়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল।

'দেখেছেন কাণ্ড? জগদীশের কাছে নালিশ জানিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করলে কবিরকান্তি।

'এক ছেলের বহু মেয়ে-বন্ধু আর এক মেয়ের বহু ছেলে-বন্ধু থাকলে এমন হবেই।' মনে মনে বললেন জগদীশ, কিন্তু কোনই জবাব দিলেন না।

'দারুণ খারাপ ছেলে দীপু দত্ত। কোনও মেয়েই ওর কাছে নিরাপদ নয়।' বেশ আশঙ্কিত ভাব কবিরের!

'তাতে কি এসে গেল? ফরমালিটির কনসেপ্‌শন এখন বদলে গেছে বলেছিলে না?' এবারও নীরব জবাব জগদীশের।

'কিন্তু আমার প্রধান প্রব্লেম তা নয়।' কবির জানালে।

'এ রকম ট্রেচারাস্ ক্রেও খলে পড়াই ভালো। সমস্যাটা হয়েছে এই যে, আমার হাতে না আছে বেড়াবার টাকা না কলকাতায় ফিরে যাবার ট্রেন-খরচা। মাধবী টাকা সংগ্রহ ক'রে আনবে তাই ঠিক ছিল। এমন কি আর্নেস্ট মণি হিসাবে আমার নিজের সত্তর-পঁচাত্তর টাকাও ওর কাছে জমা রেখে এসেছিলাম···কাজেই ভেবে দেখুন আমার অবস্থাটা কি রকম। পাঁচ-দশটাকা পকেটে আছে ভাবলাম তা সম্বল করেই ভালহৌসী চলে আসি মাসিমার কাছে। তিনি এই বিপদে সাহায্য করবেনই।···আসতে পাঁচ টাকা বাস্ ভাড়া লেগেছে, হোটেলে একদিনে আট-দশ টাকা লেগে যাবে! পরপর স্ট্র্যাণ্ডেড!···'

'ফিরে যেতে কত টাকা দরকার হবে?' জগদীশ পোয়া মিনিট চিন্তা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন। কাহিনীটা বানানো নাও হতে পারে। উদ্বেগটা ওর আন্তরিক মনে হয়েছে। শত হোক, বাঙালির ছেলে। বিদেশে এসে বিপদে পড়লে সাহায্য না ক'রে উপায় কি? ঘরের ছেলে অন্তত ঘরে তো ফিরে যাক। আর সাহায্য করতে হলে মনোরমার সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার আগেই করা ভালো। নইলে চ্যারিটি মাত্রাহীন হয়ে ওঠার পুরা আশঙ্কা আছে। এটা ভয়ের কথা।

'অন্তত পঁচাত্তর তো বটেই।' রুবির জবাব দিলে। ট্রেন ভাড়াই তো গোটা পঞ্চাশ। তার উপর পাঠানকোটে ফেরার বাস-ভাড়া, ট্রেনে খাই-খরচ··· '

'আচ্ছা এই নাও।' মণিব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে গুণে জগদীশ রুবিরের হাতে দিলেন! 'দুপুরেই রওনা হয়ে পড়ো। সন্ধ্যার পর পাঠানকোট থেকে ট্রেন ধরতে পারবে। হোটেলের খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই··· '

'সাড়ে বারোটার বাসেই যাচ্ছি। ধন্যবাদ!' বলে নোটগুলি রুবির হিপ্-পকেটস্থ করল। 'মাসিমার সঙ্গে একবার··· '

'তিনি কোন্ বন্ধুর বাড়ী গিয়ে বসে আছেন, আমিই জানিনে। বেলা দেড়টার আগে আমার সঙ্গেও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা··· '

'এই যে! আসুন মাসিমা, আসুন।' সহসা রুবির দাঁড়িয়ে উঠে রাস্তাকে সম্বোধন ক'রে উৎফুল্লকণ্ঠে ব'লে উঠল।

সভয়ে জগদীশ মাত্র হাত দশেক ঘুরে স্ত্রীকে আবিষ্কার করলেন।

'আরে তুমি এখানে? কবে এসেছ?'

'কাল বারোটায়!' বলে সহাস্যে রুবিরকান্তি তিন পা এগিয়ে গেল।

'কোথায় উঠছে?' আমি ভাবলাম, তুমি এতক্ষণে কাশ্মীরে। ক'দিন থাকবে?' মনোরমা খুশি-মুখে প্রশ্ন করলেন।

'উঠেছি কাছেই একটা হোটেলে। আজ সাড়ে বারোটার বাসেই ফিরে যাচ্ছি··· '

'এত তাড়াতাড়ি?'

'উপায় কি?' রুবির জানালে। 'হোটেলে থাকার পয়সা নেই।'

'ওমা! সে কি কথা। কলকাতা থেকে এতদূরে এসেছে। দু'দিন না থেকেই চলে যাবে? আচ্ছা, এক কাজ করো। চলে এসো আমাদের হোটেলে। আমাদের অতিথি হয়ে ক'টা দিন কাটিয়ে যাও।' মনোরমা বললেন।

'আমি রাজি।' রুবির অনায়াসেই রাজি হয়ে গেল। জগদীশের গম্ভীর মুখ লক্ষ্যই করবেন।

অপূর্ব্ব রায় ও আমি

বিভূতিভূষণ ভট্ট

অপূর্ব্ব রায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেয় আমার ছোট ভাই অংশু। তারপর তিনি নিজের পরিচয়ের দায়িত্ব নিজ হাতেই তুলে নেন।

বাইরের ঘরে বসেছিলাম। অংশুর সঙ্গে এক ভদ্রলোক এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘ ছোরারা চেহারা। উন্নত নাসা, উজ্জ্বল দুটি চোখ, তামাটে গায়ের বর্ণ, পাতলা দুখানি ঠোঁট, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু সজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া। দেহের মধ্যে অত্যন্ত বেমানান।

চোখ তুলে তাকালাম। অংশু পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। ইনিই অপূর্ব্ব রায়।

ঢিলে-ঢালা পারিপাট্যহীন পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, বসুন।

প্রতি নমস্কার করে তিনি বললেন, আপনার কথাও অংশুবাবুর মুখে শুনেছি। বড় ভাল লেগেছে আপনাদের এই গ্রাম-সহরের মিশ্র পরিবেশ। আপনাদের কাছাকাছি দিন না একটু আশ্রয়।

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরণটি বড় সুন্দর। সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। আমি জবাব না দিয়ে একটু হাসলাম।

অপূর্ব্ব রায় পুনরায় কিছু বলতে উদ্যত হ'তে আমি তাঁকে আবার বলতে অনুরোধ করলাম, আপনি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা শেষ ক'রতে চান নাকি?

মিনিটখানেক অপূর্ব্ব রায়ের প্রাণ খোলা হাসিতে ঘরের হাওয়া বদলে গেল। তিনি একটি চেয়ার দখল করে বললেন, এক গ্লাস জল খাব। আপনাদের টিউবওয়েলের জলটিও মিষ্টি।

হেসে বললাম, জলের মধ্যেও নিশ্চয় গ্রাম-সহরের গন্ধ পেয়েছেন মিঃ রায়?

অপূর্ব্ব রায় মুচকি হেসে বললেন, আপনি দেখছি প্রথম আবির্ভাবেই আমাকে বিব্রত ক'রে দিতে বদ্ধপরিকর

অবাক হলাম। কি ব'লতে চান অপূর্ব্ব রায় ঠিক আন্দাজ ক'রতে না পেরে প্রশ্ন ক'রলাম, ঠিক বুঝলাম না—

অপূর্ব্ব রায় সহাস্যে জবাব দিলেন, আপনার ঐ আপনি আজ্ঞে সম্ভাষণে লজ্জা পাচ্ছি।

তবু ভাল। ভাবলাম না জেনে বোধহয় কিছু অন্যায় করে ফেলেছি। জবাব দিলাম, কিন্তু যত সহজে কথাটি আপনি ব'ললেন তত সহজে কি এটা সম্ভব। সময়ের প্রয়োজন আছে বইকি।

সঙ্গে সঙ্গেই কথার ইঙ্গিতটুকু লুফে নিয়ে তিনি বললেন, খুবই সত্য কথা। কিন্তু আমার হ'য়েছে অভ্যাস দোষ। অধ্যাপনা ছেড়ে দিলেও অধ্যাপকের মনোবৃত্তি এখনও রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে। তাই নিজেকে দিয়েই অপরকে বিচার ক'রে বলি। তবুও যদি সম্ভব হয় আপনি আমাকে অংশুবাবুর চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিয়ে কথা না বললেই আমি স্বস্তি বোধ ক'রবো।

হাসি মুখে চুপ ক'রে রইলাম।

অপূর্ব রায় প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে নিলেন। বললেন, জানেন হয়তো আমার তাগিদে সহর পরিক্রমায় বার হ'য়েছিলাম, কিন্তু সহর আমাকে আকর্ষণ ক'রতে পারেনি। তাই উপকণ্ঠের দিকে নজর দিয়েছি। আপনাদের এ অঞ্চলটি আমার বড় ভাল লেগেছে। আপনাদের ডি সি সাহেব তাঁর বাড়ী বিক্রি করবেন খবর পেয়েই এসেছিলাম। দেখেওছি, কিন্তু ভাল লাগেনি। খালি বাড়ীর দরকার নেই বললেই হয়। অত চাপা-চাপির মধ্যে আমার মনও ভরবে না, চোখও জুড়াবে না। তাছাড়া যার ইচ্ছে বাড়ীর একাংশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। অংশুবাবুকে আমি সবই বলেছি। উনি ওঁর বাড়ী দেখালেন। পছন্দও হলো। যা দর চাইলেন ষোল আনা মেনেও নিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেলেন। ওঁর স্ত্রী আর ছেলে রাজী হ'চ্ছে না।

নিঃশব্দে শুনছিলাম অপূর্ব রায় ব'লতে থাকেন, পয়সা সামান্য কয়েকটা বছরে মোটামুটি ভালই রোজগার ক'রেছি। ভাই-এর বিলেতে থেকে ডাক্তারী পড়ার খরচ, মার খরচ আর নিজের খরচ খরচা চালিয়েও সামান্য কিছু হাতে আছে। টাকার আর কি মূল্য বলুন যদি মনই না ভরে, তাই ভাবছিলাম…

বিয়ে থা করেন নি?

না! এখনও সময় ক'রে উঠতে পারিনি।

তাহ'লে অমন রেসপেক্টেব্‌ল প্রফেসনটা ছাড়লেন কেন?

অপূর্ব রায় বললেন, আপনি প্রফেসারী করার কথা ব'লছেন? রেসপেক্ট নেই বলেই ছাড়তে হ'লো। না অর্থে না সম্মানে…

বললাম, তর্ক ক'রবো না। তবে আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। অর্থের যাঁদের লালসা আছে তাঁরা একথা চিরদিনই বলেছেন, এখনও বলেন, ভবিষ্যতেও বলবেন। ভদ্রভাবে চলবার মত অর্থ বর্ত্তমানে তাঁরা পান না অথবা উপার্জ্জন করেন না, এতথা মেনে নেওয়া শক্ত। আর সম্মানের কথা যদি বলেন—ওটা অর্জ্জন করে নিতে হয়। অধ্যাপনাকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করলে এ সমস্যা কোনদিন ঘুচবে না। বর্ত্তমান কালের ছাত্র সমাজকে নিয়ে প্রচুর চেঁচামেচি হচ্ছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এরাই দেশের ভবিষ্যৎ…কিন্তু সে ভবিষ্যৎ যে কত বেশী নৈরাশ্যজনক সেদিকে কতটুকু নজর দেওয়া হচ্ছে। সকলেই দায়সারা কাজ করে আত্মতুষ্টি লাভ ক'রলে যা হবার তাই হচ্ছে।

আপনি ভাববেন না আমি ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করি, কিন্তু ওদের সমালোচনা করবার আগে নিজেদের সমালোচনা ক'রতে ব'লছি। আপনারা শিক্ষকরা কি নিজেদের চারিত্রিক আর কর্ম্মধারার বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে পেরেছেন? কি দিয়েছেন আপনারা যে আজ প্রতিদানের কথা ভাবছেন? জীবনের সর্ব্বস্তরে অক্ষমতাই দেশকে বিপর্য্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

পারলাম। অপূর্ব রায়ের তরফ থেকে একটা কঠিন প্রতিবাদের আশায় চুপ করেছিলাম। কিন্তু অবাক হলাম তাঁর হাসি মুখের জবাব শুনে। তিনি বললেন, আপনার কথা উড়িয়ে দিতে পেলে সত্যের অপলাপ করা হবে। অথচ উড়িয়ে দিতে পারলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হতো না। অর্থের আমার খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অধ্যাপকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খোয়াতে আমার বিবেকে বেধেছে বলেই অধ্যাপকের কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'য়েছি। তবুও জোড়া-তালি দিয়ে চলতে পারিনি। আমার বর্তমান চাকরী হয়তো ততটা সম্মানজনক নয়, তবে পয়সা ভালই আছে।

বললাম, আপনি শুনেছি কাইন্ড্‌স্ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট···

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুলনা বর্ডারে আছি। এক কথায় ভালই আছি। দুনিয়ায় কোথাও যে কোন অভাব অভিযোগ আছে তা বুঝবার উপায় নেই। মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারী ওর কোন দামই নেই। যারা নিয়ে আসে আমি দয়া করে গ্রহণ করলেই তারা কৃত কৃতার্থ।

বললাম, এসব হ'লো ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের কথা অপূর্ববাবু। ব্যক্তি আজ সবার উপরে স্থান পেয়েছে বলেই এত গোলযোগ। আর এই সহজ সত্যটাই আমরা মেনে নিতে পারছি না। নামতে চাইছি না। ব্যক্তি স্বার্থের চোরা পথই আজ সোজা পথের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। যেদিকে চোখ ফেরান এই একই বীভৎস ছবি চোখে পড়বে।

অপূর্ব রায় শান্তভাবে কথা কটি শুনে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, অপরের কথা আমি জানি না। আমি আমার নিজের কথাই আপনাকে শুনিয়েছি মাত্র। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কতটুকু খুইয়ে কতটুকু পেয়েছি একথা মাঝে মাঝে ভাবতে হয় আমাকে। প্রথম জীবনে শিক্ষকের সততা আর আদর্শ নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু শিক্ষা মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেলেও মন্দিরের সাক্ষাৎ ঘটল না। সাক্ষাৎ পেলাম নানা চরিত্রের স্বার্থপর অর্থলোভী পাণ্ডাদের। শিক্ষা মন্দিরকে যারা নোংরা ব্যবসাক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছে। প্রথমেই সংঘর্ষ দেখা দিল প্রশ্ন পত্র নিয়ে, বললাম সহজ সরল করে পথ দেখালে তবেই না স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে যেতে পারবে ছেলেরা। পথকে অকারণে বাঁকা বাঁকা ক'রে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে পদে পদে হোঁচট খাবে যে। পা বাঁচাতে আর মা বাঁচাতেই যদি সবটুকু শক্তি ক্ষয় ক'রতে হয় তাহলে বিদর্ণায় দেখা দিতে বাধ্য। পাণ্ডার দল সমস্বরে আমাকে তিরস্কার করল। মোক্ষ লাভের পথ নাকি সোজা নয় বাঁকা।

একটু হেসে বললাম, তাই বুঝি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন? সংস্কারের চেষ্টা করলেন না কেন অপূর্ব বাবু। আপনি যখন অন্যায়কে অন্যায় বলে জেনেছিলেন, চিনেছিলেন তখন আর একটু ধৈর্য ধরে ন্যায় নীতি আর আদর্শ·····

বাধা দিয়ে গম্ভীর গলায় অপূর্ব রায় বললেন, নীতিহীনতার সঙ্গে সহ-অবস্থান কি সম্ভব হয়। মন্দিরে বাস করে অপকার করা আমার দ্বারা যে সম্ভব হলো না।

বললাম, সহ-অবস্থানের কথা আমিও বলছি না। আমাদের অভিধানে ন্যায় নীতি বলে যেমন গুটিকয়েক কথা আছে নীতিহীনতাকেও তেমনি বাদ দেওয়া হয়নি। তাই বলে নীতিহীনতা সবার ঊর্ধ্বে স্থান পাবে কেন? এটা ত সুস্থ আর সুন্দর জীবনের লক্ষণ নয় তাই। এই পশ্চাৎ অপসারণ নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'য়ে রুখে দাঁড়ালেন না কেন? এই দুর্নীতির জোয়ারে যে দেশ ভেসে যাচ্ছে। আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তলিয়ে যাচ্ছে। আমি আপনি জোড়া তালি দিয়ে বৈতরণী পার হ'য়ে গেলেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কি হবে। তারা জ্ঞান হবার পর থেকে কি দেখছে? কি মূলধন নিয়ে জীবনের মূল্যবোধকে

আয়ত্ব ক'রবে? কাকে অনুসরণ করে তারা সুন্দরের কল্পনা করবে অপূর্ব্ববাবু? অথচ এদের পথ দেখাবার দায়িত্ব যাদের উপর তারা আজ এক সর্ব্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে।

অপূর্ব্ব রায় জবাব দিলেন, এর জন্য দায়ী কে?

বললাম, দায়ী আপনি, দায়ী আমি। আমরাই স্বাধীনতার গালভরা বুলি নিয়ে মস্ত ভুল সোজার অথচ সে বস্তুটি যে কি তা নিজেরাও বুঝতে চাই না অপরকেও বুঝবার সুযোগ দিই না। আমরা উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি তাধা নিয়ে, প্রদেশকে খণ্ড খণ্ড করা নিয়ে, বলগত বৈষম্য নিয়ে। এসব সামলাতেই যদি সবটুকু শক্তি ব্যয় করে বসি তাহলে সাধারণের মঙ্গল চিন্তা করব কখন! আর এই সাধারণকে নিয়েই যে ঘরের অস্তিত্ব এই মূল সত্যকেই পাশ কাটিয়ে চলেছি।

অন্ত এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, সহসা সে উঠে দাঁড়াল। বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, তোমার কোনদিন আক্কেল হবে না দাদা। তোমার এই নীতিবোধের জন্য সেবারে চিঠি দিয়ে তোমায় মৃত্যু দেবার হুমকি দিয়েছে, এবারে তা ধড় থেকে নামিয়ে দেবে। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে আর তুমি তাও বুঝতে চাও না।

অন্ত রাগ করে চলে গেল।

কথাটা মিথ্যে বলে নি অন্ত। কথা পেলে আমি নিজেকেই ভুলে যাই। নইলে যার সঙ্গে মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচয় তাকে নিয়ে এভাবে মেতে ওঠার যুক্তি নেই। আমি লজ্জিত হলাম। এবং লজ্জা ঢাকবার জন্যই সলজ্জোচে বললাম, কথা পেলে আর কিছু আমার মনে থাকে না। কি ব্যাপার নিয়ে আপনি দেখা করতে এলেন আর কোন কথা নিয়ে আমি মেতে উঠলাম।

অপূর্ব্ব রায় শান্ত হেসে বললেন, আপনি মিথ্যে বলেন নি দাদা? বললাম, মিথ্যে বইকি অপূর্ব্ব বাবু। একদিনের সত্য আর একদিন মিথ্যে হ'য়ে যায়। অথচ এইটেই আমি মেনে নিতে পারছি না ব'লে দুঃখ পাই। কিন্তু এসব কথা থাক, তার চেয়ে বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।

অপূর্ব্ব রায় বললেন, আমার কথা ত আপনাকে আগেই বলেছি দাদা। আপনাদের কাছে পিঠে একটু আশ্রয় চাই। আপনার ভাই যখন কিছুতেই রাজী হ'লেন না……

বললাম, এই বাড়ী করা নিয়ে অন্ত প্রাণপাত করেছে। কাজেই ও তরফের আপত্তিটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আপত্তি ত অন্তবাবুর নয় ……

বাধা দিয়ে বললাম, অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত মন স্ত্রী পুত্রর কাছ থেকে বাধা পেতেই চেয়েছিল। নইলে এলোভন জয় করা সহজ হতনা। সুতরাং তার পরের কথা বলুন।

কিছু বলবার জন্যই অপূর্ব্ব রায় মুখ তুলেছিলেন এমনসময় মেয়ে কিছু জলখাবার আর চা নিয়ে এল। বলল, কাকা কি চলে গেলেন নাকি?

হ্যাঁ, তাকে ডাক।

সামনা সামনি বাড়ী। কলার আহ্বানে তাকে আসতে হ'ল, এবং চা জলখাবার শেষ করে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল।

অপূর্ব্ব রায় বললেন, আপনার বাড়ীর প্ল্যান একটু আলাদা মনে হচ্ছে যেন?

সামান্য! আকারে প্রকারে সবদিক থেকেই। দেখবেন ত চলুন না—

বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল অপূর্ব্ব রায়। মনে হ'লো এমনি একটি আহ্বানের অপেক্ষাই সে এতক্ষণ করছিল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। যাবার আগে স্ত্রীর সঙ্গেও সুন্দর করে আলাপ করে গেল। বলে গেল আবার আসছে সপ্তাহে সে আসবে এবং এই সময়ের মধ্যেই যেন অন্তত বিঘাপানেক একটা প্লট রেখে রাখা হয়। দু'বিঘে হলে আরো ভাল হয়।

ভিতরে ভিতরে একটা চমক অনুভব করলাম। এই সামান্য পাঁচ বছরে কতটাকা ভদ্রলোক যা হাতে কামিয়েছেন তার একটা হিসেব মনে মনে ক'রে ফেললাম।

প্রকাশ্যে বললাম, দু-বিঘের দাম কত টাকা তা জানেন ত'?

অপূর্ব্ব রায় একটু যেন তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, একসঙ্গে এতটা জমি নিলে সেইটা নিশ্চয় কিছু কম হবে? আশী হাজার টাকা জমির জন্য খরচ করলেও—

বাধা দিয়ে বললাম, জমি কিনে নিশ্চয় ফেলে রাখবেন না?

একটা হাসির চমক লক্ষ্য করলাম ওর চোখে মুখে। বললেন, ফেলে রাখব কেন। এ টাকাটা খরচ করেও সামান্য যা হাতে থাকবে তাতে ভদ্রলোকের বাড়ী একটা হ'য়ে যাবে।

ভদ্রলোক সেদিনের মত চলে গেলেন। কিন্তু পরের রবিবারে যথা সময় হাসিমুখে এসে পাশে দাঁড়ালেন।

লিখছিলাম। আহ্বানে মুখ তুলে তাকালাম। বললাম, বসুন—

ধীরে সুস্থে একখানি চেয়ার দখল ক'রে বসে একটু কিন্তু হ'য়ে বললেন, লেখার বিঘ্ন ঘটালাম। কি লিখছিলেন?

গল্প। এই সময় গোটাকয়েক লিখে না রাখলে পুজোর সময়ের তাগিদ মেটান সম্ভব হবে না। দু-চার পয়সা ঐ সময়ই পাওয়া যায়।

অপূর্ব্ব রায় গম্ভীর হ'য়ে বললেন, এটা আমাদের দেশেই সম্ভব। আপনার বহু লেখা আমি পড়েছি। আপনি জাত লেখক অথচ আপনাদের মুখেও এই কথা?

দুর্ব্বল স্থানে নাড়া দিয়েছেন অপূর্ব্ব রায়। তাঁকে হঠাৎ আমার অত্যন্ত বেশী ভাল লাগল।

অপূর্ব রায় পুনরায় বললেন, ভাল জিনিসের পাঠক আজকাল একপ্রকার নেই বললেই চলে। আমরা চিন্তা ক'রতে ভুলে গেছি। সস্তা উত্তেজনার খোরাক দিন, টপাটপ খেয়ে নেবে।

আমার কথাই অপূর্ব্ব রায়ের মুখে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে। প্রসন্ন হেসে বললাম, বাড়িয়ে ব'লছেন তবে শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু বেশী প্রশংসা ক'রবেন না—হয়তো সন্দেহ করে ব'সবো।

অপূর্ব্ব রায় হা হা ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি অদ্ভুত লোক তো দাদা!

বললাম, না অতি সাধারণ লোক ভাই—তাই সহজেই কাবু ক'রে ফেলেছেন।

অপূর্ব্ব রায় হেসে ব'ললেন, কাবু হবার লক্ষণ এটা নয় বরং আপনি যে কত বেশী সচেতন একথা জানিয়ে দিয়ে আমাকে সাবধান ক'রে দিলেন। তবুও বলবো যে কথা একবার ব'লেছি তা আরও হাজার বার বলতেও আমি দ্বিধা ক'রবো না।

অপূর্ব্ব রায় আমার হৃদয়ের আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। শুধু আমার বলি কেন অন্তর মহলেও প্রভাব বিস্তার ক'রতে সক্ষম হ'য়েছেন। যার ফলে এ বাড়ীতে আসা যাওয়াটা আমার অনুপস্থিত কালেও ঘটতে সুরু হ'ল।

এতটা অবশ্য আমার ভাল লাগল না। স্ত্রীকে খোলাখুলি বললাম, অপূর্ব্ব রায়কে আমরা কতটুকু

জানি—একমাত্র ওরই মুখের কথায় পরিচিতি ছাড়া? আমাদের এত বেশী উদারতা দেখান বোধহয় উচিত হচ্ছে না। দিনকাল ভাল না। কথাটা সব সময় মনে রেখো। তাছাড়া ভদ্রলোকের আকাশচোঁয়া কথাবার্তার সঙ্গে চাল চলন, পোষাক-পরিচ্ছদের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

স্ত্রী আমার যুক্তিকে আমোল দিলেন না বরং আমাকে সন্দেহগ্রস্ত ব'লে খোঁচা দিলেন।

বলার কিছু নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর বেশী যোগাযোগ নেই বলেই মনটা আজও অবিশ্বাসের কালিতে রং বদলাতে পারে নি, কিন্তু আমার অবস্থা ভিন্ন। আমাকে দিনের বেশীর ভাগ সময় মানুষের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হয়। মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আমার খানিকটা পরিচয় আছে। তাই মানুষ হ'য়েও মানুষকে চোখবুজে বিশ্বাস ক'রতে দ্বিধাগ্রস্ত। এই দ্বিধা আমার মধ্যে নিতান্ত অকারণে দেখা দেয় নি। ঠেকে আর ঠকে ঠকে মনটা সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়েছে। তবুও চুপ ক'রে থাকতে হয়। আমার হিসেবে ভুল হ'তে পারে না এত দম্ভ আমার নেই। তবে টাকা পয়সার ব্যাপারে অন্ততঃ খানিকটা সাবধান হবার উপদেশ দিতেও ভুল ক'রলাম না।

স্ত্রী আর একবার আমাকে সন্দেহ বাতিক লোক ব'লে ঠাট্টা করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরে পা দিতেই স্ত্রী বললেন, অপূর্ববাবু এসেছিলেন।

বললাম, এ আর এমন নতুন খবর কি!

কয়েক মুহূর্তের জন্ত একটু ইতস্তত: করে তিনি বললেন, কিছু টাকা নিয়ে গেলেন।

চমকে উঠে বললাম, টাকা নিয়ে গেলেন!

কি ক'রবো অমন ক'রে চাইলেন যে না বলা গেল না।

অথচ এই টাকা পয়সার ব্যাপারেই তোমাকে আমি বার বার সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম।

ক্ষুব্ধ গলায় স্ত্রী জবাব দিলেন, টাকাটা মারা যাবে এটাইবা ধরে নিচ্ছ কেন?

ভুল ক'রলে তোমার চেয়ে বেশী খুশী আমিই হবো, কিন্তু আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি যে এমন অবুঝের মত কাজ ক'রবে এইটেই আমি ভাবতে পারছি না। রাগ করে আমি বাইরের ঘরে চলে গেলাম। মাসের শেষ। পকেট প্রায় খালি। আর এই সময় কিনা···

আমার সন্দেহটাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হল। অপূর্ব রায় আর কোনদিন এবাড়ী আসবেন না। চিঠি লিখে জানিয়ে গেছেন সে কথা। সংক্ষিপ্ত চিঠিখানি আবিষ্কৃত হ'ল আমার লেখার ফাইলের মধ্যে। লিখেছে :—

"আমার অতীত জীবনের মধ্যে ফাঁকি ছিল না তাই ফাঁকে পড়ে গেছি। সেই ফাঁক বোজাবার জন্তই আমাকে ফাঁকির ব্যবসা বেছে নিতে হ'য়েছে। লেখাপড়া ভালই শিখেছিলাম, কিন্তু নীতিবোধই আমাকে পথে বসিয়েছে। বিদ্যামন্দিরের ব্যবসাদার পাণ্ডারা আমাকে সহ্য ক'রতে পারে নি। হাত পা বেঁধে ছুড়ে ফেলে দিলে। আমি পথে দাঁড়ালাম। নতুন করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও আর কোথাও প্রবেশ অধিকার পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেও বিফল হ'য়েছি। সত্য পথে চলে অনেক কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু ধাপ্পাবাজি আমাকে বিমুখ করে নি।

শিক্ষক ছাত্র নিয়ে আলোচনায় চলে আপনি দুঃখ ক'রে অনেক কথা ব'লেছেন। শিক্ষকদের অনেক দোষারোপ করেছেন—ছাত্রসমাজকে দরদ আর অনুকম্পার আড়ালে রেখে মৃদু তিরস্কার ক'রেছেন। বলবার অনেক থাকলেও চুপ করে থাকতেই চাই। তবে যাবার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি—আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আর ছাত্রসমাজকে এপথে কারা নিয়ে এল? কাদের চিন্তার দৈন্য, কাদের ভ্রান্ত গতি সমস্ত সমাজ দেহে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। সবার উপরে একটা চিন্তাই আজ বড় হ'য়ে উঠেছে। মূল্যবোধের প্রশ্ন। শিক্ষার মূল্য, সততার মূল্য, আদর্শবোধের মূল্য। যে বৈরাগ্য আজ সমস্ত মানবসমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে তারই প্রতিফলন সর্বত্র সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, যার হাত থেকে আমিও অব্যাহতি পেলাম না। তাই ফাঁকি দিয়ে জীবনের ফাঁক বুজিয়ে চলেছি।

কামনা করি এই ফাঁক আরও বিরাট আকার ধারণ করে যেখানে যত ফাঁকী আছে সব একসঙ্গে গ্রাস করে নিক। তবে যদি জীবনবোধ নতুন ক'রে জন্ম নেয়।

আপনাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারলাম না বলে আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। তবে এই দুঃখের মধ্যেও এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে, যতখানি গুরুভার দিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী তাঁর স্নেহ প্রীতি আর বিশ্বাস দিয়ে তাতে আপনাদের সর্বস্ব অপহরণ করাও কিছুমাত্র শক্ত ছিল না। কিন্তু আমি তা পারিনি। ভিতর থেকে বাধা পেয়েছি। আমি হারিয়ে গিয়েও নিজেকে খানিকটা ফিরে পেয়েছি। শুধু ফিরেই পাই নি আমি নিজের মধ্যে বহুর একটা বাপসা ছবি দেখতে পেয়ে কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠেছি। নতুন করে চলবার পথে একটা ক্ষীণ আলোর শিখা দেখতে পেয়েছি। এ আলো কি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে জীবনপথকে আলোয় আলো ক'রে দিতে পারে না?"

এইখানেই শেষ করেছেন অপূর্ব গল্প। এবং শেষ করে দিয়েছেন আমার মনের পুঞ্জীভূত বেদনা আর অসন্তোষকে। মাত্র তিরিশ টাকার বিনিময়ে যে উপলব্ধির কথা আমাকে তিনি শুনিয়ে গেলেন তা আমার মনেও আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এ আলো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক। আরও উজ্জ্বল। অনেক উজ্জ্বল।

খবর

ছেলেটি খবর খুঁজছে, ওকে খবর ছাপতে হবে।

ছেলেটির বয়স ত্রিশের এদিকে, চুলে মিহেন দেওয়া। ছোটবেলা ওর গালে কোড়া হয়েছিল, নাপিত সেটা চিরে দেয়। দাগটা আছে। ছেলেটি বলে ওটা ওর বিপ্লবী অতীতের স্মৃতি।

ছেলেটি এখন খবর জোগাড় করে, ছবি তোলে, কাগজে খবর পাঠায়। এখনো ও চাকরীতে পাকা নয়। বাল-বাল, গরম-গরম খবর জোগাড় করে ও ভালোকথার মোড়কে পুরে পাঠিয়ে দেয়, ওরা ছেপে দেয়। এতদিন ও একটা ছোট্ট কাগজে খবর পাঠাতো কাগজটা কলকাতায় আছে বলেই অনেকে জানেনা। মাত্রই হাজার দুই ছাপা হয়, বিকেলে বেরোয়। পেয়ারদা আর হাওড়ার মোড়ে বিক্রী হয়। বাড়ী ফিরতি বাবুরা কাগজটা বগলে পুরে ট্রেনে উঠে পড়েন।

কাগজটার কোনো তাপ-উত্তাপ ছিলনা। ব্যারিস্টার সেনের পত্নী শ্রীমতী সেন কোথায়? কালনার গ্রামে পাঁচমুখু ওয়ালা বাড়ির, টালিগঞ্জের অধ্যাপকের শালিকার ওপর দক্ষিণকালিকার ভর—বোম্বাই ডাক্তারের ওষুধে বুড়ের পুর্নযৌবন লাভ-মাত্র পঞ্চাশ টাকায় রেডিও ব্যবসা করুন, সব খবরই ওরা ছেপে যেত। ছেলেটি খবর তৈরী করত। কাগজটির মালিক ওকে মাঝে মাঝে সন্দেশ খাওয়াতেন। বলতেন,

—আমার কাগজ ঠিক এইরকম থাকবে ভাই, জেনে রেখ।

—এই রকম?

—হ্যাঁ ভাই। এ আমার বাঁধা ভাত মুরগে না? এ যারা পড়ে তারা চিরকাল পড়বে।

প্রতি সোমবার ভদ্রলোক জ্যোতিষ সংবাদ সরবরাহ করে যেতেন। 'অ' যাদের নামের আদ্যাক্ষর তারা এ হপ্তায় যাতে কষ্ট পাবে কিন্তু তাদের শ্বশুরস্থানীয় লোকের মৃত্যুযোগ। 'ন' দিয়ে যাদের নাম সুরু তারা যেন ভিন্ন প্রদেশীয়দের বাড়ী পান না খায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

—গাঁজা!

—নিশ্চয়। মানুষ তো গাঁজাই চায় রে ভাই! টুথ চায় না, আপিম চায়! আমি বাঁচতে চাই তাই ওদের আপিম খাওয়াচ্ছি।

ছেলেটি যখন মেসকাগজে চলে যায় তখন ভদ্রলোক বলেছিলেন—ভাইরে! গরীবের কথাটা শোন। তোমার না আছে এলেম না আছে খুঁটির জোর। কেন লোভে পড়ে যাচ্ছ? কেউটে দাদের নাম্বি দিয়ে কান চুলকোন কি পষার সাজে?

ছেলেটি কেউটে সাপের ল্যাজ দিয়ে কান চুলকোতেই চেয়েছিল। ইংরেজী পড়তে এখনো আটকায় বলে ও বাংলা বই-ই পড়ে। বাংলায়ই পড়ে পড়ে ওর ধারণা হয়েছে খবরের কাগজের সাংবাদিক মানে জুতোর নিচে ঝিনুকতলা—আজ-চীন কাল-রাশিয়া পরশু-আমেরিকা! বড় বড় নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসা আর কিছুক্ষণবাদেই লোটেলে গিয়ে সুন্দরী মেমসাহেবদের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে "জেন্টল্‌" নাচা।

যেজকাকাকে যিনি ওকে নিয়ে গেলেন তিনি আগেই বললেন—সবই বেলুন অথবা চীনেবাদাম বুঝলে না? একটা লোককেই তোমায় খুশী রাখতে হবে তার আবার একটা কান বড়, একটা হাত ছোট। কোনটা খবর কোনটা খবর নয় অর্থাৎ বুকুর আর মানুষ কে কাকে কামড়াবে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? দেখ! যা সচরাচর হয় না, হঠাৎ হয়, সেটাই হল খবর। প্রত্যেকটা লোকেরই সাধারণত দুটো কান বা দুটো হাত সমান-সমান হয়। এ লোকটা একটা বাঁধাকপির ছেঁড়া পাতার মত কান, একটা বাঁদুরে হাত নিয়ে যখনি জন্মাল তখনি জানা গেল হি ইজ নিউজ!

—তাই বুঝি?

—অতএব ও নিউজপেপারে চলে এল। লোকটার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। মানুষকে দেখে অথবা ছুঁকে ও বলে দেবে ওর হবে কি না! এই যেমন ধরনা হস্করের কথা! ডিনয় হস্কর যখন চৌপাঙ্কিতে সেন্ট ভিম বেচত। সবাই সেন্ট ভিম বেচে কিন্তু ডিনয় কি করত জান?

—ভিম বেচত।

—তুমি একটি ভিম! ডিনয় ভিমগুলোর গায়ে লাল-নীল রঙ করে বেচত আর যে ভিম খেত তাকেই একটা করে পবন নিপাতী হজমী গুলী দিত। বিনে পয়সায়।

—ভিম?

—গুলী। দেখেই লোকটা বললে ওর হবে। ও ভিম বেচছে কেন? যাও, ওকে লিখতে বল। ওকে খুশী রাখাই তোমার কাজ। আর দেখ! তুমি দেখতে এতই নিরেট, ইডিয়েটের মত যে তোমাকে আমল দেবার এতটিতে কোন কারণ নেই। আমি বলেছি তুমি হচ্ছ সেই বিহারের ভূমিকম্পের সময়কার বেবি। অর্থাৎ তোমাদের বাড়ীটা যখন মুঙ্গেরের ভূমিকম্পে মাটির নিচে চলে যায় তখন তুমি জন্মাও। আবার মাটি ফেটে বাড়ীটা উঠে আসে যখন তখন তোমাদের পাওয়া যায়। সমস্ত মুঙ্গেরে তখন একটাই গাই ছিল তার দুধ খেয়ে তুমি বেঁচে ওঠ।

—আমি! মুঙ্গেরে! মাটির নিচে!

—দেখ, ওরকম একটা গল্প তোমার বিষয়ে জেঁকে বসবার পর এখন আমিও যেন তোমার দিকে চাইতে পারছি। তোমার মত একটা নো গুড চেহারা ইদানীং দেখেছ?

ছেলেটি ঘরে ঢুকে গেল। সেই বিবাতাপুরুষটি চতুর্দিকে টেলিফোন নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। বললেন—হুম্‌!

ছেলেটি লেগে গেল কাজে। কাজে লেগে যাবার আগে ওকে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেছিল। বুড়োবাবু ডেকে বলেছিলেন—সাইত্য আর সংবাদের মধ্যে পার্থক্য কি? ট্রুথ আর নিউজ? একটা প্রবন্ধ লিখবা। জান?

প্রবন্ধটা লিখবে বলে ভাবতে ভাবতে ও যখন বাড়ীর দিকে যাচ্ছে তখন হঠাৎ ওর মনে হল হয়তো

বুড়োবাবু ঠাট্টা করেছেন। কেউটে সাপের লাফ দিয়ে যারা ফণা চুম্বকের তাদের সঙ্গে কি বুড়ো তামাসা করে?

ছোট কাগজের মালিক ওকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন। এখানে কেউ উপদেশ দেয়না।

ক্যামেরা আছে, কলম আছে, তুমি তো রাজা হে! বলে পিঠ চাপড়ে ছেড়ে দেয় সংসারে। খবর শহর কলকাতায় ও খবর কোথায় পায়?

কোনটা খবর আর কোনটা খবর নয়? ওর বিধাতাপুরুষ বলেছেন কখনো হিউম্যান এলিমেণ্ট ভুলবেনা, বুঝলে? মানুষ-মানবতা-মানবপ্রেম!

ছেলেটি লিখতে লাগল। গোমা মেরে রোজই রাম আর শ্যাম যদু আর মধুকে মারছে সেটা ছোট খবর কিন্তু রামের মা হাঁ করে কাঁদছেন, ক্লোজআপে আলভিড দেখা যাচ্ছে আর নিচে একটি লাইন—ও যে কইছিল কচু শাক খাইব হেই কথা আমি তুলি ক্যামেরাতে? এটা খবর।

ভেড়ি ভেঙে গিয়ে চাষবাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সাতহাজার লোকের বসতিতে খাবার জলের ইঁদারায় লোণাজল-পচাগাছ-জলেরা লাগছে এটা দেশ অথবা ছোট খবর। বড় খবর হল সেই ভেড়ির আধমাইল ঘুরে সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছিল আর নায়ক নিজেই একবার হাফপ্যাণ্ট পরে জলে নেমে গিয়ে একটা মোষের ছানাকে উদ্ধার করেন।

ছেলেটি হতাশ হয়ে বললে,

—কিন্তু দেশে তো আরো কত কি ঘটছে? সে গুলো জায়গা পাবে না?

—কি ঘটছে?

—আমার ফাইলটা যদি দেখতেন!

—হোঃ!

অবজ্ঞায় ফল করলেন তিনি। খ্যাক করে চেঁচিয়ে বললেন—কে খেতে পেলেনা, কারা মাইনে পাচ্ছেনা, কাদের ইউনিয়ন কাকে হয়তালে মাতিয়ে পেছন থেকে ছুরি বসালে এগুলো ছাড়া খবর নেই? ওগুলো কি ছবি হয়েছে? কে একটা লোক চাকরী নেই বলে ছেলেমেয়ে বউকে বিষ দিয়ে নিজে গলায় দড়ি দিলে তার ছবি তুলেছ কেন? দুটো মেয়ে গ্র্যাজুয়েট গঙ্গার ধারে সাইকেল চড়ে চানাচুর বেচছে তার একটা ছবি আনতে পারলে না?

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে বললে,

—আপনি যে বলেছিলেন হিউম্যান ইনটারেস্টের খবরটা দরকারী?

বিধাতা প্রসন্ন হয়ে বললেন—বলেছিলাম? এখন বলছি পাবলিক ইনটারেস্টের খবর মানে যাতে মানুষের ভালো হয় সে খবরও দরকার। তোমার হবে হে! এই যে তুমি ভুলেও মাথা ঘামিয়ে চিন্তা কর না, এই যে তোমার ইভিয়লি, এই যে আমি যা বলেছি তাই শুনছ, এই অচলাভক্তিতেই তোমার হবে। তুমি ভেব না। মানুষ কি চায় বলত? কেন চারদিকে এই গণ্ডগোল?

—কেন গণ্ডগোল।

—কি নেই? মানুষ কি পাচ্ছে না?

ছেলেটি বোকা তাই বললে—ভুত! চাকরী! কাজ!

—না।

ভীষণ চেঁচিয়ে বিধাতা বললেন—ভালবাসা! প্রেম! স্নেহ! প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসবে তাই চায়। স্যাচারাল ভালবাসা! এই ভালবাসা হচ্ছে মুরগীর স্যাচারাল ভালবাসা কর কি এগ।

—ডিম!

—ডিম কথাটা তাচ্ছিল্য করে বোল না। ডিমের মতন ডিম বেচতে বুঝলে?

ডিম বেচত একদিন, আজ সে সোনার ডিম পাড়ছে।

অগত্যা ছেলেটি বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি হাঁসের ডিম কিনে নিয়েই বাড়ী গেল।

মাকে বলল—ভাজনা কর।

কে জানে, হয়তো ডিম খেতে তার ভাগ্যও খুলে যাবে কিন্তু লাল ডিম বেচলে পুলিশ ধরতে পারে, হলদে ডিম বেচলে ওর দাদাই ওকে "সিয়া সিয়া" বলে ছিন্না ছিন্না করবে। বোন বলবে সবুজ ডিম বেচে প্যালিস্টিস্টরা।

শুধু খবর নয় পাবলিক ইনটারেস্টের খবর। মানুষের যাতে ভালো হয় সেই খবর। মানুষের বিশেষ করে কলকাতার মানুষের কিসে ভাল হয়? বুড়োবাবু ভাগাবাহী ঘোড়ার মত হ্রেঃ হ্রেঃ করে হেসে বললেন,

—একটি স্যাপান বোমা লাইনে কিছু ফেলে দাও বাবা! নাখোদা মসজিদটা হচ্ছে কলকাতার ঠিক সেন্টার। সেখানে ছোড় দেখি? একেবারে শহরটা বারুইপুর থেকে বেলঘরে, গার্ডেন রীচ থেকে মারাঠা ডিচ অব্দি কর্দা হয়ে যাক! পাবলিক ইনটারেস্ট কাকে বলে দেখাও!

—আজ আপনি কলকাতার কথা বলছেন। কাল বাঙাল কথা বলছিলেন না?

—পরশু পুন্ত বলব। আমি কি সোজা লোক রে ভাই! আই অ্যাম্ অল্ ইণ্ডিয়া। এই বুকটা হচ্ছে মহামানবের সাগরতীর জানলে?

বলে হেঃ হেঃ করে বুড়োবাবু এবার কাঁদতে লাগলেন। শব্দটা একই রইল শুধু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিন্তু এই সময়ে ছেলেটি হঠাৎ খবরের খোঁজ পেয়ে গেল। খবর আকাশ থেকে নামল। বিষ্টি হয়ে নামল। বুড়োবাবু বললেন,

—স্যাপান ছুঁড়তে বলেছিলাম বলে কি খেয়ে ফেলছিস মা? না কি হালদাররা তোকে নাওয়াচ্ছিল না? এ কি করলি মা? বিষ্টিবানে নাইতে গেলি কেন?

সমাজ সুন্দরী সাবিত্রী চৌ অর্থাৎ সাবিত্রী চৌধুরান টেলিফোনে বললেন,

—কে বলেছিল খবরের কাগজে ধানের কথা লিখতে?

—ধানের কথা?

—কেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ধানে ভাসাভাসি দেখেননি আপনারা?

—ম্যাডাম! আমরা তো সরকারী রিপোর্ট শুনে লিখি।

—জয়বাবার চিঠি পেয়েছিলেন?

—না তো?

—আমি পেয়েছিলাম। লেখা ছিল কুড়িটা লোককে খবর দিতে হবে তা আমি খবরও দিয়েছিলাম।

—জয়বাবা কি বলেছিলেন বন্যা হবে?

—তা বলেননি কিন্তু বলেছিলেন অহংকার আর আত্মপ্রচার থেকেই সংঘাত হবে। ঐ যে ধান হল ধান হল বলে আপনারা হেসিয়ে উঠলেন সেই জন্যই তো ভগবান অহংকারটি ভেঙে দিলেন। এখন সামলান!

সত্যি তো!

—মহিষের দুঃখকষ্ট দেখেছেন? দেখে আমার বুকের ভেতরে যে কি হচ্ছে কি বলব!

জোনের ওপাশে সাবিত্রী চৌধের দীর্ঘনিশ্বাস আর ওঁর পিকিনিজ কুকুরের ডাক একই সঙ্গে শোনা গেল।

ছেলেটি বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু যত খবরই আনে বিধাতা বলেন আরে এটা তো প্রত্যেকটা বড় কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে।

ছেলেটির যেন নেশা লেগে গেল। বিদ্যাসিন্ধুর যাবার সময়ে ও নেহাৎ বালক। কোন কথাই তেমন মনে নেই। বুড়োবাবু বললেন,

—আমায় তুমি যান দেখিওনা। জলপাইগুড়িতে করলা আর তিস্তা দুটো নদীর মধ্যিখানে আমার বাড়ালী পাঁঠার দোকান ছিল।

—নর্থ বেঙ্গলে?

—নিশ্চয়। আই অ্যাম বেঙ্গল। আমার বুকে পূব-উত্তর-পশ্চিম এসে মিলে গেছে তা জানো?

এতদিনে ছেলেটি বুঝতে পারল বুড়োবাবু সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান থেকে নিত্যি আফিম খান।

কলকাতার সব গোপন খবর জোগাড় করে ফেলল সে। কত লক্ষ লোক কলকাতায় ফুটপাথে থাকে, পার্কে স্নান করে, সরকারী সড়ক তাদের শৌচাগার। কত লক্ষ লোক শিল কেটে-ছুতো সেলাই করে পুরণো কাগজ কিনে দিন আনে দিন খায়। কতলোকের বস্তি এবার ভগবান তুলে দিলেন। কতজন স্কুলবাড়ী কলেজ বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। ছেলে মরে গেলে কোন পিতা অসহায় চোখে জল দেখেছে আর ঘরের মধ্যে মরাছেলে নিয়ে বসে বসে চোখের জল ফেলেছে। ডাক্তার ডাকা যায়নি বলে কোন মাস্রাজী কেরানীর স্ত্রী স্বামীর অফিসানারী হবার পর বসে বসে শুধু ভগবানকে ডেকেছে।

মস্ত একটা কর্দ লিখে ফেলল সে। কি কি চাই এই শহরের। জল চাই, নর্দমা চাই, ব্যবস্থা চাই, যানবাহন চাই, জল বেরোবার ব্যবস্থা চাই! ছেলেটির লেখা পড়ে মনে হল কলকাতা হচ্ছে একজন পেশাদারী ইনিয়ন নেতা। কিছুতে খুশী হবার নয় সে। ওপরে জল দাওতো নিচে পাইপ চাই। একশো ঘাবী মিটিয়ে দাও তো আরো তিনশো ঘাবী চাই।

শেষে লিখল—আমার মালিকের সঙ্গে আমিও একমত। দমদমটা শেষ অবধি ভালবাসায়। আমাদের শহর ভালবাসা চায়। এখন অনেক ভালবেসে অনেক সেবা না করলে চার্লক নগরীকে বাঁচানো যাবে না অথচ, শহরের বয়েস যদি বলি কলকাতা তো তরুণী। তার সরকারী বয়েস মাত্রই দুশো আশী। জেরুসালেম—রোম-লণ্ডন কেন, বেনারস-পুরী—দিল্লী কলকাতার চেয়ে অনেক বুড়ো।

এখন বুড়োবাবুও বলতে লাগলেন কেউটে সাপের ল্যাজ দিয়ে কান চুলকিও না ভাই! পেট্রোলের গন্ধমে বসে বিড়ি ধরিও না। কে জানতে চায় তোমার গোপন খবর। যা সত্যি তা খবর নয় আর যা খবর তা সত্যি নয় তা কি তুমি জান না? তা ছাড়া বল এখন খেপে আছে। সেন্সরের ঘোড়ে একটা

ছোট কাগজ বিক্রী হয় জানো? অবার্থ জ্যোতিষ বলে হে! তাতে লিখেছে যাদের নামের আদ্যক্ষর 'হ' তাদের পক্ষে এ হপ্তায় বেড়ে ছোকরা আর গুণো মেয়েছেলে মোস্ট ডেন্‌জারাস্।

—তা হলে?

—তুমি একলা চল ভাই! তোমার ভাকে আমি এগুচ্ছি না।

—বস্ কোথায়?

—টেবিলে। এ হপ্তায় কতগুলো মিটিং মিস হল তা জান?

—তাতে ওঁর কি?

—টের পাবে নগরমাতাদের ওখানে উনি বসে আছেন।

—নগরমাতা?

—কেন, তোমার আমার—বিদ্যাসাগরের মা থাকতে পারে নগরের মা থাকতে পারে না? কলকাতা কি একটা অরফ্যান? তার রীতিমত অনেক বাপ, অনেক মা আছে। মায়েরা তার জন্যে কত ভাবে জান?

—তাতে রসের কি?

—যাও না, খেয়ে দেখ।

—কোথায়?

—সাবিত্রী চৌরের বাড়ী। ওঁর বাড়ীতে চারতলায় গোপালমন্দির আছে সেখানে অতিথিশালা আছে। সেখানেই ওঁকে পাবে।

—থ্যাঙ্কযু!

—বল।

—ছোট কাগজের জ্যোতিষটা গাঁজা। আমি ওখানে ছিলাম।

—তাই বুঝি? তোমার বস কি তুঁইকোঁড় ভাবা? ওই ওখানে ছিল, জ্যোতিষের গাঁজা ওর মাথা থেকেই বেরোয়। ঐ কাগজে তো ওর হাতে খড়ি। কিন্তু এখন ও ভুলে গিয়েছে সব তাই নিজের গাঁজা নিজেই বিশ্বাস করছে। থাক গে! তুমি যাও। তোমার ভাল হোক। টা-রা-বং!

—কি বললেন?

—শুদ্ধ আদিবাসী ভাষা। আশীর্বাদ। দক্ষিণ বাংলার আই বিলং টু অল দি বেঙ্গলস্!

ছেলেটি সাবিত্রী চৌরের অতিথিশালায় গেল। রূপোর গোপালের মাথার পেছনে ইলেকট্রিক জ্যোতির্বলয় ঘুরছে। টেপ্‌রেকর্ডারে আমেরিকান সাধুর রামধুন হরিনাম বাজছে। সঙ্গের ঘরের আশপোড়া ডানলোপিলোর নরম আর নরম আলোয় নগরমাতারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। সাবিত্রী চৌ. মিসেস সান্যাল, ইলীনা বিশ্বাস, চমৎকারিণী পাণ্ডে, মেরি মুখার্জি। ঘরে নরম গন্ধ। বস্ আর আরো ঘরেকজন, শ্রীযুক্ত চৌহান আর শ্রীযুক্ত বিশ্বাস ছাড়া অন্যদের চেনেনা ছেলেটি। সকলেরই মুখ হাঁড়িপানা। দুমুখ ছলো ছলো।

—কি এনেছ?

সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ওঁরা। তারপর বস্ বললেন,

— আমি খুব দুঃখিত ভাই। এসব ছেঁড়িয়ে পাঠা করা যায় না। তোমায় ছেঁড়িয়ে সাংবাদিক বানানো

আমার সাধ্যি নেই। অথচ ছিল, তোমার সম্ভাবনা ছিল। ভূমিকম্পের সময়ে জন্মালে কি যে সে কথা? তুমি নিউজ হয়ে জন্মালে অথচ নিউজ পেপারম্যান হতে পারলে না।

—ফেলিওর একটা।

—ঠিক বলেছেন মিসেস চৌ।

—আমার হবে না সার?

—না। চারদিকে এইসব হিউম্যান এলিমেন্ট ফেলে রেখে তুমি চুলোর ধোরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

—হিউম্যান এলিমেন্ট?

—নয় কি? আমাদের নগরমাতারা কি তুমি বলতে চাও মানুষ নন?

ছেলেটি প্রায় পাগল হয়ে গেল দুঃখে। মরিয়া হয়ে সে।

—আর একটা চান্স দিন বলে চেঁচিয়ে চীৎকার করে সকলকে বললে,

—হল্ট! হিয়ার ইজ মাই গান্!

—সর্বনাশ!

সবাই ভীষণ ভয় পেলে। ছেলেটি কিন্তু পানের বদলে ক্যামেরা বের করলে। বের করে দুম দুম করে ছবি তুলতে লাগল নগরমাতাদের।

প্রত্যেকটি ছবি হিউম্যান এলিমেন্টে বোঝাই। বন্যা আর মহামারী চারিদিকে তাই নগরমাতারা অসম্ভব প্রশংসা হল ছেলেটির। বস ওকে চাকরী পাকা হবার চিঠি হাতে দিয়ে বললেন,

—খুব বেঁচে গেছ। এখন বুঝেছ তো খবর জোগাড় করা আসলে কি!

—বুঝেছি।

সীমা স্বর্গ

মানবেন্দ্র পাল

পাড়ায় যে তিনতলা বাড়িখানা উঠছিল সেটা সম্পূর্ণ হতেই বাড়ির মালিক সপরিবারে এসে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু পরিবারটি এতই সংক্ষিপ্ত যে প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে গেল। অত বড়ো বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী!

প্রাণী বললে অবশ্য তাঁর কুকুরটিকেও ধরতে হয়। তা হলেও দু-এ একে তিন।

কিন্তু আরো বিস্ময় ছিলেন মিস্টার সিন্‌হাকে নিয়ে। প্রথমে ভুল করেছিল সবাই—বুঝি উনি মিস্টার সিন্‌হার মেয়ে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি।

ভুল যদি ভাঙল কৌতূহল মেটে না। কিন্তু কৌতূহল নিরসনের উপায় নেই। মিস্টার সিন্‌হা কারো সঙ্গে মেশেন না। আর তাঁর বাড়িতে কেউ অযাচিতভাবে যায় এটাও যে তিনি পছন্দ করেন না তার প্রমাণ তাঁর দরজার সামনে সদা সর্বদা তালা-বন্ধ লোহার কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট আর তার ভেতরে বাঘের মতো অ্যালসেসিয়ানটা।

এই নতুন পরিবারটির আবির্ভাব অধ্যাপক সঞ্জয় বসুর অন্তঃপুরকেও বিচলিত করেছিল। অধ্যাপক যদিও তাঁর বাইরের ঘরের মধ্যে নিজের পড়াশোনা, ছাত্র আর দু-চারজন ডকটরেট-ডিগ্রিপ্রার্থী বন্ধুদের মধ্যেই ডুবে থাকতেন, অন্তঃপুরের বা বাড়ির বাইরের কোনো খবরই তিনি রাখতেন না, তবু রাস্তা দিয়ে যখন ওই নতুন মানুষটি মুখে চুরুট গুঁজে আর কুকুরটিকে নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে উদ্ধত অহংকারে হেঁটে যেতেন তখন অধ্যাপকও একবার বই থেকে চোখ তুলে চাইতেন। আর সম্পূর্ণ অকারণেই কেমন যেন রাগ হত মিস্টার সিন্‌হার ওপর। শুধুই কি রাগ? বোধহয় না। তার সঙ্গে কেমন একরকম ঈর্ষাসি। ওই যে দীর্ঘ পেশীবহুল দেহ—ওই যে টকটকে ফর্সা রঙ—অমনিভাবে সদর্পে হাঁটা এ তো তিনি পারেন না। তিনি নিজেও শিক্ষিত লোক, নিজের বাড়ি নাই বা থাকল, সংসারে তো অভাব রাখেন নি কিছু। তবু যেন তিনি ঐ মিস্টার সিন্‌হার সঙ্গে পেরে উঠবেন না। কোথায় এক জায়গায় এসে তিনি হেরে যাবেন।

এই হেরে যাবার ভাবটা মনে আসতেই তাঁর মনোভাবও আপনা আপনি বদলে গেল। মিস্টার সিন্‌হাকে দেখলেই এখন মনে হয় লোকটা উদ্ধত, অহংকারী। সঙ্গে সঙ্গে কেমন রাগ হয়।

এ হেন মিস্টার সিন্‌হার সঙ্গেও অধ্যাপক বসুর আলাপ হল। আলাপ হল লেকে। প্রতিদিন

ভোরে অধ্যাপক লেকে বেড়াতে যান। হঠাৎ একদিন দেখেন মিস্টার সিন্‌হাও বেড়াতে এসেছেন। চোখাচোখি হল। মিস্টার সিন্‌হা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আপনায় যেন কোথায় দেখেছি।

অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন, পাড়াতেই।

—পনেরো নম্বরে ?

—হ্যাঁ।

—আরে মশাই আপনি তো আমার পাড়ার লোক। কতদিন আছেন ?

—তা বছর কুড়ি।

—বলেন কী ! কুড়ি বছর এক জায়গায় থাকতে পারেন ? আমি তো তিন বছর এক বাড়িতে থাকলে হাঁপিয়ে উঠি। কলকাতা শহরে চারদিকে চারখানা বাড়ি করে রেখে দিয়েছি। এবারে পালাব বিহারে।

অধ্যাপক একটু হাসলেন।

—আর পাক দেবেন নাকি ? চলুন না একটু বসা যাক।

—অধ্যাপকের তখনো ঘর ছিল। কারণ একটু আগেই তিনি এসেছেন। তবু বললেন, চলুন।

একটা কাঠের বেঞ্চিতে দুজনে গিয়ে বসলেন।

—আপনি তো পুরোপুরি ফ্যামিলিম্যান মশাই ! দিব্য আছেন।

অধ্যাপক হাসলেন। তা আছি। আজ স্ত্রীর বুক ধড়ফড়, কাল বাতের যন্ত্রণা, পরশু বড়ো মেয়ের জন্যে পাত্র অন্বেষণ, তার পরের দিন ছোটো মেয়েটির—

বাধা দিয়ে মিস্টার সিন্‌হা বললেন, সংসার থাকলেই ওসব আছে—মাথা থাকলে তবেই না মাথা ব্যথা !

অধ্যাপক হেসে বললেন, আপনিও তো সম্প্রতি ঘাড়ের ওপর একটি মাথা বসিয়েছেন শুনলাম। তবে মাথাটি কাঁচা—আর কাঁচা বলেই ভাজা।

সিন্‌হা প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। —এ খবরও আপনার কানে পৌঁছেছে ! হ্যাঁ, মিসেস আমার নিতান্তই ছেলেমানুষ। কি করা যায়—সেকেণ্ড ম্যারেজ তারপর প্রণয় যে অন্ধ এ তো জানেনই ; তাই স্যালিকা থেকে প্রেমিকা। বলে একটা চুরুট ধরালেন।

—আপনি কি আমার মিসেসকে দেখেছেন ?

অধ্যাপক বললেন, কি করে দেখব ? শুনেছি উনি বাড়ি থেকে বেরোন না।

সিন্‌হা ইতস্ততঃ করে বললেন, বেরোতে উনি চান, কিন্তু বেরোতে দিই না। ব্যাপারটা কি জানেন—মেয়েটি বড়ো খাঁটি। একেবারে যাকে বলে গ্রাম্য তরুণী ! আমার শ্বশুর মামাতো বোন। দেশের বাড়িতে থাকত। তারপর—

এই পর্যন্ত বলে বললেন, থাক এখন। সে সব গল্প পরে আপনার সঙ্গে করব।

—তা মিসেসকে বেরোতে দেন না কেন ?

—বেরোতে দিই না নয়। নিয়ে বেরোই না। তার কারণ ওকে নিয়ে বেড়ানো যায় না। আমার তো অ্যাসোসিয়েশনটা একটু অন্যরকম। ক্লাব, বার এসব ছাড়া চলে না। তা সেখানে ওকে নিয়ে যাব কী মশাই, বিয়ারের গন্ধেই হয়তো বমি করে ফেলবে।

সিন্‌হা একটু থামলেন। তারপর বললেন, অথচ ছেলেটি কিন্তু মন্দ নয়। ওকে নিয়ে চলাফেরা করা যায় না বটে তবে নির্জনে নিরিবিলিতে ধীরে সুস্থে উপভোগ করা যায়। ভেরি টেম্পটিং! আপনার সঙ্গে আলাপ হলে—আচ্ছা দাঁড়ান, কালই আপনার বাড়িতে চন্দনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

এ প্রস্তাব অধ্যাপকের কাছে অকল্পনীয়। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন—কাল কখন আপনি অনুগ্রহ করে আসবেন?

—সন্ধ্যাবেলায়। যদি না আপনাদের কোনো অসুবিধে থাকে।

পরের দিন এঁদের অভ্যর্থনার জন্যে অধ্যাপকের বাড়ির সকলেই প্রস্তুত হতে লাগলো দুপুর থেকে। একজন ধনী অতিথি পায়ের ধুলো দিতে আসছেন বলেই নয়, কৌতূহল তাঁর স্ত্রীটির জন্যেই বেশী। অমন বয়েসে বিয়ে অনেক জায়গাতেই হয়, কিন্তু মিষ্টার সিন্‌হা যে সগর্বে ঘোষণা করে বেড়ান—ব্যাপারটা প্রণয়-ঘটিত। সেখানেই লোকের বিস্ময়।

এই নিয়ে আজ সারা সকাল অধ্যাপকের স্ত্রী আর বড়ো মেয়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক হয়ে গেছে।

নির্মলা বলেছেন—সবই সম্ভব। পুরুষ মানুষের বয়েস! পার্বতী মহাদেবের উদাহরণ কী ভোলা যায়?

উজ্জ্বলা ঝেঁকে উঠে বলেছে,

—রেখে দাও তোমার গাঁজাখুরি উদাহরণ! একালে ওসব চলে না। প্রেম করবার আর পাত্র জুটল না! পঞ্চাশ বছরের একটা বুড়োর সঙ্গে! কক্‌খনো না। আমি বলছি ভদ্রলোক ছলে বলে কৌশলে বিয়ে করেছে। আর বাইরে বলে বেড়াচ্ছে—লাভ্‌ ম্যারেজ। কারণ যাই কর না কেন প্রেমঘটিত বললেই সাত খুন মাপ! তারও কারণ পরিষ্কার—প্রেমের ব্যাপারে একজনের দায়িত্ব থাকে না। অপরাধটা দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়।

নির্মলা মানতে চাননি। তিনি এ যুগের দৃষ্টান্ত দিয়েই নিজের যুক্তি সমর্থন করেছেন—না বাপু, কিছুই বলা যায় না। এ যুগেও অসম্ভব নয়। মামাতো ভাই পিসতুতো বোনে বিয়ে করছে আর পঞ্চাশ বছরের লোক একটা কুড়ি বাইশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করলেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে! তা ছাড়া—বয়েসটা সব সময়ে কিছু বড়ো সমস্যা নয়।

এ আলোচনায় অধ্যাপক যোগ দেননি। কিন্তু কান পেতে ছিলেন। বিচার করার চেষ্টা করছিলেন। মেয়ের কথাই ঠিক। ভাবেন—দোষ তিনের তো পড়ে রয়েছে। তাঁর নিজেরই তো বয়েস হল একান্ন। মাথায় যেক'টা চুল আছে তার অর্ধেক পাকা, গালের চামড়া আর যেন তেমন টানটান নেই, পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের ছেলেরাও তাঁকে খাতির করে সামনে সিগারেট খায় না। এই বয়েসে কি উজ্জ্বলার বয়সী একটা মেয়ে প্রেমে পড়তে পারে? অসম্ভব।

তিনি মনে মনে এইরকম ভাবছিলেন, কিন্তু সামনা সামনি ওদের তর্কের মধ্যে যেতে না। তাহলেই যেন সিন্‌হা দম্পতিকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তিনি বাইরের ঘরেই রইলেন আর নিজের পছন্দ মতো কখনো টেবিলটা একটু নড়ালেন, সেলফ্‌টা একটু সরালেন, বইগুলো কতক রাখলেন টেবিলে, কতক ছড়িয়ে দিলেন বিছানার ওপর—যেন ঘরে ঢুকে প্রথমেই বোঝা যায় এটা কোনো বড়োলোকের বাড়ি না হলেও একজন অধ্যাপকের বাড়ি।

একবার উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরখানি দেখলেন। না, বেশ ছিমছাম লাগছে। একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন—পর্দাগুলো বদলে দিলে হত। কিন্তু সে সময় আর নেই। এখনি হয়তো অতিথিরা এসে পড়বেন।

অতিথিরা এলেন যথাসময়েই।

অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়নি। বাইরের ঘরেই বসানো হল। মিস্টার সিন্‌হা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইনি হচ্ছেন একজন নামকরা অধ্যাপক। প্রচুর পড়াশোনা। এই বইপত্তর দেখেই বুঝতে পারছ। এঁর মতো একজন বন্ধু পাওয়ায় আমি নিজেকে ফরচুনেট্ মনে করি।

মিসেস সিন্‌হা তাড়াতাড়ি উঠে প্রণাম করতে যেতেই মিস্টার সিন্‌হা হাঁ হাঁ করে উঠলেন।—আরে প্রণাম-টনাম কেন? যতসব সেকেলে গেঁয়ো প্র্যাকটিস! হ্যাণ্ডশেক্ করো, নইলে অন্ততঃ দুহাত তুলে নমস্কার করো।

মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ধপ করে সোফায় বসে পড়ে দুহাত তুলে সকলকে নমস্কার করল।

অধ্যাপক হেসে বললেন,

মিস্টার সিন্‌হা, আপনি যাবা দিলেন বটে, কিন্তু মেয়েদের এই বিনম্রটুকুই তো সব। এরই মধ্যে দিয়ে ওদের চরিত্র মাধুর্য ফুটে ওঠে।

মিস্টার সিন্‌হা বুড়ো আঙুল দিয়ে দাড়ি চুলকে বললেন,

—তাই নাকি! আমি ভাবলাম ওসব সেকেলে ব্যাপার আপনারা পছন্দ করবেন না।

অধ্যাপক কী বলতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন মিসেস সিন্‌হা একদৃষ্টে তাঁরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন স্পষ্টভাবে তাকিয়ে আছে যে তিনি নিজেই অস্বস্তি বোধ করলেন।

মিস্টার সিন্‌হা ঠিক সেই মুহূর্তেই বললেন,

—আমার মিসেসকে আপনার কেমন লাগছে বলুন। সেদিন এর সম্বন্ধে যা বলেছিলাম তা কি আমার কিছু বাড়িয়ে বলা?

অধ্যাপক বলে উঠলেন—

না না, এতটুকু বাড়িয়ে বলা নয়। আপনি খুব ভাগ্যবান তাই এমন স্ত্রী পেয়েছেন।

সিন্‌হা খুশী হয়ে বললেন,

—আপনি নিশ্চয় শুধু এর ব্যবহার দেখেই বলছেন না?

—অবশ্যই না।

মিসেস সিন্‌হার মুখটা আরো লাল হয়ে গেল।

—আচ্ছা মিস্টার বোস, সত্যি বলুন—এর পাশে আমায় কি মানায় না?

অধ্যাপক হেসে বললেন, কে বললে মানায় না? একেবারে হর-পার্বতী!

অধ্যাপক মনে মনে স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিলেন।

—আপনি তো জানেন আমাদের লাভ্ ম্যারেজ। কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। এটা কি জেলাসি?

অধ্যাপক বললেন,

—তা হতে পারে। আমি নিজেই তো জেলাস হয়ে উঠছি।

সিন্‌হা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন,

—তা আপনি জেলাস হলে আমার রাগ হবে না। আপনি তো আমার ফ্রেণ্ড। ফ্রেণ্ডের জন্যে ফ্রেণ্ড অনেকখানি স্যাক্রিফাইস্ করতে পারে।

ঠাট্টা রসিকতা ক্রমেই স্থূল হয়ে উঠছিল। অধ্যাপকও সামলাতে পারলেন না। বলে ফেললেন, কেউ না হয় স্যাক্রিফাইস করল কিন্তু মিসেস কেউ ?

কথাটা বলেই অধ্যাপক নিজের অসংযত জিবের জন্যে চমকে উঠলেন। মিসেস সিন্‌হা কিছু মনে করেছে কিনা জানবার জন্যে তার দিকে তাকালেন। দেখলেন মিসেস সিন্‌হা লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

এমনি সময়ে উজ্জ্বলা এল প্লেটে করে খাবার নিয়ে। মিসেস সিন্‌হার সামনে একটা প্লেট রাখতেই খপ্‌ করে উজ্জ্বলার হাতটা ধরে ফেলল। কাতরস্বরে বলল, আমি এত খেতে পারব না ভাই।

—আপনি যা পারেন খান।

বলে টেবিলে প্লেট সাজিয়ে চলে যেতেই কথা নেই—বার্তা নেই চন্দনাও নিজের প্লেটটা হাতে নিয়ে অনাবৃতভাবেই উজ্জ্বলার পিছন পিছন বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

রাত্রে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুটিকে কেমন লাগল ?

অধ্যাপক বললেন, একটা বিচ্ছু—পাজি !

স্ত্রী বললেন, আর বন্ধু-পত্নীটি কে ?

অধ্যাপক ইতস্তত: করে বললেন, কি বলব,

—একেবারে মেয়ের মতন। নিতান্ত বন্ধু-পত্নী বলেই ঠাট্টা করতে হচ্ছিল, কিন্তু এত অশ্লীলতা বোধ করছিলাম !

স্ত্রী বললেন,

—তবে মেয়েটি বড়ো ভালো। ওর আবার উজ্জ্বলাকে খুব ভালো লেগেছে। তা লাগবে। সমবয়সী তো।

সত্যিই উজ্জ্বলার সঙ্গে মিসেস সিন্‌হার খুব ভাব হয়ে গেল। এই ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস সিন্‌হা পরিচয়টা মুছে গেল। শুধু যে উজ্জ্বলার কাছেই মুছে গেল তা নয়—বাড়ির সকলের কাছেই।

এখন অন্তঃপুরে বিকেলে—ছুটির দিনে উর্মিলা বাড়ি থাকলে দুপুরেও, বেশ একটি আড্ডা বসে। কিন্তু সে আড্ডায় অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ নেই। নিমন্ত্রণ নেই—কিন্তু বাধা আছে কি ? সম্ভবত বাধাও নেই। তবু ইচ্ছে করেই তিনি ওদের মাঝখানে যান না। হাজার হোক তিনি একজন প্রবীণ অধ্যাপক। ষোলো মেয়েদের আড্ডায় তাঁকে কি মানায় ?

একদিন তিনি চায়ের টেবিলে নিজেই মিসেস সিন্‌হার কথা তুললেন। বললেন,

—চন্দনা রোজই আসে। তোমাদেরও কিন্তু মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যাওয়া উচিত।

স্ত্রী বললেন,

—কার সঙ্গে দেখা করতে যাব ? গৃহিণীই তো স্বয়ং রোজ এখানে আসেন। আর কর্তা ? তিনি তো বাড়িই থাকেন না শুনেছি। থাকলেও কী মূর্তিতে থাকেন কে জানে।

উর্মিলা বললে, তাছাড়া চন্দনা কোনোদিন যেতেও বলেনি।

বলেই বললে, আমি যা বলেছিলাম তাই কিন্তু ঠিক। লাভ্‌ ম্যারেজ মোটেই নয়। চন্দনার দিদি মারা যাবার আগেই ওকে সংসারের সাহায্যের জন্যে এনে রেখেছিলেন। মারা যাবার পর আর ছাড়েন নি। মেয়েটাও লাজুক ভীরু প্রকৃতির। বয়স্কদের লোকের খপ্পরে পড়ে আর বেরোতে পারল না।

চন্দনা নিয়মিত আসে। এখন প্রায়ই এ বাড়িতে তার খাওয়ার নেমন্তন্ন। খাওয়ার পরই চলে যায় না। দারা দুপুর উজ্জ্বলার পাশে শুয়ে শুয়ে গল্প করে। তারপর তিনটের সময়ে চা, তারপর হাতমুখ ধুয়ে উজ্জ্বলারই কাপড়পরে বেড়াতে যাওয়া।

অধ্যাপকের সামনে দিয়েই যায়। যাবার সময়ে মধুর একটু হাসি। নিঃশব্দ হাসিতেই অধ্যাপক প্রত্যুত্তর দেন। তারপর ওরা বেরিয়ে গেলে অধ্যাপক অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি! কে এই মেয়েটি? সে কি সত্যিই তাঁরই সমবয়সী এক প্রৌঢ়ের পত্নী? নাকি তাঁর মেয়ের বান্ধবী? অথবা তাঁর বাড়ির কোনো দূরসম্পর্কীয় কেউ—দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে!

পরক্ষণেই তাঁর মিস্টার সিন্‌হার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চওড়া চোয়াল, পুরু ঠোঁট। এক মাথা কাঁচা পাকা চুল সুগন্ধ তেলের গন্ধে ভরপুর। হাত নরম্‌তো, যেন মোটা একখানা থাবা। চোখের চাউনিতে হিংস্র জন্তুর ক্ষুধা।

এই লোকটাকে দেখেই তাঁর কেমন রাগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল উদ্ধত, অহংকারী—কামার্ত! কিন্তু কোথায় যেন লোকটার কী একটা প্রচণ্ড শক্তি লুকানো আছে। সামনে কথা বলতে গেলে গলায় ভালো করে স্বর বেরোয় না।

আজ চন্দনাকে তাঁরই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে হঠাৎ অধ্যাপকের মনে কেমন যেন আনন্দ হল। সে আনন্দ নির্মল নয়। তাঁর মনে হল অত বড়ো লোকটার শয্যাসঙ্গিনী আজ যেন স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়ে তারই ভাঙা কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েছে। একথা কল্পনা করতেই মন আনন্দে শিউরে উঠল। মুহূর্তে মনে হল বেচারি মিষ্টার সিন্‌হা তাঁর করুণার পাত্র! হাসলেন অধ্যাপক—কী অদ্ভুত কল্পনা।

বাড়ির ভেতরে সেদিন লুডোখেলা বেশ জমেছে। অধ্যাপক বসেছিলেন একলা বাইরের ঘরে একরাশ বইয়ের মাঝখানে। হঠাৎ তিনি উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

চন্দনা তার সেব গুটিটি নিয়ে দুই পক্ষব্যূহের মধ্যে দিয়ে পালাতে ব্যস্ত এমন সময়ে অধ্যাপক এসে উপস্থিত।

অমনি খেলা থেমে গেল। নির্মলা গুটি চালতে চালতে বললেন, তুমি আবার এখানে কি মনে করে?

অধ্যাপক বললেন,

—আমিও তোমাদের সঙ্গে খেলব।

—ওমা সে কি! তুমি লুডোখেলা জান?

—তা জানি না?

—আমার ধারণা, বইপড়া আর নোট-করা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু যে আছে তার খবর তুমি জান না।

অধ্যাপক হেসে বললেন,

—মানুষের জ্ঞানের গণ্ডি যে কত অল্প সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই এলাম। বলো কার সঙ্গে বসব?

এতক্ষণ তিনজনে খেলা হচ্ছিল, চারজনে হলে দুটো দল করে বেশ জমাটি খেলা হয়, কিন্তু অনভিজ্ঞ পার্টনার নিয়ে কে হেরে মরবে?

উজ্জ্বলা বললে, বাবাকে পার্টনার করে আমি খেলতে পারব না।

অধ্যাপক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে তুমিই আমার গতি।

—রক্ষে করো। জীবনের পার্টনার করে জলে পুড়ে মরছি আবার খেলাতেও পার্টনার!

অধ্যাপক হতাশার ভান করে বললেন, তাহলে তো আমার খেলাই হয় না। হায় হতভাগা!

তখন চন্দনা অতি লজ্জায় অতি সংকোচে বললে, আপনি বসুন আমার সঙ্গে।

অধ্যাপক মহা উৎসাহে আগের খেলা শেষ করে দিয়ে পরে গুটি সাজাতে লাগলেন। তাঁরা দুজনে হারলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপক একটা যেন নতুন আনন্দের আস্বাদ পেলেন।

এরপর থেকে চন্দনা এলেই অন্তঃপুরে যাবার জন্যে অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এতদিন কেবল তিনি বাইরের ঘরটির সঙ্গেই একাত্ম ছিলেন—কেবল বইপত্র ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্টি চলত না। এখন ভিতর মহলের সঙ্গে বিশেষ করে মেয়ের ঘরটির সঙ্গে যেন নতুন করে সম্পর্ক গড়ে উঠল। এ ঘরে তিনি কদাচিৎ আসেন। এলেও নিতান্ত প্রয়োজনে কয়েক মিনিটের জন্যে। এখন এ ঘরে রোজ খেলার আসর বসে। খেলার অবসরে মাঝে মাঝে ঘরটির দিকে তাকান। একই বাড়ির মধ্যে এ যেন নতুন একটা দ্বীপ। এ ঘরের পর্দা থেকে ড্রেসিং-টেবিল পর্যন্ত ঝকঝকে তকতকে। র‍্যাকের ওপর তাঁর পড়ার বইগুলি অতি যত্নে মলাটে মোড়া। একটি ফটো-স্ট্যাণ্ডে উজ্জ্বলার ইয়ার্নিং কালের ছবি। কবে যে ছবিটা তোলা হয়েছে তা তিনি জানেনও না। তাঁকে কেউ দেখানোর দরকারও মনে করে নি। কেনই বা দেখাবে? তাঁর সম্পর্ক তো শুধু বাইরের ঘর নিয়ে। ভেতরের খবর রাখার সময় কোথায়?

কিন্তু এখন ক্রমশঃ তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকছেন। ঘর চিনছেন—ঘরণীকে নতুন চোখে দেখছেন। এতকাল—হ্যাঁ, প্রখর যৌবনেও স্ত্রীকে শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবেই পেয়েছিলেন—স্ত্রী কন্যা এরা যেন ছিল সংসারযন্ত্রের এক-একটি বোতাম। বোতাম টিপলেই তারা কেউ আলমারি থেকে ধোওয়া কাপড় বের করে দিত, কেউ টেবিলে প্লেট সাজিয়ে দিত, অসুখে ওষুধ এনে দিত। ব্যস! স্ত্রী কন্যার সঙ্গে এই ছিল সম্পর্ক।

কিন্তু এখন ঘরের মধ্যে ঢুকে অধ্যাপক যেন নতুনত্বের আস্বাদ পাচ্ছেন। চন্দনাকে যেমন ভালো লাগছে তেমনি ভালো লাগছে উজ্জ্বলাকে, তেমনি ভালো লাগছে নির্ঝলাকে। স্ত্রীর নাম যে নির্ঝলা এ যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। কারণ নাম ধরে আর ডাকার অবসরই পেতেন না।

একদিন তিনি পরমোৎসাহে বললেন,

—নির্ঝল, বাড়িতে একটা 'ফাংশান' করা হোক। বাড়ির ক'জনই অংশ নেবে—বাড়ির ক'জনই শ্রোতা।

নির্ঝলা বললেন, তা মন্দ হয় না।

উজ্জ্বলা বললে, বেশ নতুনত্ব হয়। আমরাই করব, আমরাই শুনব।

—নির্ঝলা বললেন, তুই না হয় পিটার বাজাতে পারিস। কিন্তু আমাদের কি গুণ আছে?

—কেন মমুদা তো গান শিখছে। ও একটা গাইবে। তুমি ব্রহ্মসংগীত করবে—

—আমার যা গলা!

—তা হোক! অরোরা ফাংশান তো। আর বাবা—

অধ্যাপক বললেন, আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে পাঠ করে শোনাব। ব্যাস! হয়ে গেল। এই যথেষ্ট। বলে মেয়ের দিকে আরো কিছু প্রত্যাশায় তাকালেন।

উজ্জ্বলা বললে, হয়ে গেল! আর আমার বন্ধুটিকে বুঝি বাদ দেবে?

অধ্যাপক যেন প্রস্তাবটা সমর্থন করতে চাইলেন না। বললেন, চন্দনা? ওর আর কি পার্টস আছে শুধু ঘর আলো করে বসে থাকা ছাড়া?

উজ্জ্বলা বললে, সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি ওকে একটা আবৃত্তি শিখিয়ে দেব।

সেদিন ঘরোয়া অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। অধ্যাপকের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল—অনুষ্ঠান শেষে মেয়ে চা তৈরি করতে লাগল আর চন্দনা সেই চা নিজ হাতে পরিবেশন করল গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীকে। চা'টি যখন অধ্যাপকের হাতে তুলে দিল সেই সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে যে সলজ্জ হাসিটুকু চন্দনা উপহার দিয়েছিল অধ্যাপক তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এরপর অধ্যাপক আরো নতুন নতুন আনন্দের উপকরণ খুঁজতে লাগলেন। উপকরণ উপলক্ষ্য জুটতেও লাগল। বাড়িতে সকলেরই মনে এ এক নতুন আনন্দের জোয়ার। ছুটীর দিন এলেই সেটা যেন ছোটোখাটো উৎসবের দিন হয়ে ওঠে।

ঠিক হল সামনের রবিবার দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাবার। প্রস্তাব দিলেন নির্মলা। সবলেই খুশী।

অধ্যাপক বিগুণ উৎসাহে বলে উঠলেন,

—খুব ভালো। তা হলে একটা ক্যামেরা জোগাড় করা গেলে ভালো হত।

উজ্জ্বলা বললে, আমার বন্ধুর একটা ক্যামেরা আছে। দেখি যদি পাই।

অধ্যাপক চন্দনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তুমি অমন চুপচাপ? তুমি কিছু বলো।

চন্দনার মুখটা অমনি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মুখ নিচু করে অস্ফুট স্বরে বললে,

—আমি আর কি বলব। আপনারা যা করবেন আমি তাতেই আছি।

ক্যামেরা জোগাড় হল। এমনকি নির্মলা সেদিনের ভ্রমণটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে এবার লুচি মাংস, ফ্রাস্কে কফিও করে নিলেন।

বেলা একটায় রওনা হবার কথা। সবাই প্রস্তুত। কিন্তু চন্দনার দেখা নেই।

নির্দিষ্ট সময়ও যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখন উজ্জ্বলা বিচলিত হয়ে বললে, ওর আবার কি হল? কখনো তো এমন করে না।

এই বলে মায়ের দিকে তাকালো। নির্মলাও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে এবারকার প্রমোদ-ভ্রমণ তাঁরই পরিকল্পনা। জামাইকে এত কাছে ইতিপূর্বে তিনিও কখনো পান নি। তিনি দেখছেন এইসব বেড়ানো হৈ-চৈ করার উপলক্ষ্যে অধ্যাপক যেন ক্রমশঃ বয়সুখী হচ্ছেন। তাই এবারের ভ্রমণের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহটাই বেশি। তিনি অধৈর্য হয়ে বারে বারে ঘড়ি দেখছেন।

কিন্তু সবচেয়ে ব্যাকুল হয়েছেন যেন অধ্যাপক। তিনি কোন কথাই বলতে পারছেন না। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন পথের দিকে। শাড়ি পরা কোন মেয়ে দেখলেই তিনি চমকে উঠছেন—ওই বুঝি চন্দনা আসছে।

নির্মলা বললেন, আর বাপু দেরি করা যায় না, তুই একবার গিয়ে দেখ। কে জানে আবার সিন্‌হা সাহেব বাড়িতে আছেন কিনা।

কিন্তু উজ্জ্বলাকে যেতে হল না। সিন্‌হা সাহেবের ড্রাইভার পরদিন এসে সেলাম করে একটা খাম অধ্যাপকের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি খাম খুলে অধ্যাপক দেখলেন মিস্টার সিন্‌হার চিঠি। খুব তাড়াতাড়ি করে ইংরিজিতে লেখা কয়েক ছত্র। তার অর্থ—

এ বাড়ি আর ভালো লাগছে না। ভুবনেশ্বরে যাচ্ছি। ওখানে কিছুদিন থাকব। তারপর কোথায় যাব ঠিক নেই। এখনি রওনা হতে হবে। খুবই ব্যস্ত। মিসেস তাই যেতে পারলেন না। সাক্ষাতে বিদায় নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

চিঠিখানা হাতে হাতে ফিরল। ড্রাইভার কখন সেলাম করে বিদায় নিয়ে গেছে অধ্যাপকের তা খেয়াল নেই। চিঠিখানা তিনজনের পড়া হয়ে গেলে নির্মলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েটা কাছে কাছে ঘুরত—মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছিল। বাঁধন কেটে পালালো।

উজ্জ্বলা বললে, এখান যাবে। ওর স্বামীটা যা অত্যাচারী। বাড়িতে যখনই থাকে মদে চুর। এখানে পালিয়ে এসে মেয়েটা দুটো কথা কয়ে বাঁচত।

কিন্তু অধ্যাপক কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

নির্মলা বললেন,

ভেবে আর কী হবে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক নয়। চলো।

উজ্জ্বলা বললে,

একটা ট্যাক্সি নিতে হবে।

অধ্যাপক হঠাৎ নির্মলার দিকে ফিরে বললেন,

আজ আর নাই গেলাম।

বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠল।

অধ্যাপকের সেই জলে-ভেজা চোখ আর করুণ কণ্ঠস্বরে নির্মলা চমকে উঠলেন।

—যাবে না!

নির্বোধ অধ্যাপক নিজেকে গোপন করার প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। বললেন,

—ভালো লাগছে না। মনটা কেমন ভেঙে গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এখুনি এই রাস্তা দিয়ে মিস্টার সিন্‌হা চন্দনাকে নিয়ে চলে যাবে। কে জানে হয়তো গাড়ি থামিয়ে দেখা করতে আসবে—সে মুহূর্তটায় তিনি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারবেন না। তার চেয়ে বাড়ি না থাকাই ভালো। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন,

না। চলো যাই।

নির্মলা কঠিন কণ্ঠে বললেন,

—থাক্।

পিঞ্জর

সায়াবসু

কুসুমপুর ···কুসুম পু-উ-উ-র·····

অনভ্যস্ত কণ্ঠের বিচিত্র ধ্বনির চিৎকার শেষ হতে না হতেই বাসটা ঝড়ঝড় করতে করতে গাছের তলায় থামল। এক আঁজলা ধুলোর ঝাপ্‌টা গায়ে মেখে আরো কয়েকজন মানুষের সঙ্গে ছোট সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লেন দেবতোষবাবু। উস্কোখুস্কো চুল। রাতে ভালভাবে ঘুম না হবার ফলে ঈষৎ রক্তাভ চোখের কোলে কালির ছাপ। সুদীর্ঘ বাসজার্নিটা একেবারেই অনভ্যাসের ব্যাপার। তাই পরনের জামা-কাপড় শার্ট-খাওয়া কোঁচকানো, ময়লাও বটে। ওঁর দিকে ভাল করে তাকালেই মনে হয়, সম্ভ্রান্ত, ধনী অভিজাত সুখী মানুষটি হঠাৎ তাঁর কোন প্রিয়জনের ভয়ানক অসুখের অথবা ওই গোছেরই কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ অথবা বিপদসূচক টেলিগ্রাম পেয়ে চোখেমুখে জল না দিয়েই কাকভোরে কোনমতে বাসে উঠে বসেছেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এই চার ঘণ্টার পথ কোনক্রমে পেরিয়ে এসেছেন।

একমাত্র ব্যতিক্রম উনি ছাড়া বাদবাকী লোকগুলো এই গ্রামেরই। তারা চটপট নেমে যে যার মালপত্র হাতে নিয়ে পরিচিত গ্রামের পথ ধরল।

হতবুদ্ধির মত তাদের চলে যেতে দেখলেন দেবতোষবাবু। তারপর রৌদ্র ছায়াচ্ছন্ন অপরিচিত গ্রাম নির্জন পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

পথের দুপাশে জঙ্গল। গাছপালার সার। তার ভেতর দু'চারখানা ভাঙাচোরা খোলামকুচি। কুঁড়েঘর, বাঁশকঞ্চি দরমা দেওয়া মাটির ঘর। মাঝে মাঝে মলা-হাজা ডোবা। টলটলে জলের পুকুর। কর্ কর্ করে ঘুঘু ডাকছে। টক্ টক্ টক্ কাঠঠোক্রা। আরো অনেক পাখির অনেক রকম কিচ্‌কিচ্। ঘাসে জঙ্গলে ফুল ফুটে আছে। এপাশে ওপাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শাক তুলছে। বিস্মিত চোখে সব কিছু দেখতে দেখতে দেবতোষবাবু চলতে লাগলেন।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর দু'মুখো দুটো রাস্তার মোড়ে থমকে দাঁড়ালেন। একজন গ্রামের চলতি মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তপনের বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারেন?'

গ্রাম্য লোকটি ওঁর সম্ভ্রান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে সমীহভরে প্রশ্ন করল, 'তপন? কোন তপনের কথা বলছেন?'

দেবতোষবাবু বোকার মত ক্যালক্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'এখানে দুজন তপনবাবু আছেন। একজন ঘোষপাড়ায়, আর একজন ঠাকুর পাড়ায়। আপনি কোথায় যাবেন? কোন পাড়ায়?'

দেবতোষবাবু আরো বিমূঢ় হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

লোকটা ওঁর অবস্থা অনুমান করতে পারছিল। শহরে ভদ্রলোক। কখনো গ্রামে আসেননি বোঝাই যাচ্ছে। নতুন জায়গায়, তায় একটা অজ পাড়াগাঁয়ে এসে গোলমালে পড়ে গেছেন। বিব্রত হয়ে গেছেন।

সহৃদয়ভাবে সে আবার বলল, 'একজন তপন দত্ত, একজন তপন রক্ষিত, আপনি কার কাছে যাবেন?'

খুকী কাকে বিয়ে করেছিল? তপন দত্ত না রক্ষিতকে? কিছুই মনে পড়ছে না। পকেট হাতড়ে চিরকুট কাগজটা বার করলেন। কিন্তু নাঃ, কুসুমপুর—তপন ও খুকী—এছাড়া আর কিছুই লেখাতে লেখা নেই।

লোকটা ওর বিব্রত যেহ'ল অবস্থায় মনে মনে বিরক্ত বোধ করেছিল। একটু রেগেই বলল, 'আপনি কি আগে কখনো এখানে আসেন নি?'

'না তো!' সরলভাবে ঘাড় নাড়লেন দেবতোষবাবু।

'তপন আপনার কে হয়?

তপন তাঁর কে হয়, সেকথা মনে মনে চিন্তা করে তিনি উজ্জ্বল মুখে জবাব দিলেন, 'তপনের বৌ খুকী আমার—আমার মেয়ে হয়।'

হ্যাঁ মেয়েই বললেন। একদিন যার মুখ ইহজীবনে আর দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যে বাপ মা-মরা ভাগ্নিটিকে এতটুকু বেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেও একদিন বলেছিলেন, তুই দূর হয়ে যা—যেখানে ইচ্ছে যার সঙ্গে ইচ্ছে চলে যা, আমি জানব তুই মরে গেছিস। তোর জন্যে আমার মান সম্মান নষ্ট হয়ে গেছে। তুই আমার মুখে চুন কালি দিয়েছিস্। বামুন হয়ে অজ জাতে বিয়ে করতে যাচ্ছিস।

লোকটা ওঁর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা বুঝে নিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, 'বাঁদিকের রাস্তায় চলে যান। বড় একটা পুকুর দেখতে পাবেন। তার পাশেই ঘোষ পাড়ায় তপন দত্তের বাড়ি। সেটা যদি আপনার মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি না হয় তাহলে ঠাকুর পাড়ায় চলে যাবেন। তপন রক্ষিতের বাড়ি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, জামাইএর নাম ঠিকানাটাও জানেন না। আশ্চর্য!'

দেবতোষবাবুর গালে যেন একটা চড় কষিয়ে দিয়ে হন হন করে চলে গেল লোকটা।

অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। সত্যি কী ভাবল লোকটা? খুকীকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন অথচ তার স্বামীর নাম ধাম পরিচয় কিছুই জানেন না তিনি। কিছুই মনে থাকে না তার। মাঝে মাঝে মাথাটা শূন্য মনে হয়। সব কিছু গুলিয়ে যায়। কী যে হয়েছে তাঁর!

মাথাটা কেমন করে উঠল। সভয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। কেউ তাকে চিনে ফেলবে না তো? তাহলেই সর্বনাশ। খুকীকে সাবধান করে দিতে হবে। তোকে আমি কোলে পিঠে করে বাপের মতই মানুষ করেছি। আমি তোর বাপ ছাড়া আর কি? কেউ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করে আমি তোর কে, তাহলে তুই বলবি উনি আমার বাবা। মেয়েকে দেখতে এসেছেন।

হাতের সুটকেসটাকে কি ভেবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন দেবতোষবাবু। মুখের ওপর ভয় আর

আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। কেউ যেন তাঁকে তাড়া করেছে এমনভাবে তিনি জোরে জোরে পা ফেলে লোকটার নির্দেশমত পথে চলতে সুরু করলেন। ওই তো একটা মস্ত বড় পুকুর দেখা যাচ্ছে না?

বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হল না।

মামা তুমি! তুমি এখানে?'

চোখের সামনে যেন একটা অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে, এমন ভাবে চমকে উঠল খুকী অর্থাৎ সুনীলা। পুকুর থেকে সদ্যভরা জলের কলসীটা উথলে উঠে ওর কোমরের কাপড় ভিজিয়ে দিল।

'খুকী তুই! আঃ বাঁচলাম। ওইটে তোর বাড়ি বুঝি? বাঃ বেশ চমৎকার বাড়ি। মস্ত দালান কোঠায় সুখ নেইরে খুকী, কোন সুখ নেই। তুই যেটা উনিশ বছরে বুঝেছিলি সেটা ভাল করে বুঝতে আমার পঁয়ষট্টি বছর লেগেছে। কিন্তু তুই এত রোগা এত কালো হয়ে গেলি কেমন করে? অসুখ করেছিল বুঝি?'

তিরিশ বছরের খুকী অভিমান ভরে ছলছল চোখে জবাব দিল, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি এতকাল একটা খবরও তো নাওনি মামা? তা এখন কি করবে? বাড়ির ভেতর ঢুকবে? না বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাবে? বাড়ির ভেতর পা দেবে না।'

'বাইরে থেকে চলে যাব বলে তোর কাছে এতকাল পর আমি আসিনিরে খুকী।' দেবতোষবাবু বিষণ্ণ হলেন। 'সত্যি কথা বলতে কি, আজ আর আমার থাকবার জায়গা বলে কোথাও এতটুকু আশ্রয় নেই। তাই একবস্ত্রে তোর কাছেই পালিয়ে এসেছি। খুকি, আমি তোকে একদিন বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ তুই ইচ্ছে করলে আমাকে তাড়াতে পারিস। কিন্তু আমি জানি, তুই তা পারবিনা। তোর তো কোনদিনও টাকা পয়সার লোভ নেই। তুই মানুষের ভালবাসা আর হৃদয়টাকেই চিনেছিলি, তাই আড়াই হাজার টাকা মাইনের যে ছেলেটার সঙ্গে তোর বিয়ে আমি ঠিক করেছিলাম, অনায়াসে তাকে বাদ দিয়ে তুই তপনকে বিয়ে করেছিলি সকলের অমতে। খুকী তোর মনের জোর আছে। বুকের পাটা আছে। সেদিন আমি তোদের ওপর ভয়ানক অন্যায় করেছিলাম। বয়সে ছোট না হলে তোর পায়ের ধুলো নিতাম আমি আজ।'

'ওসব কথা থাক, তুমি আমার সঙ্গে এসো মামা।' সুনীলা ওকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর ধারের বাগান পেরিয়ে বাড়িমুখো চলতে লাগল। মামার প্রথম কথাটা শুনে ও এত বেশী হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, যে ওঁর পরের কথাগুলো ভাল করে ওর কানে পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ।

ভরা কলসীর জলকে আরো খানিকটা ছলকে পড়তে দিয়ে ও উদ্বেগ ব্যাকুল গলায় প্রশ্ন করল, 'মামা, তুমি—তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ? কেন? কী হয়েছিল?'

'কী হয়নি তাই বল? তুই আর কী জানবি। আর সত্যিইতো, তোর আর দোষ কি? এগারো বারো বছর না খোঁজ খবর, না মুখ দেখাদেখি। তুইও আমার ওপর রাগ করে চলে গেলি, আমিও তোর ওপর অভিমান করে চুপচাপ করে বসে রইলাম। তবু মনে মনে তোকে তারিফ করেছি খুকী, বলিহারী সাহস তোর। ভালবাসার মর্যাদা দেবার জন্যে কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছিলি তুই। না না—আমি ভুল বললাম। তুই নামিসনি। বরঞ্চ অনেক ওপরে উঠে গেছিস। আমার কাছে এক কানাকড়ি সাহায্য না নিয়ে তুই গরীব তপনকে বিয়ে করেছিলি। অথচ তোকেও তো আমি আমার ভাইপো-ভাইঝিদের মত বড়লোকি চালেই মানুষ করেছিলাম খুকী। তুই এককোঁটা মেয়ে হয়ে যা পেরেছিলি, তোর বাপের

বয়সী হয়ে আমি তা পারিনি। পারিনি বলেই আজ আমার এই দুর্দশা। খুকী, দারিদ্র্য মানুষকে মহৎ করে। টাকা পয়সার প্রতি তোর মতন ঘৃণা আর নিস্পৃহতার ষোল আনার এক আনাও যদি আমাদের দেশের কোটিপতি ব্যবসাদার, বড়লোকদের থাকত, তাহলে দেশে এত দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তর হত না। মানুষ না খেয়ে মরত না।'

দেবতোষবাবুর মুখের রেখাগুলো তাজাচোরা দেখাল। হঠাৎ তিনি চুপ করে কি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন।

সুনীলা আর কোন প্রশ্ন করল না। যখন নিজের থেকেই উনি এত বছর বাদে সুনীলার কাছে এসেছেন, তখন তাঁর সব কথাই, সব খবরই যথাসময়ে জানতে পারবে সুনীলা। কিন্তু তার খবর যাতে মামাবাবু বিন্দু মাত্রও টের না পান, তার ব্যবস্থা তাকে এই মুহূর্তেই করতে হবে। মামাবাবুর চোখে ধুলো দেওয়া সুনীলার পক্ষে কঠিন হবে না।

কিন্তু তপন আর ছেলেমেয়েদের কথা মনে হতেই—সুনীলার বুকের মধ্যে শুকিয়ে এলো।

বাড়ি ঢুকে মামাবাবুকে বারান্দার পাতা চেয়ারটায় বসিয়ে সাড়ে আট বছরের মেয়েটাকে বাক্স থেকে একটা তোলা ফ্রক বার করে দিতেই তার আর্ধেক কাজ সারা হয়ে গেল। দাদু এসেছেন। টুনু যেন সভ্যভব্য হয়ে থাকে। ছোট ভাইটাকে সামলে রাখে। তার সঙ্গে যেন ঝগড়া মারামারি না করে। দাদুর ফাই ফরমাস, ছোটখাট কাজগুলো যেন টুনু লক্ষ্মী মেয়ের মত করে দেয়।

মেয়েকে আর দ্বিতীয় কথা বলতে হল না। তোলা ফ্রকটা পেয়েই সে মহা খুশী। তাকে সঙ্গে নিয়ে সুনীলা চটপট ঘরদোর পরিষ্কার করল। বসবার ঘরটার খাটের বিছানার চাদর পালটালো। বাক্স থেকে সযত্নে তুলে রাখা বেত-কভার টেবিলক্লথ্ বার করে বিছানা ঢাকল। হং-চটা পুরোনো টেবিল চেয়ার ঢাকল। দুটো ফুলদানি পরিষ্কার করে বাগান থেকে চারটি ফুল তুলে এনে রাখতেও ভুলল না। যতদূর সম্ভব মামাবাবুর অঙ্গে শ্রীহীন ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য করে তুলল সাধ্যমত।

কিন্তু শুধু ঘরখানার শ্রী ফেরালেই তো আর সারা বাড়িখানার চেহারা ফেরানো যাবে না। বারান্দায় বসে কি আর মামাবাবু সুনীলার হাড় পাঁজরা বারকরা বাড়ি ঘরদোরের চেহারা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না? পাঁচীলগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। উঠোনময় শাকসবজি আর গাছপালার জঙ্গল। বাঁশের চরমার বেড়া আর মাটির দাওয়ার রান্নাঘর। সিমেন্ট-ওঠা ঘর বারান্দার মেঝে। যেদিকে তাকাও, অভাব অনটন, দুঃখ দুর্দশার ছবি। কোনদিক সামলাবে সুনীলা?

আর সামলাবেই বা কেন? পরীব জেনেই তো তপনকে ও বিয়ে করেছিল। মনে মনে অবশ্য আশা ছিল, মামাবাবু এ বিয়ে মেনে নেবেন। তাকে একেবারে বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু মামাবাবু একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। তাঁর আড়াই হাজারী মনোনীত পাত্রটিকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায়—বামুনের মেয়ে হয়ে কায়স্থকে—

কিন্তু থাক এখন সেসব চিন্তা। হঠাৎ এতকাল পর মামাবাবু এখানে কেন এসেছেন? তাঁর ভাইপোরা, বৌরা, তাদের ছেলেমেয়েরা সব কোথায়? কদিনের জন্যেই বা এসেছেন? নিজে না হয় উনি বিয়েই করেননি, কিন্তু ভাইয়ের ছেলেদুটিকে তো নিজের ছেলের মতই মানুষ করে নিজের ব্যবসা কারবার—সিধিয়ে পড়িয়ে লায়েক করে তুলেছেন। তাদের বিয়ে দিয়েছেন। তাদের নিয়েই সংসার

করছেন। এই এগারো বছর বাদে হঠাৎ সুনীলাকে মনে পড়ার কারণ কি? কদিন থাকবেন উনি এখানে? যে কদিনই থাকুন না কেন, সুনীলার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে,—শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছু যেন ওঁর নজরে না পড়ে।

সংসারের কাজ করতে করতে বুক ধড়ফড় করে উঠল সুনীলার। তপনের কথা চিন্তা করে। সুনীলার আর কি পরিবর্তন দেখলেন মামাবাবু? তাঁর সমস্ত স্নেহ মমতা ভালবাসা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে, ধন সম্পত্তি বিলাস ঐশ্বর্য্যের সমস্ত লোভ মোহ ত্যাগ করে, যে তপনের হাত ধরে একদিন মামাবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সুনীলা, তাকে যখন দেখবেন, তাদের কুৎসিত কলহ যখন শুনবেন, অভাবের সংসারের সবকিছু অশান্তির খবর যখন জানতে পারবেন তখন কী হবে সুনীলার? সে লজ্জা, সে অপমান কী দিয়ে কেমন করে ঢাকবে সুনীলা?

'তোমার পাগল বলে—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে রাতদিন তোমাকে বাড়িতে আটকে

হতবুদ্ধির মত দেবতোষের মুখের দিকে তাকাল সুনীলা।

'সত্যি যে খুকী। অফিসে কাজ করতে করতে একদিন মাথা ঘুরে অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললেন, হাই প্রেসারের জন্যে। সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক দুটোই নাকি খুব বেড়ে গিয়েছিল সে সময়। তারপরই ভাইপো দুটো আমাকে ধরবন্দি করল। ভাইপোবৌরা বাইরের লোকেদের কাছে বলে বেড়াতে লাগল আমার নাকি মাথায় দোষ হয়েছে। আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। অবিশ্যি মাঝে মাঝে আমার মাথাটা কেমন করে। সব ভুলে যাই। এই ধর না, যেমন তপনের উপাধিটার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম তোর বাড়িতে আসবার আগে। কিন্তু সত্যি বলছি খুকী, তুই বিশ্বাস কর আমি পাগল নই।' করুণ, কাতর মুখে দেবতোষবাবু সুনীলার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

সুনীলা স্তব্ধ হয়ে দেবতোষের কথা শুনছিল, তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'না-না মামাবাবু, তুমি পাগল হতে যাবে কোন দুঃখে!'

'তুই তো জানিস, বড়দা চিরটাকাল কোন কাজকর্ম করেন নি। আমি ওঁর সংসার প্রতিপালন করেছি। ওঁর ছেলেদের মানুষ করেছি। তুই আমার গরীব বোনের মেয়ে ছিলি, ওরাও আমার বেকার দাদার ছেলে ছিল। অথচ তফাতটা দেখ। তোর যেমন অর্থের ওপর ঘেন্না, অনাসক্তি, আমার ভাইপোদের আবার তেমনি লোভ আর আসক্তি খুকী, টাকার জন্যে মানুষ মানুষ খুন করে! কী না করতে পারে মানুষ টাকার লোভে? তুই তপনের জন্যে টাকাকড়ি বাড়ি গাড়ি সব ছাড়তে পেরেছিলি, আর ওরা? আমাকে পাগল বানিয়ে আমার কারখানা বিষয় সম্পত্তি সব মুঠোয় পুরেছে। তাতেও ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। এবার আমাকে ওরা সবাই মিলে মেন্টাল হাসপাতালে পাঠাতে চায়। পাগলা গারদে।'

'মেন্টাল হাসপাতাল! পাগলা গারদে?' সুনীলা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'হ্যাঁরে খুকী তাই। ওই মতলব করেছে প্রমথ সুমথরা। একবার আমাকে পাগল বলে প্রমাণ করতে পারলে আমার সর্বস্ব ওরা গ্রাস করতে পারবে। ওই যাঃ, আমার সুটকেসটা কোথায় গেল? খুকী, ভাল করে তুলে রেখেছিস তো ওটা! ওর মধ্যে আমার···চাবি কই? অ্যাঁ, চাবিটা কোথায় ফেললাম? খুকী, শিগ্‌গীর চাবিটা খুঁজে দে, জাখ্ জাখ্, এমন ভুলো মন হয়েছে আমার আজকাল!'

চেয়ার ছেড়ে পাগলের মতই দেবতোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পকেট হাতড়াতে লাগলেন। এদিক ওদিকে দেখতে লাগলেন। 'কই কোথাও নেই তো? কী হবে বুঝী? চাবিটা কি বালের মধ্যে পড়ে গেল, না কি বাড়িতেই ফেলে রেখে এলাম? কী হবে তাহলে এখন?'

সুনীলা তাড়াতাড়ি ওঁকে আশ্বস্ত করল; 'এখনই চাবি তোমার কি হবে মামাবাবু? ওঁর একখানা ঘুড়ী তোমায় বার করে পরতে দেবখন। এটা তো তোমার কলকাতা শহর নয়। অজ পাড়াগাঁ। কোথায় বা যেতে? তার চেয়ে বরং তুমি টুনুর আর খোকনের সঙ্গে একটু গল্প-টল্প কর মামা, আমি তোমার স্নান খাবার বন্দোবস্ত করিগে।'

তপন সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরল রাত আটটায়। ক্লান্ত শরীরে তিরিক্ষি মেজাজে।

ছেলেমেয়েদের অনেকদিনপর দু'বেলাই ভালমন্দ খাওয়ানো হয়েছে। সুনীলার দু'চারটে লুকোনো টাকা মামার জন্যে শেষ হয়ে গেছে। তপন ফিরে এলে যে কি হবে সেই ভাবনায় তার মেজাজটাও ভাল নেই। টুনুকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল। বাবাকে দেখেই ও ছুটে গিয়ে সব খবর শুনিয়ে আগিয়ে সাবধান করে দিয়ে এলো। দাদু এসেছেন। মায়ের সেই মামাবাবু। বাবা যেন বাড়ি গিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে, চিৎকার না করে।

সঙ্গে সঙ্গে তপনের মেজাজ আর এক ডিগ্রি চড়ল। বেশ শব্দ করেই দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ি ঢুকল। দেবতোষবাবু তখন সুনীলার ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে নিয়ে সুনীলার সাজানো গোছানো ঘরখানায় শুয়ে তাকে গল্প বলে খুব পাড়াচ্ছিলেন। তপনের জুতোর শব্দ তাঁর কানে পৌঁছল না।

সুনীলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মুখোমুখি হতে তপনই আগে তীর ছুঁড়ল, 'বুড়োটা এলো কখন?'

তপনের হাত ধরে শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চাপা গলায় সুনীলা জবাব দিল, 'এই ঘেলা দশটায় বাসে।'

'কি করতে এসেছে এখানে? এত বছর বাদে?'

মামাবাবু কি করতে যে এখানে এসেছেন, সেকথা সঠিক জানা না থাকায় সুনীলা চুপ করে রইল।

'ঘুর ঘুর করে একদিন তোমাকে কুকুর বেড়ালের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে বলে। এতদিন আমরা মরে গেছি কি বেঁচে আছি, একখানা পোষ্টকার্ড দিয়েও সে খবর নেয়নি ওই বদমাস বুড়োটা। আজ এগারো বছর বাদে কি জন্যে এসেছে? আমাদের দুর্দশা দেখতে?

হিংস্রভাবে ঘামে ভেজা শার্টটাকে একটানে খুলে আলনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল তপন।

'আঃ! দয়া করে আজকের মত একটু নীচু গলায় কথা বল।' সুনীলা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ফিসফিস করে উঠল। 'মজা দেখতেই বা আসবেন কেন? হাজার হোক নিজের মায়ের পেটের বোনের মেয়ে। যে বোন তিরিশোত মামা যাবার পর তাদের মেয়েটাকে উনি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, সেই ভাগ্নী—'

'বোনের মেয়ে! ভাগ্নী!' ঘৃণিতভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো যেন সুনীলার মুখের ওপর ছুড়ে মারল তপন। 'তুমি তোমার বড়লোক মামাকে দেখে সব অপমান ভুলে যেতে পার, গলে জল হয়ে যেতে পার, কিন্তু আমি সেদিনকার একটা কথাও ভুলিনি। আমি শিক্ষিত সচ্চরিত্র, ভাল বংশের ছেলে, কিন্তু শুধু গরীব বলে সেদিন কী অপমানটাই না উনি আমাকে করেছিলেন। বেকার ছোকরা। সেদিনের

লোকার! ঘর নেই দোর নেই—চাকরি নেই—বড়লোক আত্মীয়-স্বজন নেই, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। সেদিন যদি উনি আমাদের সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার না করতেন, তবে আজ আমাদের এমন দুর্দশা হত না। কলকাতা সহর ছেড়ে এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হত না। ভাগনি! বোনের মেয়ে! দয়া কত! কই, সেদিন তো মা-বাপ-মরা, মেয়ের মত মানুষকরা ভাগীকে অমনভাবে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু বাধে নি? শোন সুনীলা, তোমার বড়লোক মামাটিকে আদর যত্ন করে আজকের দিনটা রেখেছ ভালই করেছ, কিন্তু কাল আমি ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাবার পর তুমি ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিও। ওই বুড়োর মুখদর্শন যেন আমাকে করতে না হয় বাড়ি ফিরে এসে।'

সুনীলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কেন রাগ করছো? উনি এখানে থাকবেন বলে তো আসেন নি। কাল পরশুই চলে যাবেন। বড়লোক মানুষ, এখানে থাকতেই পারবেন না। আজই না হয় ধারকর্জ করে এটা ওটা খাওয়ালাম, কিন্তু রোজ তো পারব না। বেশতিক বুঝে উনি নিজেই চলে যাবেন, আমাকে আর কষ্ট করে ওঁকে তাড়াতে হবে না।

সুনীলার কথা কিন্তু ঠিক ফলল না।

কাল-পরশু তরশু এমন করে পর পর সাত আট দিন কেটে গেল। দেবতোষবাবু নির্বিকার। তাঁর যে এখানে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে একথা একেবারেই মনে হলনা। বরং মহানন্দেই আছেন তিনি। সুনীলার ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে গল্পগুজব করে, খেলাধুলো করে বাগানে পুকুরের ধারে বেড়িয়ে দিব্যি তাঁর সময় কেটে যাচ্ছে। ও যে কেমন করে রান্নাঘরে হাঁড়ী চড়াচ্ছে, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করছে, সে বিষয়ে কোন চিন্তাই ওঁর নেই। বরং ওঁর প্রসন্ন সদা আনন্দিত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এখানেই উনি ওঁর বাকীবাকী জীবনটা কাটাবেন বলে স্থির করেছেন।

তপন আড়ালে আড়ালে রেগে আগুন হয়ে কাল কাটছে সুনীলার ওপর। আর সুনীলা নিরুপায় ক্রোধে দুঃখে জলে পুড়ে মরছে। না পারছে মামাবাবুকে চলে যেতে বলতে। না পারছে তপনকে শান্ত রাখতে।

'পকেটে গোটা পঞ্চাশ টাকা ছাড়া আর কিছুই আনেননি? সুটকেসটাতে যে কিছু নেই বোঝাই যাচ্ছে। মালকড়ি থাকলে চাবিটাকে কেউ অসাবধানে হারায় না। যেমন কর্ম তেমন ফল হয়েছে। বুড়োটাকে পাগল বানিয়ে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হাতিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে শালারা।'

দাঁত কিড়মিড় করে তপন প্রত্যেকদিন। অবশ্য দেবতোষবাবুর অসাক্ষাতেই। 'নিজেরা খেতে পাই না, দুবেলা বুড়োটাকে ভাতের থালা ধরে দাও এ কি অশান্তি! দোকানে ধার বাজারে ধার, ধারের ওপর ধার হচ্ছে বুড়োটার জন্যে। এতটুকু লজ্জাশরম থাকলে দূর করে তাড়িয়ে-দেয়া ভাগ্নির বাড়ি এসে ওঠে? ওর ব্যবহারেই ওর ভাইপো ভাইপোবৌরা ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে একথা বেশ বুঝতে পারছি।'

একদিন দুদিন নয়। পরপর কদিন ধরেই সুনীলার দুটো কান পুড়িয়ে দিচ্ছে তপন। সুনীলাও আর তোড়াতালি দিয়ে কোনমতেই ভদ্রতার সূক্ষ্ম আবরণটুকু রাখতে পারছে না। দুটোদিক—মামা আর স্বামীকে সামলাতে সে প্রাণান্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ফুটো সংসার।

দেবতোষবাবুর কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। 'তোদের গ্রামটা চমৎকার রে খুকী। আর তোর বাড়িটা কী সুন্দর! যেন তপোবন। রাস্তাঘাট কী শান্ত। গাড়ি ঘোড়া নেই। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। কাপড়

আমার দরকার নেই। একখানা কাপড় দুপাট করে সুদির মতন করে পরেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে। বেশ আছি আমি। মাথার যন্ত্রণাটা আর হয় না। পাগল যদি হয়ে গিয়েও থাকি, তোর বাড়িতে কটাদিন এসে আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি। শুধু মাঝে মাঝে সবকথা ভুলে যাই। তবে একটু পরেই আবার মনে পড়ে।'

সুনীলা সুযোগ পেয়ে অবুঝ শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে, 'মামা, এখানে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এবার তুমি বাড়ি যাও। মামীমা সব ভাবছেন হয়তো।'

দুচোখ কপালে তোলেন দেবতোষবাবু; 'বলিস কি রে? আঁ? বাড়ি যাবার উপায় আছে? হেটাল হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে না তাহলে? না-না ওকথা তুই বলিসনি খুকী, আমি তোর এখানেই থাকব। এখানে আমি বেশ আছি। বেশ আছি।'

উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, মাঝে মাঝে সব ভুলে যাওয়া, সুটকেস, চাবি সম্বন্ধে একেবারে নীরবতা, তপনের এখানা ছুটি পরেই কদিন কাটানো সবকিছু মিলিয়ে ওঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সুনীলার একটু সন্দেহ হয়েছিল। তপনতো ওঁকে পুরোপুরি পাগল বলেই ধরে রেখেছে। এভাবে পালিয়ে আসার আর কি মানে হয়? অমন বাড়ি, গাড়ি, অতগুলো কি-চাকর, অতবড় কারবার, দোকজনদের হুকুম করাটাই যাঁর চিরদিনের অভ্যেস, তিনি আজ সুনীলার মাটির দাওয়ায় বসে শাকচচ্চড়ি ভাত দিয়ে মোটাচালের ভাত খাচ্ছেন। সুনীলার শাকসব্জির ফুলবাগানে জল দিচ্ছেন! ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না আছে পায়ে জুতো, না ভাল পোষাক-আশাক। স্নান করার পর চুল আঁচড়াতেও ভুলে যান। সত্যি সত্যি কি মামাবাবুর মাথার দোষ হয়েছে না কি? এমন তো ছিলেন না?

'খবরদার খুকী, তুই যেন বাড়িতে চিঠি-টিঠি লিখে দিসনি, তপনকেও বারণ করে দিস। না-না তোরা দুজনে তেমন ছোট কাজ কখনো করবি না এ বিশ্বাস আমার আছে। খবর পেলেই ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কেমন ঘুম করেছি আমি ওদের বল তো? ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, আমি তোর এখানে এসে উঠেছি।'

মাথা খারাপ—সত্যিই মাথা খারাপ! সুনীলা মনে মনে ভাবল। মাথাটা পরিষ্কার হলে সুনীলাদের অবস্থাটা ওঁর নজরে পড়তো, ওঁর মনে হতো এটা ওটা সেটা কেনাকাটায়, দাদা বাড়ায় খরচ হচ্ছে এটা চোখে পড়তো। সুনীলার পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়ী, চালাচোরা ঘরদোরের অবস্থা সব মিলিয়ে ওদের এই দারিদ্র্য দশা সম্বন্ধে একেবারে উনি নির্বিকার হয়ে থাকতে পারতেন না। অথচ এই নিদারুণ ভয়টাই প্রথমে করেছিল সুনীলা।

পরদিন সকালে অফিস যাবার সময় খরচ-টাকাকড়ি ইত্যাদির ব্যাপার নিয়ে বেশ খানিকটা চেঁচামেচি করে গেল তপন সুনীলার সঙ্গে। ও বেরিয়ে যেতেই দেবতোষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে খুকী, তপন এত রাগারাগি করছিল কেন রে? তোর সঙ্গে?'

সুনীলা বুঝতে পারল, কানে গেলেও, ঝগড়াটা যে ওঁকে নিয়েই—একথাটা মামাবাবুর মাথায় ভাল করে ঢোকেনি। ম্লান হেসে বলল, 'ও কিছু নয় মামাবাবু, আমাদের ঝগড়ায় তুমি কান দিওনা।'

'তা বেশ বেশ। কথায় বলে হাসতা কলহ। তোরা বেশ সুখেই আছিস খুকী। তোদের সুখেই আমার সুখ।'

দেবতোষবাবু খেয়ালের বশে আপন মনেই বক্ বক্ করতে লাগলেন। সুনীলার মেজাজ চড়েই ছিল, হঠাৎ সে, তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুমি কবে এখান থেকে যাবে মামাবাবু?'

'আমি! যাব! কোথায় যাব?' দেবতোষবাবু যেন সুনীলার কথার অর্থটা একেবারে বুঝতে পারেননি, এমন ভাবে উল্টে ওকেই প্রশ্ন করলেন।

'কোথায় আবার যাবে? তোমার বাড়ি। কলকাতায়। মেয়ের বাড়ি লোকে কদিন থাকে?'

'বারে মেয়ে কি পর নাকি? বন্ধুনি দিয়ে দেখছি তোর মাথাটা তপন একেবারে খারাপ করে দিয়ে গেছে।' দেবতোষবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। 'তুই তপনের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাগ করে আমাকে চলে যেতে বললেই আমি চলে যাব! আমি কি তোর মত পাগল? না আমার মাথা খারাপ?'

সেই দিনই একেবারে অসময়, ভর দুপুরে তপন চোরের মত বাড়ি ঢুকল। বাইরের ঘরে দেবতোষবাবু ঘুমোচ্ছেন। মেয়ে স্কুলে। ছেলেটা দেবতোষবাবুর কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সুনীলাও সবেমাত্র সংসারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে বিছানার ওপর। অসময়ে স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। 'কি ব্যাপার? অফিস ছুটি হয়ে গেল বুঝি?'

সন্তর্পণে দরজার খিল তুলে দিয়ে তপন সুনীলার পাশে বসে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাপার অফিস ছুটি হয়নি। এই কাগজটা পড়ে দেখ, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।'

হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখা খবরের কাগজখানা সুনীলার চোখের সামনে খুলে ধরল তপন।

এক পলক তাকিয়েই চিনতে পারল সুনীলা। কিছুটা ঝাপ্‌সা হলেও ফোটোটা দেবতোষেরই। মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে বামুলি বিজ্ঞাপন।—"নিখোঁজ, দেবতোষ চক্রবর্তী। বয়স বাষট্টি। বিকৃত মস্তিষ্ক। সঠিক খবর দিতে পারলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

'কী সর্বনাশ! মামাবাবু তাহলে সত্যি সত্যি পাগল? বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন?' সুনীলা আঁৎকে উঠল।

'কার যা সর্বনাশ কার বা পোষ মাস!' জলজলে চোখে তপন বলল, 'যাক ভগবান এদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন! হাজার টাকা পাইয়ে দিলেন! একেই বলে কপাল।'

'তার মানে?' একটা বিশ্রী সন্দেহে সুনীলার মুখ সাদা হয়ে গেল।

অনেকদিন পর ওর গা ঘেঁষে বসে, ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওকে প্রাণভরে আদর করতে করতে তপন গদগদ গলায় বলল, 'বোকাটা। তার মানে ওই হাজার টাকাটায় আমাদের কপাল ফিরে যাবে, বুঝলে খুকুমণি? পাঁচশো টাকা ম্যানেজারবাবুকে দিতে পারলেই সামনের মাস থেকে ষষ্ঠীশ্বরবাবুর খালি পোস্টটায় আমি চলে যেতে পারব। আর শ'খানেক টাকা এদিক ওদিক করতে পারলে আমার প্রমোশন আটকায় কে? মাইনে প্রায় ডবল হয়ে যাবে। এখন যা আছে তার চেয়ে।'

'না—না—ছিঃ! তুমি কি ভেবেছ…'

সুনীলা ওর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে সরে বসতেই তপন আবার ওকে জোর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। 'খুকী, তুমি কি ভাবছো, আমি বুঝতে পারছি। তোমার মামাবাবু পাগলের খেয়ালে আজ এখানে পালিয়ে এসেছেন। হঠাৎ ভাল না লাগলে কালই আবার এ বাড়ি ছেড়ে আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও

পালিয়ে চলে যাবেন। তাতে ওঁর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, আমাদেরই হবে। আর একথাটাও তুমি ভেবে দেখ, সত্যি যদি উনি অসুস্থ হন, ওঁর এখন উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। এমন ভাবে বিনা চিকিৎসায় শাক ভাত খাইয়ে ওঁকে এখানে ফেলে রাখা কি আমাদের উচিত হবে?'

সুনীলা নিরুত্তর।

তপন বলতে লাগল, 'তারপরও কথা আছে। এখানে তুমি ওঁকে আট দিনের জায়গায় দশ দিনই না হয় লুকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু তারপর? কাগজে কাগজে ওঁর ছবি বেরিয়েছে। গ্রামের দু'চারজন এর মধ্যেই আমাকে ওঁর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে। আর খবরের কাগজ সকলেই পড়ে আজকাল। আমাদের রোকামির জন্যে অন্য কেউ মামাবাবুকে ধরিয়ে দিয়ে টাকাটা মেরে দিক, এটা তুমি নিশ্চয় চাও না সুনীলা? বল, চাও কি? ধরা ওঁকে পড়তেই হবে। হয় আজ নয় কাল।'

'তা বলে মামাবাবুকে ধরিয়ে দেবে?' সুনীলার গলার জোরটা, মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা হঠাৎ বদ্ধে গেল।

'আমরা না দিলে অন্য কেউ দেবেই। করকরে হাজারটা টাকা মেরে দেবে। তাতে আমাদেরও লাভ হবে না, মামাবাবুরও কোন লাভ হবে না। শোন, আমি এখনি কলকাতা যাচ্ছি। তুমি আজ কোন মতেই মামাবাবুকে বাড়ি থেকে বার হতে দেবে না। দরজা বন্ধ করে ওঁকে চোখে চোখে রেখ। বলা যায় না, যা কপাল আমাদের; ঘাটে এসে নৌকা না জলডুবি হয়।'

টুকিটাকি এটা ওটা জিনিষপত্র নিয়ে তপন সাবধানে বাইরে এলো। সুনীলাও সঙ্গে সঙ্গে এলো। চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'যা বললে সত্যি? ঘুষ-টুষ দিলে প্রমোশন হবে? মাইনে বাড়বে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যতীশ্বরবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। ওঁর পোস্টটা আমি পাব। তবে—বুঝতেই পারছো কমপিটিশন্ আছে, রেষারেষি আছে। ম্যানেজারকে ভাল করে অয়েলিং করতে পারলে…'

'কখন ফিরে আসবে?'

'আজ রাত্রেই। তুমি মন খারাপ কর না। মামাবাবু কোনদিনও জানতে পারবেন না যে টাকার লোভে আমরাই ওঁকে ধরিয়ে দিয়েছি। আর হাজার টাকা ছাড়াও আরো কিছু বেশী আদায় করব। এই আট দশদিনে কত খরচ হল ওঁর পেছনে? সে টাকাটা অবশ্য পুরো তুমিই পাবে।'

সুনীলার গালটা আরো একবার টিপে রক্তের মত বাস স্টপের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল তপন লম্বা লম্বা পা ফেলে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রিপথানাকে একটু দাঁড়করিয়ে, লোক দুটোকে বারান্দায় রেখে দেবতোষের বন্ধু ভাইপো প্রথম ঘরে ঢুকল। সুনীলা আর তপনের সঙ্গে কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েছিল।

সুনীলা তক্তপোষের তলা থেকে দেবতোষের সুটকেসটা বার করে তার হাতে দিয়ে বলল, 'শুধু এই সুটকেসটাই হাতে করে এনেছিলেন উনি। তাও আবার চাবিটা আনতে ভুলে গেছেন। না কি কোথাও হারিয়ে ফেলেছেন কে জানে? যা ভুলো মন ওঁর। যেমন অবস্থায় এনেছিলেন, তেমন ভাবেই ওটা পড়ে আছে। খোলা হয়নি। দরকারও হয়নি।'

'চাবিটা আমার কাছেই আছে। কাকাবাবুর ঘরেই পড়ে ছিল। খুকী, তুই আয় তপন আমাদের

কী উপকারটাই না করলি ভাই! কাকাবাবুর জন্যেই তোদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা খারাপ হয়েছিল। এতদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। সে দোষ আমাদের নয়।'

'মামাবাবুই আমার নিজে থেকে আমার কাছে এসে সব কিছু মিটমাট করে দিলেন।' সুনীলা মৃদুস্বরে জবাব দিল।

'আমি তপনকে বলেছি, কাকাবাবুর কারখানাতেই ওর একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। এই অত পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। আর কাকাবাবুর জন্যে তোদের যা খরচ হয়েছে, তার জন্যে কিছু ভাবিসনি। আমি থাকতে তোদের কোন ভাবনা নেই। মামাবাবুকে নিয়ে তোরা আয়, আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি।'

সুটকেসটা শক্ত করে ধরে প্রমথ ফিপের দিকে চলে গেল।

সেই মলিন ধুতি, সার্ট প্রমথবাবুর সেই পোষাক-পরা দেবতোষবাবু সুনীলাকে কাছে ডেকে বললেন, 'কাঁদিসনি, চোখ থেকে আঁচল সরা। তোদের দোষ কি বল? ওরা যে আমার ছবি কাগজে ছেপে আমায় খুঁজে বার করবে, এটা মাথায় আসেনি। শোন, তোর বিয়েতে আমি কিছু দিইনি। আমার নিজস্ব দশ হাজার টাকা তোকে যে সুটকেসটা আমি দিয়েছি তার মধ্যে এনেছি। একশো টাকার একশোখানা নোট। এ কদিন একেবারে মনে ছিল না টাকার কথা। প্রমথকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সবকথা মনে পড়ে গেল। সেটা তুই আর তপন নিস। সুটকেসটার টাকার কথা যেন প্রমথদের কাউকে বলিসনি। টাকার ওদের ভীষণ লোভ। তোদের মত নয় ওরা। চাবিটা যে কোথায়...'

'সুটকেসে টাকা ছিল! দশ হাজার টাকা। চোখের জল শুকিয়ে গেল। সুনীলার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। 'কী বলছো তুমি মামা?'

'হ্যাঁরে। এখানে আসার আগের দিন ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলাম টের পেয়েই ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে, বুঝলি না? নইলে আমি ছবি বাঁচি আর তাড়িয়ে পালিয়ে ঘাট বয়েই গেল ওদের

দেবতোষবাবুর কথা শেষ হবার আগেই, বারান্দায় দাঁড়ানো খাকিমার্কা চেহারার লোকদুটো ওঁর দুপাশে এসে দাঁড়াল। 'এবার চলুন, অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

পরিবার কল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা

এখনই আর সন্তান নয়

তিনটির পর একদম নয়

যে কোন নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পঃ বঃ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

Advt. No. 161/70

পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস
ভালবাসা
আশাপূর্ণা দেবী

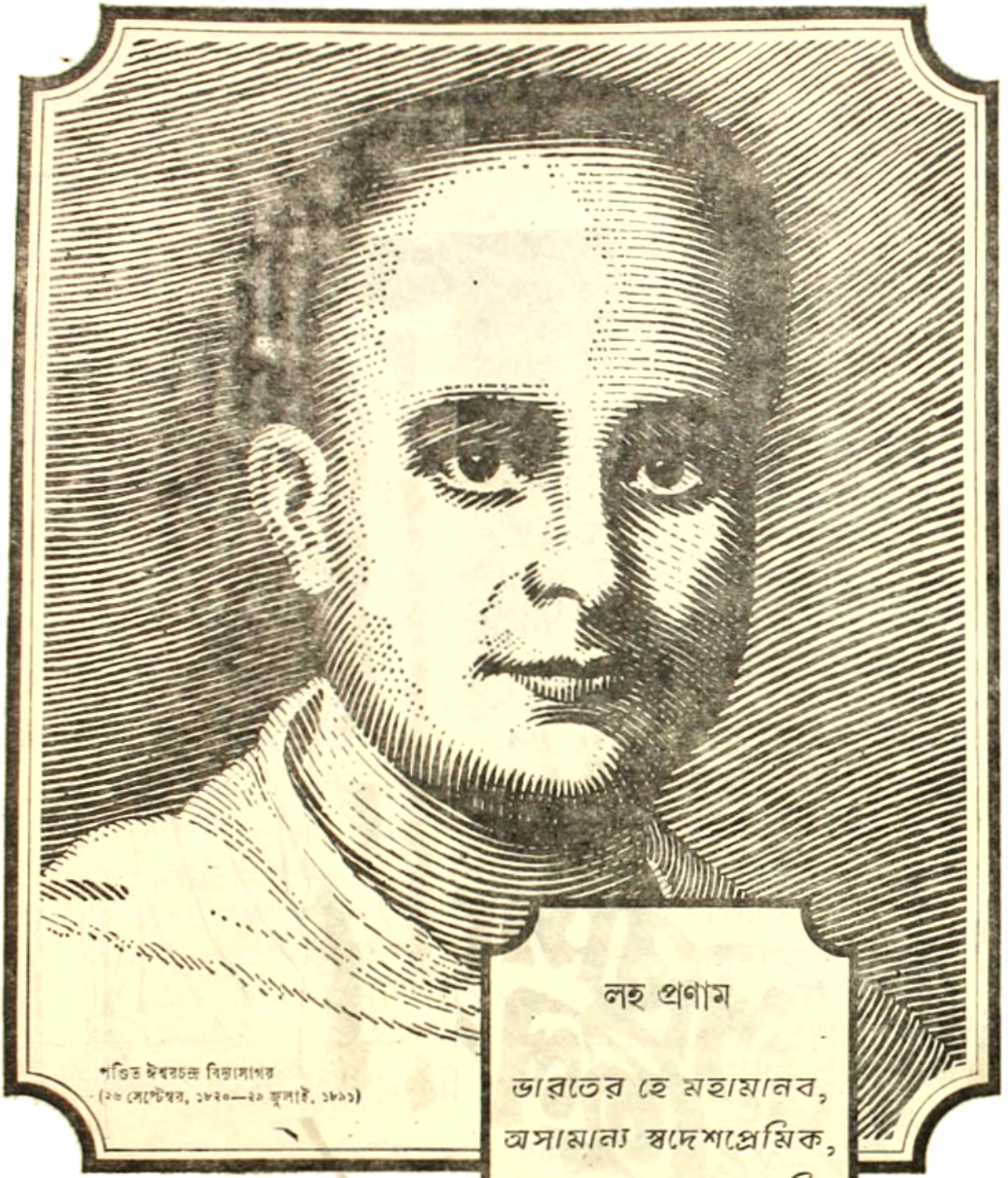

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০—২৯ জুলাই, ১৮৯১)

লহ প্রণাম

ভারতের হে মহামানব,
অসামান্য স্বদেশপ্রেমিক,
অজ্ঞতার অন্ধতার অরি,
সংগ্রামে অকুতোভয়,
হে মহান্ মানবপূজারী।

মডার্ন আর্ট সিন্ডিকেট ১২, বিপিন পাল, কলিকাতা-১

বাড়ির সমস্ত আলো নেভানো হয়ে গিয়েছিল, শুধু বাইরের গেটের আলোটা জ্বলছিল ঝলমল করে। আর হয়তো অনন্তর শোবার ঘরের মৃদু নীল আলোটা জ্বলছে, বড়ো আলোটা নিভোনোর পর সারারাত যেটা জ্বলে। অনন্তর বৌ পুরো অন্ধকার পছন্দ করে না, বাচ্চা দুটো রাতে ওঠে, কাঁদে। অথচ অনন্ত চায় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের সাগরে তলিয়ে যেতে।

কিন্তু পছন্দর চাপ-অন্ধ-ওয়ারে বৌয়েরই জিত হবে এটাই ধ্রুব নিশ্চিত, অতএব রফা হিসেবে অনন্ত ওই বাল্‌বটা এনে লাগিয়েছে, যেটা না কি জ্বেলেও একটা পরী রাতের আভাস সৃষ্টি করে।

'তা' সে আলোটা অনন্তর দেখতে পাবার কথা নয়। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার অনন্ত জীবন

একদা অনন্ত বোসের 'দুঁদে' বলে নাম ছিল, দাপটও কম ছিল না। এবং চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েসদের থেকেও পুলিশ বিভাগ তাঁকে বেশী ভয় করতো, কারণ লোকটার 'সৎ' বলেও খ্যাতি ছিল। অনেক দুর্নীতির ঘাঁটি আবিষ্কার করে তিনি অনেক সহকর্মীর অপ্রিয়ভাজনও হয়েছেন, শত্রু বৃদ্ধি হয়েছে অনেক, বিভাগীয় বন্ধুজন হিতকথা বলে সাবধান করে দিয়েছে, 'সাপের গর্তে, হাত ঢোকাতে যেওনা বোস, ছোবল পাবে।' বলেছে, 'খুন হওয়াই তোমার কপালে আছে বোস, বা দেখছি! ঘরে বাইরে সবাইকে চটাচ্ছো—'

অনন্ত বোস নির্ভীক হাসি হেসেছেন, এবং বলেছেন, 'উপায় কী? চোখের ওপর দেখছি, বাইরে থেকে ঘরে, ঘর থেকে বাইরে, শুধু লোভ আর দুর্নীতির সুতোয় টানা পোড়েনে কী একখানা জাল বোনা হচ্ছে—।'

কর্মকালে ওই চেষ্টাই ছিল অনন্তজীবন বোসের, দুর্নীতি দূর করবেন সরকারি দপ্তরগুলি থেকে, পুলিশী গ্যাঁড়াকল থেকে, আর সমগ্র দেশের 'ঘুড়োর কল' থেকে।

অনন্ত বোস কতোটুকু সফল হয়েছিলেন ভগবান জানেন, তবে কর্তৃপক্ষ সফল হয়েছিলেন, ওই বেয়াড়া ধরনের সৎপ্রকৃতির লোকটাকে—অপসারণ ব্যবস্থায়। ফলে অবসর গ্রহণের কাল পূর্ণ না হতেই অবসর নিতে হয়েছিল অনন্ত বোসকে।

অনন্তজীবন কিন্তু এ দুর্নীতির প্রতিবাদ করলেন না, যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

স্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তুমি সর্বত্র দুর্নীতির গন্ধ পেয়েছো আর উচ্ছেদের চেষ্টা করেছো, কই এখন করো সেটা? এই যে তোমায় কাজের সময় পূর্ণ না হতেই সরিয়ে দিলো, এটা দুর্নীতি নয়?

স্ত্রীর ক্ষুব্ধ হবার কারণও ছিল বৈকি। তখনো দুটি মেয়েরই বিয়ে বাকি, বড়ো ছেলে পড়ুয়া, ছোট ছেলেটা নেহাৎ নাবালক।

অনন্তজীবন স্ত্রীর ওই ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তোমার কথা অস্বীকার

করতে পারি না, কিন্তু 'বেঁচে যাওয়ার' সুখটা এতো বেশী মোহগ্রস্ত করে দিলো যে মরতে আর ইচ্ছে হলো না।'

'লড়াইয়ের ধারটা তা হলে আমার ওপরেই এসে পড়লো?' ভারতী নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'বাঁচার লড়াই!'

'বাঁচার লড়াই' শব্দটা তখন খুব চালু, তাই ভারতী ওই অভিধান বহির্ভূত শব্দটাই ব্যবহার করেছিলেন।

এখন হয়তো শব্দটা অভিধানে এসে গেছে, ভারতী দেখেননি। ভারতীকে প্রত্যক্ষভাবে লড়াইতে নামতে হয়েছে।

কিন্তু অনন্তজীবন কি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েই সংসারের দায় থেকেও অবসর নিয়ে নিয়েছিলেন? তাঁর যে এখনো অনেক করণীয় রয়েছে ভাবেন নি?

না, সে কথা বলা যায় না।

তবে নিজের মতো করে ভেবেছেন; ভারতীর ভাবনার সঙ্গে অনন্তজীবনের তখন ভাবনার মিল ছিল না। ···কোনোদিনই কি ছিল?

ভারতীর যখন বিয়ে হয়নি, তখন কি সেই কিশোরী মেয়েটার ভাবনায় ছিল একটা 'পুলিশের' সঙ্গে বিয়ে হোক তার?

পুলিশ সম্পর্কে ভয় ছিল ভারতীর, পুলিশ সম্পর্কে ঘৃণা ছিল।

কিন্তু ভারতীর ভাগ্যে তাকে পুলিশের ঘরেই এসে দাঁড়াতে হলো। শুধু বরই নয়, শ্বশুরও পুলিশ! এবং তিনি তখনও প্রায় যথা গগনে। পুলিশী জীবনের পরম ফল, 'ডেপুটি কমিশনারি' পদ লাভ করে তখন তিনি সেই পরম পাওয়ার গর্বে স্ফীত উল্লসিত।

ভারতীর যদি রূপের ডালটা অতো ভোরালো না হতো, তাহলে ভারতীর শুধু কেরানী বাবা এই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটার গেটের মধ্যে মেয়ে চালান করে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ভারতীর খুঁৎখুঁতুনি টেঁকেনি, ভারতীর বিরস-মুখের বিরূপতাও টেঁকেনি, বাবা পুলকে আটখানা হয়েই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

তখনও মেয়ের অনুমতি নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবার কথাটা ব্যাপকভাবে ভাবা শুরু হয়নি।

ভারতীর বাবাও ভাবেন নি।

ভারতীর মাকে একটি ধমকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, বর, শ্বশুর পুলিশ, এতে আপত্তিটা কোথায়? তোমার মেয়ের বাপটা কি চোর? না গুণ্ডা? তাই বরং পড়ার ভয়ে—।

সে কথা হচ্ছে না। মানুষের একটা রুচি পছন্দ বলে জিনিস থাকে—'

'থাকে!' ভারতীর বাবা হেসে উঠে বলেছিলেন, 'মানছি থাকে, কিন্তু তার মর্যাদা বজায় থাকে কি সব সময়?'

ভারতীর মাকে মুখ হেঁট করতে হয়েছিল, কারণ ভারতীর যে রূপ, তা নিতান্তই উত্তরাধিকার সূত্রে তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া। রূপের হাটে মা বেচারী থেকু, দেউলে।

ভারতীর বাবা নাকি সে খবর জেনে বিয়ের আগে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য বাবা জ্যাঠার কাছে নয়, মা জোঠিমার কাছে। কিন্তু ফল হয়নি কিছু। অভিভাবকরা 'অমতং বালভাষিতং' হিসেবে

ধ'র কথা উঠিয়ে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, 'তোর জ্যাঠামশাই ভদ্রলোককে 'কথা' দিয়েছেন, আর তোর কথা কোথায় দাঁড়াবে বল।'

মায়েরও তো অল্প বিস্তর দুর্বলতা। কিন্তু উপায় কি? মাথার উপর বড়োজা, ভাসুর। বড়ো জা-ই নতুন গয়না পরে ঝলমল করতে করতে বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন, মা বেচারীর নীরবে অশ্রু বিসর্জনই সার।

সাত্বী পিসেমশাইয়ের এক দূর সম্পর্কের মাতুলী, অতএব আপত্তির কথা ওঠেই না।

ভারতীর বাবা শেষ বেশ ঝুলনযাত্রার রাত্রে দিদি বৌদি মহলে খানিকটা চ্যাংড়াই ম্যাংড়াই করেছিলেন, অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আর সেই রুক্ষকায়া মেয়েটি যখন গৌরাঙ্গী কন্যার জন্ম দিয়েছিল, তখন সকলের সব ক্ষোভই প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল। ভারতীর বাবা সদ্যোজাত মেয়েকে দেখে বলেছিলেন। 'যাক এইটুকুই ভগবানের করুণা!'

অতএব সেদিন ভারতীর মাকে রুচি পছন্দর উল্লেখে মাথা হেঁট করতে হয়েছিল।

ভারতীর বাবা সেই হেঁট মাথাটাকে একটু তুলে দিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যায়। আর যদি তোমার মেয়ের তেমন ক্যাপাসিটি থাকে, ও লাইন থেকে সরিয়ে আনবে জামাইকে।'

কিন্তু সে ক্যাপাসিটি দেখাতে পারেননি ভারতী। অনন্তজীবন ওর মতবাদের উপরে নিজের মতবাদই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'পুলিশ' সম্পর্কে অনেক দুর্নাম আছে অনেক বদনাম আছে, একথা অস্বীকার করছিনা, এবং তোমার আপত্তিটা যুক্তিহীন নয় তাও স্বীকার করছি। কিন্তু যদি কেউ সেই দুর্নামগুলো দূর করবার সংকল্প নিয়ে ওর মধ্যে ঢোকে?'

ভারতী নামের সেই বৌটা তার কম বয়সের সরলতা আর ভীরুতা নিয়ে বলেছিল, 'ওখানে তো শুনি সবাই একরকম, তুমি একা কী করবে?'

'তা বলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে মানুষ?' অনন্তজীবন হেসেছিলেন, 'লক্ষ লক্ষ রোগ বীজাণু একজন বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় দূর হতে পারে? জগতে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে, সব কিছুরই শুরু একজনকে দিয়েই। বুঝলে ভারতী, সত্যনিষ্ঠ হয়ে ভালো কাজে এগিয়ে এলে তার অনেক সঙ্গী জুটে যায় শেষ পর্যন্ত।'...

ভারতী নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

'আর মুলুকে খারাপ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তই কি নেই? শুনেছি পাকে চক্রে পড়ে ভালোরাও খারাপ হতে বাধ্য হয়। ঘুষখোর হয়ে যায়, ষড়যন্ত্রকারী হয়ে যায়।'

অনন্তজীবন হেসে উঠেছিলেন।

অনন্তজীবন রূপবতী স্ত্রীর টলটলে মুখটি তুলে ধরে বলেছিলেন, 'শোনা কথায় কান দিতে নেই। কী দেখছো, সেটাই দেখো।'

হঠাৎ ভারতী বলে বসেছিল, 'দেখবো আর কী! তুমি তোমার বাবার মতই হয়ে যাবে তাই দেখবো।'

অনন্তজীবন বোধকরি এরকম সরাসরি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই চমকে উঠেছিলেন। পরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'গুরুজন সম্পর্কে কী ভাবে কথা বলতে হয়, সেটা বুঝি তোমাদের বাড়িতে শেখানো হয় না?'

ভারতী অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ভারতী যেন মেনেনি কথাটা। মনে মনে বলেছিলেন, 'উত্তর দিতে পারলে না বলেই তাড়া মেরে-টাড়া করে দিলে, কিন্তু তোমার বাবার এই এতোবড়ো বাড়ি। এতো বেপরোয়া খরচ, এতো বাওয়া পরার ঘটা কোথা থেকে আসে শুনি? কতো মাইনে? তবে? কে না বুঝতে পারে?'

আঠারো উনিশের বেশী বয়েস তখন ছিল না ভারতীর। কাজেই বলতেই হবে ভারতী অকালপক্ক ছিলেন।

অনন্তজীবন বৌকে থামিয়ে দিলেও রয়ে রয়ে মনে পড়ে গিয়েছিলেন বৈ কি। কারণ বাবার এতো বোল-বোলাওয়ের উৎস যে কী—সে তো তাঁরো অবিদিত ছিল না।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ওই ব্যাপারটা পীড়িত করেছে বলেই না অনন্তজীবনের সেই বাবার বিভাগেই ঢোকবার সংকল্প। যেন বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভার নিচ্ছেন, যেন বাবার জমানো জঞ্জাল ধুয়ে সাফ করবার ব্রত গ্রহণ করছেন।

অনন্তজীবনের বাবা আশা করেননি। তাঁর ধর্মপুত্তুর-জ্যেষ্ঠপুত্তুর তাঁর লাইনে যাবে, তবু নায়কা ওয়াস্তে বলেছিলেন, 'একটা পোষ্ট খালি হয়েছে—'

অনন্তজীবন জেনে নিয়েছিলেন পোষ্টটা কী, তারপর বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। আপনি যদি বলেন আমার আপত্তি নেই।'

অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

তারপর কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁকে মুচকে হেসে মনে মনে বলেছিলেন, 'হুঁ বাবা! বাল্যকালে অমন অনেক আদর্শ টাদর্শ থাকে। আমারও ছিল। আমিও একদা 'বেশোদ্ধারের' সমিতি টমিতির দ্বারে কাছে ঘুর ঘুর করেছি। কিন্তু—ওরে বাবা, জগদ্দল কার বশ? 'টা' ঠি-কে সরিয়ে নিয়ে যাও 'কার'-এর দিকে। উত্তর পেয়ে যাবে।

ভদ্রলোক তখনকার মতো উত্তরটা পেয়ে সন্তুষ্ট হলেও পরবর্তীকালে ছেলের নির্বুদ্ধিতায় সন্তুষ্ট হননি। বলতেন, 'ওরে বাবা, তুই এ লাইন সে লাইন যে লাইনেই যাস, দেখবি মন্দ লোককে চটানোর মতো বিপদ আর নেই। খল লোক সাপের জাত, ল্যাজে পা দিলেই ছোবল মেরে। ওদের তোয়াজে রাখতে হয়।'

অনন্তজীবনদের শিক্ষা ছিল গুরুজনের মুখের উপর প্রতিবাদ না করা। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক না করা। তাই চুপকরে থেকেছিলেন কিন্তু বাবার নির্দেশে মন্দ লোককে সন্তুষ্ট করতে তোয়াজের চেষ্টাও করেননি। সরে গেছেন।

কিন্তু ভারতী—ওই সন্তার ইতিহাসটা জানেন না। ভারতী দেখেছিলেন, তাঁর নিজের ক্যাপাসিটি নেই। ভারতী তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজের মধ্যে।

হয়তো সেই জন্যেই ভারতীর জীবন-চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল সন্তানকে কেন্দ্র করে। স্বামীকে আয়ত্তে না পেলে হয়তো এমনই হয় মেয়েমানুষের, সন্তানই হয়ে ওঠে জীবনের অবলম্বন।

অন্তত ভারতীর জীবনে তা' হয়েছিল।

কিন্তু মনস্তত্ত্বের তত্ত্ব বড়ো জটিল।

শ্বশুরের সংসারের 'বোলবোলাও'টার মূল রহস্য ভেদ করে ফেললেও, সেই বোলবোলাওয়ের উপস্বত্বটুকু গ্রহণ না করার প্রশ্ন মনে উদয় হয়নি ভারতীর। কারণ সে উপস্বত্ব ভোগ তো বেশীর ভাগই স্বাচ্ছন্দ্যটাকে অবলম্বন করে?

শাশুড়ী ছিলেন না, বহুবেলা থেকেই গৃহিণী, আর সেই গৃহিণীপনার শুরু প্রাচুর্য্য দিয়েই। এই প্রাচুর্য্যের অভ্যাস আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছিল ভারতীকে। ভারতী তাঁর ছেলেমেয়েদের মায়ায় বড়ো বেশী বদ্ধ ছিলেন।

অতএব তারা চাঁদ চাইলে, চাঁদ পেড়ে এনে দেবার চেষ্টাতেও কসুর হতো না ভারতীর। তবে? সে চেষ্টার মূল কথা কী? মূলকথা তো প্রাচুর্য্য ছাড়া আর কিছু নয়।

আরাম, আয়েশ, প্রাচুর্য্য, এগুলো যেন দেহ মনের ওপর আফিঙের নেশার মতো কাজ করে ইচ্ছের অনিচ্ছের যেভাবেই হোক, একবার অভ্যাস করে ফেললে, আর তার কবলমুক্ত হবার উপায় নেই।

ঘুষঘোর শ্বশুরের ঐশ্বর্য্যের ওপর খুব একটা শ্রদ্ধাবোধ না থাকলেও তাঁর স্নেহ সমাদর আদর এবং আদরের আতিশয্য, এগুলোকে অবহেলা করার কথা মনে আসেনি ভারতীর। ওঁর পয়সা নেবো না, খাবো না, আমার ছেলেমেয়েদের ওই অন্যায়ের অন্নে পুষ্টি করবো না', এমন জোরালো বিদ্রোহও মাথায় এসে মাথাচাড়া দেওয়ায়নি, বরং আতিশয্যটা দেখলেই মনে হয়েছে, 'তা আর করবেন না কেন খরচ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা তো নয়! যিনি খাটুনীর টাকা, জানেন দশমুঠো ছড়াবেন বিশ মুঠো আসবে।'

তা' মনোভঙ্গী যাই থাকুক, পরিস্থিতিটা ভারতীকে অতিমাত্রায় খরচে করে তুলেছিল, ইচ্ছে হওয়া মাত্রই ইচ্ছে পূরণের অভ্যাসটা কায়েম হয়ে গিয়েছিল, এবং ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে ওই চাঁদ পেড়ে এনে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল।

তারপর শ্বশুর গেলেন মারা। অবশ্য তার আগে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সংসারের ঠাটবাট একই ভাবে চলছিল, কোথা থেকে চলছিল, সেটা সকলেরই অজ্ঞাত। ব্যাঙ্কে আর কতো টাকা?

মারা যাওয়ার পর তো ধরা পড়লো সেটা বেশী নয়। অতএব ছিল অঙ্ক সুড়ঙ্গ, কিন্তু সেটা ধরা পড়েনি কোনোদিন। ভদ্রলোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গটা বন্ধ হয়ে গেল। অসুবিধে শুরু হতে আরম্ভ করলো ভারতীর।

মেয়েদের বিয়েতে কতো কী পরিকল্পনা ছিল। ছিল ছেলেমানুষ করবার বৃহৎ পরিকল্পনা, চার তলায় আলাদা মহল বানাবার স্বপ্ন ছিল বড়ো ছেলের জন্যে, বিয়ের পর বৌ নিয়ে একটু 'মুক্তপক্ষ' হয়ে থাকবে বলে। সেসব কিছুই হলো না।

ভারতীর আক্ষেপ হলো, শ্বশুর বেঁচে থাকতে তেমন তোড়জোড় করেননি বলে। মেয়ের বিয়ে, ছেলে তৈরি, এসব না হয় কতকটা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু ছাতে ঘর তোলা?

ঘরবারান্দা বাথরুম সম্বলিত সুন্দর একটি মহল বানানো? এটা তো হাতের ভিতরের জিনিস। তেমন তোড়জোড় করলে হয়েই যেতো। কারণ শ্বশুরও তো এ পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন। বলেছিলেন, 'মেজের মোজেক টালিটা আমি পছন্দ করে দেবো বৌমা, দেখেছিলাম একটা একজনের বাড়ি। ভারী চমৎকার।'

তাছাড়া হেসে হেসে এও বলেছিলেন, 'হাঁা, মা বটে এ যুগের। মায়ের মতো মা। কবে ছেলের বৌ আসবে, সেই বৌয়ের সঙ্গে ছেলে নির্জনে বসে গল্প করবে বলে, মা আগবাড়িয়ে ছাদে ঘর বানাতে বলছে! আর আমাদের আমলে? আরে ছোঃ! ছেলে যদি ভুলে ভুলে একবার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে ফেলেছে, তো হয়ে গেল! সে কী রাগ, কী গালাগালি।'

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

ভারতী অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'গালাগালি?'

'তা সে প্রায় তাই! ছেলের না হোক বৌয়ের তো চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হতোই। কাজে কাজেই দিনের বেলা? স্রেফ্ ভাতের ভাত বৌ!'

ছাদ কাটানো হাসি হাসতেন।

রসিক আর দিলদরিয়া প্রকৃতির ছিলেন লোকটা। হয়তো সেই কারণেই তাঁর প্রতি তেমন বিতৃষ্ণা আসতে পারেনি ভারতীর। তাঁর 'শাম হোমে'র খবর জেনেও। যেটা না কি ভারতীদের বাপের বাড়িতে প্রায় নরহত্যার সামিল দুষণীয় ছিল। মধ্যবিত্ত সংসারে, শুধু কেরানীর বাড়িতে হয়তো ওই রকমই হয়। কিন্তু গোলামেলা স্বভাবের একটা গুণ আছে।

অনন্তজীবনের বাবা সেই গুণের অধিকারী ছিলেন। সন্ধ্যা হলেই তিনি নাতি নাতনীদের তাদের মার কাছে গছিয়ে দিয়ে গিয়ে হেসে হেসে বলতেন, 'এবার আটকে রাখো বৌমা! এখন তো ওদের দাদুর একটু শরবৎ টরবৎ চলবে? দু-দৃষ্টান্ত না দেখাই ভালো।'

'শরবৎ' শব্দটা ভারতীর বড় ছেলে অন্তরের আবিষ্কার। সে কোনদিন কোন ফাঁকে দেখে ফেলে বলেছিল, 'দাদু, তুমি ডিফেন্স খলবৎ খাও?'

দাদু অম্লান বদনে বলেছিলেন, 'লস্কার শরবৎ দাদু।'

'লস্কার? ওব্, বাবা! তোমার খাল লাগে না?'

'লাগে।'

'তবে খাও কেন?'

দাদু গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, 'না খেলে আমায় ডাক্তার বাবু মারবেন।'

বলাবাহুল্য এরপর আর প্রশ্ন ওঠেনি।

কিন্তু তদবধি ওই 'শরবৎ' শব্দটা চালু করে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক।

অনন্তজীবন অন্য ধরণের।

অনন্তজীবন আদৌ দিলখোলা নয়।

তিনি তাঁর আদর্শ নিয়ে প্রাণপণে লড়েছেন, হেরেছেন, মুখ থুবড়ে পড়েছেন, কোনো কথা বলেননি।

অনন্ত জীবনের বাবা যোগজীবনের গল্পই ছিলো কেবল কর্মজীবনের। কবে কোন ব্যাটাকে পারেস্তা করেছেন, কবে কোন 'শালা' ওঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে। আর কবে তিনি কী জটিল পরিস্থিতিকে জলের পরিস্থিতিতে পরিণত করেছেন, তারই ইতিবৃত্ত। হয়তো একই কাহিনী একাধিকবার বলেছেন।

অধিকাংশ সময়ে ভারতীই ছিল শ্রোতা।

পরম আদরে ডাক দিতেন তিনি, 'কী অতো সংসার সংসার করছো বৌমা, পালিয়ে এসো ওই রান্নাঘর-ভাঁড়ার ঘরের কবল থেকে। বোসো একটু, জমিয়ে গল্প করা যাক্! ছুঁড়ি ছুটো কোথায় গেল? বড় ছোঁড়াটা?

এই সব বিশেষণগুলি অবশ্য নাতি নাতনীদের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হতো। ছোটটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতো।

ভারতী এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতো না, যতোই হোক শ্বশুর বলে কথা!

তাছাড়া—সত্যি বলতে, ভারতীর এই গল্প গাছা ভালই লাগতো। যাই হোক লোকটার মধ্যে 'প্রাণ' আছে। ছেলের মতো নিষ্প্রাণ নয়।

বাপে ছেলেয় এতো পার্থক্য যে কী করে হয়!

সাহস পেয়ে পেয়ে ভারতীও চোটপাট করতে ছাড়তো না। বলতো, 'পায়ে এসে লুটিয়ে পড়তো কী শুধুই হাত্ পা নিয়ে যাবা? হাতে টাকার থলিটলি না নিয়েই?'

যোগজীবন পুত্রবধূর এই স্পর্দ্ধায় চটে উঠতেন না, হেসেই উঠতেন। বলতেন, 'বেটি বড়ো চালাক! জানতো। জানতো সে সব! শুধু হাতে কে কার উপকার করে?'

'তার মানে ঘুষ নিতেন?'

'নিতাম না মানে? আলবৎ নিতাম। পৃথিবীটা যদি ঘুষ দেবার জন্তে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, নেবো না কেন? যে না নেয় সে বুদ্ধু! এই যে আমার বুধিষ্ঠির পুত্তুর! পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গদীতে বসে আছেন! কার কোন লাভটা হচ্ছে শুনি?'

'তা বলে ঘুষ নেবেন? নেওয়া বুঝি ভালো?'

যোগজীবন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলতেন, 'এ জগতে কোনটা সত্যিকার ভালো। আজ পর্যন্ত তার হিসেব হয়নি বৌমা! আমি যদি ঘুষ নিয়ে কাউকে বাঁচাই?'

'সে তো চোর ডাকাত গুণ্ডাকে?'

'তাই, তাই না হয় হলো। কিন্তু তারাও মানুষ তো? মা-বাপের সন্তান, স্ত্রীর স্বামী, ছেলেমেয়ের বাপ—'

'তাহলে তো আইন আদালত সব তুলে দিতে হয় বাবা?'

ভারতী জোর দিয়ে বলতেন।

যোগজীবন হেসে বলতেন, 'বেটি যদি বে থা করে ঘরের বৌ না হয়ে উকিল ব্যারিষ্টার হতো তো পসার করতে পারতো।'

ভারতীর এই কৌতুকের কথায় চোখে জল এসে যেতো। ভারতীর মনে হতো এই একজন মানুষেরও তার সম্পর্কে মূল্যবোধ রয়েছে।

যোগজীবনের প্রকৃতির গুণেই ভারতী মানুষটাকে খুব উঁচুদরের মানুষ না ভাবলেও ভালবাসতেন। যারা গেলে কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

অনন্তজীবন কোনোদিনই স্ত্রীর সান্নিধ্যের জন্যে লালায়িত ছিলেন না। তবু কোনো কোনো সময় হুতো করে স্ত্রীকে ডাকিয়ে আনতেন। এবং প্রায় বিরক্ত গলায় বলতেন, 'এতো ঘর কাটানো হাসি কিসের?'

ভারতী কঠিন হয়ে যেতেন।

কাঠিন্য বজায় রেখেই বলতেন, 'সবটা শোনবার সময় হবে তোমার? তা হলে বলছি।'

'আমার শোনবার দরকার নেই।'

'তবে আর বলছো কেন?'

অনন্তজীবন বলে ফেলতেন, 'দৃশ্যটা অশোভন বলে।'

'অশোভন!' ভারতী হিমশীতল।

'আমার তো তাই মনে হয়,' স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বলতেন অনন্তজীবন, 'সম্পর্কটাতো ঠাট্টা তামাশার নয়।'

'তাহলে সেটা বাবাকেই বলে এলে ভালো হয়। উনিই তাকেন। উনিই হাসেন। আমি নিজে থেকে ঠাট্টা তামাশা করতে যাই না।'

'ওঁর কোনোদিনই মাত্রা জ্ঞান নেই।'

'ওঃ!' ভারতী ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলতেন, 'তা হবে। কিন্তু উপায় কী? গুরুজন সম্পর্কে যে ভাবে ব্যবহার করতে হয় এ বাড়িতে এসেই শিখেছি। মাত্রাজ্ঞান না থাকলেও সেটাই মেনে নিতে হবে।'

অতএব চুপ করে যাওয়া ভিন্ন উপায় থাকতো না অনন্তজীবনের।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই একটা প্রতিপক্ষ ভাব বরাবর থেকে গেছে। প্রথম জীবন থেকে আজ পর্যন্ত।

ছেলেমেয়েদের বাইরে পরিয়ে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে। সব কিছুতে।

অনন্তজীবন চাইতেন, সব কিছুতে অনাড়ম্বর শালীনতা। ভারতী আড়ম্বর না হলে ক্ষুণ্ণ হতেন। অভিমানাহত হতেন।

যোগজীবন থাকতে পৃষ্ঠবল ছিল, তিনি বলতেন, 'ও হতভাগার কথা শুনোনা বৌমা। তোমার ছেলে দশ টাকার জুতো পরবে? কেন? বাহার টাকার গুলো তাহলে আছে কী করতে?' বলতেন, 'ওর কথা বাদ দাও। ও ওর টুলো পণ্ডিত দাদামশাইয়ের মতন হয়েছে।'

তা তখন বাদ দেওয়া চলতো।

কারণ পৃষ্ঠবল ছিল।

পরে প্রতি মুহূর্তে যান অভিমান।

মেয়ের বিয়ের সময় ?

সে তো ওর প্রায় নিজেরেরই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবার মতো অবস্থা।

অনন্তজীবন বললেন, 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, আমার বাবার দরুন মস্ত তিনতলা একখানা বাড়ি আছে বলেই তো আর ওর বাবার এই বাড়ির উপযুক্ত 'চাল বজায়ের ক্ষমতা নেই।'

'তা বলে বাবার নামের মান সম্মানের কথাটা ভাববেনা ? এই বাড়িতে হতভাগার মতো বিয়ে হবে ? বাবা বলতেন কেতকীর বিয়েতে বাড়িটাকে আলোয় মুড়বেন।'

'বাবা থাকলে মুড়তেন।'

'বাবার ইচ্ছেটা রয়েছে, বাবার দৃষ্টিটাও রয়েছে হয়তো।'

অনন্তজীবন হঠাৎ খুব কঠিন গলায় বলে উঠলেন, 'বাবা সম্বন্ধে ভক্তিটা এতো প্রবল কবে থেকে হলো ?'

ভারতী বলতে পারলেন না, 'চিরদিনই ছিল—' কারণ ভারতী যোগজীবনের ঘর খাওয়ার কথা, যোগজীবনের ঘুনী আদায়ীর সঙ্গে আঁতাতের কথা, যোগজীবনের যথেচ্ছ খরচের উৎসের কথা স্বামীর কাছে বলে ফেলেছেন এক এক সময়।

তখন অবশ্য অনন্তজীবন বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'ওসব কথা থাক। অন্য কোনো কথা থাকে তো বল।'

ভারতী চুপ করে যেতেন।

ভারতীর অন্য আর কী কথা আছে—এছাড়া ?

ছেলে মেয়েদের বুদ্ধিমত্তা, চালাকি, দুষ্টুমি, পাকামি, এই ধরনের গল্পই তার টুকে আছে, যাতে যোগজীবনের ছিল দারুণ উৎসাহ, কিন্তু অনন্তজীবনের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

অনন্তজীবনও আলোচনার মধ্যে থেকে কষ্ট করে শিশুশিক্ষা সম্পর্কে এক একটা বোধ আবিষ্কার করে বলতেন, এবং উপদেশ দিতে শুরু করতেন 'এভাবে প্রশ্রয় দিও না, ওভাবে হাসাহাসি কোরোনা।··· শিক্ষার শুরু জন্ম থেকেই, বড়ো হয়ে ঠিক হয়ে যাবে এ ধারনার মতো ভুল ধারনা আর নেই।'

হয়তো কথাটা সত্যি।

কিন্তু তরুণী মায়ের পক্ষে এই 'সত্যি কথাটা' খুব সহজপাচ্য নয়। ভারতীর আহ্লাদে উদ্ভাসিত মুখটা কালো হয়ে যেতো।

সুন্দরীদের মনের ভাব বড়ো বেশী স্পষ্ট হয়ে মুখে ফুটে ওঠে ; রাগ অভিমান, দুঃখ বেদনা, সবটাই তাদের আলাদা একটা রূপ ফোটায়। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারতো ভারতী রেগে উঠলেন, কি ক্ষেপে উঠলেন, ভারতী অভিমানে খান খান হলেন, না অপমানে কালো হলেন। কিন্তু অনন্তজীবন বুঝতেন না।

অনন্তজীবন যেন অন্যদিকেই তাকিয়ে থাকতেন।

তাই ভারতীর কালি হয়ে যাওয়া মুখটা চোখে পড়লো না তাঁর। বললেন, আমার মেয়ের বিয়ে, আমার অবস্থা অনুযায়ী হবে।'

'না তা হবে না' ভারতী স্বোষণা করলেন, 'কেতকীর বিয়েটা অন্ততঃ বাবার নাতনীর মতো করে হবে।'

'বাবাকে পাড়ার কেউই খুব একটা মহামানব বলে ভাবতো না।'

ভারতী ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন, 'পাড়ার লোক না ভাবুক আমাদের তো! আমাদের ভাবা উচিত।'

'তা'হলে সেটা আমাকেই ভাবতে দাও। বাবা আমারই, তোমার নয়।'

আর কথা চালানো চলে না।

পরস্পর পরস্পরকে বাঁচিয়ে দিয়েই দাম্পত্যজীবনের এতোবাকি পথ পার হয়ে এলেন।

কেতকীর বিয়েটা যোলজীবনের মাতনীর মতো করে হলোনা, ভারতী আর একটু কাঠ হলেন।

করবীর বিয়েটা হলো আবার অন্যভাবে

'তাব' করে বিয়ে করে বসলো করবী। অতএব বাপ মার মধ্যে তর্কাতর্কির অবকাশ রইল না।

এতে আবার অনন্তজীবন কাঠ হলেন।

যেন মায়েতে মেয়েতে যুক্তি করে খুব একটা অপমান করেছে তাঁকে! অথচ ভারতীর কোনো ভূমিকা ছিল না এতে।

করবী বরাবরই বেপরোয়া। এবং ইচ্ছের বশে চালিত।

কিন্তু শুধু কি করবীই, ভারতীর ওই ছোট মেয়েটা? ভারতীর ওই ছোট ছেলে দিগন্তও কি ওই একই প্রকৃতির নয়? ভারতীর ছোট মেয়ে জীবনসঙ্গী নিজে নির্বাচন করে নিয়েছে, আর ভারতীর ছোটছেলে নির্বাচন করে নিয়েছে জীবনের পথ।

উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের ছেলে হয়েও সে পুলিশের মার খেয়েছে সেই কোন ছোটবেলায়।

তখনো অনন্তজীবন কর্মক্ষেত্রে।

দিগন্ত তখন নেহাৎই স্কুলবয়।

তবু সেই বয়সেই ছাত্র ধর্মঘটিদের সঙ্গে জুটে—

প্রায় অর্ধচৈতন্য ছেলেটাকে নিয়ে গাড়ি করে পৌঁছতে এলেন এক ইন্সপেক্টার সাহেব। বিবর্ণ মুখে বললেন, 'দাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে স্যর, আপনার ছেলে যে ওই দলে—মানে থাকতে পারে সেটা কারুর ধারনাই ছিল না। লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ। হঠাৎ আমাদের 'ও সি' বললেন, 'এই ছেলেটি মিঃ বসুর ছেলে না? একদিন যেন ওঁর সঙ্গে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে—'

ইন্সপেক্টর সাহেব আরো বিবর্ণ আর কাতর হলেন। 'নাক দিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছে স্যর। কিন্তু হসপিটালে দিলে আপনার নামটা জানাজানি হয়ে যাবে বলে সোজা এইখানেই—।'

অনন্তজীবন তাঁর অবচেতনের সমস্ত ব্যাকুলতা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন। 'জানাজানি হবে তাতে কী? আমার যে ছেলের নাক টিপলে দুধ বেরোবার কথা, সে ছেলে যদি নাকে রক্তপাত ঘটাবার মতো কারণ ঘটিয়ে থাকে, অবশ্যই আমারও শাস্তি পাওয়া উচিত। ওকে আপনি হাজতে রাখুন। জেল হাসপাতালে দিন, যা ইচ্ছে করুন গে।'

'তাই কখনো হয়, স্যর?'

'হবে না কেন? আরো অন্য সব ছেলেদের ভাগ্যে যা হয়েছে, ওর ভাগ্যেও তাইই হওয়া উচিত। ও কেন আলাদা সুযোগ পাবে? কেবলমাত্র আমার ছেলে বলে? না না, তা হতে পারে না। ওকে আপনারা নিয়ে যান।'

ছেলেটাকে পাখার তলায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল বসবার ঘরেরই একটা সোফার ঘাড় গুঁজে। যিনি নিয়ে এসেছিলেন তিনি আরো সকাতর মিনতিতে যেন নিজের ছেলের জন্যেই আর্জি করছেন এইভাবে বললেন, 'এবারকার মতো মাপ করুন স্যর—ওকে। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন।'

অনন্তজীবন অনমনীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'তা হবে না। ওকে আপনাদের ব্যবস্থায় নিয়ে যান।'

'স্যর—'

'দেখুন, অন্যায় অনুরোধ করবেন না।'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে আর কিন্তু নেই মিঃ দাস। অন্যের থেকে বিশেষ সুযোগ ও নেবে কেন?'

কিন্তু ততক্ষণে তো ঘটনার সংবাদ পৌঁছে গেছে অন্তঃপুরে।

হঠাৎ অনন্তজীবনকে 'খো' করে দিয়ে ভিতর থেকে ঠাকুর রামেশ্বর আর চাকর বৃন্দাবন দু'জনে এসে ছেলেটাকে পাঁজাকোলা করে ভিতরে নিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা ঘটে গেল এতো আকস্মিক যে অনন্তজীবন আর প্রতিবাদের সময় পেলেন না।

যিনি বিবর্ণ হচ্ছিলেন, তিনি বর্ষিয়ান হয়ে বললেন, 'যাক্ গে বাঁচা গেল। কেস্ সুপ্রীম কোর্টে পৌঁছে গেছে। আমার আপনার কারুরই কিছু করার নেই।'

অনন্তজীবন কী বলতেন কে জানে, টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে উঠলো এবং কানে তুলতেই পারিবারিক চিকিৎসকের গলা শোনা গেল, 'এক্ষুণি যাচ্ছি। মাথাটা একটু নিচু করে শুইয়ে রাখুন। কী ভাবে পড়ে গেল?...'

কথার উত্তর দিলেন না অনন্তজীবন, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

বোধকরি ভাবলেন দোতলায় একতলায় দুটো টেলিফোন লাইন থাকা অকারণ বিলাসিতা।

ডাক্তার অবশ্যই ভাবলেন, 'বিচলিত অবস্থা'।

আর হয়তো এও ভাবলেন, বাইরে যে যতই কঠিন ভাব দেখাক, সন্তানের ব্যাপারে সবাই—

পরে ভারতী বলেছিলেন, যতো পারো শাস্তি দাও মাথা পেতে নেবো। সবটা মেনে নিয়েই একাজ করেছি আমি।'

বলেছিলেন, 'এছাড়া আমার পক্ষে আর কিছু সম্ভব ছিল না।'

অনন্তজীবন শুধু বললেন, 'তুমি আমায় যে শাস্তিটা দিয়েছো, তার উপযুক্ত শাস্তি আমার জানা নেই।'

'ফাঁসি আছে তোমাদের আইনে। তাই দাও।'

অনন্তজীবন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আমায় একটু একা থাকতে দাও।'

ভারতী সেদিন ভয় পেয়েছিলেন। শুধু কথা বলেছিলেন, 'মনকে বরং চাবুক মেরে শায়েস্তা করে রাখা যায়, কিন্তু মানের ওপর চাবুক পড়লে সহ্য করা শক্ত। এক বাড়ি লোকজন আর চাকর বাকরদের সামনে আমাকে যদি দাঁড়িয়ে দেখতে হতো এই অজ্ঞান অচৈতন্য ছেলেটাকে জুতোর ঠোক্কর মেরে বাড়ি থেকে দূর করে দিলে তুমি, তা' হলে আমার আর এ সংসারের কর্ত্রী সেজে বসে থাকা সম্ভব হতো কিনা তুমিই ভেবে বলো।'

অনন্তজীবন লাল লাল চোখ তুলে বললেন, 'মানের ওপর চাবুক পড়লে যে সহ্য করা শক্ত, সেই

কথাটাই আমারও বোঝাবার বিষয় ছিল। আমি পুলিশের একজন কর্তা বলে আমার ছেলের শাস্তি হবে না তাকে মোটর গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে এসে পালঙ্কে শুইয়ে দেওয়া হবে, এই ঘৃণ্য কথাটা সহ্য করবার ক্ষমতা আমারও হচ্ছে না ভারতী, দোহাই তোমার আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

হয়তো যুক্তি দু' পক্ষেই আছে। এবং কোনো পক্ষকেই অসমর্থন করা যায় না, কিন্তু মূল রহস্য হচ্ছে, দু' রকম ওই দুটো পক্ষকেই একটা পাখির দু' কাঁধে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং পাখিটাকে ওই পক্ষ দুটোকেই ঝটপটাতে ঝটপটাতে উড়তে হচ্ছে।

ওই চেষ্টাটুকুই লোকসমাজে মুখ। না হলে তো কবেই পড়ে যেতো পাখা দুমড়ে।

অনন্তজীবন যদি তাঁর বাবা যোগজীবনের প্রকৃতি পেতেন, পাখিটা ভরতরিয়ে উঠতো, কিন্তু অনন্তজীবন যেন হিসেব করে করে তাঁর বাবার প্রকৃতির বিপরীতগুলি গ্রহণ করেছেন। এ যেন ব্যাকরণ গ্রন্থের সেই বিপরীতার্থক শব্দের তালিকা।

তবু কাটছে দিন রাত্রি, তার মধ্যেই অনন্তজীবন তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহ শালায় নিত্য নতুন সংগ্রহ যোগ করছেন, আর ভারতী রান্নার বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে নতুন নতুন খাবার তৈরি করছেন যৌ ছেলেমেয়ে নাতিদের জন্য।

অনন্তজীবন এখন অবসরপ্রাপ্ত জীবন হলেও পূর্ব অভ্যাস অনুসারে—ঠিক পুজোর বন্ধের সময়ই চট করে বেরিয়ে পড়ে কোথাও দু' চার দিন বেড়িয়ে আসছেন। এবং ভারতী, খরচ পত্রের টানাটানি সত্বেও পুজোর সময় মেয়ে জামাই ছেলে বৌ-টৌয়ের জন্যে জামা কাপড়ের ফর্দ করছেন।

অনন্তজীবন সাধু সন্তর বেশধারী বাবা মহারাজদের প্রতি বিশেষ বিমুখ, আর ভারতী গেরুয়া কক্ষাক্ষ দেখলেই পাত্র অর্ঘ সাজাতে তৎপর।

তালিকা অনেক, তবু এমনিতে চলছেও। ঠেক খেতে খেতেই চলেছে। আজকের মতো অচল হয়ে ওঠেনি যেন।

অথচ আজ অন্য রকমটাই হবার আশা ছিল। হতে পারতো অন্য রকম।

আজ ভারতী ব্যবধানের সীমারেখাকে ঠেলে সরিয়ে কাছাকাছি এসে শরণাগতের ভঙ্গীতে বলেছিলেন—'ওগো শুনছি নাকি কলেজ স্কোয়ারে আজ ভীষণ কাণ্ড! আর দিগুটা সেই কলেজ স্কোয়ারেই গেছে—'

কলেজ স্কোয়ারে গোলমাল সেকথা অনন্তজীবনও শুনেছেন, কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি যে সেইখানেই গিয়ে বসে আছে, সে খবরটা পাননি। এখন পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন লোহার মানুষ হয়ে গেলেন।

কলেজ স্কোয়ারের ওই জনসভাটি অনন্তজীবনের মতবাদের একেবারে বিপরীত।

'তা দিগন্ত' নামের ওই ছেলেটাও তো ঠিক তার বাপেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তার বাপের মতোই সে নিজের বাপের প্রকৃতির বিপরীত প্রকৃতিটা পেয়েছে।

অনন্তজীবন পুলিশে কাজ করেও বরাবরই অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, আর দিগন্ত যে নীতিতে বিশ্বাসী সে নীতি-জেহাদ, হিংসে। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপই তাদের পদ্ধতি।

দুটো মত তো থাকবেই জগতে।

দুটো বিশ্বাস।

দৈবাৎ যদি ওই 'দুটো বিশ্বাসকে' এক ছাতের নিচে বাস করতে হয় পরমাত্মীয়ের পরিচয় বহন করে, সেটাই বিড়ম্বনা।

আত্মজের মতো আত্মীয় আর কে আছে? অথচ সেই আত্মজকে চেনাই বোধকরি সব চেয়ে কঠিন।

দূরের মানুষকে দেখা হয় দূর থেকে,—বিশ্বাস অবিশ্বাসের আলোছায়ায়; চিনতে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না এই দ্বিধাটি নিয়ে। আত্মজকে দেখা, বড়ো কাছাকাছি থেকে দেখা। তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের সূচনা থেকে, চেতনার উন্মেষ থেকে, বুদ্ধি আর চিন্তার প্রতিটি সঞ্চরণ থেকে, তাই বিশ্বাসটাই থাকে পুরোপুরি। মনে হয় এই তো—সবই তো আমার দেখা, আমার জানা, আমার চেনা।

হঠাৎ একদিন ভুল ভাঙে।

অবাক হয়ে ভাবি, এ কী? এ কে? একে তো আমি চিনি না। দেখিনি তো কোনোদিন। আমার জীবনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটা কোথা থেকে এলো?

ওই বিস্ময় থেকেই—

ভুল হয়ে যায় জীবনের সমস্ত অঙ্ক কষা, এলোমেলো হয়ে যায় জীবনের সাজানো ছন্দ, কঠিন প্রখর আলোর নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে দুই মুখোমুখি সৈনিক!

অপর দিকেও তো আছে বিস্ময়ের অবকাশ।

আস্ত একটা মানুষ হয়ে যাওয়া ছেলেটাওতো বিরক্ত বিস্ময়ে ভাবে কী আশ্চর্য! কী ভেবে রেখেছেন উনি? নেহাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই একদা যে শিশুটাকে পৃথিবীতে আমার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং তাকে তার শৈশবে পালন করেছিলেন, সেই শিশুটাকে কোনোদিনই উনি পুরো একটা 'মানুষ' বলে ভাবতে রাজী হবেন না? উনি বরাবরের জন্যেই চাইবেন তাকে হাত ধরে হাঁটি হাঁটি করাতে? অসম্ভব!

হয়তো ওই চাওয়াটা যেখানে প্রকট বিদ্রোহ সেখানেই প্রবল। চাওয়াটা যেখানে অদৃশ্য, সেখানে আছে স্বেচ্ছা-সমর্পণ। কিন্তু ওই 'প্রকট' আর 'অপ্রকট'টা তো ইচ্ছাকৃত নয়? ওটাতো সম্পূর্ণ স্বভাবধর্মের ব্যাপার!

যোগজীবন তাঁর নিজের বিপরীত প্রকৃতির ছেলেকে অনায়াসেই বহন করেছেন, গ্রহণ করেছেন। বড়োজোর হাসি ঠাট্টা করেছেন তার আড়ালে। কিন্তু অনন্তজীবন তাঁর বিপরীত প্রকৃতির ছেলেকে গ্রহণ করতে পারছেন না, তাই বহন করতেও পারছেন না।

তাই তিনি ওই উদ্বেগ-ব্যাকুল নয় শরণাগত মাতৃজঠরের সামনেও লোহার মানুষ হয়ে যেতে পারলেন, বললেন, 'ওঃ তাই বুঝি? ওরে কে আছিস, বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দে। আর কেউ আসবে না।'

আর কেউ আসবে না।

আর কেউ আসবে না।

ভারতী হঠাৎ বুকের মাঝখানে হাত রাখলেন।

মনে হলো ওখানে হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভারী জিনিস এসে পড়লো।

ভারতী কিছুক্ষণ সেই আঘাতের যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর সহসা তিনিও এক অদ্ভুত কাজ করলেন। জীবনে কখনো যে ভাবে খোকলা থেকে চেঁচিয়ে কোনো আদেশ করেননি, সেই ভাবে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন। 'গেটের আলো জ্বলুক।'

কিন্তু গলাটা কি ভারতীর?

নাকি আর কোথাও থেকে কেউ এতটা অনন্তর আদেশ দিল?

ভারতীর স্তব্ধতার অবসরে বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, কারণ অনন্তজীবনের ওই আদেশটার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা ছিল। অনন্তজীবনই বা কবে বাড়িতে অমন কড়া গলায় কাউকে আদেশ করেছেন?

ওঁর 'আদেশ' বরাবরই কাছ থেকে, মৃদু এবং দৃঢ়।

এটা অন্যরকম শোনালো, তাই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হলো।

শুধু গেটের আলোর সুইচে হাত ঠেকাবার প্রাক্কালে কর্ত্রীর হুকুমটা গিন্নে হাত চেপে ধরলো। চাকরটা থতমত খেয়ে খোকলার দিকে তাকালো, দেখতে পেলনা অবশ্য কাউকে, কিন্তু লোকটা অনুভব করলো ওই অন্ধকারের পটভূমিকায় কোনো নিঃশব্দ সংগ্রাম চলছে।

ভারতী আর অনন্তজীবনের জীবনছন্দের ফাঁকিটা বাইরের লোকের সামনে কখনো ধরা পড়েনি, কারণ ভারতী বড়ো বেশী চাপা, আর বড়ো বেশী সাধারণ! ভারতীর মনের মধ্যে যখন সমুদ্র কল্লোল, ভারতী তখন অনায়াসে বসে নায়কোল কুরনী নিয়ে নায়কোল কুরতে বসতে পারেন। ভারতীর মধ্যে যখন ঝড়ের গোঁ গোঁ আর্তনাদ, ভারতী তখন চাকরকে নির্দেশ দিতে পারেন মাছটা কী ভাবে কুটতে হবে।

আর ভারতীর মধ্যে যখন ভূমিকম্প ঘটে যায়, তখনও ভারতী দিব্যি সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।

ভারতীর ওই পারা-গুলোই অন্যের তীক্ষ্ণ হবার সুযোগ দেয়নি।

আর অনন্তজীবন?

তিনি তো পুরুষ মানুষ। তাঁর কর্মজীবনই তাঁকে অন্য ধরনের করে রেখেছে, এই ধারণা গড়ে উঠেছে লোকের মনের মধ্যে।

আজ পরপর ওই দুটো তুচ্ছ হুকুম হঠাৎ যেন আশে-পাশের পরিবেশকে সজাগ করে দিল। তারা ভুরু কুঁচকে ভাবলো। 'ব্যাপারটা কী? এটা হঠাৎ আজই? না পিছনে ইতিহাস আছে?'

আর সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ঐতিহাসিক ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সত্যিই তো। তাইতো!

অন্তত অন্তরঙ্গ যৌ শিশুপুত্রের ঘুমোয় যায় তাড়াতাড়ি, খোয় তাড়াতাড়ি, তবে ঘুমটা তাড়াতাড়ি আসতে পায় না। কারণ বাড়িতে অনেকক্ষণ কাজের শব্দ চলে, জানলা দরজার শব্দ হয়।

মিনিট কয়েক আগেই অনন্তজীবনের হুকুম হয়ে গেছে, অন্তত বলে উঠেছে—'বাবা রাগল চটে গেছেন মনে হচ্ছে। দিগুটাই বাবাকে জ্বালিয়ে খেলো। আশ্চর্য, কী যে এক সুখে থাকতে দুধের কিল খেতে ছোটা!'

অন্তরঙ্গ বৌ অসীমা ছেলে জেগে ওঠবার ভয়ে মৃদু গলায় বলে, 'সময়ে শাসন করা হয়নি। এখন রাগ করে কী হবে?'

'শাসন করা হয়নি তোমায় কে বললো?' অন্তরঙ্গ অসীমার ওই অভিযোগে বিরক্ত হলো! তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, শাসন 'যথেষ্টই করা হয়েছে। তুমিও তো এসেছো অনেক দিন—দেখনি মা কি ভাবে ওকে বুঝিয়েছেন, কতো বারণ করেছেন। তা-ওর এখন কুগ্রহ ঘাড়ে চেপেছে—'

'সত্যি, তোমরা দুই ভাই একেবারে উল্টো।'

অন্তরঙ্গ তখনো পর্যন্ত মার গলা শুনতে পায়নি। তাই অন্তরঙ্গ কৌতুকের গলায় বলে 'উল্টো? সোজা হলেই ভালো হতো? তা' কে কোন রকম হলে—'

এই সময় ভারতীর গলা শোনা গেল। ভারতীর বড়ো ছেলে চমকে উঠলো। বললো 'কী হলো? মা হঠাৎ—'

অসীমা হাত বাড়িয়ে ওর সেভিং কোণটা ধরে বলে, 'যাই হোক না, তুমি যাচ্ছো কী করতে?'

'দেখি একবার, মা হঠাৎ কেন—'

'গিয়ে কি করবে? বুঝতে পারছোনা মাও জীবন চটে গেছেন। বাবা ছেলের ওপর, মা বাবার ওপর।'

অন্তরঙ্গ চিরদিনই একটু অল্প বোঝে।

আর অন্তরঙ্গর বরাবরই বাপের প্রতি বেশী সহানুভূতি। বাবাই যে 'ঠিক', এবং মা ই যে 'ভুল' এটাই ওর ধারণা। মাঝে মাঝে এও মনে হয়, বাবার মতো আদর্শচরিত্র ব্যক্তির উপযুক্ত স্ত্রী হবার যোগ্যতা মার নেই।

উল্টো দিক থেকে কোনদিন ভেবে দেখেনি অন্তরঙ্গ।

ওরকম আদর্শচরিত্র ব্যক্তির যে সংসার করাটাই উচিত হয়নি সে কথা ভাবা উচিত ছিল অন্তরঙ্গর।

পুরুষ অনায়াসেই নিজকৃত সংসারের দায়িত্বটি পদ্মপত্রের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে 'আদর্শপুরুষ' হয়ে তার উচ্চচিন্তার গজদন্ত মিনারে অবস্থান করতে পারে, মেয়েদের জীবনে সে অবকাশ কোথায়?

মেয়েদের পক্ষে 'আদর্শ চরিত্র' হওয়ার পথ যে কতো দিক থেকে বন্ধ, সেকথা মেয়েরাই জানে। মেয়েরা শুধু মরে যাবার পর 'দানশীলা ও পুণ্যবতী' হয়ে ওঠে। অবশ্য যদি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী বা মা হতে পারে। তখন খবরের কাগজে 'শোক সংবাদের কলমে' তার সেই বিশেষ গুণের খবর ছাপা হয়।'

আদর্শ চরিত্র?

ওসব গেরস্ত ঘরের জন্যে নয়।

রাণী টাণী হলে আলাদা কথা।

গেরস্ত ঘরের মেয়ের যৌড় ওই 'দানশীলা ও পুণ্যবতী।' তাও দানের পরিধি তো অপরের দানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পদের অধিকারিণী মেয়ে সমাজে আর ক'টি?

ভারতীর মতো মেয়েরা ওই শব্দটার মানেই জানে নাকি?

সাধারণ মেয়েরা জানে আদর্শচরিত্র নিয়ে সংসার করা কতো শক্ত। সন্তান তার পায়ের বেড়ি। সন্তান তার মাথার বোঝা। বেড়ি পরা পায়ে বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে হয় তাকে অর্থনৈতিক পরাধীনতার পরিবেশে।

আলমারির চাবিটা আঁচলে বাঁধলেই কি সত্যকার অধিকারবোধ জন্মায় ? পুরুষ অনায়াসেই সন্তানের ওপর কঠোর হতে পারে, মায় কষতা নেই তা হবার।

সেই 'না পারার' কারাগারে মা চিরবন্দিনী।

মাকে তার জন্যেই হয়তো নত হতে হয়, নম্র হতে হয়, অনেক কিছুর সঙ্গে আপোস করতে হয়।

অথচ সেই মাতৃমুখাপেক্ষী এতোটুকু প্রাণকণাটি, বল বুদ্ধি সাহস এবং বিচারবোধসম্পন্ন আস্ত একটা মানুষ হয়ে অনায়াসেই রায় দিতে পারে, 'বাবা ঠিক্, মা ভুল।'

ভারতীর মেয়েও যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে আসে বলে, 'বাবার মতো মানুষের সঙ্গে যে কী করে ঝেঁপাঝেঁপি কর তুমি মা।'

সেই ঝেঁপাঝেঁপি হয়তো ওই মেয়েকে কেন্দ্র করেই। অনন্তজীবন অনায়াসেই বলেন, 'ভালো তত্ত্ব দেবার মতো ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, কোথা থেকে দেবো ? কানুসের মতো আমি যা নই তা সেজিয়ে কী হবে ? অকিঞ্চিৎকর দিতে যদি তোমার মাথা কাটা যায়, দিও না। নাতির অন্নপ্রাশনে রুপোর বাসনই দিতে হবে এটা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা আছে আমার জানা নেই, অতএব ওটা হবে না।'

আর ভারতী ?

ভারতী প্রাণপণ আয়াসে সেইগুলোই ঘটিয়ে তোলেন। কারণ না ঘটালে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের মুখ 'ছোট' হবে।

আবার মেয়ের কাছে সেটা উহ্যও রাখতে হবে, না রাখলে মেয়ে অভিমানে খান খান হবে। স্বামীর সম্মানের কাছেও তো নিরুপায়তা মেয়েদের। স্বামীকে কি ভারতী উদ্ঘাটিত করে ধরবেন তাঁর সন্তানদের সামনে ? বলতে পারবেন, 'দেখ্ দেখ্' যা কিছু পাচ্ছিস তোরা, সবই আমার আদায়ের জোরে। ও আদর্শচরিত্র মহাপুরুষ, এই সব তুচ্ছ মায়া মমতা, সমাজ সামাজিকতা ওর কাছে পরম অবজ্ঞার বিষয়। ও জানে এ সমস্তই বাহুল্য, অপ্রয়োজনীয়।

না, তা পারেন না ভারতী।

তাঁকে স্বামী কুল দুই রাখতে হয়।

তাই মেয়ের ওই ঝেঁপাঝেঁপিটাই চোখে পড়ে, কারণটা জানা হয়না। সেটা ভারতী যা হয় একটা 'গল্প' বানিয়ে গোঁজামিল দেন।

সেই বানানোটাতে অবশ্যই ত্রুটি থাকে, কাজে কাজেই ওরা মাকে আরো 'ভুল' ভাবে।

ছোট্ট থেকে দিগন্ত অন্য ধরণের।

জন্মর মতো ভালো খাওয়াটি, ভালো পরাটি এবং ভালো মতো হাত খরচটি পেলেই সব পাওয়া মিটে যেতো না। দিগন্ত ওই জিনিসগুলোর ধারই ধারতো না। সে শুধু ছোট থেকে বলেছে, 'মা, তোমার তো বেশ-'গোপাল অতি সুবোধ বালক' গোছের একটি ছেলে আছে, আমাকে তুমি দেশের নামে ছেড়ে দাও। আমায় তুমি 'আমাকে' দিয়ে দাও।'

ভারতী শঙ্কিত হতেন। ভারতী একটা সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেতেন তার কথায়।

তবু ভারতী তখন, দিগন্তর সেই ছেলেবেলায়, আলটু-বালটু কথা বলে ভাগা দিতেন। প্রশ্নের উত্তরটায় বলতেন, 'এসব ভালো ভালো কথা কোন নাটকে পড়েছিস রে?' বলতেন, 'তোকে তোকেই দিয়ে দেবো? নাঃ বাপু এ ধরণের রহস্যময় ভাষার পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

কিন্তু ছেলে যখন আর শিশু রইল না, রইল না বালক? যখন কৈশোরের দোলার সময়টিতে সে আপন সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতা, সব কিছুকে তৃণবৎ ত্যাগ করে লক্ষ্যের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, তখন কে তাকে পাখা দিয়ে আগলে আগলে ঢেকে রেখেছে তার আদর্শবান বাপের রোষের আগুন থেকে?

অনন্তজীবনের পথ, আর দিগন্তজীবনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ আপাতদৃষ্টিতে ভারতী এদের একেবারে কাছাকাছি বেঁধে রেখেছেন মিথ্যার ডোর দিয়ে দিয়ে।

দিগন্ত যখন বাঁধা নিয়মে তাদের পার্টির অফিসে চলে গেছে কলেজ ফেরৎ, ভারতী তখন মিথ্যে থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন, 'কি জানি বাপু, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে না কোথায় যেন পড়তে যায় বুঝি। তা' লাইব্রেরী কি এতো রাত অবধি খোলা থাকে? বাসটাস পাচ্ছে না বোধ হয়।'

দিগন্ত যখন ছুটিটুটির দিনে ভোর থেকে রাত অবধি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে, তখন ভারতী অবলীলায় বলেছেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে যাবার কথা ছিল!'

কিন্তু কদিন আর খাঁচল দিয়ে আগুন ঢেপে রাখা যায়?

ধরা পড়ে যায় মিথ্যার রহস্য, অনন্তজীবন তিক্ত হাসি হেসে বলেন, 'এমন নইলে মা?'

তখন ভারতী তর্ক যুদ্ধে নামেন।

বলেন, 'মাকে ওরকম হতে হয়েছে বাপের রাগের ভয়ে। সবাই কি এক পথে চলে? কতো ছেলে তো বৈরাগ্যের পথও বেছে নেয়। সবই মেনে নিতে হয়।'

অনন্তজীবন শুধু মৃদু হেসে বলেছেন, 'তা সত্যি, কতো ছেলে তো চুরি ডাকাতি খুনখারাপির পথেও যায়। মেনে নিতে হয় বৈ কি।'

ভারতীকে চুপ করে যেতে হয়েছে।

কিন্তু অন্তর বেলাতেই কি কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি?

অন্তর যখন কেবলই 'হাত খরচের' টাকা ফুরিয়ে যেতো?

অনন্তজীবনের কাছে আবেদন করতে আসতে হতো কাকে?

অনন্তজীবন বলতেন, 'তোমার মধ্যে মাতৃস্নেহটা যদি একটু কমমাত্রায় থাকতো, হয়তো 'মানুষ' হতো ছেলে দুটো।'

দুটো ছেলেকেই 'অমানুষ' ভাবেন অনন্তজীবন। বড়োটাকে হয়তো ভারতীও ভাবেন। ছোট? দিগন্ত? ওর সম্পর্কে যে ভারতীর পরম মূল্যবোধ।

অনন্তজীবন ওই বোধটাকে বাদ করেন।

কদাচ ওর সম্পর্কে সহজ নামে উল্লেখ করেননি। বলেছেন 'তোমার বেপরোয়া ছেলে।'...বলেছেন 'তোমার রণজয়ী ছেলে।'

কিন্তু সেও অতীত কথা।

এখন আর ছিপ্ত সম্পর্কে কোনো উল্লেখই করেন না অনন্তজীবন। ও থাক্ না থাক্ কিছুই যেন এসে যায় না ওঁর।

নীরবতার বিরুদ্ধে বগড়া চলে না। ভারতী শুধু মনে মনেই তর্ক করে চলেন, 'কেন? কেন তোমার ওর সম্পর্কে অতো অবজ্ঞা, অতো বিদ্বেষ। ও কি মাতাল? অসচ্চরিত্র? জোচ্চোর, বেরেবখাজ, কালোবাজারি? না কি জুয়াড়ী উচ্ছৃঙ্খল?

ওর যদি নিজস্ব কোন আদর্শ থাকে, তুমি অবজ্ঞা করতে যাবে কেন? কই তোমার বাবা তো তোমাকে কোনোদিন এরকম করেননি?

হ্যাঁ, 'আমার ঘুধিষ্ঠির ছেলে' বলে কৌতুক করেছেন, পরিহাস করেছেন, এমন বিদ্বেষ করেননি।'

তুলনাটা ভারতীর একটা অভ্যাস।

আজও ভারতী বিগত একটি কালের সঙ্গে আজকের তুলনা করছিলেন।

তখন রাত্রার সময়।

অনন্তজীবনের 'ডিউটির' কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, নিরাপত্তারও না।

যখন তখন বেরিয়ে যেতে হতো, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো।···

ছেলে যতোক্ষণ না ফিরতো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন যোগজীবন। বেশী রাত হলে রাস্তার ধারের বারান্দায় পায়চারি করতেন। হয়তো সারারাতই।

ভারতী মাঝে মাঝে বলতো, 'বাবা আপনি ঘুমোন।'

যোগজীবন সঙ্গে সঙ্গে বলে বসতেন, 'তুমি ঘুমোওগে না পরের বেটি।'

ভারতী তার উদ্বেগে কালিপড়া মুখেও হেসে ফেলে বলতো, 'আপনার শরীর খারাপ হবে বলেই বলছি বাবা—'

যোগজীবনও হাসতেন তখন।

বলতেন, 'ঘুম কি আমার হুকুমের চাকর বৌমা? যে ডাক দিলেই আসবে?'

তখন দুজনেই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতেন জনহীন রাস্তার শেষ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে।

আর আজ?

আজ যোগজীবনের ছেলে অনায়াসেই হুকুম দিলেন, 'সব আলো নিভিয়ে দে। আর কেউ আসবে না।'

অনন্তজীবনের ছেলের নিরাপত্তার অভাব নেই,

না কি বাপের ইচ্ছার পথে চালিত না হয়ে সে নিজের পথে চলতে শুরু করেছে বলে, পিতৃহৃদয়ের ভয়টুকু ঘুলো হয়ে ঝরে গেছে? উদ্বেগ ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা, এসবের কিছুই আর তার প্রাপ্য নয়?

তা সেই সময় ভারতীর নিজেরই আর এক ছেলে ওতে মন্তব্য করছিলো, 'সত্যি বাবার রাগ করবার রাইট্ আছে। ওই ছেলেটাই—'

যদিও মা যে সেই ছেলেটাকে যথেষ্ট বুঝিয়েছেন বলেছেন, সেকথা স্ত্রীর কাছে বলেছে সে। বাবার মতো বলেনি 'যার প্রশ্রয়েই এটি হয়েছে।'

আর বৌ যখন সমালোচনা করলো ওর ভাইয়ের, তখন স্ত্রীর ওপর বিরক্তই হলো। বললো, 'আর কীভাবে শাসন করতে হবে? প্রহার দিয়ে?'

এই সময় নিচে থেকে সেই খোলার বিশেষ আওয়াজটি শোনা গেল। যে আওয়াজের জন্যে ভারতী প্রায় প্রতিদিনই অনেক রাত পর্যন্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, আর অন্তু নামের ছেলেটা তিন ঘণ্টা আগে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লেও, ওই আওয়াজটা না শোনা পর্যন্ত স্বস্তি করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

'ওই যে এলেন!'

বললো অন্তুর বৌ।

অন্তু এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো, বৌ আটকাতে পারলো না। কারণ অন্তুর ভয় ছিল ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো ভিক্ত পরিস্থিতি ঘটে কিনা। নিশ্চয়ই অনেক বেঁটে অনেক ঘুরে খিদে তেষ্টায় কাহিল হয়ে এসেছে—

ভাইটার দুর্মতির জন্যে ভারী দুঃখ হয় অন্তুর। কেন যে ও অন্তুর মতোই সাধারণ বুদ্ধিসুদ্ধিওলা একটা ছেলে হলো না!

অমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেটা! ভাল কাজকর্ম করতো, সুন্দরী পাত্রী জুটিয়ে বিয়ে দেওয়া হতো, সুখে জীবন কাটাতো, আর সর্বোপরি কারো সমালোচনার পাত্র হতে হতো না, তা নয় এক সর্বনাশা দুর্মতির পথ বেছে নিয়ে—

সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অন্তু, কই দিগন্তর গলা কই? এটা আবার কার গলা? মেয়েলি মেয়েলি?

হ্যাঁ মেয়েরই গলা।

গেট খুলে যে ঢুকেছিল এই মাত্র এগারোটা রাতে, সে পাড়ার সুজনবাবুর ছোট মেয়ে ঝুলি!

ঝুলিরই গলা শোনা যাচ্ছে—

'কোনো খবরও দেয়নি? তা'হলে কী হবে মাসিমা?'

তাহলে কী হবে।

ও এমন তাড়া তাড়া গলায় একথা বলছে কেন? কে ও? সুজনবাবুর মেয়েটাই মনে হচ্ছে তো!

অন্তু অবাক হলো।

অন্তুর হঠাৎ মনে এসে গেল, মেয়েটার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম নেই তো দিগুর? না হলে এই রাতদুপুরে একটা মস্ত বড় মেয়ে পরের বাড়ি ছুটে আসে?

তা এটাও তো মন্দের ভালো।

ওই প্রেম-ট্রেম একটু থাকলেও তো বোঝা যায় কিছুটা সাধারণ। পুরো অসাধারণ হওয়াই যে মহা বিপদ!

জয়ন্ত আর এক ধাপ সিঁড়ি নামলো।

মার গলা শুনতে পেলো, 'যা হবার তাই হবে।'

মার গলাটা যেন কোন দূর দিগন্ত থেকে ভেসে এলো।

ভাবশূন্য, অভিব্যক্তিশূন্য, অদ্ভুত গলা!

মেয়েটা কি মাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে?

তাই আস্তে বলছে, 'আসলে ওই খবর দেওয়াটা অভ্যাস নেই বলেই—অথচ আশ্চর্য, আপনাদের নিজেদের বাড়িতেই টেলিফোন, খবর দেবার কতো সুবিধে! দাদা তো দেরী টেরী হলেই এই লীলাদের বাড়িতে ফোন করে খবর দেয়। জানে তো মা একটু দেরী দেখলেই কান্নাকাটি লাগাবে!'

জয়ন্ত আবার তার মার গলা শুনতে পেলো!

'তোমার দাদা জানে তোমার মা ছেলেকে ভালবাসে, ভাবনা হলে কাঁদে—'

মার গলাটা যেন আরো দূরে সরে যাচ্ছে, যেন একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা বোধকরি লজ্জিত হলো।

বোধকরি ওই স্বরটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। তাই তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি যাই মাসিমা, দাদা দিগন্তদার খবরটার জন্যে ফোন্ ধরে বসে আছে—কলেজ স্কোয়ারে তো আজ খুব গোলমাল হয়েছে।'

মেয়েটার গলাটা কাঁপা কাঁপা?

না কি জয়ন্তর কানের ভ্রম?

আবার গেট ঠ্যালার শব্দ পেলো জয়ন্ত। তখন নিচে নেমে এলো। মেয়েটার সামনে চট করে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছিলো।

যদি ভাবে। ছি ছি, কী অদ্ভুত দাদা যে। ভাইটা কোথায় বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েনি। কে জানে হাসপাতালে না হাজতে গিয়ে পড়ে আছে, আর দাদাটা কিনা দিব্যি খেয়ে-দেয়ে পান চিবোচ্ছে!

নিজের কাছেও লজ্জা এলো জয়ন্তর।

যাক মেয়েটা চলে গেলো।

তাড়াতাড়ি নেমে এলো জয়ন্ত।

বলতে গেল, 'মা মেয়েটা কে বলতো? কী বলতে এসেছিল?' কিন্তু বলতে অবকাশ পেলো না।

ভারতী কেমন একটা ঝাপচাড়া ভাবে বলে উঠলেন, 'ও, তুই জেগে আছিস? একবার এগিয়ে গিয়ে ওই মেয়েটাকে জিগ্যেস করলে তো—ও আর কিছু খবর দেবার জন্যে এসেছিল কিনা—'

জয়ন্ত কথাটার মানে বুঝতে পারে না, বোকার মতো বলে, 'আর কি খবর?'

ভারতী ক্লান্ত গলায় বলেন, 'যে খবর মার মুখের ওপর বলা যায় না। তুই জেনে আয় তো বলবে আমার মা খুব শক্ত, যা বলবার স্পষ্ট করে বলে যাও।'

'আঃ কী যে বল—' জয়ন্ত তেমনি হতভম্ব ভাবেই সত্যিই বেরিয়ে যায় গেট ঠেলে।

এতো রাত্রে একটা মেয়ের পিছু পিছু ছোটাটা যে কুদৃশ্য তাও চট্ করে মনে পড়ে না।

ভারতী সিঁড়ির শেষ ধাপটায় বসেছিলেন।

এখানে জুতোর ধুলোর ছড়াছড়ি, এখানে সকলের পা, জীবনেও কখনো এখানে বসে থাকতে দেখা যায়নি ভারতীকে। ওই কোনোদিন না-দেখা দৃশ্যটা দেখেই কি অনন্তর নিজের গতিবিধির দৃশ্যটা শোভন হচ্ছে কিনা মনে পড়লো না?

অনন্তজীবন কোনখানে যেন ছিলেন, বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'এটা কী বসবার জায়গা?'

ভারতী উত্তর দিলেন না।

অনন্তজীবন বললেন, 'খুব খারাপ দেখাচ্ছে, রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে।'

ভারতী নির্বাক।

অনন্তজীবন বললেন, 'দেশের চিন্তা করেও দায়িত্ববোধ থাকতে পারে তার প্রমাণ পেলে তো?'

ভারতী হঠাৎ অনন্তজীবনের ভাষায় কথা বললেন।

বিবর্ণ গলায় বললেন, 'আমায় একটু চুপ করে থাকতে দেবে?'

পিছনে পায়ের শব্দে ভয় পেয়েই বোধহয় মেয়েটা প্রায় দৌড়চ্ছিল। এতোরাত্রে এই বয়সের একটা মেয়ে নেহাৎ প্রাণের দায়ে ভিন্ন রাস্তায় বেরোয় না। অনন্ত বুঝছিল, কিন্তু কি ব'লে তাকে আশ্বস্ত করবে? নামও তো জানে না ছাই।

তবে কি ফিরে যাবো?

সত্যি কি বলতেই বা এসেছি আমি?

তবু চলতে লাগলো দ্রুত।

ভয় ওকেও তাড়া করেছে। ভয়ানক একটা ভয়, যার ওই ধাপছাড়া গলায় যে ভয়ের ইশারা। যদি যার আশঙ্কা সত্যি হয়। ও হয়তো যাকে সামনে দেখেই—হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে যা তা বলে পালাচ্ছে।

'শুনুন! শুনছেন!'

মেয়েটা তবু দ্রুত পা চালাচ্ছে।

অনন্ত আরো দ্রুত।

কিন্তু নীলাদের বাড়িটা এসে গেছে।

সেটা সুজনবাবুদেরও বাড়ি। ছোটো তলার দু ফ্ল্যাটের দু'ভাড়াটে। জুলিরা আর নীলারা।

দরজায় ঢুকে পড়েই দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতে হলো, আর থমকে গেল মেয়েটা। হাঁপাচ্ছিল, শুকনো গলায় বললো, 'আপনি! বিপত্তারণ দাদা!'

'হ্যাঁ!' অনন্তর হঠাৎ মনে হলো এ আমার ছোট ভাইয়ের প্রিয়া; এ আমার স্নেহের পাত্রী, একে আমি 'আপনি' করে বলতে যাবো কেন?

ভাই বড়ো ভাইয়ের মতো গলায় বললো, 'তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না?'

জুলি হাঁপাতে হাঁপাতেই একটু হাসির মতো করলো, 'না ভয় পাবো কেন? কিন্তু একটু দাঁড়ান, আমার দাদা কোন ঘরে বসে আছে—।'

লীলাদের ফ্ল্যাটটাই নিচতলায়, ঢুকে পড়লো একটা ঘরে, পরক্ষণেই গলা পাওয়া গেল ওর।

'ষড্ডো দেরী হয়ে গেল রে দাদা! বাবা তো বাড়ি নেই জানিসই, আমাকেই যেতে হয়েছিল— এতো রাত্তিরে? তা কী করবো? দরকারের সময়—

মা বলছিল যা যাবে। যা যেতে আসতে তো সকাল হয়ে যেতো। · না ফেরেনি দিনভর।

হ্যাঁ মানিমার অবস্থা তো—মানে আমাদের মার মতো কাঁদেন টাঁদেন না তো! আচ্ছা দাদা তোর কি মনে হচ্ছে কোনো বিপদ টিপদ—।'

অন্তু এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো মেয়েটার গলাটা কেঁপে গেল।

অতএব অন্তু আর একটা কথাও স্পষ্ট বুঝতে পারলো না।

অন্তু আবার শুনতে পেলো, 'কিন্তু ভাল থাকলে তো খবর দেবে একটা;'

'ওদের অতো সুবিধে রয়েছে।···তা জানি, বাড়ির কোনো সুবিধে গ্রহণ করাটাকে ও খুব ঘৃণা-দুর্বলতা বলে মনে করে। কিন্তু এরকম দিনে—আচ্ছা দাদা রাখছি।··মেয়েটার খুব খাটো গলার একটা কথা শোনা গেল, 'বাইরে আবার দিনভরার দাদা দাঁড়িয়ে···জানি না কেন! আচ্ছা রাখছি—'

ও আবার ফিরে আসতেই অন্তু ম্লানভাবে বলে, 'দিশু কি তোমাকেও কিছু বলে যায় নি?'

জুলি চমকে ওঠে।

কেঁপে ওঠে।

তেমনি শুকনো গলাতেই বলে, 'আমাকে বলে যাবেন কেন? মাসিমাকেই বলে যান নি—'

অন্তু সামলে নেয়।

আস্তে বলে, 'না মানে, তুমিও তো ওদের দলের লোক।'

'আমি কেন ওদের দলের লোক হতে যাবো?'

'না এমনি। মানে—'

মানেটা ঠিক বোঝাতে পারে না অন্তু, অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'আচ্ছা আমি তাহলে যাই। মা বললেন, তাড়াতাড়ি বলে এলে—কি বললে ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাই—আচ্ছা আমি যাচ্ছি—'

যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত চলে যায় অন্তু। আর জুলি দাঁড়িয়ে থাকে সেইদিকে চেয়ে।

জুলির মনের মধ্যে, এতো উদ্বেগের মধ্যেও একটা কথাই যেন জলতরঙ্গের মতো বাজতে থাকে, 'তোমাকেও কিছু বলে যায় নি?'

তার মানে উনি সন্দেহ করেছেন।

তার মানে উনি বুঝতে পেরেছেন।

অথচ 'দিশু' নামের সেই নির্বাঞ্ঝাট ছেলেটা?

এতোদিন ধরে দেখে চলেছে, তবু বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না জুলি নামের মেয়েটা কোন ছোট্টবেলা থেকে তার পায়ে প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে।

আগেকার দিনগুলো কী ভালোই ছিল।

দাদা আর ও এক ক্লাসের বন্ধু কিন্তু একমতের ছিল না আগে, তাই—দু'জনে একত্র হলেই জোর

তর্ক শুরু হয়ে যেতো দু'জনে। জুলি তার ফ্রকটাকে টেনে টেনে হাঁটু দুটো ঢাকা দিয়ে এককোণে বসে হাঁ করে গিলতো সেই তর্কের কথা।

কিন্তু কথাগুলোর প্রতি মন ছিল জুলির ? না তার একপক্ষের বক্তার প্রতি ?

দাদা মাঝে মাঝে বলতো, 'তুই এখানে বসে আছিস কী করতে ?'

অন্যজন মহোৎসাহে বলতো 'তাতে কি ? থাকুক না। জ্ঞানবৃদ্ধি হবে। তাছাড়া ছুচু, দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের মধ্যেই এই সত্য চেতনা আনা দরকার। আমাদের এদেশের মনের গড়নই হচ্ছে চিরকালের খুঁটিতেই বাঁধা থাকবো। নতুন কিছু আসতে চাইলেই তাকে প্রাণপণে ঠেকাবো। এ মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। ছোট থেকেই শিক্ষা ভালো।'

জুলি ওই সব উচ্চ চিন্তার কথাগুলো হয়তো ঠিক বুঝতে পারতো না, তবু জুলি মুগ্ধ হয়ে শুনতো, বক্তার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতো।

দাদা বলতো। 'কিন্তু সেই খুঁটিটা যদি সত্যিকার শক্ত খুঁটি হয়। যদি পুরনো হলেও ঘরের চাল ধরে রাখবার ক্ষমতা তার থাকে ?'

'আছে, তার প্রমাণ কই ?' উত্তেজিত হয়ে উঠতো 'দিগন্ত' নামের সেই তরুণ ছেলেটা। বলতো, 'তাই যদি থাকতো, এই হাল হতো দেশের ? কেউ দেয়ালে গর্ত কেটে সোনা পুঁতে রাখছে, কেউ না খেয়ে ফুটপাথে পড়ে মরছে। কোথাও একশোগুণ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে লোকে বেকার হয়ে ঘুরছে, আর কোথাও মূর্খ বুদ্ধু একটা লোক টপ্‌এ উঠে বসে আছে। যে চাষারা গায়ের রক্ত জল করে দেশের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, তার ঘরে ভাত নেই। আর তাদের সেই গায়ের রক্ত জল-করা জিনিস নিয়ে মুনাফাখোরেরা কোটি কোটি টাকা ঘরে তুলছে। শক্ত খুঁটি! হুঁ! বলিসনা ছুচু, এরকম অব্যবস্থার দেশ আজকের দিনে বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই।'

জুলির দাদা ছুচু ভাল নাম যার—সুযন সে তখনও তর্ক করতো—'কিন্তু এটাই কি এসবের প্রতিকারের পথ ?'

'নিশ্চয়ই! কারণ এটাই পরীক্ষিত পথ।'

'কিন্তু সব দেশের জল মাটি বাতাস মনোবৃত্তি তো সমান নয়। একই ওষুধ কি খাটে ?'

'তা সেটা ওষুধ প্রয়োগ না করলে বোঝা যাবে কি করে ?'

ক্রমশঃ ছুচুও ওর প্রভাবে প্রভাবিত হলো। আর জুলি, যে বাকি ওই তুলনা টুলনা গুলো আদৌ বুঝতে না পারলেও মুগ্ধ হয়ে শুনতো, সে আস্তে আস্তে ওগুলো বুঝতে শুরু করলো।

কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই তো মন প্রাণ সমর্পিত!

অথচ ওই অদ্ভুত অন্যমনস্ক।

কিন্তু ইনি এক রহস্যময় দেখায় কী করে বুঝতে পারলেন ? দিগন্তর এই দাদা ?

দিগন্ত পছন্দ করেনা তার বাড়িতে তার বন্ধু টন্টু কেউ যায়। কদাচ কেউ তাকতে গেছে, বাইরে থেকে ডাকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দিগন্ত, কখনো বলেনি 'ভেতরে এসে বোস না।' বাড়িটাকে যেন পরের বাড়ির মতো ভাবে দিগন্ত। যেন ওখানে ওর কোনো অধিকার নেই, যেন আশ্রিতের মতো আছে।

কেন এমন মনোভাব গড়ে উঠেছে ওর, কে জানে। দাদুর স্নেহচ্ছায়ায় শৈশব কেটেছে ওর। মায়ের কোলের ছেলে, তবু কেন এমন ধারণা ওর!

হয়তো নিজেই ও ওই প্রাসাদতুল্য বাড়িটাকে 'নিজের' ভাবতে পারে না, তাই ও বাড়ির বাসিন্দাদেরও 'অনাত্মীয়' মনে হয়, মনে হয় অন্য জাতি। মিস মেটা ব্যতিক্রম!

বন্ধুই যায়না, তা বন্ধুর বোন।

জুলি কখনো অনন্তজীবন বোসের বাড়ির গেট ঠেলে ঢোকেনি।

তবু জুলি দিগন্তর দাদাকে চেনে, মা বাবাকে চেনে। চেনে বৌদিকে আর তার ছোট বাচ্চাটাকে। নিজের বাড়ির জানলা থেকেই ওই সব চেনা টেনা জুলির।

হয়তো বা রাস্তায়।

ওরা গাড়িতে, জুলি মাটিতে।

হয়তো বা পুজোর সময় পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে ওরা অঞ্জলি দিতে এসেছে, জুলিও গেছে।

অনন্তজীবন অবশ্য কখনো প্যাণ্ডেলে গিয়ে অঞ্জলি দেননা, জয়ন্তও না। গিন্নী আর বৌটিই। তবে জয়ন্তকে বেশ মুরুব্বির মতো গিয়ে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়।

দিগন্ত কখনই ও পথ মাড়ায় না, কিন্তু সুমন আগে খুব উৎসাহী কর্মী ছিল। সেই সূত্রেই—

সুমনও আজকাল উৎসাহকে অন্যপথে চালিত করেছে, কিন্তু জুলি না গিয়ে পারে না। এই পুজো উপলক্ষেই তো খানিকটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া। অন্য আর কোন রাত দুপুর অবধি বাড়ির বাইরে থাকার হুকুম মেলে? আর কবে ছেলেরা মেয়েরা একত্রে কাজ করবার এবং কাজ না করবার সুযোগ পায়?

জুলির দুঃখ হয়। এমন সোনার সুযোগের মাঝখানে দিগন্তরা থাকেনা।

কারণ দিগন্তরা ওই সব সুযোগ টুযোগের ধার ধারে না। অথচ দিগন্তরার দাদা, একবার দেখে, অনায়াসে বলে উঠলেন, 'তোমাকে ও বলে যায়নি?'

তার মানে 'তুমি' একটু বিশেষ।

তার মানে 'তুমি' ওর সব কিছু জানবার অধিকারিণী।

কিন্তু জুলির মুখে কি সেই অধিকারের ছাপ আছে?

না কি জুলির মুখে কিছু ব্যাকুলতা ফুটেছিল? জুলি তো খুব সাবধানে শক্ত হয়ে কথা বলছিল। জুলির পা কাঁপছিল ছুটে ছুটে একটা কখনো না-আসা বাড়ির মধ্যে ঢুকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করতে, তবু জুলি গলা ঠিক রেখেছিল।

রাখতে যে পারেনি—সেটা টের পায়নি জুলি। তাই ভাবছিল 'রেখেছিলাম।'

অনেকক্ষণ জুলি তন্ন তন্ন করে ভাবতে চেষ্টা করলো, জুলির ব্যবহারে কী প্রকাশ পেয়েছিল।

তারপর—

জুলি হঠাৎ নিজেকে ওই ভেসে যাওয়া থেকে টেনে আনলো।

ভাবলো, দূর কী সব যা তা ভাবছি। বুঝতে আবার পারবেন কি। ওই তো বলে গেলেন, 'তুমি ওর দলের লোক—'

তাই ভেবেছেন।

আমি ওদের পার্টির।

তুলির চোখটা হঠাৎ জলে ভরে আসে। হতে পারতাম তা। আমাকে একটু কাছে লাগাবার জন্যে ধরে নেবার জন্যে ঘরে গিয়েছি আমি, ওতো চেয়েও ছিল নিতে। বলেছিল 'আসুক না তুচু, পার্টিতে তো কতো মেয়ে রয়েছে। না থাকলে চলবেই বা কেন? একখানা চাকার গাড়ি চলে? একটা ডানার পাখি ওড়ে?'

কিন্তু দাদা রাজী হল না।

দাদা বারণ করে দিল।

মা বাবা চটে যাবেন বলে খুঁৎ খুঁৎ করলো, বিয়ের লগ্ন হচ্ছে, বলে ছুতো তুললো।

গিরজা তখন হাসতে লাগলো।

বললো, 'তবে যাও হে কন্তে, বাসর ঘর আলো করোগে।'

বিয়ে আমি করছি বৈকি!

কক্ষণো করবো না!

আর একটু বড়ো হই না, পড়াটা শেষ করে একটা চাকরী-বাকরী জোগাড় করে ফেলি না, তারপর বেরিয়ে যেবো।

কিন্তু ওর কী হলো?

ও কোথায় গেল?

ও কেন ফিরলো না?

আর শুধুই তো না-ফেরা নয়, ও যে আগুনের মুখে গিয়েছিল। হয়তো কাল খবরের কাগজে 'হতাহতের' সংখ্যায় ওর নাম থাকবে—

হঠাৎ উথলে উথলে কান্না পায় ওর।

ছুটে দোতলায় উঠে যায় নিজেদের ফ্ল্যাটে। লীলা বলে ঘর থেকে 'কী হলো যে?'

'কিছু না, মা ভাবছে—' বলে বাঁধ দিয়ে আসে।

কিন্তু তখনই তো আবার বাঁধ দিতে হবে যায় কাছেও। বাঁধ দিতে দিতেই তো মানুষের চলা। ভিতরের কলকল্লোলকে ছেড়ে দিলে আগেই তো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মান মর্যাদা।

সব যায় যাক, মান মর্যাদাটা থাক।

মা বললেন, 'হ্যাঁ রে আসেনি?'

'না!'

'তাই তো, ভারী ভাবনার কথা হলো তো! গিন্নী খুব কান্নাকাটি করছে দেখলি?'

'সবাই তোমার মতো ছিঁচকাদুনী নয়?'

'ছিঁচকাদুনী? হুঁঃ! যতো হও, ছেলের মা হও, তখন বুঝবে!'

'উনিও ছেলের মা। চুপ করেই বসে আছেন।'

তুলির মা এ সংবাদে প্রীত হল না।

বিরক্ত গলায় বলেন, 'যতো লোকের কথাই আলাদা।'

অন্য দিন হলে ছুলি এখন মায়ের সঙ্গে কৌতুক শুরু করতো। হয়তো বলতো, 'তাহলে ধরে নিতে হবে 'মাতৃস্নেহ' জিনিসটা শুধু না বড়লোকদেরই? ধরো আমি খুব বড়োলোকের বৌ হবো! তাহলে আর তোমার মনের অবস্থা কোনো দিনই বুঝতে পারবো না?'

কিন্তু আজ ওর উথলে উথলে কান্না পাচ্ছে।

অথচ কিছু করার নেই।

দাদাটা যদি আসতো, নিশ্চয় একটা সুরাহা হতো!

কিন্তু ওরা কি?

ওই দিগন্তর বাবা মায়ারা?

ওদের গাড়ি রয়েছে, ফোন রয়েছে, চাকর বাকর রয়েছে। আর নিজেরা দু' জন রয়েছে। অথচ ওরা বাড়িটি অন্ধকার করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমের তোড়জোড় করছে।

তাছাড়া আর কি!

ঘুমের আয়োজন না হলে আলোগুলো নেভানো কেন? নেহাৎ গেটের আলোটা জ্বলছিল, বোধহয় চাকর দারোয়ান কেউ ঘুমের আগে ওটা নিভিয়ে গেটে তালা লাগাতো।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

গাড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করতে পারছে না, থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে খবর নিতে পারছে না? নিজে তো পুলিশে চাকরী করতে, এ ধরণের ঘটনার পরিণতি কী কী হতে পারে জানোনা তা' নয়।

হঠাৎ সমস্ত রাগ ছুলির ওদের ওপর পড়ে।

আচ্ছা অনন্তজীবনের মধ্যেই কি তোলপাড় করা একটা যন্ত্রণা চলছিল না?

সত্যিই কি ভারতী যা ভাবেন তাই?

পাষাণ দিয়ে গড়া অনন্তজীবনের হৃদয়?

তা' তো নয়।

ভারতীর সেই সন্দেহের জায়গাটায় তো এখন রক্ত ঝরছে। মুচড়ে মুচড়ে ওঠা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়েছে যে সেইখানটা।

ইচ্ছে হচ্ছে না তাঁর ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, ওর ওর করে খুঁজে বেড়ান সেই উদ্ধত অবাধ্য অবিনয়ী ছেলেটাকে? খুঁজে বেড়ান থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে। বলেন, 'কলেজ স্কোয়ারের গোলমালে হতাহতের তালিকার নামগুলো একবার দেখাও তো আমায়। নাম জানো না? তবে চেহারাটা? চেহারাটাই তবে দেখাও তোমরা।'

কিন্তু ওরা যদি সেই চেহারাটা দেখাবার জন্যে লাশকাটা ঘরে নিয়ে যায় অনন্তজীবনকে?

তারপর ওরা যদি অনন্তজীবনের মুখের ওপর ব্যঙ্গ হাসি ছুড়ে মেরে বলে, 'কী মশাই চিনতে পেরেছেন?' চিনতে পারা এতো সোজা নয়।

চিনতে জানাও সহজ নয়।

চিনতে জানলে—ছেলেটাকে এইখানে এসে পৌঁছতে হ'তো না।

তো নিয়ে যান পরিচয় টরিচয় লিখে দিয়ে।'

আর তারপর অনন্তজীবনকে বয়ে নিয়ে আসতে হবে সেই 'চেনা' দেহটাকে। বয়ে এনে বাড়ির দরজায় রেখে ঘটা করে দাগিয়ে গুছিয়ে—

পাড়ার লোকেরা জানালায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সেই দৃশ্য, আর হা হুতাশ করবে!

অথবা সমালোচনা।

অনেকবার এই ছবির রীলটা মনে থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছেন অনন্তজীবন, মুছে ফেলতে চাইছেন হাত দিয়ে, কিন্তু ঘুরে ফিরে কেবল ওই ছবিটাই চোখের সামনের পর্দায় ছায়া ফেলছে।

অনন্তজীবন তাই অনড় হয়ে বসে আছেন ঘরের মধ্যে।

ঘরের দরজায় ভারী পর্দা, কেউ এ ঘরে সহজে উঁকি মারে না। আর মারবেই বা কে? ভারতী? না:, ভারতী তো নিশ্চিন্তায় সেই সিঁড়ির ধাপেই বসে আছেন।

অতএব এ বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছে অনন্তজীবন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন।

অন্তরা ফিরে এসে দেখলো, মা সেই ভাবেই বসে।

বললো, 'মা ওপরে চলো।'

ভারতী স্বামীর কথার উত্তরও দেননি। ছেলের কথায় ফিরলেন। ভাবলেশহীন মুখ তুলে বললেন, 'ওপরে যাবো? কেন?'

'বাঃ এইখানে বসে থাকবে নাকি?'

ভারতী ঘোমটে গলায় বললেন, 'তা' ওকে যতক্ষণ না নিয়ে আসছে, বসে থাকতে হবে বৈকি! নাহলে যারা নিয়ে আসবে 'তারা কী ভাববে?'

অন্তরা সব কিছুই হেঁয়ালিতে ঘোরে। তাই অন্তরা অবাক হয়ে বললো, 'কারা আসবে?'

এখানটা গেটের মুখ। কটা সিঁড়ি উঠে তবে বারান্দা, এই সিঁড়িটায় বসে আছেন ভারতী, এখান থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, জনশূন্য হয়ে যাওয়া সেই রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে ভারতী তেমনি ভাবেই বলেন, 'যারা দেখতে পাবে। যাদের হাতে পড়বে। চিনতে পারবে তো? কতো বড়ো একটা পুলিশ অফিসারের ছেলে, চিনতে পারবে না লোকে?'

অন্তরা আস্তে বলে, 'কেউ তাকে নিয়ে আসবে, একথাই বা ভাবছো কেন মা? হয়তো কোনোখানে গাড়াকা দিয়ে আছে, বাসটায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফিরতে পারেনি, আটকে পড়েছে। যেমন সুজনবাবুর ছেলে! যে ফোন করেছিল।'

ভারতী কঠিন গলায় বলেন, 'সে কি গাঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকবার ছেলে অন্তরা?'

'আহা কতোরকম পরিস্থিতি হতে পারে তো—।'

'অন্তরা তুই চুপ যা।'

অন্তরার অবশ্য সে ইচ্ছে হচ্ছিল, কারণ সে মনটাকে ঠিক করে নিচ্ছিল, সুজনবাবুর ছেলে যখন দিগুর বন্ধু, সে যা করেছে দিগুও তাই করেছে। শুধু দুজনে ছিটকে আলাদা হয়ে গেছে।

মন্দ খবর বাতাসের আগে ছোটে। সেরকম কিছু হলে ঠিকই কোন ভাবে না কোনোভাবে

কিন্তু মায়ের এই আদেশে হঠাৎ নিরীহ অন্তরাও একটু অপমান বোধ করলো।

বলে উঠলো, 'শুতেই যাই আর বসেই থাকি, ফল একই হবে মা।'

'আমি তো কোনো ফলের আশায় বসে নেই জয়ন্ত, আমি শুধু লোক নিন্দের ভয়ে বসে আছি।'

কথাটা হয়তো গভীর অভিমানের কথা, কিন্তু ভারতীর কণ্ঠস্বরে না ফুটলো অভিমান, না বা অভিযোগ, যেন ঘরা বিবর্ণ একটা গলা কথা কইছে অদৃশ্য কারো সঙ্গে।

জয়ন্তর বৌ বাজল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে, নিচতলায় কোন নাটক অভিনীত হচ্ছে তা জানবার জন্যে ছটফট করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত নাটকে যবনিকাপাত হলো কি না দেখতে অধীর হয়ে নেমেই এসেছে।

কিন্তু কই?

কোথায় সেই অপরাধীটি?

যে নাকি এ সংসারের সব স্বস্তি-শান্তির হরণকারী।

ওই একটি ছেলের জন্যেই তো বাড়িতে সর্বদাই অশান্তি, অবস্তি তার।

করবী নিজের ইচ্ছে মতো একটা বিয়ে করে চলে গেছে। আপদ গেছে, কিন্তু উনি যে বাড়ি বসে নিজের ইচ্ছে মতো চলছেন। সেটাই তো জ্বালা।

ওই যে লোকটা, ওকে সম্পূর্ণ করে পায় না বেচারা। ওই 'ভাই ভাই' করেই বাবু রাত দুপুর অবধি চঞ্চল।

জয়ন্তী একদিন বলেছিল হেসে হেসে, 'তুমি যে রকম কাজের লোক ছোট ঠাকুরপো, তোমার উচিত সেই কর্মক্ষেত্রেই আস্তানা গাড়া।'

তা স্পষ্ট মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছিল পাজিটা, 'তার মানে দরজা দেখিয়ে দিচ্ছেন?'

'ধাঃ দরজা দেখানো আবার কি?'

'ওরই নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার মা জননীটি যতোদিন জীবিত আছেন, অর্থাৎ থাকবেন, ততোদিন আর নিষ্কণ্টক হবার উপায় নেই, আপনার।'

ওই রকম কথাবার্তা ওর।

এদিকে তো এতো অন্তমনস্ক যে, জামা উল্টো করে পরে বোতাম খুঁজে পায় না।

খেতে বসে খেয়াল করে না কী খাচ্ছে।

কিন্তু কাজলের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই দিব্যি ব্যঙ্গের ছুরিখানি উঁচি দেয়।

দাদাকেই বা তাছাড়া কি। ব্যঙ্গ না হোক অবজ্ঞার কৌতুক।

বাপকে তো এড়াতে পারলেই বাঁচে, আজকাল তো কথাও নেই প্রায়।

মা ডেকে ডেকে 'খোকা খোকা' করে মরেন, তাই ক্যাবা ক্যাবা করে দু একটা কথা কয়।

কিন্তু দাদাটির একেবারে ভেতরে ভেতরে তাই অন্য প্রাণ।

কাজল বোঝে না নাকি?

আশ্চর্য, যে ভাই পৌঁছেই না, 'মনিষ্যি' বলেই গণ্য করে না, তার জন্যেও এতো ভালোবাসা।

তা ওই যে বোনটি, ওপর ঝোলা, বাঙালীর মেয়ে হয়ে একটি অবাঙালীকে বিয়ে করে ফেলে পড়েছেন। তার জন্যেও তো ভালবাসার কিছু কমতি নেই! বাবা মাকেও না জানিয়ে চুপি চুপি তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাওয়া হয়। কাজল ঠিকই ধরতে পারে।

কাজল বলে 'লুকোচুরির মানেটা কী? যা করবে সাহসের সঙ্গে করবে।'

তা বাবুর বলা হয়, 'আমি অতো বীরপুরুষ নই। আমি বাবা শান্তিটাই বুঝি। বাবা টের পেলে বাবা ভাববেন, বাবা যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখছি, তার মানে বাবাকে অপমান করছি। মা জানতে পারলে হয়তো ধরে বসবেন 'আমায় একবার দেখা—। কী দরকার?'

কাজল অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বলে, 'তা করবীর তো এক কোঁটাও টান দেখিনা। বাবাই না হয় রেগে আছেন, থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে তো একবার এসে পায়ে পড়ে মাপ চাইতে পারে?'

'বলেছি তো—' দাদাসিধে ভদ্রলোক ভিতরের কথা ফাঁস করে বসে, বলতে কসুর করিনি সেকথা, 'তা তেজী তো তীষণ। বলে কিনা মাপ চাইবার মতো কাজ করলে ঠিকই মাপ চাইতে যেতাম দাদা।'

'তার মানে তিনি কোনো অপরাধ করেন নি?'

কাজল ব্যঙ্গে তীব্র হয়।

বোকা ভদ্রলোক বলে, 'তা সত্যি বলতে, অপরাধ আর কী? এরকম বিয়ে তো আজকাল হাজারে হাজারে হচ্ছে। আমাদের বাবাই এখনো অতীত যুগে পড়ে আছেন তাই—'

'তা কই সেটা তো বাবার মুখের ওপর বলতে পারো না?'

'বাবার মুখের ওপর? ওরে সর্বনাশ!'

ওইখানেই কথার ইতি।

কাজলের রাগে গা জ্বলে যায়।

সত্যি বলতে কাজলকেও দোষ দেওয়া যায় না।

তার বাসনা ছিল, স্বামীটি, সন্তানটি আর নিজেটিকে নিয়ে ছোট্ট একটু নীড় রচনা করতে, সেই নীড়টি ভরা থাকবে হাসিতে গানেতে আনন্দের কলকুজনে। সেখানে মাঝে মাঝে আসবে তার প্রিয়জনেরা। তার পরম আত্মীয়েরা। তা নয় তার ভাগ্যে জুটলো একটা কুতুড়ে সংসার।

বৃহৎ একখানা বাড়ি, অথচ একটু নির্জনতা নেই, সবই গায়ে গায়ে।

তাও কিছু হতো না, যদি সংসারের লোকগুলো হতো স্বাভাবিক। কর্তাটি যেন একটি প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ, গিন্নীটি যদিও তা নয়, ঘোরতর সংসারীই, কিন্তু কর্তার সঙ্গে মিল না থাকায় সর্বদাই মনের আগুনে পুড়ছেন। বড়ো মেয়েটি মাঝে মধ্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসেন আর কেবলই নিজের সেই শ্বশুরবাড়ির গল্প করেন, শ্বশুর এতো ভালো, শ্বশুড়ী এতো ভালো যেন নন্দ তা ভাদুর সব ভালো। যার যা মুনদি ভালো, পুরনো চাকর শুদ্ধর ভালো।

তোর ভালো তোরই আছে, অতো বলার কি আছে? আর কোনো প্রসঙ্গ নেই?

একদিন কথা প্রসঙ্গে কাজল খুবই ভাল মানুষের মতো বলেছিল, 'তোমার শ্বশুরবাড়ির বেড়ালে দুধ খেয়ে নিয়েছিল? ওমা সে কি! বেড়ালটা বুঝি 'খুব ভালো' নয়?'

কী রাগ মহিলার।

চলেই গেলেন ঠমঠমিয়ে।

তাতে আবার দাদার কতো রাগ।

'ওভাবে বলা উচিত হয়নি,' হালো ভালো।

যাতদিন উচিতের ধাক্কা!

কার ভালো লাগে?

বিনয় একটু ছোট্ট সংসার হলে তো আর কাজলকে রাতদিন এই উচিতের ধাক্কা সইতে হতো না?

তবু এতোতেও নাকি 'লক্ষ্মী বৌ' নাম নেই তার।

কাজলের কেন ভাল লাগবে?

কারই বা লাগে? কস্তার? গিন্নীর? ছোট ছেলের?

একমাত্র ওই হাঁদারামটিরই বাড়িটা খুব ভালো লাগে।

হয়তো কাজলের কথাই ঠিক। বোকারাই পারে সবকিছু ভালো লাগাতে। বুদ্ধির সঙ্গে ভালো লাগার বড়ো বিরোধ। বড় মনদটির মধ্যেও ওই হাবাটির মতো বুদ্ধির বালাই নেই, তাই তার শ্বশুরবাড়ির সব ভালো লাগে।

অথবা কে জানে সেটি অতি চতুর কিনা।

কাজলের কিছুই ভালো লাগে না বুঝে ফেলে বানিয়ে বানিয়ে অতো 'ভালো লাগার' গল্প করে।

কাজলের কাজই হচ্ছে, সংসার চরিত্র বিশ্লেষণ। এবং দেখে দেখে আর ভেবে ভেবে বুঝেছে, সংসারের মধ্যে সব থেকে যন্ত্রণার বিষয় হচ্ছে কতকগুলো বিপরীত প্রকৃতির লোকের স্রেফ্ একটা সম্পর্কের দায়ে পড়ে একটা খুঁটিতে বাঁধা পড়ে থাকা।

তা' সেকথা কাজল একাই ভাবে না।

জয়ন্ত বাবে এ বাড়ির সকলেই বোধহয় ভাবে।

দিগন্ত নামের ছেলেটা তো আবৈশব ভেবে আসছে।

অবাক হয়ে ভেবে আসছে, 'আশ্চর্য! এরাই নাকি আমার সব থেকে নিকট আত্মীয়! অথচ ওদের আমার একেবারে পরের মতো লাগে।'

ওই যে অনন্তজীবন বসু। যিনি নাকি পুলিশ অফিসের দুর্নীতি দূর করবার মানসে পুলিশে চাকরী নিয়েছিলেন, এবং শেষ অবধি পরাজিত হয়ে ফিরে এসে বাড়িতে বসে আছেন চাকরীর মেয়াদ ফুরোবার আগে।

ওঁর সঙ্গে কি কোথাও কোনোখানে মিল আছে দিগন্তর? উঁচু থেকে ছাড়া কখনো সমতলে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন উনি ছেলেমেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে?

বোধকরি সেই ওঁর কম জীবনের অভ্যাসটা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে।

একদা পদগৌরবের উচ্চ চূড়ায় বসে অবস্তনদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলতেন, আদর্শ গৌরবের উচ্চ চূড়ায় বসে সেইভাবে কথা বলেন স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে।

বাবা কখনো দিগন্তকে বকেছেন বলে মনে পড়ে না দিগন্তর। সেটা স্বাভাবিক ছিল।

আর মা?

ছেলেবেলা থেকে দিগন্ত দেখেছে মা আর বাবার মধ্যে অহরহ অন্তর্নিহিত একটা বিরোধ! যার অঙ্গে মার মধ্যে নেই পূর্ণতার স্পর্শ। মা হয় ভাবপ্রবণ, নয় একগুঁয়ে, নয়তো আতিশয্যের শিকার।

বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ওঁদের যেন কোনো যোগই নেই।

অথচ তাদের সহকর্মী কমবয়সের বাড়িতে দেখেছে, মা বাবা দু'জন মিথি, সকলেই কতো বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছু নিয়ে ওরা সপরিবারে আলোচনা করে কতো সহজে,

কতো স্বচ্ছন্দে। হয়তো তর্কাতর্কি হয়, হয়তো উত্তেজনাও দেখা দেয়, কিন্তু তার মধ্যে চিত্তের বিলাসের বালাই নেই।

পৃথিবীর এই ঘোরতর দুর্দিনে, দেশের এই অকথ্য দুরবস্থার দিনে, সমাজের এই ঘুনধরা দুর্বিপাকের দিনে, মানুষ আপন হৃদয় নিয়ে বিলাস করছে। মান অভিমানের ছাকাছি করছে। এ দেখলে তার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে যায়।

কনকদের বাড়িতে খাওয়া পরা শোভা সৌন্দর্য এইসব নিয়ে এতো মাতামাতি নেই। ওদের বাড়ি সুদ্ধ সকলেরই বয়সের বিলাসিতা স্রেফ্ বই কেনা নিয়ে।

হয়তো বইয়ের ভাগটা যার যার নিজ পছন্দ মতো, কিন্তু সকলেরই পছন্দ বই।

আশ্চর্য, কনকের বাবা অধ্যাপক, মা স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস, দুই দিদিও অধ্যাপিকা। কনকেরই শুধু অল্পবয়সে কড়া রকমের টাইফয়েড হয়ে লেখাপড়া এগোয়নি।

কিন্তু কনককেই ওরা সবাই সব থেকে শ্রদ্ধা করে। ওরা সবাই সবাইকে শ্রদ্ধা করে।

এরকম একটা বাড়িতে দিগন্ত জন্মাতে পারতো!

বুচুদের বাড়িটাও তো কই খারাপ লাগে না।

বুচুর বাবা সুজনবাবু অবশ্য খুবই সাধারণ, কিন্তু কেমন একরকম নির্বিরোধী। মাসের মধ্যে কুড়িদিন তো তাঁর অফিসের কাজে বাইরেই কাটে, যদিও কাজটা এমন কিছু উচ্চপদের নয়। তাতে কি? কেমন সহজ অনাড়ম্বর জীবন তাদের। মা-টি একেবারে 'মাদে'র মতো। ছেলে দেরী করে ফিরলেই কাঁদতে বসেন। ছেলে বেরোচ্ছে দেখলেই হাত ধরে দিব্যি পালাতে শুরু করেন, 'কোনো বিপদ আপদের মুখে যাবি না তো বাবা?'

তবু সহজ।

অহমিকার বর্ম পরে হৃদয় বিলাসের নাটক অভিনয় নেই।

আর ঐ পাগলী মেয়েটা। ঝুমি!

ওর কথা মনে পড়লে যে মনটা কেমন করে না তা নয়, কিন্তু ও যে প্রত্যাশায় অমন সূর্যের দিকে সূর্যমুখীর মতো তাকিয়ে থাকে, সে প্রত্যাশা পূরণের ক্ষমতা তো নেই দিগন্তর।

দিগন্তকে তাই অরুণের ভূমিকাতেই থাকতে হয়। একবারও ক্ষণিকের জন্যও সমতার ভূমিতে তাকাবার উপায় নেই।

মেয়েটার মধ্যে হয়তো পার্টস ছিল, হয়তো অনেক কাজ করতে পারতো ও। মেয়েরা তো বেশীর ভাগই কাজ-টাজ করে একটা ব্যক্তি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোনো মতবাদের প্রভাবের থেকে ব্যক্তি মানুষের প্রভাব তাদের ওপর অনেক বেশী কার্যকরী। সে প্রভাবে বিগলিত আছে ও।

কিন্তু ওর দাদা অরাজী।

তাছাড়া—আমিই কি খুব রাজী ছিলাম?

ভেবেছে দিগন্ত।

হয়তো নয়।

মেয়েটা মনপ্রাণ থেকে যা চায় তা আমি বুঝি। ও ঘর চায়, বর চায়, সংসার চায়। ··তবে আর বেচারীকে আমার সঙ্গের মোহে মোহগ্রস্ত করে সে পথ থেকে সরিয়ে এনে লাভ কি ?

বিয়ে-টিয়ে হলে ভুলে যাবে।

তবু ওর কথা মনে পড়লেই মন কেমন করে।

আজও হঠাৎ ওর কথাই মনে পড়েছে দিগন্তর, যখন ওর খুব তেষ্টা পেয়েছে, তেষ্টায় বুক থেকে পেট পর্য্যন্ত ধুলোর মাঠের মতো খাঁ খাঁ করছে। আশ্চর্য্য, কষ্টের সময় মায়ের কথা মনে পড়লো না দিগন্তর, মনে পড়লো পাড়ার একটা মেয়ের কথা !

অথচ তখন ওর মা—তখন তারপর অনেকক্ষণ, আরো অনেকক্ষণ, তার মন্ত্রে ঘরবার করে অবশেষে বাইরে এসে বসে আছে।

রাস্তা এখন জনবিরল, তবু দু'চারটে লোক কি আর যাওয়া আসা করছে না ? তারা কি দেখে একটু অবাক হচ্ছে না ? ভারতী সে কথা ভাবছেন না। ভারতী এক অদ্ভুত সম্মানের কথা ভাবছেন। অন্ততঃ বড়ো ছেলের কাছে সেই কথাই বলেছেন, ভারতী।

'যারা দিগন্ত নামের শবদেহটাকে ঘরে নিয়ে আসবে, তারা কী বলবে, যদি দেখে ওই শবদেহটার মা-বাপ ভাই সবাই দোর তাড়া বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

মান সম্মানের চিন্তা মানুষের কতো দূর বিস্তৃত, ভেবেছে নির্বোধ জয়ন্তও।

কী গভীর অভিমান থেকে ওই অদ্ভুত সম্মান জ্ঞানের জন্ম, তা বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই। দিগন্তর প্রতি অনন্তজীবনের *ত্রুটি*, জয়ন্তজীবনের *ত্রুটি* সবটার পূরণ করতে চান ভারতী। অনন্তজীবনের স্ত্রী, জয়ন্তজীবনের মা।

তাই তিনি জয়ন্তকে বললেন, 'তুই শুতে যা।'

যেন তোর মতো নিকৃষ্ট জীবের এছাড়া আর কি ক্ষমতা আছে ? আর কিছু চাওয়াই বা কে তোর কাছে ?

এই সময় কাজল নেমে এলো।

কাজল আশা করেছিল দেখবে অপরাধীর বিচারের প্রহসন চলছে, এবং সে অনায়াসে অবজ্ঞায় বিচারকদের নস্যাৎ করে দিয়ে যথাকর্ত্তব্য করতে যাচ্ছে।

প্রথম কর্ত্তব্যটাতো স্নান।

যতো রাতই হোক স্নানটি তো চাই চুড়ান্ত।

কিন্তু নেমে এসে কাজল অবাক হয়ে গেল। কোথায় কে ?

আরো এগিয়ে এলো, বাইরের দরজায় উঁকি মারলো, আর হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

গভীর রাত্রির এই গা ছমছমে হাওয়ায় একটা অদ্ভুত জায়গায় চুপ করে বসে থাকা ভারতীকে দেখে সমস্ত শরীরটা যেন শিথিল হয়ে এলো কাজলের।

ভয়ানক একটা ভয় করলো কাজলের।

দারুণ ভয়।

ঝিলের ভয় তা জানে না।

হয়তো কোনো ভয়ঙ্করের প্রতীক্ষায় বসে থাকা মানুষকে দেখলে এইরকম ভয়ই করে।

কাজল যে ওই মানুষটার আড়ালে সমালোচনা করে। ওই মানুষটার সংসার চালনা পদ্ধতির বহুবিধ ত্রুটি আবিষ্কার করে, এবং সুবিধে পেলেই অগ্রাহ্য করে, তা এখন মনে পড়লো না কাজলের।

ওই মানুষটাকে যেন বহুদূরবর্তী অন্য কোনো গ্রহের বাসিন্দা বলে মনে হলো।

কাজলও হঠাৎ বারান্দায় বসে পড়লো। বলে উঠলো, 'ঠাকুরপো আসে নি?'

গলার শব্দ করলো না জয়ন্ত, শুধু মাথা নাড়লো।

কাজল হঠাৎ কেঁদে ফেললো।

বললো, 'তা তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? খুঁজবে না?'

কাজল কি এটা অভিনয় করলো?

কাজলের ওই কেঁদে ফেলাটা কি ব্রেক্ ৮?

ভারতীয় অষাঢ় চৈতন্যের মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ঝিলিক, বিরক্তির বিদারণ রেখা টেনে দিয়ে গেল।

আর জয়ন্ত খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

হয়তো জয়ন্তর ওই কান্নাটা ব্রেক্ অভিনয় ভাবতে খুব কষ্ট হবে বলেই জয়ন্ত খুব আশ্চর্য হলো।

কারণ কাজলের মধ্যে ভাবপ্রবণতার বালাই নেই। আর কাজল সংসার সম্পর্কে এতো উদাসীন যে এক এক সময় অবাক হয়ে যেতে হয়। কাজল আত্মকেন্দ্রিক, কাজল চক্ষুলজ্জার বালাই বর্জিত, কাজল কর্তব্যবোধের ধার ধারে না, এবং জয়ন্ত ওকে ওগুলো শেখাবার চেষ্টা করে হার মেনেছে।

হঠাৎ কাজলের এই অভিব্যক্তি!

জয়ন্ত মলিন মুখে বললো, 'এতো রাতে কোথায় কি খুঁজবো?'

কাজল এবার কান্না থামালো।

শক্ত গলায় বললো, 'রাত বলেই তো খোঁজার দরকার। দিনের বেলা হলে তো বলা হতো না।'

'রাত তো করেই মাঝে মাঝে—'

'করে! কিন্তু আজ নিজেই তো বললে, তখন 'রেডিওতে স্থানীয় সমাচারে বললো কলেজ স্কোয়ারে আজ খুব গোলমাল গেছে। লোক মারা পড়েছে—আর খোকাটা নাকি ওইখানেই—'

'জয়ন্ত!'

ইস্পাতের মত কঠিন, আর ইস্পাতের মতো শীতল একটা ধাতব শব্দ যেন জায়গাটার ওপর আছড়ে পড়লো।

'জয়ন্ত, বৌমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুতে যা। নাটক ভাল লাগছে না।'

জয়ন্ত কেঁপে উঠলো।

অরন্তু ওর বৌয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলো না।

অরন্তুর মনে হলো ওর মা যেন ওর স্ত্রীর মুখের ওপর একটা পাঁক মাখা জুতো ছুঁড়ে মারলেন।

অরন্তু কি আর কোনোদিন ওর বৌয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারবে?…

কাজল অবশ্য আর এক মুহূর্তও বসে থাকে নি সেখানে, যাকে বলে 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট' সেইভাবে ঠিকরে উঠে সোজা হোস্টেলার গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় আছড়ে পড়েছে।

অরন্তুও কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে, প্রায় ঘনটাতে ঘনটাতে উঠে গেছে ওপরে।

কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারে নি, বসে আছে বারান্দার সোফায়।

কী করে ঢুকবে? ঢুকে কী করবে?

কাজলকে ডেকে কথা বলবার সামর্থ্য থাকলে তো ঘরে ঢোকার মানে আছে? এযাবৎ অরন্তুর ভিতরে যেন একটা সূক্ষ্ম অভিযোগ ছিল কাজল অরন্তুর মাকে সম্যক সম্মান দেয় না। মায়ের এক মুহূর্তের ব্যবহারে কাজলের দিকের পাল্লাটা একেবারে হালকা হয়ে গেল।

মায়ের এই কুৎসিত ব্যবহারের কলঙ্ক কালিমা মুছে যাবার একটা মাত্রই পথ দেখতে পাচ্ছে অরন্তু, যে পথটা বড়ো ভয়ানক। যে পথটা ভাবতে বুকটা হিম হয়ে যাচ্ছে অরন্তুর। শিউরে উঠছে সমস্ত অনুভূতির স্নায়ুগুলো।

কিন্তু আর কোন পথ আছে কাজলের কাছে মুখ দেখাবার? কোন পথ আছে কাজলের সামনে যাকে 'মা' বলে ডাকবার?' 'দিগন্ত' নামের সেই ছেলেটা? অরন্তু যাকে বেশীর ভাগ সময় 'খোকা' বলে উল্লেখ করে? যে ছেলেটার ওপর কাজলের বেশ একটু হিংসে আছে স্বামীর ভালবাসার ভাগীদার হিসেবে, সেই ছেলেটার মূল্যে—

কিন্তু আর কি ভাবতে পারবে অরন্তু?

অরন্তুরের প্রতিকার তো শুধু অরন্তুর দিয়েই হতে পারে।

মনের একেবারে গভীরে যে স্তরগুলো শুধু একবার করে মাথা তোলে আর ধাক্কা খেয়ে নেমে পড়ে, তারাই শুধু খবর রাখে মানুষ জীবটা কী!

ভারতীর বড়ো ছেলের ভাবনার সঙ্গে ভারতীর চিন্তার মিল রয়েছে, একথা যদি সেই গভীর স্তরেরা বলে ওঠে, উপরের স্তরেরা ঘৃণায় অবিশ্বাসে 'ছি ছি' করে উঠবে।

কিন্তু অনন্তজীবনকে খুব—খুব ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবার আর কী উপায় আছে ভারতীর?

সত্যি জগতে কতো উল্টোপাল্টাই ঘটে।

দিগন্ত সম্পর্কে সব থেকে বড়ো আদায়ী দু'জনই শুধু একান্ত কামনায় ঈশ্বরের কাছে দিগন্তর অটুট আর নিখুঁৎ কুশল প্রার্থনা করছিল।

কাজল আর অনন্তজীবন।

হয়তো শুধু দিগন্তের জন্যেই নয়।

তীব্র তীক্ষ্ণ একটা 'অবাধে'র অন্তেও হয়তো।

একটা কুৎসিত দুষ্টতার অভাব।

শুধু একটা ব্যাকুল কিশোরী মন কেবল একটি মাত্র কারণেই জীবনে এই প্রথম ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনায় ভেঙে পড়তে চাইছে।

ভয়ঙ্কর ভেষ্টা পেতে পেতে কখন যেন চেতনাটা গিয়েছিল মুছে, সেই মুছে যাওয়া শ্লেটের লেখাটা যখন আবার আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো, অনুভব হলো সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা?

ব্যথাটা কিসের?

লেখাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

অনেকগুলো লাঠির ঘা পড়েছিল গায়ে।

ব্যথাটা বাঁচলো কী করে?

আশ্চর্য্য তো!

খুব যেন একটা কৌতুক বোধ করলো দিগন্ত। ব্যথাটা আমিই বাঁচিয়েছিলাম নড়িয়ে চড়িয়ে, না ওরাই বাঁচিয়েছিল ক্যামা ঘেন্না করে?

নাটকটা পুরো দেখা যায়নি, মঞ্চের উপরটা কীভাবে গ্যাসের প্রভাবে ফাঁকালো আর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

তৃষিকাভিনেতারা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পায়নি।...

আপাততঃ আমি আছি কোথায়?

আলা-করা করা চোখের পাতা দুটো যেন আটা দিয়ে আটকে রয়েছে। অনেক করে খুলে তাকিয়ে দেখলো দিগন্ত, আর চোখটা যেন জড়িয়ে গেল। চিরপরিচিত দৃশ্য।

প্রবোধ গুহর সেই একতলার ঘরটি।

মোনাধরা দেওয়াল, রংচটা জানালা দরজা, ফাটা আর ফাটা জোড়া-দেওয়া মেঝে।

আনন্দের আর আরামের।

পার্টির অফিস।

প্রবোধ গুহর বদান্যতায় যেটি যিনি ভাড়ায় পাওয়া যায়।

দেওয়াল আলমারিতে প্রচুর ধূলিধূসর কাগজপত্র পুস্তিকা, চৌকীতে ধূলিমলিন শতরঞ্চ।

তবু পরিচয়ে সুন্দর।

যেমন সুন্দর রোগা কালো দাঁত উঁচু মা।

কিন্তু আমি এখানে এলাম কী করে?

না কি স্বপ্ন টপ্ন দেখছি?

এই ঘর থেকে একটা গ্যাসের শেখা যায় কোণের দরজা দিয়ে, ওই গ্যাসেজটার ওধারে একটা স্নানের ঘর আছে। ভাঙলা পড়া চৌবাচ্চাও আছে একটা।

'একবার উঠতে পারলে খানিকটা জল গায়ে ঢালতাম। তা গায়ে তো দেখছি দারুণ ব্যথা। তার মানে লাথিয়ে আধমরা করে ছেড়েছে।...কিন্তু আমাকে তা' হলে আনলো কে? নিজের পা দুটো? এনে ফেলে দিয়ে ছুটি নিয়েছে?

অথচ আগেও মনে পড়ছে না কিছু।

বাইরের দিকের দরজাটা ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগানো, তার মানে যে এঘরে ছিল সে ওই প্যাসেজের দিকেই আছে।

অতএব ওই দিকেই চেয়ে থাকা।

তা বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে হলোনা, শম্ভু ঘরে ঢুকলো। ঢুকে একটা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে তার মানে স্নান সেরে এসেছে। শম্ভু প্রবোধ গুহর ভাইপো, ওর সূত্রেই বন্ধনসূত্র।

শম্ভুর পরণে একটা ভিজে আণ্ডার উয়্যার, তবু শম্ভু সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

একটা উল্লাস জমি করে ওঠে, 'এই যে চোখ মেলেছিস? তার মানে মরে ফরে গিয়ে ফেলেছারি করলি না? যেমি থ্যাঙ্কস! সারারাত যে অবস্থায় কাটিয়েছিস, ভাবলাম যাঃ টেঁসেই গেলি বুঝি।'

দিগন্ত উঠে বসতে চেষ্টা করলো।

শম্ভু হাঁ হাঁ করে উঠলো।

'থাক থাক, আর এক ডোজ আনিকা খেয়ে নে। তারপর কেমন বুঝছিস?'

'এখনো ঠিক বুঝছি না' দিগন্ত মৃদু হেসে বলে। 'তুই বুঝি আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলি?'

'হুঁ! গ্যাসের জ্বালায় তো চোখে কানে দেখতে পাচ্ছিলাম না, 'যেই হোক কুড়িয়ে তো নিয়ে যাই ব্যাটাকে' গোছ মনোভাব নিয়েই—কেমন লাগছে শরীরটা? তা এখন আর লাগবে কি? একটু খেলে টেলে,—তুই তো আবার চা খাস না, গরম দুধ খা একটু, আনি।'

'দূর!'

'দূর মানে?'

'বাচ্চার মতো দুধ খাবো কি?'

'তা, একটা কিছু খাবি তো? গরম গোছের? কী খাস সকালে?'

'বলা শক্ত।' দিগন্ত একটু হাসে, 'মা যেদিন করলে পান যা পায়েস গিলিয়ে দেন, যেদিন করলে পান না, কিছুই খাই না।'

'বেৎ, এটা ঠিক নয়। একদিন একটু চা খেলে কিছু হবে না—তার আগে মুখটা ধুয়ে নে।'

ওই স্যাওলা-পড়া কলঘরটা একেবারে অপরিচিত নয় দিগন্তর, এক একদিন তো অনেকগুলো ঘণ্টা কাটাতে হয় এখানে।

দিগন্ত এবার উঠেই বসে।

তারপর বলে, 'না, আমাটামা বড়ো বিশ্রী ঘুলো, বাড়িই চলে যাই।'

'মাথা খারাপ! এখন যাবি কি করে? একটু গায়ে জোর টোর না করে—'

'হয়ে যাবে।'

বলে চৌকি থেকে নামতে চেষ্টা করে দিগন্ত পেরে ওঠে না, অজ্ঞাতসারেই একটু উঃ করে ওঠে।

'হবে না যাদু, হবে না। চল আমার কন্ধে একটু ভর করে চলে চল—'

'কাল থেকে তো তোর কন্ধেই ভর করে রয়েছি! ধেৎ, ভারী বিশ্রী হলো। না মা যাঃ!'

'আমি তো বলিনি খুব সুখী হয়েছে ব্যাপারটা! তবে মিটিং যে এভাবে ছত্রভঙ্গ করবেই ওরা, তা টের পেয়েছিলাম। আচ্ছা দাঁড়া—'

বলে ভিতরে চলে যায় শম্ভু, তারপর ফিরে এসে দিগন্তকে মুখ ধুতে যেতে সাহায্য করে।

ফিরে এসে দেখলো দিগন্ত, একটা বছর ষোলো সতেরোর মেয়ে একটা জামা পায়জামা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব জিনিস দুটো শম্ভুর।

আঃ, কী বিশ্রী!

দিগন্ত যেমন নিজের জন্যে একটু আঙুল নাড়াতেও চায় না, তেমনি হলো বিপদ।

ব্যস্ত হয়ে বললো, 'এসব আবার কেন? দরকার ছিল না—।'

'ছিল দরকার!'

মেয়েটা গম্ভীর মুখে বলে, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার জামার পিঠটা রেক ছিঁড়ে ফুটি ফুটি!'

'ইস। তাই না কি? তবে দিন।'

'আপনি কি চা-ই খাবেন? না দুধ?'

দিগন্তর মনে হলো, দুধ জিনিসটা চায়ের থেকে মূল্যবান, হয়তো কারুর ভাগের দুধটাই দিয়ে দেবে তাকে। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'চাই দেবেন! এই শম্ভুটা এতো ঝামেলা করে। দরকার ছিল না কিছু।'

দরকার ছিল না।

এটা দিগন্তর বলতে গেলে মুদ্রা দোষ।

সব সময় সব কিছুতেই দরকার ছিল না।

ভারতী রেগে রেগে বলেন, 'তা তোর আর এই সংসার জগতে থাকারই বা দরকার কী? কৌপীনবন্ত হয়ে হিমালয়ের গুহায় চলে গেলেই হয়।'

'কোন দুঃখে?' দিগন্তর মার রাগে মজা লাগে, তাই হেসে হেসে বলে, 'পাহাড়ের গুহায় আমার কী কাজটা হবে!'

'তোর কাজটাই যে কী, সেটা জানতে পারলেই মরতে পারি। ওইটার জন্যেই আটকে আছে!'

'তবে আর জেনে দরকার নেই, আটকে থাকাটাই দরকার।'

কথা বলতে যা যায় সঙ্গেই একটু। তাও কোনো কোনোদিন। বেশীর ভাগই অবশ্য মা খাবার দিয়ে এসে তাড়া করলে। তা ইদানীং আর 'যাপরে মারে ও করতো না দিগন্ত, যতটুকু নেবার নিয়ে সরিয়ে রাখতো নিঃশব্দে।

মার কথা মনে পড়লো। কাল থেকে মা কী ব্যস্ততা করছেন কে জানে!

একটু পরেই মেয়েটি এক পেয়ালা চা, আর দু'খানা টোষ্ট এনে ধরে দিল। যদিও পেয়ালা প্লেট কোনোটাই বেশ আকর্ষণীয় নয়। তবু এতে বন্ধুর আগ্রহ নিহিত আছে। তাই আগ্রহ দেখিয়ে টেনে নিলো সামনে।

মাকে আমি অনেকদিনই অবশ্য বলেছি ফিরতে ফিরতে না পারলে বেশী ভাববার কিছু নেই, কিন্তু মা আর তা শুনেছেন! হয়তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছেন।

ওঁরা যদি আমার দিকটা একটু দেখতেন, আমার কথাটা একটু বুঝতেন! কনকের বাড়ির সবাই বোঝে, ভুচুর বাড়ির ওরাও বোঝে, এই শম্ভুর বাড়ির এরা—

কিন্তু কাল অনেকক্ষণ তো আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল ভুচু?

কী আশ্চর্য্য এতোক্ষণ আমি ভুচুর কথা ভুলে বসেছিলাম। ছি ছি, আমি কী? অথচ একসঙ্গে পাড়া থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

জুলি ধরলা পর্য্যন্ত এলো।

যেমন পাগলা পাগলা স্বভাব ওর, দাদার হাতটা চেপে ধরে বললো, 'কোনো গোলমাল হবে না-তো দাদা?'

ওর যে আমার হাতটাও ওইভাবে চেপে ধরতে ইচ্ছে করছিল তাতে সন্দেহ নাস্তি। নেহাৎ লোকলজ্জায় পারলো না। অথবা আমার ভয়ে। হাতে হাত ধরতে এলে আমি যে এ্যালাউ করবো না তা কি আর বোঝে না?

ভুচু বললো, 'হবে কি না কী করে জানবো? জ্যোতিষী তো নই।'

'তা ইচ্ছে করে গুলির মুখে টুখে এগিয়ে যেও না অন্ততঃ। তোমার আবার আছে তো বাহাদুরি!'

আমি বুঝতে পারছিলাম কথাগুলো জুলি ওর দাদাকে উদ্দেশ করে ততোটা নয়, যতোটা আমাকে উদ্দেশ করে বলছিলো। কারণ ভুচুর প্রকৃতিটা ঠিক ওরকম নয়। ভুচু একটু মাথা-ঠাণ্ডা!

তা' ওর সেই ঠাণ্ডা মাথাটা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে তো? না কি—

'কাগজ এসেছে না কি রে শম্ভু?'

শম্ভুর জুটেছে এক পেয়ালা, হয়তো এটা দ্বিতীয় প্রস্থ, কারণ বেলা নেহাৎ কম হয়নি। শম্ভু সেটা মুখ থেকে নামালো।

শম্ভু বললো, 'না রে, সেই থেকে তো তাই তাকিয়ে বসে আছি। এতো দেরী করে—'

'যাক গে, আমাকে তা হলে এবার ভাগা। খেয়ে দেয়ে গায়ে বেশ জোর হয়ে গেল।'

'চমৎকার! এবেলা তোর যাওয়া হবে না।'

'না রে, না গেলে নয়। কে জানে মা এতোক্ষণে শহর তোলপাড় করছেন কি না।'

'তা অবশ্য। এই মা-টাদের নিয়েই তো যতো জ্বালা। আমার অবশ্য মা নেই, কিন্তু একা পিসিমাটিই একাই একশো!'

'তোর মা নেই।'

'না তো। বলতে গেলে দেখিই নি মাকে। সে একেবারে অল্পকালেই—'

দিগন্ত লজ্জিত হয়।

কী আশ্চর্য্য, এতোদিন ধরে দেখছি শম্ভুকে, খবর রাখি না যে ওর মা নেই।

ওদের কর্মক্ষেত্রে যে মা বাপি সম্পর্কে উল্লেখ হবার কোনো কারণ ঘটে না, তা মনে পড়লো না দিগন্তর, হঠাৎ খুব লজ্জা করতে লাগলো।

'মা' জিনিসটাকে খুব মূল্যবান, আর মা শব্দটাকে খুব পবিত্র মনে হলো দিগন্তর।

দিগন্তর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কিন্তু শম্ভু?

তার মা?

তিনি নিশ্চয় এতোক্ষণে চেঁচিয়ে কেঁদে পাড়া মাথায় করছেন।

যদি অবশ্য শম্ভু না ফিরে থাকে।

হয় এই অজানা অজানা অবস্থাটা ভারী অস্বস্তিকর।

নিজের মনে কখনো ট্যাক্সী করে না দিগন্ত; করাচ না। কখনো কোনো দিন হয়তো দিদিকে শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দিতে—

দিগন্ত যে আবার অনন্তজীবন বোসের গাড়িতেও চড়ে না কিনা; শৈশব পার হবার পর আদৌ না। তাই দিদিকে পৌঁছতে ট্যাক্সী!

দাদা যখন দাংলার মতো বাবার গাড়িটা চড়ে অফিস যায়, দেখায় মাথা কাটা যায় দিগন্তর।

বলেও ছিল একদিন।

দাদা লজ্জিত হলো না।

দাদা অম্লান মুখে বললো, 'তা বাবার গাড়িতেই যদি চড়বো না তো কার গাড়িতে চড়বো? লোকে কথায় বলে, 'এতো জোর কেন রে? তোর বাবার জিনিস নাকি?'

দাদার জীবনদর্শন এই।

দাদার প্রতি দিগন্তর অনুকম্পা আসে, তবু দাদা যে তাকে খুব ভালবাসে সে কথা বোঝে দিগন্ত।

কিন্তু বুঝে কি করবে?

বুঝতে গেলেই তো মুক্তির পথে খানিকটা কাঁটা! তবু এখন এই মুহূর্তে দাদার মুখটা মনে পড়ে কষ্ট হলো দিগন্তর। বেচারী! হয়তো রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সকালে উঠে দেখেছে আমি ফিরিনি! লজ্জায় অধোবদন হচ্ছে।

যার কাছে বিচার পাচ্ছে হয়তো।

আমার প্রতি যার যতোটা টান দাদার প্রতি ততোটা নেই! ভারী আশ্চর্য্য। অথচ দাদাই তো বড়ো ছেলে! প্রথম সন্তান।

কিন্তু দাদা যার কাছে যেন শুধু বৌদির বর।

এসব যে আমি বুঝতে পারি সেটা অবিশ্যি মা বুঝতে পারে না। মা ভাবে আমি অন্তর্যামী। মা, তুমি নিজেই খোলা চোখে অন্ধ, কারণ তুমি নিজেকেই দেখতে পাও না।

একখানা আরশি রাখতে হয় মা, আরশি, যাকে সাধুভাষায় বলে দর্পণ। অন্যের সম্পর্কে অভিমান অভিযোগ পোষণ করবার আগে সেই আত্মবিশ্লেষণের দর্পণটি মুখের সামনে তুলে ধরতে হয়।

আর তুমি অনন্তজীবন বোস!

তোমাকে কিছু বলার নেই।

তুমি স্রেফ্ একটি মাকড়সা।

নিজের জালে নিজে আবদ্ধ।

তোমার সেই আদর্শের জাল থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারতে, অনেক কাজ হতে পারতো তোমার দিয়ে

দাদা বেচারা নিপাট ভালো মানুষ!

দাদার জন্যেই মাঝে মাঝে মন কেমন করে। আমার ব্যবহারে অনেক সময়ই খুব আহত হয় দাদা। তবু মনের থেকে ফেলে দিতে পারে না আমায়। বরং বৌদির 'চোখ' থেকে আমার দোষ ঢেকে বেড়ায়।

বেলায় বোকা আর সরল। আমার থেকে যে অনেকখানি বড়ো তা মনেই হয় না!

ছেলেবেলা থেকে ও আমায় বোঝাতে চেষ্টা করেছে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ', বোঝাতে চেষ্টা করেছে—'জননী জন্মভূমিশ্চ—'

খুঁজে খুঁজে আমার জন্যে—যতো সব মহাপুরুষদের জীবনী কিনে আনতো, কাঁচেরফ্রেমে বাঁধানো ভালো ভালো সব 'বাণী' এনে আমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতো।···আর ঘরে থেকে আমার গতিগতির খবর টের পেয়েছিল, কেবল আমায় বোঝাতে চেষ্টা করতো—'ওপথে যাসনে খোকা, একাদড়ের ভয়।'

পাগলা!

যদি মরে করে যেতাম, দাদাটা দারুণ শক্ পেতো!

যাক—মরে না যাওয়াটা বেশ বুদ্ধিমানের মতো কাজ হয়েছে।

মরলে বড়ো জোর শহীদ।

বেঁচে থাকলে আরো অনেক বড়ো কাজ করা যেতে পারে।

তাছাড়া—মরে গেলে ওই বাড়ির লোকদের বড়ো দাগা দেওয়া হতো। অবিশ্যি সেসব হতেই পারে সব সময়, তবে আপাততঃ খানিকটা হাড় গুড়ো হওয়ার ওপর দিয়েই গেছে। প্রফুল্লের অনেক চেষ্টা যে মাথাটা দু'ভাগ করে ফেলেনি।

মা দারারাত নির্ঘাৎ সেটা কল্পনা করেছেন বসে বসে।

নাঃ ঘুম-টুম হয়নি বৃদ্ধা মহিলার বোঝাই যাচ্ছে, জেগে জেগে রক্তমজ্জার মধ্যে জামাতার আসন্ন দেহখানির স্বপ্ন দেখেছেন আর কি !

দিগন্ত নিজের নিয়ম বহির্ভূত একটা কথা বললো।

বললো, 'কী করা যায় বল দেখি পল্টু ? বাসে টাসে চড়া যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না, একখানা ট্যাক্সি ভ্যাক্সিই ডেকে দিবি নাকি ?'

'পেয়েছে—' পল্টু বললো, সেই ভাবনার চিন্তাটি ধরে বসে আছিস ? বলছি এবেলাটা থেকে—

'দূর ! ঠিক হয়ে গেছে। তুই একটা ট্যাক্সিই ডেকে দে ! ঘড়িও দিয়ে দাদার কাছে ভাড়াটা চাইতে হবে। পিটুনির সময় পার্সটা পকেট থেকে পড়ে গেছে দেখছি। 'অবিশ্যি'-হাসলো একটু দিগন্ত, 'ছিলও না লাখ দু'লাখ।'

'আমার কাছে দিয়ে দে তাহলে—'

ব্যস্ত হয়ে বললো পল্টু !

'নাঃ ! দাদার কাছে চাইলে অ্যাম প্রীড্ হয়ে যাবে। যখন তখন খোসামোদ করতে আসে, টাকা দেবার জন্যে। মাঝে মাঝে আমার অগোচরে দু'দশ টাকা গুঁজে রেখে দেয় প্যান্টের পকেটে।'

'তবু—'

পল্টু বলে, 'একেবারে ফাঁকা গন্তব্যে মাঠে হয়ে বেরোনোটা ঠিক নয় বুঝলি ? ধর মাঝপথে খারাপই হয়ে গেল ট্যাক্সিটা, মাঝপথেই নামিয়ে দিয়ে ভাড়া চেয়ে বসলো—আরে এতো কথাই বা বলছি কেন। আমি তো তোর সঙ্গে যেতেই পারি। যাবও !'

'না না। কোনো দরকার নেই।'

'তোর দরকার নেই, আমার দরকার আছে।'

শেষ পর্যন্ত ছাড়লো না।

সঙ্গে চললো।

ওদের মধ্যে ভালবাসার ভাবাদুতা নেই, কিন্তু ভালবাসাটা আছে।

তাই পল্টু বললো, ওর ওই দিকে একটা কাজ আছে। অনেকদিন থেকে হচ্ছে না। আজ যখন পরের পয়সায় গাড়ি চড়া যাচ্ছে—

এরপর আর সঙ্গে নেওয়া ছাড়া উপায় কি।

পাড়ায় ঢোকবার মুখে সুজনবাবুর বাড়ি।

গাড়িটা থামিয়ে ফেললো দিগন্ত, বললো, 'ভুচুর খবরটা নিয়ে যাই।'

উদ্বেগ আছে, উৎকণ্ঠা আছে, শুধু কথার প্রকাশ নেই।

কি জানি ওর অদৃষ্টে কী ঘটলো।

কালো গাড়িতে চড়িয়ে নিয়েই গেলো, না শেষ করে দিলো।

ভাবছে ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু।

যদি ও ফিরে না থাকে।

ওর মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো কী করে?

যদি বলেন, 'তুমি যে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বাবা!'

আর জুলি?

যদি তীব্র হয়ে বলে, 'দাদাকে ফেলে রেখে নিজে দিব্যি ট্যাক্সি চেপে চলে এলেন দিগন্তদা?' যদি বলে, 'আপনিই ওকে বিপদের পথে টেনে নিয়ে গেছেন! ও তো অন্যরকম ছিল।'

যদি বলে, 'দাদাই এ সংসারের একমাত্র ভবিষ্যৎ সেটা খেয়াল করেছেন? আপনি বড়ো লোকের ছেলে, আপনার দায়িত্ব বলে কিছু নেই, আপনার পক্ষে সবই শোভা পায়।'

জুলির চোখটা একটু কটা কটা, সেই চোখে তীব্র ভর্ৎসনার আগুন দেখতে পেলো দিগন্ত।

তবু কী আর করা।

যে কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নিয়েই তো কাজ ওদের। দুরবস্থার চর্চা করলে চলবে কেন?

জুলিকে শুধু এইটুকুই বলা যায়, 'মরতে সবাইকেই হবে জুলি, কেউ না বাঁচিয়ে কাটিয়ে যেতে পারবে না। শুধু মরার ধরণটা হয়তো সকলের এক হবে না।'

কিন্তু ভাগ্যের অপার করুণা, এসবের কিছুই বলতে হলো না। নিচতলায় নীলাদের ঘরে বসে ছিল জুলি। শুকনো শুকনো মুখে, গাড়ি থামার শব্দে জানলায় চোখ ফেললো। আর সেই শুকনো মুখে হঠাৎ যেন ঝড়ের বাতি জ্বলে উঠলো! বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

'আপনি! দিগন্তদা! এসেছেন?'

বুঝতে অসুবিধে হলো না, ভুচুর খবর খারাপ নয়। খারাপ হলে ওই বাড়ের আলোটা জ্বলে উঠতো না। চেঁচিয়ে উঠে বলতো, 'আপনি একা? দাদা?'

গাড়ির জানলা দিয়েই কথা বললো দিগন্ত, 'কেন? ধরে নিয়েছিলি আমি আর ফিরবো না?'

ব্যাপারটা তো প্রায় তাই দাঁড় করিয়েছিলেন! দেখুন সে বাড়ি গিয়ে! বুঝবেন ঠ্যালা।'

ওর এই নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো কথায় হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে গেল দিগন্তর।

কারণ দিগন্তর সেই 'ঠ্যালা'টা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না।

দিগন্ত জানে তাকে কেউ বিশেষ বকবে না।

বড়ো জোর মা একটু।

বকার থেকে তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়ানোর তালেই তৎপর হয়ে উঠবেন।

বাবা ?

আসে না।

তাকিয়ে দেখেই নিজের ঘরে ঢুকে যাবেন।

দাদা ?

দাদা কি আর বাড়িতে আছে এখন ? আফিসে চলে গেছে বোধ হয়। না কি আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে ? ঘুম এতো আর ছুটে পালায়নি। তাছাড়া কোথায় আর খুঁজবে ? থানায় ? হাসপাতালে ?

মাথা খারাপ !

দিগন্ত তো বলেই রেখেছে না ফিরলে ভাবনা করবার দরকার নেই। 'নিহতই হয়েছি' এটা না ভাবলেও চলবে।

কিন্তু সেটা তো মাকে বলে এসেছে।

দাদা !

দাদার ভাবনাটা মন থেকে সরিয়ে রেখে হেসে বললো, 'ঠ্যালা তো এখানেও বুঝছি। যাক কটু কখন ফিরলো ?

'দাদা ? ফেরেনি এখনো। মাসির বাড়ি থেকে ফোন করেছিল কাল, আটকে গেছে। আজ আবার জানালো, মাসি ছাড়ছে না, খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে আসবে। ভগবান জানেন পিটন চণ্ডী খেয়েছে কিনা। আপনি কোথায় ছিলেন ? একটা মাসির বাড়িটারি আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন না কি ? মুখ চোখ তো খুব বসে গেছে দেখছি। আহার টাহার জোটেনি তো ?'

'আহার ?'

আর একটু হাসে দিগন্ত, আর বাকি টুকু বলার আগেই ওপাশ থেকে শম্ভু গলা বাড়িয়ে বলে ওঠে, প্রহার জুটেছে বেশ ভালমতো।'

'অ্যাঁ! দিগন্তদা।'

'আচ্ছা পরে চেঁচাস ; এখন চলি।'

'কী বাবা ? প্রেম ট্রেম চালাচ্ছিস নাকি ?'

শম্ভু হেসে বলে।

দিগন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

বলে 'বাজে বকিসনি।'

গম্ভীর হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হলো, যেন বেশী ভাবলতা প্রকাশ করা হয়ে গেছে।

এই একটা ভয়।

সর্বদা আড়ুল-উঁচিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পাছে হালকা হয়ে যায়, পাছে সহজ সাধারণ হয়ে যায়। পাছে ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে বসে, পাছে ভালবেসে ফেলে।

না হলে, এই সহজ সাধারণ কথাবার্তা, সহজ সাধারণ হৃদয়ের প্রকাশ সব সময়েই যে 'অসার' মনে হয় তা নয়।

এখনই তো ইচ্ছে হচ্ছিল ওই হাসি হাসি মুখ মেয়েটার সঙ্গে আর দুটো কথা কই।

ইচ্ছে হচ্ছিল।

কারণ নিজের বাড়ির পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না দিগম্বর।

কিন্তু ধারণা কি কারুরই ছিল। একটা বেনিয়মী ছেলের একটু নিয়মছাড়া ব্যবহারের জন্যে হঠাৎ সমস্ত সংসারটা উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে।

হয়তো আকস্মিকতাটা এমনিই অমোঘ শক্তিশালী।

একটা কাঁটা পেরেক দুরন্তগতি একখানা দোতলা বাসের টায়ার ফুটো করে দিয়ে স্রেফ্ অচল করে দিতে পারে, একটু পোড়া সিগারেটের টুকরো বিরাট একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে, একটু পা ফসকানো জলের তলায় তলিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

দিগম্বর তো ওই রকমই।

ও তো বলেই রেখেছে, আমার খরচের খাতায় লিখে রাখো—

তবে ওর এই সামান্য অনুপস্থিতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতী তাঁর জীবনের সমস্ত জমা খরচের হিসেব এলোমেলো করে ফেললেন কেন?

ভারতীর আপাত-শান্ত চেহারার মধ্যে কি পুঞ্জীকৃত ধূম অপেক্ষা করছিল একটু অনুকূল বাতাসের আশায়?···অথবা একটা দেশলাই কাঠির?

সেইটুকুর জোগান দিলো দিগম্বর?

তাছাড়া কী?

শুধু মাতৃহৃদয়ের দুশ্চিন্তার চেহারা কী এই?

ভারতী যেন সারাজীবন ধরে অনন্তজীবনের জন্যে একটা 'জবাব' খুঁজছিলেন। জবাবের মতো জবাব।

ভারতী যেন সেটাই হঠাৎ হাতে পেয়ে গেলেন। তাই সেটাকে অতো আঁকড়ে ধরলেন।

অথচ ভারতী একটু ধৈর্য্য ধরতে পারতেন! 'জবাব'টা সত্যিই হস্তগত হলো কিনা দেখতে পারতেন, তাহলে ভারতীকে এমন হাস্যাস্পদ হতে হতো না।

হাস্যাস্পদ বৈ কি!

কাজল তো উঁকি দিয়ে দেখলো বাড়িতে ঢুকছে ভারতীর ছোট ছেলে পায়ে হেঁটে। আস্ত শরীরটা নিয়ে।

ভারতীর সেই ছোট ছেলে তার ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে যাওয়া আস্তটা ফেলে দিয়ে এসেছে।

ভারতীর সেই ছোটছেলে অন্য এক আমা দিয়ে গায়ের কালশিটের দাগ ঢেকেছে। আর মুখের ক্লান্তিটা ঢেকেছে ওর অভ্যাস সেই সব উড়িয়ে দেওয়া-হাসিটা দিয়ে।

অতএব ধরেই নিতে হবে ছেলেটা দিব্যি আস্ত সুস্থ দেহ নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ঢুকলো।

এখন ?

এখন যদি ভারতীর বড়ো ছেলের বৌ সামনে এসে হেসে হেসে বলে, 'বাবা আমরাও একটা নাটক দেখলাম !

তাহলে ?

আর অনন্তজীবন বোস !

যে লোকটা নাকি চিরদিন ভারতীকে অবজ্ঞা করে এসেছে আপন অহমিকার উচ্চ চূড়া থেকে। সেও তো আরও একবার সেখান থেকেই গলা বাড়িয়ে তেমনি অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে উঠবে, 'জানতাম ! তুমিই তিলকে তাল করে একটা কেলেঙ্কারি ঘটালে ! যা তোমার চিরকেলে স্বভাব।'

তা সেটাই স্বভাব বৈকি ভারতীর।

ছেলেমেয়েদের ছোটবেলায় বরাবরই ভারতী ওই করেছেন।

গভীর রাত্রে শিশু গভীর ঘুমে ডুবে থাকলে ভারতী অনন্তজীবনের ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাকুল হয়ে বলতেন, 'ও অমন করে ঘুমোচ্ছে কেন ? ওর অমন আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ছে কেন ?'

শিশু হঠাৎ রাত্রে কান্না জুড়লে ভারতী 'ডাক্তারকে কোন' ক'রবার জন্যে পাগল করেছেন অনন্তজীবনকে।

ওদের একটু সর্দি জ্বর হলে ভারতী সেটাকে ! 'নিশ্চয় নিউমোনিয়া' ভেবে নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছেন, তারা দৈবাৎ একবার বমি করলে 'কলেরার' আশঙ্কায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

অনন্তজীবনকে ব্যস্ত করেছেন, ছুটোছুটি করিয়ে ছেড়েছেন, 'মিছির নির্ঘাত্রিক' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, প্রতিকারের আশায় যোগজীবনের কাছে গিয়ে পড়েছেন।

যোগজীবন হয়তো ছেলেকে বকাবকি করেছেন, ডাক্তার ডেকেছেন, কিন্তু ভারতীকে অপদস্থ করে দিয়ে বমি-করা ছেলেটা দু'ঘণ্টা পরেই 'খিদে পেয়েছে' বলে মুখ তুলেছে, আর জ্বর-হওয়া ছেলেটা নির্লজ্জের মতো গাটাকে দিব্যি ঠাণ্ডা করে ফেলেছে।

অনন্তজীবন মুখ টিপে ব্যঙ্গ হাসি হেসেছেন।

কারণ তখনো অনন্তজীবনের বয়েস কম ছিল। তারপর বাবার কাছে অপদস্থ করার জন্যে ঘৃণা করেছেন ভারতীকে।

ভারতী তখন ওই ছেলেমেয়েগুলোর উপরই চটে যেতেন। ভারতীর মনে হতো বাপের সঙ্গে যেন ওদের ষড়যন্ত্র ! যাকে হেয় করবার ফন্দী !

তা' চিরটা দিনই তো ওরা অনন্তজীবনের কাছে হেয় করেছে ভারতীকে।

অনন্তজীবন চেয়েছিলেন অন্তত ভালো করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে বিয়ে করবে, অন্তত ছাত্র থাকতে থাকতেই বিয়ের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো। তখনই ঔষধ পড়লো তাই, নচেৎ নির্ঘাৎ বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠতো।

ভারতী মা, ভারতী তো সেটা বুঝতে পেরেছিলেন? বাধ্য হয়েই তাই প্রতিকার করতে হয়েছিল ভারতীকে।

ভারতীর, ছোট মেয়ে ওই কড়া মতবাদী বাপের নাকের ওপর দিয়ে একটা উল্টোপাল্টা বিয়ে করে চলে গেল, ভারতীর মাথাটা হেঁট করে দিয়ে।

শুধু ভারতীর এই ছোট ছেলেটা ভারতীর মুখ রেখেছে।

ওর জন্মের পর থেকেই ছেলে কান্নার ছুতো করে অনন্তজীবন ঘর ভিন্ন করেছেন, ভারতী ওই ছেলেটাকে নিতান্ত নিভৃতে একান্ত আপন করে মানুষ করেছেন।

ওর জন্যে অনন্তজীবনের কাছে ভিক্ষাপাত্র পাতেননি কোনোদিন ভারতী।

ডাকতে আসেননি কোনোদিন, 'দেখ কী রকম করছে ও।'

পাতলা দেহে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী 'হিমন্ত' নামের ছেলেটা।

ও আমার মুখ রেখেছে।

ও আমার মুখ রাখবে।

এই ছিল ভারতীর আশা।

তুমি অনন্তজীবন ঘোষ, তুমি মস্ত এক আদর্শবাদী, আমার ছেলেও কম নয়। তুমি ধন্য, দেখো ও সফল সার্থক হবে।

তবে, ওই সাফল্যের জন্যে যে গায়ে আঁচড়টি লাগবে, এমন কল্পনা করেননি।

অথচ পর্ণা সেই ভয়। অথচ অনন্তজীবন যেন নির্বিকার।

তাই না আবার অনন্তজীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন ভারতী 'উচিত জবাব' পাওয়ার জন্যে।

জবাবটা ফিরে এলো ভারতীরই দিকে।

তার মানে বাপের সঙ্গে সেই অদৃশ্য ষড়যন্ত্রটা ওরও আছে।

ভারতীর একান্ত নিজের ছেলেটারও।

তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আর এক জোড়া চোখের।

আর এক কারণে অন্তরও চেয়েছিল অন্তরঙ্গ একটা জবাব কিন্তু—

সারারাত ঘরে থেকে ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অন্তর। কে জানে কোথায়, কে জানে কী করতে।

কাজলের কাছে মুখ দেখাবার হদিস খুঁজতেই কি?

কিন্তু ও যখন ফিরলো, তখন অনন্তজীবনের গেট এর সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে নয়—সরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

তাহলে ঘটেছে কিছু।

খবর নিয়ে এসেছে কেউ।

হঠাৎ বুকটা যেন ধড়ফড় করে উঠলো অনন্তর। নিজেকে খুনী মনে হলো।

অনন্ত কি গাড়িটা না থামিয়ে আবার ছুটে যেতে?

কিন্তু চোখ ছুড়িয়ে দিয়ে একখানা মুখ বাড়িয়ে ধরলো ট্যাক্সীর আরোহী।

বলে উঠলো, 'ওহ্ লাক। দাদা এসে গেছো! ট্যাক্সির মিটার কতো উঠেছে দেখে মিটিয়ে দাও পকেট খালী। পার্স হারিয়ে।'

অনন্তর মনে হলো কৃত কৃতার্থ হয়ে গেল সে। ভুলোর বাপ কাজল, আর তার কাছে সম্মান রক্ষা। যে সম্মীহারা ছেলেটা তাকে খুনের পাপ থেকে বাঁচিয়েছে, তাকে কোলে করে নাচাতে পারলে ভালো হয়।

মেয়ে পড়েছিল দু'জনেই।

দিগন্ত বললো, 'শম্ভু তুই আসবি নাকি?'

আসবি নাকি!

তার মানেই আসিস না।

শম্ভু জানে।

শম্ভু পা চালালো। বললো, 'মা কাজ আছে।'

দিগন্তর মুখে আসছিল দাদাকে বলে, 'এই শম্ভুই কাল আমার জীবনরক্ষা করেছে—'

কিন্তু বলতে গিয়ে কেমন জোলো জোলো লাগলো। বললো না।

শম্ভু চলে গেল।

অনন্ত বাঁচলো।

অনন্ত হাসি-কান্না গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'তা'হলে মরিস নি?'

'মোটেই না! মরবার কথা ছিল নাকি?'

অনন্ত ওর জামার একটা কোণ চেপে ধরে টান দিয়ে বললো, 'তা কেন, মারবার কথা ছিল! ছিপি কোথায় রাখিয়ে?'

দিগন্ত বললো না মরতে মরতে বেঁচেছি।

দিগন্ত শুধু বললো, 'পার্টির অফিসে!'

'পার্টির অফিসে! পার্টির অফিসে কাটিয়ে এলে তুমি বাবু? আর আমরা—মায় মা অবধি! তুই যদি ছোট থাকতিস খোকা, টেনে একটা থাবড়া লাগাতাম!

দিগন্ত একটু হাসলো।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে নিজের রক্তের কথাটা বলতে পারলো না। তাছাড়া—রক্তের কথা তো বলেও না সে কোনোদিন।

তাই একটু বেগে বললে', আপত্তি নেই।'

তৎক্ষণে ওরা গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে, বারান্দা পার হয়ে সামনের ঘরটায় পা দিয়েছে। যে ঘরটায় ভারতী বসে আছেন কোনো একটা বিশ্রী প্রতীক্ষায় বসে থাকার মতো।

শেষরাত্রে বাইরে থেকে এইখানে উঠে এসেছিলেন তিনি, এইটুকু সভ্যতা শুধু করেছিলেন।

জয়ন্ত বেরিয়েছিল, উঠোন পার হয়ে ছোট গেট দিয়ে, ঢুকলো প্রধান প্রবেশ পথে।

বলে উঠলো, 'এই দেখ মা, তোমার গুণধর পুত্রর কাল সারারাত পার্টির অফিসে বসে ছিলেন! আর তুমি আমি বুঝেই ছিলাম—'

এক মুহূর্তেই বলে নেয়।

বুঝেছিল বলেই যে উদ্বিগ্ন হয়নি সেই কথাটাই আরো প্রাঞ্জল করে বলতে যাচ্ছিল জয়ন্ত, কিন্তু তার আগেই বলে উঠলো, 'কী ব্যাপার! মা কি সারারাত এইখানেই বসে আছেন নাকি?'

দিগন্তর বলার ভঙ্গীতে, আর গলার সুরে যেন ওই বসে থাকার হাস্যকর দিকটা উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

আজ সুস্থ একটা ছেলে, কতো কতো দিন ওই পার্টির অফিসে রাত বারোটা অবধি বসে থাকে, লাস্ট বাসে ফেরে, সে যদি একদিন বাকি রাতটুকু নাই ফেরে এতো কিসের চিন্তা? লাস্ট বাসটাও ফেল করতে পারে তো! অসম্ভব তো নয়।

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

তার মানে ভারতীর পালে মুখে চুনকালি পড়লো।

তার মানে গতকাল সন্ধ্যার পর ভারতী যা যা করেছেন আর বলেছেন, সবকিছুই যেন ভারতীর দিকে তাকিয়ে নির্লজ্জের মতো দাঁত বার করে হাসতে লাগলো।

ভারতী উঠে দাঁড়ালেন।

যেন কোনো দুরন্ত স্বপ্নের আগুনে বসেছিলেন, কোনো রাক্ষস এসে সে স্বপ্ন ভঙ্গ করে দিলো।

ভারতী চীৎকার করে উঠলেন, 'কেন তুই এ বাড়িতে এসে ঢুকলি? লজ্জা করলো না তোর লজ্জা করলো না? বেহায়া নির্লজ্জ। আত্মসম্মানজ্ঞানহীন!

দিগন্ত হতভম্ব হলো।

দিগন্ত দিশেহারা হলো।

কার্য কারণ বোঝবার ক্ষমতাটা চট করে হলো না দিগন্তর। দাদার মুখের দিকে তাকালো সে কপালটা কুঁচকে।

দিগন্তর খুব কষ্ট হচ্ছিল।

দিগন্তর ইচ্ছে হচ্ছিল এই ঘরটাতেই শুয়ে পড়ে। কারণ দিগন্তর সর্বাঙ্গ থর থর করছিল, আর পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হচ্ছিল।

কিন্তু এই অদ্ভুত নাটকের সামনে হঠাৎ বসে পড়া যায় না।

দিগন্ত শুধু দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী হলো?'

'কিছু হয়নি! তুই চলতো! রেগে গেছেন আর কি! যা কীর্তি তোর! চল চল একটু বিশ্রাম করবি চল। সারারাত না ঘুমিয়ে রাতকার্য হচ্ছিল যোগেন। আয়—

অন্তত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ও ঘরকে দাঁড়ালো।

আর দু দুটো বড়ো বড়ো ছেলের মুখের ওপর ভারতী যেন ৫

'না যাবে না। ভেতরে যাবে না।—

বাড়ির ভেতরে যাবার অধিকার ওর আর নেই।

কী বলছো তুমি মা?

অন্তত তীব্র হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভারতীই কি পারেন না তীব্র হ'তে?

বলতে পারেন না, 'তবু বাড়ি ঢুকছিস বেহায়া ছেলে? আবার পেটে এতো নির্লজ্জর অন্ন হয়েছে? যে বাপ ছেলে মরে গেলেও নিশ্চিন্তি হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে, সেই বাপের ভাত আবার খাবি তুই?

দিগন্ত স্বাভাবিক গলাটা বজায় রাখে।

দিগন্ত সহজভাবে বলে, 'কিন্তু মরলাম আবার কখন? দিব্যি তো বেঁচেই আছি।'

ভারতী যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর।

ঠেলে দিলেন দরজার দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সেই ব্যবস্থাই তো দিচ্ছি তোকে। দিব্যি বেঁচে থেকে হাসতে হাসতে

বাড়ি ফিরলি কেন তুই? কেন তোর মরা দেহটা ধরাধরি করে নিয়ে এলো না লোকে, বয়ে দিল না ওই অনন্তজীবন ঘোষের নাকের সামনে!'

বসে পড়লেন।

বসে পড়লো অনন্তও।

তার পা কাঁপছিল।

মা ও তাহলে খুনের জন্যে ছুরি শানাচ্ছিলেন!

অনন্তদের চির স্নেহময়ী মা!

দিগন্ত বসে পড়লো না।

দিগন্ত বরং একটু হেসেই উঠলো।

বললো, 'আচ্ছা তাহলে আজ চলি! তোমার ইচ্ছেটা কোনো একদিন পূরণ হওয়া অসম্ভব নয়। আর দু'চারটে টাকা হবে নাকি দাদা? দাও তো যদি থাকে। নিরুদ্দেশ হবার বাস ভাড়াটা অন্তত দরকার!'

দরকার!

জীবনে এই প্রথম শুনলেন ভারতী ওঁর ছোটো ছেলের কিছুতে দরকার আছে।

কিন্তু ভারতীর আর উপায় নেই ছুটে গিয়ে দরকারের অনেক বেশী ঠেলে দেন ওর হাতে!

ভারতী নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছেন।

অনন্ত কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে পার্সটা বার করে ছোট ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিলো।..

দিগন্ত একবার ব্যাগের মুখটা খুলতে গেল। খুললো না।

মৃদু হেসে বললো, 'থাকগে সবসুদ্ধই নিচ্ছি। যথা সর্বস্বই খোওয়া গেছে কিনা, তবু যেটুকু থাকে

বেরিয়ে গেল।

বাড়িটার দিকে তাকালো না।

তাকালে দেখতে পেতো বারান্দায় ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন, এবাড়ির মালিক অনন্তজীবন ঘোষ।

দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওঁর।

আজে বাজে সাধারণ লোকের মতো ছুটে গিয়ে ছেলের হাত ধরে ফিরিয়ে আনতে যাবেন নাকি?

ওই পাড়ার লোকদের জানলা বারান্দার সামনে দিয়ে?

পাগল নাকি?

সব ত্যাগ করা যায় প্রেসটিজ্ ত্যাগ করা যায় না।

এক রাণী ঃ একটি কণ্ঠহার

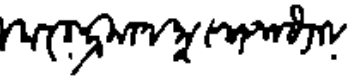

১৭৮১ সালের ফরাসী দেশে এক শীতের রাত্রি।

রাজপ্রাসাদের উপরতলায় আমোদের স্রোত বইছে, আর নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত জনতা আর্তনাদ করছে—রুটি দাও, রুটি চাই···

রাণীর কানে সেই গোলমাল পৌঁছলো। তিনি এক সভাসদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—চিৎকার কিসের!

সভাসদ জানালো, শহরের লোকেরা রুটি পাচ্ছে না, তাই তারা চেঁচাচ্ছে।

রাণী বললেন, রুটি পাচ্ছে না! তাতে কি? তারা কেক খেতে পারে তো!

কথিত আছে, এই উক্তি করেছিলেন সেই সময়কার ফ্রান্সের রাণী মেরী আঁতনয়েৎ।

ইতিহাস লেখক বলেছেন, মেরী আঁতনয়েৎ-এর মত বিলাসপ্রিয়, বে-হিসাবী, অমিতব্যয়ী রাণী পৃথিবীর কোন দেশের সিংহাসনে আর কখনো বসেন নি। তাঁরই জন্যে ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল, সে-দেশের রাজতন্ত্র চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছিল।

পরবর্তীকালের ইতিহাস-গবেষক বলেছেন, মেরী আঁতনয়েৎ-এর যত দোষই থাক, তিনি হৃদয়হীনা ছিলেন না; প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর সততা এবং চেষ্টার অভাব ছিল না এবং নিষ্ঠুর ভাগ্যের ক্রীড়নক আর কেউ বোধকরি জন্মায়নি তাঁর মতো।

ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর পুত্রটি মারা গিয়েছিল। ছিল এক নাতি, ভবিষ্যৎ সম্রাট।

অস্ট্রিয়ার রাজার নবম কন্যা মেরীকে দেখে লুই-এর খুব পছন্দ হয়ে গেল। নিজের পরিবারের বাকি সভ্যদের বিরোধিতা না মেনে তিনি নাতির সঙ্গে মেরীর বিবাহের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন।

ভার্সাই শহরে শুভদিনে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হল সেই বিবাহে, গোটা শহরটার নতুন করে সংস্কার হল। সাতদিন সারা রাত সারা শহর আলোকমালায় সজ্জিত রইল।

যুবরাজ-পত্নীরূপে ভার্সাই শহরে মেরী আঁতনয়েৎ বাস করতে এলেন। পনেরো বছর বয়স, রূপ যেন ফেটে পড়ছে, তারুণ্যের আবেগে সদাচঞ্চল মেরীকে যে দেখে সেই মোহিত হয়।

কিন্তু মেরীর মনে সুখ নেই! কিসের তাড়নায় তিনি যেন অস্থির! মনে হচ্ছে যেন বন্দী জীবন, বড় একঘেয়ে, বড় নীরস। রাজতন্ত্রের নিয়মকানুন, আদবকায়দা আর বাধা নিষেধ যৌবনচঞ্চল মেয়েটিকে যেন শ্বাসরুদ্ধ করে তুললো।

রাজ-অমাত্যরা তাঁকে পছন্দ করত না। ভিন্ দেশের এক গরীব রাজার মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে শেষ পর্যন্ত তাদের রাণী হবে, এ যেন তারা বরদাস্ত করতে পারছিল না। যুবরাজ ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ, লাজুক প্রকৃতির, মেরীর সজীব প্রাণোজ্জ্বলতার সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারতেন না।

বাধা নিষেধের বেড়াজাল অনহ্য লাগত মেরীর। মাসে মাসে তন্ত্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে রাজতন্ত্রের নিয়ম ভিঙিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, শহরের সবচেয়ে বড় নাচঘরে গিয়ে মুখোস নৃত্যে যোগ দিতেন, প্রজাদের সঙ্গে অবাধে মিশতেন।

এমনি এক নাচের আসরে সুইডেনের এক তরুণ জমিদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁর নাম কাউন্ট ফারসেন। মেরী আঁতনয়েৎ-এর জীবনে সেই প্রথম আর শেষ রোমান্স। প্রথম দর্শনেই দু'জনে দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তাঁদের মাঝখানে যে মহাসমুদ্রের মতো দুস্তর ব্যবধান। তাই ফারসেন মেরী আঁতনয়েৎ-এর অনুগত সেবক রূপে তাঁর প্রয়োজনে সর্বদা প্রস্তুত থাকলেও কোনদিন তাঁকে একান্তে পাবার সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

মেরী আঁতনয়েৎ-ও বুঝতেন সব। তাই দূর থেকেই ম্লান হাসি হেসে তাঁর মনের কথা কাউন্টকে জানাতেন।

কিছুদিন ফরাসী দেশে কাটিয়ে কাউন্ট ফারসেন নিজের দেশে চলে গেলেন। বছর খানেক পরে আবার এলেন। এমনি বারে বারেই তিনি গেছেন আবার এসেছেন। মেরী আঁতনয়েৎ-এর প্রতি এই বিদেশী সামন্তরাজের ভালবাসা এবং হিতাকাঙ্ক্ষা ছিল যেমন অকৃত্রিম, তেমনি ছিল অবিচল আজীবন।

১৭৭৪ সালে পঞ্চদশ লুই পরলোক গমন করলেন। যুবরাজ নাম নিলেন, সম্রাট ষোড়শ লুই। মেরী আঁতনয়েৎ সম্রাজ্ঞীর আসনে বসলেন।

আলোচনার পর স্থির হল, রীম্‌স্ শহরে অভিষেক অনুষ্ঠান হবে। অকল্পনীয় বিরাট আয়োজন শুরু হল। রীম্‌স্ শহরে রাণীর জন্যে এক সুরম্য প্রাসাদ তৈরী হল। ভার্সাই থেকে রাজা রাণী সেই প্রাসাদে এসে উঠলেন।

অনুষ্ঠানের দিন রীম্‌স্-এর বড় গির্জায় এমন বর্ণাঢ্য দৃশ্যের অবতারণা হল, আড়ম্বরে, জমকে আর ব্যয়বাহুল্যে যার তুলনা নাকি ইতিহাসে নেই।

অভিষেকের সময় রাজার মাথায় মুকুট পরানো হল। কোটী টাকার জহরতে ঝোড়া সেই মুকুট রাজার মাথায় একটু চেপে বসল। তার ভারে রাজা বললেন, মুকুট-টা মাথায় বড় লাগছে। তিনি সেটা খুলে ফেলতে চাইলেন।

অমাত্যরা হা হা করে উঠল, রাজার এমন বাজে উক্তি যে ঘোর অমঙ্গলসূচক। অনেকের মনে পড়ল, হতভাগ্য তৃতীয় হেনরির কথা! তিনিও ঠিক এমনি অভিষেকের দিন মাথায় মুকুট পরে বলেছিলেন, বড় কুটছে মাথায় মুকুটটা। পরে তাঁকে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

অভিষেকের পর রাজার অমাত্য পারিষদ আর অতিথি রাজন্যবর্গের হুল্লোড় চলল সারা রাত ধরে। কত যে অর্থ খরচ হল তার ইয়ত্তা নেই। এদিকে তখন দেশের দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে হাহাকার উঠেছে। খেতে না পেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহনীয় দুর্দশা ভোগ করছে। মানুষ অন্নের সন্ধানে পাগলের মতো চারিদিকে ঘুরছে, তারা যেন মরীয়া হোয়ে উঠেছে।

একদিকে রাজ্যের রাজকোষের অর্থের অপচয়, অন্যদিকে নিত্য প্রজার পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। দেখতে চতুর্দিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল ১৭৭৪ সালে প্যারিসের নানা স্থানে শান্ত-হাঙ্গামা বেঁধে গেল।

তারপর ক্রমেই প্রজাদের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটতে লাগল এবং সেই সঙ্গে রাণীর জনপ্রিয়তাও হ্রাস পেতে শুরু করল। রাণীর বিলাসপ্রিয়তার জন্যে জাতীয় অর্থভাণ্ডারের বিপুল অপচয়ে প্রজাদের কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর সোচ্চার হয়ে উঠল।

রাজা অবশ্য এই অর্থের অপচয় অনুমোদনও করতেন না, পছন্দও করতেন না। কিন্তু রাণীর কাছে তিনি ছিলেন নিতান্ত দুর্বল। মেরী আঁতনয়েৎ-কে সামলানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

প্রজাদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মাঝেই মেরী আঁতনয়েৎ সহসা এক ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। রাণী হীরা মুক্তার প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তির কথা অনেকেই জানতো, বিশেষ করে জানতেন, মাদাম ভিলা মত্তে নামে এক রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী কুচরিত্রা মহিলা যিনি তাঁর মাসোহারার বরাদ্দ বাড়াবার জন্যে বার বার রাণীর কাছে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মাদাম মত্তে কার্ডিনাল রোহান নামে এক ধনী অস্ট্রিয়াকে হাত করে একটি বহুমূল্য জড়োয়া নেকলেস কেনবার আয়োজন করলেন। পক্ষান্তরে তাঁর এক রক্ষিতাকে দেবেন বলে সেই নেকলেসটি তৈরী করবার জন্যে এক বিখ্যাত জহুরীকে অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ায় নেকলেসটি তৈরী হোয়ে জহুরীদের কাছেই ছিল।

মাদাম মত্তে এসব খবর জানতেন। সেই নেকলেসটিই তিনি হাতাবার ষড়যন্ত্র করলেন।

কার্ডিনাল রোহান একদিন মাদাম মত্তের কাছ থেকে রাণীর লেখা এক পত্র পেলেন। পত্রে রাণী জানিয়েছেন সেই নেকলেসটি তিনি কিনতে চান, নেকলেসটির দাম (৬৪ হাজার পাউণ্ড) তিনি চার কিস্তিতে পরিশোধ করবেন। কার্ডিনাল রোহান এই বিষয়ে ব্যবস্থা করলে রাণী বিশেষ খুশী হবেন।

রাণীকে খুশী করতে কে না চায়! কার্ডিনাল রোহান সেই পত্র নিয়ে জহুরীদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং জহুরীরা রাণীর স্বাক্ষরযুক্ত করা চিঠি দেখে কোনরূপ সন্দেহ না করে নেকলেসটি কার্ডিনাল রোহানকে দিলেন।

পূর্ব ব্যবস্থা মত কার্ডিনাল নেকলেসটি মাদাম মত্তের হাতে সমর্পণ করলেন। আর তার পরদিনই মাদাম মত্তের স্বামী সেই নেকলেস নিয়ে চম্পট দিলেন লণ্ডনে এবং সেখানে গহনাটি ভেঙে জহরৎগুলো বিক্রি করে বহু অর্থ সংগ্রহ করলেন।

এদিকে জহুরীরা নির্ধারিত দিনে প্রথম কিস্তির টাকা না পেয়ে মাদাম মত্তের কাছে গেলেন।

কার্ডিনাল রোহানের কাছে জহুরীরা জেনেছিলেন, মাদাম মত্তের মারফৎ সেই নেকলেস রাণীর হাতে পৌঁছেছে এবং কিস্তির টাকা তাঁরা মাদাম মত্তের কাছ থেকেই পাবেন। কারণ, রাণী এই নেকলেস কেনার ব্যাপারটা গোপন রাখতে চান।

কিন্তু মাদাম মত্তে জহুরীদের সোজা জানিয়ে দিলেন, যে চিঠির বলে জহুরীরা নেকলেসটি কার্ডিনাল রোহানকে দিয়েছেন সে চিঠি আদৌ রাণী মেরী আঁতনয়েৎ-এর লেখা নয় এবং মাদাম মত্তে নেকলেস সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

অন্তরীণ! স্তম্ভিত! এ কী ভয়ংকর ষড়যন্ত্র! এ কী সাংঘাতিক প্রতারণা! উপায়ান্তর না পেয়ে তাঁরা রাণীর সঙ্গে দেখা করলেন।

তাঁদের অভিযোগ শুনে রেবী জাঁতমন্ত্রে কাডিনালের প্রতি রাগে ফেটে পড়লেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করলেন। রাণী জানালেন, রেকলেস সম্বন্ধে তিনি একেবারেই কোন কিছু জানেন না। কাডিনাল রোহানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি, কোন কথা হয়নি এবং তিনি কোন চিঠিও দেন নি।

বেচারা কাডিনাল রোহান অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্যে পদচ্যুত এবং অপমানিত হলেন।

রাণী নিজের দোষ খণ্ডন করলেন বটে কিন্তু অনেকেরই মনে ধারণা জন্মালো যে তিনিই সেই রেকলেস লাভ্রে করেছেন এবং তাঁর দুটো সৈন্যে একজন নিরপরাধ লোক মারা গেল, চারিদিকে রাণীর নামে কেচ্ছা শোনা যেতে লাগল।

এদিকে তখন রাজ্যময় বিপ্লবের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বেশীদিন নয়।

দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠল,

সমস্ত বিপ্লবীরা ব্যাস্টিলের দুর্গ অধিকার করে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদও আক্রান্ত হল, রাজা রাণী বন্দী হলেন

ঘরে ঘরে আজ শিশুরা নতুন বেবী সোপ নিয়ে কানাকানি করছে আর তা হল

বেঙ্গল কেমিক্যালের
বেবী সোপ

প্রত্যেক মায়েরা চান এমন একটি বেবী-সোপ যার ব্যবহারে শিশুদের স্বাস্থ্যকর কোমল, মোলায়েম ও স্নিগ্ধ রাখে। বেঙ্গল কেমিক্যালের বেবী সোপে এই সমস্ত গুণই বর্তমান— ঘরে ঘরে তাই এই সাবানের এত আদর।

কসমেটিক ডিভিসন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা

এই সময় শেষবার কাউন্ট কারলেন প্যারিসে এসে রাণীকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রায় সফলও হয়েছিলেন।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পালাতে গিয়ে রাজা রাণী এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়লেন।

রাজা রাণীর পালাবার সব ব্যবস্থা করে কাউন্ট কারলেন যখন বিদায় নেবার আগে রাণীর সঙ্গে দেখা করলেন তখন নীরবে অশ্রুসিক্ত চোখে মেরী আঁতোয়নেৎ তাঁর আঙুল থেকে আংটি খুলে পরম স্নেহে কাউন্টের আঙুলে পরিয়ে দিলেন।

কাউন্ট কারলেন মাথা নুইয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আবার দেখা হবে!

রাণী মেরী আঁতোয়নেৎ জীবনে সেই প্রথম কেঁদে ফেললেন, মাথা নেড়ে জানালেন, আর দেখা হবে না।

১৭৯৩ সালের ১০ই আগস্ট নবগঠিত জাতীয় বিচার সভায় রাজা ষোড়শ লুইর বিচার হল এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

তারপরের দৃশ্য বড় করুণ!

রাজার মৃত্যুর পর রাণী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বন্দীশালায় জীবনযাপন করছেন। কোথায় সেই রাজকীয় শয্যা, বিলাসবৈভব, সারা পৃথিবীতে যার তুলনা ছিল না! কারাগারে কঠিন শীতল মেঝের উপর কম্বলের বিছানা, আহার দুবেলা কয়েক টুকরো শুকনো রুটি আর কিছু কদর্য ব্যঞ্জন।

কিন্তু রাণীর মনে কোন বিকার নেই। তিনি শান্ত সমাহিত। মনের সব আশা আকাঙ্খা নির্বাপিত। প্রার্থনায় আর বই পড়ে তাঁর সময় কাটছে।

অবশেষে এলো সেই প্রতীক্ষিত দিন। তাঁর বিচারের দিন।

১৭৯৩ সালের ১৪ অক্টোবর তাঁকে আদালতে আনা হল।

পাঁচজন জজ এবং পনরজন জুরী দুদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে বহু সাক্ষীর জবানবন্দী শুনলেন। সরকারী কৌঁসুলী অদ্ভুত ভাষায় রাণীর বহু অপকীর্তির কথা ফলাও করে বললেন, সেই সঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বললেন সেই নেকলেস-এর কথা যার জন্যে এক নিরপরাধ কাউন্টেসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং যে নেকলেস রাণী নিজেই আত্মসাৎ করেছিলেন। বিচারের পর অনেকেরই মনে হয়েছিল, নেকলেসটির ব্যাপারে রাণীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুতর এবং তার জন্যেই তাঁর সব গেল।

রাণীর পক্ষের কৌঁসুলী অবশ্য রাণীর তরফে সওয়াল করেছিলেন এবং রাণী নিজেও একটি মর্মস্পর্শী বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তেমন জোরালো হয়নি।

পরদিন বিচারকদের রায় বেরুলো।

রায়টা সম্বন্ধে কারুর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। রাণীর নিজেরও নয়। তাই মৃত্যু দণ্ডাদেশ শুনে তিনি বিস্মিত বা বিহ্বল হলেন না।

পরদিন ভোর বেলা ফ্রান্সের শেষ সম্রাজ্ঞী মেরী আঁতোয়নেৎ-এর ভাগ্যতাড়িত জীবনের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল।

আপাদমস্তক শাদা পোষাকে সজ্জিত হয়ে তিনি বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে বধ্যভূমি অভিমুখে যাত্রা

করলেন। এবার আর তাঁর জন্যে রাজকীয় স্বর্ণখচিত শকট নয়, একটা ঠেলাগাড়ীর উপর তাঁকে তোলা হল এবং গালিগালাজ-মুখর জনতার মাঝখান দিয়ে সেই ঠেলাগাড়ী এগিয়ে চলল।

পুরুষানুক্রমে রাজারাণীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের মনে যে ঘৃণা যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল মেরী আঁতোয়েৎকে ঘিরে সেই ঘৃণা আর বিক্ষোভ সেদিন ফেটে পড়ল। পুরুষেরা তাঁকে কুৎসিত ভাষায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। মেয়েরা তাঁকে উদ্দেশ করে থুতু ছিটোতে লাগল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাঁকে গালি আর ঘুষি দেখাতে লাগল। কিন্তু মেরী আঁতোয়েৎ-এর শূন্য দৃষ্টিতে সব যেন ঝাপসা, কিছুই যেন তাঁর নজরে পড়ছে না।

ঠেলা গাড়ী যথাস্থানে পৌঁছলো।

শান্তভাবে গাড়ী থেকে নেমে মেরী ফাঁসীর মঞ্চে উঠলেন। জল্লাদ দাঁড়িয়েছিল পাশে। অসাবধানে তিনি তার পা মাড়িয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অনুতপ্ত হোয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। জল্লাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

রাণী বললেন, কেঁদো না! তুমি আমার প্রিয় প্রজা। তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। তোমার কর্তব্য তুমি কর। আমি প্রস্তুত।

গিলোটিনে দ্বিখণ্ডিত হবার পর রাণীর ছিন্নমুণ্ড একটা উঁচু জায়গায় টাঙিয়ে দেওয়া হল যাতে সবাই তা দেখতে পায়।

হিংসায় উন্মত্ত এবং উৎফুল্ল জনতা সেদিন রাজপথে এক দুর্লভ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল—দেশের রাণীর কাটা মুণ্ড, গাছের ডালে ঝুলছে।

সেই দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করে তারা খুশী মনে প্রাতঃরাশ খাবার জন্যে যে যার ঘরে ফিরল।

শ্রীপথিকের **দূরের বলাকা** দাম ২·৫০

অনামিকা প্রকাশনী

২৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৭

পালকি

কবিতা সিংহ

আর পালকি এসে যায়না।

এখন আর নতুন বৌরা পালকি করে শ্বশুরবাড়ি যায়না। হাওয়াগাড়ী, টেম্পো, সাইকেল রিক্সা কত কিছু না আছে।

এখন লক্ষ্মীসিঁড়ি নদী রাজবাড়ি থেকে অনেকদূরে সরে গেছে।

নদীর সে রূপই আর নেই। এককালে যে খঞ্জনচোখা তরাযৌবনা শরীর ছিল তা আর কেউ দেখলেও বিশ্বাস করবে না। নেহাৎ দীর্ঘ ইটের সেতুটা আছে বলে তাই। সেই তার সেকালের শরীরের মাপে গড়া। এখন নদী আর তাঙা রাজবাড়ির মাঝখানে ধূ-ধূ প্রান্তর আর বালির চড়া প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা শুঁড়ি পথ। তবু মানায় না। যখন হাতে টোপর ধরে, জ্যালজেলে বেনারসী-পরা বৌকে পাশে নিয়ে টেম্পো বা সাইকেল রিক্সায় চড়ে চাষাড়ে চেহারার বর যায়, রাজবাড়ির তাঙা দরজা জানলা, হাট করে খোলা ঘণ্টাকটক যেন উপহাস করে ওঠে। যেন এত ছোটমাপের খেলো সম্বন্ধ দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেকালের বড় প্রাণাদের ক্ষুধিত আত্মারা।

এই রাজার বাড়ির অনেক ইতিহাস ছিল। অনেক কাহিনী। কতদিন লোকের মুখে মুখে সে সব কথা ফিরেছে, বেড়েছে, রঙ মিশেছে বদলেছে। তারপর আস্তে আস্তে আধার কমে ম্লান হয়ে গেছে, ডুবে গেছে উহ্য হয়ে গেছে। সেকালের মানুষের মৃত্যুর সংগে সংগে হারিয়েও গেছে।

আগে আগে তিন্ গাঁ থেকে পালকি করে যখন নতুন বৌরা এই রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে যেত, তখন তারা দুপুরে হয়ত পালকি বেহারারা এই ঘণ্টা কটকের সামনে পালকিটি নামিয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিত। নতুন বৌ হয়ত তার কৌতূহলী চোখ দুটি মেলে মুগ্ধ বিষাদে চেয়ে থাকত ঐ রাজবাড়ির দিকে। তাঙা অলিন্দে অলিন্দে পায়রা উড়ছে। শ্রীহীন জানলার পাল্লাগুলো দুলেছে। চকচকে অস্ত্রের গুঁড়ো মাখানো বালির ওপর পা ফেলতে ফেলতে নতুন বৌ হয়ত উঁকি দিয়ে দেখত রাজবাড়ির ঘণ্টা কটকের ফাঁক দিয়ে। প্রান্তর পেরিয়ে খোলা হাটকরা দরজার ভিতর দিয়ে অন্ধকারের প্রস্থ ছাড়িয়ে আবার রৌদ্রালোকিত তাঙা দালান পেরিয়ে আরো তাঙা ঠাকুর দালান দেখা যায়। সবুজ লতায় পাতায় গুল্মে দূরের সেই অবান্তর জগতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার দুচোখে হয়ত কত অদেখা অতীতের উপকথা সত্যিকারের ছবি হয়ে ফুটে উঠত।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকতেন রাজা বিজয়কেশব। দেখলে মনে হ'ত অযোধ্যার রাজপুত। এখনও যারা বিলিতি আর্কিটেক্‌চারের বইতে এই রাজবাড়ির নাচঘরের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে দেখতে আসেন তাঁরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন ধূলিধূসরিত নাচঘরের টাঙানো কালো হয়ে আসা অয়েলপেন্টিং এর সারির দিকে। সবচেয়ে পুরোনো ছবিটিই সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের। মাথায় উষ্ণীষ, পরণে বেগুনি ফুল রঙের বেনারসীর চোস্ত আর কুর্তি। আগাগোড়া জরির বুটি তোলা। গলায় মুক্তোর মালা, হাতে খোলা তলোয়ার। সুচোলো দিকটা পাশের একটি চৌকির উপর আলতো বেঁধানো। বিজয়কেশবের পরণে সাদা বেনারসী আর হাতে ধূপমালা দেওয়া রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ। অন্তরঙ্গ অন্ত দেওয়ান অন্তরঙ্গ। সব সোনামাখা চেহারা। ভোগী অথচ শরীর। রাজা প্রসন্নকুমার, চোগা চাপকান পরা, মাথায় পাগ্‌লা আঁটা; রাজা প্রথম বিজয়, আস্তিন চুড়িদার পাঞ্জাবি আর জামিয়ার পালের ঝলেপড়া আঁচল, রাজা চন্দ্রকুমার—সেকেলে কেতার চোঙা প্যান্ট, পকেট ঘড়ি আর ওপরে কোট ওয়ালা স্যুটপরা লোহার পলা পরম করে কেয়ারি করা চুল।

কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন ছবিটি সবচেয়ে উজ্জ্বল। রাজা বিজয়কেশব, রাজবংশের সর্বশেষ দুরন্ত পুরুষ।

কিন্তু অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পুরুষের দুচোখে এত প্রচ্ছন্ন শোক কেন? খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে তাঁর কপালের ধনধনে সিরাজালের ভিতরে ভিতরে ছড়ানো লজ্জাকেও হয়ত ঠাহর করা যেত।

তিনি কোথাও যেতেন না। বেরোতেন না। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কখনও কখনও নিজের মধ্যেও থাকতেন না। বাড়ির ঠাট বজায় রাখার জন্য বারোমাসে তেরোপার্বণ হ'ত। বাই নাচত, যাত্রা হত, হোল দুর্গোৎসব। রাজা শুধু একবার এসে দাঁড়াতেন। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে রাখতে চাইতেন নিজেকে। সর্বদাই গায়ের চাদরে কিম্বা পালে নিজের চিবুক আর ঠোঁট দুখানি চাপা দিয়ে রাখতেন।

আর এই এত ঝঞ্ঝাট এত উৎসব, সবই দশভুজার মত দশহাতে চালিয়ে নিতেন রাণী দুর্গাসুন্দরী।

রাণী যদি কারো সঙ্গে মুখ খুলে, চোখ তুলে কথা বলতেন তবে সে এই রাণী। রাণী দুর্গাসুন্দরী।

পুজোবাড়িতে বাৎসরিক অন্নপূর্ণার মন্দিরে পুজো দিয়ে এসে রাণী রাজার কাছে প্রসাদ দিয়ে এলেন।

রাজা মৃদু হেসে বললেন,

—এবছর নিয়ে কিন্তু দশ বছর পূর্ণ হ'ল। আমি আর দুটো বছর দেখব! তারপর তোমার আবার বিয়ে দেব।

রাজা বললেন,

—চুপ, ওকথা বলো না। আমরা ব্রতক নেব। আমার বিয়ে একবারই হয়েছে। আর হবে না।

দুর্গাসুন্দরী দরজার মখমলের পর্দা টেনে দিয়ে কাঠের তিনধাপ সিঁড়ি বেয়ে স্বামীর পাশে সাটিনের জাজিম মোড়া খাটে এসে বসলেন। হাজার-বুটি চাকাই শাড়ির কপালটানা ঘোমটাটি একটু এলিয়ে দিতেই তাঁর পানপাতা গড়নের মুখখানি সিঁদুরলাল হরতনের মত ফুটে উঠত। বাগানখোঁপা থেকে মুক্তাবসানো কাঁটা আর—হীরেবসানো চিরুনি খুলতে খুলতে তিনি বললেন,

—মনে পড়ে আমাদের বিয়ের দিনটির কথা! আনো আমার ত তখন দশবছর বয়স। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমিই কনে। আমিও সবার সঙ্গে ছুটে বর দেখতে এসেছিলাম। সে কি কাণ্ড। ব্যাণ্ড পার্টি, বাড়ি-বাজনা, গ্যাসের নীল আলো, তুমি, কি ঝকমকে চেহারা!

বিস্ময়কেশব মুগ্ধ হয়ে রাণীকে দেখছিলেন, আর রাজার বার শুনে শুনেও আবার শুনতে ইচ্ছে করা সেই তাঁদের বিয়ের গল্প শুনছিলেন।

তারপর তোমাদের বাড়ি আসা। আমার সময়টা এত ভালো লেগেছিল। তোমার পাশে বসে হাতীর, আমনা-বসানো পাল্কীতে চড়ে কত গ্রাম নদী বন দেখতে দেখতে আসা। জানো, সেই আমার জীবনে প্রথম আমাদের জমিদারবাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো।

পানের বাটা থেকে পোনাপী আভর-মাখানো একখানি তুলতুলে গন্ধভরা পান মুখে দিয়ে রাণী রূপোর পিকদানীতে পিচ কাটলেন। একটি অভ্যস্ত হাত কিন্তু মখমলের তাকিয়ায় এলিয়ে থাকা স্বামীর পায়ের পদ্মরঙা পাতায়।

—তোমাদের বাড়ি সেই ঢুকে আলতায় পা রেঙ্গুন। তোমাদের বাড়ির সব মুখঝেপানি গয়নার পাহাড়, উঃ! আর তোমার মা,....

রাজা সিধে উঠে বসলেন,

—রাণী!

রাণী চমকে উঠে বললেন,

—বলো।

—ঠিক মত খাবার দেওয়া হয়েছে, পাথরের ঘরে?

—রাণী ফ্যাকাসে মুখে মাথা নাড়লেন,

—হ্যাঁ!

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে।

দু'হাত মুঠো করে তিনি বললেন,

তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ! মা আমার কোথাও পালিয়ে গেছেন! বলো ঠিক কিনা!

রাণী লজ্জায় অপরাধে মাথা নীচু করে বললেন,—

—হ্যাঁ! এবার শুধু মিছে নয়, তোমার বোন রত্নমালাকেও নিয়ে পালিয়েছেন। ছাদ থেকে কপিকলে করে কাঠের সিন্দুকে বসে মা আর মেয়ে নেমে গেছে। তোমার বয়স্থ-করা নায়েবের ছেলের সঙ্গে উনি রত্নমালার বিয়ে দেবেনই দেবেন। সঙ্গে আছে সিন্দুক ভরা গয়না।

রাজা চাপা গলায় বললেন,

—ছিঃ, কি লজ্জা।

তারপর ছুটে গিয়ে নিজের তরবারি তুলে নিয়ে বললেন—

—আমি যাচ্ছি! আমি কিছুতেই এ বিয়ে হতে দেব না। আমি হরধরানকে শেষ করব। আর মা'কে ফিরিয়ে আনব! মা'র এত বয়স হ'ল তবু তিনি একবারও কি তোমার, আমার এই বংশের সম্মানের কথা ভাববেন না!

রাণী স্বামীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বললেন,

—না, তুমি যাবে না। যেতে পারবে না। ঐ নোংরা পরিবেশে তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

—কিসের নোংরা পরিবেশ?

মখমলের পর্দা তুলে ঘরে দাঁড়ালেন রাণী সত্যসুন্দরী।

রাজা বিজয়কেশবের বিধবা মা। বৃদ্ধা বাইজির মত লোলজঙ্ঘ চেহারা। সৌন্দর্য মাতৃত্ববিহীন দু' চোখে তীব্র ভোগলালসা আর অতৃপ্তি। ঘৃণা, সর্ব আর ক্রোধের রেখায় রেখায় সারামুখ ব্যঞ্জনাময়।

—আমার যা ইচ্ছে আমি করব। এবং করেছি। হরদয়াল আমার লোক। তুমি ঐ কুটচরিত্র বৌটার পরামর্শে তাকে সরিয়েছ। তার ছেলের সঙ্গে রত্নর বিয়েতে বাধ সেধেছিলে। আমি ওদের বিয়ে দিয়ে ভিন গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মেয়েকে যা সোনা দিয়েছি তা তোমার ঐ পেয়ারের রাণীরও নেই। এমনকি পায়ের নূপুর অব্দি সোনার।

রাজা দীর্ঘদীর্ঘ নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাণীও পালঙ্ক থেকে নেমে মাথা নীচু করে ঘোমটা টেনে দাঁড়ালেন।

কারণ সত্যসুন্দরীর দিকে চোখ রাখা যায় না। বিস্রস্ত চড়া রঙের শাড়ির আঁচল টানতে টানতে সত্যসুন্দরী খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন,

—কাটাও, কামরূপ কামাখ্যার ভেড়ার জীবন কাটাও!

সত্যসুন্দরী চলে গেলে রাণী একবার উঁকি মেরে বাইরে গিয়ে দেখে এলেন চাকর দাসীরা কোথায়। বাইরে দালানে, সিঁড়িতে তারা সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলেশহীন মুখ। বড় ঘরের বড় কেচ্ছা ওরা দরিদ্র মানুষেরা ঐ ভাবেই হজম করতে শিখেছে। স্বামীকে হাত ধরে বিছানার ধারে নিয়ে এসে রাণী শেষ বাতি জেলে দিলেন। চাপা গলায় বললেন,

—না, না, কেউ কিছু দেখেনি। জানে না! চলো তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো!

রাজা চাপা গলায় বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন,

—হ্যাঁ, আমাদের বিয়ের গল্প বলো, শুনি! আমাদের বাড়ির এই কলঙ্কের জন্য আমার কোনো রাজবাড়ির সঙ্গেই সম্বন্ধ হচ্ছিল না। তোমাদের জমিদারী অনেকদূর বলে সব গোপন করা এত সহজ হয়েছিল। তারপর তোমাকে যখন বাড়ি নিয়ে এলাম। দুধে-আলতায় পা দুঁইয়ে তুমি দাঁড়ালে মা ছুটে এসে বললেন—

—দেখি বৌ দেখি! তাহ'লে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হ'ল। ঐ নাও তোমার জন্যে একটা লাউডগা সাপ রেখেছি। ছুঁড়ে দিচ্ছি, লুফে নাও, আমার ছেলে আবার আমি ছুঁলে তোমাকে চান করাবে!

দশবছরের মেয়ে তুমি! অবাক হয়ে পায়ার হারটা লুফে নিলে! কিন্তু ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক সেকথা তুমি বুঝেছিলে। রাণী তাঁর পদ্মকুঁড়ির মত আঙুলগুলি দিয়ে রাজার ঠোঁটে চাপা দিয়ে বললেন,

—আঃ, থাক্ না, আর বলো না!

রাজা বললেন,

—না, আমায় বলতে দাও রাণী। এ আমাদের বিয়ের গল্পেরই ত সব ভালো ভালো পরিচ্ছেদ। তাই না। একদিন অনেকগুলো ছিটকিনি আর কড়া লাগানো একখানা ঘর দেখে তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে—এ ঘরটা কার? ··

একরাত্রে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে-আসা এক মহিলাকে দেখে তুমি রাজবাড়ির পুরোনো দিনের প্রতিমা ভেবেছিলে, নীচের বারমহলে দরোয়ানের নবযুবক ভাই-এর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন দেখেও বিশ্বাস করতে পারোনি উনি রাণী সত্যসুন্দরী।

রাণী দুর্গাসুন্দরী বললেন,

—তোমার কি দোষ? তুমি কি করবে? উনি বিকারগ্রস্ত। উনি রোগী। যে ভাবেই হোক ওঁকে সামলে রাখতে হবে। বিশেষ করে ওর গলার যখন তাবিজটাও পরিয়ে দিয়েছ।

রাজা মাথা নাড়লেন,

—রাণী, আমি সব বুঝেছি, সব বুঝি কিন্তু কি করব বলো। তুমিই বলে দাও!

রাণী মাথা নাড়লেন। তিনি নিরুপায়।

রাজার হয়ে তিনিই যান সামাজিকতা করতে। এই জমিদারীতেই আর এক ধনী সোনার বেনে সেনেরা। সেন বাড়ির খোলামেলা মনের বড়গিন্নী নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে সরিকদের কাছে রাণীকে কি অপদস্থই না করিয়েছিলেন। রাণী মুখ বুজে সব সহ্য করতেন। যাতে স্বামীর গায়ে একটি আঁচড়ও না লাগে।

কিন্তু আঁচড় লাগত। রাজার সুস্থমন যেন অন্ধেরার মধ্যে থেকেও দেখে নিত চাপা ঘৃণা, গোপন অবজ্ঞাকে। প্রতিদিন রাত্রে বারোটার সময় ঠিক ওঁর তন্দ্রা ভেঙে যেত। তিনি আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেন। পাশে জেগে শুয়ে থাকতেন রাণী। ঘুমের অমলে শিয়ালের পাল প্রহর ঘোষণা করত। রাণী ক্লান্তকণ্ঠে বলতেন,

—আর কি হবে জানলায় দাঁড়িয়ে! তুমি শুতে এসো! রাজা কোনো উত্তর দিতেন না। অনড় পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর দেখতেন মুঠোমুঠো মোহরের ঘুষে যথারীতি ছিটকিনি আর তালা খুলে গেছে।

নিঃশব্দ পাখী বেহারারা চলেছে ঘটাকটক পেরিয়ে। রামধন্নালের এখন অনেক টাকা। রাজার বাড়ির চাকরি ছেড়ে এখন সে পাশের তিনখানা গাঁ কিনে জমিদার হয়েছে। শুধু তার বনেদীয়ানা আর নবাবী আমলের রাজা পদবীটাই নেই। আর সব আছে।

রাণী স্বামীর শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতেন এমন মনোকষ্ট নিয়ে যে মানুষ দিনকাটায় কি করে তার ঘরে সন্তান আসবে।

কয়েকদিন পরে রাজাকে ডেকে পাঠালেন সত্যসুন্দরী।

—আমি চাই তুমি আবার বিয়ে করো,

বিজয়কেশব মায়ের মুখের দিকে তাকাতেন না। মায়ের সঙ্গে কথাও বলতেন না। তাই মাথা নাড়লেন।

—কিন্তু আমি যে পাত্রী ঠিক করে ফেলেছি।

বিজয়কেশব উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দুয়ারের কাছে এলেন।

—বিয়েই যদি না করবে, তাহলে এই সম্পত্তি নিয়ে করবেটা কি? তুমি?

বিজয়কেশব ঘুরে দাঁড়ালেন।

রাণী সত্যসুন্দরী গলার ভারি সোনার তাবিজটি মুঠিয়ে ধরেছেন।

—এটার বিলিব্যবস্থা তাহলে এবারে আমায় করতে হয়। হরদয়ালের সংসার বাড়ছে, রত্নমালার সংসার বাড়ছে। তারপর রত্ন এখন কপর্দকহীন। ওর বাড়ি ভাকাতি হয়ে গেছে।

বিজয়কেশবের অজ্ঞাতেই ওঁর দুহাত মুঠি হয়ে এল।

রাণী আবার তীক্ষ্ণ তীব্র গলায় বললেন,

—সাত দিনের মধ্যে যদি তুমি বিয়ে না করো তাহলে এই বিষয়-সম্পত্তি সব আমি হরদয়ালের হাতে তুলে দেব। রাণী সত্যসুন্দরীর চিৎকারে চাকর বাদীরা এসে পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দুহাতে সরিয়ে দুর্গাসুন্দরী এসে ঢুকলেন।

—মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি কথা দিচ্ছি সাত দিনের মধ্যেই উনি নবদুর্গাকে বিয়ে করবেন। আপনিও তাবিজ কাউকে দেবেন না।

রাজা নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

রাণী দুর্গাসুন্দরী ঘরে আসতেই রাজা বললেন,

—আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। তুমি বাধা দিলেও আর শুনব না। আমি বরকন্দাজ আর পাইক রেখেছি লক্ষ্মীসিঁড়ির পোলের ধারে। পুরোপাড়ি আর বেহারাগুলো নিকেশ করে ডুবিয়ে রেখে এসে। তাবিজটা যদি পার আনবে, নাহলে ভেসে যাব যাবে। তারপর তোমাকে নিয়ে এই রাজবাড়ি ছেড়ে

লর্ডেন্স ও টফি

জেন্স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

JL-24B

আমি চিরকালের মত চলে যাবো। তীর্থে তীর্থে ঘুরব। যেখানে কেউ আমাদের চেনে না জানে না। তুমি না বলেছিলে তুমি বাইরের জগৎ পাহাড়ালা নদী বন বাঘ দেখতে ভালোবাসো—প্রাণ ভরে দেখাবো তোমায়।

রাণীর দুচোখ দুটি উল্কাতারার মত জ্বলে উঠে এক মুহূর্ত যেন রাজার স্বপ্নকে দায় দিয়েছিল। তারপরই সারা শরীর যেন থর থর করে কেঁপে উঠল তাঁর।

—মাতৃহত্যা! মহাপাপ, ছিঃ

মন জ্বলে উঠল তাঁর! বর্গীদের আক্রমণের ভয়ে মাটির নীচে কোথায় যেন রাজবাড়ির বংশপরম্পরা ধরে সঞ্চিত সোনার ঘাট রাখা আছে। তারই নকশা আছে রাণীসতাসুন্দরীর গলায় তাবিজে। সেই বিষয় ছেড়ে দিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর অনুতাপ আসবেনা ত।

রাণী আজ স্বামীকে একটি চরম পরীক্ষায় ফেলতে চান। তাঁর দেখা পুরুষদের পাশাপাশি বাজিয়ে দেখতে চান বিজয়কেশবকে। বাবা কাকা স্বামীর বংশের অন্যান্য শরিকদের পুরুষরা যেভাবে ঘর বার হাজার সংসার করে পুরুষের মত আছে, তাদের মত স্বামীর মতি গতি কিনা রাণী একবার শেষ যাচাই করে নেবেন বলে মাথা হেলিয়ে হেসে বললেন,

—তুমি যে বিয়ে করবনা বলছ, তুমি কি নবদুর্গাকে দেখেছ?

রাণী বাইরে থেকে কাকে যেন হাত ধরে টেনে এনে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে চলে গেলেন।

—দেখো, দেখো, প্রাণভরে দেখ!

রাজা তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কি তীব্র তপ্ত সৌন্দর্য। যোলতার মত হলুদ, কালো, ভ্রমরার মত রূপালী কালো। অথচ তীক্ষ্ণ ছুরির মত বাঁকানো চোখ, সরু কটিদেশ কঠিন স্তন। এমন মেয়ে বিজয়কেশব কখনো দেখেন নি।

নবদুর্গার পাশ দিয়ে উঠে গিয়ে তিনি দুর্গাসুন্দরীর ঘরের দিকে গেলেন।

নিজের ঘরে খেতে বসেছেন দুর্গাসুন্দরী। রূপোর পাত্রাঅলা একটি বেকাটীতে ভেলভেটের বালিশে একটি হাতের ভর দিয়ে। একমুঠো ভাত আর ছোট ছোট বাটী-ভরা নানান ব্যঞ্জন। এর সিকিও খাবেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর তাঁর সাবিত্রী ব্রত। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ছাড়া খান না। রাজা সামনের কেদারায় এসে বসতে রাণী স্বামীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন,—

—এই শেষ খেয়ে নিচ্ছি, আজই আমি বাবার কাছে চলে যাবো।

রাজা বললেন,

—তুমি এভাবে আমায় অত্যাচার করছ কেন রাণী?

তুমি ছাড়া আর ত কেউ আমায়..... রাণী উগ্র, ক্রুদ্ধ চোখে চাইলেন রাজার দিকে।

—রাজা, আমি অনেক সয়েছি। আর নয়। আমি চাই চরম প্রমাণ দিতে। তোমার মা বলেছেন আমি বন্ধ্যা। আমি দুশ্চরিত্রা নই। তাহ'লে হয়ত প্রমাণ দিতে পারতাম। আমি তাঁকে জানিয়ে দিতে চাই যে তাঁর সমর্থ ছেলে তাঁরই অত্যাচারে আজ আর সন্তানের বাবা হতে পারে না। তুমি নবদুর্গাকে বিয়ে করো।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। নিজের অজান্তে রাণী দুর্গাসুন্দরী তাঁকে যে কোথায় আঘাত দিলেন তা বুঝতেও পারেন নি।

রাজা অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন বহির্বাটীর রংমহলে। এবাড়ি

থেকে দুর্গাসুন্দরী একচোখ জল নিয়ে দেখলেন রংমহলের হাজার তালের ঝাড়বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠল।

সাতদিনের মধ্যেই নবদুর্গাকে বিয়ে করলেন রাজা। কিন্তু হরদয়ালের যুবতী মেয়ের কাছে আসার মুহূর্তে কোথায় তাঁর। তিনি তান্ত্রিক সাধক নিয়ে যেতেছেন, আসন করেন কারণ করেন আর প্রতিরাত্রে এক একটি প্রজার ঘর থেকে এক একটি কুমারী আসে তাঁর ষোড়শোপচার পূজা নিবেদনের জন্য।

হরদয়ালের বাড়ি আর পালকি যায় না। রাত বারোটার প্রহর ঘোষণা করে শিয়ালের পাল যখন গর্তে ফিরে যায় তখন রংমহলে হুলোড়। হুলোড়ের পূজা আচার। মাতৃহত্যা মহাপাপ, রাজা নাকি তাই বন্ধ করে পবিত্র হচ্ছেন। শুধু একদিন রঙমহলে আলো জ্বলেনি। কুমারী পূজা জমেনি। সেদিন একটি নিঃশব্দ পালকি রাজবাড়ি ছেড়ে উত্তর দিকে চলে গেল। রাজা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হয়ত মনের কিনে নেশায় পুরোনো দিনের কথা মনে হয়ে থাকবে তাঁর। তিনি আস্তে আস্তে নবদুর্গার ঘরের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে খেতে বসেছে নবদুর্গা। একথালা ভাত, চুনো মাছের বাসি টক্ আর আচার! হরদয়ালের মেয়ে। ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি।

আর একজনের আর একদিনের খাওয়া মনে পড়ে গিয়েছিল হয়ত। ফিরে গিয়েছিলেন রংমহলে। তারপর তাঁর পঞ্চমুণ্ডির আসনে। পরদিন সেখানেই রাজার মৃতদেহ পাওয়া যায়। কেউ বলে পিশাচ তাঁর কণ্ঠ রোধ করে মেরেছিল, কেউ বলে কোনো কুমারীর ক্রুদ্ধ পিতা।

তবে আবার একটি পালকি ফিরে এসেছিল রাজবাড়িতে। আর ফিরে যায়নি। দুটি বিধবা বসবাস করতো এই বিশাল রাজ বাড়িতে। একজন যার যার বেরিয়ে যেতে চাইত, আর একজন তাকে ধরে বেঁধে বৈধব্য পালন করাত। এই ছিল তার কাজ।

আজও যদি কেউ রাজা বিজয়কেশবের সেই কালো হয়ে-যাওয়া অয়েল পেন্টিংটিকে ঠাহর করে দেখেন, হয়ত দেখতে পাবেন কোণে শিল্পীর বিলিতি নামের তলায় লেখা আছে আরও দুটি নাম। এ ছবি এঁকিয়েছেন তাঁর স্ত্রী নবদুর্গা আর দুর্গাসুন্দরী।

রাজা বিজয়কেশবের বোন, রত্নমালার বংশের কেতুরুক বহু যখন রাজা হলেন তখন আবার তীর্থের পথে নিয়ে দুটি স্ত্রীলোককে নিয়ে চলে গিয়েছিল সাদামাঠা একটি পালকি।

সে পালকি আর কোনদিন ফিরে আসেনি!

সকাল আটটাতেই যেন নিশুতি রাত। এমন ভীষণ নির্জন, নিস্তব্ধ এই শহরটা। অথচ বাইরে থেকে কিছুই এর বোঝা যায় না। বাইরে বোম্বের দারুণ কর্মচঞ্চল জীবন। লোকজনের ভীড়, গাড়ী-ঘোড়া, সারে সারে দোকান পশার, চিরব্যস্ত ফেরিওয়ালা কর্মীরা। তারই এক পাশ দিয়ে ওপরে উঠে গেছে চওড়া রাস্তাটা মালাবার হিলে। সেখানে ডাবল-ডেকার আর মোটর গাড়ীর দাপটে পথিকরা সদা সন্ত্রস্ত। ঠিক তারই নীচে, ঠিক তারই পাশে এই অখণ্ড নৈঃশব্দের রাজত্বটা চুপচাপ তার অস্তিত্বটা বজায় রেখে যাচ্ছে। একথা কারুর চট করে মনেও পড়ে না। বাইরের কোন কোলাহল এ রাজ্যের অটল নৈঃশব্দ্য ভাঙতে পারে না। প্রয়োজন না হলে এ রাজ্যে কেউ আসে না।

ভিতরটাতে পাহাড় আর জংগল। ক'দিন থেকে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত। বোম্বের আকাশে এক সপ্তাহ সূর্য অদৃশ্য। আজ বৃষ্টিটা কিছু কম। কিন্তু গাঢ় মেঘের আস্তরণে সহর ঢেকে বটেই, আরব সাগরের চক্রবাল পর্যন্ত আপাদমস্তক মোড়া। সেই আকাশেই আরব সাগর হলস্থূল হয়ে ফুঁসছে ক'দিন থেকে।

এই ঘুটঘুটে মেঘলা দিনে এই জংগলে পাহাড় অঞ্চলটা অদ্ভুত রকমের অবাস্তব লাগছে। সব কিছু ছায়া ছায়া। সব কিছু অস্পষ্ট আর আবছা। এর এই চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা ছায়াগাছগুলো যেন অশরীরীর দল। জংগলের কোপঝাড়ের আবছা অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বহু অদেহী। মাঝে মাঝে তারা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। হাওয়া হেঁকে চলেছে সর্‌সর্‌ আওয়াজ তুলে। যেন পাতাল থেকে সটান উঠে আসছে এই হাওয়া, এমন ভিজে, এমন ঠাণ্ডা। অজস্র চোখের জল ঝরে পড়ছে টুপটাপ করে চারদিক থেকে। তাদের শব্দগুলো কানে এসে বাজছে হৃৎস্পন্দনের আওয়াজের মতো।

নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে, আমি এখানে কখনো আসতাম না। ডাক্তারের টেলিফোন পেয়েছি সকাল বেলায়। ওরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। মনে বেদনার বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ওদের প্রতীক্ষায়।

ক্রমশঃ এই ঘুমন্ত নৈঃশব্দ্য আমাকে অজগরের মতো গ্রাস করতে লাগল। চোখের সামনে দুচারজন লোককে দেখছি ঘোরাফেরা করতে। একটু দূরেই সামনে অফিসঘরের মতো বাড়ীটার লোকজনের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। দু'একটা পাখী গাছের ডালে বসে ডানা ঝাড়া দিচ্ছে, তাও চোখে পড়ছে। এমন কি যে পীচ-বাঁধান রাস্তার ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি তার পাশে পাশে সুদৃশ্য ফুলের কেয়ারি-করা ঝাড়গুলোও যে আমার নজরে পড়ছে না এমন নয়। তবু মনে হচ্ছে আমি যেন ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছি একটা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে। সমুদ্রটা অজগরের মতো আমাকে গিলছে।

ওরা যে কখন সামনে এসে গেছে বুঝতে পারিনি ভাল করে। ডাক্তার আমার কাঁধে হাত দিতে আমি সজাগ হলাম।

—কতক্ষণ এসেছ?

হাতের ঘড়ি দেখলাম। প্রায় দশটা বাজে।

—চলো, অফিস ঘরের দিকে যাই। ওরা ওখানেই রয়েছে।

ডাক্তারের মুখ মেঘলা আকাশের মতো থমথমে, বিষণ্ণ। গলার আওয়াজ অত্যন্ত গম্ভীর।

যন্ত্রের মতো এগিয়ে গেলাম। অফিস ঘরের বারান্দায় শবাধারটা নামান হয়েছে। দুধের ফেনার মতো সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা একটা দেহ, যেন পটে-আঁকা ছবিটি। তার ওপরে সাদা বড় বড় লিলি আর লাইলাকের কয়েকটা রিং। ফোটা লাইলাকের অজস্র পাপড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে আর একটী না-ফোটা ঘুমন্ত লাইলাক। একটী মুখ! ঈষৎ পাণ্ডুর, দুটী চোখ বোজা! যেন ঘুমের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য! ও মুখে মৃত্যু এখনও তার কলঙ্কিত স্পর্শ রাখতে পারেনি। পাশে দাঁড়িয়ে রোজা বাটলিওয়ালা। কেঁদে কেঁদে ওর চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। আমি কাছে আসতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোজা।

ডাক্তার ওপাশে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সব নিস্তব্ধ।

আমি যেন আবার তলিয়ে যাচ্ছি। এ বড় ভয়াবহ স্তব্ধতা। আমার চোখের সমুখ থেকে সব কিছু যেন এক এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে, অনেক দূরে। কিছু একটা বলে ওঠবার চেষ্টা করতে গেলাম। মুখ দিয়ে বার হয়ে এল, ফিরোজ আসেনি?

নিজের কানেই শুনলাম নিজের কথাগুলো। নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল।

ওরা ওদের কাজ সুরু করে দিয়েছে।

অফিসের কাজ ফেলে রাখা চলবে না। তেখ্ সার্টিফিকেট্ লিখতে হবে। তার আগে আছে বহু কাজ।

তারপর আছে অন্তিম ক্রিয়া। তার জন্ত এগিয়ে যেতে হবে আরও দূরে। লোকচক্ষুর একেবারে অন্তরালে।

ডাক্তার আর রোজা অফিস ঘরে গেলেন। আমি অনিমেষ হয়ে দেখতে লাগলাম সেই মোষা লাইলাকটীকে।

যখন এই লাইলাকটী ছোটা ছিল, এর মধ্যে যখন অজস্র জীবনের বর্ণালী খেলা করত, প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমল করত এর সমস্ত শরীর। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বহু লোক অবাক হয়ে চেয়ে থাকত এর দিকে। আমিও থাকতাম। এক এক সময় একে দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারতাম না। এমন সুন্দর, এমন সতেজ!

কিন্তু ফিরোজ কেন এল না? এদের এক সম্প্রদায়ের লোক। এদের আত্মীয় বন্ধু, সব সময়ের পরামর্শদাতা ফিরোজ! সে কি শোক সহ্য করতে পারেনি?

আমি আবার ডুবে যাচ্ছিলাম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। ডুবতে ডুবতে স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখছিলাম আমাদের চার্চগেটের বাড়ীটার চারতলার ফ্ল্যাটের স্বপ্ন। আমি দেখছিলাম ফিরোজকে। একটা টকটকে লাল চুকের জীবন্ত লাঠি। ঝকঝকে করে মাজা। মানুষ তার কাছে এলেই একটা আকর্ষণ অনুভব করতে বাধ্য। এড়াবার উপায় নেই। অন্ততঃ আমি তো এড়াতে পারিনি। এবং আরও অনেকেই।

দীর্ঘল চেহারা, সেমিটিক বাঁকা নাক ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের ওপরে। টকটকে লাল গায়ের রং, দু'গালে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। চুনীর টুকরোর মতো রক্তাভ দুটো চোখ। এখন তখন ঝিলিক দিয়ে ওঠে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

আর সে কি কথা! গলায় মিঠে-গম্ভীর সুরে স্বরোদের আওয়াজ। মাঝে মাঝে সাদা মুক্তোর মতো দাঁতের মন-মাতান হাসি। ফিরোজ বিলিমোরিয়া বোম্বাই শহরের একজন অতুলনীয় রূপবান পুরুষ।

ফিরোজকে দেখে, ফিরোজের সঙ্গে কথা বলে ভুলবে না এমন লোক দুনিয়ায় কেউ আছে নাকি? জ্ঞানের এমন বিষয় নেই যা নিয়ে ফিরোজ কথা বলতে পারে না। আর ঠিক সময়টিতে ঠিক কথাটী যুগিয়ে দেওয়া।

ফিরোজ সব সময়েই প্রস্তুত। তা সে কথাবার্তাতেই হোক বা বেশবাসেই হোক। সকাল আটটাতে (এই সময় সে দরজা খুলে বার হয়) কি রাত একটাতে যখনই তাকে দেখা যাক মাথার চুল থেকে জুতোর ডগাটী পর্যন্ত তার মাজাঘষা, ঝকঝকে।

ফ্ল্যাটের মালিক প্রৌঢ়া রোজা বাটলিওয়ালা যখন প্রথম আমাকে তার ঘরে ফিরোজের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়, তখন যথেষ্ট গর্বের সঙ্গে মুখ এবং বুক ফুলিয়ে, চোখ বড় বড় করে বলেছিল—ফিরোজ, আমার কাজিন। পার্শী সম্প্রদায়ের গর্বের বস্তু। একজন কেমাস, সাকসেস্ফুল বিজনেস্ একজিকিউটিভ্। একটা প্রথম আমেরিকান ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মের সঙ্গে যুক্ত।

এই একজিকিউটিভ্ কথাটা রোজা উচ্চারণ করেছিল অনেক যত্নের সঙ্গে, তার ওপর শব্দের সমস্ত গুরুত্ব দিয়ে।

আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রণ। ফিরোজ বড় সামাজিক, বড় বন্ধুবৎসল। আপনি যখন

আমাদের নেবার, তখন আপনাকে সঙ্গ দেবার দায়িত্ব আমাদেরই। আসুন আজ রাত্রেই আলাপ করা যাক।

ক্রিকেট ক্লাবের বিখ্যাত ডাইনিং হলে ফিরোজ নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। সেখানে গিয়ে আমি অবাক হয়েছিলাম ফিরোজের পরিচিতের সংখ্যা দেখে!

—আসুন, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা—

—এই যে ডানদিকে একটু চলুন বোম্বাই-এর হালাল ষ্টীটের প্রিন্স—

—আর ঐ যে দেখুন একদম খাঁটী পার্শী টুপি মাথায়, গলাবন্ধ কোট গায় মিস্টার টাটা। আমার স্বজাতি, সমস্ত ভারতের বাণিজ্য-ভাগ্য-বিধাতা। চলুন, আলাপ করিয়ে দিই।

অন্ততঃ বিশজন উচ্চতম স্তরের রইস্ ব্যক্তির সঙ্গে ফিরোজ অভিবাদন দেওয়া-নেওয়া করেছিল। তাদের মধ্যে দশজনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ধরণের আলাপ করেছিল বেশ কয়েক মিনিট ধরে গল্প নামিয়ে।

আর দেখেছিলাম ফিরোজের যাদু মহিলা সমাজের ওপর। যেদিকেই সে তাকায় সেদিকেরই মহিলারা একবার করে উঠে এসে হেসে আলাপ করে যায় ফিরোজের সঙ্গে। অথবা হাত নেড়ে হাসি ঠাট্টা করে নিজেদের টেবিল থেকে। ফিরোজ সবারই বন্ধু, সবারই পরিচিত। রোজা মিথ্যে বলেনি। ফিরোজের সঙ্গে এসে গর্বে আমারই বুক ফুলে উঠছিল। এমন লোকের সঙ্গ পাওয়া, তার 'নেক্সটডোর নেবার' হবার সৌভাগ্য হয় কজনের?

কিন্তু আমাদের টেবিলে আমরা ছিলাম মাত্র দু'জন।

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সোভিয়েট রাশ্যা আমাদের ভারত সাগরের বৈজ্ঞানিক অভিযানে জাহাজ দিয়ে আসছে?

অবাক হয়েছিলাম। ব্যাপারটা তখনও সরকারের উঁচু দপ্তরে অত্যন্ত গোপনীয় একটা খবর হিসাবে রাখা হয়েছিল।

—কি করে জানলেন আপনি?

—আমার কাছে সরকারী কোন খবর গোপন থাকে না। আপনি ঐ দপ্তরে কাজ করেন বলেই আপনাকে বললাম। আপনাদের দপ্তরের উঁচুতে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই আমার বন্ধু। যদি পরে কিছু প্রয়োজন হয় তো বলবেন।

আমি প্রায় গলে যাবার জোগাড়। বললাম—এখানে এসে তো দেখছি আপনি একজন প্রকৃত গুনাময়ন্ত পুরুষ।

ফিরোজের ঠোঁটের ওপর গর্বের হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল—আমার কাছে এই সব লোকেদের সবারই টিকি বাঁধা।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে (ফিরোজ নির্জলা হুইস্কিটাই বেশী পছন্দ করে) বলেছিল—যাই হি যাই, আপনার যদি কখনও কোন কাজে লাগি, ধন্য মনে করব নিজেকে। যতো কঠিন কাজই হোক। আপনি আমার প্রতিবেশী—

আরও দু'এক ঢোক হুইস্কি পান করে আবার বলেছিল—'আমার কাছে আলাদীনের প্রদীপ আছে (এই আলাদীনের প্রদীপ কথাটা উচ্চারণ করার সময় তার মুখে চোখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল)।

এই দিয়ে আমি প্রায় সব কাজ উদ্ধার করে থাকি। আমার কাছে যে যা চায় তাই পায়। আমেরিকান এই কোম্পানীটাকে বলা যায় আমিই এদেশে এনে বসিয়ে দিলাম।

হঠাৎ আলোচনার গতি পাল্টে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা, আপনি কি 'ব্যাচলর' ?

—না, তবে ফ্যামিলি কলকাত্তাতে।

—আ-উ! তা হলে আপনি আমার স্বগোত্র? আসুন আসুন—

ফিরোজ আমার হাতটা জোরে চেপে ধরেছিল সোজাসে। সঙ্গীহীন লোক আপনি, সময় কাটাবার জন্য সঙ্গীর দরকার হলে আমার কাছে আসবেন, আমাকে বলবেন। দেখবেন আলাদীনের প্রদীপ কিভাবে কাজ করে।

ইতিমধ্যে বড় দু' পেগ হুইস্কি শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফিরোজ নিজের থেকেই বলেছিল—আমি অবশ্য ইচ্ছে করেই 'ব্যাচলরের' জীবন নিয়ে আছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না। অ্যাণ্ড্ আই থিঙ্ক সো দিজ্ইজ দ্য বেস্ট। আসলে আপনি যদি নেহাৎ 'মিজিওকর' না হন, তবে আপনার স্ত্রী নিয়ে মিবিবাদী সংসার করা বরাতে হয়ে উঠবে না। যাবেন কি একথা?

উত্তর দিতে আমি একটু কুণ্ঠা বোধ করছিলাম মনে মনে। কিন্তু ফিরোজ তিন নম্বর পেগটাকে হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরে তার গায়ে গভীর ভালবাসার সঙ্গে (ঠিক যেন যুবতী নারীর অঙ্গে হস্তার্পণের মতো) হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল—অবশ্য যদি আপনি ডাক্তার গাইতোণ্ডের মতো ক্র্যাংকি না হন।

—কে ডাক্তার গাইতোণ্ডে?

—আরে তাও জানেন না? আপনার ডান পাশের ঘরের বাসিন্দা ডক্টর সি. গাইতোণ্ডে, এফ্. আর. সি. এস্. (লণ্ডন), এম্. আর. সি. পি. (এডিন), পি. এচ্. ডি. (বার্লিন), ডি. এস-সি. (ভিয়েনা), এণ্ড সো অন্ অ্যাণ্ড সো ফোর্থ।

—খুব বড় ডাক্তার নাকি?

হা হা করে হেসে উঠল ফিরোজ। একজন অ্যাডেঞ্চার, ডিগ্রী হাণ্টার। সাকুল্যেসাকুল ডাক্তারেরা কখনও এতো ডিগ্রী নিয়ে বেড়ায় না। তারা চিকিৎসা ব্যবসাতেই ব্যস্ত থাকে।

আবার হেসে উঠল ফিরোজ হা-হা করে। দেখলেই বুঝতে পারবেন। তবে একটু সাবধান করে দিই আগে থেকে, কথাবার্তা কইবেন খুব হুঁসিয়ার হয়ে।

ওদের অফিসের ভিতর বেশ দেরী হচ্ছিল। আমি জানি দেরী হবেই। ডাক্তারকে অনেক লড়তে হবে এই মৃত্যুটাকে একটা স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে প্রমাণ করতে।

আমি সেই লাইলাক গুচ্ছের ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হু হু করে হাওয়া বইতে লাগল একবার জংগলের ভিতর দিয়ে। রাস্তার ওপারে গাছগুলো ঘাড় ভাবে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। ছড় ছড় করে জল ঝরে পড়ল। পরক্ষণেই নিস্তব্ধতাটা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

আমি আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

ডাক্তার চিন্তামন গাইতোণ্ডে। মাথায় পাঁচ ফুটের চেয়ে হয়তো দু'এক ইঞ্চি বেশী। কালো

রোগা রোগা চেহারা। শরীরের ভিতর থাকবার মধ্যে আছে একটা খাপছাড়া বড় মাথা। তাতে দুটো বড় বড় চোখ। তার ওপর ভীষণ পুরু লেন্সের এক জোড়া চশমা। পরণে চলচলে ট্রাউজার্স। তাতে যে কোনদিন ক্রীজ লাগান হয়েছিল, তা দেখলে মনেই হয় না। পাগুলো তার গোল গোল। গায়ে অতি সাধারণ হাওয়াই শার্ট! মুখে নেই এতটুকু হাসির রেশ। ডাক্তার সর্বদাই গম্ভীর। হাব ভাবে চাল চলনে, বেশবাসে ফিরোজ বিসিমোরিয়ার ঠিক বিপরীত মেরুর লোক ডাক্তার চিন্তামন গাইতোণ্ডে।

রোজা বাটলিওয়ালাও প্রথমদিকে ডাক্তার গাইতোণ্ডে সম্বন্ধে কিছু জানিয়ে ছিল। অবশ্য প্রথমেই সে চোখ বড় বড় করে বলেছিল (এইটাই তার নিজের ফ্ল্যাটের বোর্ডারদের পরিচয় দেবার সাধারণ পদ্ধতি। তার মতে তার বোর্ডাররা সবাই এক একজন ঝিনপাগল।)—ডাক্তার গাইতোণ্ডে একজন খুব বড় চেষ্ট স্পেশালিষ্ট। আমার বহুকালের পুরনো হাঁপানী ওঁর চিকিৎসাতেই সারছে। বিদেশে কাটিয়েছেন অনেকদিন। তবে ওঁকে দেখলে সেটা বোঝা যায় না। আপাততঃ একটা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। ওঁর হাসপাতালে আমি প্রায়ই যাই। সেখানকার নার্স, নার্স, ডাক্তাররা সবাই বলে গাইতোণ্ডে ইজ্ এ মিথ্যাকুলাস ওয়ার্কার। নিজের কাজে ডাক্তার ষোল আনা নিঁখুত। ডাক্তার হিসেবে পয়লা নম্বর।

তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে বলেছিল—এ সবই ঠিক। কিন্তু একটা বড় ব্যারাম আছে ওঁর।

বলে রোজা আমার মুখের ওপর তার কথাগুলোর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করেছিল। তারপর মুখ মটকে বলেছিল—যদি কখনো পান খেকে চুনটুকু খসে তাহলে ডাক্তার মুহূর্তে ভূতকালায় বাঁধিয়ে ছেড়ে দেবে। কাজেই আপনাকে বলে রাখা ভাল আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। বলা তো যায় না—

—আর হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে রাখি।—রোজা তার কথার জের টেনে বলেছিল। —যদি কখনও ওঁর সঙ্গে কোন ব্যাপারে এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট করেন তাহলে বরঞ্চ একটু আগেই গিয়ে হাজির হবেন। নৈলে এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট লেট্ মানেই হল ওঁর খাতা থেকে চিরকালের জন্যে আপনার নাম কেটে যাওয়া। উনি বলেন, যারা সময়ে এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট রাখে না, তারা অসভ্য। তাদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। কাজেই—

ডাক্তার চিন্তামন গাইতোণ্ডেকে আমি প্রথম প্রথম কয়েকদিন কেবল চোখেই দেখেছিলাম। কথাবার্তা আমাদের কিছুই হয়নি। একদিন আলাপ হয়ে গেল একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে।

কোলাবার সেকেণ্ড বাস-স্টপেজটাতে একদিন দুপুর বেলায় দাঁড়িয়ে আছি। যে নম্বরের বাস ধরব তার আর পাত্তা নেই। একটু দূরে দেখলাম দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ডাক্তার চিন্তামন গাইতোণ্ডে। দু'জনে চোখাচোখি হল। ব্যস্ ঐ পর্যন্তই।

মিনিটের পর মিনিট চলে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট ডাক্তারের ভুরু দুটো ক্রমশঃই কুঁচকে উঠছে। এমন সময় সেই নাম্বারের বাসটাকে আসতে দেখা গেল। বাসটা ষ্টপেজে এল বটে, কিন্তু যাত্রীদের ওঠার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে তখুনি বার হয়ে গেল হু-হু করে।

ষ্টপেজে বাস না দাঁড়ান বোম্বাই এ এক অভাবনীয় কাণ্ড। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। কেউ কেউ চেঁচিয়ে গালাগাল করতে লাগল। ডাক্তার গাইতোণ্ডে ঝপ করে আমার হাত ধরে বললেন—আপনি রোজা বাটলিওয়ালার ফ্ল্যাটে থাকেন কি?

বললাম—হাঁ।

—তবে আসুন।—বলেই একটানে আমাকে একটা সামনে-দাঁড়ানো ট্যাক্সির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, নিজেও উঠে বসলেন আমার পাশে। ড্রাইভারকে বললেন সামনের ঐ বাসটাকে ধর।

আমার দিকে ফিরে বললেন—দুপুরে আমি আজকাল রোজই এদিকে কাজে আসছি। রোজই দেখছি এই ব্যাপারটা ঘটছে। আজ এর ফয়সালা করব।

ট্যাক্সিটা ওদিকে বাসটার সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে দৌড়তে সুরু করেছে। বোম্বাই এর গাড়ী-ঘোড়া ঠাসা রাস্তায় একভাবে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কখনও আটকাচ্ছে লাইট্‌পোষ্টে, কখনও ট্রাফিক জামে।

সামনের চলন্ত বাসটার দিকে নজর রেখে ডাক্তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে (অর্থাৎ ভুরু দুটো উঁচুকে) গম্ভীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

নাম বললাম। হঠাৎ দেখলাম ডাক্তারের সেই গম্ভীর মুখে এক চিলতে হাসির আভাষ। বললেন—আপনি একজন গুণী লোক। এত একটা রাতে আপনার বেহালার আলাপ শুনি আর মনে করি আপনার সঙ্গে আলাপ করে আসি! কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। নিঃসন্দেহে বলছি আপনি চমৎকার বাজান। আপনার চা'টা বড় ভাল। আমাদের মারাঠী চা'এর মতো নীরস নয়। বরঞ্চ অনেক বেশী মোলায়েম, অনেক বেশী মিঠে।

ডাক্তারের কথা শুনে আমি একটু বিস্মিত হলাম। ডাক্তার যে বিশুদ্ধ মার্গ সঙ্গীতের ভক্ত একথা তো আমাকে কেউ বলেনি। আমার কৌতূহল বাড়ল।

ডাক্তার ওদিকে চেঁচিয়ে উঠেছেন—এই ড্রাইভার রোখো, রোখো।

কিন্তু ট্যাক্সিটা কষতে কষতে বাসটা আবার চলে গেল অনেক দূরে। এইভাবে জন সিলপিনের রেস্ চলতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ বোম্বাই-এর রাস্তায়। শেষে সেই দাদারে গিয়ে ধরা গেল বাসটাকে।

কন্‌ডাক্টরকে প্রথমেই চেপে ধরলেন গাইতোণ্ডে।—কোলাবার সেকেণ্ড ষ্টপেজে যাত্রীদের উঠতে দাওনি কেন ?

মারাঠী কন্‌ডাক্টর তার স্বভাবসিদ্ধ বদ মেজাজ দেখিয়ে রুঢ় ভাবে জবাব দিল—বাস ভর্তি ছিল।

—ছিল না, আমরা সবাই জানি সে কথা। আমার সঙ্গে এই আর একজন ভদ্রলোক আছেন, তিনি সাক্ষী।

—আরে যাও হটো।—প্যাসেঞ্জারদের টিকিট দিতে দিতে জবাব দিল লোকটা। হাত ঝেড়ে হটিয়ে দিতে চাইল ডাক্তারকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। আর সেই ছোট মানুষটি তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে চেপে ধরলেন কণ্ডাক্টরের জামার কলারটা।

—তোমাকে আমি থানায় নিয়ে যাব। কদিন প্রায়ই দেখছি কোলাবার সেকেণ্ড ষ্টপেজে বাস থামছ না। যাত্রীদের খুবই অসুবিধা করছ। তোমাদের এই ফাঁকি-দেওয়া কাজ আমি বন্ধ করে ছাড়ব।

ডাক্তারের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। ওদিক থেকে আর একজন কন্‌ডাক্টর এসে চালিয়ে দিল ঘুষোঘুষি ঘুষি ডাক্তারের নাকে মুখে। কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে সে যাত্রায় ডাক্তারকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম কোন গতিকে।

মুখ, নাক থেঁতো হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের। তার জন্য দু'দিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

ডাক্তার হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। সন্ধ্যাবেলা দেখা হতেই বললাম—ঐ সব গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে লেগে ভাল কাজ করেননি ডাক্তার। ডাক্তারের কোঁচকান ভুরু আরও কুঁচকে উঠল। বললেন—গুণ্ডাদের সামনে রুখে না দাঁড়ালে ওরা যে শেষ অবধি সর্বনাশ করে ছাড়বে। আপনি হয়তো খবর রাখেন না, সেদিন ঐ বাসে একজন খবরের কাগজের লোক ছিলেন। তিনি খবরটা কাগজে তুলে দেন। তারপর থেকেই কোলাবা বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে যে কটা বাস ছাড়ছে তাদের ওপর বেষ্টের কর্তারা রীতিমতো কড়া নজর রাখছে।

বলতে বলতে চট করে আমার ঘরে ঢুকে পড়লেন ডাক্তার। ধপ করে বসে পড়লেন সটান আমার বিছানাটার ওপরে (ডাক্তারের কার্যকলাপ সবই এমনি বাপছাড়া)। বললেন—রাখুন ওসব কথা। একটু শুদ্ধ কল্যাণ আলাপ করুন দেখি, শুনি।

পরের দিনই ডাক্তারকে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন লিফ্‌টএর সামনে গম্ভীর মুখে। রাত তখন দশটা। আমি লিফ্‌টএর সামনে আসতেই তেতো গলায় বললেন—লিফ্‌ট্‌ম্যানটা আজকাল ভয়ানক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছি পনেরো মিনিট, কোন পাত্তা নেই। অথচ ওর লিফ্‌ট্‌ নিচে রাখবার কথা এগারোটা অবধি।

এমন সময় করিডরের পাশের আওয়াজ উঠল। কলকল করে হাসি ও কথার শব্দ পেলাম। দেখি গেট্‌ দিয়ে ঢুকে ভিতরে আসছে দুটী মেয়ে। একটীর বয়স কম, হয়তো বছর পঁচিশ, আর একটীর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। দুজনেই হাসিতে খুশীতে ঝলমল করতে করতে এসে হাজির হল। তারপর লিফ্‌টের দিকে না এসেই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রেখে নিল আমাদের।

বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েটী এগিয়ে এল আমাদের সামনে। —গুড্‌ ইভ্‌নিং ডক্টর, লিফ্‌টের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। লিফ্‌ট্‌ম্যানটাকে বাইরে পানের দোকানে আড্ডা মারতে দেখে এলাম।

—তাই নাকি? —গুরুতর মুখ করে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার।

—হাঁ, তাইতো আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। কিন্তু তার আগে,—প্রিজ্‌। —বলে হাতের কোলান বেতের ঝুড়িটা থেকে বার করল এক গুচ্ছ টাটকা তাজা টকটকে লাল গোলাপ। বাড়িয়ে দিল ডাক্তারের দিকে মুখের মিষ্টি হাসির সঙ্গে।

অন্য মেয়েটীও পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি স্পষ্ট দেখলাম ডাক্তার একটু ইতস্তত: করলেন প্রথমে। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে ফুলের গুচ্ছটা নিয়ে বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ, বড় সুন্দর গোলাপ।

বয়সে ছোট মেয়েটী হাসতে হাসতে বলল—এই ফুলগুলো কেনবার জন্যে অনীষা যা ঘোরান ঘুরিয়েছে আমাকে। একবার এ দোকান, আবার সে দোকান—

মনে হল ডাক্তার তার কথায় কান দিলেন না। তিনি আমার সঙ্গে ওদের পরিচয় করাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। —বাঙ্গালী ভদ্রলোক, আমার পাশের ঘরে এসেছেন। চমৎকার বেহালার হাত। একদিন তোমরা শুনে যেও এসে।

বলতে বলতে ফুলের গুচ্ছটা সটান আমার হাতের মধ্যে চালান করে দিয়ে আমার পিঠে হাত রেখে একটু ঠেলা মেরে বললেন—যান আপনারা ওপরে উঠে যান। আমি আসছি।

দেখলাম বড় মেয়েটার চলচলে চোখ দুটীতে মুহূর্তের জন্য একটু ছায়া পড়ল। ছোটটী ভিড়বিড় করে বলল—আপনি বেহালা বাজান? কার কাছে শিখেছেন? ইহুদী মেনুহিন-এর কোন সাকরেদের কাছে?

বললাম—না, আমি ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত বাজাই।

বড়টী ধীর গম্ভীর সুরে বললে—ভাক্তার পাইত্রোগ্রে মার্গ সঙ্গীত বলতে অজ্ঞান। কোথাও গানের আসর বসলে উনি কখনও যাবার সুযোগ ছাড়েন না। একমাত্র সেই সময়েই দেখেছি উনি হাসপাতালের কাজ একটু তাড়াতাড়ি সারবার চেষ্টা করেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মেয়ে দুটীর সঙ্গে আলাপ হল। খবর পেলাম ডাক্তার যে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, মেয়ে দুটী সেই হাসপাতালের নার্স। বড়টীর নাম অনীষা, ছোটটীর নাম বিজয়া। ওরা থাকে এই বাড়ীরই তিনতলার ফ্ল্যাটে একটা ঘরে। অনীষা রোজা বাটলিওয়ালার কি রকম আত্মীয়।

বিজয়া কথায় কথায় বললে—অনীষা তুমি যে কি করে ডাক্তারকে ফুলের গোছাটা দিলে. আমি অবাক হয়ে দেখলাম।

অনীষা বললে—কেন?

ওঁকে দেখলেই আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে। কী গম্ভীর মানুষ!

অনীষা আমার দিকে ফিরে বললে—ডক্টর ইভ্ এ ভেরী হার্ড টাস্ক মাষ্টার। ওঁর কাছে কাজ করা যার তার সাধ্য নয়। নিজে যেমন খাটেন, পরকেও খাটান তেমনি। এতটুকু কাজে ফাঁকি দেবার যো নেই। লিফ্‌ট্‌ম্যানটা দেখছি আজকাল প্রায়ই কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। দেখুন আজ ওর বরাতে কি লেখা আছে।

বিজয়া বললে—এই কিছুদিন আগে আমাদের ফ্ল্যাটের ঝি সীতাকুমারীকে নিয়েও কি ভীষণ গণ্ডগোল বেঁধেছিল। ডাক্তার তাকে তাড়িয়ে ছেড়েছেন। অবশ্য তাতে এ বাড়ীর অনেকেরই গোঁসা হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু কথাটা তো সত্যি ছিল, সীতাকুমারী ইদানীং খুব বাড় বেড়ে উঠেছিল।

অনীষা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—থাক সে কথা। আচ্ছা মিষ্টার, গুড্ নাইট।

ওরা ওদের ঘরে চলে গেল। আমি ওপরে উঠলাম। বহুক্ষণ আর ডাক্তারের দেখা নেই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন নীচে লিফ্‌ট্‌ম্যানের প্রতীক্ষায়, প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তারের ঘরে পায়ের আওয়াজ শুনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম।

তার পরের দিন সকালে রোজার ঘরে গিয়েছিলাম একটু প্রয়োজনে। দেখলাম ফিরোজ বিলিয়োরিয়া বসে আছে। মনে হল আগে হতেই তাদের কিছু একটা আলোচনা চলছিল। আমাকে দেখে ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। বললে—তোমরা কথা বল আমি অফিস যাই।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েও সে গেল না। থেমে যাওয়া আলোচনার জের টেনে বললে—এরকম ক্র্যাংকি চ্যাপ বাড়িতে থাকতে এখানে থেয় পর্যন্ত বাস করাই দায় হয়ে উঠবে। আজ কি সীতাকুমারীর পিছনে, কাল ধরোয়ান এর পিছনে, পরশু লিফ্‌ট্‌ম্যানের পিছনে। এভাবে কাজের লোকেদের পিছনে লাগতে

থাকলে শেষ পর্যন্ত কোন লোকই এ বাড়ীতে কাজ করতে আসবে না। আমি তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে রোজা।

বুঝলাম গত রাতের ঘটনার জের চলছে। ফিরোজ চলে যেতেই গম্ভীর চিন্তিত মুখে রোজা বলেছিল,—কি করি বলুন তো? ডাক্তার গাইতোণ্ডেকে নিয়ে তো আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। কাজে গাফিলতি একটু আধটু তো সবারই হয়. তা নিয়ে এরকম হাঙ্গামা করলে কি চলে? এ দেশটাতো আর বিলেত আমেরিকা নয়। ডাক্তারকে দেখছি এবাড়ী থেকে চলে যেতে বলতেই হবে আমাকে।

কিন্তু আমি জানতাম রোজা ডাক্তার গাইতোণ্ডেকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলতেই পারবে না। রোজার দীর্ঘদিনের হাঁপানী সেরে উঠছে ডাক্তার গাইতোণ্ডের চিকিৎসাতে। এখনও প্রতি রাতে ডাক্তার শোবার আগে একবার করে নিয়মিত চেক করে যান। তাছাড়া এই এতবড় বাড়ীটার প্রায় প্রত্যেক বাসিন্দাই ডাক্তার গাইতোণ্ডের চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে থাকে সময়ে অসময়ে।

আমি বললাম—কি করবেন বলুন : ডাক্তার যে মেজাজ খারাপ করেন তার তো যথেষ্ট কারণও আছে।

—হাঁ, তাতো আছেই।—রোজা অস্বীকার করল না।—আজকাল লোকের রেওয়াজই হয়েছে কাজে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু কি দিনকাল পড়েছে দেখছেন তো? কাজের লোক পাওয়াই তো একটা দুর্ঘট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশঃ।

হঠাৎ দেখলাম রোজার চোখে মুখে একটা দুষ্টু হাসি খেলা করে গেল। বললে—ডাক্তারের এই বদ মেজাজের কারণটা কি জানেন?

বললাম—কি করে বলি বলুন?

—আমি জানি। এই এতো বয়স অবধি পুরুষ যদি স্ত্রী-সঙ্গ না করে তবে এমনি খিটখিটে, এমনি ক্যাংকি হয়। ওর দাওয়াই হল—

—একটা গার্ল ফ্রেণ্ড জুটিয়ে দেওয়া তো?

—ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক।—খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললে রোজা।—ওঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসাবে আমাদের এটা করা উচিত।

পরক্ষণেই ভয় পাবার ভান করে বললে—কিন্তু, ওরে বাবা! বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

—কেন ফিরোজকে বলুন না? সে তো এসব ব্যাপারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

—তা পারে বটে। তবে দু'জনে দু'জনকে আদরে সহ্য করতে পারে না।

তাই নাকি? কিন্তু কেন? একজন ডাক্তার, আর একজন ওষুধের কার্বের এক্সিকিউটিভ্—দু'জনের তো অন্তরঙ্গতা হওয়া উচিত অনেক বেশী। বিশেষ করে ফিরোজের মতো অমন সামাজিক বন্ধু।

—নাঃ,—ঠোঁট উল্টে বললে রোজা।—ফিরোজ প্রথমদিকে অনেক চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার এসব ব্যাপারে একদম অসামাজিক। কোন রকম ভদ্রতার ধার ধারেন না। একে ক্যাংকি, তার ওপর জেদী।

একটু চুপ করে থেকে বললে—তাই ফিরোজ ওঁকে এতটুকুও বয়দাস্ত করতে পারে না। উনি উঠে গেলে ফিরোজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু ওঁকে উঠে যেতে বলাও তো—

রোজা গভীর ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল। তার অবস্থা ভাল রাখি না কুল রাখি। একটু পরে বললে—অবশ্য আমি ফিরোজকে বলব এই কথাটা। ও খুব ক্লেভার তো। যদি কৌশল করে আর কাউকে দিয়ে—বলে একটু চুপ করে কি একটা ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা দেখি কি করা যায়।

সে ঐ প্রসঙ্গটা বন্ধ করে তাদের কথা সুরু করে দিল।

কিন্তু তার দু'দিন পরেই বেতো পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে রোজা আমার ঘরে এল সন্ধ্যাবেলা। বললে—তোমার কথাই মিলায়। ফিরোজকে বলতেই সে মো লাফিয়ে উঠল—মার্ভেলাস। ডাক্তার গাইডোণ্ডেকে সামলাবার জন্য একটী খুব ক্লেভার মেয়ে তার হাতে আছে।

—মেয়েটি কি রকম?

—গোয়ার মেয়ে। রং একটু তামাটে। তা হোক চং চাং-এ কথাবার্তায় একেবারে পয়লা নম্বর।

অভিনয়ে অনবদ্য। তার সঙ্গে নাচবার জন্যে এবার ইণ্ডিয়ার পার্টনটরা পাগল।

—সে গাইডোণ্ডের কাছে ঘেঁসবে কেন? ঐ তো রূপ!

—আঃ তুমি কিস্সু বোঝো না।—অধৈর্য হয়ে উঠল রোজা। - তোমার বোধহয় জানা নেই ফিরোজকে খুশী করবার জন্য এই বোম্বের সোসাইটীর কয়েক ডজন মেয়ে আগুনে পর্যন্ত ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। তা গাইডোণ্ডেকে নিয়ে একটু নির্দোষ খেলা করা তো সে তুলনায় একটা কান। তুমি কিন্তু লক্ষ্মীটী এবিষয়ে ডাক্তারকে কিচ্ছুটী বোলো না।

একটু থেমে বললে—তা ছাড়া এতে দোষেরই বা কি আছে? শুধু একটু কথাবার্তা, একটু হাসি ঠাট্টা। নিষ্টে-কাঠা নীরস ডাক্তারকে একটু গুড্ হিউমারে রাখা আর কি! মেয়েদের সঙ্গ পেলে মানুষ এমনিতেই অনেক নরম হয়।

—ডাক্তার কি বুঝতে পারবে না?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—ওঃ, নো! ডাক্তার সে লোকই নন। মেয়েদের সম্বন্ধে ডাক্তার একেবারে অন্ধ। তাই বোধহয় ডাক্তার তাদের প্রাণপণে এড়িয়ে চলে।

—কি করে জানলেন আপনি?

পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ়া মিস রোজা বাটলিওয়ালা এক নিমেষে নব-যুবতীর মতো একটা চং করে বললে—মনে থাকে যেন, আমি এখনও মিস্। আমার শরীরে এখনও যৌবনের কিছু তলানি আছে। পুরুষ দেখলেই আমি চিনতে পারি।

আমার দিকে রঙিণী দৃষ্টি ফেলে হাসতে লাগল রোজা। পরক্ষণেই বললে—কিন্তু সমস্যা সেই এক। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে! মেয়েটীকে কে আলাপ করিয়ে দেবে ডাক্তারের সঙ্গে?

এরপর আমি নিজেই একদিন ডাক্তার গাইডোণ্ডের সঙ্গে ফিরোজের সম্পর্কটাকে সহজ করে দেবার জন্য দু'জনকে চায়ে নিমন্ত্রণ করলাম আমার ঘরে।

সেটা একটা ছুটীর দিন। ডাক্তার আগেই এসে বসেছিলেন। দু'একটা কথাবার্তার পর একটা কি জার্নাল হাতে নিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন তার পাতায়। এমন সময় এল ফিরোজ।

—হাউ ডু ইউ ডু মাই ওল্ড বেয়ার, ডক্টর?

ফিরোজ হাসতে হাসতে এসে ডাক্তারের সামনে বসে পড়ল। ডাক্তার মুখ তুলে সংক্ষেপে বললেন—ভালো।

পরক্ষণেই আবার জার্নালের পাতায় ডুবে গেলেন।

আমি চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে লাগলাম। হঠাৎ ডাক্তার মুখ তুলে আমার উদ্দেশে বললেন—কি

হরিবংশ অবস্থা বোঝেছেন। দেশের বেকার সমস্যা কি রকম সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। এর দু'দিন পরেই দেখবেন সহরে গ্রামে ডাকাতি, ছিনতাই আর মারামারি সুরু হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতাদের দূরদর্শিতার অভাবের কি ভয়াবহ পরিণতি।

ফিরোজ বললে—আমাদের লাইনে এখনও প্রচুর এডুকেটেড ইয়ংম্যান নেওয়া হচ্ছে। একটা রিমার্কেবল্ সাজিশ দিচ্ছে বিদেশী ওষুধের কোম্পানীগুলো বেকার সমস্যা সমাধানে।

ডাক্তার কোন কথা বললেন না। ফিরোজ কিন্তু থামল না। সে বলে চলল—তার নিজের কেস্। —কোন ছোকরা যদি তার সন্তিকারের কেরিয়ার তৈরী করতে চায় তবে তার মেডিক্যাল সেলস্‌ম্যান হওয়া উচিত। যদি কোম্পানী বিদেশী হয় তো সে চাকরীর তুলনা নেই। কোথায় লাগে এই ছেঁড়া আই. এ. এস.-এর চাকরী।

ডাক্তার মুখ তুললেন না। আমি ওদের সামনে কিছু খাবার আর চায়ের কাপ সাজিয়ে দিলাম। ডাক্তার শুধু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা উঠিয়ে নেবার সময় একবার আড় চোখে দেখে নিলেন ফিরোজকে। চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—তাইতে কি এই দেশব্যাপী বেকার সমস্যা ঘুচবে?

ফিরোজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বিশ্বাস করাবার মতো গলার আওয়াজ নিয়ে বলে উঠল—এই দেশব্যাপী বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় হল একটা। বিদেশী বড় বড় কোম্পানীগুলোকে এদেশে ডেকে এনে ইণ্ডাষ্ট্রী খুলতে অনুরোধ করা। যতো বেশী ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে খুলবে, তত বেশী ছেলে চাকরী পাবে। ডুটো খেয়ে বাঁচবে।

ডাক্তার চুপচাপ শুনে গেলেন কথাগুলো। কোনও মন্তব্য করলেন না। ফিরোজ উৎসাহিত হয়ে বলতে সুরু করল এদেশে বিদেশী কোন কোন ইণ্ডাষ্ট্রী কিভাবে কাজ করছে। তারা কি রকম মোটা মোটা টাকা দিচ্ছে তাদের কর্মচারীদের।

তার কথাগুলো শোনাতে লাগল বক্তৃতার মতো। শেষ পর্যন্ত সে এসে পড়ল তার নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে। বলতে লাগল এদেশে বিদেশী ওষুধ কোম্পানীগুলির অবদানের কথা। শেষে বললে—এই আমাদের গরীব দেশের লোকগুলো মরে উড়কুড় উঠে যেত যদি ঠিক সময়ে আমাদের বিদেশী বন্ধুরা বিশেষ করে আমেরিকা আমাদের পাশে এসে না দাঁড়াত ওষুধের শিশি হাতে নিয়ে। সে ইতিহাসের সবটা হয়তো আপনারা জানেন না—

ডাক্তার এইখানে তাকে বাধা দিলেন।—ইতিহাসের যতটুকু শুনলাম তাতো স্প্যান পত্রিকা কি ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন পত্রিকাতে নানাভাবে, ছবি-গ্রাফ দিয়ে মনোজ্ঞ করে বোঝান হয়েছে। হচ্ছেও। ওতে নতুন কি আছে?

আরো এটুকু বলেই তিনি তাঁর হাতের জার্নালের পাতায় আবার চোখ ডুবোলেন। আমি দেখলাম ফিরোজের লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার মুখের সেই হাসিটা বিন্দুমাত্রও এদিক ওদিক হল না। সে প্রায় জিদ করেই বলল—তবুও একথাগুলো বার বার বলার অপেক্ষা রাখে। কারণ আমাদের বিদেশী বন্ধুরা যতটা সিন্‌সিয়ারিটি নিয়ে আমাদের সাহায্য করে যাচ্ছেন, আমরা তার সত্তাংশের একাংশও কৃতজ্ঞ হচ্ছি না তাদের প্রতি। কৃতজ্ঞতা বোধ হয় আমাদের জাতীয় কুষ্ঠীতে লেখে না। না হলে কৃষ্ণমেনন কি ঐভাবে ব্যবহার করে আসতে পারতেন আমেরিকাতে?

ডাক্তার গাইডোতে এবার পুরোপুরি মুখটা বই এর পাতা থেকে উঠিয়ে নিলেন। বড় বড় চোখ

ছুটো ফিরোজের মুখের ওপর রাখলেন। স্পষ্ট দেখলাম তাতে এক চিলতে বিদ্রূপের হাসি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে গেল। আগের মতো নরম গলায়—তিনি বললেন—বিশেষ করে কৃতজ্ঞ হবার মতো কি আছে মিষ্টার বিলিমোরিয়া ?

—বাঃ কৃতজ্ঞ হবার নেই ? আমরা কি স্বপ্নেও কোনদিন ঐ রকম নব স্পেসিফিক মেডিসিন আবিষ্কার করতে পারতাম ? না পারতাম ওদের মতো সস্তা দামে লোকের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে ? তাতেই না আজ এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক নানা ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে ? অকাল মৃত্যুর হার কতো কমে গেছে।

—শুধু মৃত্যুর হার কমে যাওয়াই তো একটা জাতের সুস্থতার প্রমাণ নয় !

—কিসে প্রমাণ হয় ?—গলায় একটু ঝাঁজ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ফিরোজ। মুখের হাসি তার তেমনি অটল।

—আর একটা ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ নেবার দরকার থাকে।

—কি সে ষ্টাটিস্টিক্স ?

—ওষুধ খেয়ে কতো কোটী টাকা বিদেশী কোম্পানীগুলো বছর বছর ঘরে তোলে তারই হিসাব।

বলে কৌতুকোজ্জ্বল দুটী চোখ সাইতোতে ফিরোজের ওপর থেকে এনে আমার ওপর ফেললেন। মুখে তাঁর খেলা করতে লাগল একটা বৃহৎ হাসি। এ হাসিটা তাঁর মুখে আগে কখনও দেখিনি।

ফিরোজের মুখটা একবার ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে আবার টকটকে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ধন্য ফিরোজ, তার ধৈর্যচ্যুতি কিছুতেই ঘটে না। তার ঠোঁটের হাসি ঠিক আগের মতো স্থির হয়ে বসে রইল। মোলায়েম সুরে সে বললে—কতো কোটী টাকা আমরা বছর বছর এদেশ থেকে পাচ্ছি, সেটাও তো তোলবার নয়। কিন্তু কি জানেন ডাক্তার (হাসতে হাসতে), আমরা জাত বিষকবিরাজ। তাই সেটা আমরা মনে রাখি না।

ডাক্তার সাইতোর দুটো ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর সুরে বললেন— মিষ্টার বিলিমোরিয়া, কথাগুলো বৃটীশ আমলের একজন রাজভক্ত প্রজার মতো শোনাচ্ছে। আমার দাদামশাই ছিলেন একজন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে প্রচুর টাইটেল দিয়েছিল। তাঁর কাছে এই ধরণের কথা আমি ছেলেবেলায় প্রচুর শুনেছি। কিন্তু স্বাধীন ভারতের একজন বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে একথা শোনা শুধু দুঃখেরই নয়, পাপেরও বটে।

ফিরোজের ভুরু দুটো একবার নিমেষের মধ্যে কুঁচকে উঠে আবার সোজা হয়ে গেল। হাসি হাসি মুখে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম ?

—রকম একটাই। কলোনীর ওপর রাজত্ব করা আজকাল দুনিয়া থেকে উঠে যাচ্ছে। এখন নতুন আর এক ধরণের প্রভুত্বপ্রবণতা দেখা দিয়েছে শক্তিশালী দেশগুলোর অনুন্নত দেশের ওপরে। সে প্রভুত্ব হল ইন্ দি ফর্ম অফ্ এড্। সাহায্য দিয়ে মানসিক দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়া। আমার কাছ থেকে যার নিয়ে তোমার দিন যায়, সুতরাং সব দিক দিয়ে তুমি আমার অনুগত।

—এড্ না পেলে সমস্ত ভারতবর্ষটা ছারখার হয়ে যেত, না খেতে পেয়ে। বিদেশী ওষুধ, বিশেষ করে আমেরিক্যান ওষুধ ভারতে আসছে বলেই এদেশের কোটী কোটী লোক প্রাণে বেঁচে আছে। নৈলে, ঐ যে বললাম, মরে উড়কুড় উঠে যেত।

হা—হা করে হেসে উঠল ফিরোজ। সেবে যোগ করল—আপনার মতো যারা চিন্তা করে তাদের মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে। ডাক্তার আপনি একবার ভাল করে—

ডাক্তার চায়ের কাপটা মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন। ঠক করে নামিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—পাগলের চিকিৎসা আছে। কিন্তু মতলববাজ পাজীদের একমাত্র চিকিৎসা হল মার। ভারত সরকার যদি এই বিদেশী শোষণ এদেশে থেকে বন্ধ করতে চায় তো তাকে মার দিতে হবে। কিন্তু সরকার তা করে উঠতে পারছেন না।

ফিরোজ ডাক্তার সাইতোতের মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা নিতান্ত নির্বুদ্ধি বালকের কথা শুনছে। কিন্তু সে দিকে সাইতোতের কোন লক্ষ্য নেই। তিনি বলতে লাগলেন—পাব্লিসিটির জয়ঢাকে আকাশ কাঁপিয়ে আর ডাক্তারদের কমিশনের চোপের পরিমাণ বাড়িয়ে সারা ভারত ছেয়ে ফেলছে বিদেশী ওষুধে।

আমার দিকে ফিরে বললেন—আপনার বোধহয় জানা নেই বহু ওষুধ ইউরোপ আমেরিকার নিজস্ব বাজারে যে দামে বিক্রী হয়, ভারতের বাজারে এসে তার দাম হয় পাঁচশ' গুণ বেশী। এর ওপর আছে ওষুধের বিষক্রিয়া। নিজেদের বাজারে যে সব ওষুধ তারা বিষের মতো মনে করে ব্যবহার বন্ধ করে দেয়, সেই সব ওষুধও ভারতের বাজারে অনায়াসে ছাড়তে তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় না। ওদের কথাই হল—এনি ড্যাম থিং ইন্ ইণ্ডিয়ান মার্কেট। ওরা জানে তা বিক্রী হবেই। টাকা ওরা পাবেই।

ডাক্তার একটু থেমে এক চোক চা খেয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন—

—আর সবার সেরা হল তাদের মোক্ষম ধাওয়াই 'ড্রাগ হ্যাবিট' তৈরী করে দেওয়া। বেনিয়ার জাতরা জানে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে নেশার মতো লোক ওষুধ কিনে খাবে। খাচ্ছেও। সমস্ত ভারতবাসী কোটী কোটী টাকার মাথা ধরার বিদেশী ওষুধ কিনে খাচ্ছে। আর যতো খাচ্ছে ততো তাদের মাথা ধরছে আরও বেশী করে। ঠিক যথা যুগে চীন দেশে চণ্ডুর ব্যবসা চালানর মতো। এরপর যদি আমার মন বিদেশীদের ওপর কুটজ না হয়, তা হলে কি আপনারা মনে করবেন আমার মাথাটা পাগলামিতে ভরা?

ফিরোজ বোধহয় ভিতরে ভিতরে খুব বেশী ভেতে উঠেছিল। তার ওপর মোক্ষম এক আগুনের ফলা ধরলেন ডাক্তার। বললেন—যারা নিজেদের কেরিয়ার তৈরীর জন্য দেশের সর্বনাশ করছে, হাজার হাজার লোক মারছে, কোটী কোটী লোককে মরবিড করে রাখছে ওষুধের নামে বিষ খাইয়ে—তারা রীতি মতো দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, পশু।

এই রূঢ় কথাগুলো কানে যেতেই আমার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। ওদিকে দেখলাম ফিরোজের মুখের সেই অনবদ্য হাসিটা, যা কোন সময়েই তার ঠোঁটের ওপর থেকে সরে যায় না এক মুহূর্তের জন্য, সেটাও উবে গেল। তার মুখটা তীব্র রাগে বেঁকে গেল। তেঁতুল কাটার মতো সে বলে উঠল—বিদেশে যে সব বিজ্ঞানী এই সব ওষুধ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, তাঁরা বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত। তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে খেয়াল করবেন আপনি তাঁদের পায়ের নখেরও যোগ্য নন।

ডাক্তার সাইতোতো কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। চেঁচামেচিও করলেন না। শুধু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—উঁহু, উঁহু। উঁহু উঁহু। ও কথা বলবেন না। ঐ সব বিজ্ঞানীদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি, জানি। ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে আমার কাজ করার সৌভাগ্যও হয়েছে।

চট করে উঠে পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলেন একটা বুকলেট। ফিরোজের কোলের ওপর সেটা ফেলে দিয়ে বললেন—জেনেভা নিখিল বিশ্ব-স্বাস্থ্য সম্মেলনে আমার পেশ করা একটা প্রবন্ধ, ড্রাগ পয়জনিং সম্বন্ধে। দয়া করে পড়ে দেখবেন।

তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন—মিস্টার মিলিমোরিয়া, দেশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখছেন, কি অবস্থা! সমস্ত দেশটা আবর্জনা হয়ে আছে অন্ধকারে, অন্ধকারে ভাইটালিটি যেখানে নেই রোগ সে দেশের ওপর ঝাঁকিয়ে বসে থাকবেই। এর ওপর সন্তীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার। সমস্ত দেশটা যে উজরে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে; এখনও কি আমাদের চেতনা হবে না? আমরা এখনও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বিদেশী বেনিয়াদের মাথায় নিয়ে ভাঁক করে বেড়াব? আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

ফিরোজ বন্দুকের থেকে ছিটকে যাওয়া তীরের মতো ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। ও সব বড় বড় কথা দয়া করে আপনি আপনার পকেটে পুরে রাখুন। আমার কি উচিত আর অনুচিত সেটা আমার আর কারুর চেয়ে ঢের ভাল করেই জানা আছে।

সাইতোতে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আর দ্বিতীয় কথাটী না বলে।

ফিরোজ তার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে আমাকে হাসতে হাসতে বললে—দেখলে কি অসাধারণ ক্যারেক্টার আর কি মুখের কথা! এতটুকু রসকস নেই।

আমি বললাম—ফিরোজ তুমি সেই মেয়েটীর ব্যবস্থা কর। আমি তার নিজে তাকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার।

ওরা অফিস থেকে বার হয়ে এল। সঙ্গে এল চারজন পার্শী। গায়ের রং তাদের চড়া কর্সা। যেমন শক্তিশালী, তেমনি ভীষণদর্শন। পরণে তাদের হাতকাটা ফতুয়ার মতো জামা, সরু সরুল বডার দেওয়া। ছোট ছোট সাদা ইজার হাটুর ওপর পর্যন্ত তোলা। মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা, মাথার ওপরে বসান সাদা টুপি। ধবধবে ধোপদুরস্ত তাদের বেশবাস। কিন্তু মুখ তাদের পাথরের মতো কঠিন। তারা এসে শবাধারটা ওঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

ডাক্তার হঠাৎ একবার হাত নেড়ে তাদের একটু থামবার জন্য অনুরোধ করলো। তারা ভুরু কুঁচকে ডাক্তারের দিকে তাকাতেই, ডাক্তার হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে সেই মৃতস্ত লাইলাকের কপালের ওপর তাঁর ঠোঁট দুটো চেপে ধরলেন।

দেখতে পাচ্ছি, রোজার কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। সে দারুণ বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আমি নিজেও কম বিস্মিত হইনি। ভাবছি, একি আর এক স্বপ্ন দেখছি নাকি?

কয়েকটা মুহূর্ত চলে গেল। ডাক্তার মুখ তুললেন। দু' চোখ দিয়ে ডাক্তারের দুটী ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ডাক্তার রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বাহকদের বললেন—ওঠান আপনারা।

ওরা শব উঠিয়ে নিল স্কন্ধে। এগিয়ে চলল সামনে পাহাড়ের পথে। রোজা ওদের পিছন পিছন চলতে লাগল। পথটা চড়াই-এ উঠে গেছে। খানিকটা উঁচুতে দেখা যাচ্ছে একটা বাঁশ' কেল্লা আছে রাস্তাটার এপার ওপার বন্ধ করে।

আমাদের ওখানে যাবার হুকুম নেই। পাশী হলে যাওয়া যায় ঐ সীমানা পর্যন্ত। তার ওপারে বাহকরা ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। ঐ সীমানার ওপারে অটল নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব। ওখান থেকে মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রা সুরু।

রোজা সেই সীমানা পর্যন্ত গেল। বাহকরা সেই সীমানা পার হয়ে দেহ নিয়ে চলে যেতে লাগল ওপরের পথে। দু' পাশে তার জংগল আরও ঘনীভূত হয়েছে। এক সময়ে তারাও একটা বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল। ডাক্তার আর আমি সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম!

ডাক্তার এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ডাক্তারকে আমার এই সময়ে বড় রহস্যময়, বড় দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হচ্ছে। আমার বারবার মনে পড়ছে আর একটা দিনের কথা।

অফিসে বসে কাজ করছি, টেলিফোন বেজে উঠল।

—হালো, কে?

—আমি অনীষা বলছি। অনীষা। চিনতে পারছেন কি? আপনাদের ফ্ল্যাটের নীচের তলায় আমি থাকি। টাক নার্স অনীষা।

—হ্যাঁ, বলুন।—খুশী হলাম খুব অনীষার টেলিফোন পেয়ে।

—আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার। আজ সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি আমি আপনার জন্য চার্চ গেট্ রেল ষ্টেশনের মেন গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। আপনি দয়া করে একটু সময় করতে পারবেন কি?

—নিশ্চয়ই।

যথা সময়ে ঠিক জায়গাটাতে অনীষাকে দেখতে পেলাম। অনীষা গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল।

—এসেছেন তা হলে?

—হ্যাঁ এসেছি। কিন্তু অন্য কোন কাজ সুরু করবার আগে আমি একটা কথা বলে নেই।

অনীষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরল আমার মুখের ওপর। বিকালের পড়ন্ত রোদে একখানি অনবদ্য মুখ।

—চারপাশের এতো লোক হাঁ করে আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে, যে এখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। চলুন নটরাজে যাই। সেখানে নিরিবিলি বসে কথা কওয়া যাবে।

অনীষা খুশীর সুরে বললে—চলুন।

নটরাজে এসে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলাম কফির অর্ডার দিয়ে।

বলুন, কি ব্যাপার, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

—আমার নিজের জন্য নয়। আমি এসেছি ডক্টর গাইতোণ্ডের জন্য আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।

—ডক্টর গাইতোণ্ডে?

—হ্যাঁ। আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখি আমি ডক্টর গাইতোণ্ডেকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি। সেই জন্যই আপনাকে অনুরোধ করছি—

এই পর্যন্ত বলে অনীষা একটু থামল। তারপর করুণ চোখ তুলে বললে—আপনারা যে নিষ্ঠুর খেলা সুরু করেছেন ডাক্তারের সঙ্গে তার খবর আমি পেয়েছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এই খেলার মধ্যে থাকবেন না।

আমার কানের পাশটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। বললাম—আপনি শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছেন, অথচ আমি নিমিত্ত মাত্র। রোগা আছে, কিরোজ আছে—

—জানি। তাদের কাছে বলে কিছু হবে না বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি। ওরা আমার কথা বুঝবে না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—স্বচ্ছন্দে।

—ডাক্তারের ওপর আপনার এই অহেতুক অনুগ্রহের কারণটা কি?

—অনুগ্রহ বলবেন না। ডাক্তারকে যদি আপনারা সত্যি সত্যি বুঝতে পারতেন তা হলে ওঁর সঙ্গে আপনারা এরকম খেলা খেলতেন না। বিশেষ করে যে মেয়েটীকে আপনারা ওঁর ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন, তাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। একটা ভয়ানক কেলেঙ্কারি আসন্ন করেই আমি একথা বলছি।

একটা তীব্র কৌতূহল আমার মনের মধ্যে ঘাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। বললাম—ডাক্তারকে আপনি একাই ভালভাবে চেনেন, অন্য কেউ চেনে না, এ ধারণা হবার আপনার কারণটা কি? উনি সত্যিই বেশ খানিকটা ক্র্যাংকি, এটাতো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

আপনি আমার কথা একটু শুনবেন কি দয়া করে।—কফি খেতে খেতে অনীষা অনুনয় করল।

—নিশ্চয় শুনব।

—ডাক্তারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক নেই। একই হাসপাতালের উনি ডাক্তার, আমি নার্স। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কাজ করে এইটা বুঝেছি, ওঁকে বাইরের থেকে চেনা যথেষ্ট কঠিন।

—কি রকম?

—একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। কিছুদিন আগেই ঘটে গেছে ব্যাপারটা। একটা সেরিব্রো-স্পাইন্যাল কেস এসেছিল হাসপাতালে। ফুটফুটে সুন্দর বছর দশ বারোর একটী মারাঠী ছেলে। কেসটা দেখেই ডাক্তার বললেন—এ কেস শেষ পর্যন্ত যদি টেঁকে তো চৌ অবধি গড়াতে পারে। ঘরে মানুষে টানাটানি হতে লাগল ক'দিন। উনি অন্য কোন নার্সের ওপর ভরসা না করে নিজের থেকে আমাকে অনুরোধ করলেন টাক নার্স হিসাবে। আমাকে বোঝাতেই বললেন—এ কেসটা অনেকটা ডিলার্টের মতো। কাজেই এর ওপর খুব বেশী নজর রাখা দরকার, যেন একটুও ত্রুটী না হয় নার্সিং-এর। আর নিজে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে সেই ছেলেটার পাশে বসে রইলেন দিনরাত।

ডাক্তারের অবশ্য আরও একটা দুর্বলতা ছিল। ডাক্তার শুনেছিলেন ছেলেটার সঙ্গীতে নাকি অলৌকিক প্রতিভা। অদ্ভুত ভালো বেহালা বাজায় এই বয়সেই। তার জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় সে বার বার বলছিল—আমাকে বাজনা শোনাও।

ডাক্তার নিজে গান-পাগল লোক।

যাক, যা বলেছিলাম। ডাক্তারের চিকিৎসার গুণে ছেলেটার সে অবস্থাটা কেটে গেল। কিন্তু দশ দিনের মাথায়—ডাক্তার যা বলেছিলেন তাই হল। তার ফুসফুসে নিউমোনিয়ার প্যাচ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে

কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন এবার তিনি টেনে তুলবেন যাত্রাটাকে। পরে তিনি ঘুমোতে গেলেন। আমি নিজেও মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু রাত দশটাতে রাউণ্ড দিতে গিয়ে ছেলেটার সিম্পটমগুলো আমার ভালো ঠেকল না। রাত একটার সময় আমি আবার গেলাম ছেলেটাকে দেখতে। দেখি তার বিষম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দিলাম। ডাক্তার দৌড়োলেন। পরীক্ষা করলেন। ছেলেটার দুটো ফুসফুসই তখন পাঁচে ভরে গেছে। হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দিচ্ছে। ডাক্তার পর পর আরও মোটা কতক ইঞ্জেকশন দিলেন। আমি তার নাকে অক্সিজেনের নল লাগিয়ে দিলাম। অসহ্য কষ্ট পাচ্ছিল বেচারা।

বলতে বলতে অনীষার নিজের চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। বললে—ডাক্তার পাগলের মতো টাক্সি নিয়ে ছুটলেন রাত দুটোতে টাটকা ওষুধ আনবার জন্য। হাসপাতালের ওষুধে তাঁর আর একদম বিশ্বাস রইল না। নতুন ওষুধটা এনে ইঞ্জেকশনটা দেবার কিন্তু আর সুযোগ হল না। ছেলেটা মারা গেল।

আমি দেখলাম ডাক্তারের মেরুদণ্ডটা যেন কেউ দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে গেল। তিনি সেই যে বিশ্রাম ঘরের ইজিচেয়ারে গিয়ে চোখ বুজলেন পুরো দিনটা আর উঠলেন না। আমি অন্য একটা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই তিনি বললেন—এ্যান্টিবায়োটিক্স যদি কাজ না করে তবে বুঝতে হবে ওষুধটা ভাল। আমার সব চেষ্টা বৃথায় গেল। একটা প্রতিভা অকালে শুকিয়ে গেল। বলে ডাক্তার আমার সামনে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনীষা তার নিজের চোখে রুমাল চাপা দিল। যেন কিছুক্ষণ তার কথা কইবার শক্তি রইল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

পরের দিন দেখলাম ডাক্তার প্রচণ্ড রকমে রেগে উঠেছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন—হাসপাতালে যে কোম্পানী ওষুধ সাপ্লাই করেছিল সেখানে খোঁজ নিয়েছি। নামী কোম্পানী। কিন্তু তাদের সব এ্যাম্পুলগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি, কোনটাতেই ওষুধ ছিল না। কোম্পানীর যতো নামই থাক, আমি দেখাচ্ছি এই জোচ্চুরি ব্যাবসা করার ফল কি!

ডাক্তার গেলেন সেই এ্যাম্পুলগুলো নিয়ে সরকারী টেষ্ট হাউসে। সরকারী টেষ্ট হাউসের লোকেরা নাকি টেষ্ট করবার আগেই বলেছিল—ওরা নামী কোম্পানী, ওরা সব সময়েই জেনুইন্ ওষুধ দিয়ে থাকে।

ডাক্তার ধমকে উঠে বলেছিলেন—আমি আপনাদের মতামত চাই নি। টেষ্ট-এর রিপোর্ট চাই।

টেষ্টের রিপোর্ট ডাক্তার পেলেন বটে। তাতে কিন্তু সব ওষুধই জেনুইন্ বলে লেখা ছিল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ডাক্তার সেই কোম্পানীর থেকে আরও কতকগুলি এ্যাম্পুল কিনে এনে আগের স্যাম্পলের সঙ্গে দিলেন হপকিন্স টেলিফিউটের এক বন্ধু বিজ্ঞানীর কাছে পরীক্ষা করবার জন্য। দেখা গেল কোনটাতেই আসল ওষুধ নেই। তিনি আবার গেলেন সরকারী টেষ্ট হাউসে। দেখালেন হপ্‌কিন্সের রিপোর্ট।

সরকারী লোকেরা গম্ভীর হয়ে বলেছিল—আমরা যে এ্যাম্পুলগুলো পরীক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে ওষুধ ছিল, ওরা যেগুলো দেখেছেন তাদের মধ্যে হয়তো নাও থাকতে পারে।

—তা যদি হয়, বলেছিলেন ডাক্তার, আপনাদের কর্তব্য নয় কি, দোকানটার সব ওষুধ সিল্ করে পরীক্ষা করে দেখা।

সরকারী লোকেরা নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল—আমাদের কাজই তো তাই। দয়া করে আপনি

আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নতুন করে আমাদের কিছু বলতে আসবেন না। কোন কোম্পানীর ওষুধে ভেজাল থাকলে আমরা ঠিক তাকে বার দিয়ে দেব।

—কিন্তু আমি তো দেখছি যাকে ওষুধ বিক্রী করে এরা মানুষ খুন করেছে—বলেছিলেন ডাক্তার।

—যাকে সেটা প্রমাণ করবে কে? —প্রশ্ন করেছিল সরকারী লোকেরা।

—আমি নিজে ডাক্তার। আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানী, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার রোগী বাঁচেনি। —ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন ডাক্তার।

—রোগী বাঁচেনি চিকিৎসার বিপাকে। আদালত তো সে কথা মানবে না। কোম্পানী প্রমাণ করবে তারা আপনাকে পয়সা খাওয়ায় নি বলে আপনি তাদের পিছনে লেগেছেন। এ স্থলে জল পুরে দিয়েছেন আপনি নিজেই। বলেছিল সরকারী টেষ্ট হাউসের লোকেরা।

—ডাক্তার রাগে, দুঃখে এসে মামলা রুজু করেছেন আদালতে। সে মামলায় এখনও ফয়সালা

অনীষা কফির পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে—একে যদি ক্র্যাংকি বলতে হয় বলুন। কিন্তু আমি বলছি এমন লোক আমার নজরে পড়েছে এই সারা বোম্বাই শহরে মাত্র একটী। এ লোককে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। আর এর সঙ্গে আপনারা যে মেয়েটীকে ভিড়িয়ে দিচ্ছেন, সে হল একজন ডাকসাইটে ব্রাণ্ডদাকার। সোসাইটীতে ওর নাম ভ্যাম্পায়ার।

আমি তখন হাঁ না কিছুই বলতে পারিনি অনীষাকে। কারণ মনে মনে জানতাম, আমি আগের রাতেই ডাক্তার গাইডোভোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে এসেছিলাম সেই মেয়েটীর।

আর এক রাতের কথা।

সহরে বসন্তের এপিডেমিক। হাসপাতাল ভরে গেছে কণীতে। তিল ধারণের জায়গা নেই। বোম্বের খালি বস্তিগুলো থেকে দলে দলে রোগগ্রস্ত শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রীলোকে হাসপাতাল ভরে যাচ্ছে।

আমাদের বাড়ীতে লিফ্‌টম্যানটারই গায়ে গুটি উঠল। সারা বাড়ীটা আতঙ্কে সিঁটিয়ে উঠল, কি করা যায়! রোজার ঘরের বৈঠকে ঠিক হল, ওকে এখুনি হাসপাতালে চালান করা দরকার।

ডাক্তার গাইডোভো তখন সে বৈঠকে ছিলেন না। ফিরে এসে রাতেই রোজার কাছে সব শুনে বললেন—হাসপাতালে ওর জায়গা হবে না। তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর।

রোজা ছুটল ফিরোজের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ফিরোজ বললে—ওকে আর একদণ্ড এ বাড়ীতে রাখা যাবে না। ওকে বল ওর খোলিতে চলে যেতে।

—ও বলছে ওর খোলি নেই। ওর আত্মীয় বন্ধু কেউ নেই যার কাছে ও যেতে পারে।

—আগে ওকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বল। তারপর ও যেখানে খুশী যাক। আমাদের জানবার দরকার নেই। ওদের বাঁচবার ক্ষমতা অসীম, ওদের তুমি জান না।

তারপর কি মনে করে ফিরোজ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।—তোমরা হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো, একাজ তোমাদের দ্বারা হবে না। দাঁড়াও ওকে আমি তাড়িয়ে আসছি। এই এত বড় বাড়ীটার সব বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যটা তো আগে দেখা দরকার।

রাত দশটায় ডাক্তার গাইডোতে বাড়ী ফিরছিলেন। গেটের বাইরে লিফ্‌ট্‌ম্যানটা দাঁড়িয়ে ছিল ফুটপাথের ওপর। গাইডোতের নজরে পড়ল। এদিকে আকাশে মেঘ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ডাক্তার সটান আমার ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়লেন।

—কি ব্যাপার ডাক্তার?

—কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভেবে জবাব দিন।

শক্ত বিচারকের সুরে ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি একটু বিস্মিত হলাম। ডাক্তার বললেন—আপনার কি রোগ-ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষ আতঙ্ক আছে?

—না, তেমন কিছু নেই।

—আপনার কি টীকা নেওয়া আছে?

—তা আছে।

—দয়া করে আমার সঙ্গে একটু আসবেন কি?

চলে গেলাম ডাক্তারের সঙ্গে। নীচের ফুটপাথে গিয়ে লিফ্‌ট্‌ম্যানটার একটা হাত ধরে তুললেন ডাক্তার। আমাকে বললেন—ধরুন অন্য হাতটা। ধরুন, কোন ভয় নেই। আমি বলছি কোন ভয় নেই।

তাকে এনে তুললেন ডাক্তার নিজের ঘরে। বললেন—এবার এর সমস্ত দায়িত্ব আমার।

—কিন্তু ওরা যে আপত্তি করবে।

—কিসের আপত্তি? আপনার আমার যদি ব্যারাম হত ওরা কি আপনাকে আমাকে ঘর থেকে বার করে দিতে পারত? আমার ভাইয়ের যদি ব্যারাম হয় সে দায়িত্ব আমার।

একটু পরেই ঘরে এলেন ডাক্তারের সেই সুবেশা রমণী ভগিনী।

—কি ব্যাপার ভাইয়া? ঘরে এ কে?

—আমাদের লিফ্‌ট্‌ম্যান। ওর পক্স্ হয়েছে বলে এখানে এনে রেখেছি সেবা শুশ্রূষার জন্য।

—ও, হাউ হরিব্‌ল্!—মেয়েটী প্রায় ছুটে ঘর থেকে সেই যে বার হয়ে গেল আর সে ডাক্তারের ঘরমুখো হয়নি।

সবকিছু ছায়াছবির মতো মনে হচ্ছিল। ঝির ঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল মাথার ওপর। গাছগুলো যেন ছায়াচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। এতক্ষণ পরে ঘুনো ঝিঁঝিঁয়ের তীক্ষ্ণ ঘাতর আওয়াজ একটানা সুরে কানে এসে বাজতে লাগল।

ঘুরে দেখছি রোজা দাঁড়িয়ে আছে সেই বাঁশ কেলা সীমানাটার এপারে। সমাধার মিছে বাহকরা কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে খুঁজছিলাম আমার সেই ঘুমন্ত লাইলাকের মতো মুখখানাকে।

হঠাৎ ফিরোজের কথা মনে পড়ল।

গিয়েছিলাম আমার এক বাইরে থেকে আসা অতিথিকে রি-অক্ করতে। ফিরোজের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে উঠে এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাদের টেবিলে।

—কি খাবে বল? হুইস্কি, জিন, ব্র্যাণ্ডি? না খাক, নিশ্চয়ই তোমার ডিনার সেব করেছ? এসো একটু ভাল চেরীব্র্যাণ্ডি খাও। বড় সুস্বাদু, বড় রংদার। আমি নিজে ওটা পছন্দ করি। এই ছাখো না—

বলে নিজের গেলাসটা তুলে দেখাল।

—সে কি তুমি তো হুইস্কির একনিষ্ঠ ভক্ত।

জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—অবশ্যই।—ফিরোজ অস্বীকার করল না।—তবু কি জান? আমি পার্শীর ছেলে। যতদিন বেঁচে আছি জিভের সেবা করে যাই। মরে গেলে তোমরা হিন্দুরা স্বর্গে গিয়ে এখান থেকে পাঠান খাবারের স্বাদ নিতে পারবে। আর তোমাদের,—বলে বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে বললে,—যদিও কিছু পাঠাবার দরকার নেই, তবু পাঠালে পরে খেতে পারবে। কিন্তু আমাদের এই জোরোষ্ট্রিয়ান পার্শীদের সে উপায় নেই।

—কেন?—প্রশ্ন করলেন একজন বান্ধবী।

—আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুরুতেই জিভটাকে কেটে কুকুরকে খেতে দেওয়া হয়।

—ভেরি ফানি, বাট হোয়াই?—প্রশ্ন করলেন আর একজন বান্ধবী।

—যদি কুকুরটা সেটা খেয়ে ফেলে তবে বুঝতে হবে দেহের অধিকারী ব্যক্তিটি ছিল সত্যবাদী, ধার্মিক লোক। সে নির্ঘাৎ স্বর্গে যাবে। যদি না খায়, তবে বুঝতে হবে লোকটা ছিল অতি পাজী, সে নির্ঘাৎ নরকে যাবে। তাই বলেছিলাম জিভ না থাকলে তো আর খাবারের ভালমন্দ বুঝতে পারব না। অতএব যতদিন বেঁচে আছি ভালমন্দ খেয়ে নিই।

—ভেরি ফানি। ইট্স্ নট্ ইট?—বলে সেই মেয়েটি অন্যটির দিকে তাকাল।

অন্য মেয়েটি কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্ন করল—তোমাদের শুনেছি মারা যাবার পর দেহ শকুনিকে দিয়ে খাওয়ান হয়, সত্যি?

—সত্যি, খুব সত্যি।—ফিরোজ জবাব দিল।—আমাদের ধর্মের লোক মারা যাবার পর, তাকে উঁচু পাহাড়ের চুড়োতে নিয়ে গিয়ে দেহটা খণ্ড খণ্ড করে কেটে নীচের খাদে ফেলে দেওয়া হয়। শকুনের দল সেখানে বসেই থাকে। তারা সেই মাংসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

—মেয়ে দুটি শিউরে উঠল। দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল—হাউ হরিব্‌ল্। এ রকম প্রথা কেন?

—জানো তো আগুন আমাদের দেবতা। যা মৃত, যা অশুদ্ধ, তা আমরা দেবতাকে উৎসর্গ করি না। তাই আমরা আগুনে মৃতদেহ সৎকার করি না। মাটিতে পুঁতে রাখলেও পৃথিবী অশুদ্ধ হয়। তাই আমাদের ধর্মের নিয়ম হল দেহটা কোন মাংসাশী প্রাণীকে দিয়ে খাওয়ান। তাতে অমুক প্রাণীকে খাদ্য দেওয়ার পুণ্য হয়।

আমি খাঁচার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। ঐ লাইলাকের মতো শান্ত সুন্দর মুখখানা একটু

পরেই বিকৃত হবে। ওকে জবরদস্তি করে হাঁ করান হবে। ওর জিভটা কেটে ফেলা হবে নৃশংস ভাবে। সুন্দরকে ওরা ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে ফেলবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল আমার সমস্ত বুক চিরে। গাছেরা কেউ এখন আর শ্বাস ফেলছে না। মিঃস্ক স্তব্ধতার প্রতীক্ষা করে আছে সেই ভয়াবহ পরিণতির জন্য। স্তব্ধতাটা একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণার মতো আমার মনের ওপর চাপ দিচ্ছে। অসহ্য মনে হচ্ছে।

রোদ্দা ফিরে আসছে, চোখে রুমাল রগড়াতে রগড়াতে। ডাক্তার আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একটা শুষ্ক গাছের মতো। আমি দেখছি ঐ পাহাড়ের চূড়োগুলো, পাথরের চাঁইগুলো কালো কুকুর হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য কালো কুকুর, লক্ লক্ করছে তাদের জিভ্ গুলো। চোখগুলো তাদের জ্বলছে অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মতো। গাছের মাথাগুলো হয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ চঞ্চু শকুন। ওরা এখনও স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। দেখছে ঐ সুন্দর দেহটাকে যখন ওরা অস্ত্র চালাবে শকুনগুলো উল্লাসে চীৎকার করে উঠবে বাতাস কাঁপিয়ে। ডানা ঝাড়া দিয়ে উঠবে আসন্ন ভোজের বীভৎস আনন্দে। তারপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে ফুলের পাপড়ির মতো টুকরো টুকরো অঙ্গগুলোর ওপরে।

ওঃ, অসহ্য এই যন্ত্রণা।

আমি রাস্তার ওপর ধপ করে বসে পড়লাম দুহাতে চোখ ঢেকে। ডাক্তার আমার হাত ধরে তুললেন। অদ্ভুত মানুষ এই ডাক্তার।

বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছি ওঁকে। ওঁকে কাতর হতে দেখেছি, অসহ্য ক্রোধে প্রচণ্ড হয়ে উঠতে দেখেছি। নিদারুণ ঘৃণায় এই হতভাগা সমাজের বিরুদ্ধে আগুন উদ্গার করতে দেখেছি। কিন্তু আজ তাঁর এ অবস্থা কেন? ওঁর মনে কোন শোক, কোন দুঃখ এ সময়ে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে না কেন?

একটা রাতের কথা মনে পড়ল। রাত তখন আড়াইটে। টোকা পড়ল দরজায়। খুলে দেখলাম ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। তার আগে আমার ঘুম আনা পঞ্চাশ ডাক্তারের ঘরে অশান্ত পায়চারির আওয়াজ পেয়েছি। আলো জেলে দরজা খুলে বললাম—আসুন। কি হয়েছে, ঘুমোন নি?

—নাঃ, আজ কটা রাত আমরা ঘুমোতে পারছি না। আচ্ছা, এদেশে যদি ভাল ভেজাল ওষুধ বিক্রী করা হয়, তার শাস্তি কি?

বসে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বললেন—মাত্র পঞ্চাশ টাকা ফাইন্। আমি একটা কেস্ করেছিলাম। ফুলের মতো একটা টাটকা তাজা ফুট ফুটে ছেলে। গানে তার অসাধারণ প্রতিভা। এ বর্ন্ সিনিয়াস্। ভেজাল ওষুধের জন্যে শেষ হয়ে গেল।

ডাক্তার সোফার ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। দু হাতে বড় বড় চুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধরে, মাথা নীচু করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—যে পাপের শাস্তি হল অ্যাক্ত মাত্রিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ান, তার জরিমানা হল মাত্র পঞ্চাশ টাকায়!

বুকখানা ভেঙে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল আবার। দুটো অতি করুণ চোখ আমার ওপর রেখে বললেন—একটু ভাল বেহাগের আলাপ শোনাবে ভাই? বড় জ্বালা করছে মাথাটার ভিতরে।

আমি বিনা বাক্যে বেহালাটা তুলে নিলাম। সুরু করলাম বেহাগের আলাপ দীর্ঘ বিলম্বিতে।

আপন মনে বাজিয়ে যাচ্ছি, দেখি সেই অবস্থায় ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়েছেন। সোফাটার ওপর এলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একজন ক্লান্ত যোদ্ধার মতো।

আর একটী দিনের কথা। রাত এগারোটাতে সটান আমার ঘরে চলে এসেছেন ডাক্তার। দেখেই মনে হল কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে কোথাও। বুক ফুটো অসম্ভব কৌচকান। চোখের দৃষ্টিটা কোন অতলে তলিয়ে আছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন ডাক্তার। আমি যে সামনে বসে আছি তা প্রায়ই নেই। গানের অর্ডারও করলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি?

এবার চাপা গর্জন বার হল ডাক্তারের গলা দিয়ে—হতভাগা দেশের ওপর এ্যাটম বোমা কেন ফাটে না! জাপানের মতো টাইফুন এসে একমুহূর্তে এই ভারতবর্ষটাকে ভাসিয়ে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় না কেন? এদেশের সাত পুরু মাটি অবধি কলুষিত হয়ে আছে।

একটু চুপ করে থেকে তেমনি সুরেই বললেন—জান, জাত হিসাবে আমরা কি ভয়ানক পিশাচ? কতকগুলো বিদেশী সংস্থা এদেশের গরীব শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ পাঠায়। সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের নাম করে একদল কালোবাজারী সেই গুঁড়ো দুধের বারো আনাই বিক্রী করছে এদেশের দুধ তৈরীর কারখানাগুলোতে। প্যারেল আর ওলিনাকার বস্তিগুলোতে বাচ্চারা এক ফোঁটাও দুধ পায়নি। তারা শুধু জল খেয়ে বেঁচে আছে। ভাবতে পারো? ভাবতে পারো বাচ্চাগুলো ক'দিন কিছু খেতে পাচ্ছে না—?

বলতে বলতে ডাক্তারের গলার আওয়াজ বুজে এল। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আজ আমি নিজে দেখতে গিয়েছিলাম। ওঃ সে যে কি অসহ্য দৃশ্য! চোখ মেলে দেখতে পারা যায় না। বাচ্চাগুলোর কান্না শুনলে পাথর ফেটে যায়। খিদের কান্না। এখানে ওখানে, সরকারের দরজায়, বড় বড় লোকের দরজায় ধর্ণা দিয়ে এলাম, এর প্রতিকারের জন্য। দেখলাম সবাই জানে ব্যাপারটা। অথচ আশ্চর্য যাদের বলবার ক্ষমতা আছে, তারা কেউ কিচ্ছুটী বলবে না। তাতে নাকি তাদের বৃহত্তর স্বার্থের হানি হবে।

ডাক্তার বলে চলছিলেন—দেশের যে এতো বড়ো ক্ষতি তাকে কি আর ছোটখাট সেলাই দিয়ে মেরামত করা যায়? তাই বলছিলাম, আসুক একটা প্রলয়, সব এক সাথে ধ্বংস হোক।

বলতে বলতে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ডাক্তার আমার ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। আমিও ডাক্তারের পিছন পিছন তার ঘরে ঢুকলাম। বললাম মুখোমুখি। বললাম—আপনি এদেশে এমনভাবে ক'দিন টিকবেন। তার চেয়ে আপনি বিদেশেই চলে যান।

ডাক্তার কান্না-ভেজা গলায় বললেন—এমনভাবে আমি আর একদিনও বাঁচতে চাইনে। আমার বিদেশী বন্ধুরা আমাকে চিঠি লেখেন আমার দেশ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে। আমি লজ্জায়, ঘৃণায় একটারও জবাব দিতে পারি না। দিতে গেলেই আমি জানি আমাকে মিথ্যে বলতে হবে। ভারতবাসী হিসাবে নিজেকে এতো ছোট, এত হীন মনে হয়—

ডাক্তার হাঁপাচ্ছিলেন। আমি চুপচাপ। ডাক্তার যেন নিজের কাছে নিজেই কথা বলছিলেন—এদেশের দুরবস্থা দেখে একটা ইনটারন্যাশান্যাল হেল্থ্ অর্গানাইজেশনের মোটা টাকার চাকরী ছেড়ে দিলাম। তখন ভেবেছিলাম হাজার হোক নিজের দেশতো। দেশে থাকব, দেশের মানুষের সেবায় লাগব। মাথা উঁচু করে

থাকতে পারব। সে ইচ্ছা আমার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় চুর চুর হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। এখন মনে একটা বড় প্রশ্ন উঠেছে ক্ষুদ্র নগণ্যাদপিতা মনে স্থান দিয়ে ভুল করলাম না তো?—

খুব নীচু স্বরে বললাম—কিন্তু সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকাই তো হল বুদ্ধিমানের কাজ, ডাক্তার।

ডাক্তার গাইডোত্তের সজল চোখে এবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন—মানিয়ে নেওয়া? কার সঙ্গে! এই বিকট লোভী, স্বার্থপর কন্ডকাটা রাক্ষসগুলোর সঙ্গে?

পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বর হতাশায় ছেয়ে গেল।—এই কথাটা আমি প্রায় সবারই মুখে শুনে থাকি। এড্‌জাষ্টমেন্ট করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এইসব বুদ্ধিমানদের হাড়হদ্দ আমি চিনি। এরা গায়ে চড়ে কোনদিন যা কাড়ে না। হাজার অন্যায়ে এদের গলায় প্রতিবাদের আওয়াজ বার হয় না। এরা শুধু নিজেরটুকু বাঁচাতেই ব্যস্ত। এই ক্ষীণজীবী ইঁদুররা গর্ব করে নিজেদের বুদ্ধিমান বলে। আসলে যারা বুদ্ধিমান তারা পিশাচ। তারা এই সুযোগে দেশের ক্ষমতা আর অর্থ সব গ্রাস করে ফেলছে।

—যাদের ইঁদুর বলছেন, তারা এর বেশী আর কি করতে পারে বলুন?

—দু'হাত, দু'পাওয়ালা মানুষের বাচ্চা হয়ে জন্মেছে, লড়তে পারে না, প্রতিবাদ করতে পারে না অন্যায়ের বিরুদ্ধে?

লড়তে গেলে যে তাদের সর্বস্ব যায়। তারা যে না খেয়ে মরে।

—মরুক, তাদের মরাই ভাল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো বাষ্পোচ্ছ্বাস বার হয়ে এল ডাক্তারের গলা থেকে। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—ওকথাটা বলা খুব সোজা, কিন্তু করা বড় কঠিন ডাক্তার। প্রায় অসম্ভব।

ডাক্তার তাঁর চুলের গোছা দু'মুঠোতে চেপে ধরে স্থির মেরে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ। অন্যায়ের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে বলি দেওয়া বড় কঠিন কাজ।

বড় করুণ শোনাল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই তিনি গর্জন করে উঠলেন—কিন্তু কাজ কঠিন বলেই তো সেটা অপেক্ষা করে আছে একজন মানুষেরই জন্যে।

—নিশ্চয়ই, সেই মানুষটার অভাব হচ্ছে বলেই তো সমাজে বিশৃঙ্খলতা। কিন্তু সে মানুষ তো আর সাধারণ মানুষ নয়।

—সে মানুষ তুমি, সে মানুষ আমি।—ডাক্তার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড উত্তেজনার সঙ্গে বলতে লাগলেন—একজন যেশায়া আমাদের উদ্ধার করবে বলে যদি আমরা আমাদের প্রতিমুহূর্তের দায়িত্ব এড়াই, তবে আমাদের মানুষ জন্মে ধিক্। আসলে এইটাই হল মানুষের সবচেয়ে বড় পাপ। মানুষ পালাচ্ছে? পালাচ্ছে আর বলছে এড্‌জাষ্ট্‌ করছি। এই এড্‌জাষ্টমেন্ট করতে করতে এদেশের লোকের গায়ের চামড়া এতো পুরু হয়ে গেছে যে তাদের গায় অন্যায় বোধটাই গেছে বেমালুম ভোঁতা হয়ে। তাই তাদের অন্যায় করতেও বাধে না, অন্যায় সহ্য করতেও অপমান বোধ নেই! কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা যে পুড়ে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে। আমার হাতে যদি কোন ক্ষমতা থাকত তবে আমি ঐ চুর-চোর রাক্ষসগুলোকে আজ রাতেই গুলি করে মারবার হুকুম দিতাম। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই। বাস্তু এর বৌদ্ধ ভিক্ষু যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিজের শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বেলে পুড়ে মরেছিল—তাও যদি পারতাম। কিন্তু সে ক্ষমতাও আমার নেই।

ওঃ!—হতাশায় ভেঙে পড়লেন ডাক্তার। দু'হাতে মুখ ঢেকে সমস্ত দেহটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে।

এমন সময় ডাক্তারের ঘরে টোকা পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত প্রায় একটা। কয়েক মিনিট লেগে ডাক্তারের নিজেকে সামলে নিতে। ইতিমধ্যে আবার অধির টোকা বাজল দরজায়। ডাক্তার ধীরে উঠে দরজা খুলে দিলেন। ঝড়ের বেগে ঢুকল বিজয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—অনীমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘুমের মধ্যে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হচ্ছে। কেউকে সাড়া পাচ্ছি না। একবার দয়া করে আসবেন?—

ডাক্তার কোন কথা না বলে টেবিলে রাখা ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দরজার বাইরে পা দিয়ে বললেন—বোলো, আসছি।

দশমিনিটের মধ্যে ফিরলেন তিনি। বললেন—শিগ্‌গির বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরো।

যে মেয়েটা ডাকতে গিয়েছিল তাকে বললেন—এ ব্যাপারটা এখন কাউকে জানাবার দরকার নেই।

ট্যাক্সি নিয়ে এলাম আমি। ডাক্তার আর আমি রুগীর দেহটা নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। একরাশ সাদা লাইলাক, বিছিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার আমার কানের পাশে মুখরেখে নীচু গলায় বললেন—স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়েছে। তুমি কাউকে এখন কিছু বোলো না।

রোজা অনেক আগেই চলে গেছে। এ জায়গায় এসে সে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল। তার হাত ধরেছিল বুকের মধ্যে। স্পন্দন বেড়েগিয়েছিল হৃদপিণ্ডের। ডাক্তার তাকে চলে যেতে বলেছিলেন।

তারপর থেকে আমরা দু'জনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তার নিশ্চুপ। আমি প্রতিটা মুহূর্ত শুনে চলেছি। দেখছি ধীরে ধীরে বাহুকরা এগিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের উঁচু পথে। নিঃশব্দে তাদের পা পড়ছে। ঠিক যেন সময়ের নিঃশব্দ পদপাত। ক্রমশঃই তারা উঠে যাচ্ছে চূড়োর দিকে। ক্রমশঃই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে এই পৃথিবীর কোলাহল। সব হাসি কান্না, আনন্দ বেদনার আওয়াজ ডুবে যাচ্ছে অতল স্তব্ধতায়। তারা চলেছে কয়েকটা পাহাড়ের মাথা টপকে উর্বতর রাজত্বে, সেই চূড়োর দিকে। সেখানে স্তব্ধতা আকাশের মতো সীমাহীন, সমুদ্রের মতো গভীর।

তারা এক সময়ে থামল। তারপর তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাটতে লাগল সেই দেহটা। এতটুকু রক্তপাত হল না। টুকরো গুলো ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল নীচের গভীর খাদে। ওপরে বসেছিল মৃতাদ্যুত শকুনের দল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি আবার শিউরে উঠলাম।

ডাক্তার এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন উপরে-ওঠা পথটার দিকে চেয়ে। হঠাৎ বলে উঠলেন—তুমি শকুনের ডাক শুনতে পাচ্ছ না? ঐযে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছে—

বুঝলাম ডাক্তার আমারই মতো স্বপ্ন দেখছেন। ডাক্তার বললেন—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি একটা শকুন মেয়েটির মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি সেই শকুনটার মুখটাও দেখতে পাচ্ছি। ভীষণ পরিচিত লাগছে মুখটা। দেখছি তার বাঁকা ধারাল ঠোঁটটা আর লম্বা গলাটা সে ঢুকিয়ে দিয়েছে বুকে পাঁজরের ভিতর দিয়ে। ঐ যে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে এল শকুনটা।

আমি এবার বিস্মিত হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালাম।

ডাক্তার পকেটের ভিতরে হাতটা পুরে দিয়ে বার করে আনলেন একটা খামে ভরা চিঠি। আমার হাতে দিতে দিতে বললেন—আজ সকালে হাসপাতালে পেয়েছি। পড়ে দেখ।

আমি চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলাম।—

ডাক্তার, এই প্রথম আমি আপনাকে চিঠি লিখছি। এই-ই শেষ। যখন আপনি আমার এই চিঠিটা পাবেন আসছে কাল সকালে, তখন আমি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি। যদি আমার সৌভাগ্য হয়, তাহলে হয়তো আপনিই আমার দেহটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে শবাধারে তুলে দেবেন আমার শেষযাত্রার সময়। বেঁচে থাকতে যা পাইনি মৃত্যুর পর তাই পাব।

ওঃ, ভাবতে আমার যে কি ভাল লাগছে, আমি বলতে পারি না। এতদিন আমিই আপনার হাতে ফুল গুঁজিয়েছি। আপনার কাছ থেকে তার বদলে একটু হাসিও তো আমি পাইনি, শুকনো ধন্যবাদ ছাড়া। ডাক্তার আমার অন্তিম অনুরোধ রইল, আপনি আমার জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলবেন। ফেলবেন এইভেবে, যে একটি মেয়ে অতি সংগোপনে, অত্যন্ত নিভৃতে আপনাকে ভালবেসে ছিল।

ডাক্তার যাবার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে যাই, যে আমি আপনাকে ভালবেসে ছিলাম। আমার এই বয়সের মধ্যে আমি এমন একজন পুরুষ কাউকে দেখিনি যে আপনার পায়ের নখের যোগ্য হতেপারে। লোকে আপনাকে বলে কুৎসিত। কিন্তু আমার কাছে আপনি চির সুন্দর। আপনার চেয়ে সুন্দর মানুষ আমি পৃথিবীতে দেখিনি।

পূজার অভিনন্দন

এই শুভ-অবসরে আমরা
আবার আমাদের
দেশবাসীগণের সেবায়
নিজেদেরকে উৎসর্গ করছি।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

ASP/UCO-15/70

অথচ, আমি বিবাহিতা। আমার বিয়ে হয়েছিল লণ্ডনে। সেখানে থাকতাম আমি আর আমার বুড়ো বাবা। আমাদের আর কেউ ছিল না। মা ছিলেন আমার মারাঠি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাবা পার্শী। মা মারা যাবার পর বাবা দেশ ছেড়ে আমাকে নিয়ে বিদেশে বনবাস করছিলেন। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন বড় অসহায়। তখন আমারই সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তিনি তখন বিদেশে একটা কাজে গিয়েছিলেন।

এটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন যে আমি সুন্দরী। যদি সে কথা কোনদিন না ভেবে থাকেন তবে এখন আমিই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই, আমি সুন্দরী। বোম্বাই এর সোসাইটিতে যেসব মারাঠি, পার্শী, সিন্ধি মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের অনেকের থেকেই আমি ঢের বেশী সুন্দরী। অন্ততঃ সেই সুদর্শন পার্শী যুবক লণ্ডনে আমার রূপে যে মুগ্ধ হয়েছিল তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। সে আমাকে চেয়েছিল। আমিও চেয়েছিলাম বিয়ে করে সংসারী হতে। সে রাজী হয়েছিল।

পরে জেনেছিলাম সে রাজী হয়েছিল শুধুমাত্র আমাকে তার হাতের মুঠোয় পাবার জন্য। বিদেশে তাকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। আমাদের দেশের লোকেরা যখন বিদেশে যায়, তখন তাদের আসল রূপটা সব সময়ে ঠিকমতো চিনে ওঠা যায় না।

তাকে চিনতে পারলাম, সে যখন দেশে ফিরে এল। দেখলাম সে বোম্বাইএর সোসাইটীতে একজন ধনী জুয়ান। তার সুন্দর চেহারার সুযোগ নিয়ে সে মেয়েদের সর্বনাশ করে হাসতে হাসতে। তখন দেখলাম তার সত্যিকারের পিশাচের রূপ। সে নারী মাংসের ব্যবসা করে। আর তাতেই সে সমাজের বড় বড় লোকদের মাথাগুলো কিনে রেখেছে। আমাকে সে চেয়েছিল তার ব্যবসার পণ্য হিসাবে।

আমি তা হতে দিইনি। প্রচণ্ড লড়াই আমাকে করতে হয়েছিল তার থাবা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে। আমি স্বাধীনভাবে থাকতাম। কাউকে জানতে দিইনি যে আমি বিবাহিতা।

কিন্তু আমি তাকে ছাড়তেও পারেনি। তাই একই বাড়ীতেই আমি থাকতাম তাকে চোখে চোখে রাখতে। আমি আমার মনের এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য বার বার নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছি। কতোবার ভেবেছি বাড়ী ছেড়ে চলে যাই, অন্য কোথাও থাকি। পেরে উঠিনি। হয়তো আমি তাকে ফিরে পাবার জন্য প্রতীক্ষা করতাম মনে মনে। মনে মনে হয়তো চাইতাম, সে একদিন বুঝবে সত্যিকারের প্রেম কাকে বলে। একদিন সে ক্লান্ত হবে। তখন তাকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও তার কোন পরিবর্তন দেখলাম না। দেখলাম সে ক্রমশ ভয়ানক হয়ে উঠছে।

এমন সময় আপনি এলেন আমাদের হাসপাতালে। আপনাকে হাসপাতালের সবাই ভয় করত। একটি কর্তব্যপরায়ণ, কম্, সংস্কারহীন মানুষ। লোকে তাকে ভয় না করে পারে? নার্সরা প্রথম প্রথম আপনার চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করত। আমিও প্রথম প্রথম সে হাসিতে যোগ দিয়েছি। ক্রমশঃ আপনাকে জানলাম। চিনলাম আপনার ভালবাসায় ভরা মনটাকে। রোগীদের চিকিৎসা করা, সেবা করা আপনার কর্তব্যের উপরেও আর কিছু। মানুষের ওপর আপনার এই গভীর ভালবাসা আমাকে আস্তে আস্তে আপনার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। বিশেষ করে, যেদিন আপনার সেই লড়াইএর সৈন্যের মতো মূর্তি দেখলাম, সেই নিরপরাধ, সরল ছটফটে বাচ্চাটা ভেজাল ওষুধের গণ্ডগোলে মারা যাবার পরে, তা আমি ভুলতে পারিনি।

সেদিন মনে হয়েছিল আপনার মতো একটা প্রেমিক মানুষকে আমি মনেমনে বহুদিন ধরে চেয়েছি। চেয়েছি আমার স্বামীর রূপে। চেয়েছি আমার জীবনের সবকিছু তার কাছে সমর্পণ করব বলে।

সেই থেকে আমি মনেমনে পাগল হয়ে গেছি। কতোবার উন্মাদের মতো আপনাকে ইঙ্গিতে জানাতে চেয়েছি আমার মনের কথাটা। কিন্তু অদ্ভুত আপনি। হয় আপনি আমার মনের কথা জেনেও এতটুকু প্রশ্রয় তাতে দেননি। নতুবা আপনি এতটুকু বুঝতে পারেননি আমার সে ইঙ্গিতগুলো। আমার মনে হয়েছে আপনি নারী জাতটার সম্বন্ধে বড্ড উদাসীন, বড় অজ্ঞ।

কিন্তু আপনি ডাক্তার, আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন আমার কাজগুলো। আপনার কথা ভাবতে বসলেই আমার নেশার ঘোর ঘোর লাগত। আমি আপনাকে সব সময়ে দেখতে লাগলাম আমার আসেপাশে। আমার চোখের সামনে। একটু একলা হলেই আপনাকে আমি পেতাম আমার বুকের কাছটাতে। আপনাকে আমি কতোবার যে আলিঙ্গনে বেঁধেছি তার হিসাব নেই। কতোবার যে আপনার বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে নীরবে চোখের জল ঝরিয়েছি তা বলতে পারব না। এই চিঠি লেখা শেষ করে ডাকে দিয়ে, আমি ঘরে ফিরে গিয়ে একের পর এক সিরিঞ্জ শিল খাবো। যতক্ষণ আমার শেষ চেতনা আমার শরীরে ধরা থাকবে, ততক্ষণ আমি থাকব আপনার কণ্ঠলগ্ন হয়ে।

সে রাতেও আমি আপনার কণ্ঠলগ্ন হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, সে রাতে আমি আপনাকে আমার সর্বস্ব দিয়েছিলাম। ওঃ কী যে আনন্দ ছিল সেই দেবার মধ্যে! আপনার শরীরের প্রতিটী অঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলাম আমার প্রতিটী অঙ্গ। কিন্তু রাত শেষ হতেই আমার সেই নেশার ঘোর কেটে গেল। আমার পিশাচ স্বামী আমার কয় মেটের অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল রাত্রে। আমি নেশার ঘোরে তাকেই আমার সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছি। আমি নিজেই দেখছি আমার সমস্ত শরীরটা একটা শকুনে ঠুকরে খেয়ে রাংসহীন করে দিয়ে গেছে। আমি আমার কংকালটা বয়ে বেড়াচ্ছি।

সেই থেকে কেমন একটা ঘৃণা আমাকে পেয়ে বসেছে। নিজেকে ভারী অশুচি মনে হচ্ছে। গাটা ঘুলিয়ে উঠছে বার বার। সহ্য করতে পারছি না নিজেকে। সেই থেকে রাতের ঘুম আমার চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে। ক'রাত আমি একেবারেই ঘুমোইনি। তাই ভেবেছি আমি এবার ঘুমোব।

গুড্‌বাই ডাক্তার, গুড্‌বাই।

চিঠিটা পড়া শেষ করে ডাক্তারের হাতে ফিরিয়ে দিলাম। নিস্তব্ধ, নির্বাক ডাক্তার পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আর জংগলের নিশ্চল গাছগুলো থেকে যেমন টপটপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে তেমনি তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়তে দেখলাম।

———

ফেউ

শঙ্খলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এ-বাড়িটি সুন্দর।

জায়গাটাও।

বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি। সামনে সবুজ লন। কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। দু'বেলা মালি এসে যত্ন করে ফুল ফোটায়।

শহরতলিটাও নির্জন। খানিকটা গ্রামের শ্রী আছে! আশেপাশে খোলা মাঠ—গাছপালা, অনতিদূরে পাহাড়।

ফাঁকা মাঠ জুড়ে এরই মধ্যে কয়েকখানি বাড়ি উঠেছে, আরো উঠবে। তবু কলকাতার মতন ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ি উঠবে না এখানে কখনো। আর ভিড়ও হবে না অত বেশী।

কলকাতা থেকে বিদ্যাবের শহর।

এ-শহর এখনো সৌখিন, প্রাকৃতিক শোভায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। হাঁকডাক নেই, কাজ আছে। অথচ কাজের জন্যে হৈহল্লা নেই।

জীবনকে একটুও দাঁড়াতে দেয় না কলকাতা শহর। এ-শহর কিন্তু তা নয়। এ শহরে বিশ্রাম এবং বিরামের আবেশ আছে।

তন্দ্রার বেশ পছন্দ হয়েছে এই শহর আর এই বাড়িটি। আরো পছন্দ হয়েছে এখানকার পরিবেশ। এখানকার নির্জনতা। নিখেদের আভিজাত্য আর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এখানে বেশ আরামে বসবাস করা যায়।

রজতের কিন্তু ভালো লাগে না এমন বিচ্ছিন্ন জীবন। এমন নির্মম নিঃসঙ্গতা। বিশেষ করে তন্দ্রার একাকীত্বের কথা ভেবে রজত স্বস্তি পায় না।

এর চেয়ে বরঞ্চ ঘন শহর ভালো। যেখানে কিছু মানুষ-জন আছে, পাড়া-পড়শী আছে। সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান আছে। মানুষ আছে; আর আছে মানুষের মুখ।

মানুষ নিয়ে নয়, যন্ত্র নিয়ে রজতের কারবার।

যন্ত্রের ভিড় আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। যন্ত্রের ভিড়ে বড় একাকীত্ব। যন্ত্র যখন সচল তখন মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক বড় কম।

অসংখ্য কলকব্জা। তবু শব্দ আর শব্দ। সেই শব্দের ভাষার কোন বৈচিত্র্য নেই; চেনা-চেনা আওয়াজের শুধু একটানা চীৎকার। আর সেই চীৎকার যখন থেমে যায়, অর্থাৎ যন্ত্র যখন বিকল হয়ে পড়ে

তখনই ডাক পড়ে মেশিন ইঞ্জিনিয়র রজত রায়ের। গ্লাসগোয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মেশিন ইঞ্জিনিয়র রজতকে মোটা মাইনে দিয়ে রাখা এই জন্যে ত!

অফিস-স্টাফ থেকে বিল্ডিং একখানা বড় ঘর—ঘন নীল পর্দায় ঢাকা। সাধারণের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। ফ্লাইলাইট থেকে ঘরে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে নিষ্কৃতির জন্যে সুখ-শীতল এয়ার-কন্ডিশনড ঘর। সোফা, কৌচে বিশ্রামের পরিপূর্ণ সুখ-সম্ভার।

টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ-পত্তর—কলকব্জার ক্যাটালগ; আর নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক বিবরণ? মেশিন ইঞ্জিনিয়র রজত রায়কে এ-সব তথ্য জানতেই হয়।

আরো আছে। সাহিত্যের সব পত্র-পত্রিকা। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার আধুনিক কাগজ-পত্তর আর বই। তা না হলে সময় কাটাবে কেমন করে?

কবে কখন যন্ত্র থামবে, তখনই ত দরকার পড়বে রজত রায়কে। তখনই ত কেবল কাজের চাপ। আর কথা কইবার জন্যেই ত তন্দ্রাকে নির্বাচন।

শুধু তন্দ্রা নয়, তন্দ্রার সঙ্গে তার গোটা সমাজকে রজত চায় অন্তরঙ্গ করে নিতে। তাছাড়া তন্দ্রার আর আছে কী?

শ্যামল ছিপছিপে গড়ন, কিন্তু কলেজী-শিক্ষার ছাপ, আর ম্যাচ করা শাড়ি-ব্লাউজ পরার ছন্দ। সুডৌল বক্ষ যৌবন, মুখ-ভঙ্গির মাধুর্য, সুর্মা-টানা চোখ—তন্দ্রার মতন এমন মেয়ে হামেশাই দেখা যায়। গোলাপী লিপ-স্টিকে রঞ্জিত অধর। যৌবনবতী তন্দ্রার দেহ-সাধর্ম্যের জন্যে কিন্তু বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়র রজত রায় লালায়িত নয়।

বংশ-কৌলিন্যের দিক থেকে ত তন্দ্রা একেবারেই অপাংক্তেয়। নিতান্তই সাধারণ ঘরের মেয়ে—গরিব বাপ-মায়ের ছাপোষা ঘরের নিরিবিলি মান। উত্তর কলকাতার জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ির একতলার ঘরের অধিবাসিনী।

এ পরিবেশ থেকে গ্লাসগোর বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত মেশিন ইঞ্জিনিয়র রজতের সঙ্গত অনেক উঁচু ধরের। বিলিতি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি তার—মাসে আড়াই হাজার টাকা মাইনে। মোটর, প্রশস্ত বাড়ি, ঘরোয়ান, চাকর, বাবুর্চি, সোফার—পুরোদস্তুর আভিজাত্য। লাইব্রেরি ঠাসা বই, আর গান-বাজনার সরঞ্জাম, দামী রেডিও সেট, রেকর্ড-প্লেয়ার।

রজত চিত্ত ভালোবাসে, বাসেনা ভালোবাসে আর ভালবাসে গান-বাজনা, গল্পগুজব। সারা জীবনটাই যন্ত্রের সঙ্গে কেটেছে তার। এ-দেশ থেকে সে-দেশ, বিদেশ। জীবনের পরিপূর্ণ বছরগুলি শুধু কাজ আর কাজ শিখতেই অতিবাহিত হয়েছে। যখন সে নিজের দেশে খাঁটি কলকাতা শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, তখন আর তার যৌবন নেই। সংসারও নেই, ঘর নেই, নেই আত্মীয়-স্বজন।

একটা জলসায় মোটা রকমের ডোনেশন দিয়েছিল রজত।

সেই জলসায় গান গাইতে এসেছিল তন্দ্রা সান্যাল। ছিপ্‌ছিপে চেহারা, চোখদুটিতে তন্ময়তা, কণ্ঠস্বরে সুরের আকুলতা।

সেইখানেই জানা-শোনা। সেইখান থেকেই তন্দ্রাকে কুড়িয়ে আনা। কুড়িয়ে এনে একেবারে ডৌলুষে, ঔজ্জ্বল্যে, আভিজাত্যে ভরিয়ে তোলা।

তন্দ্রা ভুলে গেল নিজেকে, ভুলে গেল তার দরিদ্র পরিবার—বিধবা মা, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন। উত্তর কলকাতার আষ্টেপিষ্টে বাঁধা বড়-হাওয়ার ছোট অপরিসর ঘরের দৈনন্দিন জীবনকে তন্দ্রা আর মনে করতেও চায় না।

মিসেস তন্দ্রা রায় ভিন্ন জাতের, ভিন্ন সংসারের, ভিন্ন পরিবেশের মানুষ

বাড়ি পাল্টানো, পরিবেশ পাল্টানো।

রজত কিন্তু এই পরিবেশেই থাকতে চায়। পুরানো শ্যামবাজারের গলি-গলির পাশে মস্ত গাড়া ফুপেন ঘোষ এ্যাভেন্যু চারতলা বড় বাড়ির মধ্যে দক্ষিণ-খোলা প্রশস্ত তিনতলার ফ্ল্যাট তন্দ্রার বাপের বাড়ির কাছে-পিঠে। বিয়ের পর এই পাড়াতেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে রজত।

তন্দ্রার মা আসুন, ভাই আসুক, ছোটবোনও আসুক না কেন রজতের বাড়িতে।

তন্দ্রার কিন্তু তা পছন্দ নয়।

স্বামীর আড়াই হাজার মাস-মাইনে থেকে সে না হয় গোপনে কিছু টাকা বাপের বাড়ির সাহায্যের জন্য দিতে পারে; কিন্তু ধারালো-চোখে, দরিদ্রের বেশে মা-ভাই-বোন এসে তার পরিচ্ছন্ন সংসারকে অপরিচ্ছন্ন করে তুলবে কেন?

গানের দলের মত বখাটে ছোকরা—মিলেকরা পাঞ্জাবী ঘিরে যাদের মিথ্যে আভিজাত্যের বড়াই, আর ধারালো সব মেয়ের দল, পান-জর্দা আর চায়ের চুমুকে গানের আসর মিসেস তন্দ্রা রায়ের আর পছন্দসই নয়। এখন আর সে নিজেকে ওদের মধ্যে একজন করে রাখতে চায় না।

রজত অভিযোগ করে, "এ-পাড়াটা ছাড়বে কেন?"

"ছাড়বো বড্ড ভিড় এখানে, ভাই।"

'কিন্তু এখানে তোমার আত্মীয়-স্বজন, তোমার গান-বাজনার আসর। এখান থেকে চলে গেলে কী সুবিধে হবে তোমার?'

তন্দ্রা স্বামীর কথায় ঘোরতর আপত্তি জানায়, 'এখানে বড় নোংরামি। তোমার-আমার মনের উপযুক্ত পরিবেশ এখানে নেই।'

অতএব উত্তর থেকে দক্ষিণ।

কিন্তু তাতেও অসুবিধে অনেক। মাত্র পঁচিশ পয়সার বাস ভাড়া। অক্লেশে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়া যায়।

সেই ঘাড়-কামানো গানের মাস্টার, সেই ভিক্ষাবৃত্তিতে হাতযেলে প্রার্থনা করা, 'সত্যি তন্দ্রা, সংসার আর চালাতে পারছিনে।'

'তা, আমি কী করব বলুন!'

'তোমার অভাব কী? তুমি আমার পুরোনো ছাত্রী। ছোট মেয়েটার টায়ফয়েড—ডাক্তার ডাকবার সামর্থ্য নেই। জানো ত সা-রে-গা-মা' শিখিয়ে কোথা আর পাই! আর পাড়ায় পাড়ায় এখন মেয়ে-ইস্কুল, ছেলে-ইস্কুল—সব ইস্কুলেই সস্তা গানের ক্লাস।'

একখানা পাঁচ টাকার নোট, বড়জোর না হয় দশটাকা—এইদিয়েই বিদায় করা যেত গানের মাস্টারকে। কিন্তু হঠাৎ অফিস থেকে ফিরাট হাঁকিয়ে রজত এসে হাজির। নিজের ব্যাগ থেকে একশো টাকার একখানা নোট বার করে গানের মাস্টারের হাতে দিয়ে তন্দ্রাকে বললে, 'আহা, কচি মেয়ে বিনা চিকিৎসায় থাকবে!

টাইফয়েডের ওষুধের দামও বেশি। তারপর আজকাল আবার টাইফয়েডে পথ্য দেওয়া হয়। তার খরচ কী কম!'

একশোটাকার নোট নিয়েই গানের মাস্টার চলে গেল।

কী বলবে তন্দ্রা? স্বামী ত জানে না, দারিদ্র্যের চেহারা কী! শুধু কী রোগে? মরেও। আর ঠিক তাই।

দুদিন বাদে সেই ফিয়াট কারেই রাত্রের শোতে তন্দ্রা আর রজত মেট্রোতে একখানি বিলিতি ছবি দেখতে গিয়েছিল। ফিরবার পথে পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি কিড স্ট্রীটে কাকে দেখলে তন্দ্রা?

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মাতাল ঘাড়-কামানো গানের মাস্টার। একশো টাকার নোটে এ্যাংলো-পাড়ায় নিশ্চয়ই স্ফূর্তি লুটতে বেরিয়েছে! উপরি পাওনা একশো টাকা—তন্দ্রার স্বামীর বদান্যতা!

ছি, ছি, ভাগ্যিস্ রজত দেখতে পায়নি। কিংবা চিনতে পারেনি।

প্রৌঢ় রজত তখন চলন্ত মোটরে তন্দ্রারই দারিদ্র্য আজুর। 'আচ্ছা, বাংলা গান এত ভালো গাইতে, ইংরেজি গান কিছু শেখ নি?'

স্বামীর কথায় তন্দ্রা বিস্মিত। বললে, 'না।'

'শিখবে?'

'হঠাৎ ইংরিজি গান কেন?'

'ওদের মেলোডি আমার বড় ভালো লাগে। নির্জন মুহূর্তে কখনো কখনো গভীর রাতে এই গাড়িতে যাওয়ার সময় তোমার চিকন সুরেলা গলায় ইংলিশ টিউন বেশ উপভোগ করা যায়।'

স্বামীর কথায় হাসলে তন্দ্রা। বললে, 'আচ্ছা, শিখবো।'

'তাহলে ভালো একজন ট্রেনার দেখি?'

'না, এখুনি তার দরকার নেই। তুমি কয়েকখানা নোটেশনের বই এনে দিও। তাতেই প্রথম প্রথম কাজ চলে যাবে।'

ফিয়াট এগিয়ে চলেছিল। তন্দ্রার মন কিন্তু পিছিয়েই ছিল।

উত্তর কলকাতার সেই সরু গলি—অন্ধকূপ বাতাস আর অপরিসর ঘর। একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার, বধূটির চোখে অসহায়ের রুদ্ধ অশ্রু, ছোট মেয়েটির অপরিচ্ছন্ন রোগশয্যা। ডাক্তার নেই। বধূটিই কোনরকম একে ওকে ধরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়েছিল। দামি ওষুধ খাওয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানকার চিকিৎসক।

হঠাৎ ব্রেক কষলো ড্রাইভার। রাউডন স্ট্রীটে একটা এ্যাংলো মাতাল আর একটু হলেই চাপা পড়েছিল আর কী!

'ইউ সন্ অফ এ বীচ!'

মাতালের গালাগাল শুনে ড্রাইভার গাড়ি থামাচ্ছিল আর কি। পাহাড়ী সোফারের মাংসপেশীতে উত্তেজনার স্পন্দন, 'লেট মি ট্রিট দ্যা ডগ্!'

রজতের সঙ্গে থাকতে থাকতে পাহাড়ী সোফার বেশ ভালো ইংরেজি বলে।

তন্দ্রাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, 'টিচ্ হিম এ গুড লেসন্।

রজত বাধা দিলে, 'নো! এ ট্রিট্ ডগ্ ওন্‌লি বার্কস।'.

'কিন্তু ওরাই ভালো মানুষের ধর্মভাবকে ঠকায়। সংসারকে ছারখারে দেয়'—তন্দ্রার চোখে তার মৃতপূর্ব গানের মাস্টারের প্রতিচ্ছবি।

সোহার আর কিছু বললে না। জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

শ্যামবাজার কুপের মোড় এ্যাভেন্যু থেকে বালিগঞ্জ কেয়াতলা রোড—সে বাড়িও পরিবর্তন করতে হল তন্দ্রাকে।

আরো নির্জনতা চাই—মানুষের মুখ যেখানে আরো কম।

রজত বলে, তবু বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার কাছে। দরকার পড়লে মোটরে তোমার বাপের বাড়ি বিশ মিনিটের জাঁমি।

তন্দ্রার মত কিন্তু ঠিক উল্টো।

কাছে থাকা মানেই ভাই-বোন দুটিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ থেকে বাধা দেওয়া। পদে পদে দরকার পড়লে তারা আসবে। আর আসবে পুরোনো দিনের বন্ধু-বান্ধবী যারা হাত পেতেই আছে।

মুখে অবিশ্যি সে-কথা তন্দ্রা স্বামীর কাছে প্রকাশ করলে না। বললে, 'চলো, আরো দক্ষিণে, আরো একটু খোলা-মেলা জায়গায়।'

'কতদূরে যেতে চাও তুমি?'

'আরো দক্ষিণে, ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে—'

তন্দ্রার কথায় বাধা দিয়ে রজত বলে, 'না, না, অতদূর নয়। তাহি অসুবিধে ওদব জায়গায়।'

তন্দ্রা বলে, 'কেন? তোমার ত গাড়ি রয়েছে।'

'গাড়ি থাকলেই কী সব অসুবিধে মেটে!'

তন্দ্রা বলে, 'তবুও শহরে থাকতে আমার একদম ভালো লাগে না।'

রজতই মীমাংসা করে দিলে, 'তাহলে বরঞ্চ চল যাদবপুর পার হয়ে গড়িয়ার দিকে।'

তাই হল।

গড়িয়া।

গড়িয়াহাটা রোড ধরে ছিমছাম নিত্য যাওয়া-আসা গড়িয়ার পথে।

উত্তর কলকাতার গলী-ঘাঁচির ভিড় তবু একটু কম। অমন হামেশা আলাতন করতে আর আসে না তারা।

কিন্তু একদিন যে এল তাকে বুঝি কেরান যায় না।

তন্দ্রার ছোট বোন ছন্দা। আর তার সঙ্গে একজন তরুণ যুবক—যার মুখে-চোখে সিনেমার নায়কের হাবভাব।

তাড়িয়েই দিচ্ছিল তন্দ্রা ওদের দুজনকে।

ছন্দা তন্দ্রার মার পেটের সন্তান—তার ছোট বোন—আত্মজা। কিন্তু তাতে কী? তার অপকর্মের ভার তন্দ্রা নেবে কেন?

আর স্পর্ধা ছন্দার! বলে, বিয়ে করেছি—ও তোমারো আপনজন।

ছিঃ, ছিঃ, বেহায়াপনার একশেষ। লজ্জাও নেই। কোন সাহসে ওরা তন্দ্রার গেটের ভেতরে ঢুকতে সাহস পায়?

ছেলেটি নাকি সিনেমা-লাইনে যেতে চায়। বিদ্যের বালাই নেই—ঘর-সংসারেও চাল-চুলো কিছু নেই। ছন্দা ভিড়লো কেমন করে ওর সঙ্গে? না, সে-প্রশ্ন করার প্রবৃত্তিও নেই তন্দ্রার।

মা চোখের জল ফেলেছেন। ফেলুন তিনি।

শেষকালে তিনিই নাকি পাঠিয়ে দিয়েছেন বড় জামাই-এর কাছে—কারখানায় যদি কিছু কাজ-কর্মের জোগাড় করে দিতে পারে। যাবে কী তা না হলে ওরা দুজন। একম দুজন বটে; এরপর ও সংসার আরো বাড়বে।

'এ-বাড়ির ঠিকানা তোমাদের কে দেখালে?'

তন্দ্রার কথার জবাবে ছন্দা উত্তর দেয় নির্বিকার কণ্ঠে, 'কেন, এ-বাড়ি কী আমার পর?'

'সাট আপ্!' তন্দ্রা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল।

ছেলেটি ড্রয়িংরুমের একটি সোফায় চুপচাপ বসে।

আত্মসম্মানেরও কী বালাই নেই—তন্দ্রা রাগে কাঁপছিল।

রজত অন্য ঘরে ছিল। বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে এল।—'কী বলছ তন্দ্রা? ছেলেমানুষ। হয়ত ভুল করেছে! তোমারই ত বোন ও—আসবে না কেন?'

সহানুভূতির ছোঁওয়া পেয়ে ছন্দা কচি মেয়ের মতন ডাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'জামাইবাবু! আমি ওকে ভালবেসে বিয়ে করেছি। আমাদের আশ্রয় দিন!'

রজতই আশ্রয় দিলে। তন্দ্রার ঘোরতর আপত্তিতে নিজের বাড়িতে নয়। একটা পাকা চাকরির ব্যবস্থা, নগদ কিছু টাকায় সংসার-বাঁধার যাবতীয় সরঞ্জাম, আর শহরতলিতে একখানা ভাড়াটের ঘরের সুবন্দোবস্ত রজতই করে দিলে। শুধু তাই নয়,—ছন্দার নিরাভরণ অঙ্গে কিছু স্বর্ণ অলঙ্কার—এও জামাইবাবুর দেওয়া বিবাহ-যৌতুক।

খুশিতে ছন্দা ডগমগ করছে।

কিন্তু তন্দ্রা আক্রোশে গর্জন করে ওঠে স্বামীকে তিরস্কার করে, 'কেন, কেন তুমি এত দয়া দেখাও? একটুও কী নির্দয় হতে জান না তুমি? ওদের ভয়েই ত শহর ছেড়ে শহরতলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি।'

রজত তন্দ্রার এ-কথার আর কোন জবাব দেয় না। সে জানে মেয়েদের মন কোমল। বাইরেই শুধু কাঠিন্যের আবরণ। তন্দ্রার এটা অভিমান।

গড়িয়াতেও আর থাকা চলে না।

গড়িয়া কেন, এই বাংলা দেশেই আর থাকতে চায় না তন্দ্রা।

'আচ্ছা, তুমি বদলি হতে পারো না?'

তন্দ্রার কথায় চমক ভাঙল রজতের। হঠাৎ এমন প্রস্তাব কেন? আবার কী হল তন্দ্রার।

রজত উত্তর দিলে, 'সারা জীবনটাই বদলি হতে হতে চললাম। এবার রিটি। এখান থেকে আর কোথাও নড়বার ইচ্ছে নেই। আর ভালো লাগে না এ-দেশ ও-দেশ ঘুরতে ফিরতে।'

উত্রা অনুনয় জানায়, 'না, চলো অন্য কোথাও। এখানে আমার আর একটুও ভালো লাগছে এই ভিড়, এই সব চেনা মুখ, এই অস্বচ্ছন্দ পরিবেশ—না, এ আর আমি সহ্য করতে পারছি নে।'

'বাইরে একা একা তোমার ভালো লাগবে ?'

স্বামীর কথায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে উত্রা।—'একা কেন, তুমিও ত থাকবে।'

'আমি ত অফিসেই থাকি বেশিক্ষণ।'

'তা হোক্। তবু, তবু আমি শুধু তোমার অস্তিত্বকে নিয়েই থাকতে চাই, শুধু তুমি আর আমি। আর কেউ নয়।'

কী যেন ভাবল রজত। হয়ত উত্রার মনের অতলে একবার ডুবে যেতে চাইল, দেখতে চাইল—কী রহস্য সেখানে !

পশ্চিমের বিহার শহর।

রাঁচী যাকে বলে।

জায়গাটা নতুন করে গড়া হচ্ছে। এখানকার পাওয়ার হাউসের চীফ ইঞ্জিনিয়ার রজত রায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলো। ঝকঝকে উজ্জ্বল জীবন।

উত্রা বুঝি এই চায়।

দুপুরের গরমে বাংলোর নীল ডিস্টেম্পারের ঘরটি খসখসের পর্দায় ঢাকা। একজন চাপরাশি অবিরাম জল ঢালছে পর্দায়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজে দুটির দুপুরে রজত এবং উত্রা সেই ঘরে বিশ্রাম সুখ-শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

'সত্যি জায়গাটা বেশ।'—উত্রার কণ্ঠে আবেশ।

রজত খুশি হল, 'ভালো লাগছে তোমার ?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে।' উত্রা স্বামীর আরো কাছে সরে আসে।

বাইরে কলিংবেলের শব্দ।

'এই গরমের দুপুরে আবার কে এল ?'—উত্রার চোখে বিরক্তির চিহ্ন।

রজত উঠে পড়ল।

ফিরে এল কিন্তু একা নয়। সঙ্গে একজন তরুণী।

ভীষণ রেগে যায় উত্রা।

'কী আশ্চর্য, রজতের বুদ্ধিশুদ্ধি কী একেবারে লোপ পেয়ে গেছে নাকি ! কোথাকার এক উটকো মেয়ে, তাকে নিয়ে একেবারে শোওয়ার ঘরে হাজির।'

উত্রা এর আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল তাই রক্ষে। মুখে ভদ্রতা প্রকাশ করতে হয়। শুকনো আপ্যায়নের সুরে সে তরুণীটিকে উদ্দেশ করে বললে, 'বসুন !'

মেয়েটি একটি সোফায় উপবেশন করল। কপাল মুখের রং, দুপুরের তাপে লাল হয়ে উঠেছে। ঘামে গায়ের ব্লাউজটা ভিজে ভিজে। আঁটসাট দেহের গড়ন।

এ-মেয়ের সঙ্গে রজতের সম্পর্ক কী ?

রজত যেন আগ্রহের সুরেই বললে, 'উত্রা, ওঁকে এই ঘরেই নিয়ে এলাম। দুপুরের রোদে খুবই

কষ্ট পেয়েছেন। এখানে একটু বিশ্রাম করুন। তোমার সঙ্গে ওঁর অনেক ভালো। বড় ভালো রুচি ওঁর। পড়াশুনাতেও ভালো মেয়ে ছিলেন। একটু আলাপেই ওঁর পরিচয় পেয়ে গেছি। তুমি ও একা একা থাক, উনি তোমার ভালো সঙ্গিনী হবেন।'

তন্দ্রা মেয়েটির দিকে তাকাল।

আরো আগ্রহ নিয়ে রজত বলে চলে, 'উনি এক বুক শাবলিশার্সের সেলিং এজেন্ট। সেদিনের আনা বইগুলি ওঁর কাছ থেকেই নেওয়া।'

রজত উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

তন্দ্রার মুখে কঠিন রেখা, 'সেলিং এজেন্ট! তাকে আবার আদর করে অন্দর-মহলে ডেকে আনা!' না, রজত বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি সুরু করেছে।

'একটা বড় সংসারের গুরুদায়িত্ব আমার ঘাড়ে। দয়া করে কিছু বই কিনে যদি হেলপ্ করেন!' মেয়েটির কণ্ঠে বিনয় মাখি!

'এই জন্যই কী ঠিক দুপুরবেলা এমনি ধারা আক্রমণ?'—কথা কটি ঠোঁটের আগায় এসেছিল তন্দ্রার। কিন্তু ভদ্রতায় খাতিরে মুখ ফুটে তা বলা গেল না।

তবু তন্দ্রা বললে। বললে একটু বিরক্তির সুর মিশিয়েই, 'বই পড়ার খুব বাতিক নেই আমার। আর যার সেদিন ত ওই অতগুলি বই রাখলাম আমরা।'

মেয়েটির গলা তবুও আশ্চর্য রকমের নরম।—'হ্যাঁ। মিস্টার রায় অনেকগুলি বই কিনলেন আর আমার অবস্থা শুনে খুব সিমপ্যাথিও জানালেন।'

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ল যেন।—'আপনার এজেন্সির এলাকা কী কলকাতা, না রাঁচী,—মা কলকাতা থেকে একেবারে রাঁচী পর্যন্ত?'—তন্দ্রার চোখে শাণিত দৃষ্টি।

মেয়েটি বিস্মিত এবং বিহ্বল। তার কণ্ঠস্বর দ্বিধাবিজড়িত।—'আমার এজেন্সি বিহারের। কলকাতার সঙ্গে আমার বই বিক্রীর কোন যোগ নেই। কিন্তু একথা জানতে চাইছেন কেন?' অত্যন্ত ভীরু এবং বিনম্র প্রশ্ন।

'এমনি। আচ্ছা নমস্কার।' বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত তুলল তন্দ্রা।

অগত্যা মেয়েটিকে উঠতেই হল।

কিন্তু তন্দ্রার মুখের রেখা আরো কঠিনতর হয়ে উঠছে কেন?

এবার সে রজতকে আবার কোথায় ট্রান্সফার নিতে বলবে?

হয়ত এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কিছু কথা কাটাকাটি হতে পারে। রজত এমন করে কতদূর সুখ বেচবে? আর চাকরির ক্ষেত্রে এমন অশোভন আবদার বা টিঁকবে কেমন করে?

তবু, তবুও এখান থেকে রজতকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তন্দ্রাই যদি না বাঁচে তবে রজতের এই সুখ—ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে?

———

নূর জাহান

গুপ্তচর কাহিনী

তোফাজ্জল হোসেন

১ ফ্রান্সের মাটিতে ১

বৃহস্পতিবার ১৭ই জুন ১৯৪০—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এখন প্রায় মধ্যপথে। পরমকপালাবণ্যময়ী নূর ইনায়েৎ অনেক ঘুঁকেপেতে লেফটেন্যান্ট আঁরি প্যারীর বাসভবনে এসে হাজির হল। এমিলি আঁরির বাসভবন অতেউইলের এক সমৃদ্ধ অঞ্চলের ৪০ নম্বর ক আরলাঙ্গারের একটি ফ্ল্যাটে।

এই ঠিকানা ওকে লণ্ডন থেকে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্যারিসে পৌঁছে সর্বাগ্রে এই বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে। তাকে একটি কোড্ শিখিয়ে দেওয়া হল, এই কোড্ উচ্চারণ করলেই ওর পরিচিতি প্রকাশ পাবে। নূর মনে করেছিল যাঁর সঙ্গে দেখা হবে তিনি একজন বৃদ্ধা। নূর তাই পথে কিছু কারনেশন ফুল কিনে নেয়, মহিলাটিকে উপহার দেওয়া হবে।

এদিকে প্যারী খবর পেয়েছিল এই সপ্তাহে ইংলণ্ড থেকে একজন গুপ্তচর আসবেন, এবং সেই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা তাঁর পরিচয় হিসাবে যে গুপ্তবাক্যটি বলবেন—সেটিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বাক্যটি শোনামাত্র যে উত্তর দিতে হবে সেটিও তাকে বলে দেওয়া হয়েছে। এরপর ঠিক কোন দিন এবং কোন সময় তিনি আসবেন তাও বলা হয়েছে।

নূর এসে বেল টিপতেই প্যারী এসে দরজা খুলে দেয়। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে বিহ্বল ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে।

নূর বুঝেছিল বৃদ্ধা একাই থাকেন, তাই একজন পুরুষ এসে দোর খুলতে সে অবাক হয়ে গেছে। কি ভাবে আত্ম-পরিচয় দেবে ভেবে পায় না নূর। কিন্তু বেল টিপেছে, তার কৈফিয়ৎ চাই। তাই সে আমতা আমতা করে বলে—আমার আসার কথা ছিল।

গ্যারী বলল—ওঃ, আচ্ছা। ভিতরে আসুন।

নবাগতাকে ভিতরে নিয়ে এল গ্যারী। বসার ঘরে গিয়ে নূর দেখে একটি তরুণী বসে আছে। ভদ্রলোক বললেন—ইনিই আমার প্রিয়তমা, মামজেল নাদু।

এই তরুণীটিকে দেখে নূর আরো বিস্মিত হয়েছিল তবু ভদ্রতার খাতিরে বলে—হাউ ডু ইউ ডু। কেমন আছেন, এই বলে হাতটা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আত্ম-পরিচয় দেয় না।

এদিকে গ্যারী ও মামজেল নাদুও অবাক, একেবারে বিভ্রান্ত বলা যায়। ওদের মনে একথা উদয় হয়েছে যে লণ্ডন থেকে যে গুপ্তচর আসার কথা ইনিই হয়ত সেইজন। তা নইলে উনি বলবেন কেন যে আমার আসার কথা ছিল। যদি উনি আগেভাগেই এসে থাকেন তাহলেও আত্ম-পরিচয় দানের গুপ্ত বাক্যটি (code) উচ্চারণ করলেন না কেন। গ্যারীর গুপ্তবাক্যটি ওর কথার উত্তর মাত্র। সুতরাং উনি কিছু না বলতে সে কিছুই বলতে পারে না।

গ্যারী নূরকে বলতে বলে, যেন এই অজ্ঞাতকুলশীলকে আপ্যায়ন করাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। গ্যারী একটি সিগারেট এগিয়ে দেয়। নূর সেটি গ্রহণ করল। স্বচ্ছন্দ হওয়ার ভঙ্গীতে দু একটি কথাও বলে গ্যারী। এর উত্তরে নূরও দু একটা ভাসা ভাসা জবাব দেয়, তার মধ্যে গ্যারীকে পরীক্ষা করার প্রচেষ্টা—সে কি বুঝতে পেরেছে নূরের পরিচয় ?

নূর পরে বলেছে সে ভাবছিল হয়ত এঁরা সেই বৃদ্ধার আত্মীয়-আত্মীয়া, কিংবা প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গী। এই গুপ্তচক্রের বাইরের কেউ যে এই সম্পত্তি নয় এটা সে বিশ্বাস করতে চায় না। নইলে একজন অপরিচিত মহিলাকে ওরা এইভাবে সহজ মনে গ্রহণ করতো না। নূর স্থির করল যতক্ষণ না বৃদ্ধা এসে হাজির হচ্ছেন ততক্ষণ অন্ততঃ সে অপেক্ষা করে থাকুক। আত্মপরিচয় এখনই দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই বিস্ময়কর নাটকীয় দৃশ্যের কি যে অর্থ মামজেল নাদু তাই ভাবছেন, হয়ত এই সেই লণ্ডনের গুপ্তচর। কিন্তু যেহেতু তিনি হাজির আছেন ও মুখ খুলতে পারছে না, একটু অস্বস্তি বোধ করছে। নিঃসন্দেহে সেক্রেটেরিয়াট গ্যারীকে ও একাই দেখবে মনে করেছিল হয়ত।

সে তাই বলে ওঠে—আমি বরং একটু কফি তৈরী করে নিয়ে আসি। এই বলে সে ভেতরে উঠে চলে গেল।

রান্নাঘর থেকেই মামজেল নাদু অটোহাস শুনে বুঝে নেয় তাহলে পরিচয় হয়ে গেল, ভালোই হল।

কফি হাতে নিয়ে যখন নাদু ফিরে এল তখন গ্যারী আর নূর বেশ ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতেই কথাবার্তা বলছে।

নাদুকে দেখে সে বলে—উনি আশা করেছিলেন যে আমি একজন বৃদ্ধা। তাই আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য এই কারনেশনগুলি এনেছেন।

এই কথায় দুজনেই মামজেল নাদুকে পুষ্পস্তবক উপহার গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

পরে জানা গেল নূর সমস্ত সময়টুকু ধরেই গ্যারীকে বোঝার চেষ্টা করছিল। বেশ লম্বা, মাথার চুল বাদামি এবং কোঁকড়ানো, মুখের আকৃতিতে দৃঢ়তার ছাপ আছে। চোখ দুটি অতিশয় কঠোর। ওকে দেখে মনে বিশ্বাস জাগে, তাই ও সহসা গুপ্তসংকেতটি (code) উচ্চারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যারী যথাযোগ্য উত্তর দেয়—

গ্যারী বা তার বাগ্‌দত্তা নাহু কেউই বুঝতে পারে না, কি করে 'বুদ্ধার' চিন্তা ওর মাথায় এলো। ওরা বলল—এখানে কোনো বুদ্ধাই থাকেন না। ওরা ছাড়া গ্যারীর বোন যিনি এই ফ্ল্যাটটিতে থাকেন, এ ছাড়া একজন দক্ষিণ আফ্রিকার কন্যাদী বিভাগের মেয়র আছেন, কোড্‌ হিসাবে তাঁর নাম "আতোয়ান"—আসল নাম আনথেলমে, আর তার ছদ্মনাম 'র‍্যাটিয়ার', ইনি সাধারণতঃ ওদের সঙ্গেই থাকেন। আজ রাত্রে তিনি বাইরে গেছেন।

নূর গতকাল ফ্রান্সে এসে পৌছানোর পর সব ঘটনার বিবরণ দেয়। লি যান ন্যায়ক একটি গ্রামের কাছে সে বিমান থেকে নেমেছে। এখান থেকে ট্রেনের পথ খুঁজে নিয়েছে। তারপর একটা ট্রেনে প্যারিসে এসেছে। এখনও পর্যন্ত সে কিছুই খায়নি। ওর ব্যাগে অবশ্য একটা নকল রেশন বই আছে। এটা লন্ডন থেকে ওকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিভাবে কুপনগুলি ব্যবহার করতে হয় তা ঠিক জানা নেই তাই ভেবেছে ওই কুপন এখন না ব্যবহার করাই ভালো। কারো কাছ থেকে না জেনে কোনো রেস্তোরাঁ বা কাউন্টারে কুপন হাজির করতে সাহস করেনি। সাহস করে শুধু একগুচ্ছ কারনেশন কিনতে পেরেছে।

মাযজেল নাহু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—সেকি! চব্বিশ ঘন্টায় আপনি কিছু খান নি?

—গতকাল বিকালে টংলণ্ডের মাটি ছাড়বার পর কিছু খাওয়া হয়নি!

—তা খালি পেটে এত দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে নিশ্চয়ই আপনার খিদে পেয়েছে। কিছুই খাননি?

—একটি কাফেতে এক গ্লাস তিক্ত ওয়াটার খেয়েছি।

—তাতে আর আপনার কি হবে?

—না, তবে ভাবলাম যে এর জন্য হয়ত কুপন চাইবে না। নূর এই কথা বলে হাসল।

মাযজেল নাহু বললেন—তাহলে ত' ক্ষিধে চেয়ে আরো অনেক কিছু আপনার প্রয়োজন?

এই কথা বলে তিনি রান্নাঘরে গেলেন কি পাওয়া যায় দেখার জন্য। দুঃখের বিষয় একটু আগেই খাওয়া দাওয়া শেষ করেছে ওরা। সেলফের চারদিক খুজে পেতে দেখতে লাগল অতি দ্রুত কি কি বানানো যায়, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি ডোঁয়া ওঠা প্লেট এনে হাজির করল।

নূর যেন দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মত গোগ্রাসে খেতে লাগল—তার খাওয়ার গতি দেখে মাযজেল নাহু রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আরো কিছু তৈরী করে নিয়ে এল।

যখন নূর খাচ্ছিল তখন ওকে নিম্নোক্ত সেকটর সম্পর্কে সামান্য কিছু বলল। গ্যারী ফ্রেনচ্‌ সেকসনের জন্য বছর খানেকের বেশী কাজ করছে। ও একজন ব্রিটিশ অফিসারের ভাবে কাজ করে, তাঁর কোড নাম 'প্রসপার'। মার্থে ডিপার্টমেন্টের ও চীফ অফিসার, তাই সে মানের কেন্দ্রস্থল মার্থে ওর সদর দপ্তর। ও অবশ্য প্যারিসে একটি বাসা-বাড়ির ঠিকানা ঠিক রেখেছে এবং প্রয়োজনানুসারে প্যারিস ও সে মানের মধ্যে যাতায়াত করে। কাজকর্ম চাপা দেওয়ার জন্য ওর একটি ভুয়া ভ্রমণপত্র আছে, তাতে ওর পরিচয় আছে ইঞ্জেকট্রো-সিমি অফ প্যারিসের ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৃত পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারই তার বৃত্তি। ওর কোড

নামকরণ করা হয়েছে—'সিনেমা', এই নাম পরে পরিবর্তন করে করা হয় "ফনো"—ওর অবশ্য ঘুরা নামের প্রয়োজন হয় না, এখন ও নিজের প্রকৃত নামটাই ব্যবহার করতে পারে।

প্রতিরোধ চক্রের অন্য অনেক ফরাসী কর্মীর পক্ষেও অবস্থা অনুরূপ ছিল। ব্রিটিশ অফিসারদের অনুপ্রবেশের জন্য দুরকম নাম প্রয়োজন হত। একটি মনাটের নাম, অর্থাৎ আইডেনটিটি কার্ডের (পরিচয় পত্র) নাম অপরটি কোড্‌ভুক্ত নাম।

ওরা নূরের কোড্‌-নাম জানত—'মদলিন' নূরের কোড্‌নাম। নূর এখন মনাটের নামটাও জানাল—"জিন-মেরী-রেনিয়ার"—ওরা শুনে বলল, আমরা গোড়া থেকেই 'জিন মেরী' বলে ডাকব। আসল নামটা ভুলে যাওয়াই শ্রেয়।

নূর বলল সে সম্প্রতি যাকে ছেড়ে এসেছে। মা জানেন না ওর অবস্থিতি। আর যাকে ছেড়ে আসতে ওকে রীতিমত একটা মানসিক সংগ্রাম করতে হয়েছে।

ওদের দুজনেরই মনে হল এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত কাজের পক্ষে ওরা একেবারে একজন ছেলেমানুষকে পাঠিয়েছে। ওদের মনে হয়েছিল, নূরের বয়স বিশ কিংবা একুশ, তার বেশী নয়।

ওরা জানতে চায় রাতটা কোথায় থাকবে কিছু ঠিক করেছ নাকি ?

নূর বলল—না-ত', কিছুই ঠিক নেই।

তখন ওরা বলল—তুমি আমাদের কাছেই থাক।

নূর এ প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ মেনে নেয়। প্রকৃতপক্ষে ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। খাদ্য এবং উষ্ণতার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, তা ছাড়া অন্ততঃ নিরাপদে বিশ্রাম করা যাবে এটাও কম স্বস্তির কথা নয়। বিশেষ করে একা একা একটি দিন ও একটি রাত যেভাবে দুঃসাহসিক অভিযানে কেটেছে। তারপর ওর চোখ ঘুমে বুজে আসছে। মাদমোজেল বাস্থ তৎক্ষণাৎ বিছানা করতে বলে গেলেন।

॥ গুপ্তচক্র ॥

যে ব্রিটিশ গুপ্তচক্রের সাহায্যের জন্য নূরকে লণ্ডন থেকে পাঠান হয়েছিল তার অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন "প্রসপার", ইনিই সংগঠক (প্রকৃত নাম—লেঃ কর্ণেল ফ্রান্সিস সটিল, ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যারিষ্টার), 'আর্কাম্বল' ইনি যেতায়বয়ের অপারেটর (প্রকৃত নাম যেজর গিলবার্ট নরম্যান),—কাজের সহায়ক হিসাবে একজনের প্রয়োজন, এই আবেদন তিনি জানিয়েছিলেন। আর চতুরকা হিসাবে 'ডেনিস' (প্রকৃতনাম মিস এনড্রি বোয়েল, এই তরুণীটি জাতিতে করাসী)। এরা তিনজনেই প্রধানতঃ প্যারিসে থাকতেন, কিন্তু ওদের কাজের সদর দপ্তর হলো একোল নাশন্যাল ও এগ্রিকালচার—রিসনমে, তার্সাই-এর উত্তর পশ্চিমে একটি ছোট্ট জায়গা, এর প্রাধান্য মূলতঃ কৃষি বিজ্ঞানের জন্য। এই স্কুলের কাজকর্ম মঁসিয়ে ভ্যানভাইভিংকট নামক এক ভদ্রলোকের পরিচালনায় চলত, তাঁর আড়ালেই এই গুপ্তচক্রের কাজকর্ম চলত 'প্রসপারের' নির্দেশে। প্রসপারের সংগঠনের আরো অনেকগুলি ভাগ ছিল। প্রফেসর আলফ্রেড সাজি বালাচোলস্কী, প্যাস্তুর ইনষ্টিট্যুটের অধ্যাপক। তিনি রিসনম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, যেমন লেফটেন্যান্ট গ্যারী সে মানের কেন্দ্রটির অধ্যক্ষ।

প্যারিসে পৌঁছানোর অল্পকাল পরে সম্ভবতঃ পর্ঁয়লই ডিসেম্বর মঁসিয়ে ভ্যানভাইভিংকটের অনুমতি

বালাচৌলকী সংগ্রহ করার পর 'আর্কাম্বল' নূরকে গ্রিনমনে নিয়ে এলেন। সন্ধ্যা নাগাদ নূর এসে পৌছাল, তার সঙ্গে মাদাম ভ্যানডারভিংকটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, তাঁর কন্যা দুটির সঙ্গেও পরিচয় হল, এছাড়া ছিলেন মাদাম বালাচৌলকী ও গুপ্তচক্রের অন্তর্ভুক্ত আগের দুটি তরুণী। পরিচয় বিনিময়ের পরে নূর বলে উঠল আমি আর্কাম্বলকে চিনি। ও সাঁ ক্লাউডে পড়াশোনা করেছে (নূরও এইখানে দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ নিয়েছিল) আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।

'জিন মেরী' (নূর) বেশ মিশে গেল ওদের সঙ্গে। তারপর তরুণীদের সঙ্গে রান্নাঘরে চা বানাতে গেল এবং একটি ট্রে হাতে নিয়ে ফিরে এল। সকলকে চা পরিবেশন করে ঐ ঘরেই পাউরুটি টোস্ট বানাতে লাগাল। ঘরের আগুনে রুটির টুকরোগুলি সেঁকতে থাকে। এই রুটিটা নূরই সঙ্গে করে এনেছে।

একজন তরুণী এই সব লক্ষ্য করে এবং চায়ের কাপে নূর প্রথমেই দুধ ঢেলেছিল বলে মাদাম বালাচৌলকী বলল—এই সব আচরণ দেখেই বলা যায় যে মেয়েটি ইংরাজ।

মাদাম বালাচৌলকী এই মন্তব্যটা জিন মেরীকে শোনালেন। তিনি বললেন ফ্রান্সে কেউ রুটি সেঁকে টোস্ট বানায় না, আর দুধটা শেষকালে ঢালে। ফরাসীদের কাছে দুধ আগে ভাগে চায়ের পাত্রে ঢালাটা ইংরাজী কেতা। এই সব ছোট-খাটো জিনিষেই মানুষ ধরা পড়ে যায়—এই হুঁসিয়ারীর জন্য জিন মেরী ওকে ধন্যবাদ জানালো।

একটু পরেই এলেন প্রোফেসর বালাচৌলকী। উনি ভাইনিং রুমে সদর কামরায় ফেলে আসা নূরের একটি পোর্টফোলিও ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি জানতে চাইলেন, এর ভিতর মূল্যবান কিছু আছে নাকি!

নূর বলল—লণ্ডন থেকে যে কোড্ এনেছি তা এই ব্যাগে আছে।

অধ্যাপক ওকে একটু মৃদু তিরস্কার করে বললেন—কখনই কোনো দরকারী কাগজপত্রসহ ব্যাগ এরকম অবস্থে রেখো না। আমি এটা কুড়িয়ে নিয়ে এলাম, অন্য কেউও নিতে পারত। আমি বা আমার সঙ্গীরা সবাই জানে এখানকার কর্মীরা সবাই বেশ বিশ্বাসী। কিন্তু এই বিশ্বাসের অনুষ্ঠান আগে ভাগে করে নেওয়া ঠিক নয়। এখন তুমি আর্মান অধিকৃত ফ্রান্সে এসেছ, তোমার জানা উচিত গেষ্টাপোর গুপ্তচর সর্বত্র আছে। এমনকি অনেক সময় যে সব জায়গা প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি বলে মনে করা যায়, সেখানেও ওদের লোক আছে। সর্বদা মনে মনে ভাববে যে তোমাকে চারদিক থেকে গেষ্টাপোর স্পাইরা ঘিরে আছে।

এরপর অধ্যাপক বালাচৌলকী নূরকে কয়েকটি কার্যকরী উপদেশ দিলেন, কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই উপদেশ।

মাদাম বালাচৌলকী ইতিমধ্যে নূরের আচরণে যে দু'একটি ইংরাজসুলভ বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছিলেন তার উল্লেখ করে সতর্ক করে দিলেন।

পরে অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আসার পর, প্রায় পাঁচটা নাগাদ, আর্কাম্বল নূরকে নিয়ে গ্রীন হাউসে গেলেন। এইখান থেকে তিনি বেতারে সংবাদ প্রেরণ করেন। আর্কাম্বলের নির্দেশনায় এবং তারই ট্রান্সমিটারে নূর সর্বপ্রথম অধিকৃত ফ্রান্স থেকে লণ্ডনে সংবাদ পাঠাল। ওর নিজের ট্রান্সমিটার এখনও এসে পৌছায় নি। (নূর ইংলণ্ড থেকে যাবার প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার নিরাপদ পৌছানো সংবাদ ও আর সব প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাতে পেরেছিল।)

মাদাম বালাচৌসকী পরে বলেন—জিন মেয়ী আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করার জন্য এতসব কথা বললাম মনে কোরো না, তোমার এবং আরো পাঁচজনের সুবিধার জন্যই তোমাকে যেসব কারণে গুপ্তচক্রের মানুষ বলা পড়ে যায় তার ইঙ্গিত দিলাম।

মাদাম অবশ্য বুঝেছিলেন যে জিন মেয়ী বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে তাঁর কথার অর্থ করবে না।

স্কুল বাড়িটা প্রকাণ্ড—অনেকখানি মাঠ জুড়ে স্কুলটা। প্রায় পনের ফিট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এর ভিতরেই আরেকটি প্রাসাদ আছে তাকে 'ভাটো' বলা হয়। মঁসিয়ে ভ্যানডারভিকেট সেখানে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে থাকেন, মঁসিয়ে ছাইলে ওঁর জামাইও এখানে থাকেন।

এইখানেই জিন মেয়ীকে একটি খাতার জন্য ঘর দেওয়া হল।

দুবেলা খাওয়ার সময় খাবার ঘরে যেন একটা বিরাট পার্টি বসে। সমবেত হয়েছেন সমগ্র ভ্যানডার-ভিংকট পরিবার ও সম্পর্কিতরা, প্রফেসর বালাচৌসকী ও তাঁর স্ত্রী, এছাড়া ব্রিটিশ দলবল রয়েছেন, জিন মেয়ী আসাতে দল বাড়ল। সবাই এসে টেবলে বসতেন। অনেক সময় মনে হত যেন একটি বিরাট পরিবার একই সঙ্গে যৌথ পারিবারিক জীবন যাপন করছেন। নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করছেন। চারদিকে যে এত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা তার মধ্যেও সবাই বেশ খোসমেজাজে খেলাধেলা করতেন ডাইনিং টেবলে বসে।

সর্বাধ্যক্ষ 'প্রসপার'কে সবাই বিশেষ করে ভালোবাসত। বালাচৌসকী দম্পতি ওঁকে বড় ভালো বাসতেন। মাদাম বালাচৌসকী বলতেন—ইংরেজ ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় ভদ্রলোক ঠিক তাই। মার্জিত, হাস্যিকজ্ঞানসম্পন্ন এবং সর্বদাই বিবেচক।

বালাচৌসকী দম্পতি এই প্রাসাদে থাকতেন না। ভিয়েনের সহরতলিতে এক আধুনিক প্রাসাদে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। এই সহরতলী ডানিউব-এর অপর পারে। তবুও এই গ্রিশনেই তাঁরা বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন।

জিন মেয়ী, নিজের বিষয় খুব অল্পই বলেছিল ওঁদের কাছে, ওর একটিমাত্র ভাই যে মেডিসিনে কাজ করে তা বলেছিল, আর বলেছিল যে সে এক সময় এয়ার কোর্সে কাজ করেছে। তারপর এই বিশেষ কাজের জন্য সে স্বেচ্ছায় আবেদন করেছিল। ওর নিজের প্রকৃত নাম হিসাবে 'নোরা বেকার' এই নামটা যে কেন ব্যবহার করেছিল কে জানে। সে বলেছিল এতদিন যার কাছেই ছিল, তিনি জানেন না যে ও এই কাজ নিয়েছে। তিনি জানেন যে ওকে নর্থ আফ্রিকায় পাঠানো হয়েছে। মেয়ের আচরণ লক্ষ্য করে সকলের মনে হয়েছিল যে তার যার জন্য সে খুব ভাবে, বিশেষ করে তাঁকে লুকিয়ে এসেছে তাই তার মনটার ওপর চাপ পড়েছে।

বালাচৌসকী দম্পতীর এই মেয়েটিকে ভারী ভালো লেগেছিল, বিশেষ করে তার সাহস এবং বিবেচনা। তবে প্রথম কয়েকদিন কিঞ্চিৎ একঙ্গেমি ছিল। ওরা দুজনেই জিন মেয়েটির মধ্যে সেমেটিক (ইহুদি সুলভ) লক্ষণ দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। মেয়েটি আংশিক ভাবে ভারতীয় এই তথ্য জানা না থাকায় ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন ও নিশ্চয়ই ইহুদী।

প্রফেসর বলেছেন—ওর মুখ এবং হাতের গড়ন একেবারে সেমেটিক ধরণের! তাই ইহুদি মনে হত।

"সিকারহাইটসডায়েনষ্টি" জার্মান পুলিশের গুপ্তচর সংস্থার নাম, তারা কয়াসী অংশে কাজ করত। 'জিন মেয়ী'র ইহুদি জাত্যাংশ কিনা এ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় নি। এ্যাডিল্ফ ক্রমে 'সিকারহাইটসডায়েনষ্টি' সংস্থার সমর প্রপ্তর—সেখানে ইহুদী বন্দীদের আর সব বন্দীদের সঙ্গে একই ধরণের

ব্যবহার করা হত। এখানে জাতের কথাটা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু বিশদ অনুধাবনে, তার এই ইঙ্গিতসূলভ আকৃতি গোটাপোর নজরে পড়তে পারে এবং যদি চেপে প্রশ্ন করে তাহলে ওর ছদ্ম পরিচয় ধরা পড়ে যেতে পারে।

যারা এই গুপ্তচক্রের বাইরে ছিল তাদের কাছে ওর পরিচয় ছিল অন্য রকমের। তারা সবাই জানত জিন মেয়ী স্কুলে পড়াশোনা করে।

জিন মেয়ী নিজের ট্রানসমিটারের অপেক্ষায় আছে তবে প্রতিদিনই আবহাওয়াবলের সঙ্গে কাজ করে। কোনো কোনো দিন পাশাপাশি বসে কাজ করতে হয় তাঁর সেটে—আবার কখনও ওঁকে ছুটি দিয়ে নিজে একা একাই কাজ করে। গ্রীণ হাউসে ওরা রবিবার বেলার নামক করাসী বাগানরক্ষকের নির্দেশনায় কাজ করত, এই লোকটি প্যারাসুট অবতরণকারীদের সাহায্য করত।

এক এক সময় সবাই একত্রে প্যারিস চলে যেত। ত্রিশননে আসার পরবর্তী রবিবার প্যারিসে এক বিরাট লাক পার্টির সে ছিল অন্যতমা। অনেকেই ছিলেন সেই আসরে। এছাড়া সে মাঝে মাঝে প্যারিসে এসে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যারী ও মার্গারাইট নাদু-র সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে যায়। দুবার সে প্যারীর বোন রিনির ঘরে রাত্রি যাপন করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়র আঁতোয়ান ফিরে এসেছেন এবং প্যারীদের বাসায়ও এবং নূরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ, নূরের সঙ্গে তিনি পিতৃস্নেহে সে যেন ছোট্ট মেয়েটি এইভাবে কথাবার্তা বলেন। মেয়র নিজের ছেলেমেয়েদের ছবি বার করে দেখালেন। তাদের সম্বন্ধে গল্প বললেন।

প্যারী, তার বাকদত্তা নাদু, আঁতোয়ান এবং নূরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বাপূর্ণ অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। নূরকে সবাই ভালোবাসত, তার অল্পবয়স আর আন্তরিকতার জন্য। এই মাসের শেষ দিনটিতে প্যারী ও তার বাকদত্তার সঙ্গে বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল। নূর ও আঁতোয়ানের আসা চাই-ই একথা বলেছিল প্যারীরা।

এই ক'দিনের ভিতরই প্যারী নূরের সঙ্গে একজন করাসী ভদ্রলোক মঁসিয়ে 'একস'-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। (ইনি নাম প্রকাশ করতে রাজী নন)। লোকটি বিরাট ব্যবসায়ী। প্যারী তাঁকে করাসী গুপ্তচক্রে আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়া আলাপ হয়েছিল মঁসিয়ে ভঁদেভিরের সঙ্গে, তিনি সোসিয়েৎ কাঁসে দেজিয়ো ইলেকট্রিক নামক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার। এঁরা প্রকাশ্যে আর্থানদের সহায়তা করতেন কিন্তু আসলে করাসী প্রতিরোধ বাহিনীর অনেককে এইভাবে গোপনে পালন করতেন।

তুইলারিসের হোতেল কঁতিনেন্তালের সামনে একটি বেঞ্চে এই চারজনের প্রথম পরিচয় হয়। এর কিছুদিন পরে মঁসিয়ে 'ওয়াই'-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মঁসিয়ে 'একস'। যেহেতু 'ওয়াই' 'একসে'র আত্মীয় সেইহেতু তিনিও নাম প্রকাশ করতে রাজী নন। মঁসিয়ে 'ওয়াই' একজন উকিল। 'একস', 'ওয়াই' আর ভঁদিভের এই ত্রয়ী একত্রে কাজ করতেন। নূর এঁদের সঙ্গে পরে অতিশয় ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করেছেন।

ছায়া কালো কালো

২১শে জুন সোমবার প্রকেসর বালাচৌলকী তার আরো কিছু অনুচর নিয়ে গেলেন রোণী অঁরস্ অনুরের কাছাকাছি একটি গ্রামের খামারে, সেখানে প্যারাসুটে কিছু জিনিষপত্র আসার কথা। জিন মেয়ীর জন্য দুটি তিনটি ট্রানসমিটার এবং সেই সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত জিনিষপত্র। এইসব জিনিষপত্র-নিয়ে

প্যারাসুটটা পড়ল একটা গাছের ওপর, ঠিক যেন ব্যাঙের ছাতার মত গাছটার মাথায় টুপি হয়ে পড়ল। প্রফেসর যখন তাঁর লোকজন নিয়ে পৌঁছলেন সেই জায়গায় তখন দেখলেন কেসটা একেবারে খুলে গেছে। জিনিষপত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ভোর পর্যন্ত সজাগ থাকতে থাকতে ওরা সেই সব জিনিষ উদ্ধার করল। প্যারাসুটের কারবারটাই বিপজ্জনক। যদিও অবতরণের জন্য গ্রামাঞ্চল নির্বাচিত করা হয়েছে তবু কেউ না কেউ প্যারাসুট আকাশ থেকে নেমে আসা দেখে ফেলতে পারে। যত শীঘ্র সম্ভব মালপত্র সংগ্রহ করে নেমে পড়াই ভালো। গাছে প্যারাসুটের টিকটুকু রাখতেও সাহস হল না ওদের।

সেই ভোরের দিকে জিন মেরীর জিনিষপত্র যথা স্থানে পুরে সেগুলি একটি পরিচিত স্থানে সাময়িক ভাবে রাখা হল। তারপর বালাচৌলকীর গাড়িতে প্যারাসুট ওঠানো হল. সেই গাড়ি দুইলে ড্রাইভ করে নিয়ে গেল গ্রিগনবে।

এরপর বৃহস্পতিবার জাহিন দ্য লুকসেমবার্গের কোয়ারার কাছে প্রফেসর ও মাদাম বালা-চৌলকীর সঙ্গে একটি সভা বসল। ওদের সঙ্গে দেখা হতেই মাদাম বালাচৌলকীর হাতে সে রোজীর একটা প্ল্যান দিল। এই প্ল্যানে রোজির খামারের কাছে একটি জায়গা × চিহ্নিত করা ছিল। সেখানে ওঁর স্বামীর কাছ থেকে উপযুক্ত সংকেত চিহ্ন পেলে প্যারাসুটের মালপত্র যা সোমবার পাওয়া গেছে তা দেওয়া হবে।

এইরকম প্রকাশ্য স্থানে জিন মেরী একটা কাগজ তাঁর হাতে দেওয়ায় মাদাম অত্যন্ত ভড়কে গেলেন। তাঁর মনে হল জিন মেরী ফ্রান্সের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তিনি বল্লেন: জানো এখানকার অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে কেউ যদি প্রকাশ্যে কারো হাতে একটা চিঠি দেয় তাহলে সেটিও খুলে দেখা হবে। সর্বত্র গুপ্ত পুলিশ ঘুরছে। তারা সব দেখে আর সব জিনিষের কারণ জানতে চায়। যার সঙ্গেই দেখা হোক তাকে গেষ্টাপোর এজেন্ট বলে জানবে। পথে, ঘাটে, আনডারগ্রাউণ্ডে, রেস্তোরাঁয় সর্বত্র। ওদের গায়ে লেখা থাকে না কিছু জানো, ওদের আরো পাঁচজনের মতই দেখতে। মনে করো, এখন যদি কেউ ঐ চিঠিটা দেখতে চায়?

একথা শুনে জিন মেরী বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এরপর মাদাম বালাচৌলকীর সঙ্গে ওর প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা চলল। তিনি কি রকম সতর্কতা পালন করা উচিত তার নির্দেশ দিলেন। বললেন:

—এরপর যদি কাউকে কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে শুধু বলবে "আপনাকে একটা জিনিষ দেব", এরপর নিজেদের জানা কোনো বাড়িতে দেখা করে গোপনে সেটা দেবে।

জিনিষপত্র গ্রিগনবে এসে পড়ার পর প্রফেসর নূরকে সে সব দিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে তার জামা পত্র, তার অবস্থা জীর্ণ হলেও নূর খুশী হল।

সেই সপ্তাহের শেষে অনেক ধরপাকড় হল, ফ্রান্সে গেষ্টাপোর এই সবচেয়ে বড় আকস্মিক আক্রমণ। নানা জায়গায় ছড়ানো কেন্দ্রে একই সময়ে জার্মান গেষ্টাপো অনুসন্ধান চালানোর ফলে মনে হয় তাদের নতুন কর্মকেন্দ্র সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই যথেষ্ট খবর ছিল।

২৪শে জুন বৃহস্পতিবার প্রফেসার, (জার্মানীতে ফাঁসী হয়), অর্কাম্বল। গুলি করে মারা হয় বন্দী শিবিরে), ও ভেনিসে (ইনজেকসন দিয়ে মারা হয় বন্দীশিবিরে)—এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ম দিয়ে আর মাঝার তুয়ে-ম রেস্তোরাঁয় এরা খাওয়া দাওয়া করত, তা ছাড়া চিঠিপত্র সোপনে এখানেই আসত। এদেরও গ্রেপ্তার করা হল।

প্রফেসর বালাচৌদকী নূরকে বললে—তুমি এখনই প্রিসনন থেকে চলে যাও। এর পরেই হোটেল তল্লাসি হবে। উনি বা ওঁর স্ত্রী আর সেখানে ফিরবেন না। শুধু ডাইরেকটর মঁসিয়ে ভ্যানডারভিকেট আর তাঁর স্ত্রীকে থাকতেই হবে।

প্রফেসর উপদেশ দিলেন তুমি প্যারিসে একটা ঘর ঠিক করে নাও। নিজের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখো। এই গ্রেপ্তার তরঙ্গ কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে। সবচেয়ে বড় ক'জনকেই তো ওরা পাকড়াও করেছে!

গায়ী নূরের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে একাধিক ব্যক্তির একত্র থাকা চলবে না, তাই নূরকে ওদের সঙ্গে থাকার জন্য আমন্ত্রণ করল না। পরিবর্তে সে সীনে নিবের তরুণ ও এ্যাক্টিভ নামক এক বিরাট মহিলা বিপত্নীক মালিক মাঝার আইত্রেনকে অনুরোধ করে তাঁর কাছে জিন মেরীকে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। তাঁর ফ্লাটটা ফ এর ল্যাণ্ডারের খুব কাছে, ফলে নূর দুটো বাড়ির মধ্যে সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

এইসব বিপদ্ধ সত্ত্বেও লেফটেন্যান্ট গায়ী ও মার্গারিট নাদুর বিবাহ পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী ২৯শে জুন মঙ্গলবার সম্পন্ন হল। আঁতোয়ানের একজন সাক্ষী হওয়ার কথা ছিল। আগেরদিন সন্ধ্যায় ওরা হাসাহাসি করেছে যে তাকে গ্যাটিয়ার এই ছদ্মনামে সই করতে হবে। পরদিন প্রাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল -নূর অবশ্য বিয়ের সময় উপস্থিত ছিল।

নববিবাহিত দম্পতি সেই রাতে ফিরে নিজেদের ফ্লাটে নিশাযাপন করলেন। আঁতোয়ান একটু সুস্থ হয়েছে মনে হল।

পরদিন প্রাতে গায়ীদের গায়ে সেট লেজায়ে যেতে হল। ওরা ফিরতেই বাড়ির কাঁসিয়ার্জ (চৌকিদারনী) চুপি চুপি বলল—সেক্টাপোর লোক এসে গ্যাটিয়ারকে খুঁজছে, ওপরে ওদের ফ্লাটে গিয়েছে। ওরা আসার একটু আগেই মঁসিয়ে গ্যাটিয়ার বেরিয়ে গেছেন।

ওদের প্রথম কর্তব্য হল আঁতোয়ান আর জিন মেরীকে আগেভাগে সতর্ক করা। নূর আগে চলে গেছে। আজ ওরা প্যারিস থেকে চলে গেল। ওদের এই সপ্তাহ শেষে সেখানে যাওয়া দরকার ছিল। ওদের বাড়িতে এই হানা দেওয়ার পর স্থির হল তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো হল। বাড়িতে ফ্লাটে যা ছিল কাপড় চোপড় অন্যান্য জিনিষ একেবারে হাত ছাড়া হয়ে গেল, কারণ সেখানে যাওয়ার উপায় নেই।

মাঝার বালাচৌদকীর মনে আছে যে এই বুধবার প্রভাতে জিন মেরী হঠাৎ ওদের বাসায় এসে পড়েছিল। সে প্যারিস থেকে সাইকেলে ভিরোফ্লে এসে হাজির। সে বলতে এসেছিল যে গায়ীদের সঙ্গে সে সেখানে যাবে। পরদিন আঁতোয়ান এসে ওদের কাজ করবে। বালাচৌদকী অবশ্য আঁতোয়ানকে দেখতে পায়নি। আঁতোয়ান একজন উচুদরের অফিসার, অবশ্য তাঁর এই পরিচয় অনেকের কাছে অজানা ছিল।

জিন মেরী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, বিশ্রী ঠাণ্ডা লেগেছে, হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। যে নখ ওষুধপত্র সে ব্যবহার করেছে তার বিবরণ দিয়ে সবাইকে হাসিয়েছে। যদিও সে পরিহাস রসিক ভাব

বজায় রেখেছিল, তথাপি আগের শনিবার ব্রিটিশ গুপ্তচক্রের অনেকে ধরা পড়তে নূর অতিশয় শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

তার সংবাদ জানিয়ে ও বলল এখন গ্যারীদের কাছে ফিরে যাবো।

বালাচৌলস্কী বলেন—ওদের ফ্ল্যাটে? তার আগে বরং একটা ফোন করে জেনে নাও অবস্থাটা কি। যাওয়া ঠিক হবে কিনা জানা দরকার।

নূর বলল—কাল পর্যন্ত সব ঠিক ছিল, আমি ওদের বিয়েতে গিয়েছি কাল।

—তার মানে এ নয় যে সব কিছু আজও ঠিক আছে। এখন পর্বতাই অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রতিদিনই কত গ্রেপ্তার চলছে। টেলিফোনে জেনে নাও গেষ্টাপো কাল রাতে কি আজ প্রাতে এসেছিল কিনা।

এই হুঁশিয়ারির জন্য ওদের ধন্যবাদ দেয়। বলল বেশ তাই করব। সে ওদের বৈঠকখানা থেকে ফোন করতে গেল, কিন্তু মাদাম বললেন না—না না, এখান থেকে নয়। এই ফলটা কোথা থেকে হচ্ছে ধরা যাবে, তার পরই—ওরা এখানে আসবে। প্যারিস গিয়ে পাবলিক কলবক্স থেকে ফোন করবে। আর গ্যারী কিংবা আঁতোয়ান ছাড়া অন্য কারো কণ্ঠস্বর যদি তুমি শোনো, যিনি বলবেন যে তিনি গ্যারীরই বন্ধু তাহলে বুঝে নিয়ো যে ফ্ল্যাট গেষ্টাপোর কবলে এবং আর সেখানে যাবে না।"

মনে হয় নূর এই উপদেশটা গ্রহণ করেছিল, কারণ সে ফ্ল্যাটে যায় নি। এইভাবে মাদাম বালাচৌলস্কীর দূরদৃষ্টি ওকে সে যাত্রা গ্রেপ্তারের হাত থেকে ত্রাণ করেছে।

ইতিমধ্যে গ্যারীও আঁতোয়ানকে ধরতে পেরে সতর্ক করে দেয়, সুতরাং গৃহচ্যুত হয়ে সেও মাদাম আইগ্রেপের বাসায় এসে নূরের সঙ্গে যোগ দিল। আস্তানাটা ক এভন্যুদারের কাছাকাছি হওয়ায় একটু অসুবিধা হল।

গেষ্টাপো এসে যখন র‍্যাটিয়ারকে খুঁজেছে তখন আঁতোয়ানের পক্ষে পথে বেরোন অনুচিত। গ্যারীদের মত আঁতোয়ানকেও তার সব সম্পত্তি বিসর্জন দিতে হল, শুধু যা অঙ্গে ছিল তাই। মাদাম আইগ্রেপ এখন এই দুই ব্রিটিশ গুপ্তচরের জননীর কাজ করছেন। এদের একজনকে গেষ্টাপো এখনই খুঁজছে। দুজনের কারোই শরীর আবার ঠিক নেই।

গ্যারীরা সেইদিনই সেখানে চলে গেল—সেখানকার বাড়িউলিকে বলল—ওরা দুজনে নববিবাহিত, মধুযামিনী যাপন করতে এসেছে, প্রকৃত কাজকর্মের উদ্দেশ্য চাপতে যে মিথ্যা ও রচনা করল তাও অংশতঃ সত্য।

পরদিন অপরাহ্নে বৃহস্পতিবার ১লা জুলাই তারিখে বেলা দুটোর সময় গেষ্টাপো ব্রিগনলে এসে হাজির হল। আশি-পঁচাশীজন ইয়ম-ট্রুপার ফুলবাড়ি ঘেরাও করল। ভ্যানডারভিংকট এবং ডাইলেকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই সঙ্গে আরো অনেককে। এঁদের দুজনকেই জার্মানীতে হত্যা করা হয়।

এইদিন নূর প্রফেসর বালাচৌস্কীর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ব্রিগনলে এল। তার ট্রান্সমিট করার জরুরী প্রয়োজন, লণ্ডনে খবর পাঠাতে হবে। সে ভেবেছিল এত কাণ্ড সত্ত্বেও হয়ত গ্রীণ হাউস থেকে ট্রান্সমিট করা যেতে পারে।

সে সাইকেল চেপে ফুলে গেল, একটা ঝোপের আড়ালে বাইসাইকল রাখল। তারপর প্রায় পা টিপে টিপে ফুলের ভিতর ঢুকল। ভিতরে পা দিতেই বুঝল, অবস্থাটা সুবিধের নয়। সমস্ত বাড়িটা ইয়ম-ট্রুপারে

অধিকার করে ফেলেছে জেনে সে তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। (এ কথা বহুই পরে ব্রেজককে বলেছিল) এবং সাইকেলের মায়া ছেড়ে একটি চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল—সেই বাসে চেপেই গিয়ে পৌঁছাল এবং সেইখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে প্যারিস ফিরে এল।

এইদিন সমস্তক্ষণ বালাচৌসকীরা আঁতোয়ানের জন্য অপেক্ষা করেছেন।

প্রায় মধ্যরাত্রে হাল ছেড়ে দিয়ে ওরা শুয়ে পড়লেন।

পরদিন শুক্রবার ২রা জুলাই। ওঁরা ব্রেকফাস্টে বসেছেন এমন সময় সদরে ঘণ্টা বেজে উঠল। ওঁরা উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় কাঁচের ভিতর থেকে বেশ লম্বা চওড়া একজন ভারী ফরাসীতে প্রফেসর বালাচৌসকীর কথা বললেন—

মাদাম বালাচৌসকী বলে উঠলেন—এই যে আঁতোয়ান, প্রফেসর সোজা গিয়ে বলতে সুরু করলেন—আপনার জন্য আমরা কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি।

সেই লোকটি কিন্তু গেস্টাপোর এবং ওঁকে গ্রেপ্তার করতেই এসেছিল। (প্রফেসর নির্বাসিত হয়েছিলেন বুকেনওয়ালডে পরে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পান।)

মাদাম বালাচৌসকী এই ব্যাপারে অতিশয় বিস্মিত হলেন। (পরে তিনি এ্যাভিন্যু ফসে গেস্টাপোর সদর দপ্তরে গিয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রতিরোধ বাহিনীর কি সম্পর্ক। তার জবাবে তারা বলে—আপনাকে ধরিনি কারা স্ত্রীলোক বলে—আর আপনি আপনার স্বামীর কার্যকলাপ ঠিক জানেন না।)

গেস্টাপোর লোকজন তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

বাড়িতে রইলেন দাসী আর মাদাম।

এখন মাদামের দায়িত্ব অনেক। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে তাঁর স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর সবাইকে সম্ভব হলে ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করতে হবে। উনি দাসীকে বললেন—তুমি ফোন নিয়ে বসো। যে কেউ ফোন করবে তাকে ঘটনাটি জানিয়ে দেবে আর আসতে মানা করবে। এরপর চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে কেউ কোথায় তাঁর ওপর নজর রেখেছে কিনা বেশ করে বুঝে তিনি চললেন আর সবাইকে সতর্ক করতে। তাঁর হিসাবে এইভাবে তিনি প্রায় তিনজনকে বাঁচিয়েছেন নিশ্চিত গ্রেপ্তারের হাত থেকে।

বেলা এগারোটা নাগাদ নূর ফোন করল যে সে ভিয়েনা থেকে ট্রেনে আসছে। দাসী তৎক্ষণাৎ তাকে জানালো যে প্রফেসর গ্রেপ্তার হয়েছেন সে যেন না আসে। মাদামের কাছে নূর সম্পর্কে এইটুকুই সর্বশেষ সংবাদ।

১৪ই জুলাই রবিবার, মাদাম বালাচৌসকী ব্রিসনবে গিয়ে সেখানকার হাঙ্গামার সম্পূর্ণ সংবাদ পেলেন। শুক্রবার চারটে-পাঁচটার সময় ইয়র্ক-ট্রুপারও এসেছিল। সেই দিনই সন্ধ্যায় ওরা ঐ অঞ্চলের আরো সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। প্যারিসে বালাচৌসকীদের পরিচিত পঁচিশ-ত্রিশজন গ্রেপ্তার হলেন।

অল্প কিছুদিনের ভেতর ঐ অঞ্চলের গুপ্তচক্র কিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তার সংবাদ পাওয়া গেল। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রচুর।

প্যারিসে নূর এবং আঁতোয়ান এই বিপর্যয়ের মধ্যে কোনো রকমে সে যাত্রা বেঁচে গেছে। এরা মাদাম আইগ্রেণের ফ্ল্যাটে কোনো রকমে আত্মগোপন করে রইল। আঁতোয়ান একেবারেই বেরোতে

পারেন নি কারণ ৪০ নম্বর ক আরদাজার অতি নিকটে। নূর নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে বেরিয়েছে এবং মাঝে মাঝে লণ্ডনে ট্রান্সমিশন করেছে এবং বিপক্ষের পুরো সংবাদ পাঠিয়েছে।

লণ্ডনের গুপ্তচক্রের কর্তা সেঃ কর্ণেল মরিস বাকমাসটার যিনি নূরকে এই কাজে নিয়েছিলেন তিনি বললেন—সবাই যখন গ্রেপ্তার হয়েছে তুমিও ইংলণ্ডে চলে এসো, তাহলে ফ্রেঞ্চের বন্দোবস্ত করা হবে।

বাকমাসটার অবাক হয়ে গেলেন শুনে যে ও প্যারিসেই থাকতে চায়। সবাই ধরা পড়েছে বলে ওর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তাই এখানে থাকাই প্রয়োজন, কারণ প্যারিস অঞ্চলে সেই একমাত্র ওয়্যারলেস অপারেটর, ও যদি চলে যায় তাহলে ওয়ার অফিস এখানকার কোনো সংবাদ পাবেন না। কিন্তু নূর জানতো না সেঃ গ্যাসটন কোহেন নামে আরেকজন ফ্রেঞ্চ সেক্সন অপারেটর আছেন।

বাকমাসটার বুঝলেন অবস্থাটা গুরুতর। হাতাহাতি 'পোষ্ট-মর্লিন' (নূরের গুপ্ত নামাঙ্কিত কেন্দ্র) ফ্রান্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। নোরা বা নূর বা মর্লিন যদি থাকে তাহলে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা কিন্তু সামরিক দিক থেকে তার থাকাটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, সে নিজেই যখন আত্মদানে রাজী তখন বাকমাসটার স্থির করলেন তার পক্ষে থেকে যাওয়াই ভালো।

তিনি অনুমতি দিলেন। তবে বললেন উপস্থিত ট্রান্সমিশন বন্ধ রাখাই ভালো, কারণ ওর ট্রান্সমিশন যন্ত্র একটিমাত্র হওয়ার ফলে গেষ্টাপোর পক্ষে তা ধরে ফেলা সহজ হবে। সে সর্বদাই লণ্ডন থেকে প্রেরিত সংবাদ গ্রহণ করতে পারে কারণ তা ধরার কোনো উপায় নেই।

॥ বিপদের বেড়াজাল ॥

নূরের জীবনের পরবর্তী অংশের একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করা কঠিন। বহুসংখ্যক সূত্র থেকে যারা তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখেছে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে তবে তার ধারাবাহিকত্ব সঠিক নয়।

জুলাই মাসের প্রথম অংশে মাদাম আইগ্রেণের কাছেই ছিল এই সংকটময় মুহূর্তে নূরের ভীষণভাবে ঠাণ্ডা লাগে, সে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ তার বিছানায় শুয়ে থাকার কথা। এই শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও সে ট্রান্সমিট করার উপযোগী ঘর খুঁজতে থাকে। এই ঘরটির কাছে একটি গাছ থাকবে যাতে ট্রান্সমিটারটার তার ঝোলানো যাবে। এই রকম একটা ঘর পেলে নিয়মিত কাজের সুবিধা হবে। এই কালে গোড়ার দিকে সে একদিন মাদাম আঁদ্রিয়েৎ রেণীর দরজায় এসে হাজির হল। উনি এক সময় হার্প বাজানো শেখাতেন নূরকে, তারপর ন'বছর আর দেখা হয়নি।

মাদমোজেল রেণী বলেছেন কে যেন তার ফ্ল্যাটের ঘন্টা বাজালো। দরজা খুলে দেখলেন—সেই ছোট্ট নূরটি, অনেক দিন তাকে দেখেন নি।

মাদমোজেল রেণীর বিশ্বাস এবং স্নেহ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত।

নূর বলল—একটি ঘর বা একটি কুঁড়ে ঘর হলেও চলবে, তাহার সন্ধান দিতে পারেন ?

ফরাসী ভদ্রমহিলা বললেন—তুমি ত' আমার কাছেই থাকতে পারো।

শান্ত শিষ্ট নূর যে এভাবে একা একা এইখানে এসে দেখা করবে তা মাদমোজেল রেণী ভাবতেই পারেন নি।

নূর বলল—আপনার সঙ্গে থাকার অসুবিধা আছে। ফরাসী মহিলা কারণটা বুঝতে পেরেছেন, নূর ভয় করছে ওঁর ওপর অত্যাচার হতে পারে।

নূর বলল—আমি প্যারিসে এসেছি একটা ওয়্যারলেস পোস্ট বসাতে যার দ্বারা ইংলণ্ডে সংবাদ পাঠানো যেতে পারে।

—কিন্তু ধরা পড়লে তুমি যে মারা যাবে!

—আমি জানি, আমি যার জায়গায় কাজ করছি তাঁকে গুলি করে মারা হয়।

নূর তার গলেলা কণ্ঠে আবার বলে—জানেন, লণ্ডনে ওরা একজন ফরাসী-ভাষা ভদ্রলোককে খুঁজছিল যে প্যারিস সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। আমি বললাম আমি এ কাজের উপযুক্ত আর এই আমি এখানে। জানি, এর জন্য একটা ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, কারণ যারা এই কাজ করে তাদের এই শোচনীয় পরিণতি।

এর পর একটু থেমে আবার বলে :

আপনাকে দেখে আমার ভারী আনন্দ হয়েছে, আপনাকে তাই চুমা দিচ্ছি। তবে আমি এখনই যাচ্ছি। কারণ আমাকে যদি কেউ অনুসরণ করে থাকে তাহলে আপনারও বিপদ ঘটতে পারে—আমি আপনার বিপদ ঘটাতে চাই না—

এই বলে মাদমোজেল রেনীর কাছ থেকে একটু মিষ্টি হেসে ও বিদায় নেয়।

এর পর ওকে দেখেছেন মাদাম সলোমন-প্রটারস পরিবারের বিবাহিতা কন্যা। লুয়েসনেতে ওদের বাড়ি, নূরদের ফ্রান্সের বাড়ি 'ফজল মানজিল' থেকে মাত্র দুচারটি বাড়ির মধ্যে। নূর সাইকেলে যাচ্ছিল এমন সময় উনি ডাকলেন—নূর—নূর!

নূর এইভাবে নিজের নাম শুনে তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে পিছিয়ে এল।

মাদাম সলোমনকে দেখে নূর হাসল, তারপর বলল—চলুন একটা গলির ভেতর যাওয়া যাক।

একটা নির্জন গলির ভিতর নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ও কি কাজে প্যারিসে এসেছে তা জানালো। সে বলল এখন ওর ছদ্মনাম জিন মেরী। কেউই জানেনা ওঁর নাম নূর।

মাদাম সলোমন রাস্তায় এইভাবে চীৎকার করে ডাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন—তিনি বললেন—তোমাকে এইভাবে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখাটা এত স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে তোমরা যে প্যারিস থেকে চলে গেছ একথা মনেই হয়নি। তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি।

নূর একটু হাসল। সে সামান্য ছদ্মবেশ ধারণ করেছে বলা যায়। কারণ তার চোখে ছিল কালো চশমা। তার অঙ্গে ছিল একটা পরমকালের সাধারণ ফ্রক।

নূর বলল—আমি সবে এসেছি। একটা ঘর খুঁজছি।

মাদাম সলোমন বললেন—আমার সন্ধানে কিছু নেই তাই। তবে সন্ধান পেলেই জানাবো। আমি গোপনে একটি জার্মান-বিরোধী পত্র প্রকাশনার গোপন সংগঠনে যুক্ত আছি। তার নাম মুভমেন্ট ন্যাশিওনেল।

স্থির হল দুজনে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। মাদাম সলোমনের মতে এই সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৮ই জুলাই।

এরপর আগস্ট, সেপ্টেম্বরের দুটি মাস নূর নানা ভাবে কাজ চালিয়েছে, সমানে লণ্ডনে সংবাদ পাঠিয়েছে এবং বরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

এ্যাভিন্যু ফদ প্যারিসের একটি চমৎকার প্রশস্ত রাজপথ, আর্ক ড ট্রায়ম্ফ্ থেকে বেরিয়ে বোই ড বুলোঁর দিকে এগিয়ে গেছে। এই পথে বিরাট বে-সরকারি প্রাসাদ আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি জার্মানরা অধিকার করে বসে আছে। তাই এর বাঙ্গ করে নাম করা হয়েছে এ্যাভিন্যু ফদের বদলে 'এ্যাভিন্যু বস'। ৮২, ৮৪ ও ৮৬ নম্বর বাড়িগুলিতে গেষ্টাপো, সিকিউরিটি সার্ভিস প্রভৃতির সদর দপ্তর। গেষ্টাপোর চীফ হলার অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক কাইকার এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান ডাঃ স্কিল্ড্, সমগ্র ফ্রান্সের জন্য এই দুই গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তা জেনারেল ওবার্গ হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্বে কাইকার ছিল পুলিসের অফিসর, এ ছাড়া তার গুপ্তচর বৃত্তির ইতিহাস অষ্ট্রিয়ার সঙ্গেও জড়িত।

আরনেষ্ট ছিলেন একজন বেসরকারি স্বেচ্ছাবাহিনীর কর্মী। বাবেনে তাঁর বাড়ি।

সুইস মহিলা। দুজের চোদ্দ বছর আগে থেকেই তিনি প্যারিসে বাস করতেন।

১৯৩৯-এ ফরাসীরা তাঁকে অন্তরীন করেন। ১৯৪০-এ জার্মানরা ফ্রান্সে এসে তাঁকে মুক্তি দান করে। ফরাসী এবং ইংরাজী উভয় ভাষায় তাঁর দক্ষতা থাকায় তাঁকে কাইকারের অধীনে কাজ দেওয়া হয়। আরনেষ্ট গোয়েন্দাগীরি কাজও করবেন স্থির হল। তিনি অবশ্য ওপরওলা নন, এবং সরাসরি হুকুম জারিরও কোন অধিকার তাঁর ছিল না, এদিকে আবার কাইকার ভিন্ন কেউই তাঁকে হুকুম করতে পারবেন না।

অকটোবর মাসের প্রথমার্ধে ইষ্টর-ইুপার ট্রায়ম্ফ কাইকার এই আরনেষ্টকে বললেন যে একজন অজ্ঞাতনামা ফরাসী মহিলা তাঁকে জানিয়েছেন যে একটা মূল্যবান তথ্য তিনি জানাবেন সুতরাং ত্রোকোদারোর পিছনের বাগানে ফরাসীভাষী কাউকে পাঠালে তিনি তাকে সব বলবেন। কাইকার আরেষ্টকে বললেন যে তিনি তার নাম বলবেন মাঁদ্রি আর তাঁর বগলে থাকবে একটি সচিত্র পুস্তিকা। আর মহিলাটি তাঁর নাম বলবেন 'রিনি'। তাঁর জামায় ফুলপোঁজা থাকবে এবং বিশেষ পোষাক পরা থাকবে। তিনি আরনেষ্টকে যেতে বললেন এবং রক্ষী ওর্গেকে বললেন পিস্তল হাতে নিয়ে তুমি দূর থেকে লক্ষ্য রাখবে।

আরনেষ্ট যথাসময়ে গিয়ে দেখলেন সেই বর্ণনামাফিক মহিলাকে, তিনি যখন বললেন 'মাঁদ্রি' তখন মহিলাটি বললেন 'রিনি'—

রিনি বললেন—আমার টাকার প্রয়োজন। আমি মদলিন বা জিন মেয়ী বা নূরকে উপযুক্ত মূল্য পেলে ধরিয়ে দিতে পারি।

আরনেষ্ট ত অবাক। মদলিন যে একজন মহিলা রেডিও অপারেটরের নাম তা তিনি জানতেন। এ নাম শুধু ফ্রেঞ্চ সেকসনের মানুষের জানার কথা। যাচাই করার জন্য তিনি বললেন এই মদলিনটি কে? মহিলাটি বললে ফোনোর রেডিও অপারেটর।

আরনেষ্ট জানতেন স্যারীর কোড নাম, 'ফোনো' তাই 'রিনি' যে সত্যকথা বলছে একথা তিনি বুঝলেন।

আরনেষ্ট বললেন, ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ ফ্রাঁ এই সহায়তার জন্য আপনাকে দেব।

নিজের সততার প্রমাণ স্বরূপ নূর সম্পর্কে আরো কিছু গোপন কথা 'রিনি' বললেন। ৯৮ রুয় কাইসারেস্টীর গোপনাবাসের তত্ত্বাবধানে জিন মেয়ী বেগমিয়ারকে পাওয়া যাবে।

মহিলাটি অনুরোধ করলেন গোপনাবাসে যেন গ্রেপ্তার করা না হয়। আরনেষ্ট কথা দিলেন

বেশ ভাই হবে। তবে জিন মেয়েকে যেন এই ঠিকানায় সোলানজের অনুপস্থিতি বা তার বাড়ির বাইরে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বললেন বেশ, ফ্ল্যাটটি যেদিন খালি থাকবে বা মর্দলিন একা থাকবে সেইদিন ফোন করবে। পরদিন সে আবার ফোন করে একটি কাফেতে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানালো। বললে—সোলানাজ এবং মর্দলিন দুজনই এখন বাইরে। যদি এখনই আসেন তা' মর্দলিনের ফ্ল্যাট এবং তার টানসমিটারটা দেখিয়ে দেব।

তারপর আয়নেস্কোকে তিনি সব দেখালো, রান্নাঘরে রাখা টানসমিটারটা ও দেখিয়ে দিল।

এরই দু তিন দিন পরে 'তিনি' আয়নেস্কোকে সকালের দিকে ফোন করে জানালো যে সোলানজ বাইরে গেছেন সমস্ত দিনের মতো, মর্দলিনও বাইরে গেছে তবে একটু পরেই ফিরবে।

এই তারিখটা সম্ভবতঃ ১৩ই অক্টোবর। আয়নেস্কো তৎক্ষনাৎ সংবাদটা কাইকারকে জানালেন, কাইকার হুকুম দিলেন পীয়ের কারত্যাকে (পিটার) সঙ্গে নিতে। পিটারকে ঘরের ভিতর আটক রাখবে, সে ঘরের ভিতরই থাকবে আর মর্দলিন (নূর) যেই ফিরবে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করবে।

বেলা সাড়ে নটার সময় আয়নেস্কো পীটারকে সঙ্গে নিয়ে গেল রু গু লা কাইসানজিয়েরে, গুপ্ত জায়গা থেকে চাবি নিয়ে দরজাটি খুলে তার ভিতর পিটারকে রেখে আবার দরজা বন্ধ করে চাবিটা গুপ্ত জায়গাতেই রাখলেন। চাবি রাখার এই গুপ্ত জায়গাটা তিনি আগে দেখিয়ে দিয়েছিল। তারপর আয়নেস্কো এ্যাভিন্যু ফদে ফিরে গেল।

পিটার দরজার পাশে লুকিয়ে রইল। যথা সময়ে নূর (মর্দলিন) ফিরল। তৎক্ষনাৎ দুটি কব্জি ধরে তাকে আটকালো পিটার। মর্দলিন অনেক ধস্তাধস্তি করেও যখন ছাড়াতে পারল না তখন পিটারের কব্জিটা কামড়ে ধরলো। পিটার ওকে না ছেড়ে দিলে কামড় সামলাতে পারে না, সে চীৎকার করে কামড়িও না, আহা করো কি ? ছাড়ো ছাড়ো। নূর কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়, সে আরো জোরে দাঁত বসায়, ফলে রক্ত বেরোতে সুরু হয়।

দু'জনের অবস্থাই অচল অটল। পরিশেষে মর্দলিন ওর হাত ছেড়ে দেয় পিটার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাহু দিয়ে ওকে একা সোফার ওপর ঠেলে দেয় এবং তার হাতে হাতকড়া পরাবার উদ্যোগ করে, কিন্তু এমনই বিক্রমে নূর বাধা দিচ্ছে যে পিটার কিছুতেই তাকে আটকাতে পারছে না। অবশেষে পিটার পকেট থেকে রিভলবার বার করে বলে—যেখানে আছো সেখানেই থাকো নইলে গুলি করবো। একহাতে ওকে রিভলবার দেখিয়ে অপর হাত দিয়ে টেলিফোনটা বাগিয়ে কাইকারকে ফোন করে অবস্থাটা জানায় এবং অতিরিক্ত সাহায্য প্রার্থনা করে।

কাইকার আয়নেস্কোর অফিসে এসে তাকে পিটারের সাহায্যে যেতে বললেন। আয়নেস্কো ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল অবস্থাটা পিটার যখন ফোন করেছিল ঠিক সেইরকমই আছে।

দৃশ্যটা রীতিমত হাস্যকর।

পিটার ওকে ঘিরে ঘরের দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে আর মর্দলিন (নূর) কৌচে বসে এমনভাবে হাত পা ছুঁড়ছে যেন একটা জীবন্ত বাঘিনী।

ওরা যখন ঘরে এল তখন নূর ওদের তাকিয়ে বলল-বলেন—(আর্যানদের প্রতি ঘৃণাসূচক নাম) এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক অপমানজনক গালাগাল দিতে লাগল। আয়নেস্কো তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতায় এমন উগ্রতা আর দেখেনি।

নূর আন্তরিক ভাবে বলে—শেষ মুহূর্তে, আর ক'দিনের মধ্যেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে যেতাম।

আয়নেষ্ট দেখল পিটারের হাত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। মহলিনের (নূর) খুব কাছে না এসে আয়নেষ্ট তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। সে বলে—তুমি আমার সঙ্গে শান্তভাবে এসো। কারণ বাড়ির লোকজন যদি হৈ-হৈ শুনতে পায় তাহলে লোলানজকে গ্রেপ্তার করতে আমি বাধ্য হব নিরাপত্তার কারণে।

অবশেষে নূর রাজী হল। ওকে চারজনে মিলে সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল। ওর হাত দুইল আয়নেষ্টের হাতে, এটাও তারই নির্দেশ। সেইসঙ্গে ওরা নূরের ব্রেফকেস সেটটা (রান্নাঘর থেকে) এবং শোবার ঘরের ড্রয়ার থেকে কিছু নোটবই ও অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে গেল।

ওরা যে গাড়িতে এসেছিল সেটি একটু দূরে রেখেছিল, যাতে বাড়ি থেকে নজরে না পড়ে। তারপর নূরকে এ্যাডিছা ফলের পাঁচতলায় নিজের অফিসে নিয়ে গিয়ে জেরা সুরু করে।

কোনো কিছু প্রশ্ন শোনার আগেই নূর বলে—

আপনি জানেন আমি কে? কি করছিলাম! আপনারা আমার ব্রেফকেস সেটটাও নিয়েছেন। আমি আপনাদের কিছুই বলব না তবে একটি কথা আমার বলার আছে, আমার অনুরোধ আমাকে যত তাড়িতাড়ি সম্ভব গুলি করে মারুন।

আয়নেষ্ট বলে ওঠে—না, তা হয় না। তোমাকে গুলি করে মারতে দেব না আমি।

এরপর কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য অনুনয় করে। নূর একটিও প্রশ্নের উত্তর দেবে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেও যখন কিছুই হল না তখন আয়নেষ্ট হুকুম দিলেন ওকে নিয়ে গিয়ে সেলে আটক রাখো, পরে বিকালে দেখা যাবে।

নূর বলল—আচ্ছা আমাকে স্নান করতে অনুমতি দেবেন? আয়নেষ্টের কাছে এই অনুরোধ কিঞ্চিৎ অদ্ভুত মনে হয় একেবারে ভর দুপুরবেলা এইরকম অবস্থায় স্নান, কিন্তু যেহেতু সহযোগীতার প্রয়োজন ওকে একটু সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন তাই বললেন—নিশ্চয়ই, আর কি প্রয়োজন আছে বলতে পারো।

আয়নেষ্ট একজন গার্ডকে হুকুম দিলেন—ওকে স্নানের ঘরে নিয়ে যাও। বন্দীদের যখন স্নান করতে দেওয়া হয় তখন দরজাটা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করতে দেওয়া হয় না, একটু খোলা রাখার জন্য একটি ইট দরজার মাঝে আটকানো থাকে। এই ফাঁকটুকু দিয়ে গার্ড বাথরুমের ভিতর নজর রাখে। নূর (মহলিন) এই ইট দেখে ত' আগুন। বলল- এখনই ইট হটাও। গার্ড কিছুই বোঝে না, এরা সাধারণতঃ কয়েদির বা কম বুদ্ধ বন্দী। কোনো ভাষাই বোঝে না। তাই সে আয়নেষ্টকে ডেকে আনে। নূর তাকে বলল যে আমি পূর্ণাঙ্গ স্নান করতে চাই, সমস্ত পোষাক খোলা প্রয়োজন, এই দরজা যদি চেপে বন্ধ না করা হয় তাহলে কি করে কি হবে!

আয়নেষ্ট গার্ডকে বললেন—আচ্ছা ইট হটাও।

গার্ড বলল—দায়িত্বটা আপনার কিন্তু!

আয়নেষ্ট বললেন—বেশ।

বললেও মনটায় তেমন স্বস্তি বোধ করলেন না আয়নেষ্ট তাই একটি প্রস্রাবাগারের ভিতর থেকে এই ঘরে নজর রাখল।

আয়নেষ্ট বাথরুমের দিকে তাকাতেই দেখে নূর (মহলিন) জামাকাপড় খুলে বেরিয়ে একেবারে ভিজে

ছাতের পাঁচীলে উঠে পড়েছে, তার পাশেই খানা। ও পাঁচিলের উপর দিয়ে হাঁটছে। একটু পা পিছ্‌লিয়ে গেলেই পড়ে যাবে পাঁচতলার নীচের খানায়। নূর টালি ধরে ধরে হাঁটছে।

আরনেষ্ট আতংকিত হল। খানাটা ত' হাত কয়েক উঁচুতে, ও একেবারে পাঁচতলার নীচে পাথরে আছাড় খাবে ও যদি তাকে তাহলে ভড়কে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে যেতে পারে।

সে কাছাকাছি গিয়ে অতিশান্ত গলায় বলে—মদলিন, বোকামি কোরোনা, তুমি মরবে। তোমার মার কথা মনে করো। বরং হাতটা এগিয়ে দাও আমি তোমাকে ধরি।

নূর একেবারে শাদা হয়ে গেল, ইতস্তত: করতে থাকে। আরনেষ্ট ভাবে ও পড়ে যাবে। হঠাৎ ও হাতটা এগিয়ে দেয়। নূর হাতটা ধরল। আরনেষ্ট তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রিসেপশন রুমে আটক রাখল।

এই দুর্বল মুহূর্তে নূর বলেছিল—আমি যখন নীচে খানার দিকে তাকিয়েছিলাম তখন ভেবেছি মৃত্যু বা পলায়ন দুটির মধ্যে একটি, জানিনা কেন আপনার হাত ধরেছি—আপনি হাত বাড়িয়েছেন বলেই আমি অন্যমনস্ক ভাবে ধরে ফেললাম।

এই বলে মদলিন কাঁদতে থাকে। আরনেষ্ট তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

এরপর বলুন—আমি তীক্ষ্ণ। আমার উচিৎ ছিল পড়ে যাওয়া।

এই ভাবে সে কাঁদতে থাকে যে বোঝা যায় সে কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করতে পারছে না। একঘণ্টা আগে সে অনুরোধ করেছে গুলি করে মারার জন্য আর যখন মরার সুযোগ এসেছে তখন সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

আরনেষ্টের মনে পড়ল ওর পরিচিত আর্কাদিবল এই বাড়িতেই অন্য ঘরে বন্দী হয়ে আছে। তাকে ডেকে আনা হল তার সেল থেকে। তাকে বলা হল ওকে শান্ত করতে, বোঝাতে হল সুইসাইড করার প্রয়োজন নেই। আর্কাদিবল এসে বোঝাতে চেষ্টা করে যতটুকু পারে। পরিশেষে কিঞ্চিৎ শান্ত হল নূর। আর্কাদিবলকে আবার তার সেলে নিয়ে যাওয়া হল!

বাথরুমে যেতে গিয়ে আরনেষ্ট দেখলেন যে ও বাথরুমে প্রবেশ করে দরজাটা ভিতর থেকে এঁটে দিয়েছে। দরজাটা শেষ পর্যন্ত ভাঙতে হল।

দুপুরে মদলিন লাঞ্চ খেতে রাজী হল না।

সন্ধ্যায় আরনেষ্ট অর্ডার দিলেন দুজনের জন্য ডিনার ওঁর ঘরে দিতে, সঙ্গে থাকবে, বিলিতি চা, বিলিতি সিগারেট। কাইদারকে জানালো এই সব ব্যবস্থা মদলিনের জন্য। রাত আটটার সময় মদলিনকে সেল থেকে এনে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন। যে সব জিনিষ আনতে বলেছিলেন তা অবশ্য এসেছিল মদলিন কিন্তু কিছুই খেল না। চা-টুকু অবশ্য গ্রহণ করলো, আর যতক্ষণ ছিল অনেক সিগারেটও খেয়েছে।

আরনেষ্টই সব সময় কথা বলল। আরনেষ্ট তাকে দেখালো তার নোট বুক থেকে সব-কথার অর্থ বার করা হয়ে গেছে। এরোপ্লেনে যে হাতে লেখা রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তার ফটোগ্রাফ, ওর মাকে লেখা চিঠিটা দেখে ও কেঁদে ফেলল। তখন আরনেষ্ট বলল—ফ্রেঞ্চ সেকশন সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি। এর সর্বাধ্যক্ষ মরিস বাকমাস্টার। তাঁর অফিস লণ্ডনে অরচার্ড কোর্টে। আরনেষ্ট আরো কয়েকজন সহযোগীর নাম বলল। এরা লণ্ডনে কাজ করে।

মদলিনের (নূর) এসব কথা শুনে চক্ষু চড়কগাছ। সে বলে ওঠে—আপনাদের নিশ্চয়ই লণ্ডনে এজেন্ট আছে। নইলে এতসব জানলেন কি করে।

আরনেষ্ট বলে—হয়ত।

এইভাবে প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত দুজনে কথা বলে। কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে পারেন না আরনেষ্ট।

আরনেষ্ট অবশেষে বললেন—এখন আমি শুতে যাবো। তোমাকে নেলে রেখে আসছি। তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও। কাল আবার দেখা হবে।

তার পরদিন সকালে আবার প্রশ্নোত্তর। কিন্তু নূর কিছুই বলে না। কে বলে—আমিই কিছুই জানি না। আরনেষ্ট বলল—মহলিন, এইসব লোকজনদের মধ্যে সবাই যে ঠেক সেকসনের অন্তর্গত তা নয়, অনেকের অপরাধ হয়ত লাঘব। কেউ হয়ত একটি রাতের মত আশ্রয় দিয়েছে, কেউ কোনো কারণে বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি যদি কিছু না বলো তাহলে তাদের শাস্তিটাও গুরুতর হবে। তাদের সবাইকেই ধরতে বাধ্য হব।

আরনেষ্ট লক্ষ্য করে এই কথা বলে সে নূরের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি করতে পেরেছে।

আর একটু বেলা বাড়তেই মোয়েৎস মহলিনকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন সুরু করলেন, ওর জাজকর্মের কারিগরি কিকটুকু নিয়ে। কিন্তু থানিক পরে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বলল—এ এক অদ্ভুত স্ত্রীলোক। কিছুই বলবে না। এমন মেয়েমানুষ আমি আর আগে দেখিনি।

শরতের-পুলীমাখা শিউলি ফোটার দিনগুলো
আপনার জীবনে আনুক
নতুন আনন্দ

আপনার সুখ ও সমৃদ্ধি আমাদের কাম্য

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

ই. ভি. কানসারা
কাষ্টোডিয়ান

পি. কে. মিত্র
রিজিওনাল ম্যানেজার
(কলিকাতা শাখাসমূহ)

আরনেষ্ট আবার ওকে নিয়ে বসে, সমস্ত দিন ধরে কত কথা হল, সহিষ্ণুতা সহকারে ওকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়।

সন্ধ্যার পর কাইকার এসে আরনেষ্টকে প্রশ্ন করে কি কতদূর হল ?

—আরনেষ্ট বলল—কিছুই নয়।

কাইকারের হাতে একটা কাগজ ছিল। সেটির অর্থ করার জন্য নূরকে আদেশ দেয়—

মহলিন (নূর) এর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে—আপনাকে আমি কিছুই বলব না, ওকে যা বলেছি তাও বলবো না। আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। আমি আপনার চোখের ভাষা বুঝি।

কাইকার চটে গিয়ে আরনেষ্টকে বলে—ওকে কবে ঘুটো-চারটে চড় লাগাচ্ছো না কেন ! আরনেষ্ট বলল—তাহলে ও আমাকে কোনো কিছুই বলবে না।

কাইকার রেগে চলে গেল।

আরনেষ্ট বলল—তুমি কেন বড় কর্তাকে চটিয়ে দিলে ?

—আমার কাছে সবাই সমান। আমি গ্রাহ্য করিনা কাউকে।

আরনেষ্ট আবার চেষ্টা করেন সন্ধ্যা পর্যন্ত তারপর ওকে সেলে পাঠিয়ে দিলেন।

আরনেষ্ট শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিলেন যে ওর নাম—নোরা সেকার। আর হেলেন এগার কোর্সের সে একজন লেফটেন্যান্ট। এইটুকু সংবাদ নিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের কোনো লাভ নেই।

আরনেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন নূর তার প্রকৃত পরিচয় দিক। সে যে ভারতীয় এই কথা বলুক। বলেন যে সে প্রয়োজন বোধে ভারতীয় উপাধিগুলি ব্যবহার করতেও পারে।

আরনেষ্ট বলেছেন কাইকারের সঙ্গে যদি অমন দুর্বিনীত আচরণ মহলিন (নূর) না করতো তাহলে হয়ত তার প্রাণটাও বাঁচানো যেত। কিন্তু নূর অতিশয় সততা দেখাতে গিয়েই সর্বনাশ করল।

এরপর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে তার জেরা হয়েছে। আরনেষ্ট প্রতিদিন কথা বলেছেন এক ঘন্টা দু ঘন্টা করে, কখনো বা আরো কম।

একদিন সন্ধ্যায় আরনেষ্টের একটি নিমন্ত্রণ নূর গ্রহণ করলো। ডিনারে নূর বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন। কয়েকটি গল্প বলল, এমন কি দুজনে হাসাহাসিও করেছে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো গোপন খবর প্রকাশিত হয়নি।

আরনেষ্ট বুঝলেন মেয়েটি যথেষ্ট শিক্ষিত এবং মার্জিত। একদিন তিনি বললেন—মহলিন তুমি কি কখনো ভাবোনি যে তোমার মত মেয়ের পক্ষে এই ভাতীয় কাজ নেওয়া উচিত হয়নি। এটা একেবারে অশোভন। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং চতুর মেয়ে। এই কাজ না নিলে তুমি কত ভালো কত মহৎ কাজ করতে পারতে।

নূর মাথা নাড়ে—আমাকে যদি আবার আমার কাজ ফেরে নেওয়ার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি এইকাজই নেব।

—এখানকার এইসব অবস্থা দেখেও। বুঝতে পারছো যে আমরা ফ্রেঞ্চ সেকসনের যারো আমা জানে করেছি, তোমার এই আত্ম ত্যাগের কি দাম ?

—তাতে কিছুই এসে যায়না। আমি আমার দেশের কাজ করেছি, সেই আমার সান্ত্বনা।

এই উক্তি থেকে মনে হয় নূর ইংলণ্ডকেই তার স্বদেশ মনে করত।

উপসংহার ॥

'মদলিন' এক অসাধারণ কাহিনী। 'মদলিন' বা নূর ইনায়েৎ খান একজন শান্তি পরায়ণা তরুণী। সে সহসা ফ্রান্সে ব্রিটিশ এজেন্ট বা গুপ্তচরের কাজ নিয়েছিল। এই কাজে যে সাহস ও শৌর্যের পরিচয় নূর দেয় তা প্রায় অবিশ্বাস্য। তার মৃত্যুর পর তাকে জর্জ ক্রস এবং প্যারিসের 'ক্রোয় দ্য গয়ের' এই সম্মানে সম্মানিত করা হয় এবং যেহার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার (M, B. E.) এই সম্মানও দেওয়া হয়। (এই উপাধির জন্য একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে নূরের ভারতীয় উদ্ভব ব্রিটিশ সরকার মেনে নিয়েছেন।)

নূর ইনায়েৎ খানের পিতা টিপু সুলতানের কয়েক পুরুষ অবতন ভারতীয় সুফী সম্প্রদায় ভুক্ত পীরজাদা ইনায়েৎ খান ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সঙ্গীতবিদ এবং সুফী মতে দীক্ষা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য খণ্ডে সুফীবাদ প্রচারের দায়িত্বভার পান। তাঁকে তাঁর গুরু পীর ও মুরশীদ সায়েদ আবু হাসেম মুদকী একজন পাশ্চাত্য মহিলাকে বিবাহ করে পশ্চিম জগতে সুফীবাদ প্রচার করতে বলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই থেকে লুাইয়র্কে যান এবং নূরের জননী মিস ওরা রে বেকারকে তিনি বিবাহ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেমলিনে ১লা জানুয়ারী তারিখে নূর উন-নিসার জন্ম হয়। নূর রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে এবং শিক্ষালাভ করেছে ফ্রান্সে। বাল্যকাল থেকেই নূর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেছে এবং সেই সঙ্গে পড়েছে কোরাণ ও বাইবেল। নূর নিজে হার্প বাজাতে পারত ও সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী ছিল। সে কিছু উপকথা এবং রূপকথা রচনা করেছে। সেইসব গ্রন্থ ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নূর ইনায়েৎ W. A. F. F. বাহিনীতে যোগ দেন ও পরে ফ্রান্সে রেডিও অপারেটরের কাজে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। ১৯৪৩-এ তাকে গোপনে ফ্রান্সে অবতরণ করানো হয়। সেই সময় মিত্র শক্তির এক মহা সংকটকাল। কিছুকাল কাজ করার পর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ফরাসী গুপ্ত চক্রের ব্রিটিশ ক্ষেত্রের প্রায় সবাই ধরা পড়ে যায়। গেষ্টাপো নূরকে অনেক পীড়ন করেও কথা আদায় করতে পারেনি। সে দুবার পালাবার চেষ্টা করে। ফলে তাকে জার্মানীতে পাঠানো হয়। পরে তাকে জার্মানীতে একটি ক্ষুদ্র কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়। এর প্রায় দশমাস পরে তাকে দাচাউ-এ নিয়ে গিয়ে গুলীকরে মারা হয়।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই আশ্চর্য মনোবল সম্পন্ন সাহসী তরুণীর জীবনকথা এক আশ্চর্য উপন্যাসের মতো হৃদয়গ্রাহী। ভারতবর্ষে নূর ইনায়েৎ খান সম্পর্কে আলোচনা এই প্রথম। আমরা অজস্র তথ্যের মধ্যে সামান্য কিছু অংশ এই উপন্যাসোপম কাহিনীতে পরিবেশন করলাম। বিস্তারিত কাহিনী সুদীর্ঘ, তাই কিছু নাটকীয় ঘটনা এই আলোচনায় পরিবেশিত হল।

লাহুলের বিবাহপ্রথা

শান্তু মহারাজ

হিমালয় দেবালয়, সে শিবালয়। ধারণাটা হয়তো নিখো নয়। পৃথিবীতে কোথাও যদি দেবভূমি বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা হিমালয়—দেবাত্মা হিমালয়।

কিন্তু হিমালয় শুধু দেবভূমি নয়, সে মানুষের বাসভূমিও বটে—লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর তারা হিমালয়ে বাস করছে সুদূর অতীত থেকে। দুর্ভাগ্যের কথা সমতলের অধিবাসীরা তাদের বড় একটা খোঁজ-খবর রাখেনি। সাধন-ভজন ও তপস্যার প্রয়োজনে সমতলের শত শত মানুষ যুগে যুগে হিমালয়ে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। তীর্থের প্রয়োজনে হাজার হাজার সমতলবাসী প্রতিবছর হিমালয় দর্শন করেছে। হিমালয়ের মানুষরা তাদের পথ দেখিয়েছে, মাল বয়েছে, সেবা করেছে। বিদায় বেলায় চোখেও জল ফেলেছে। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা তাদের মনে রাখেনি। হিমালয়বাসীদের বাদ দিয়ে হিমালয়কে মনে রাখা যায় না। তাই হিমালয়ের সঙ্গে সমতল ভারতের কোন স্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আর সে সম্পর্ক আজও সুদৃঢ় নয়।

সমতল ভারতের সমাজ হিমালয়ের সমাজকে আশ্রয় না দিলেও গিরিপ্রাচীরের অন্তরালে হিমালয়ের প্রতি উপত্যকায় ছোট ছোট সমাজ গড়ে উঠেছে। তারা নিজেরাই নিজেদের আচার-বিচার ও নিয়ম-কানুন নির্দ্ধারণ করেছে। তেমনি একটি উপত্যকার কথাই আজ বলতে বসেছি আমি।

এই উপত্যকার নাম লাহুল—চন্দ্রা ও ভাগা নদী বিধৌত লাহুল। এখন হিমাচল প্রদেশে, আগে ছিল পাঞ্জাবে। সুন্দর ও সুন্দর এই উপত্যকা হিমালয়ের বিচিত্রতর সৃষ্টি। সুউচ্চ এবং রুক্ষ এই উপত্যকার পুবে স্পিতি ও পশ্চিমে চাম্বা, উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণে কুলু আর চাম্বা উপত্যকা। ইদানিং লাহুল এবং স্পিতি নিয়ে নতুন একটি জেলা হয়েছে। লাহুলের মধ্যাঞ্চলে ভাগা নদীর তীরে অবস্থিত কেলং জেলা-সদর।

বছর দুয়েক আগেও শীতকালে প্রায় পাঁচমাস লাহুল স্পিতি ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। কারণ যে কয়েকটি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে সেখানে পৌঁছন যায়, তার সব কটি প্রবল তুষারপাতে অগম্য হয়ে উঠত। এখন মানালী থেকে রোতাং গিরিবর্ত্মের (১৩,৪০০´ ওপর দিয়ে প্রশস্ত যানপথ নির্মিত হয়েছে। প্রকৃত পরিশ্রম করে শীতকালেও এই পথ সুগম রাখা হচ্ছে।

কিন্তু এখনও লাহুল-স্পিতি হিমালয়ের সবচেয়ে অপরিচিত উপত্যকাগুলির অন্যতম। তবু আজ আমি লাহুলের কথা লিখছি কারণ এই অপরিচয়ের ব্যবধান ঘোচাতে মাত্র কয়েকদিন আগে সুজয়া ও কমলা লাহুলের মাটিতে জীবনদান করেছে। ২৫শে জুলাই ওরা কলকাতা থেকে মহিলা লাহুল অভিযানে রওনা হয়েছিল। ওরা বাংলার ছয়টি তরুণী—সুজয়া গুহ (নেতৃ) সুদীপ্তা সেনগুপ্তা (সহ-নেতৃ), কমলা সাহা, নীলু ঘোষ, সেফালি, চক্রবর্তী ও ডাঃ পূর্ণিমা শর্মা। সুজয়া, সুদীপ্তা ও কমলা ২১শে অগাস্ট ২০,১৩০ ফুট উঁচু লাহুল-হিমালয়ের একটি নামহীন শৃঙ্গে আরোহণ করে। মূল-শিবির থেকে ফিরে আসার সময় করচা নালা পার হতে গিয়ে সুজয়া ও কমলা তলিয়ে যায়। সুজয়ার মৃতদেহ পাওয়া গেছে কিন্তু কমলাকে আর পাওয়া যায়নি খুঁজে। ৩০শে অগাস্ট কেলং শহরের উপকণ্ঠে সুজয়ার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে যাদের জীবনে জীবনের চেয়ে হিমালয় বড় ছিল, তারা হিমালয়ের কোলে চিরকালের মতো আশ্রয় নিয়েছে। তাদের

মতান মৃত্যু বাঙালীকে মহাজীবন দান করেছে। যে লাহুলের উদার-উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে সুরমা ও কমলার মহাপ্রয়াণ হয়েছে, সেই লাহুলের কথা লিখে আজ আমি তাদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

এবারে লাহুলের কথায় ফিরে আসা যাক্। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী লাহুলের লোকসংখ্যা ১৪,১৭৭ জন। এদের মধ্যে ৮,৬৯২ জন পুরুষ আর ৬,২৮৫ জন স্ত্রীলোক। কাজেই কলকাতার ছোট একটি পল্লীর জনসংখ্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে গোটা লাহুলী সমাজ। কিন্তু সে সমাজ সুদূর অতীত থেকেই তার সামাজিক নিয়ম-কানুন স্থির করে নিয়েছিল।

লাহুল-হিমালয়ের অভিযানের সদস্যাগণ
বাঁদিক থেকে—সুরমা গুহ (নেতৃ—দাঁড়িয়ে), কমলা সাহা (বসে), ডাঃ পূর্ণিমা শর্মা
সুদীপ্তা সেনগুপ্তা (সহ-নেতৃ), সেফালি চক্রবর্তী ও নীলু ঘোষ।

[ফটো—হিমালয়ে ফেডারেশনের সৌজন্যে

সেকালে লাহুলে কেবলমাত্র বড় ছেলেরাই বিয়ে করত। ছোট ভাইরা বৌদির অনুমতি নিয়ে বাড়িতে থাকতে এমনকি সহবাস পর্যন্ত করতে পারত। কিন্তু সন্তান-সন্ততিরা সর্বদা বড় ভাইয়ের পরিচয়ে পরিচয় দিত। বৌদি সম্মতি না দিলে দেওরদের গুম্ফায় গিয়ে বাস করতে হত। কোন কারণে বড়ভাইয়ের অকালমৃত্যু হলে তার পরের ভাই গুম্ফা থেকে বাড়ি এসে সংসারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করত। বলাবাহুল্য চাষের জমির স্বল্পতার জন্য জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনে লাহুলী সমাজ এই ব্যবস্থা করেছিল।

কিছুকাল থেকে অবশ্য এই বহুপত্নি প্রথা এবং অবিবাহিত থাকার নিয়ম বন্ধ হয়েছে। এখন সাহলে প্রায় প্রত্যেক পুরুষই বিয়ে করে। কিন্তু বিবাহ প্রথার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই বিচিত্র বিবাহ প্রথাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

সাহলী সমাজে সাধারণত মা-বাবা কিম্বা পরিবারের লোকেরাই বিয়ে ঠিক করে। তবে ওরাও প্রেমে পড়ে এবং প্রেমিক প্রেমিকেরা অনেক সময়ে বাপ মায়ের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করে। অনুমতি না পেলে তারাও পালিয়ে যায়। তবে কয়েক দিন বাদে ঘরে ফিরে আসে। তখন কিন্তু অধিকাংশ পিতা-মাতাই ছেলে-মেয়েকে সানন্দে ঘরে নিয়ে যায়—তাদের আশীর্বাদ করে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা সাধারণত বাপ-মায়ের পছন্দ অনুসারেই বিয়ে করে থাকে। কারণ পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাকে সমাজ ভাল চোখে দেখে না।

সামাজিক বিয়ের প্রথম পর্বে ছেলের বাবা এক ঘড়া 'ছাং' তথা দেশীয় মদ নিয়ে মেয়ের বাড়িতে আসে। মদের ঘড়া মেয়ের বাবাকে উপহার দিয়ে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। মেয়ের মা তখন ছুটে যায় মেয়ের কাছে। মেয়েকে জানায় এই প্রস্তাব। মেয়ে রাজি না থাকলে সে আর বাড়ির বাইরে ফিরে আসে না। মেয়ের বাবা তখন ছাং-এর ঘড়া ফিরিয়ে দেয় ছেলের বাবাকে। সমস্ত ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

মেয়ে অমত না করলে, প্রতিবেশীদের ডেকে এনে মহা সমারোহে ছেলের বাবার দেওয়া ছাং-এর সদ্ব্যবহার করা হয়। তারপরে কিছুদিন বাদে বাদে আরও দুবার ছাং আদান প্রদান হয়। তৃতীয়বারে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে একটি টাকা দেয়। এই টাকাটি গ্রহণ করার পরেই সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়। বিয়ের দিন ঠিক হয়।

বিয়ে হয় বরের বাড়িতে। বিয়ের দিন বর বাড়িতে বসে থাকে। কিন্তু তার চাল-তরোয়াল যায় কনের বাড়িতে। বরের আত্মীয়-স্বজন শোভাযাত্রা সহকারে কনের জামা কাপড়, গয়নাগাটি, মিঠাই ও ছাংয়ের সঙ্গে তার চাল-তরোয়াল নিয়ে যায়। মেয়ের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে পাত্রীর আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা করতে থাকে। দু'পক্ষ মিলিত হয়। কিছুক্ষণ ধরে মদ্যপান চলে। বে-সামাল হবার পরে শুরু হয় তর্ক-যুদ্ধ। তবে তার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে।

যেখানে কনেপক্ষ বরপক্ষীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সেখান থেকে মেয়ের বাড়ি পর্যন্ত পথের ধারে একুশটি পাথরের স্তূপ তৈরি করা হয়েছে। মদ্যপানের পরে দু'পক্ষই তার প্রথম স্তূপটির সামনে এসে দাঁড়ায়। কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে একটি প্রশ্ন করে। তারা যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে স্তূপটি ভেঙে ফেলে দু'পক্ষ দ্বিতীয় স্তূপের কাছে আসে। আর যদি না পারে, তাহলে প্রথম স্তূপটি অক্ষত থাকে। এবং বরপক্ষকে তীব্র পরিহাস সহ্য করতে হয়। এবং এইভাবে প্রশ্নোত্তর ও স্তূপ ভাঙার পালা চলে। একুটি প্রশ্ন এবং উত্তরের পরে তারা কনের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়। এই সব প্রশ্ন এবং উত্তর একখানি স্থানীয় ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে। দু'পক্ষই বিয়ের আগে সেই বইখানি খুব ভাল করে পড়ে নেয়।

মেয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের শেষ পরীক্ষা হয়। পাত্রীপক্ষ আগেই একটি তেড়া মেষে তার হৃৎপিণ্ডটি কোথাও পুঁতে রেখে দিয়েছে। তারা ছড়াগানের মধ্য দিয়ে জায়গাটি বলে দেয়। বরপক্ষের জনৈক বীরকে তখন বরের তরোয়াল দিয়ে একটিমাত্র খোঁচায় তেড়ার সেই হৃৎপিণ্ডটিকে তুলে আনতে হয়। সাধারণত ছড়াগান শুনে জায়গাটার হদিশ পাওয়া যায় না। তাই বরপক্ষকে অনেক বাড়ির কাউকে পাঠিয়ে জায়গাটি জেনে নিতে হয়।

এই পরীক্ষায় পাশ করার পরে বরপক্ষ কনের বাড়িতে প্রবেশ করে। দু'পক্ষ গোল হয়ে বসে। বরপক্ষ তখন উপহার দেবার। পান ও ভোজনপর্ব শুরু হয়। তারপরে মেয়ের বাবা পনের টাকা ও জিনিসপত্র দেয়। বলাবাহুল্য তার আর্থিক অবস্থার ওপরে দানের পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণত কিছু জামা-কাপড়, বিছানা পত্র, একটি গরু কিম্বা চমর ও টাকা অর্থাৎ নতুন সংসার পাততে যা লাগে, সবই দেওয়া হয়। আর যাই দিতে পারুক, বরপক্ষ তাতেই খুশি হয়।

অবশেষে কনেকে নিয়ে আসা হয় বরের বাড়িতে। প্রতীক্ষারত পাত্রের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে কিন্তু তার প্রতীক্ষার অবসান হয় না জীবনসঙ্গিনীর শ্রীমুখ দর্শনের জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কারণ কনে বরের বাড়িতে ঢুকতে পারে না। বলা তো যায় না আসার পথে যদি কোন অশরীরী আত্মা তার ওপর ভর করে থাকে! কাজেই বিয়ের মিছিল বরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমেই বরের পূর্বপুরুষদের কারও আত্মাকে আহ্বান করে কনের কাঁধের কুড়কে তাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়। বর তারপরে কিছুক্ষণ ধরে ভগবানের কাছে সেই একই অনুরোধ করে। প্রার্থনার শেষে সে একটি মেষশাবক নিয়ে ঘরের চালে ওঠে। সেখান থেকে সেই নিরীহ মেষশাবকটিকে শোভাযাত্রীদের সামনে ছুড়ে ফেলে দেয়। অর্থমৃত মেষশাবকটিকে ঘিরে তারা হত্যা করে। তার হৃৎপিণ্ড এবং যকৃৎ টুকরো টুকরো ভাগ করে কাঁচা খেয়ে ফেলে। একদিকে যখন এই নৃশংস ব্যাপার চলেছে, আর একদিকে তখন চলেছে ধর্মচর্চা। জনৈক লামা একখানি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে মন্ত্রপাঠ করতে থাকেন। তাঁর একহাতে ধর্মগ্রন্থ আরেক হাতে ছোট মাটির পাত্রে একটি মনুষ্য মূর্তি। পাঠ শেষে তিনি সেই মূর্তিটি ভেঙে ফেলেন। ধ্যান ভঙ্গ ভাঙানো হয়ে গেল। তখন সকলে নিশ্চিন্ত মনে কনেকে নিয়ে বরের বাড়িতে প্রবেশ করে। বরও নিশ্চিন্ত হয়।

লাহুলে বিয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা আছে। তবে সাধারণত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের তার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। অনেক সময় ছেলে-মেয়ে জন্মাবার পরেই তাদের বাপ-মায়েরা বিয়ে ঠিক করে রাখে। বড় হবার পরে ছেলে কিম্বা মেয়ের আপত্তি হলে অবশ্য সে বিয়ে ভেঙে যায়। এ ধরণের ঘটনা যদিও খুব বেশি ঘটে না। সাধারণত লাহুলের ছেলে-মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মায়ের মতকে মেনে নেয়। না মানলে, সমাজ তাকে ভাল বলেনা।

স্ত্রী সন্তানহীনা হলে, স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে কিন্তু সংসারে দ্বিতীয়ার স্থান হয় প্রথমার পরে। তাই দ্বিতীয়াকেই যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয়। প্রথমা থাকে গৃহকর্ত্রী হয়ে।

লাহুলের সমাজেও মাঝে মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। স্বামীর উদ্যোগে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী তার বাপের দেওয়া পশু ও জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যায়। আর তার চেষ্টায় বিচ্ছেদ হলে, স্বামীকে তার কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুষ্ঠানটি বড় হৃদয় বিদারক। একগাছি সরু উলের সুতো দু'জনের কব্জি আঙুলে জড়িয়ে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ায়। আত্মীয়-স্বজনরা থাকে চারিদিকে। সবার সামনে ওরা অঙ্গীকার করে যে আর তারা একসঙ্গে থাকবে না। বলতে বলতে কাঁদে আর সবাইকে কাঁদায়। অবশেষে দু'জনে দু'দিকে হাত সরিয়ে নেয়। সুতো ছিঁড়ে যায়। শেষ বারের মত দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপরে চোখ মুছিয়ে নিয়ে দু'জনে দু'দিকে চলে যায়। কেবল পড়ে থাকে বিগত জীবনের হাসিকান্নায় ভরা দিনগুলির সুন্দর স্মৃতি। জানি না সে স্মৃতি কতদিন অক্ষয় হয়ে থাকে ওদের মনে।

———

মধুমিতার উপর ভার পড়েছিল বর-বধূর উপহারের ফর্দ লিখবার। প্রথমটায় সে ভীষণ আপত্তি করেছিল, "না মাসীমা, এ কাজটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তুমি অন্য কাজ দেও আমাকে।" কিন্তু মাসীমা শুনলেন না। বললেন, "তোকেই করতে হবে এ কাজটি। আর মেয়েগুলোকে দিয়ে কি কিছু বিশ্বাস আছে? ঘর ভরা জিনিষ, উপহার সব ফেলে চলে যাবে, তারপর চুরি হতে কতক্ষণ? দেখলি তো সকালবেলা, পান সাজবার কথায় হৈ-হৈ করে উঠলো সবাই, আমরা সাজল পান। তারপর সব ছত্রখান করে রেখে পালালো। আর এখন তো ফুলপরী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা সব! ওরা এসে বসবে এখানে ফর্দ লিখতে।" আর বৌগুলোর তো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। রান্নার দিক দেখছে। ডিয়েন সাজাচ্ছে—আরো কত কি। হাতে খাতা কলম গুঁজে দিয়ে মধুমিতাকে উপহার লিখতে বসিয়ে গেলেন মাসীমা। তারপর সেই বিকেল পাঁচটা থেকে বসে বসে এ কাজই করছে সে। বধূর হাতে থেকে উপহারের প্যাকেট বা বাক্স নিয়ে খুলে দেখছে আর লিখছে—জোড়াসাঁকোর মাসীমা—চাকাই বেনারসী। বালিগঞ্জের বৌদি—রোলেক্সঘড়ী। টালিগঞ্জের কাকা—প্রেসার কুকার। কলেজের বন্ধুরা—কফি সেট। প্রথম দিকে যা-ও বা একটু এদিক ওদিক তাকাবার সময় পাচ্ছিল, সাতটার পর থেকে আর তাও পাচ্ছে না। কোলের উপর এসে পড়ছে প্যাকেটের পর প্যাকেট। পাশে জমে উঠছে বাক্সের উপর বাক্স। লিখতে লিখতে রেগে যাচ্ছিল সে মাসীমার উপর—কোথায় সুন্দর সুন্দর সাজ দেখবে, ভালো ভালো চেহারা দেখবে, তা নয় জিনিষের স্তূপের মধ্যে বসিয়ে রেখে খেলে তুমি আমাকে!

মধুমিতা এরই মধ্যে যখন একটু চোখ তুলবার সময় পেল, দেখল মস্ত হল ঘরটা মহিলা আর তরুণীতে ভরে গেছে। সাজে—অলঙ্কারে রূপে-আলোতে ঝলমল করছে ঘর। এতক্ষণ কারও দিকে তাকাবার অবসর মেলে নি

তার। এবার কাউকে হাসি দিয়ে, কাউকে বা 'কখন এলে'—বলে সম্ভাষণ জানাতে জানাতে হঠাৎ এই আলো আর হাসির হাটে একটি চল্লিশ প্রান্তিক শুভ্র বসনা মহিলার প্রতি দৃষ্টি আটকে গেল মধুমিতার। হাঁটুর উপর চিবুক রেখে বসে আছেন তিনি। তার কিনারে ধূতীর ঘোমটা আর কালোচুলের মাঝে মাঝে দু'চার গাছা হালকা পাকা চুল পাখার বাতাসে কপালের উপর উড়ছে। দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর নব-বধূর প্রতি। মধুমিতা দেখতে লাগল মহিলাটিকে। কিন্তু মহিলার দু'চোখের দৃষ্টি ওর বুকের মধ্যে কেন ব্যথা জাগিয়ে তুলতে লাগল বুঝে উঠতে পারল না।

"এই মধুমিতা ধর—"

আবার মধুমিতা লিখে চললো, বেহালার বড়দি···। নাকতলার দিদিমা···। বৌবাজারের বৌদি···। ঘরের ভিড় উপচে পড়ল গিয়ে বারান্দায়। কিন্তু খালি হলোও কিছুক্ষণের মধ্যেই। দিনকাল ভালো নয়। এখানে বোমা পড়ছে। ওখানে বোমা পড়ছে। সেখানে খুন হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এসে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায় সবাই। খাবার ডাক পড়তে ঘর একেবারে খালি হয়ে গেল। মধুমিতা লক্ষ্য করল মহিলাটি গেলেন না। তিনি ঠিক তেমনি বসে রইলেন। তবে এবার তাঁর দৃষ্টি নব-বধূর দিকে নয়—ওকেই দেখছেন তিনি। চট্ করে উঠে দাঁড়াল মধুমিতা। নববধূর হাতে খাতা কলম দিয়ে, "আমি আর কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি" বলে এসে দাঁড়ালো মহিলাটির কাছে। বললো, "আপনি যেতে গেলেন না? আমাদের নিরামিষের ব্যবস্থাও তো আছে।"

মহিলাটি একটু হাসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি?"

মধুমিতাও মহিলার হাসির উত্তরে একটু হেসে বললো, "আমার নাম মধুমিতা সেন। আসুন আমার সঙ্গে।"

"তুমি এ বাড়ীর কে হও?"

"আমার মাসীমার বাড়ী এটা। মার খুড়তুতো বোন হন মাসীমা। খাবেন না আপনি?"

এ সময় মাসীমা নিজেই এলেন সে ঘরে। মহিলাটির কাছে এসে বললেন, "চল শোভনা।"

"কোথায় যাবো?"

"খাবিনে?"

বিনীতভাবে দু'হাত জোড় করলেন শোভনা," না মে আমার একেবারে খাবার ইচ্ছে নেই। তোর এই বোনঝিটির সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগছে। বসে বসে তাই বলি।"

"ঠিক আছে, আমার বোনঝিটিকে একদিন নিয়ে যাবোখন তোর বাড়ী। এখন ওঠ তো—" বলে হাত ধরে টেনে তুললেন মাসীমা শোভনাকে। তারপর শোভনার হাতের ভেতর নিজের হাত গলিয়ে জড়িয়ে ধরে চলতে চলতে সকৌতুকে হেসে বলে গেলেন, "তোরা কলেজে পড়িস বলে বুঝি কেবল তোদেরই বন্ধু থাকতে পারে? আর আমাদের পারে না? শোভনা আমার বন্ধু কিন্তু।

তারপর মধুমিতা শুনল মাসীমা শোভনাকে বলছেন, "আমি জানি ভিড়ের মধ্যে তোর একটুও ভালো লাগবে না। তাই আমার ঘরেই তোর খাবার নিয়ে এসেছি।"

প্রবল আপত্তি জানালেন শোভনা, "না সবার মধ্যে বসতে ভালো লাগবে না কেন? এতক্ষণ আমি এখানে সবার মধ্যে বসে আছি না?"

ওঁরা চলে গেলেন।

মধুমিতা ভাবতে লাগলো, কিসের বেদনা শোভনার দুচোখে? কিসের জন্য মাসীমা বলছেন, সবার ভেতর গিয়ে বসতে তার ভালো লাগবে না? তিনি কি সদ্য বিধবা হয়েছেন? কিন্তু মনটা তার 'না' করে উঠলো। এ বেদনাতুর দৃষ্টি বৈধব্যের নয়। এ দৃষ্টিটা চেনে ও—ভীষণভাবে চেনে। নিশ্চয়-ই চেনে। নইলে শোভনার চোখ ওর বুকে কান্না ডেকে আনছে কেন?

শোভনা যেন ওকে টানতে লাগলো। ওদের পিছু পিছু মাসীমার ঘরে এসে ঢুকল মধুমিতাও।

শোভনা চেয়ারে বসে খাবারের প্লেটে হাত রাখলেন—

থেকে থেকেই কিন্তু পর পর গানাই বাজছিল। আবারও বেজে উঠল। শোভনা দুটি তরকারীর ডেলা

মুখের ভেতর ঠাসতে লাগলেন। মধুমিতা দেখলো, সত্যি খাবার তার গলা দিয়ে নামছে না। মধুমিতার মনে হলো, দাদাইটা যদি এই মুহূর্তে বেজে না উঠত, তবে হয়তো শোভনা কিছু গলা দিয়ে নামালেও নামাতে পারতেন, এখন আর পারবেন না। চুপচাপ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন মাসীমাও।

কিছু খাবার গলা দিয়ে নামিয়ে শোভনা গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললেন, "ট্রামেই চলে যেতে পারব কি বলিস? রাত তো হয়নি তেমন?"

"আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি—" মধুমিতা এগিয়ে এলো। মাসীমাকে বললো, "তুমি কাউকে উপহার লিখবার জন্য পাঠিয়ে দিও।"

মাসীমা আনন্দের সঙ্গে মধুমিতার মাথায় হাত রাখলেন, "জানিস শোভনা, আমার এ মেয়েটা সত্যি বড় লক্ষ্মী। তুই যে বলছিলি, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে। ভালো লাগবার মতোই মেয়ে যে।" হঠাৎ মেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আরে, অভীকের জন্য খাবার রেখ যে। দাঁড়া নিয়ে আসছি।"

"না, না" করে উঠলেন শোভনা। কিন্তু মাসীমা শুনলেন না। তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন। এবং অল্প সময়ের ভেতরই একটি টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ফিরে এলেন। সেটা মাসীমার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে মধুমিতা শোভনাকে বললো, "চলুন মাসীমা।"

মাসীমা বললেন, "অভীকে বলবি, মাসীমা খুব দুঃখ পেয়েছেন তুমি না খাওয়াতে—বুঝলি?"

"আচ্ছা বলব।"

শোভনাকে নিয়ে মধুমিতা এসে তার গাড়ীতে উঠলো। শোভনাকে পাশের আসনে বসিয়ে মধুমিতা গিয়ে বসলো চালকের আসনে।

"তুমি গাড়ী চালাবে?"

"আমার গাড়ী আমিই চালাই।" ষ্টিয়ারিংএ এক মোচড় দিয়ে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে এলো মধুমিতা রাস্তায়।

কিন্তু এই রাতে—আমাকে পৌঁছে দিয়ে তোমাকেতো একা ফিরতে হবে?

"কোথায় রাত? ঘাটটা যাত্র। নাইট শোর ছবি দেখে কত সময় আমি একা ফিরি।" গাড়ী চালাতে চালাতে জবাব দিল মধুমিতা।

শোভনা বললেন, "ঠিক করো না। দিন কি পড়েছে দেখছ তো?"

"দিন কে ভয় করে ঘরে গিয়ে ঢুকলে কি লাভ মাসীমা? ভয় পেতে দেখলে দুর্জনরা কি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? শেষে ঘরই আক্রমণ করবে। রাস্তা তস্করের হাতে ছেড়ে দেবো কেন? সবাই ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকছে বলেই না আমরা একা হয়ে যাই।" গাড়ীকে বাঁয়ে মোড় ঘোরালো মধুমিতা।

শোভনা দেবী বললেন, "কিন্তু তুমি যে গাড়ী চালিয়েই চলেছ—তুমি যাচ্ছ কোথায় মধুমিতা? তুমি তো জাননা আমি কোথায় থাকি? জানো কি?"

"না জানিনা। আপনাকে যখন পৌঁছে দেব তখন জেনে নেবো। এখন আমি আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।"

আশ্চর্য হয়ে গেলেন শোভনা—"তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছ? কেন বলতো?"

"এমনি মাসীমা। বছরখানেক হলো আমার মা মারা গেছেন। তারপর থেকে খালি বাড়ীতে ঢুকতে মনটা আমার এমন ছটফট করে যে মাসীমাকেও অনেক সময় এমনি ডাকি দিয়ে টেনে নিয়ে আসি।"

একটু সময় চুপ থেকে বললো, "দীপঙ্কর বলে আমার এক বন্ধু আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। আমারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটা কথা মনে হলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়—দীপঙ্করেরও মা নেই।"

ক্যাচ করে গাড়ীর ব্রেক কষল মধুমিতা। সামনে গাড়ীর মস্ত লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ী থামিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রাখল সে। বললো, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমরা আজকালকার মেয়েরা শাশুড়ী না থাকাই তো চাই। আমরা আজকাল যা চাই তা সব খারাপ। সব নোংরা। সব কুৎসিৎ। আর একথা

যে আমরা না বুঝি তাও কিন্তু মোটেই নয়। জেনে শুনে বিষ পান করে চলেছি।"

শোভনা তাকিয়ে রইলেন মধুমিতার দিকে।

অনুভবে সেটা বুঝে মধুমিতা বললো, "মাসীমা, আমি আমার একমাত্র মামার মৃত্যু দেখেছি কাছে দাঁড়িয়ে। আমার মাকে মরতে দেখেছি আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দুটো মৃত্যু আমাকে অনেক গভীর কথা ভাবতে শিখিয়ে গেছে।"

শোভনা মলিন হাসলেন—"কোন ঘটনা কাউকে কিছু ভাবতে শেখায় না মধুমিতা। বড় ঘটনা ঘটতে দেখলেই কি মানুষ বড় করে ভাবতে শেখে? কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকে কেউ কি কিছু শিখছে? তোমার ভেতর গভীরতা রয়েছে বলেই গভীর কথা ভাবছ।"

গাড়ীর লাইন চলতে শুরু করেছিল। মধুমিতাও তাদের পেছন পেছন চলতে লাগল। তারপর বাঁদিকে মোড় ঘুরে গিয়ে পড়ল এক নির্জন রাস্তায়। রাস্তার দুদিকে বড় বড় লনওলা সব বাড়ী। তারই একটা বাড়ীর গেটে গাড়ী দাঁড় করিয়ে হর্ণ বাজালো মধুমিতা।

বেয়ারা দৌড়ে এসে গেট খুলে ধরল।

বাড়ীর মধ্যে গাড়ী ঢোকালো মধুমিতা। নিজে নেমে ঘুরে এসে দরজা খুলে ধরলো শোভনার। বললো, "আসুন।"

শোভনা নেমে এলেন।

মধুমিতা গাড়ীর ভেতর টিফিন ক্যারিয়ারটা ভালো করে রেখে বললো, "এটা এখানেই থাক। কিন্তু ভাবছি, আপনাকে যে নিয়ে এলাম—মাসীমা যার জন্য খাবার দিলেন, তার খাওয়া হয়ে যাবে না তো?"

"অতী? না। ও রুটা দাড়ে রুটার আগে খায় না। আর আমি না যাওয়া পর্যন্ত এমনিতেও খাবে না। অতী আমার ছেলে?"

"ও, আচ্ছা। আসুন।"

শোভনা মধুমিতার সঙ্গে যেতে যেতে বললেন, "তোমরা খুব বড়লোক।"

"আমার বাবা ব্যারিষ্টার ছিলেন। টাকা উপায় করেছেন খুব। আর টাকাওলা মানেই আজকের বাজারে মন্ত্রী। আর মন্ত্রী মানেই হলো লুটের টাকার পকেট উপচে পড়া।"

"তোমার বাবা মন্ত্রী ছিলেন?"

"এই হয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য"—কথাটাকে কোন মূল্যই দিল না যেন মধুমিতা। দোতলায় নিজের ঘরে এনে বসালো সে শোভনাকে। বললো, "এটা হলো আমার ঘর। বসুন।"

শোভনা বসলেন আরাম চেয়ারটায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ীর সবাই বুঝি বিয়ে বাড়ী?"

"হাঁ।" বলে বসল মধুমিতা। কিন্তু তক্ষুণি আবার উঠল। বললো, "কফি বানাই আপনার জন্য? কিংবা চা? আমারও খুব চা কফির তেষ্টা পেয়েছে।"

"তবে বানাও তোমার যেটা পছন্দ। তোমার ঘরেই তো আয়োজন রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।"

"রাত জেগে পড়তে হলেই আমার কফি চাই। তা ছাড়াও আমি খুব চা কফি খাই। তাই সব ব্যবস্থা ঘরেই রাখি।" ইলেকট্রিক হিটার জেলে কেতলীতে কফির জল চাপালো মধুমিতা।

"তুমি কফি বানাও। আমি বসে বসে তোমাকে দেখি। তোমাকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগছে।"

শোভনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো মধুমিতা—"আপনার ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে?"

"না।"

"আমায় বৌ করবেন?"

শোভনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অতি আস্তের উপর বুকের ভেতর চেপে ফেলে হেসে বললেন, "তুমি তো দীপঙ্করকে ভালোবাস?"

"আর একজনকে নতুন করে ভালোবাসব?"

"অতীকে তুমি তো চেননা। যদি ভালোবাসতে না পারো?" আর কিছু নয়, মধুমিতা কি বলে সেটা শোনবার জন্যই কেবল এ জিজ্ঞাসা।

"পারব।" ককির আয়োজন করতে করতে মধুমিতা জবাব দিল।

"পারবে!"

"কেন পারব না? আপনার ছেলে নিশ্চয়ই আপনার মতো হবেন?"

"তুমি কি ভাবছ আমায় চিনে ফেলেছ?"

"মনে হচ্ছে তো।" বলে হাসলো মধুমিতা। বললো, "আর যদি ভুল চিনে থাকি তবে পালিয়ে আসব। আপনি তো এখনই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন না।"

"কিন্তু কেন তুমি এটা করতে যাবে?"

"আপনি সুখী হবেন বলে।"

"আমার সুখ তোমার কাছে এত বড় হলো কি করে যে, যাকে ভালোবাস তাকে ছাড়তে পারো?"

"আপনার জন্য—? না, এখানে জিনিষটা ঠিক ব্যক্তি নির্ভর নয়। সে কাজই ভালো কাজ যা করলে সব চাইতে বেশী সংখ্যককে সুখী করা যায়। অন্তত আমার দৃষ্টিভঙ্গি এই। অভীকবাবু যদি তার নির্বাচিতাকে বিয়ে করেন, তবে সুখী হওয়া থেকে আপনি বাদ পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে হলে আপনি সুখী হন। ওখানে দুজনের সুখ। এখানে তিনজনের।"

"কোথায়? সংখ্যায় তো তোমরা ভারী। চারজনের সুখ ওলট-পালট হবে আমার একার জন্য।"

"ওলট-পালট হবে, কিন্তু দুখ হবে না তা বাড়াচ্ছে না মোটেই। দীপঙ্কর আর মধুমিতার জায়গায় অভীক আর মধুমিতার সুখ হবে। অরুন্ধতীরও তেমনি। একের বদলে অন্যজন—এই মাত্র।"

"ভালোবাসা তোমার কাছে কিছু নয়?"

"অবশ্যই কিছু। কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়। কোন প্রাণ নিয়ে ছেঁড়াছিড়ি করা চলে তেমন তো নয়ই।"

শোভনা নীরবে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে।

পেয়ালায় ককি ঢালতে লাগল মধুমিতা—"মাসীমা জীবনের ঘাটে ঘাটে ভালোলাগা। কত ভালোলাগা যে জীবনে এসে উপস্থিত হয়, কাঁদিয়ে যায় তার কি ঠিক আছে? বরং ভালোলাগা থেকে দূরে সরে থাকাই দুরূহ কাজ। বিয়ে তো ভালোলাগার সামনে বেরাল তোলার জন্যই। কিন্তু তাতেই কি প্রেম বাঁচিয়ে রাখা যায়? বিয়েও ভাঙে। আর প্রেমের বিয়েই বেশী ভাঙে। তাই প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার ঘৃণা করে—ভীষণ ঘৃণা করে। দেখলেও আমার গা গোলায়। পরমপ্রিয় কাউকে সুখী করতে—পাত্র বদলাতে আমার তিলমাত্র আপত্তি নেই।" পেয়ালায় সুগার কিউব দিতে দিতে তির্যক দৃষ্টিতে একবার শোভনার মুখের ভাবটা দেখে নিল মধুমিতা। কিন্তু না, সে মুখে কোন আলো, কোন উৎসাহ এখনও সে আনতে পারেনি। বরং আগে সর্বহারার মতো দেখাচ্ছে শোভনাকে। মধুমিতা বুঝলো, তার অন্বেষণ ঠিক পথেই চলেছে।

ককি এনে শোভনার হাতে দিয়ে; নিজের পেয়ালা নিয়ে আর একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো সে। বললো, "আমাকে পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমার সম্বন্ধে নীরব—আপনার ছেলে কাউকে ভালোবাসেন?"

শোভনা কোন জবাব দিলেন না। ককিতে ঠোঁট ছোয়ালেন।

"তাই যদি হয়, ভাববেন না আপনি। আমি ঠিক ভাসিয়ে নিয়ে আসব।"

এবার হেসে ফেললেন শোভনা. "ভাসিয়ে নিয়ে আসবে?"

"হাঁ।" খুব আরাম করে এক চুমুক ককি খেল মধুমিতা।

"কি ভাবে?"

"কি ভাবে—তা উপস্থিত বুদ্ধি মতো বেছে নিতে হবে। সোজা রাস্তায় হয় তো সোজা রাস্তায় চলব। বাঁকা পথ নিতে হয় তো তাই হবে। জলে নামতে বললেও থামব না।"

"যদি ডুবতে হয়?"

"আমি সাঁতার জানি।"

"অন্যজন তো না জানতে পারে?"

"তিনি যে জানেন না—বুঝতেই পারছি। জলে

নামতে হলে তাকে তোলার জন্যই তো নামব। এবং তুলব।" আত্মপ্রত্যয়ে দুচোখ উজ্জ্বল মধুমিতার।

এবার স্পষ্টতই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শোভনা।

সেটা লক্ষ্য করে মধুমিতা বললো, "অসম্ভব বলেছেন?"

শোভনা মধুমিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে দেখা যে কত কি ভেবে চলছিল সে কথা জানেন বোধহয় একমাত্র ঈশ্বর।

"কিছুতেই সম্ভব ভাবতে পারছেন না? ভাবছেন আমি পারছি না আর তুমি পারবে? ঐ তো ভুল করছেন। আপনি আপনার পরম স্নেহ, চরম আকুলতা, শ্রেষ্ঠতম অভেদ্য দিয়েও বাঁধতে পারবেন না, কিন্তু যে কোন মেয়ে শুধুমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে যে কোন ছেলেকে বাঁধতে পারে। জানি বলুন, জানি বলুন তা তো ঐ শক্তি।

তবু নীরব শোভনা! আরাম কেদারাটার আরো সামনে এগিয়ে এসে এক রকম ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল মধুমিতা—

"দেশী মেয়ে না বিদেশী? আমার মনে হচ্ছে বিদেশী। দেশী হলে আপনার এমন অসম্ভব ঠেকত না আমার কথা।"

এবারও মুখ খুললেন না শোভনা।

"বুঝলাম।" অকস্মাৎ মুখটা যেন পাথরের মতো কঠিন হলো মধুমিতার।

"বুকে যেন ভয় পেয়ে গেলে?" একটু পরিহাস না করে পারলেন না শোভনা।

"না, ভয় পাইনি—ভাবছি।"

"কি ভাবছ?"

শোভনার কথার জবাব দিল না মধুমিতা। তার কথা ওর কানে গেল কিনা তাও বোঝা গেল না। সে তার সামনের কফি কাপটার দিকে চোখ রেখে বসে রইল। এবার বুঝতে পারলো মধুমিতা, শোভনার দু চোখের দৃষ্টি ওর বুকে ব্যথা জাগিয়ে তুলছিল কেন। কেনই বা সে শোভনা সম্বন্ধে এতটা আত্মহারিত হয়ে উঠেছিল। মৃত্যু মুহূর্তে মা'র চোখে ঠিক এই দৃষ্টিটাই দেখেছিল সে। মা'র সেই শেষ তাকানো মধুমিতার বুকে—খোদিত হয়ে আছে পাথরের বুকের খোদাই-এর মতো। কোনদিনও মা'র সেই চাওয়া ভুলবে না মধুমিতা।···যাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল—পারেনি। শোভনাকেই কি পারবে রক্ষা করতে?

"কি ভাবছ?" আবারও উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন শোভনা।

"অনেক কিছু ভাবছি—চলুন আপনাকে পৌঁছেদি।"

"কফি রয়ে গেল তোমার?"

"ও!" পেয়ালাটা তুলে নিয়ে ঢোকে ঢোকে কফি গিলতে লাগল মধুমিতা।

"তোমার গয়নাগুলো খুলে রেখে যেও মধুমিতা। আজকাল গয়না পরে বেরুনো উচিত নয়।"

"আচ্ছা।" গয়না খুলে ড্রয়ারে রাখল মধুমিতা।

"অভীক সম্বন্ধে উৎসাহ তোমার মরে গেল?" মধুমিতাকে অন্যমনা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন শোভনা।

"আরো অনেক বেশী বাড়লো মাসীমা।"

শোভনা ভেবে পেলেন না জিনিষটা কি। আশ্চর্য হলেন তিনি। মধুমিতা কি কাউকে ভালোবাসত? যাকে কেড়ে নিয়ে গেছে কোন বিদেশিনী? গভীর ক্ষত রয়েছে তার বুকে? কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে শোভনা শুধোলেন, "তোমার মনে কোন গভীর দুঃখ আছে মধুমিতা?"

"আছে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ যেন ধপ্ করে জ্বলে উঠল মধুমিতার। কফির শূন্য কাপটা ঠক্ করে প্লেটের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল সে।

শোভনাও উঠে পড়লেন।

নীচে নেমে বসবার ঘরে এসে বললো, "একটু দাঁড়ান আপনি মাসীমা। আমি কোন করে একটু বলেছি মাসীমাকে, যেন না ভাবেন। আমি আসছি।"

মধুমিতা কোন করতে ঘরের কোনের দিকে চলে গেল। শোভনা দাঁড়িয়ে বসবার ঘরটাকেই দেখছিলেন; হঠাৎ একটা গলা ছাড়া কান্না ঘরের ভেতর এসে ছড়িয়ে পড়তে চমকে উঠলেন তিনি। কান্নাটা কথা বলে বলে

কাঁদতে লাগল ; "রেণুকা কেন মরলি তুই ? কে তোর ঘর ছারখার করলো···রাজা·· আ · আ···"

মধুমিতা ফোন করে এলো। বললো, আমার ঠাকুমা কাঁদছেন। মাঝে মাঝেই তিনি এ ভাবে বিলাপ করেন। নার্স ঘুমের ওষুধ দিলেই ঘুমিয়ে পড়বেন। "কে তোর ঘর ছারখার করলো"—আপন মনেই যেন মধুমিতা তার ঠাকুমার বিলাপটা আওড়ালো। তার ঠোঁট দুটোকে দেখাতে লাগলো উদ্যত চাবুকের মতো।

গাড়ীতে বসে শোভনা শুধোলেন, "তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছেন ?"

গাড়ী নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে জবাব দিল মধুমিতা, "ঠাকুমা আছেন। আর এত বড় বাড়ী এমনি পড়ে থাকবে বলে আমার এক পিসতুতো ভাই আর বৌদি তাদের দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানেই থাকেন।"

"তোমার আর কোন ভাই বোন নেই ?"

"বোন নেই। দু' ভাই আছে। একজন আমার বড় আর একজন ছোট। মাঝে আমি।"

"ভাই দুটি কোথায় ?"

"ওদের শ্বশুরের দেশে। একজন আমেরিকায় একজন ইংল্যাণ্ডে।"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন শোভনা। এক ভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। একবার শুধু বলে দিলেন, "আমি যোধপুর পার্কে থাকি। তুমি সে দিকেই গাড়ী চালাচ্ছ তো ?"

"এইবার চালাব।" রাস্তায় এখন ভীড় কম। গাড়ীর স্পীড্ বাড়িয়ে দিল মধুমিতা।

চুপচাপ সময় কাটতে লাগল।

এক সময় শোভনা আস্তে আস্তে বললেন, "এইবার বুঝলাম তোমার ঠাকুমার ঘর ছারখার করছে কারা। কত ঘর যে শেষ করছে ওরা। আমি কিন্তু মরে যাই নি। মরবোও না।"

"মরবেন ! কেউ হঠাৎ মরে। কেউ মরে ভিলে ভিলে। আমার কাছে মা'র মৃত্যুটা বরং ভালো।"

আবার নীরব সময় কাটতে লাগল।

যোধপুর পার্কে ঢোকার মুখে ওভারটা পার হতেই শোভনা বললেন, "এবার আস্তে চালাও। গোটা তিন চার বাড়ীর পরই আমাদের বাড়ি।"

গাড়ীর স্পীড্ কমিয়ে দিল মধুমিতা।

"এই—এই—এইবার থামো।"

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পড়েছিল। গাড়ী ব্যাক করে বাড়ির দরজায় নিয়ে এলো মধুমিতা।

শোভনা একেবারে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়েই গাড়ী থেকে নামলেন। বললেন, "তোমাকে আজ আর নামতে বলব না মধুমিতা।"

"কেন—"নামতে নামতে বললো মধুমিতা।

"আবার নামলে ? হাত ধুয়ে যাচ্ছে না ?"

"যদি নাই নামব, তবে এলাম কেন ? ড্রাইভারই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারত।" ঝুঁকে এসে শোভনার হাত থেকে ক্যারিয়ার নিয়ে নিল মধুমিতা।

শোভনা একটু হেসে বললেন, "তুমি তোমার পাত্র বদলের ইচ্ছায় আছ এখনও ?"

"নিশ্চয়।"

ড্রয়িংরুমে যে ঘরে আলো জ্বলছিল, শোভনা সেই ঘরেই ওকে নিয়ে এলেন।

অভীক বই পড়ছিল। মা'র সঙ্গে একটি অপরিচিত মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

শোভনা মধুমিতাকে নিয়ে অভীকের কাছে এসে বললেন, "এটি হলো অনিলার বোনের মেয়ে মধুমিতা। আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে।"

"ও, আচ্ছা—" দু হাত তুলে নমস্কার জানাল অভীক।

শোভনা মধুমিতার হাত থেকে ক্যারিয়ার নিয়ে খাবার ঘরের দিকে চলে গেলেন। মধুমিতা প্রতি নমস্কার জানালো।

অভীক আর হেসে বললো, "বসতে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। রাত হয়ে গেছে—"

হাত উল্টে এক নজর ঘড়ি দেখে নিয়ে মধুমিতা বললো, "সাড়ে ন'টাকে আপনি রাত বলছেন ?"

"আমি না বললেও আপনারা বলেন তো?"

"কক্‌খনো নয়—" তীব্র ভাবে মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে উঠলো মধুমিতা।

ওর ছেলেমানুষি বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললো অভীক। বললো, "তবে আপনাকে বলতে বলতে পারি?"

"পারেন।" বলে মধুমিতা অভীকের বলার আগেই একটা শোফায় গিয়ে বসলো।

বসলো অভীকও।

অভীকের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে আনল মধুমিতা। সাদা ঢোলা পাজামা, পাঞ্জাবী, চুল সবই কিছু এলোমেলো। মা'র চেহারার যে বিষাদ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ছেলের মুখেও দেখল সেই বিষাদ। মা যেভাবে শুধু পরিচয়টুকু করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, এবং অভীকও মা'র দিক থেকে যে ভাবে মুখটা কিছু অন্যদিকেই রাখল, তাতে মধুমিতার মনে হলো, মা আর ছেলেতে বোধহয় শান্ত লড়াই চলছে!

অভীক কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

মধুমিতা শুধালো, "আপনি গেলেন না কেন? মাসীমা বলে দিয়েছেন আপনাকে বলতে যে, তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন আপনি না যাওয়াতে।"

একটু অন্যমনস্ক ভাবে অভীক বললো, "দুঃখ দিতে আমার খুব দুঃখ হয়। কিন্তু কি করে যে সবাইকে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা যায়—তাও ভেবে পাই নে!"

জবাবটা ওর কথার উপর হলেও, এর অর্থ যে অনেক গভীরে, সেটা পরিষ্কার বুঝল মধুমিতা। কিন্তু মুখ খুলল না। আজ এ জাতীয় কথায় ভোলা চলে না। আজ শুধু তরলতা। তরলতা দিয়ে পুরুষকে যত কাছে টানা যায়, তত আর কিছু দিয়েই নয়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মধুমিতার দিকে তাকালো অভীক—"মধুমতি চাওয়ার অভিনয় আর করলাম না।"

"ঠিক করেছেন। কি পড়ছিলেন?"

"জেমস্ অয়েস্"

এমন সময় দুম্ দুম্ শব্দে গোটা তিন চার বোমা পড়লো যেন কোথায়। চিন্তিত মুখে এসে ঘরে ঢুকলেন শোভনা। বললেন, "না, আর দেরী করতে পারবে না মধুমিতা। আর একা গাড়ী চালিয়েও তোমাকে যেতে দেবো না আমি। কোথায় যেন বোমা পড়ল, শুনলে তো। অভীক তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক— ওঠ।"

"নিশ্চয়—" বলে তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো অভীক।

কিন্তু মধুমিতা উঠলো না। বসে থেকেই শুধালো—"আমায় পৌঁছে দিয়ে তারপর আপনি একা ফিরবেন তো? বিপদের ঝুঁকি নেবার আগে শক্তি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। আসুন পাঞ্জা ধরি। আপনি যদি জেতেন তবে আপনি একা ফিরবেন। আমি যদি জিতি তবে আমি একা যাবো।"

শোভনা মধুমিতাকে বুঝছিলেন, তাই আশ্চর্য হচ্ছিলেন না। কিন্তু অভীক খুবই বিস্ময়বোধ করছিল। গম্ভীরবোধ মর্যাদাবোধ আভিজাত্য—সবকিছু একসঙ্গে যার চেহারায় রয়েছে, তার এই গায়েপড়া ভাব সত্যি তাকে বিস্মিত করছিল। কিন্তু কথা হলো, কোন তরুণীর গায়েপড়া ভাব কোন তরুণেরই খারাপ লাগে না। অভীকেরও লাগছিল না। হেসে বললো, "চলুন।"

"আগে আমাকে হারান।" সেন্টার টেবিলের উপর কনুই রেখে হাত তুলে মধুমিতা ডাকলো, "আসুন। মাসীমা আপনি বিচারক।"

"আমি হার মানলাম।"

"তবে আর আপনাকে সঙ্গে নেবার মানে হয় কি?" উঠে পড়ল মধুমিতা।

আমোদ লাগছিল অভীকের।

বসে পড়ে বললো, "লড়ুন দেখি।"

মধুমিতাও বসে বসলো। তারপর দুজনেই সেন্টার টেবিলের উপর কনুই রেখে আস্তিন গুটিয়ে পরস্পরের হাত শক্ত মুঠোয় মুঠো করে ধরলো। একটানে মধুমিতার হাত টেবিলের উপর চিৎ করে ফেলে উঠে পড়লো অভীক।

মধুমিতাও হেসে উঠে দাঁড়ালো। বললো, "এবার আপনাকে একটু কষ্ট করা যেতে পারে। আচ্ছা যাচ্ছি মাসীমা। অভীকবাবুকে আমাদের ড্রাইভার এসে দিয়ে যাবে। ভাববেন না।"

"আচ্ছা মা।" সত্যি নিশ্চিন্ত হলেন সোভনা।

অভীককে পাশে বসিয়ে মধুমিতা গিয়ে বসলো চালকের আসনে।

অভীক জিজ্ঞাসা করলো, "আপনার গাড়ী আপনিই চালান?"

"সব সময়। আমার গাড়ী কাউকে ধরতে দিয়ে আমি।...আর কেই বা আছে বলবার!"

গাড়ী চালাতে লাগলো মধুমিতা।

সিগারেট ধরাতে লাগল অভীক।

ভাঙাচোরা রাস্তায় পড়ে বেবম ঝাঁকুনি খেল গাড়ীটা। গাড়ীকে ভালো দিকে নিয়ে যেতে যেতে মধুমিতা বললো, "দেখছেন পথ ঘাটের অবস্থা?"

"দেশের সব অবস্থাই দেখার মতো।"

ভালো রাস্তায় না পড়া পর্যন্ত আর কথা বললো না মধুমিতা। গড়িয়াহাট রোডে পড়ে মুখ খুললো সে। বললো, আপনার মিষ্টি কিন্তু হুবহু মতো জোরালো। ইউনিভার্সিটিতে আমি পাল্লা কথায় অনেক ছেলেকেই হারিয়ে দি। ভেবেছিলাম আপনাকেও পারব।

"তারা ইচ্ছে করে হারে।"

"কারণ?" অভীকের দিকে তাকালো মধুমিতা।

"ভালো লাগে আপনার কাছে হারতে।"

"ওঃ। আপনার সেটা লাগলো না?"

অভীক হাসলো।

গাড়ীকে রতন স্ট্রীটে ঢুকতে দেখে বললো, "আপনি রতন স্ট্রীটে থাকেন?"

"হাঁ।"

গাড়ীর শব্দ পেয়ে বেয়ারা দৌড়ে এসে গেট খুলে দিল। কিন্তু মধুমিতা গাড়ী ভেতরে নিল না। বেয়ারাকে বললো, "ড্রাইভারকে ডেকে দেও।"

বেয়ারা দৌড়ালো ড্রাইভারকে ডেকে আনতে।

নেমে এল মধুমিতা।

নামলো অভীকও।

"আমার কবে দেখা হচ্ছে—কথাটা জিজ্ঞাসা করব আমি না আপনি বলুন দেখি?"

অভীক হাসলো।

থাক, আজ এ পর্যন্তই। মধুমিতার আর কিছু বললো না।

অশোক পলাশ অশথ গাছে ঢাকা বাড়ীগুলোর উপর মস্ত চাঁদ স্থির হয়ে আছে। শরতের হাল্কা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে তার উপর দিয়ে। ফুরফুরে হাওয়াটি বড় ঠাণ্ডা। ভারি আমেজ মাখা। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলা এই ছেলেটিকে যে এই প্রাকৃতিক রমণীয়তা একটুও স্পর্শ করছিল না তা খুবই স্পষ্ট। তার মুখে কালীর ওপর কালীর পোঁচ। অভীকের এই মুখের দিকে তাকালেই মধুমিতার রাস্তার ঘুটা মনে পড়ে যায়। আর তক্ষুনি একটা গলা পর্যন্ত উঠে আসা কান্নার পিণ্ড গিলে ফেলতে হয় তাকে।

এখনও হলো।

ড্রাইভার এসে মামুলী নমস্কার আর হাসি জানিয়ে অভীক চলে গেল। মধুমিতা চলে এলো ঘরে। যদিও একটা কান্নার দলা এই মাত্র ওকে গিলে ফেলতে হয়েছে, তবু ভালো লাগছিল মধুমিতার। এই ভালোলাগা হলো অভীককে ভালোলাগার। এখন এই ভালোলাগা মন নিয়ে ও এগিয়ে চলবে। ফেরে যাবে না ফিরবে—সেটা স্বতন্ত্র কথা।

আবার উঠে পড়লো সে। মাসীমাকে 'এই আসছি' বলে গেছে। কিন্তু আজ আর যে ও আসছে না সেটা জানানো দরকার তাকে। মাসীমার ওখানে কথা সেরে গেল ঠাকুমার ঘরে। এ কাজটি ওর রোজকার। ঠাকুমাকে ঘুমের অষুধ দেওয়া হয়েছে কিনা—তিনি ঘুমোচ্ছেন কি না, এছাড়াও টুকিটাকি অনেক কিছু সে ঘুমোতে যাবার আগে অবশ্যই দেখে যায়।

ঠাকুমার ঘরে এসে দেখলো, তিনি ঘুমোচ্ছেন। তাঁর নার্সও ঘুমোচ্ছে। ঠাকুমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে

দিতে গিয়ে দেখলো, তাঁর বোজা চোখের দুকূল ছাপানো জল।

স্বপ্নেও কাঁদছেন!

আঁচল দিয়ে সযত্নে জলটা মুছে আনল মধুমিতা। তারপর মার্সের টুলটা—যেন শব্দ না হয়, এমনিভাবে খাটের পাশে আস্তে টেনে এনে ঠাকুমার ভাঙাচোরা গালে গাল রেখে বসে রইল। মনে মনে বলতে লাগলো, ঠাকুমা গো, তোমার কান্না শান্ত করার কোন দাওয়াই আমার জানা নেই এক ঘুমের অমুধ ছাড়া। তাই ঘুমের অমুধ বাইয়ে আমি তোমাকে পাড়িয়ে রাখতে চাই। কিন্তু তুমি যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাঁদ তবে আমি কি উপায় করি বলতো? তোমার এই বয়সে তোমাকে এভাবে একা ফেলে মায়ের চলে যাওয়া উচিত হয়নি—কিন্তু ঠাকুমা গো, সেজন্য অপরাধী আমি। আমি যদি বাবার চলে যাবার সংবাদটা এমন আচমকা না বলতাম মাকে তবে হয়তো এভাবে মরতেন না।

ঠাকুমার গাল থেকে মুখ তুললো মধুমিতা। ও সর্বদাই নিজেকে এভাবে দোষী করে কেন? মাকে যখনই সংবাদটা বলা যেত, তখনই তার কাছে সে খবর হঠাৎ হতো। উঠে টুলটা যথাস্থানে রেখে ফতুয়া ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলো মধুমিতা। এবার ঘরে এসে পোষাক পালটে ভালো করে একবার স্নান করে নিল সে। তারপর রাতের জামা পরে বসলো গিয়ে আরাম চেয়ারে। খুবই ক্লান্ত লাগছিল। কিন্তু তবু তার চোখে ঘুমের চিহ্নও ছিল না। তাই বিছানায় না গিয়ে আরাম-চেয়ারেই দু-চোখ বুজে শুয়ে ভাবতে লাগলো কত কি। পোড়না অতীত, মা, প্রতীপ, রাজা—সবাই ওর মনের সমুদ্রে ঝড় তুলতে লাগল এসে।

প্রতীপ আর রাজার ঘরের সামনে দিয়ে আসবার সময় মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল মধুমিতা। ভাইদের শূন্যঘর বড় কাঁদায় ওকে। মানুষ নকল চালতে জানে। সৌজন্যের আলাপ জানে। কিন্তু ঘরের শূন্যতার কোন আড়াল নেই। সে বড় বেশী স্পষ্ট। বড় বেশী উচ্চারিত। শূন্যঘর শূন্যমনা মানুষের চাইতেও বেশী যা মারে বুকে। তাই ভাইদের ঘরের দিকে ও কখনো পারতে তাকায় না।

প্রতীপ মধুমিতা রাজা—মাথায় মাথায় তিন ভাই-বোন! নাম ধরে ডাকে সবাই সবাইকে। হাসি, খেলা, হিংসা করা ঝগড়া করার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে ভালোবাসতে বাসতে বড় হয়েছে সমবয়সী বন্ধুর মতো। ব্যারিষ্টার বাবা, মন্ত্রী বাবার বারমহল ছিল জমজমাট। অন্দর মহলও কম জমাট ছিল না। মা কাকীমা পিসীমাদের রান্নার প্রতিযোগিতা, সেলাইএর নমুনা নিয়ে কাড়াকাড়ি, এর কে জব্দ করার নানা পদ্ধতির খেলা—এখনও মনে করতে ভালো লাগে ওর।

আর ওরা তিন ভাই বোন তো সম্রাট! ইচ্ছে করলে মারতে পারে। ইচ্ছে করলে রাখতে পারে। এই সম্রাট তিনজনকে নিয়ে এতো কাজের মধ্যেও বাবার কত ভাবনা। কত না চিন্তা। প্রতীপ তার্কিক। তাই তিনি তাঁর নিজের পেশায় বসাবেন। রাজা ইতিহাস প্রিয়। তাকে তিনি করবেন ডক্টরেট। আইনের বই-এর লাইব্রেরী তাঁর বিরাট। তার উপর নিত্য নতুন আসছেই। এবার ইতিহাসের বই আসতে লাগলো রাজার জন্য। বাবার সাধনা তিনি বড় হয়েছেন, কিন্তু প্রতীপ আর রাজার বড় হতে আছে।

মধুমিতা অভিমানে ঠোঁট ফোলাতো, "বা, সব কিছু হচ্ছে ওদের জন্য? আর আমি?"

"তুমি! তুমি প্রতীপ আর রাজার ওই লাইব্রেরী ঘরে হাটাহাটি করতে থাকো। যে ঘরে তোমার মন বসবে তোমাকে তাই করে দেব। হয় প্রফেসর না হয় ব্যারিষ্টার। ডাক্তার হতে চাও তো তাও হতে পারো।"

মা বাবার সুখ দিয়ে, সাধ দিয়ে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা দিয়ে তৈরী বাড়ী আজ নীরব। লাইব্রেরী ঘর অন্ধকার। প্রতীপ আর রাজা এখন এ বাড়ীতো নয়ই, মাতৃভূমিরও বাসিন্দা নয়। তারা এখন শান্তনীর দেশের বাসিন্দা! তাদের একজনের স্ত্রী আর একজনকে চিনবে না! হয়তো কোন একদিন

প্রতীপের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাজার ছেলেমেয়েদের দেখা হবে কোন এক এয়ারপোর্টে। কিন্তু কেউ কাউকে চিনবে না। একই এয়ার লাইন্সে বসে তারা হয়তো একজন সময় কাটাতে পকেট-বুক পড়বে। আর একজন পিস্ বাজাবে।

এশিয়া এশিয়া, ইউরোপ ইউরোপ—এই মতবাদের যে ধ্বনি উঠেছে যদি কোন দিন তা সত্য হয়ে দাঁড়ায়—বিরোধ বাধে, তখন এদের ছেলেমেয়েরা কোন রকের অনুগত হবে? পিতৃরক্তের? না মাতৃভূমির?

প্রতীপ আর রাজার ছেলেমেয়েরা কোন দেশের? তারা কি আমেরিকান? তারা কি ইংরাজ? তারা কি ভারতীয়? তারা কি কখনো গাইবে, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্?' তারা কি গাইবে, 'যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ—উদ্ভিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ?"

কি একটা অনির্দিষ্ট ভাগ্যের খেলার পুতুল হয়ে যেন প্রতীপ আর রাজা গেল ছত্রছাড়া হয়ে। জীবনের গতি কেললো হারিয়ে।

অনির্দিষ্ট ভাগ্যের খেলার পুতুল হয়ে, না কোন মেয়ের হাতের খেলার পুতুল হয়ে? কিন্তু না—মধুমিতা প্রতীপ রাজাকে দোষী করবে না। বিদেশে পরিবারের বেষ্টন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে—যেখানে মা নেই, বাবা নেই শুভবুদ্ধি দেবার, রাশ টানার কোন পরিজন নেই। কোন মেয়ে টেনে নিয়ে চললে বাধা দেবার ভালোমন্দ বোঝাবার জন নেই—যে সব দেশে প্রফেসর ছাত্রকে শুধোয় কোন ডিগ্রি নেবে—কলেজ 'বারে' বিয়ারের দাম অর্ধেক, সে সব ডিগ্রির অবাধ রাজ্যে মেয়েদের অবাধ সঙ্গ ছেলেদের টেনে নিয়ে যেতে না পারে কোথায়? যায়ও। তারপর ঘটনা আয়ত্তে রাখবার শক্তি বেশীর ভাগ ছেলেরই থাকে না।

প্রতীপ যখন দেশে ফিরে এলো দেখা গেল তার গলায় কি যেন আটকে আছে। যা সে গিলতে পারছে না ওগরাতেও না। শুকিয়ে যেতে লাগলো সে দিনে দিনে। তারপর শোনা যেতে লাগলো এক আমেরিকান কন্যার উপস্থিতির সংবাদ। একদিন দুদিন নয়—দু'বছর চললো বাপ মা ছেলেতে ঠাণ্ডা লড়াই। তারপর যা হবার তাই হলো। মাকে কাঁদা, বাবাকে রোষ থামিয়ে ছেলের বিয়ের আয়োজনে নামতে হলো।

এক সুরসিকা কাকীমা বললেন, "যাই বলিস তোরা, সীতা সাবিত্রীর ভারত কিন্তু মিস টাইলারদের কাছে সতীত্বে হেরে যাচ্ছে। তাদা থেকে জল গড়ালে তোলপাড় করে ছেলেও অমলেন্দুকে চাই! কম কথা নয়।"

সত্যি তো বড় কথা!!

যাই হোক বিয়ে হলো। ছেলেও হলো। তিনটা বছরও কাটলো। কিন্তু তারপর আর কাটলো না। মানুষের টানের চাইতেও মাটির টান বেশী। মেয়েদের সেটা আরো বেশী। আমেরিকার মাটি আমেরিকান কন্যাকে—টানতে লাগলো। গঞ্জনায় গঞ্জনায় কন্যা বাধ্য করলো প্রতীপকে আমেরিকাবাসী হতে। বিদেশী মেয়ের গঞ্জনা যে দেশী মেয়েদের গঞ্জনার চাইতে কিছু উগ্র হবে তা কিন্তু দেখলো না মধুমিতা।

সেই কন্যার ভারত বাসের ক'টা বছর একটা সমগ্র পরিবার যে কত রক্ত জল করলো—এবং চলে যাবার পরও আরো কত রক্ত জল করে নিজেদের সামলালো তার সাক্ষী মধুমিতা।

প্রতীপের নাটকে যবনিকা পড়লো।

উঠলো রাজার নাটকের যবনিকা।

মা'র প্রতিজ্ঞা আর বিলেত নয়। দেশে থেকে বিয়ে হয়তো হোক—না হয় তো থাক।

কিন্তু বি. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে রাজা। তার কি বিলিতি ডক্টরেট ডিগ্রি না হলে চলে? ওর কলেজের প্রফেসর প্রিন্সিপাল পর্যন্ত এসে বাবাকে অনুরোধ করে গেলেন। রাজা যাকে যেখানে পেলো—অর্থাৎ যাদের কথা মা বাবা ঠেলতে পারেন না, তাদের ধরে ধরে এনে বলাতে লাগলো। এমন কি মধুমিতাকে দিয়েও। বল

না মধু মা বাবাকে। আমাকে তো তুই চিনিস্। আমি কি প্রতীপের মতো কাজ করব? আমি নিজের চোখে দেখলাম না মা বাবার মার খাওয়া?

রাজার কথা বিশ্বাস করেছিলও। তা ছাড়া অভিজ্ঞতারও একটা মূল্য আছে। রাজা নিশ্চয়ই প্রতীপের ঘটনা থেকে কিছু শিখেছে। শেষ পর্যন্ত মা বাবাকে রাজী করিয়েছিল মধুমিতাই।

প্রতি সপ্তাহে চিঠি। প্রতি মাসে ট্রাঙ্কল। ছুটিতে তিনমাসের জন্ত দেশে আসা—একটা বছর রাজা মনে হতেই দিলো না যে সে বিদেশে। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে এসে মাকে বুকে তুলে নিল। যাবার সময় বলে গেল, "মা আর দুটো বছর। আমিও কাটিয়ে দি। তুমিও কোন মতে কাটিয়ে দাও। তারপর আর কোনদিন তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

সেই রাজাকেও একদিন 'মা'র অসুখ' বলে মিথ্যে টেলিগ্রাম করে নিয়ে আসতে হলো।

অসুখের কথাটা অবশ্যি পুরোটাই মিথ্যে নয়। প্রতীপ তো চলে গেছেই। রাজা—রাজাও কি তাই যাবে? আর বিশ্বাস করেন না মা কাউকে। রাজাও থাকবে না, মায়ের মনের অনুভব দিয়ে সেটা যেন তিনি বুঝতে পারছেন। সত্যা তিনি সত্যি নিয়েছিলেন। রাজা আসতেও তার সেই অনুভবে ছেদ পড়েনি। এসেছিল তো প্রতীপও। কথায় বলে, 'যা রটে তা কিছু বটে।' উড়ো কথা যা কানে আসছে তার কিছু তো সত্য বটেই। মা অন্তরে পাগল হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাজাকে তিনি তাঁর অন্তরের ভয় বুঝতে দিলেন না। তার কাছে যা চলতে লাগলেন, যেন কিছুই জানেন না। রাজা সম্বন্ধে কোন শঙ্কা বা অবিশ্বাস তাঁর মনে নেই। শুধু মধুমিতাকে বললেন, "আর রাজাকে কিন্তু যেতে দেওয়া হবে না। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো।"

বুঝছিল রাজা সবই—তা মা যতই তার শরীরের কথা বলুন আর ডাক্তারবাবু মাকে হাই-প্রেসার আর হার্টের অসুখ দিন। প্রতীপের সময়কার মতো আর একটা ঝাড় বুঝে যে এগিয়ে আসছে সে জানত। একদিন মা বেড়াতে গেলে মধুমিতা যখন ওকে ডেকে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করলো, তখনও সে বুঝল এখন কি কথা উঠবে।

"তোকে নিয়ে এসে কেন বললাম, বুঝছিস নিশ্চয়ই?"

বোনের কথায় রাজা একটু হাসলো। বললো, "বুঝছি?"

"তবে বল তোর কথা।"

"আমার কথা?" মানসিক চঞ্চলতার জন্তই হয়তো রাজা বারকয় মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালালো—"আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছি মধু।" রাজার চোখেমুখে রক্ত ছোটাছুটি করছে।

"ঠিক আছে। তারপর?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকালো রাজা—"একটি বিলিতি মেয়েকে ভালোবাসি শুনে তুই বলছিস 'ঠিক আছে?'"

"একটা দেশে গিয়েছিস—সেখানে কত পরিচয় হবে। কত ছেলেকে ভালোবাসবি, কত মেয়েকে ভালোবাসবি—এর ভেতর সেটিক কথা কি আছে যে ঠিক আছে বলব না?"

"তুই আমাদের দু'ভাই-এর চাইতে অনেক শক্ত মধুমিতা।"

"প্রেম বুঝি শক্তদের কাছ থেকে দূরে থাকে আর দুর্বলের ঘাড় মটকায়?"

"প্রেম বস্তুটা ভূতই।"

"তবে ঘাড় থেকে নেমে ফেল।"

"ইচ্ছে করলেই কি পারা যায়?"

"নিশ্চয়ই পারা যায়। তবে তাকি ইচ্ছায় পারা যায় না। ইচ্ছাটা সত্যি হওয়া চাই।"

রাজা মুখে সন্ধ্যার রং নিয়েই এসেছিল। এখন সে মুখ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। এতটুকু আলো নেই কোথাও।

"কি ব্যাপার রাজা—আমাকে অন্তত খুলে পরিষ্কার করে বল?" বুকটা ধকধক শব্দ তুলছিল মধুমিতার।

চেয়ার ঠেলে হঠাৎ উঠে পড়েছিল রাজা। ঘর ময়

পায়চারি করছিল অস্থির পায়ে। তেমনি পায়চারি করতে করতেই বলেছিল—'একটি মেয়ের সঙ্গে আমার এক পার্টিতে আলাপ হয়েছিল। খুব নেচেছিলাম তার সঙ্গে। সেই পরিচয় মিনতে-মিনতে চলতে-চলতে হৃদ্যতা এসে গিয়েছিল। তারপর বন্ধুত্ব। আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা। বড়দিনের উৎসবের সময় মেয়েটি নিয়ে গিয়েছিল আমাকে তাদের দেশের বাড়ীতে। বড়দিনের একটা সপ্তাহ—নাচগান হৈ হল্লা—ড্রিঙ্ক, কোন কিছুরই মাত্রা থাকে না ওদের। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভাসিয়ে ফেলেছিলাম সব কিছুর মাত্রা! এই অবস্থার মধ্যে কখন যে বিয়ের কথা উঠেছিল, আমি ভুলেছিলাম না মেয়েটি মানে এ্যান বলেছিল—মনে নেই। তারপর কি ঘটেছিল না ঘটেছিল সে কথাও মনে করতে পারি শুধু মুছে যাওয়া ছবির মতো। কেউ যদি বলে সে সব ঘটনা সত্য—বলব সত্য। আবার কেউ যদি বলে স্বপ্ন—তবে বলব স্বপ্ন।"

যদিও মধুমিতা প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রতীপের বেলা সে দেখেছে—তা ছাড়াও অনেক দেখছে, একটা ফরিদ-পত্র রেখে তবে ওরা আসতে দেয়। তবু মাথাটা কেমন যেন শূন্য লাগছিল মধুমিতার। প্রথম কিছু সময় কোন কথাই খুঁজে পেলো না সে। তারপর বললো, "আমি বলছি স্বপ্ন।"

"তবে তাই।"

"এ্যান যদি বলে সত্য?"

রাজা এসে বললো। তার কপালে ঘামের বিন্দু—"মরা ছাড়া কোন উপায় নেই—এই বুঝছি।"

রাজার মুখে মরার কথা শুনে অসহ্য রাগে ক্ষেপে উঠলো মধুমিতা—"বাঃ চমৎকার! একেবারে জমাট নাটক!! জীবনকে নাটক করে তুলতে, নাটকীয় কথা বলতে লজ্জা করছে না তোর? মরবি—তুই মরলে এ্যানের তো ভারি আসবে আর যাবে! মরতে মরবে সেই মা-ই।"

অসহায় একটা শিশুর দৃষ্টি নিয়ে রাজা তাকিয়ে রইল বড়বোনের মুখের দিকে।

রাজার সেই অসহায় দৃষ্টি নয়ন করে ফেলল মধুমিতাকে। নরম গলায় বললো, "তোদের এ বিয়ে আইনে দাঁড়াবে?"

"তা জানিনে। কিন্তু বিবেকে দাঁড়াবে তো?"

আবার ক্ষেপে উঠল মধুমিতা—"বিবেকের কথা আর তোরা মুখে আনিসনে রাজা। বিবেক তোদের বুকে মুখ খোলে না। জানে লাভ নেই। যাবার সময় মা'র পায় হাত রেখে বড় বড় কথা বলে গিয়েছিলি—সেই সত্যে থাক। আমার বিবেক খুব পরিষ্কার রাজা—আমি বলছি, এসব মাতলামির বিয়ে বিয়েই নয়। তোর আর বিলেত যাওয়া হবে না—হবে না।"

"আমার থিসিস্ শেষ হয়নি যে?"

"এখানে করবি। এখানে ডক্টরেট্ হবি।"

প্রতীপের সময় সামনে এসে দাঁড়াবার মতো বয়স হয়নি মধুমিতার। বাবাও বেঁচে ছিলেন। রাজার সময় সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মধুমিতা।

রাজাও শিশুর মতো আত্মসমর্পণ করল বোনের কাছে।

মাকে এ্যানের কথা কিছুই জানতে দিল না মধুমিতা। বললো, "অনেক বাজে কথা রটেছে। তেমন কিছু নয়।"

মধুমিতা বান্ধবীদের ডেকে বাড়ীতে আসর বসিয়ে, সিনেমায় গিয়ে, পিকনিকের আয়োজন করে দিনগুলোকে ঠেলে রাখতে লাগলো রাজাকে একটুকু ভাববার সময় না দিয়ে। রাজাও কখনো অন্যমনস্ক মনে, কখনো স্লেট-রং মুখ নিয়ে কখনো হাসিখুসি ভাবে যোগ দিয়ে চললো। এ্যানের চিঠি আসতে লাগলো স্রোতের মতো। কিন্তু মধুমিতা ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো সব চিঠি। রাজা বোঝে চিঠি না পাওয়ার কারণ। কিন্তু কিছু বলে না।

শুভ্রা মেয়েটিকে কিছু বেশ ভালো লাগতে লাগলো রাজার। সুন্দর। স্মার্ট উজ্জ্বল। মুখে একটি হাসির ঢেউ লেগেই আছে। রাজার এই বিষণ্ণ মনে শুভ্রার হাসি আর উজ্জ্বলতা যেন অমৃতের কাজ করছিল—সুস্থ করে তুলছিল তাকে। শুভ্রা এসে রাজাকে ডাকতে হয় না। সে নিজেই এসে বসে। জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছেন?" কিংবা "কি খবর?" কখনো বলে, "চলুন সবাই মিলে একটা ছবি দেখে আসা যাক।"

মধুমিতা মাকে বলে, "এইবার শুভ্রার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন মা।"

মা ফিসফিস করে বলেন, 'পারবি রাজী করাতে?'

"নিশ্চয় পারব।" মধুমিতার ইচ্ছেটা হলো বিয়ে তো দিয়ে দেনা যাক। তারপর যদি কিছু ফ্যাসাদ বাধে—টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলবে। মা বাবার মুখে কত এমন শুনেছে—বিয়ে করে এসে আবার বিয়ে করেছে দেশে। মেমসাহেব এসে উপস্থিত হলে—দশ বিশ হাজার শুনে দিয়েছে। মিটে গেছে।

কথাটা রাজার কাছে তোলার জন্য আরো একটু সময় নিচ্ছিল মধুমিতা। শুভ্রাকে এগিয়ে দিয়ে নিজেকে ঘুরে সরিয়ে নিচ্ছিল সে—এমন সময় একদিন ভরদুপুরে একটা ফোন পেয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল রাজা। ফিরলো সন্ধ্যা বেলা। রাজার পরিষ্কার হয়ে আসা মুখে কে যেন কালী লেপে দিয়েছে।

মধুমিতা রাজার অপেক্ষাই বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছিল। ব্যাপার কি? কোথায় গেল রাজা কিছু না বলে? এ রকম তো যায় না! এবার রাজার মুখের চেহারা দেখে মধুমিতার বুকটা ধুক ধুক করতে লাগলো।

রাজা বসবার ঘরে এসে বসে পড়ে বললো, "ওঃ এমন চায়ের তেষ্টা পেয়েছে না। চা দিতে বল না লক্ষ্মীটি রামকে। আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না। এখান থেকে চেঁচালে ওর বেটারা শুনবে না।"

মধুমিতা গিয়ে চায়ের কথা বলে—রাজার কাছে বসলো—"কি হয়েছে রাজা?"

"কেন? কি আবার হবে?"

"তোর মুখের চেহারা এমন কেন?"

"কেমন? হাড়ির তলার মতো?" বলে হা হা করে হেসে উঠলো রাজা।

"হাড়ির তলার মতো না হলেও কালোই। যাদা নয়।"

"অনেক ঘুরেছি।" দুহাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল রাজা।

"কোথায় এত ঘুরলি?" রাজার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছিল না মধুমিতা।

"রেডারেণ্ড কাদার মার্লোর সঙ্গে।" বলে মুচকি হাসতে লাগলো রাজা। যেন মজা দেখছে মধুমিতাকে ক্ষেপিয়ে।

"রেভারেণ্ড মার্লো? সে কে?"

"সে একজন উঁচু দরের মিশনারী।"

"তোর কাছে নাম শুনিনি তো কোনোদিন।"

"আজই চেনা হলো।"

"একবারে বলতো কি ব্যাপার। কেন ডেকেছিল সে তোকে?"

মধুমিতার মুখে যে হাসি সেটা লক্ষ্য করছে বলেই যেন তাকে আরো চটাচ্ছে—এমনি একটা ভাব করে রাজা গম্ভীর গলায় বললো, "কাদার মার্লো আমাকে ফোনে ডাকলেন। আমি অবাক! কি দরকার থাকতে পারে তাঁর আমার সঙ্গে—ভাবতে ভাবতে গেলাম তাঁর কাছে। কাদারের কথা শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। বললো কি জানিস? বললো, 'হামি টোমাকে উদ্ধার করিতে চায়।'

আমি বললাম, "কেন আমি কি বন্দী যে তুমি আমাকে উদ্ধার করবে?" কাদার বললো, 'টুমি যে বন্দী সে কথা টুমি নিজেও জানে না। টোমাদের পিটা মাটারা টোমাদের খাঁচায় বন্দী করিয়া রাখে। টোমরা মা'র আঁচল ধরিয়া থাকিটে ভালোবাসে। টোমরা ভিরু আছো। টোমাকে হামি মুক্ত করিয়া দেবে।" বলে ভীষণ হেসে উঠলো রাজা। বললো, "নে চল একটা ছবি দেখে আসি। শুভ্রাকে ডাকার আর সময় নেই। আসরাই যাই।"

মধুমিতা ওর হাসিতে ভুলল না। ঠাট্টা গায়ে মাখে না। তার পেছনে একটা সত্য থাকে। এই কাদার কে? এই উদ্ধার শব্দের মানে কি? রাজার এমন চালাও ফুর্তি ভাবের অর্থ কি? সে এত বেরুচ্ছে কোথায়? কেবল পায়চারি করে কেন? মধুমিতা হাসে

চলে কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা হিমস্রোত বয়ে যায় তার শরীর দিয়ে।

মধুমিতা তার আরাম কেদারায় নড়েচড়ে বসলো। আয়াকে ডেকে বললো এক গ্লাস ঠাণ্ডা লরবৎ দিয়ে যেতে।

না, সে দিনটা মধুমিতা জীবনেও ভুলবে না।

সকালবেলা রাজা মা'র কাছে মোড়া টেনে এসে বসলে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ?"

রাজা বললো, "তোমার কাছে বসলাম।"

"আমার কাছে বসলি!" হাসলেন মা ছেলের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে। "কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলবি।"

"তোমার মনে হচ্ছে আমি কিছু বলব বলে ? তবে বলি একটা কিছু - ও ও ··কি বলি, কি বলি ?" তারপর যেন হঠাৎ কথাটা খুঁজে পেয়ে গেছে, এমনি করে বলে উঠলো, "আমি তোমার কাছে বসতে ভালোবাসি মা।"

মধুমিতার শরীরে সেই হিমপ্রবাহটা আবার বয়ে গেল। 'আমি তোমার কাছে বসতে ভালোবাসি' কথাটাকে সে যেন শুনতে লাগলো, 'আমি তোমার কাছে থাকতে ভালোবাসি মা।'

মা'র কাছ থেকে উঠে এসে রাজা যে কখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, মধুমিতা কেন কেউ-ই তা দেখে নি।

"দিদিমনি, দাদাবাবু ফোন করছেন।"

মধুমিতা ফোন তুলে নিয়ে বললো, "কে রাজা ?"

"হাঁ। আমি বাড়ি—"মোটা ভাঙা গলা রাজার—আর কথা বলতে পারল না।

চমকে উঠলো মধুমিতা—"কোথায় যাচ্ছিস তুই ?"

"আমি তোদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি—"

"এসব কথার মানে কি রাজা ?" মধুমিতার হাত কাঁপছে। গলা কাঁপছে। ফোনটা যেন খসে পড়ে যাবে হাত থেকে। হাতের মুঠো শক্ত করলো মধুমিতা—"তুই কোথা থেকে কথা বলছিস শিগগির বল ?"

একটা ম্লান হাসির শব্দ হলো—"আমি কোথায় জেনে লাভ নেই—"

"রাজা! আমি তোর বড় বোন। পা ধরছি আমি তোর—বল তুই কোথায় ?"

রাজা বড় গলায় বললো, "মাকে আমার প্রণাম।"

"রাজা—" কেঁদে ফেলল মধুমিতা—"বল আমাকে তুই কোথায়।"

"আমি দমদম এয়ারপোর্টে। আর ঘণ্টার মধ্যে আমার—"

বাকী কথা শোনার জন্য মধুমিতা অপেক্ষা করলো না। ফোন ফেলে দিয়ে সে তখন সিঁড়ি দিয়ে ছুটছে।

বুড়ো পিসীমা বারান্দায় বসে জপ করছিলেন। জপ ফেলে বললেন, "এমন ছুটে কোথায় চলেছিস মধু ?"

"যাচ্ছি। এলাম বলে।"

সেদিন কিভাবে যে গাড়ী চালিয়েছিল মধুমিতা এখন ভাবতেও পারে না। পুলিশের হাত মানে নি। লাল আলোর চোখ রাঙানোয় থামে নি। যমদূতের মতো বাসগুলোকে এপাশে ওপাশে কাটিয়ে কাটিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছিল দমদম। গাড়ী থেকে নামতেই দেখলো বি. ও. এ. সি. লেখা প্লেন গর্জাচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে টেক অফার করার জন্য। দৌড়োতে দৌড়োতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সে এনকোয়েরি কাউন্টারের ওপর "বি. ও. এ. সির লণ্ডন ফ্লাইট চলে গেল ?"

রিসেপশনিষ্ট মেয়েটি মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলো, "হাঁ।"

তক্ষুনি দৌড়ে বেরিয়ে এসে মধুমিতা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। প্লেনটা বিকট আওয়াজ করতে করতে শব্দ আর শরীর নিয়ে ঘুরে মিলিয়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে ধরে দুরন্ত কান্নার বেগ থামাতে লাগলো মধুমিতা,—"রাজা একটা পরিবারকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে গেলি—"

আস্তে আস্তে আবার এনকোয়েরি কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়েছিল মধুমিতা। রিসেপশনিষ্ট মেয়েটিকে বলেছিল, "দেখুন তো মিঃ আর. সি. সেন বলে কেউ এই ফ্লাইটে আছে কি না।"

প্যাসেঞ্জার লিষ্টখানা তখনও রিসেপশনিষ্ট মেয়েটির সামনেই পড়েছিল। কাগজ উল্টে পাল্টে দেখে মেয়েটি জানালো, "আছেন।"

ঘানওয়ের দিক থেকে তখন লোকজন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের তুলে দিয়ে ফিরে আসছিল। তাদের কারু মুখ বিষণ্ণ। কারু চোখে জল।

ঐ যে একজন পাদ্রী আসছে—ওকে? এক ঝলক ফুটন্ত রক্ত বুক থেকে উঠে মুখের ওপর আছড়ে পড়লো মধুমিতার—ও কি ফাদার মার্লো? রাজাকে দাঁড়িয়ে থেমে তুলে দিয়ে গেল? পিঠটান করে দাঁড়ালো মধুমিতা।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে যাচ্ছিল সেই পাদ্রী—দৌড়ে এসে তাকে ধরল মধুমিতা। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস টানতে টানতে বললো, "তুমি ফাদার মার্লো?"

পাদ্রী সাহেব—থেমে পড়লো। মধুমিতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কে?"

"তুমি ফাদার মার্লো কি না, তুমি আর. সেনকে তুলে দিতে এসেছিলে কি না তাই শুনতে চাই।"

ফাদার মার্লো দু'চোখ কুঞ্চিত করে মধুমিতার দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত সময় নিল—যেন ভাবলো মেয়েটার কথার জবাব দেবে কি না। তারপর জোরের সঙ্গে বললে, "হাঁ, মিঃ সেনকে তুলে দিয়ে গেলাম। আমি ফাদার মার্লো আছে।"

পলকে পায়ের চপ্পল খুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাদার মার্লোর গালে বাড়ি মারলো মধুমিতা—হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, "আমি ফাদার মার্লো আছে! আজ কিন্তু আর থাকতে পারবে না। তোমাদের তাড়াব এদেশ থেকে—"

ফাদার মার্লো মধুমিতার চপ্পল শুদ্ধ হাত চেপে ধরে চপ্পল ছিনিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মধুমিতা অন্য পায়ের চপ্পল খুলে আনল। সে হাতও ফাদার মার্লো চেপে ধরলে মধুমিতা একদিকে হাত ছাড়িয়ে আনবার জন্য ঘুরতে লাগলো, অন্যদিকে দাঁতে দাঁত চেপে কেটে কেটে বলতে লাগলো, "ফাদার—সব বেওয়ারিস ফাদার এসে জুটেছে। তোমাদের দেশের পুরুষ কি ইম্পোটেন্ট? একদিকে মেয়েরা পাকড়াচ্ছ, অন্যদিকে তোমরা ফাদার দেশে ছেলেমেয়ে চুরি করছ? যাও পারতো নিজেদের শক্তিতে ছেলের জন্ম দিয়ে ফাদার গিরি করো গিয়ে—" উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল তখন মধুমিতা।

ততক্ষণে ভীড় জমে গেছে। ওকে টেনে সরিয়ে আনা হয়েছে। এয়ারপোর্টের অফিসাররা ফাদার মার্লোর কাছে ব্যাপার কি জানতে চাইছে। কিন্তু ফাদার মার্লো কারু কথার কোন জবাব দিল না। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে হনহন করে চলে গেল।

বাড়ী ফিরলে মধুমিতার খালি পা, পাগলের মতো চুল, বিশৃঙ্খল শাড়ি-জামা দেখে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ছুটে চলে গেলি, পাগলের মতো ফিরে এলি—কি হয়েছে মধু?" বলে রাজাকে ডাকলেন, "রাজা দেখ এসে মধু কোথায় যেন কি কাণ্ড করে এসেছে।"

মধুমিতা মা'র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল, "তোমার ডাকে রাজা আর আসবে না মা। সে চলে গেছে।"

কপাল ভরা বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো মা'র—"কোথায় চলে গেছে? বিলেত?"

মধুমিতার মনে হলো যেন মা'র গলা অনেক দূর থেকে ভেসে এলো। মধুমিতা বললো, "হাঁ মা। কিন্তু মা রাজা সত্যি ফিরতে চেয়েছিল, ওরা দিল না। রাজাটা বোকা-বোকা-বোকা—একদম বোকা মা।"

মা'র শরীর মধুমিতার দু হাতের মধ্য থেকে আস্তে আস্তে নীচে পড়ে গেল। একবার শুধু মা ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তারপর আর না।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে দুটো বাজলো।

আয়া ঘুম চোখে উঠে এলো—"দুটো বাজলো যে দিদিমণি! তুমি শোবে না? সযত্নে রেখে গেছি—তাও দেখছি খাওনি?"

"যে—" হাত বাড়ালো মধুমিতা।

"ঠাণ্ডা সযত্নে চেয়েছিলে—এতে ঠাণ্ডা নেই আর। দাঁড়াও গরম করে নিয়ে আসছি।"

আয়া সযত্নের বাটি গরম করে নিয়ে এলো।

মধুমিতা খেতে খেতে বললো, "যা তুই খেয়ে নিয়ে। আমি এখনই খাব।"

আয়া চলে গেল।

ঠাণ্ডা দইবড়ং খেয়ে শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হলো মধুমিতার। স্মৃতিচারণ করতে করতে কত যে সে কেঁদেছে—মধুমিতা টেরও পায়নি।

এখনও বাপের ঘরের স্মৃতিস্তূপ থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারেনি মধুমিতা। হয়তো বিয়ে করলে পারবে। তখন মৃতদেহকে নতুন চাদর বিছিয়ে ঢেকে দেওয়ার মতো ও ওর নতুন জীবনের চাদর বিছিয়ে বাপের ঘরের দুঃখ ঢেকে দেবে।

কিন্তু এখনো পারছে না। এখনো সে কখনো কাঁদে—কখনো ভাবে। কত যে অদ্ভুত আর উদ্ভট চিন্তা তার মাথায় খেলে যায় তার ঠিক নেই। ও একটা বল করবে। তার স্লোগান হবে—'পাঠ্য পুস্তক বর্জনাও। রামায়ণ মহাভারত রামমোহন বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ পড়াও। নিজের দেশের ধর্ম ঐতিহ্য মনীষীদের মহৎ জীবনের আদর্শ সামনে ধর। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র দেও ধুলায় গুঁড়িয়ে। দেশের ভিত করো ধর্ম।' তারপর নিজেই হেসে ফেলে। কিন্তু বন্য আগুনের মতো জনেও ওঠে আবার তক্ষুনি—কেন হাসির কি আছে? কেন এসব হবে না? কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনীতি আর বিশৃঙ্খল শিক্ষাইতো ওদের বিশৃঙ্খল করে গড়ে তুলছে। আর দেশ সংসার দুই তলিয়ে যাচ্ছে। কেন এর শেষ হবে না?

"দিদিমণি তুমি কিন্তু শুচ্ছ না।"

"যা—এই শুলাম।" শুয়ে পড়লো মধুমিতা।

দীপঙ্কর কিন্তু আজ ফোন করলো না!

অবশ্যি সকাল বেলাই তার ফোন এলো। মধুমিতা বললো, "যখন ফোন করার কথা তখন ফোন করছ না, যখন আসার কথা তখন না এসে ফোনে মারছো—ব্যাপার কি দীপঙ্কর?"

মধুমিতার জিজ্ঞাসার জবাব এড়িয়ে গিয়ে দীপঙ্কর বললো, "কাল বিয়ে বাড়ী থেকে কখন ফিরলে?"

"আটটা সাড়ে আটটা হবে।"

"কেন? বৌভাতের দিন রাত হবে বলেছিলে। ভালো লাগলো না?"

"না তা নয়। একটি ভদ্রমহিলাকে পৌঁছে দিতে এসে জড়িয়ে পড়লাম। আর যাওয়া হলো না।"

"জড়িয়ে পড়লে মানে?"

"সে কথা পরে শুনো। আমি একটা ব্রত নিয়েছি। তোমার সাহায্য আর সহৃদয়তার দরকার হবে।"

"ব্রত। সাহায্য সহৃদয়তা!! সহৃদয়তার ইংরেজীটা কি?"

"বাংলার মানে জানো না?"

"এই একটু একটু ধরতে পারছি। কিন্তু চরিত্রে হালকা, শরীরে পল্‌কা লোক আমি। অত ওজনদার শব্দ কি ঘাড়ে তুলতে পারব?"

"ঘাড়ে তুললেই দেখবে তোমার ওজনও বেড়ে গেছে। আর যে হালকা নেই তুমি সেটা নিজেই অনুভব করবে।"

"ভেঙে যেতে পারি।"

"ডালে যদি ভেঙে যেতে পারো, তবে হালকা পল্‌কা বলে উড়ে যেতে পারো। মচ্‌কে যেতে পারো।"

"ভাঙার চাইতে ওড়াই আমার পছন্দ।"

"কিন্তু দীপঙ্কর, তাহলে তবু মাটিতে থাকবে। উড়লে যাবে বেপাত্তা হয়ে। মরবে বেঘোরে। ঘরের ঠিকানা জীবনেও আর মিলবে না। তাই ওড়া থামিয়ে ওজনটা কিন্তু বাড়াও—কিন্তু যাক সে কথা থাক। বলো খবর কি—তোমার?"

"খবর তো তোমার।"

"কি রকম?"

"তুমি ভদ্রমহিলার কথা, সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কথা বললে, কিন্তু ভদ্রলোকের কথা তো কিছু বললে না? অবশ্যি মহিলাটির সঙ্গে জড়িয়েছ বলেই যে ভদ্রলোকের সঙ্গেও জড়িয়েছ সে কথা আমি মিন করছিনে।"

"তোমার কষ্ট করে কোন অর্থ বের করার দরকার নেই। সত্য অর্থটা আমি নিজেই তোমাকে বলে দেবো সময় মতো। কিন্তু ভদ্রলোকের কথা তুমি জানলে কি করে?"

"আমার চোখ দুটো নানা জায়গায় ঘোরে।"

"তুমিও নানা জায়গায় ঘোর। কিন্তু আমার সত্যি খুব আশ্চর্য লাগছে—তুমি তার কথা জানলে কি করে?"

"তোমাদের দুজনকে গাড়ীতে দেখলাম।"

"কোথায় দেখলে?"

"রাস্তায় দেখলাম। দেখলাম তোমাদের বাড়ীর গেটে। তুমি নামছে। ভদ্রলোকটি নামলেন। চাঁদ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়তে কি যেন বললেন। কবিতাই হবে। কিন্তু চোখ যতদূর যায়, কান ততদূর যায় না তো।"

"সত্যি দুঃখের কথা। অমন সুন্দর কবিতাটি শুনতে পেলে না।"

"তুমি এখন শুনিয়ে দেও।"

"চাঁদ আর আকাশের তলায় না হলে ও কবিতা শোনা না শোনা সমান। চাঁদ আকাশ আমি যেদিন একত্র হবো সেদিন শুনিয়ে দেবো। কিন্তু তুমি আমার কিছু নিয়েছিলে নাকি?"

হেসে উঠলো দীপঙ্কর—"সত্যি নিয়েছিলাম। ঘুরছিলাম—তোমাদের দেখে ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গেই ঘুরি।"

"তুমি নিশ্চয়ই একা ঘুরছিলে না?"

"না, একা ঘুরব কেন। দিল্লী থেকে এসেছে সুমিতা—তাকে একটু কলকাতা দেখাচ্ছিলাম।"

ক'দিন ধরে কলকাতা—দেখাচ্ছে কিংবা কথাটা ওকে লুকিয়েছে কেন দীপঙ্কর—সে কথা আর তুললো না মধুমিতা। বললো, "সু-মিতা? তা তোমার বন্ধুভাগ্য ভালই দেখছি।"

"সে কথা বলতে। মধুমিতা সুমিতা—মিতার ভাগ্য আমার অবশ্যই ভালো।"

দূর সু আর মধু কি এক? ক্ষেত্র বিশেষে মধু বিষ। সু সর্বত্র উত্তম। "বিয়ের প্রস্তাব করা হয়ে গেছে?"

আবারও হেসে উঠলো দীপঙ্কর—"আমার মনে তুমি।"

"ওসব ভাঁওতা কথা রাখো। সম্প্রতি তোমার ভেতর যে একটা ছাড়াছাড়া ভাব দেখছিলাম, এখন বুঝতে পারলাম তার কারণ।"

"তোমার ভেতরও শিগ্‌গিরই ছাড়াছাড়া ভাব দেখব মনে হচ্ছে?"

"সেটা এখনই বলতে পারছিনে। তুমি আমার জন্য ভেবো না—ক্যারি অন।"

"তোমাকেও আমি বলব কি, ক্যারি অন?"

"বল।"

"ভদ্রলোকটি কে?"

"আমি কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি সুমিতা কে? অর্থহীন প্রশ্ন।"

"আরে তুমি কি সুমিতার কথা সিরিয়াসলি নিয়েছ নাকি? এ হলো যতদিন ছাড়া থাকা—ততদিন একটু চরে বেড়ানো।"

"ঠিক আছে। তুমি ছাড়া আছ, আমিও তো ছাড়াই আছি। আমিও একটুও চরে বেড়িয়ে নি। একসঙ্গে দুজনের সাথে চরে বেড়ানো তোমারও উচিত নয়। আমারও না। তুমি সুমিতাকে কলকাতা দেখাও। আমি যা দেখতে চাচ্ছি দেখি তার শেষ কি দাঁড়ায়। যদি দুজনকেই ফিরে আসতে হয়—তখন আবার দেখা যাবে।"

"আরে আশ্চর্য কথা দেখছি! তুমি কি সত্যই আমার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিচ্ছ নাকি?"

"সম্পর্ক তুলে দিচ্ছি কিনা জানি না—তবে আপাততঃ থামছি। তোমার মতবদলতা চাচ্ছিলাম, দেখছি ভগবানই আমার প্রতি এ যাত্রায় সদয়। তিনি নিজেই আমাকে সাহায্য করলেন। আচ্ছা—গুড্ নাইট্।"

রিসিভার নামিয়ে রাখলো মধুমিতা।

দীপঙ্করের সুমিতার কথা ওকে না বলাটা ক্ষুব্ধ করেছিল ওকে। কিন্তু যাক্—একটা সমস্যা নির্ঝঞ্ঝাটে অতিক্রম করে আসা গেল এটাই এখন বড় কথা।

"মধুমিতা দেবী আছেন?"

অতীকের গলা শুনে ভেতরটা নেচে উঠলো মধুমিতার। বললো, "কথা বলছি।"

"আমি অতীক।"

"আমিও কিন্তু আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

কথাটা সত্যি। আজ বিশ্বকর্মার পুজো। ছুটির দিন। আজ একটা ফোন করা যাক অতীককে। মধুমিতা রিসিভার তুলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখুনি অতীকের ফোন এসেছে।

অতীক বললো, "একটুকুর জন্ম তবে এই আনন্দটা মিস করলাম আমি!"

"আমি যে পেলাম।"

"ও, আচ্ছা।"

"সত্যি আমার ভীষণ ভালো লাগছে আপনি ফোন করেছেন বলে।"

"সেদিন আপনি জানতে চেয়েছিলেন, 'আবার কবে দেখা হচ্ছে'—আমি চুপ করেছিলাম। খুবই অন্যায় হয়েছে সেটা। আমি লজ্জিত।"

মধুমিতা বললো, "কেবল ভদ্রতার উপরই তো আছি—এক আধটা ভুল হয়ে গেলে কিছু আসে যায় না। বরং সে দিনের ভদ্রতার জবাবের বদলে আজ যে আপনার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ডাকটি পেলাম, সেটা অনেক ভালো।"

"আমি খুবই একটা মানসিক অস্থিরতার ভেতর রয়েছি—সেদিন আপনি আসাতে হঠাৎ যেন সময়টা ভালো কেটে গিয়েছিল—"

"আসব আমি?"

"চলে আসুন—"

"চমৎকার! এখুনি এসে পড়ছি। ছাড়ছি?"

"আচ্ছা।"

কোন উৎসবের সময় ছাড়া মধুমিতার ঘরের লাগে বাইরের লাগে বড় বেশী তফাৎ থাকে না। কিন্তু আজ সে নিজেকে সাজালো। বিবাহী পক্ষের প্যারিয়ার হয়ে বাবা একবার বার্মা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাছাই করা চুনি নিয়ে এসেছিলেন মধুমিতার জন্ম। সেই মোটা মোটা বেদানার দানার মতো স্বচ্ছ স্নিগ্ধ চুনির হার বালা দুল পরলো মধুমিতা। আর শাড়ি ব্লাউজ পরলো সাদা জমির ওপর সাদা জরির টানা পাড়ওলা ঢাকাই শাড়ি। আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অনেকক্ষণ—সুন্দর লাগছে তাকে। সিঁড়ি নামতে নামতে মনে মনে বলতে লাগল, দুর্গার দশহাতের নয়টি হাতেই অস্ত্র এক হাতে বরাভয়। মেয়েদের যত অস্ত্র আছে সেও ন'টি হাতে তা রাখবে। আর এক হাতে রাখবে সে বরাভয়—অর্থাৎ আশা। অন্ততঃ একটা সংসারকে দানবের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে সে। একটা সংসারের চোখের জল মুছে দেবে। ওর যতটুকু ক্ষমতা।

মধুমিতার গাড়ী থামার শব্দ পেয়ে অতীক ঝুলোনো বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। মধুমিতা ওপরে উঠে এলে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললো, "আসুন।"

মধুমিতাও প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললো, "চলে এলাম।"

"নিজে নেমে আসেন নি। ডেকেছি বলে এসেছেন। বসুন।"

মধুমিতা বসলো।

অতীকও বসলো।

মধুমিতা বললো, "না ডাকলেও আসতাম। তবে ডাকাতে আমার আত্মশ্লাঘা বাড়লো বা বলার রইল। জানেন তো মেয়েলী ভ্যানিটি খুশি হয়ে প্যাসিভ থাকতে পারলে।"

অতীক হেসে বললো, "আচ্ছা!" তারপর উঠে পড়ে বললো, "দাঁড়ান মাকে বলে আসি দু' জনের রেকফাষ্ট তৈরী করতে।"

সঙ্গে সঙ্গে মধুমিতা উঠে পড়ে বললো, "আপনি বসুন। আমিই মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

সোভনাকে মধুমিতার আসার কথা জানানোর কোন দরকার ছিল না। তিনি জানেন, মধুমিতা আসছে। অতীকই তাকে ফোন করেছে। কিন্তু সে জন্ম মনের খুশিতে তিনি উপচে পড়তে দেননি। বরং দীর্ঘ নিঃশ্বাসই ফেলেছেন—এ মেয়েকে ঘরে আনার মতো সৌভাগ্য তিনি করে আসেন নি?

শোভনা লুচি বেলছিলেন—মধুমিতা এসে বললো, "চলে এলাম মাসীমা চা খেতে।"

"বেশ করেছ মা।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে শোভনা আর মধুমিতার মধ্যে যে দৃষ্টির মিলনটুকু হলো, তার অর্থ আছে কিন্তু ভাষা নেই।

শোভনা বললেন, "অভীক লুচি ভালোবাসে তাই দুটির দিনে লুচি হয়। তুমি বোস গিয়ে। আমার হয়ে গেল।"

তড়িৎ হাতে তিনি লুচি বেলে দিতে লাগলেন। লক্ষ্মণ গ্যাসের উনোনে ভেজে তুলতে লাগল।

মধুমিতা এসে বসলো আবার। বললো, "আপনার হাতে সেদিন জেমস জয়েসের পত্রাবলী দেখেছিলাম। কিন্তু আমি পড়িনি বইটা। ভাবছি নিয়ে যাবো আপনার কাছ থেকে।"

"দিয়ে যেয়ো আপনাকে যাবার সময়। আপনার কার বই পড়তে বেশী ভালো লাগে?"

"ইউরোপীয় সাহিত্যে না বাংলা সাহিত্যে?"

"বাংলা সাহিত্য? ইদানিংকালের লেখকদের লেখা আমার বিশেষ পড়া নেই। প্রথম সারির সবারটাই পড়া আছে। তাঁদের হলে মুখ খুলতে পারব। এখনকার হলে পারব না।"

"অর্থাৎ বিদেশে যাবার পর আর বেশী সাহিত্য ছোঁননি?"

"তা বলতে পারেন।" সিগারেট ধরালো অভীক।

"নিজের দেশ সম্বন্ধে তবে আপনি একেবারে অন্ধকারেই আছেন বলুন?"

"বর্তমান সাহিত্যে আলো আছে বলে আপনার মনে হয়?"

"অন্ধকার থাকে তো তাও দেখতে হবে তো? আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে—বর্তমান সাহিত্যিকরা আমাদের রূপজীবিনী করে তুলছেন কি না। দেখতে হবে তারা সমাজ থেকে আমাদের বাইরে টেনে আনছেন কিনা। বিদেশী পোষাক, বিদেশী ভাষা, বিদেশী বই বিদেশী বৌ—আপনারা যদি সবরকমে দেশের মাটি থেকে পা তুলে নেন, মন তুলে নেন, তবে—তবে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।" যেন আর কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে মধুমিতা নিজের খারাপ লাগার কথাটাই বলে ফেললো।

মধুমিতা যখন 'বিদেশী বৌ' কথাটা বললো তখন অভীক ওর দিকে বিশেষভাবে তাকিয়েছিল। মধুমিতা কি জানে? তার কথার পেছনে কি কোন ইঙ্গিত রয়েছে? কিন্তু মধুমিতা তার চোখে মুখে কোন তাৎপর্যই ফুটে উঠতে দেয়নি। ভাবান্তর হীন মুখে সে বলে গেছে। সে জানে এ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে অভীক তার মুখের দিকে তাকাবেই তাকাবে।

খাবার দেওয়া হয়েছে জানিয়ে গেল লক্ষ্মণ।

ওরা গিয়ে চায়ের টেবিলে বসলো।

খেতে খেতে কথা চলতে লাগলো।

অভীক বললো, "আপনি বুঝি ঘোর জাতীয়তাবাদী?"

"নিশ্চই। জাতীয়তাবাদী না হয়েই আন্তর্জাতিক হওয়া যায় কি করে, আমার তো মাথায় আসে না। যত বড় মহীরুহ-ই হোক মাটি ছাড়লেই সে মৃত। গাছ আগে মাটির তারপর তো আকাশের? মাটির শিরা উপশিরা আঁকড়ে ধরে তারপর তো সে আকাশের দিকে মাথা তুলে উঠতে পারে? বলুন সত্য কিনা?"

"গাছের ব্যাপারে তো সত্য নিশ্চয়ই।" লুচির উপর বেগুন ভাজা রেখে রোল বানাতে বানাতে অভীক বললো।

মধুমিতাও মুখে লুচি ঠেসে বললো, "গাছের ব্যাপারে যেমন সত্য, মানুষের বেলাও তেমনি সত্য।"

শোভনা আরো লুচি তরকারী এনে ওদের প্লেটে তুলে দিলেন। মধুমিতা হাত দিয়ে প্লেট ঢেকে বললো, "আর পারব না মাসীমা। দুপুরের খাওয়া প্রায় হয়ে গেল।"

চা পর্ব শেষ করে বসবার ঘরে এসে মধুমিতা বললো, "এবার আপনি বলবেন আমি শুনব। না হয় ইংরেজী সাহিত্য নিয়েই বলুন। যদিও আমার তাতে একেবারেই মন নেই।"

অভীক বললো, "তার চাইতে চলুন বেরিয়ে পড়ি। শরতের আকাশ আজ বড় সুন্দর। রোদটি মিষ্টি। হাওয়াটা ঠাণ্ডা।"

বেরিয়ে পড়লো ওরা।

বেরুবার সময় শোভনাকে বলে আসতে গেলে আবারও শোভনার সঙ্গে মধুমিতার চোখ মিললো। যে মিলনের অর্থ আছে কিন্তু ভাষা নেই।

অভীকের এই বেরুবার ইচ্ছাকে কিছুদিনের ভেতরই রোজ বেরুবার ইচ্ছায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল মধুমিতা। হঠাৎ গাড়ী নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে অফিসে পৌঁছে দিতে আসতে লাগলো। বিকেলবেলা ছুটির সময় গিয়ে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, "ভালো লাগছে না। তাই চলে এলাম। বাড়ী ফিরে করবেন কি? চলুন কোথাও কফি খেয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসা যাক।"

সময় নেই। সময় নেই হাতে। তবে প্রতীপের কন্যার মতো এক কন্যা এসে হাজির হবে কে জানে! কবে কারার মালোর মতো এক পাত্রীর উদয় হয়ে তাকে মেনে তুলে দেবার মতো, অভীককেও মেনে তুলে দিয়ে আসবে কে জানে!

মধুমিতা যে অভীকের মুখের কালী মুছে ফেলতে পেরেছে তা নয়। সে যে তার অন্তমনস্কতা দূর করতে পেরেছে তাও নয়। কিন্তু ভেতরের ভাবনা যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ তো এসব থাকবেই। অভীকের মুখ কেবল রাজার মুখকে মনে করিয়ে দেয়। বোঝে মধুমিতা রাজার মতোই সেও পথ দেখতে পাচ্ছে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার ধারে বসে অভীক বললো, "আজকাল বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে 'তুমি' বলাটাই চলে বেশী। আপনি আর আমি যে কেন সেই 'আপনিতেই আটকে আছি বুঝতে পারছিনে?"

"আপনি না শুরু করলে, আমি কি করে করি? বলেছিনা মেয়েরা প্যাসিভ্ থাকতে ভালোবাসে।"

"এখনও তোমাকে 'আপনি আপনি' করতে আমার বাজে লাগছে। তুমি করে ফেলনাম—কি বলো?"

মধুমিতা বললো, "আমি যদিও সামনে আপনি বলেই কথা বলি, কিন্তু মনেমনে সবসময় আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি অভীক, তুমি বলে।"

"মনে মনে?"

মধুমিতার চোখের সঙ্গে চোখ মিললো অভীকের।

অভীক মধুমিতার হাতটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, "জানিনা এ কাজটা আমার অন্যায় হচ্ছে কিনা—তবু না নিয়ে পারলাম না মধুমিতা। যদি কখনো কিছু শোন—আমাকে পর ভেবো না। তোমার হাত হাতে নেওয়ার ইচ্ছাটা আমার সত্য।"

"কখনো কিছু আমি শুনবই না।" মাথা দুলিয়ে চললো মধুমিতা। "আমি তোমাকে বিয়ে করব।"

হেসে উঠলো অভীক। বললো, "মেয়েরা প্যাসিভ থাকতে ভালোবাসে সেই থেকে শোনাচ্ছ। হঠাৎ এমন এগ্রেসিভ?"

শারদীয় অভিনন্দন

লিলি
ব্র্যাণ্ড
বালি

লিলি বালি মিলস্ প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-৪

"উপায় নেই যে। এখন আমি যদি এ্যারেস্টেড্ না হই তোমাকে পাব না।"

"মধুমিতা! তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। হয়তো আরো আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু তোমার মনটা আমায় এমন আঘাত দিচ্ছিল যে, পাছে তুমি সব শুনে চলে যাও—সে ভয়ে আমি মুখ খুলিনি। কিন্তু আর না বলা উচিত হবে না। যত দেরী করব তত আমার অন্যায় বেড়ে যাবে।"

মধুমিতা বললো, "তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি জানি।"

"জানো? কার কাছে শুনলে?"

"কারু কাছে নয়। তোমায় দেখে।"

"আমাকে দেখেই সব কথা কি করে বুঝে নিলে?"

"মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তার সব কিছু তারা তাদের সহজাত অনুভব দিয়েই বুঝতে পারে।"

"একটু শুনি কি জান?"

"বিদেশে ছিলে অনেক দিন। কাউকে বিয়ে করে ফেলেছিলে।"

অভীক ভীষণ আশ্চর্য হলো। ওর বিয়ের কথা কেউ জানে না। এটা ওর আর ছেলার ভেতর একান্ত —গোপন ব্যাপার। ছেলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে এ কথা প্রকাশ করতে পারবে না—যতদিন না অভীক বলে। তাই অভীক বললো, "বিয়ে করে এসেছি কেন বলছ? ভালোবেসেও তো আসতে পারি?"

"তা পারো। কিন্তু চার বছরের উপর দেশে ফিরে এসেছ—এখনও চিন্তায় ভাবনায় পাথর হয়ে আছ——এ হয় না বিয়েটিয়ে করে আটকে না গেলে। প্রেমের অভিজ্ঞতার শেষ রায় কি জানতো? 'চোখের বার তো মনের বার।' আর তোমরা যারাই বিলেত থেকে আস, তাদেরই ভালোবাসা আর যেতে চায় না। তোমাদের যাওয়া যায়, ঘুম যায়, সংসার ভাঙে তবু প্রেম যায় না—এমন প্রেম একমাত্র স্বপ্নেই জন্মায় দেখছি কিনা—তাই প্রেমে মায়া নেই বলে বিয়ে বলছি।"

"তাই যদি হয়, তবে তুমি কি করে বলছ আমাকে ভালোবেসেছ—আমাকে বিয়ে করবে?"

"জেনে শুনেও মানুষ অনেক ভুল করে। আমি জেনে শুনেই ভুল করেছি। এখন কি করতে বলো আমাকে, তুমিই বলো অভীক? চলে যাবো?"

অভীক হঠাৎ মধুমিতার হাতটা ব্যাকুলভাবে ঠোঁটের উপর চেপে ধরে বলতে লাগলো, "না, না, না। তুমি চলে যাবে না—কখনোই না। আমি বলব না। তুমি বলো মধুমিতা, এখন আমি কি করব? তুমি যা বলবে তাই করব আমি।"

"ঠিক?"

"ঠিক। ঠিক। ঠিক—তিন সত্য করলাম মিতা। আমিও তোমাকে ভালোবাসি।"

"কোন কথা বলতে পারবে না। আমি যা বলব নীরবে করে যাবে?"

"যাবো। সব দায় তোমার?"

"সব দায় আমার। এমন কি ছেলার পর্যন্ত।"

"ঠিক আছে।"

"চল রেজেষ্ট্রারি অফিসে। এক্ষুনি আমাদের বিয়ে হবে?"

"নোটিশ দিতে হয় না একমাস আগে?"

"টাকা ফেলে একমাস আগের নোটিশ করিয়ে নেবো। টাকায় সব হয়।"

"চল। কিন্তু আমার কাছে বিশেষ টাকা নেই।"

"সে সব আমি বুঝব।"

মধুমিতা প্রথমে গেল বাড়িতে। অভীককে গাড়িতে বসিয়ে রেখে বললো, "তুমি একটু বোস। আমি এক্ষুনি আসছি।"

ঘরে এসে সে রাইটিং টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড় হয়ে কলম ছুটিয়ে যেন প্যাডে কি লিখল। তারপর চেক্‌বই বের করে তাতে একটা মোটা অঙ্ক বসিয়ে তলায় সই দিলো। চিঠি আর চেক্‌টা ভাঁজ করে এনভেলাপে ভরে মুখ আটকে ব্যাগে রাখল। তারপর গয়নের খুলে টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

ওরা যখন রেজেষ্ট্রারি অফিসে ঢুকল তখন দাড়ে দাতটা। যখন বেরিয়ে এলো যুক্ত সই দিয়ে তখন আটটা।

তারপর অভীককে নিয়ে মধুমিতা গেল জি.পি.ও-তে। ব্যাগ থেকে চেক আর চিঠি ভরা এনভেলাপটা বের করে অভীকের হাতে দিয়ে বললো, "টেলার ঠিকানাটা লিখে দেও তো।"

অভীক নীরবে ঠিকানা লিখে দিল। সেই চিঠি ব্যাগে ফেলে মধুমিতা এবার অভীককে নিয়ে ফের বাড়ি এলো। নিজে নেমে ঘুরে এসে অভীকের দিকের দরজা খুলে ধরে—বললো, "এসো"।

অভীককে নিয়ে নিজের ঘরে এলো মধুমিতা।

অভীক ওর ঘরে আরো এসেছে। মধুমিতার ঘর অপরিচিত ঘর নয় অভীকের কাছে।

অভীক এসে আরাম-কেদারায় বসলো। মধুমিতাকে টেনে পাশে বসালো।

মধুমিতা বললো, "টেলাকে কি লিখলাম জিজ্ঞাসা করলে না অভীক?"

"কিছু দরকার নেই। তুমি যা করবে ভালো করবে —এটা জানি।"

"টেলাকে আমি দশ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিলাম।"

"আমি কিছু শুনতে চাই না।"

"ঠিক আছে।"

"কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে। আর এখানে থাকতে পারবে না। আজই আমার সঙ্গে যাবে—আমাদের বাড়ীতে।"

"এমন চুপি চুপি যাবো কেন শ্বশুর বাড়ি? নানাই বাজিয়ে যাবো।"

"সেটা কবে?"

"সাত দিনের মধ্যে।"

অভীক মধুমিতার বুকে মুখ গুজলো। অভীকের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে মধুমিতার দু'চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো—মনে মনে বলতে লাগলো, রাজা জীবনে যদি আমি কিছু ভালো কাজ করে থাকি, তবে তার পুণ্যফল আমি তোকে দিচ্ছি। তুই যেন জীবনে সুখী হোস। সব অমঙ্গল থেকে যেন ভগবান তোকে রক্ষা করেন।

• • •

স্বাধীনজিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রার বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্বাদের জোর বেশী বলে জানি। মনে হয় যেন, ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠলে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। যে প্রার্থনা তাঁদের সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে বোনেরাই দেয় ভাইফোঁটা। আমরা জানি, সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের যে কেবল আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ উদ্যান। প্রভাত। রাণী সুদর্শনার সখীত্রয়—হৃদ্যা, নন্দা ও সন্ধ্যা পুষ্পচয়ন করিতেছে ও বসন্তের আবাহন-গীতি গাহিতেছে। রাণী সুদর্শনার প্রবেশ।]

সুদর্শনা। (সখীদের প্রতি) আজ যে তোরা মেতে উঠেছিস! ব্যাপার কি?

হৃদ্যা। নব বসন্তে আজ যে মদনোৎসব সখি, তা কি ভুলে গেছ?

সুদর্শনা। ও, হাঁ, আজ ভদ্রা পূর্ণিমা। কিন্তু কা'কে নিয়ে হবে মদনোৎসব! তোমাদের রাজা কোথায়?

নন্দা। মহারাজা কি এখনো জাগেননি সখি? ঘুমিয়েই আছেন?

সুদর্শনা। এত বেলা হয়েছে—জেগেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার জীবনে মহারাজ ঘুমিয়েই রইলেন চিরদিন। জাগলেন না কখনও। আশ্চর্য লোক। উল্লাস নেই, উত্তাপ নেই, মনে হয় প্রাণহীন যেন এক পাথর।

সন্ধ্যা। রাতদিন রাজ্যের কথাই ভাবেন। রাজকার্য নিয়েই মেতে থাকেন। প্রজারাই ওঁর জীবন।

সুদর্শনা। হাঁ, সন্তানের অভাব প্রজাদের দিয়ে পূর্ণ করেছেন। কিন্তু আমার হাহাকার পূর্ণ করবে কে? যাক—আজ যে মদনোৎসব—রাজার কি তা স্মরণ আছে?

হৃদ্যা। আমরা ত' ভেবেছি—তুমি রাজাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ সখী।

সুদর্শনা। স্মরণ ছিল না আমার নিজের। কি স্মরণ করবো? কাকে স্মরণ করবো? শীত আর বসন্ত—আমার জীবনে এক। তফাৎ নেই এতটুকু। শীতে নেই উত্তাপ, বসন্তে নেই উল্লাস।

ছিঃ সখী। রাজাকে তুমি এত ভুল বুঝনা—বুঝনা সখী। তোমাকে তিনি ভালবাসেন।

গভীর তাঁর প্রেম—তাই তাতে নেই উচ্ছ্বাস। চল সখী, মদনদেবের মন্দিরে। বসন্তের এই পুণ্য প্রভাতে—তাকে প্রণাম করে আসি।

সুদর্শনা। না, না, না। রাজপুরীর বাইরে রাজপথে আর আমি বেরুতে পারি না—পারব না।

নন্দা। কেন সখী ?

সুদর্শনা। রাজপথে রথারোহণে যখন যাই জয়ধ্বনি শুনি আমার। চোখে পড়ে সন্তানবতী সব নারী। মাতৃবক্ষে কত শিশু। আমার চোখ জ্বলে যায় নন্দা—আমার চোখ জ্বলে যায়।

সন্ধ্যা। মনে কর না রাণী—তারা তোমারই সন্তান। রাজা যেমন মনে করেন।

সুদর্শনা। অক্ষয়ভার সান্ত্বনা—রাজা উপভোগ করছেন—করুন। আমি পারব না। আমি ত' অক্ষম নই। তোরা যা—মন্দিরে। কর—তোরা উৎসব। উৎসব হোক্ ঘরে ঘরে।

সন্ধ্যা। সে কি রাণী! তোমাকে বাদ দিয়ে উৎসব! তাকে কি কেউ উৎসব বলবে!

সুদর্শনা। তোরা জানিস্ না—জানিস না তোরা। তাই বলিস এ কথা। অথবা জানিস—মন রাখতে বলিস মিথ্যা কথা।

নন্দা। এ তুমি কি বলছ রাণী ?

সুদর্শনা। জানিস না তোরা—আমাকে দেখলে লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলে—অলুক্ষণে, বন্ধ্যা। এক ভিখারিণীর দুঃখ দেখে কাল গিয়েছিলাম তাকে ভিক্ষা দিতে। ভয়ে ভয়ে সে ভিক্ষা নিলে। কিন্তু তারপরে কি দেখলাম জানিস ? দূরে গিয়ে সে ভিক্ষা সে ফেলে দিলে।···তোরা যা, তোরা যা···

নন্দা। কিন্তু তোমায় ফেলে কি করে যাবো আমরা ?

সুদর্শনা। (সক্রোধে) যা বলছি।

[সখীরা ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল। রাণী সুদর্শনা কাহারও দর্শন প্রত্যাশায় চারিদিকে তাকাইলেন। অবশেষে একটি বেদীতে বসিলেন। দেখা গেল- একটি ফুলের তোড়া হাতে লইয়া উদ্যানের মালিনী রাণীর কাছে আসিয়া তোড়াটি তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া উঠিল। রাণী তোড়াটি হাতে লইলেন।]

সুদর্শনা। এ তোড়া তুই বেঁধেছিস ?

মালিনী। হাঁ।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা। এত ভাল তোড়া তুই আমার কবে বাঁধলি ? সত্যি বল।

মালিনী। সে বেঁধেছে।

সুদর্শনা। তোর স্বামী ?···তাই বল। তোর স্বামী বুঝি চাঁপা ফুল খুব ভালবাসে ? তাই এত চাঁপা ফুল দিয়েছে ?

মালিনী। চাঁপা ফুলের মত তোমার রঙ্—তাই।

সুদর্শনা। তুই বুঝি তাকে বলেছিস ?

মালিনী। সে নিজে তোমায় দেখেছে যে—একদিন।

সুদর্শনা। রাজপথে রথে হয়ত আমায় কোনো দিন দেখেছে কিন্তু তাতেই সে এত দেখেছে ?

মালিনী। পথেও দেখেছে—তবে সে দেখেছে দূর থেকে কিন্তু আমার অসুখ হতে ওকে পাঠিয়েছিলাম আমার বদলে বাগানের কাজে। সেদিন খুব কাছে থেকে দেখেই না সে আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে—মরতে বসেছে।

সুদর্শনা। হুঁ। কিন্তু ভাবছি—কি করে তোদের সাহস হলো ? এ-বাগানে রাজা ছাড়া আর কোন পুরুষের আসা নিষেধ। তোর অসুখ হলো—বাগানে কাজ না হয় একদিন না-ই পড়তো। কোন্ সাহসে তুই তাকে পাঠালি বল্ দেখি ?

মালিনী। সাহসে নয় রাণীমা—ভয়ে, গর্দানের ভয়ে। অসুখ বলে বাগান ছাঁটা দিতে একদিন কসুর হতো—রক্ষা ছিল আমার ? তাই না পাঠালাম ওকে।

সুদর্শনা। আমি কিন্তু তাকে দেখিনি।

মালিনী। তোমার দেখবার তো কথা নয় রাণীমা। আমি যে বলেই দিয়েছিলাম—কেউ যদি রাণীমাকে দেখে—গর্দান যাবে তার।

সুদর্শনা। হাঁ,—আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু সে

আমাকে দেখেছে। খুব কাছে থেকে দেখেছে।

কোথা থেকে ?

মালিনী। তুমি যখন ঐ সরোবরে স্নান করছিলে—দেখেছে তখন ঐ অশোক গাছের আড়াল থেকে।

সুদর্শনা। কি দুঃসাহস! প্রাণের ভয় ছিল না!

মালিনী। প্রাণের ভয় ছেড়ে দিয়েই দেখেছিল। প্রাণের ভয় ছেড়ে দিয়ে আজও সে এসেছে।

সুদর্শনা। এসেছে? কোথায় সে?

মালিনী। ঐ ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ নারকেল গাছের আড়ালে। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে রাণীমা—ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কি করে ওকে বাঁচাব—আমি জানি না—জানি না!

সুদর্শনা। ওকে বাঁচাতে হলে—ওকে মরতে হবে। হাঁ—ওকে মরতে হবে—মরতে হবে। আর। দেখিয়ে দে—কোথায় সে!

[রাণী সুদর্শনা নারকেল গাছের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল মালিনী]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি আম্রবৃক্ষতলে সারা দেহ ভস্ম বিভূতি মাখিয়া এক তরুণ সাধু বসিয়া আছেন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁহার পদধূলি লইতেছে। সাধু মৌনী; তিনি নীরবে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন।]

রাজানুচর। [সমাগত লোকদের প্রতি] সাধুবাবার কাছে এখন কেউ থাকতে পাবে না। রাজারাণী সাধুবাবার দর্শনে আসছেন। চলে যাও—এখান থেকে, এখন সবাই চলে যাও। চলো—চলো।

[সমাগত লোকজনদের মৃদু গুঞ্জন। রাজানুচর তাহাদিগকে বিতাড়ন করিয়া লইয়া গেল। মালিনী সাধুর পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া সম্মুখে আনিয়া রাখিল।]

[সাধু নীরবে ফুলগুলি দেখিতে লাগিলেন]

মালিনী। প্রভু, পূজার ফুল।

মালিনী। এখানে তো কেউ নেই। মুখ খোলো, দুটো কথা বলো।

সাধু। কি, আর বলবো। আমি অবাক্ হয়ে গেছি, বৌ। ছিলাম সামান্য এক মালী। লোকে ছায়া মাড়াতে চাইতো না। ছাই ভস্ম মেখে যেই সাধু সেজেছি, রাজ্যের লোক এসে পায়ে পড়ছে। পায়ের ধুলো নিচ্ছে। আশীর্বাদ চাইছে। রাণী শিখিয়ে দিয়েছিলো কথা বলো না, মৌনী হয়ে থেকো। তাই রক্ষে। কথা বললেই বেরিয়ে পড়তো বিদ্যাবুদ্ধি। কথা কই না, লোকের ভক্তি তাতে আরো বেড়ে গেছে। রাজ্যের ঘরে ঘরে আজ শুধু আমারি কথা "সাধুবাবা"—"মৌনীবাবা"। আমার চোখের দৃষ্টিতে লোকের ব্যারাম সারছে, বিপদ কাটছে, টাকা হচ্ছে, দুঃখ ঘুচছে। হ'লো কি মালিনী, হলো কি?

মালিনী। রাণীর বুদ্ধিতেই সব হয়েছে। সাধু সাজালেই এ-সব হয়। রাণীর কথায় দেশত্যাগী হলে। ঘটনা হল তুমি মরে গেছ, আমি বিধবা সেজে একটা বৎসর কাঁদলাম। ছাই ভস্ম মেখে, মৌনীবাবা সেজে ফিরে এলে তুমি। রাজ্যের লোক তোমার পায়ে পড়ছে, সবই বুঝলাম, কিন্তু এখনো—বুঝলাম না, রাণীর কি মতলব, কি করে তুই তাকে পাবি, সে তোকে পাবে?

সাধু। কি তার মতলব, এখনই দেখবি। ঐ দেখ—রাজা আসছেন—রাণী আসছেন। রাণী! সেই রাণী! আজ নিজে আমার কাছে আসছেন। ফুলের ডালা আমায় সাজিয়ে দে; উতাড় করে আমি ওর পায়ে ঢেলে দেব।

[শান্ত সমাহিতভাবে সাধু অপেক্ষা করতে লাগল, মালিনী পুষ্পার্ঘ সাজাইতে লাগিল। রাজা ও রাণী যুক্ত করে প্রবেশ করিলেন]

রাজা। তোমার পুণ্য পাদস্পর্শে রাজ্য আমার ধন্য। প্রজারা কৃতকৃতার্থ। রাজা আমি, কিন্তু আমার

মতো এত বড় দুঃখী আর কেউ নেই প্রভু! আমি অপুত্রক। আমার দুঃখ দূর কর।

রাণী। জীবন আমার ব্যর্থ। রাজপুরীতে এসে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করি। দয়া কর প্রভু, দয়া কর।

[সাধু নীরব, নিশ্চল রহিলেন।]

রাণী। কত লোকের কত মনস্কামনা তুমি পূর্ণ করেছ। শুধু এই হতভাগিনীকেই কি তুমি কৃপা করবে না প্রভু?

[সাধু ইঙ্গিতে রাজা ও মালিনীকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন]

রাজা। রাণী, সাধুবাবা হয়তো তোমাকে গোপনে কিছু বলতে চান। যেমন করেই হোক্—ওঁর দয়া তোমাকে পেতেই হবে রাণী! আমি তোমার জন্য অদূরে অপেক্ষা করছি।

[রাজা চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে মালিনী গেল]

রাণী। তুমি আমাকে চেয়েছিলে। আমি এসেছি।

[সাধু নীরব রহিলেন।]

রাণী। না, না—আর মৌনী হয়ে না থাকলেও চলবে। কেউ নেই এখানে—কথা কও—

[সাধু তথাপি নীরব রহিলেন]

রাণী। না,—না—আমি তোমাকে মৌনী হয়ে থাকতে বলেছিলাম সবার কাছে—যাতে ধরা না পড় তুমি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? নিষেধ তো করিনি। আমি তোমার কাছে ধরা দিতে এসেছি—তুমি আমাকে ধরা দিচ্ছ না যে? চলো আমার প্রাসাদে। আমাকে পুত্র দাও—

[সাধু তথাপি নীরব রহিলেন]

রাণী। একি! তবু তুমি নীরব? কার ভয় করছ তুমি? রাজার? ঐ অক্ষম রাজাকে ভয় করিনা ভয় করো না তুমি আমি—আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি প্রাসাদে। রটনা করেছি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হবে—প্রাসাদ উদ্যানে গড়েছি তোমার মন্দির—সে মন্দিরে থাকব শুধু তুমি আর আমি। —ওঠ, আমি তোমার পায়ে পড়ছি—আমি—আমি—রাণী সুদর্শনা···

সাধু। তুমি সুদর্শনা। কিন্তু তোমার চেয়েও সুদর্শনা নারী আমার পদধূলি নিয়ে ধন্য হয়েছে। দেশের রাজা প্রণাম করেছেন আমাকে। ধনী বল—নির্ধন বল—সুখী বল—দুঃখী বল—কাছে এসেছে—পূজো করেছে। পূজো করেছে আমাকে! কে আমি! হীনহীন নগণ্য এক মানুষ। লোকের অস্পৃশ্য ছিলাম আমি। তুমি—তুমি রাণী সুদর্শনা—আমাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছ। তোমারি কথাতে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যাই দূরে—বহু দূরে। আবার ছাই ভস্ম মেখে সাধু সেজে ফিরে আসি তোমারি দুয়ারে। কিন্তু আজ আর আমার তৃষ্ণা নেই। সাধুর এই মিথ্যা সাজ যদি আমায় দিয়েছে এত ধন, এত রত্ন, এত অর্থ, সেই মিথ্যা যদি আমার জীবনে সত্য হয় সুদর্শনা—পাব আমি পরমার্থ, আমার সকল তৃষ্ণা, আমার সকল কামনার মোক্ষ। আমার জীবনে এসেছে এক নতুন আলো—সে আলো জেলেছ তুমি। আমার নবজন্মের গুরু তুমি—তোমাকে প্রণাম।

[ফুলগুলি রাণীর চরণে অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিল। সুদর্শনা পাষাণী দেবীর মত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন।]

—যবনিকা—

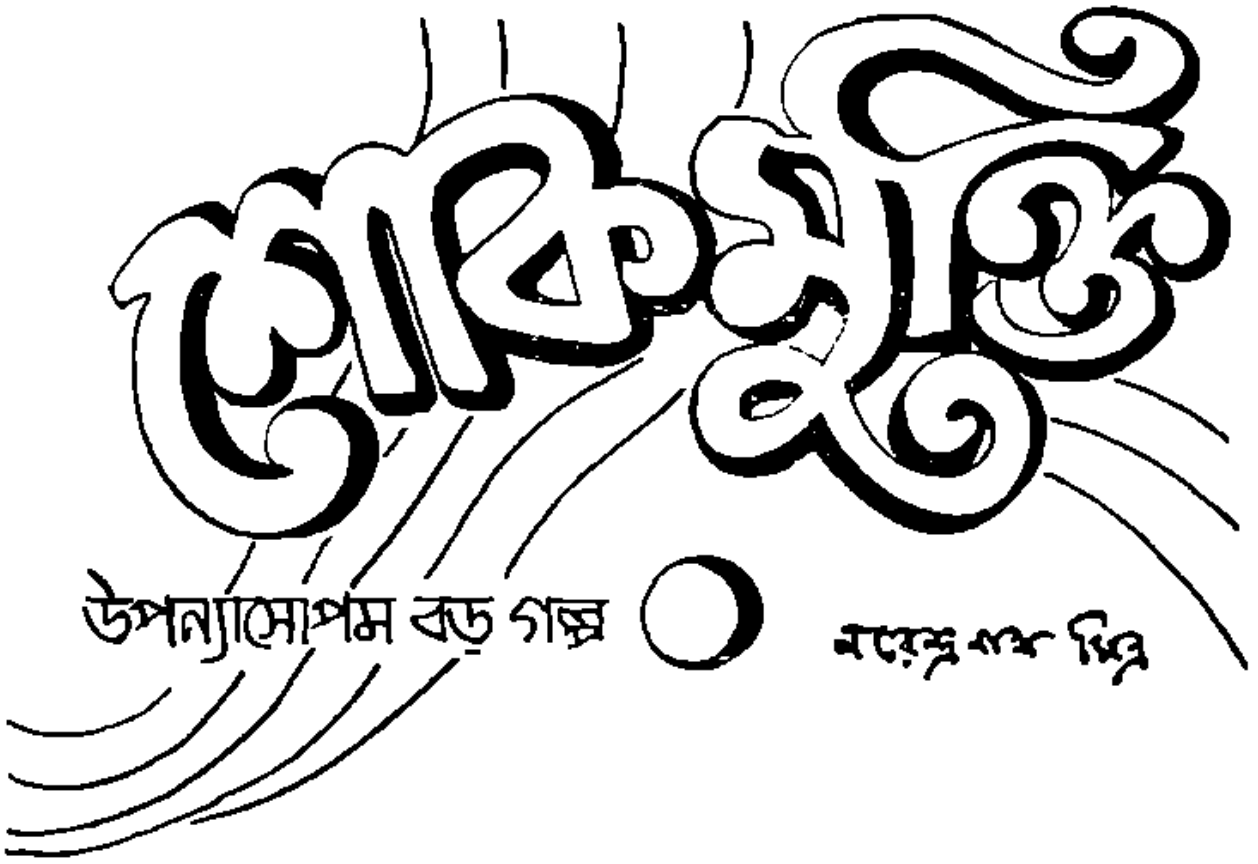

বউভাতের দিন আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রায় সবাই এলেন। বন্ধুদের মধ্যেও প্রায় কেউ বাদ গেল না। এলনা শুধু বিমল। ও না আসায় আমার খুবই খারাপ লাগল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি একটু স্বস্তিও বোধ করলাম। এই রঙ্গিত পৌরুষের অর্ধউন্মাদ বন্ধুটিকে আমার জীবনের বিশেষ এক উৎসবের মধ্যে ঠিক যেন পেতে চাইনি।

দলে দলে নিমন্ত্রিতেরা আসছেন। আত্মীয়স্বজনের দল, বাবার বন্ধুদের দল আমার সমবয়সী অসমবয়সী বন্ধুরা, সহকর্মীরা সব আসতে লাগলেন উপহার সম্ভার হাতে নিয়ে। যেসব জিনিষ প্রয়োজনে লাগে ব্যবহার করা যায় সেগুলির আধিক্য আর আভিজাত্যও বোধহয় বেশি। টি-সেট, ইস্ত্রি, হিটার তাছাড়া নববধূর জন্যে বসন ভূষণ তো আছেই। অভ্যর্থনার জন্যে বাবা ছিলেন, কাকারা ছিলেন মামারা ছিলেন। তবু যারা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু তাদের আমি নিজেই আপ্যায়ণ করলাম। নতুন বউ সুপর্ণা উৎসবের রাণী সেজে বসে আছে। বন্ধুদের তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

উপহার হিসাবে কেউ কেউ বই-টইও নিয়ে এসেছে। বেশির ভাগই চটি চটি কবিতার বই না হয় হাল আমলের মোটা মোটা উপন্যাস। অলোকের উপহারের মধ্যে অনন্যতা আছে। ও এনেছে মার্কস এঙ্গেলস আর লেনিনের সিলেক্টেড রাইটিংস। তা দেখে কবিবন্ধু শুভেন্দু ঠাট্টা করে বলল 'অলোক তোর সব ব্যাপারেই একটা কিছু অলৌকিক কাণ্ড আছে। তুই যে রাজনীতি করিস তা আমরা সবাই জানি। তার জন্যে এই মসি লিখিত সুসমাচারগুলি না আনলেই পারতিস।'

অলোক জবাব দিল, 'ভুল হয়ে গেছে। তোর সঙ্গে দেখা হলে পরামর্শ করে একখণ্ড কামসূত্র কিনে আনা যেত।'

শুভেন্দু এখনো প্রেম আর প্রকৃতির কবি। আর অলোক সেন রাজনীতি ছাড়া কিছু বোঝে না। দুজনের মধ্যে দেখা হলেই ঝগড়া হয়।

প্রভাত বলে, 'তোদের এত বিবাদ কিসের বলতো। একজন বাম মার্গী আর একজন বামা মার্গী। মাঝখানে শুধু আকারটুকুর তফাৎ।'

ছাদের ওপর খাওয়ানোর ব্যবস্থা। আমি ওদের নিয়ে গিয়ে একটি বেঞ্চে বসিয়ে দিলাম। শুভেন্দু আর অলোক পাশাপাশি বসল।

প্রভাত বলল, 'আমাকে মাঝখানে বসতে দিলে পারতিস। ওরা দুজনে তো ঘুষোঘুষি করবে। পাশে বসে আমি কতখানি আর মধ্যস্থতা করতে পারব।'

পাতে লুচি আর পটল ভাজা পড়া পর্যন্ত আমি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেই সময়টুকুর মধ্যেই অলোক জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের আর এক প্রেমিকের খবর কি? বিজন! বিজন আসেনি?'

আমি বললাম, 'দেখছি না তো।'

অলোক বলল, 'ওর নাকি একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তার কথা এখন থাক।'

অলোক একটু হাসল। 'প্রদীপ, তুমি বড় টাচি, আমরা সবাই বন্ধু। কিন্তু বিজনের সঙ্গে তুমি একেবারে হরিহরাত্মা। যে দুর্ঘটনাটা বিজনের বেলায় ঘটেছে তোমার বেলাতেও তা ঘটতে পারত।'

প্রভাত অলোককে ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ কি হচ্ছে এসব। এই শুভদিনে কী অলুক্ষুণে কথা।'

অলোক অপ্রস্তুত হয়ে এবার খাওয়ায় মন দিল।

আমি ওদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বললাম, 'তোমরা খাও। আমি নিচে যাচ্ছি। আরো অনেকে আসছেন।'

প্রভাত বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমাদের জন্যে ভেবনা। আমরা কেউ লজ্জা করে খাবনা। আর অলোক তো জন্তুর মত খাবে।'

অলোক ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কেন? আমার মধ্যে জন্তুস্বভাব কিসে দেখলে।'

প্রভাত তাতাতাড়ি রিট্রিট করল 'জন্তুস্বভাব আমাদের সবাইর মধ্যেই আছে। এখনকার দিনে মানুষের ডেফিনেশন Man is a political animal.'

কোন মন্তব্য না করে আমি নিচে নেমে এলাম। নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে আসছেন। বহুকাল যাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়না যাঁরা, বহু দূরে থাকেন, কি কাছে থেকেও কাছে আসবার যাঁদের সময় সুযোগ হয় না তাঁরাও এসেছেন দেখে ভারি আনন্দ হল। পুরোণ ব্যয়বহুল, সময় অপচয়কারী এই সব অতিকায় অনুষ্ঠানের আমি পক্ষপাতী নই। কর্মকর্তা বাবা। তিনি যা করবার করছেন। আমি শুধু এই বৃহৎ উৎসব অরণ্য থেকে আমার রুচি অনুযায়ী ছোট ছোট সৌন্দর্যের ফুল চয়ন করে বেড়াতে লাগলাম। এসব ব্যাপারে আমার বন্ধু অলোকের কী মত তা আমি জানি। সে বলে, 'তুমি তোমার ঠাকুরদার আমলের মানুষ। একটু বেড়েপুছে তুমি সেই কালকেই ধরে রাখতে চাও। আর আমরা সেই ধসে পড়া বনেদের অযোগ্য ইমারতকে ভেঙে চুরে সাফ করে তার জায়গায় নতুন সৌধ গড়ে তুলতে চাই।'

এই কমলা পাহাড়ের দলকে আমি চিনি। মোটামুটি ওদের সঙ্গে আমার মতের মিল আছে।

কিন্তু ওরা মোটামুটি মিল চায় না। ওরা চায় সর্বাঙ্গীন মিল যদিও আমি জানি সেই মিল ওদের নিজেদের মধ্যেও নেই।

বিপদের কথা আমি ভুলেই ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। আত্মীয়বন্ধুদের ভিড়ের ভিতর থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই যে প্রদীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

বিজনের বাবা অতুলবাবু। বাপ আর ছেলে দুজনের সংসার। বিজনের মা নেই। আমি দুজনকেই বলেছিলাম। আমার বাবা বিজনের বাবাকে প্রায় চেনেনই না। ধুতি পাঞ্জাবি পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। রোগা কালো ছিপছিপে চেহারা। মাথার কাঁচা পাকা চুল। নিরীহ মানে গম্ভীর স্বভাবের মানুষ। ইদানীং বিজনের চেয়ে ওর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব বেশি! বিজনকে কী করে সুখ সবল করে তোলা যায় উনি প্রায়ই তাই নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন।

ওঁর দিকে তাকিয়ে আমি হেসে বললাম, 'আসুন, কাকাবাবু। বিজন বুঝি আসতে পারল না।'

অতুলবাবু বললেন, 'কী জানি। ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। বাড়িতে কখন যায় কখন আসে, কখন থাকে কখন থাকে না কিছু ঠিক নেই।'

তারপর একটু থেমে হেসে বললেন, 'আজ ওসব কথা থাক প্রদীপ। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন, এই শাড়িখানা বউমাকে দিয়ো।'

একটা প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন অতুলবাবু।

আমি বললাম, 'সেকি। আপনি নিজে গিয়ে দেখবেন না, আশীর্বাদ করবেন না? তাই কি হয় নাকি?'

আমি ওঁকে সুপর্ণার কাছে নিয়ে গেলাম। ঘর ভর্তি লোক। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। বড় একখানা চেয়ারকে সিংহাসন বানিয়ে সুপর্ণাকে সেখানে বসানো হয়েছে। বসনে ভূষণে আজ সে উৎসবের রাণী।

রাণী।

আমি অতুলবাবুকে সামনে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমাদের কাকাবাবু। আমার বন্ধু বিজনের বাবা অতুলচন্দ্র মজুমদার। আমাকে খুব ভালোবাসেন।'

সুপর্ণার সিংহাসন থেকে নামবার যো ছিল না। সে সেখানে বসেই হাত তুলে নমস্কার জানাল।

আমার বোন পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। খাতায় লিখছিল উপহারের তালিকা আর দাতাদের নাম। তার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম।

'আমার বোন মণি। মণিমঞ্জুষা। আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। কিন্তু বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। ভাব দেখার সংসারে যেন ওর অনেক অভিজ্ঞতা।

অতুলবাবু একটু হাসলেন, 'ওতো সিনিয়রিটির দাবি করতেই পারে।'

মণি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

অতুলবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'দাদা বউদিকে নিয়ে একদিন আমাদের ওখানে।'

মণি জিজ্ঞাসা করল 'আমাদের বউদি কেমন হয়েছে?'

অতুলবাবু হেসে বললেন, 'লক্ষ্মী প্রতিমার মত।'

আর দেরি না করে আমি ওঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম।

বললাম 'বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করবেন না?'

তিনি বললেন, 'না না, আজ থাক। আজ ওঁরা ব্যস্ত আছেন। আমি এবার যাই প্রদীপ।'

বললাম, 'সে কি, কিছু না খেয়েই চলে যাবেন? তাই কি হয়?'

তিনি কিছুতেই আসরে বসে খেলেন না। আমি তাঁকে আলাদা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালাম। নিজেই দই আর মিষ্টি এনে দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম মণিকে ডাকব। কিন্তু সে তার নতুন বউদিকে নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া যাঁরা বউ দেখতে আসছেন তাঁদেরও তো আপ্যায়ন করতে হয়।

আমি সাধারণত নিজের হাতে কাউকে খেতে-টেতে দিইনে। পরিবেশনের কাজে আমি অপটু। কিন্তু অতুলবাবুকে আমার নিজের হাতে কিছু দেওয়ার বড় ইচ্ছা হল। যেন এইভাবেই আমি তাঁর কিছু দুঃখ, কিছু ব্যথা দূর করতে পারব।

অতুলবাবুও খুশি হলেন। বললেন, 'আহা তুমি নিজেই এলে কেন প্রদীপ। তোমার কত কাজ।'

হেসে বললাম, 'আজ আমার আবার কী কাজ কাকাবাবু। আমাকে আজ সবাই ছুটি দিয়েছে। বিজন এলই না। ও এলে বড় ভালো লাগত।'

ছেলের কথা ওঠায় অতুলবাবু ফের বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। বললেন, 'ওর যে কবে মাথাটাথা ঠিক হবে কে জানে। অফিসে যায় আসে কিন্তু কাজে মন নেই। তা আমি ওর মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। বাড়িতে খুব কম সময়ই থাকে। যতক্ষণ থাকে নিজের ঘরের বাইরে আসে না। হয় বসে থাকে না হয় টান টান হয়ে শুয়ে থাকে, আমার সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না। যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি হাঁ না করে দেয়। অথচ বাড়ির মধ্যে শুধু তো এখন আমরা দুজনই আছি। আর বুড়ী বি নিশ্চিন্দ মা। রান্না-বান্নাও এখন সেই করে।'

আমি বললাম, 'বিজুর একটা বিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে শুঝিয়ে যেমন করেই হোক রাজি করাতে হবে ওকে।'

অতুলবাবু বললেন, 'দেখ, তুমি যদি পার। তুমিই তো ছিলে ওর স্কেও ফিলম ফার এণ্ড গাইড।' তিনি একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি তো বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম বাবা। কিন্তু বিজু বলে বিয়ে তো একবার ওর হয়ে গেছে। আর ও ওসবের মধ্যে যাবে না। সারাটা জীবন এইভাবেই নাকি ও কাটিয়ে দেবে। বিয়ে না করেও থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু এমন আবপাগল অকর্মণ্য হয়ে থাকা কি থাকা? তুমিই বল।'

ছেলের কথা উঠলে অতুলবাবু আর থামতে চান না। যান কাল খুলে যান। যে কথা বহুবার বলেছেন তারও পুনরাবৃত্তি করেন। মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধহয়, বিরক্তি লাগে। কিন্তু যখন মনে পড়ে ছেলে ছাড়া ওঁর আর কেউ নেই, উনি প্রায় ওঁর ছেলের মধ্যেই বাস করেন তখন আমি এই বিপত্নীক বৃদ্ধের ওপর স্নেহ সহানুভূতি বোধ করি।

আমাকে কে যেন ডাকলেন, 'প্রদীপ কোথায়? প্রদীপ।'

কোন আত্মীয়স্বজন কেউ এসে থাকবেন।

অতুলবাবু নিজেও এবার অপ্রতিভ হলেন। 'এই দেখ, তোমাকে কতক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি। যাও প্রদীপ, তুমি তোমার গেষ্টদের দেখাশোনা কর গিয়ে। আমার এখানে আর থাকতে হবে না। আমার খাওয়া হয়ে এসেছে। হাতটাত ধুয়ে আমি এখান থেকেই চলে যাব। তুমি যাও।'

তবু উনি যাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপরে ওঁকে দোর পর্যন্ত এগিয়েও দিলাম।

অতুলবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এবার আমি চলি। তোমাদের দেখলেও চোখ জুড়োয়। বউমাকে নিয়ে অবশ্যই একদিন এসো।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব কাকাবাবু।'

নিজেদের বাড়িতে জায়গা হবে না বলে বাবা একটা ফুলবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন বউভাতের জন্যে। যেসব ঘরগুলিতে ফ্যান হয় সেইসব ঘরে নিমন্ত্রিতের দল ভিড় করছে। আর হল ঘরটি রাখা হয়েছে স্বপর্ণার জন্যে। সেখানে মেয়েরা আসর জমিয়ে বসেছে। ছেলেদের দল প্রবেশপ্রার্থী। আমি একটু হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কারিডোরে দেখা হয়ে গেল বর্ণার সঙ্গে। বেশ সেজে টেজে এসেছে। পরণে ভায়োলেট রঙের শাড়ি। তাতে অরির পাড়। গয়না টয়না অবশ্য বেশি পরেনি। বিয়ে বাড়িতে মেয়েরা যত সেজে আসে তত সাজেনি। আর ওতো সাজের ওপরই আছে। থিয়েটারে ওকে নানা সাজে সাজতে হয়। কখনো স্ত্রী, কখনো প্রণয়িনী, কখনো রাণী, কখনো দাসী। বর্ণা অভিনেত্রী। কোন পাবলিক স্টেজে এখনো স্থায়ী কোন কাজ পায়নি। তবে নানা এ্যামেচার ক্লাব থেকে ওর ডাক আসে। ওই মহলে বর্ণা বন্ডের নাম আছে। প্রায় সারা বছরই ওর কাজ থাকে। বর্ণাকে সুন্দরী বলা যায় না। তবে দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। মেকআপ টেকআপ করলে ভালোই দেখায়। ওদের ড্রামাটিক ক্লাবের সঙ্গে আমার একসময় যোগাযোগ ছিল রিহার্সেল দেখতে যেতাম। কোন কোন নাটকে দুচার নম্বর পার্টও করেছি। সেই সূত্রে জানাশোনা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি একখানা ওকেও দিয়ে এসেছিলাম। নইলে ও আমাকে খোঁটা দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুলত।

বর্ণা বলল, 'বিয়েটা শেষ পর্যন্ত করেই ফেললে প্রদীপদা!'

হেসে বললাম, 'শেষ পর্যন্ত মানে। তুমি কি ভেবেছ আমি বেশি দেরি করে ফেলেছি?'

বর্ণা বলল, 'মোটেই না। বরং উল্টো। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেললে। এই তো সেদিন এম. এ. পাশ করে অফিসে ঢুকেছ।'

'সেদিন মানে দু'বছর হয়ে গেল।'

বর্ণা বলল, 'থাকগে। চল তোমার বউ দেখে আসি। বিয়ে বাড়িতে এসে বরকে বেশিক্ষণ আটকে রাখলে অনেকের হিংসা হবে।'

বললাম 'তোমার বাবা মা এলো না।' ওঁদেরও তো বলে এসেছিলাম।'

বর্ণা হেসে বলল, 'বলেছ আমার খাতিরে। সে নিমন্ত্রণ ওঁরা নেবেন কেন? আরে মা-না, সেজন্য নয়। মার শরীর ভালো না। আর বাবা খুব অসামাজিক। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে বড় একটা যান না। সামাজিক দায়-দায়িত্ব যা আর আমি রক্ষা করি। আর দেরি না, তোমার বউ দেখিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি পালাব।'

বললাম, 'কেন এত তাড়াতাড়ি কিসের।'

বর্ণাকে নিয়ে গেলাম স্বপর্ণার কাছে। পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওর অভিনয় দক্ষতার কথা বললাম। বর্ণা উপহার হিসাবে একটি আংটি নিয়ে এসেছে। স্বপর্ণার হাতে কেসটি তুলে দিল। নতুন

বউয়ের চোখে একটু কৌতূহল লক্ষ্য করলাম। এর আগে কোন বান্ধবীকে আমি ওর কাছে নিয়ে আসিনি। আর বান্ধবীই বা আমার কোথায়। মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার ক্ষমতা আমার নেই। খুব একটা ঝোঁক যে আছে তাও নয়। ইউনিভার্সিটিতে যে দু'চার জনের সঙ্গে সামান্য আলাপ পরিচয় হয়েছে তাকে বন্ধুত্ব বলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিচয় প্রায় মুছে গেছে। বিজন আমাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, 'তোমার মত চেহারা থাকলে আমি বিশ্ব জয় করতে পারতাম প্রদীপ।'

আমি ওদের বলতাম, 'মেয়েদের বিশ্বটাই কি একমাত্র বিশ্ব? এমন অনেক জিনিস আছে, তা জয় করতে হলে চেহারা লাগে না। শুনেছি মেয়েদের জয় করতে হলেও চেহারাটা বড় ব্যাপার নয়। চাই সাহস আর কিছু অর্থ-সামর্থ্য।'

বিজন বলত, 'থাক, বই পড়া বিদ্যা তোকে আর ফলাতে হবে না।'

স্বর্ণাকে সুপর্ণার কাছে নিয়ে গেলাম। ওর পরিচয় দিলাম। ওর যোগ্যতার কথা বললাম।

বললাম, 'চমৎকার ওর অভিনয়। দেখলে তুমি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবে।'

স্বর্ণা বলল, 'থাক, থাক তোমাকে আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না।'

ওকে দেখেই আইডিয়াটা আমার মাথায় এল। তার একটু আগেই অতুলবাবু বিদায় নিয়েছেন।

স্বর্ণাকে আমি একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।'

স্বর্ণা হেসে বলল, 'বল কি। তোমার তো সাহস কম নয়। নতুন বউয়ের পারমিশন নিয়ে এসেছ?'

বললাম, 'সেজন্যে তোমার অত ভাবনা কিসের!'

স্বর্ণা হেসে বলল, 'আমার জন্যেও ভাবনা তোমার জন্যেও ভাবনা। ঠিক আছে একদিন বউ নিয়ে যাবে আমাদের ওখানে, সেদিন তোমার দরকারী কথাটা শুনব। না কি বউয়ের সামনে সে কথা বলা চলবে না?'

ও যেন সব সময় পরিহাসে তরল হয়ে আছে। আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ সাধারণ বন্ধুত্বের স্তরে। কিন্তু কথায় বার্তায় মাঝে মাঝে প্রণয়ের অভিনয়ও করে থাকে। আমি একটু শঙ্কিত হলাম। পাছে আমার স্ত্রীর সামনে স্বর্ণা এই ধরণের ভাবগুলি কিছু করে বসে। তাহলে সুপর্ণা কিছু ভাবতে পারে।

আমি যা ভেবেছিলাম দেখলাম তা খানিকটা ঠিক। নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বাড়ির সবাই আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর মণি আমার জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, মামাত, পিসতুতো বোনেরা সম্পর্কিতা বউদিরা রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত নব-দম্পতির ঘরে বসে গান বাজনা হাসি গল্পে ফুলশয্যার উৎসব শেষ করে বাকি রাতটুকু দয়া করে আমাদের ঘুমুতে দিয়ে চলে গেল। সেই নিরিবিলি ঘরে সুপর্ণা আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ওই স্বর্ণা মেয়েটি কে? তোমার বন্ধু নাকি?'

আমি হেসে বললাম, 'আরে না-না। কোন মেয়ের সঙ্গে জীবনেও আমার কোন বন্ধুত্ব হয়নি। এমনি সাধারণ আলাপ-পরিচয়।'

সুপর্ণা বলল, যাই বল মেয়েটির ধরণ ধারণ একটু যেন কেমন কেমন। ও কি স্টেজের বাইরেও অভিনয় করে?'

আমি হেসে বললাম, তা হতে পারে। প্রফেসনের ছাপ যাবে কোথায়। আমার এক বন্ধু আছে কবি। তার সাধারণ কথায়-বার্তায়ও একটু না একটু কাব্যের গন্ধ আছে। আর একজন আছে রাজনীতিক। পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছে। সেও যদি পাঁচ মিনিট কথা বলে তার মধ্যে রাজনীতি এসে যায়। এদের দুজনের সঙ্গেই তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছি। মনে আছে?'

সুপর্ণা হেসে বলল, 'অত লোকের মধ্যে আলাদা করে কাউকে কি মনে রাখা যায়?'

বললাম, 'তা ঠিক। আমার আর একজন বন্ধু আছে। খুবই ঘনিষ্ঠ। দেখতে বেশ সুন্দর। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। তার নাম বিজন। ও যে আমার বিয়েতে আসবে না আমি ভাবতেই পারিনি।'

সুপর্ণা হেসে বলল। 'আজ সারারাত তুমি কি শুধু তোমার বন্ধুদের গল্পই করবে?'

আমি একটু লজ্জিত হলাম। খুশিও হলাম। সুপর্ণা এতক্ষণে একটি কথায় যত কথা বলেছে।

আমি সানন্দে আমার আলাপের প্রসঙ্গ বদলে নিলাম।

অফিস থেকে দিন পনেরোর ছুটি নিয়েছিলাম। আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ খেতে খেতেই ছুটিটা কেটে গেল। আমি যেন এক আলাদা জগতের বাসিন্দা। সেখানে কোন সমস্যা নেই, অন্য কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই আর কারো ওপর কোন দায়িত্ব কর্তব্য নেই। শুধু অফিস থেকে ছুটি নয়, নিজের ধ্যান ধারণা গড়াশোনা, গভীর ও গুরুতর আলাপ আলোচনার জগৎ থেকেও আমি যেন ছুটি নিয়ে বসে আছি। এই কয়েকটা দিন কেউ আর আমার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে না। শুধু এখন আলাপন রঙ কৌতুক হাসি তামাসার রাজ্যে আমি স্বানান্তরিত হয়েছি। সেই সঙ্গে চলছে একটি মেয়ের সঙ্গে মন জানাজানির পালা। এই সেদিন পর্যন্ত যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা ছিল, কিছু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আর কতকগুলি লৌকিক আচারের বৈধতা স্বীকার করে আমি তার ওপর পূর্ণ অধিকার অর্জন করেছি। আর সেও আমার সেই অধিকার মেনে নিয়েছে। আর বিনা দ্বিধায় আমার ওপর তার অধিকার বিস্তার করে চলেছে। এ যেন এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এর অনিবার্যতা সম্বন্ধে কারো মনে কোন সংশয় নেই।

আমি একদিন হেসে বললাম, 'পর্ণা, তোমার তো আরো কত ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল। তার একটি যদি হয়ে যেত তুমি তো তাহলে তাকেও এমনি করে ভালোবাসতে—'

পর্ণা বলল, 'তুমিও তো তাই করতে। তোমারও কি কম মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে নাকি? আমি বুঝি শুনিনি? কিন্তু কী হবে সে কথা ভেবে? আমি তো ভাবতেই পারিনে আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত। তুমি হয়তো মনে মনে আমাকে ছাড়াও আরও কতজনকে কল্পনা করো।'

আমি বললাম, 'দূর-তাই কি হয় নাকি? তুমি যা ভাবতে পার না আমিই বা তা কী করে ভাবব? আর কারো কথা ভাবতে গেলেই তোমার চেহারা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আর কোন মূর্তি কল্পনাতেই আসে না। মনে হয় 'তোমারেই যেন ভালো বাসিয়াছি শতরূপে শতবার। জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

পর্ণা হেসে বলল 'থাক। তোমার আর বাড়বাড়ি করতে হবে না। যত সব বানানো কথা।'

আমি বললাম, 'কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বানিয়েছিলেন, সবাইর পক্ষেই সেগুলি সত্য হয়ে উঠবে বলে।'

কখনো ঠাট্টার ছলে কখনো বা গভীরভাবে আমি আমার নব-পরিচিতা স্ত্রীকে এইসব কথা বলি আর ভাবি এর নামই কি প্রেম? আমার বন্ধু বিজনও কি দীপ্তির সঙ্গে ঠিক এই রকম একটি সম্পর্কই

সঙ্গে তুলেছিল? সেই দীপ্তি নেই বলে বিজন শোকে মুহ্যমান হয়ে একেবারে বন্ধু-বান্ধবের সংস্রব ত্যাগ করে বসল? শুধু তাই নয় নিজেও সুস্থতার স্বাভাবিকতার সীমার বাইরে চলে গেল?

সেই শুভরাত্রির দিন বিজনের এই অদ্ভুত ঘটনার কথা পর্ণাকে বলিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললাম। বিজন কী করে দীপ্তি নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে ভালোবেসেছিল, অন্য জাতের মেয়ে বলে লুকিয়ে রেজেস্ট্রি ম্যারেজ করেছিল, তারপর জানাজানি হওয়ায় দীপ্তিদের বাড়িতে অশান্তি হয়। তারপর হঠাৎ একদিন দীপ্তি আত্মহত্যা করে মারা যায়, সেই থেকে বিজন তিলে তিলে নিজেকে মারছে। এই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে আমার আছে আমি সে কথা স্ত্রীর কাছে গোপন করলাম না।

পর্ণা বলল, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। কিন্তু তুমি কী করবে বল? তিনি নিজে থেকে যদি না ফেরেন তাহলে কি তোমার সাধ্য আছে ফেরাবার. তুমি ওঁকে সান্ত্বনা দিতে পার, বুঝাতে পার, উপদেশ পরামর্শ দিতে পার, কিন্তু তাতেও যদি কিছু না হয় তোমার কিছু করবার আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'সবাই সেইকথা বলে। কিন্তু পর্ণা, আমি তো বিজনকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারিনে। আমাকে চেষ্টা করে যেতেই হবে। তা ছাড়া অতুলবাবুও আমার ওপর খুব নির্ভর করেন। এর মধ্যে দু তিন দিন ফোন করেছেন। যেতে বলেছেন তোমাকে নিয়ে। চলনা একদিন ঘুরে আসি।'

কিন্তু পর্ণা যেতে তেমন ইচ্ছুক নয়। ও বলল, 'সেখানে আমি গিয়ে কী করব বল। সেখানে মেয়েরা কেউ থাকেন না। যদি বিজনবাবুর মা থাকতেন কি স্ত্রী থাকতেন যেতাম। কিন্তু ওই সবের মধ্যে আমার যেতে ভালো লাগে না।'

মাও সেই কথা বললেন। 'সত্যি ও গিয়ে করবে কি? যেতে হয় তুই যা। বিজুই বা এ কী স্বভাব বাবা। তোর বিয়েতে ও একবার আসতেই পারল না। যারা বিয়ের দিন কি বউভাতের দিন আসেনি তারাও পরে এসেছে। কিন্তু ও একবার আসতেই পারল না।'

'হেসে বললাম, 'মা ওর কি মাথার ঠিক আছে।'

মা বললেন, 'কী জানি বাপু। শুনি তো অফিসে যায়। খায়দায় ঘুমায়। শুধু সমাজ সামাজিকতার বেলায় মাথার ঠিক থাকে না। লোকে সে কথা শুনবে কেন।'

বিজনের ওপর—আমার যে মমতা আমাদের বাড়ির আর সবাইর সেই মমত্ববোধ থাকা সম্ভব নয়। আমি তাই সতর্ক হয়ে গেলাম। ওর কথা নিয়ে বাড়িতে আর বিশেষ আলোচনা করা যাবে না। আমি যেমন আমার অফিসের কাজকর্মের ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে তেমন আলোচনা করিনে; তেমনি কিছু কিছু সম্পর্কের প্রসঙ্গও পারিবারিক গণ্ডির বাইরেই আমার রাখা উচিত। এরই নাম প্রাইভেসি। একান্ত ব্যক্তিগত কথা। ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতা। এই গোপনতা শুধু অবৈধ প্রণয়, কি অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেই মানুষের দরকার হয় না। আরো নানা ব্যাপারে বিধিসঙ্গত নীতিসঙ্গত বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েও এই প্রাইভেসি দরকার। আমি নিজেই পরজ করে সেদিন পর্ণার সঙ্গে দেখা করলাম। বেলগাছিয়ার একটি গলির মধ্যে কয়েকটি ফ্ল্যাটবাড়ি। তারই একটি বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটের দুখানি ঘর নিয়ে পর্ণারা থাকে। একখানা ঘর নিজের। আর একখানায় ওর বাবা মা থাকেন। বাবা বুড়ো হয়েছেন। সামান্য টিউশনি টিউশনি

করেন। বর্ণার এক কাকা আছে। বিয়ে করার পর আলাদা থাকে। হয়তো সামান্য কিছু বাপ মাকে দেয়। যতদূর জানি বর্ণার আয়েই সংসার চলে। কিন্তু ওর আয়তো নিয়মিত নয়। তাই ওকে বড় বিব্রত হতে হয়।

কড়া নাড়তে বর্ণাই এসে দর খুলে দিল। আমাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, 'কী ভাগ্য একা কেন? নতুন বউ কোথায়?'

হেসে বললাম, 'বাপের বাড়িতে।'

বর্ণা বলল: 'তাহলে তো বিনা টিকেটে রঙ্গালয়ে প্রবেশ নিষেধ।'

হেসে বললাম, 'এই বুঝি এতদিনের বন্ধুত্বের পরিণাম! আমি থিয়েটার দেখব না। শুধু গ্রীনরুমে বসে থাকব।'

বর্ণা বলল, 'বাইরের লোককে আমরা গ্রীনরুমে ঢুকতে দেব না!' তুমি বরং মায়ের কিচেন দেখবে এসো।

মাসীমাও আমার গলা শুনে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'এই যে প্রদীপ এসো এসো, বউমাকে নিয়ে এলেনা কেন?'

বর্ণা বলল, 'বউকে বাপের বাড়িতে রেখে এসে নিজে যেন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভারি সুন্দরী বউ। যেখানে সেখানে নিয়ে বেরোতে ভরসা হয় না।'

মাসীমা বললেন, 'কী ফুরফুরেই হয়েছে আমার মেয়ে। যা দিনকাল। চুরি রাহাজানি, বোমা ফাটাফাটি লেগেই আছে। সময়ে টময়ে তো চলতেই হয়। যাও ঘরে গিয়ে বোসো। সুবিধে মত বউকে একদিন নিয়ে এসো প্রদীপ।'

বললাম, 'আসব মাসীমা।'

বর্ণা আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। ওদের আলাদা বসবার ঘর নেই। দুখানা শোবার ঘরে যখন যেখানে সুবিধা ওরা আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে বসে।

বর্ণার ঘরের পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোষ। তাতে মাদুর পাতা বিছানা গুটানো। আর একদিকে একটি আলনা বইয়ের র‍্যাক। দেয়ালে ছবির ভিড় নেই। শুধু বাটিকের কাজ করা রবীন্দ্রনাথের ছবি। ওর কোন বন্ধু যেন দিয়েছিল। আর একখানি ক্যালেণ্ডারে ডুবারাবৃত হিমালয়। দুখানি বেতের চেয়ার মুখোমুখি পাতা। আসবাবপত্র সামান্য। কিন্তু ভারি পরিচ্ছন্ন সুন্দর করে গুছানো। তোলা বিছানাটি কমলালেবু রঙের একখানি চাদর দিয়ে ঢাকা।

বেতের চেয়ার দুটিতে সবুজ রঙ লাগানো হয়েছে: আমি বললাম, 'একেবারে সত্যি সত্যি গ্রীনরুম করে রেখেছ। আর্টিষ্টের ঘর দেখলেই চেনা যায়।'

বর্ণা খুশী হয়ে হেসে বলল, 'আর্টিষ্ট না ঘোড়ার ডিম। কী যাবে বল চা না কফি।'

বললাম, 'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, কিছু না হলেও চলবে। আমি যে দরকার নিয়ে এসেছি সেইটা আগে শোন।'

বর্ণা মৃদু হেসে বলল, 'আমি বিনা দরকারে আসবার দিন ফুরিয়ে গেছে। কী ব্যাপার। তোমাদের অফিসের কোন থিয়েটার আছে নাকি? পার্ট করতে হবে?'

বললাম, 'পার্ট করতে হবে। তবে অফিসের থিয়েটারে নয়। তোমাকে ধীরে সুস্থে বসে ব্যাপারটা শুনতে হবে।'

বর্ণা বলল, 'ওরে বাবা। এ যে একেবারে লম্বা সৌধচন্দ্রিকা। তুমি তা হলে নিজেই একটু ধীর স্থির হয়ে বোসো। আমি এক কাপ কফি করে আনি। বেশি দেরী হবে হবে না।'

ও পাশের ঘরে চলে গেল। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। জানালার বাইরে ছোট্ট একটু বারান্দা। পাশাপাশি দুটি টব। একটিতে একটি ক্যাকটাস। আর একটিতে লিলি ফুটেছে। বেশ লাগছে সাদা রঙের বড় বড় ফুলগুলি।

দেখা হলেই বর্ণার মা বলেন, 'দেখো তো বাবা একটি ভালো ছেলেটেলে পাও কিনা তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।'

কিন্তু বর্ণা বিয়ে করতে চায় না। বলে, 'আমি বিয়ে করলে বাবা মার চলবে কী করে?'

আমি বলি, 'তাই বলে তুমি কি চিরকালই বাবা মাকে চালাবে? ওরাই বা তা চাইবেন কেন?'

হয়তো অন্য কোন ব্যাপার আছে। আমি ঠিক জানিনে। এ নিয়ে আমি বেশি মাথাও ঘামাইনে। অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া বিপদ আছে। বিজনের বেলায় আমার সেই শিক্ষা হয়েছে। অথচ আমি নিজে চেষ্টা করে তার এই সব ব্যক্তিগত বিষয়ে মাথা গলাইনি। বিজু নিজেই আমাকে বারবার টেনে নিয়েছে। আর টেনেছেন ওর বাবা।

বর্ণা এল ট্রেতে করে দুকাপ কফি নিয়ে। সেই সঙ্গে একটি প্লেটে একখানি ইলিশ মাছ ভাজা।

বললাম, 'এ আবার কি?'

বর্ণা বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছো মাছ ভাজা। আশা করি উল্টে খেতে পারবে।'

হেসে বললাম, 'তা আর পারব না কেন। তবে কেউ উলটে দিলে ভালোই লাগে।'

বর্ণা বলল, 'উল্টোবার লোক তো তোমার এসেই গেছে। তারপর বল গরীবের বাড়িতে এই হাতির পায়ের হেতুটা কি। যার মুখ দেখে রোজ উঠি আজও তো তার মুখ দেখেই উঠেছি।'

'কার'?

বর্ণা বলল, 'কাল্লুদারের।'

এবার কালক্ষেপ না করে আমি আসল কথাটা পাড়লাম। বললাম, 'আমার বন্ধু বিজনকে তুমি চেন? বিজন মজুমদার?'

বর্ণা বলল, 'না। তোমার সব বন্ধুর সঙ্গে কি তুমি আমার আলাপ করিয়ে দাও? তুমি যা হিংসুটে।'

আমি বললাম, 'শোন। ঠাট্টা তামাসা নয়, একটা গুরুতর ব্যাপারে আমি তোমার কাছে এসেছি। বিজন আমার বন্ধু, খুবই ঘনিষ্ট বন্ধু। নানা স্তরে আমার অনেক বন্ধু আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বিজনের আমি ছাড়া আর কোন বন্ধু ছিল না। মুখচোরা মানুষ। বিশেষ কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। কলেজে যখন পড়েছি তখনো ওর যেমন স্বভাব ছিল, কলেজের বাইরে এসেও তেমনি হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আমার অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হল। কিন্তু ও কারো সঙ্গে ঘনিষ্টতা করবে না যেন পণ করে বসে আছে। বেরিয়ে এসে আমি ঢুকলাম ব্যাঙ্কে আর ও গেল সরকারী চাকরিতে কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্সে। কিন্তু সেখানে ওর ওই একই দশা। ওর বন্ধু নেই বান্ধব নেই ও একা। বাড়িতেও তাই। ওর মা ছেলেবেলায় মারা গেছেন। বাবার সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ওর বাবা অফিস থেকে ফিরে নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। ছেলেও তাই। বাবার স্বভাব পেয়েছে।'

বর্ণা বলল, 'স্বভাব বর্ণনা তো হল, এবার আসল কথায় এসো।'

হেসে বললাম, 'অধীর হয়ো না শোন। অদ্ভুত স্বভাব এই বিজনের। ওর খেলাধুলো নেই রাজনীতি নেই সাধারণ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ও আনন্দ পায় না, কিন্তু ভালোবাসার কাঙাল, একজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতে চায়। তার মধ্যে ডুবে থাকতে পারলে ও আর কিছু চায় না। আর কাউকে না পেয়ে ও আমাকে আশ্রয় করেছিল, এমন এক সময় গেছে যখন রোজ ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত কি ফোন করত কি চিঠি লিখত, সেই চিঠির জবাব না দিলে ওর অভিমান হত। রাগে দুঃখে ও আমাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। বলতে কি ওর সেই ভালোবাসার অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। মনে মনে নিষ্কৃতি চাইছিলাম। নিষ্কৃতি মিলল, পার্ক-সার্কাসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশন দেখতে গিয়ে মেয়েদের হাতের কাজের নমুনা দেখল সেই সঙ্গে দেখল একটি মেয়েকে। বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে সে ষ্টল খুলেছিল। সখের দোকানদারি। মেয়েটির নাম দীপ্তি বসাক। আমিও দেখলাম তাকে। বিজনই একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাল, আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটি বেশ সুশ্রী! অসামান্য কিছু নয়। তবে দেখলে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, কর্সা রং। সবচেয়ে ভালো লাগে ওর সপ্রতিভতা। অথচ কথা বলবার ধরণটি ভারি মিষ্টি। গলার স্বরও তাই। বিজন দেখল ওর নিজের মধ্যে যা নেই ওই মেয়েটির মধ্যে তা আছে। মেয়েটি কী দেখেছিল তা জানিনে। হয়তো সেই বৈপরীত্য তাকেও বেশি আকর্ষণ করে থাকবে। দু'মাস না আড়াইমাস যেন মেলা ছিল। বিজন রোজ যেত। তারপর সেই শিল্পমেলা ভেঙে গেল। কিন্তু ওদের মেলামেশা চলতেই লাগল।'

আমাকে থামতে দেখে বর্ণা বলল, 'তারপর?'

'তারপর দেখলাম বিজনের স্বভাব বদলে গেছে। আমাকে এখন না হলেও ওর চলে। দীপ্তিই এখন ওর ধ্যান জ্ঞান। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে। বেড়ায় গল্প করে। আরো কি করে না করে জানিনে। লুকোতে হয়। কারণ দীপ্তিদের বাড়ির লোকজন উদারপন্থী নন। এসব ব্যাপারে ওর বাবা-মা ভারি কড়া। দাদা বউদির শাসন টাসন তার চেয়েও চড়া। দীপ্তি কলেজে পড়েছে, বি এ পাশ করেছে। কিন্তু বাপ মার স্নেহ শাসনের গণ্ডি ডিঙে বেরিয়ে আসবার সাহস যেন তেমন নেই। বিজনরা জাতে কায়েত। বর্ণ হিসাবে উচ্চবর্ণ। কিন্তু অবস্থা তো তেমন ভালো নয়। তাছাড়া অন্য জাতের ছেলের সঙ্গে ওর বাবা মা বিয়ে দিতে রাজি হবেন না তা দীপ্তিও জানে বিজনও জানে। এদিকে দীপ্তির বিয়ের সম্বন্ধ আসার বিরাম নেই। বেশ বড়লোকের ঘর থেকে ওর সম্বন্ধ আসছে। ওর বাবা আর দাদা জোর করেই ওকে যেন বিয়ের পি ড়িতে বসিয়ে দেবেন এমনি ভাব। তারপর নিজেদের বুদ্ধিতেই ওরা এক কাজ করে বসল। গোপনে রেজেষ্ট্রি ম্যারেজটা ওরা সেরে ফেলল। বিজনের পক্ষে আমি একমাত্র সাক্ষী। দীপ্তি আরো দুজনকে সংগ্রহ করেছিল। আমি ভাবলাম বিপদ গেল। কিন্তু দেখা গেল বিপদ আরো ঘনীভূত হয়েছে। দীপ্তির বাবা যখন একটি সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করে বসলেন দীপ্তি বলল আমার বিয়ে হয়ে গেছে এই দেখ সার্টিফিকেট। ওর দাদা বললেন ও সার্টিফিকেটে আমি প্রভাব করি। বলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন সেই কাগজ। তারপর ঝগড়াঝাটি কাঁদাকাটি। অশান্তি লেগেই রইল ওদের বাড়িতে। আমরা দীপ্তির বন্ধু সুমিতা চন্দ বলে একটি মেয়ের কাছে এসব কথা পরে শুনেছি। তারপর সেই সুমিতাই একদিন ভোরবেলায় ফোন করে বিজনকে দুঃসংবাদটি জানায়। দীপ্তি আত্মহত্যা করেছে। গলায় শাড়ি জড়িয়ে বাথরুমের মধ্যে সুইসাইড করেছে দীপ্তি। 'আমি বিশ্বাস করিনে—বিশ্বাস করিনে' বলতে বলতে বিজন তো ছুটে

গেল। তখন যা হবার হয়ে গেছে। বিজন পাগলের মত বলতে লাগল ও আত্মহত্যা করতেই পারে না। ওকে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি পুলিশ কেস করব। আমি ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। এসবের কি কোন মানে আছে? বিজন বলে নিশ্চয়ই মানে আছে। এই অবিচার কি আমরা মুখ বুজে সহ্য করব? কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট আর পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট সবই দীপ্তির বাবা কি ষড়যন্ত্রে অনুকূলে। কিছুই করবার ছিল না। বিজন অসহায় আক্রোশে ফুলতে লাগল। শ্মশানে গেল বিজন। সেখানে ওর আচার আচরণ একেবারে পাগলের মত। ওকে সামলাবার জন্যে আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে। সামলাতে কি আর পারি? দীপ্তিকে যে আংটি দিয়েছিল বিজন তা কিছুতেই দীপ্তির হাত থেকে খুলতে দেবে না। এদিকে শবদেহকে নিরাবরণ নিরাভরণ ভাবে চিতায় শোয়ানোই নিয়ম। অনুষ্ঠান মহা অমঙ্গল। যেন অকল্যাণের কোন কিছু বাকি আছে।'

'তারপর?'

'তারপর একবছর পার হয়ে গেল, কিন্তু বিজন সেই যে শোকসাগরে ডুবে আছে আর ওকে তোলা গেল না। তারপর ওকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে আমি চেষ্টার অন্ত রাখিনি। যদি বলি বিজন তুমি বিয়ে কর। তোমার বাবার সেবা শুশ্রূষার জন্যেও তো একজন কাউকে দরকার। বিজন জবাব দেয় বাবার দরকার বাবা মেটালেই পারেন। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি কি আর বিয়ে করতে পারি? ওর বাবার ঘরে ওর মায়ের একখানা ফটো এনলার্জ করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। বিজনের ঘরে দীপ্তির তেমন কোন ছবি নেই। ওর একটি পকেট ব্যাগ আছে। সেই ব্যাগে দীপ্তির একখানা ফটো সব সময় বিজন সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। মাঝে মাঝে বের করে দেখে। নির্জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। এরনি আরো অনেক কাণ্ড কারখানা আছে।'

বর্ণা বলল, 'ভালোইতো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?'

বললাম, 'তুমি ওকে শোকসাগর থেকে উদ্ধার করতে পার।'

'তাতে আমার লাভ?'

হেসে বললাম, 'জনকল্যাণে যদি তোমার রুচি না থাকে বন্ধুজনের কল্যাণ বলে ধরে নাও। বলতো কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থাও করা যায়। অতুলবাবুকে ব্যাপারটা খুলে বললে তিনি নিশ্চয়ই রাজি হবেন। ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে তিনি এখন সবকিছু করতে রাজি।'

বর্ণা বলল, 'হেঁয়ালি ছেড়ে ব্যাপারটা তুমি আমাকে সব আগে বুঝিয়ে বলতো।'

আমি তখন প্ল্যানটা ওকে সবিস্তারে বললাম।

বর্ণা অতুল বাবুর কাছে যাবে পার্টটাইম চাকরী প্রার্থী হয়ে। নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়কে সে সঙ্গ দেবে। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করবে। চিঠিপত্র লিখবে বইপত্র গুছিয়ে রাখবে। ফোন টোন এলে অ্যাটেণ্ড করবে বিপত্নীক প্রবীন ভদ্রলোকের আরো যা কিছু খুঁটিনাটি কাজকর্মের দরকার হয়, সব করে দেবে। যে হেতু বর্ণার প্রয়োজন খুব বেশি তাই কম মাইনেতেই সে রাজি হবে। তারপর বর্ণা বাপের সেবাযত্ন করবে বটে কিন্তু চোখ রাখবে ছেলের দিকে। মৃতা প্রণয়িনীর কবল থেকে টেনে আনবে। জীবন সম্বন্ধে ফের উৎসাহী করে তুলবে। কাজ এইটুকু করে দিতে পারলেই বর্ণার ছুটি। সেই সঙ্গে একখানি হাজার টাকার চেক।

বর্ণা বলল 'মাত্র হাজার টাকা?'

'চাইলে অতুলবাবু তোমাকে নিশ্চয়ই আরো কিছু বেশি দেবেন।'

বর্ণা হেসে বলল, 'ওই বুড়ো মানুষের কাছে আমি কেন তোর তবরদস্তি করব? তুমি দেবে।'

'বেশ আমিই দেব। আমার বন্ধুকে ভালো করে দিতে পারলে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

বর্ণা বলল, 'যেন তোমার কৃতজ্ঞতার কোন দাম আছে। তুমি তো এখন মর্টগেজী সম্পত্তি। এক কাজ করো। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে নাটক নবেল লিখতে শুরু করে দাও। যত সব উদ্ভট কল্পনা তোমার।'

কিন্তু আমি ছাড়লাম না। বর্ণার সঙ্গে এই নিয়ে আরো দু দিন দেখা করলাম, কথা বললাম। শেষ পর্যন্ত বর্ণাকে রাজি করাতেও পারলাম।

অতুলবাবুর সঙ্গেও আলাদাভাবে দেখা করে আমার উদ্দেশ্য আর উপায়ের কথা তাঁকে জানালাম।

অতুলবাবু বললেন, 'তোমার প্রস্তাব তো ভালো। কিন্তু এতে কি কোন কাজ হবে?'

বললাম, 'চেষ্টা করে দেখা যাক।'

অতুলবাবু বললেন, 'কিন্তু ওতো কোন মেয়েকে আমলই দেয় না। কোন মেয়ের নাম গন্ধই সহ্য করতে পারে না। শেষে যদি ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে।'

আমি হেসে বললাম, 'না না তা হবে না। ওর মাথা অতটা বিগড়ে যায়নি। তা হলে কি আর অফিসে কাজকর্ম করতে পারে?'

বর্ণাও হাসতে হাসতে বলেছিল, 'পাগলের খপ্পরে ঠেলে দিচ্ছ। শেষ পর্যন্ত মারধোর খেয়ে মরতে হবে না তো? শুধু দাইক নয় প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইনসিওর করে, রাখব! প্রিমিয়াম তুমি দেবে। রোজ ক্ষতি হলে পুরোমাত্রায় ক্ষতি পূরণ তোমার কাছ থেকে আদায় করে নেব।'

হেসে বললাম, 'আমি সব শর্তেই রাজি। তবে আমার বন্ধুকে তোমার ভয় করবার কোন কারণ নেই। বিদ্যু অভদ্র নয়, সত্যিসত্যি পাগলও নয়। ভাবের পাগল মাত্র।'

তারপর আমি নেপথ্যে সরে গেলাম। রঙ্গমঞ্চে তিনটি কুশীলব বর্ণা অতুলবাবু আর বিজনের আনাগোনা চলতে লাগল।

অতুলবাবু বর্ণাকে প্রথমেই কিছু অগ্রিম টাকা দিলেন। ও নিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল।

কিন্তু অতুলবাবু বললেন, 'তোমার যখন দরকার তুমি নেবে না কেন? তোমাকে তো এর জন্যে যথেষ্ট সময় দিতে হবে, পরিশ্রমও করতে হবে।'

অতুলবাবু আমার কাছ থেকে সব খোঁজ খবর নিয়ে রাখলেন। বর্ণারাও কায়স্থ। বংশ পরিচয় ভালো। মেয়েটি দেখতে সুশ্রী সুতরাং তেমন কিছু যদি ঘটেই ঘটকালিতে বাধা হবে না।

বর্ণার কাছেই আমি একটু একটু খবর নিই। নিজে বিজনদের বাড়িতে কদাচিৎ যাই। যে সময় বর্ণা থাকে না তখন গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আসি। কি বাইরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা সাক্ষাৎ করি।

সেদিন অফিস ছুটির পর ওকে টেনে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। প্রথমে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকে চা টা খেয়ে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইডেন গার্ডেনের ভিতর দিয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে চলে গেলাম।

দীপ্তি মারা যাওয়ার পর বিজনকে আর ঘরের বার করতেই পারিনি। সঙ্গে করে বেড়ানো তো দূরের কথা।

গঙ্গার ধারে প্রিন্সেপ ঘাটে গিয়ে একটি খালি বেঞ্চ খুঁজিয়ে নিয়ে পাশাপাশি বসলাম।

আমি একটু বাদে বললাম, 'দীপ্তিকে তুই যেভাবে মনে করে রাখতে চাইছিস সেটা কিন্তু মনে রাখবার যথার্থ উপায় নয়।'

বিজন একটু হেসে বলল, 'ভুলে যাওয়াই কি মনে করে রাখবার প্রকৃষ্ট পথ? আমরা জীবিতেরা বড় অকৃতজ্ঞ। যত প্রিয়ই হোক মরবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা ভুলে যাই। কেউ কেউ বা বছরে একবার করে স্মৃতিবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করি। কিন্তু সবই কর্মকাণ্ড। আমি ঠিক করেছি আমি মৃত আর জীবিতের ব্যবধান করবনা। আমি রোজ দীপ্তির কথা মনে করি, রোজ ওর সঙ্গে কথা বলি। বেঁচে থাকতে যেমন করেছি এখনো তেমনি করি। মৃত্যু তোমার কাছে রিয়াল নয় কিন্তু আমার কাছে রিয়াল।'

আমি বললাম 'তা হতে পারে। কিন্তু রিয়ালিটির স্তর তো এক নয়, তার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে।' বিজন জোর দিয়ে বলল, 'রিয়ালিটির যে স্তরে তুই আছিস আমার কাছে দীপ্তিও সেই স্তরে আছে আমি তার প্রেজেন্স অনুভব করতে পারি, এইসব জায়গায় কত এসেছি তাকে নিয়ে। ঠিক এমনিকরে তার পাশে বসে গঙ্গার জলস্রোত দেখেছি। জাহাজ দেখে বিদেশ যাত্রার কল্পনা করেছি সেসব কি মিথ্যে?'

বললাম 'মিথ্যে কেন হবে? সেসব অতীত স্মৃতি।' বিজন বলল, 'তোর কাছে অতীত কিন্তু আমার কাছে বর্তমান।'

আমি আর কোন কথা বললাম না। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম বিজন ঝর্ণার কিছুমাত্র উল্লেখ করল না। অথচ আমি বেশ জানি ঝর্ণা ওদের বাড়িতে কাজ শুরু করেছে তাকে দেখে বিজন প্রথম একটু অবাক হয়েছিল কিন্তু অতুলবাবু যখন তাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন, কাজকর্মে একজনের সহায়তা তাঁর চাই একথা যখন ছেলেকে জানিয়েছেন বিজন কোন আপত্তি করেনি। গম্ভীরভাবে বলেছে বেশ তোমার যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার হয় আর তুমি যদি অ্যাফোর্ড করতে পার তুমি নেবে বইকি।'

ঝর্ণার ব্যাপারে প্রথম কিছুদিন উদাসীন থেকেছে বিজন। ঝর্ণা যেন অতুলবাবুর কাছেই শুধু রিয়াল বিজনের কাছে আনরিয়াল। বাস্তবের একটি ক্ষীণ ছায়ামাত্র।

কিন্তু এই ঔদাসীন্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ঝর্ণা তার ব্যক্তিসত্তাকে বিজনের কাছেও প্রণমিত করে ছেড়েছে। হয়ত কাজ করতে করতে ডিকসনারিখানার দরকার হয়ে পড়েছে ঝর্ণার। বাপ আর ছেলের ঘর কাছাকাছি। মাঝখানে ছোট একটি করিডোরের ব্যবধান। ঝর্ণা বিজনের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আসতে পারি বিজনবাবু?'

বিজন অভদ্র নয়। বলেছে 'নিশ্চয়ই।'

তারপর ভিতরে গেলে জিজ্ঞাসা করেছে 'কী ব্যাপার?' ঝর্ণা অপরাধীর মত বলেছে 'আপনাকে বিরক্ত করলাম। মিঃ মজুমদার বললেন ডিকসনারিখানা বোধ হয় এ ঘরেই আছে।'

বিজন প্রথমে র‍্যাক দেখিয়ে দিয়েছে 'ওই যে ওখানে আছে। নিয়ে যান।'

কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেই উঠে গিয়ে ডিকসনারিখানা এনে হাতে তুলে দিয়েছে ঝর্ণার।

ঝর্ণা লজ্জিত হয়ে বলেছে 'আপনি এত কষ্ট করলেন। দরকার ছিল না। আমিই তো নিতে পারতাম।'

আর একদিন বর্ণা চায়ের কাপ নিয়ে গেছে বিজনের ঘরে।

বিজন প্রথমটায় একটু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলেছে 'আপনি কেন আনলেন? আমাদের গণাদিইতো আছে।'

বর্ণা লজ্জিতভাবে হেসে বলেছে 'মিঃ মজুমদার গণাদির কাছেই চা চেয়েছিলেন। কিন্তু সে রান্না-বান্না নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমার হাতে কাজ ছিল না। আমিই করে দিলাম। আপনার বাবা আপনাকেও এক কাপ দিতে বললেন।'

বিজন হেসে বলেছিল 'বাবা কি জানেন না আমি তাঁর মত চায়ের ভক্ত নই?'

বর্ণা বলেছিল 'তা হলে নিয়ে যাব?'

বিজন বলেছিল, 'নানা এনেছেন যখন দিয়েই যান।'

এসব ঘটনা নিশ্চয়ই খুব তুচ্ছ তবু বিজন একবার কোন না কোন প্রসঙ্গে বলতে পারত। কিন্তু বলল না। হতে পারে বিজন এসব ব্যাপারের বাস্তবতা স্বীকার করতে চায় না, কিংবা যে বিজন শুধু দীপ্তিরই বিজন সেই বিজনকেই আমার সামনে তুলে ধরতে চায়।

রাত হয়ে যাচ্ছে বলে আমি উঠে পড়লাম। বললাম—'চল ছেড়া যাক।'

বিজন হেসে বলল এখনই? ও তোমার তো আবার অন্য টান হয়েছে। তোমার বিয়েতে যাওয়া হয়নি। অপরাধ হয়ে গেছে। এবার একদিন যাব। গিয়ে আলাপ করে আসব তোমার বউয়ের সঙ্গে।'

আমি মনে মনে হাসলাম। বর্ণার ক্ষমতা আছে। এরই মধ্যে বরফ গলতে শুরু করেছে।

তারপর বিজন সত্যিই একদিন আমাদের মানিকতলার বাড়িতে এসে হাজির হল। বাবা মা ওকে দেখে খুব খুশি।

মা বললেন, 'তুমি তো বাবা একেবারে আসা যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ বিজন। প্রদীপের বিয়েতে এলে না। আমার এত খারাপ লাগছিল।'

বিজন হেসে বলল, 'এই তো এলাম মাসীমা। আমি কোথাও যাইনে।'

মা বললেন, 'তা তো জানি। যাও না কেন, যাবে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশাই তো ভাল বাবা। একা আর বোকা সমান।'

সুপর্ণিমার সঙ্গেও বিজনের আলাপ করিয়ে দিলাম। বিজন ওকে এক জোড়া গোলাপ উপহার দিল।

আমি বললাম, 'আর আবার ওসব কেন। আর তো আর ফুলশয্যা নয়।'

বিজন বলল, 'ফুলের সঙ্গে যাদের তুলনা তাদের ফুল দিয়েই দেখতে হয়।'

তারপর সুপর্ণার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার একদিন আসুন আমাদের ওখানে।'

সুপর্ণা স্মিতমুখে বলল, 'যাব।'

চা-টা খেয়ে বিজন বিদায় নেওয়ার পর আমি সুপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার বন্ধুকে কেমন লাগল?'

সুপর্ণা হেসে বলল, 'উনি সেই শোক সামলে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। তোমার আর ভাবনা নেই। সেই বিয়ের রাত থেকে শুনছি কেবল বিজন-বিজন,বিজন। বিজন এবার নতুন আত্মীয়-স্বজন পেয়ে যাবেন দেখে নিয়ো।'

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী করে বুঝলে ?'

সুপর্ণা বলল, 'ও আমরা দেখেই বুঝতে পারি। এই তো তোমাদের পুরুষের প্রেম। পুরুষের শোক। সেই যে গল্প আছে না বউ বলল আমাকে এত ভালোবাস আমি যদি মরি তুমি কী করবে। স্বামী বলল আমি পাগল হয়ে যাব। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, তুমি কের বিয়ে করবে ? স্বামী পরম দুঃখীর মত মুখ করে বলল—'পাগলে কী না করে' ?'

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। সুপর্ণা বর্ণার মত অভিনেত্রী নয়। কিন্তু অল্পস্বল্প ক্যারিকেচার বেশ করতে পারে।

আমি বললাম, 'বর্ণার ক্ষমতা আছে বলতে হবে।' শোকসন্তপ্ত বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি যে সব ফন্দী কৌশল উদ্ভাবন করেছি প্রথম কিছুদিন পর্ণাকে সে কথা বলিনি। তারপর সবই বলেছি। কিন্তু পর্ণা যেন বর্ণার ওপর এখনো তেমন প্রসন্ন নয়।

সুপর্ণা বলল, 'ওই আর একখানা মেয়ে। যখন যে সময় টপোমপো করছে। সারা দুনিয়াটাই যেন ওর টেক আর রিহার্সাল রুম।'

হেসে বললাম, 'ভালোইতো।

সুপর্ণা বলল, কিন্তু ওর জন্যে কার যে কখন কপাল ভাঙবে তার ঠিক নেই।'

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'তোমার কপাল সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই পর্ণা।'

মনে মনে ভাবলাম খুব কম মেয়েই আর একটি মেয়ে গুণগুলোর সমবদার হয়। কিন্তু ঈর্ষার হিসাবে আমরা ছেলেরাই কি কিছু কম যাই? আমরা আরো চতুর, আমাদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরো বড়, তাই হয়তো অমন করে চোখে পড়ে না।

অতুলবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ফোনে কথা হয়। তিনিও ফোন করেন, আমিও করি।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকাবাবু কেমন মনে হচ্ছে? বিজনের কিছু পরিবর্তন-টরিবর্তন হল?'

অতুলবাবু খুব খুশি। বললেন, 'অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি যে বদলাবে আমি ভাবতেই পারিনি। এখন তোমার বন্ধু হাসে, গল্প করে। মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসে। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় প্রদীপ।'

আমি লজ্জিত, হয়ে বলি, 'কী যে বলেন কাকাবাবু। বিজু যাতে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে আমরা তা সকলেই চাই।'

অতুলবাবু বললেন, 'এখন একটা দিনক্ষণ দেখে দুহাত যত তাড়াতাড়ি এক করে দেওয়া যায় ততই ভালো।'

হেসে বললাম, 'আপনি ওকথাও ভাবছেন নাকি?'

অতুলবাবু বললেন, 'ভাবছি বই কি। বেশি দেরি করে লাভ কি বলো। শেষে কোথায় আবার কোন অঘটন ঘটে বসবে। আমার যা কপাল। মেয়েটি সত্যিই ভালো প্রদীপ। অভিনয় করুক আর যাই করুক ঘর সংসারের কাজ-কর্ম ভালোই জানে। আর সেবা যত্ন যা করে তার তুলনা নেই। বলতে কি তোমার কাকীমা যাবা যাওয়ার পর এমন যত্ন আমি আর কারো কাছে পাইনি। মাঝখানে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল ও আমার কী সেবাটাই না করল। মনেই হয় না টাকার বিনিময়ে কাজ করছে। টাকায় এসব হয় না প্রদীপ। টাকাটা দরকার তাই নেয়। কিন্তু যা পাই তা আমাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি।'

কর্ণার যে এতগুণ আছে তা আমি জানতাম না! শুনে খুশিই হলাম।

বললাম, 'তাহলে আপনিই একদিন সাউথ করে দেখুন না।'

অতুলবাবু বললেন, 'সে কি হয় প্রদীপ? ছেলের বাপ হয়ে আমার কি প্রথমে এগিয়ে যাওয়া সাজে?'

আমি বললাম, 'তা হলে বিজুই এগিয়ে যাক। সময় সুযোগ মত ওর প্রোপোজ্ করাই ভালো।'

অতুলবাবু বললেন, 'তাহলে সেই কথাই তুমি তোমার বন্ধুকে বলে দিয়ো।'

হেসে বললাম, 'ওকে কিছু বলতে হবে না কাকাবাবু। ও নিজের গরজেই যা করবার করবে।'

অতুলবাবু বললেন, 'তবু আমাদেরও তো কিছু করণীয় আছে বাবা। আমারও আছে তোমারও আছে। তুমি ওর বাবা মাকেও আকারে ইঙ্গিতে বলে দেখতে পার। আমার কোন দাবি-দাওয়া নেই। তবে বিয়ের পর বিয়েটার টিয়েটার না করাই ভালো। যদিও ভদ্রঘরের অনেক মেয়েই আজকাল করছে তবু—'

বললাম, 'ও সব ব্যাপার ওদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দিন কাকাবাবু।'

অতুলবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছ। ওসব পরে ভাবা যাবে। আগের কথা আগে। তোমাকে যা বললাম সে কথা কিন্তু মনে রেখো প্রদীপ।'

'আচ্ছা কাকাবাবু।'

বলে ফোন রেখে দিলাম। ভদ্রলোক ফোনে একটু বেশি কথাবার্তা বলতে ভালোবাসেন। ওঁর ও তো বন্ধুবান্ধব আজকাল বিশেষ কেউ নেই। কাউকে পেলে সহজে ছাড়তে চান না।

যা চাইছিলাম তাই হতে যাচ্ছে। তবু বিজনের কাণ্ড দেখে একটু অবাকই হলাম। বর্ণার সঙ্গে আলাপের পর দু'মাস যেতে না যেতেই সে ওর প্রেমে পড়ে গেল। দীপ্তির জন্যে ওর শোকের সেই তীব্রতা তো আমি দেখেছি। সেই শোক এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল বিজন। আসলে যতই ও নিঃসঙ্গতার বড়াই করুক সঙ্গের তৃষ্ণা ওর মনে অপরিসীম। কোন একজনকে অবলম্বন না করে ও বাঁচতে পারে না। বাঁচবার জন্যেই ওর কাউকে না কাউকে চাই। ওর এই দ্বিতীয় প্রেম সম্বন্ধে বিজন কিন্তু আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরুচ্ছ্বাস। বর্ণার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা আমাকে বিজু কোন দিন বলেনি। প্রসঙ্গ উঠলেই এড়িয়ে গেছে। হয়তো ওর মনে লজ্জা আছে, দ্বিধা আছে। হয়তো ভয় আছে উপহাস পরিহাসের। আমি ভাবি এত লজ্জা ভয় কিসের। কার সাহস আছে জীবনের এই ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে? দুদিন পরে বিজন কাউকে না কাউকে ভালোবাসত, বিয়েও করত। সেই প্রণয় আর পরিচয় যদি দুদিন আগে ঘটে যায় ক্ষতি কি?

বিজন বর্ণাকে নিয়ে বাইরে টাইরেও বেরোয় শুনতে পেলাম। বিজু নাকি ইদানিং নাট্যামোদী হয়ে উঠেছে। বর্ণাকে রিহার্সেল রুমে নিয়ে যায়, মাঝে মাঝে ওর অভিনয় দেখতে যায়। শুনে কৌতুক বোধ হল। সেই বিজন! এক জন্মেই মানুষ বহুবার জন্মায়। নাকি একজনের মধ্যেই বহুজন বাস করে।

স্মৃতি :

স্বর্গত সুখ্যাত কথা সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—যিনি এখনো বাংলা-সাহিত্য থেকে হারিয়ে যান নি—মজলিসী-বৈঠকে যিনি অদ্বিতীয়—তাঁর জীবনকে এবং পরিবেশকে ঘিরে অনুপম গল্প-কাহিনী।

একজন আর কয়েকজন ॥ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ॥

দাম : চার টাকা

উপন্যাস :

মেঘ আর পাহাড়—মন এবং জীবনকে ঘিরে কথায় এবং বিন্যাসে, ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাতে লিরিক-ধর্মী অনবদ্য কথা-কাহিনী।

মেঘ পাহাড়ের গান ॥ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ॥

দাম : দু'টাকা

গল্প :

কয়েকটি গল্প—যার আয়তন স্বল্প, কিন্তু ব্যঞ্জনায় সুদূর।

দ্বিতীয় বাসর ॥ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ॥

দাম : আড়াই টাকা

কবিতা :

সাগর আকাশ ॥ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ॥

দাম : দু'টাকা

একদিকে জীবনের চার দেয়ালের বন্ধন, অপরদিকে সাগর-আকাশের অনন্ত প্রসার। আধুনিককালের নামকরা কবিতা সংকলন।

ডি, এম, লাইব্রেরী : ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

ওদের মেলামেশা আমাদের জানাশোনা বন্ধুবান্ধবের অনেকেরই চোখে পড়ল। সব চেয়ে অবাক হলাম আমার রাজনীতিকবন্ধু অলোক সেনেরও ব্যাপারটা চোখ এড়ায় না।

অলোক একদিন আমাকে অফিসে গিয়ে পাকড়াও করল। 'তোমার উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের কাণ্ড শুনেছ? বর্ণার সঙ্গে খুব জমিয়ে তুলেছে। হৃদয় সিংহাসনও বোধ হয় এক মিনিটের জন্যেও খালি রাখতে নারাজ।'

হেসে বললাম, 'তাতে তোমার কি? তুমি তো আর ও সব ব্যাপারের মধ্যে নেই?'

আমাদের অফিস ক্যানটিনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে চা খাওয়াবার জন্যে। আমার এই বন্ধুর দর্শন কদাচিৎ আমি পাই। তবু আমি কেন ওর বাবা মাও ওর দেখা পান না। ও বাইরে বাইরে থাকে। পার্টির কাজকর্ম করে। চন্দ্রকান্তার একটা স্কুলে পড়ায়। তারই কাছাকাছি একটা মেসে থাকে। পারিবারিক বন্ধন ওর কাছে বড় নয়। আমাদের মত বন্ধুত্বের সম্পর্কও ওর কাছে গৌণ। আমাকে ও প্রায়ই ক্যারিয়ারিষ্ট বলে গাল দেয়। এস্টেপিষ্ট বলে অনুকম্পা করে। কোন সন্ন্যাসী কোন গৃহীর বাড়িতে ঢুকলে তাকে যেমন করুণার চোখে দেখে আমার এই রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর কাছেও আমরা তেমনি ঘৃণা আর অবজ্ঞার পাত্র! অলোক সব সময় চরমপন্থী। সব ব্যাপারেই ওর উগ্রতা দেখতে পাই। ওর চুলগুলি খাড়া খাড়া, কথায় ঝাঁজ বেশি। ভুরুর ওর শ্লেষ ব্যঙ্গ। শুভেন্দুরা ওকে পছন্দ করে না। আমি কিন্তু ওর নিষ্ঠাকে মূল্য দিই, ওর আদর্শকে শ্রদ্ধা করি। যদিও ওর পথের সঙ্গে সব সময় একমত হতে পারিনে। হুজুগপ্রিয়তা আমার ধাতে নেই।

অলোক বলে, 'তোরা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী এই হল তোদের একমাত্র পরিচয়। যারা কিছু করে না করতে চায়না তাদের অজুহাতের অভাব হয় না।

ওদের দলের প্রচারমূলক একটি নাটকে ছোট একটি স্ত্রী ভূমিকার দরকার ছিল। আমি সেই উপলক্ষ্যে বর্ণার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। দু'একবার বোধ হয় অভিনয় বর্ণা করেও ছিল। কিন্তু অলোকের তেমন পছন্দ হয়নি। বর্ণাও বলেছিল ওসব প্রপাগাণ্ডা ভূমিকায় আমি আনন্দ পাইনে। ওখানে আমার কিছু করবার নেই। তারপর অলোক ওদের দলের কালচারাল ফ্রন্ট থেকে সরে গিয়ে সরাসরি কৃষক মজুরের মধ্যে মেশে যায়। সেখানে কী করে না করে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই।'

অলোক চা শেষ করার আগে সিগারেট ধরাল। হেসে বলল, 'তুমিই নাকি নাটের গুরু নিত্যানন্দ। সব যোগাযোগ নাকি তুমিই করিয়ে দিয়েছ।'

আমি বললাম, 'কে বলল, তোমাকে। তোমার তো এসব খবর রাখার কথা নয়। যতদূর জানি এগুলি তোমার পার্টি প্রোগ্রামের মধ্যে পড়ে না।'

অলোক আমার দিকে তাকাল, একটু হেসে বলল—'প্রোগ্রামের বাইরেও জীবন আছে। কিন্তু প্রোগ্রাম সবচেয়ে বড়। যাগগে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবি একটু খোঁজ খবর নিয়ে গেলাম।' আমি ওকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোর অপার অনুগ্রহ।'

অতুলবাবুর কাছে থেকে আরো কয়েকবার তাগিদ পেয়ে বর্ণার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এ ব্যাপারে ওকে বাড়িতে ডেকে আনা সঙ্গত মনে করলাম না। চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটি রেষ্টুরেন্টেই চা খেতে ডাকলাম।

আমার কাপে পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে বর্ণা বলল, 'কী ব্যাপার বলতো। হঠাৎ আমার যে এত তত্ত্বতালাস করছ? বউকে ভয় কর না? এমন ডেয়ারডেভিল হলে কবে থেকে?'

আমি ধীরে ধীরে অতুলবাবুর প্রস্তাবটি ওর কাছে তুলে ধরলাম।

বর্ণা ম্লান মুখে বলল, 'আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম প্রতীপদা।'

আমি বললাম, 'আশঙ্কা? আশঙ্কা কিসের?'

'এ বিয়ে হলে সব চেয়ে সুখের ব্যাপার হবে। বিজন তো অযোগ্য নয়।'

বর্ণা বলল, 'অযোগ্য কে বলছে?' তারপর একটু হেসে বলল, 'আমারই বুঝি কোন যোগ্যতা নেই? একটি হোমরচোমরের হাতে আমাকে তুলে দেওয়ার মতলব।'

আমি বললাম, ও তো নামে মাত্র হোমরচোমর। শুধু কাগজে কলমে বিয়ে হয়েছিল। ঘর সংসার তো আর করেনি।'

বর্ণা বলল, 'সে জন্যে নয়। তোমার সব শর্তই আমি পূরণ করেছি। ভালোবাসার অভিনয় করে তোমার বন্ধুকে শোক সাগর থেকে তুলে এনেছি। তাকে ফের জীবনমুখী করেছি। সংসারের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বাসনা কামনার মধ্যে এনে দিয়েছি। আর আমার কাছে কিছু চেয়ো না। এবার আমাকে মুক্তি দাও। আমি বিজনকেও সে কথা বলে দিয়েছি।'

'বলেছ?' আমি আঁৎকে উঠলাম।

বর্ণা বলল, 'যা সত্য তাকে আর কতদিন গোপন করে রাখব? সারাজীবন তো আর অভিনয় করা যায় না? তা দু'চার ছ'মাসই চলে!'

ওর কথার তীব্রতায় আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

শূন্য কাপে চামচেটা নাড়তে নাড়তে বর্ণা বলল, 'তোমাদের উপকার করতে গিয়ে আমার নিজেরও একটু লাভ হয়েছে প্রতীপদা।'

'কি রকম?'

বর্ণা বলল, 'আমি আর একজনের মনে ঈর্ষ্যা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছি। যে আমার ওয়ার্ক একেবারেই স্বীকার করত না সেও এখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বাইরে কারো কাছে নয়। মনে মনে নিজের কাছে। মাঠে ময়দানে বক্তৃতাবাজি করতে করতে অন্তত দিনের মধ্যে একবারও সে আমার কথা ভাববে। না ভেবে পারবে না।'

আমি সবই বুঝতে পেরেছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে সে?'

বর্ণা কের একটু হেসে বলল, 'সেও তোমার আর এক বন্ধু।'

আমি দ্বিতীয়বার স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

ভারত ও সোভিয়েতের মৈত্রী আজ সুদৃঢ়। এই মৈত্রী বন্ধন দুই মহান দেশের পরস্পর সহযোগিতা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে বহু যুগ আগে, যখন না সোভিয়েত না ভারত, কেউই চিন্তা করেন নি এই মহা-মিলনের কথা, তখন গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ ভারতবর্ষে এসেছিলেন সুদূর সোভিয়েত দেশ থেকে মৈত্রীর বাণী হাতে নিয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাই, ভারত প্রেমিক লেবেডেফ আজ একটি স্মরণীয় নাম।

জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নাটকের অবদান সব চাইতে বেশি—সেই সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে তুলতে সোভিয়েত-শিল্পী বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গোড়াপত্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন—অনেক নির্যাতন এজন্যে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে; কিন্তু তিনি বিচলিত হননি, এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

আজকের এই বিধা, দ্বন্দ্ব ও বিভেদ-বিদীর্ণ পৃথিবীতে লেবেডেফের মতন বিশ্বপ্রেমিকের নাম বার বার স্মরণীয়। এবং এই জন্যই, আজিকার দিনে লেবেডেফ সম্পর্কে এই আলোচনাটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

সম্পাদক

লেবেডেফের থিয়েটার

প্রথম বাংলা নাট্যশালা

ডাঃ সুরেশচন্দ্র ঘোষ

রুশ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সর্বপ্রথম থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নাট্যসাহিত্যের চর্চা ও অভিনয়ের ধারা প্রবর্তন করে রুশ-নাগরিক বঙ্গভাষা-প্রেমিক গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ বাঙালীর তথা মহাভারতীয় সংস্কৃতি-জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁকে বলা যায় রুশ-ভারতীয় সংস্কৃতিগত মৈত্রীবন্ধনের অগ্রদূত। ১৭৮৭ সাল থেকে সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল কলিকাতা সহরে তাঁর অবস্থান—এদেশের সংস্কৃতি-জীবনের সম্মুখে তিনি থিয়েটারের পাদপ্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। সেদিন ছিল কলিকাতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৈষয়িক স্বার্থের রাজধানী। একজন রুশ নাগরিক হিসাবে লেবেডেফ ব্রিটিশ বণিকের কাছে আশা করতে পারেন না অধিক বা অন্য কোন সাহায্য—তাই তিনি স্বীয় অর্থ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গলী থিয়েটার। নতুন কালের অভিজ্ঞতা—সেই সঙ্গে রুশ সংস্কৃতি-জীবনে থিয়েটারের অবদান তাঁকে অনুপ্রাণিত করল অনগ্রসর একটি দেশকে চলতি-কালের সঙ্গে আগামীকালের সংস্কৃতির সেতুবন্ধন করতে। তিনি বাংলাভাষা শিক্ষা করলেন,

বাংলা ভাষায় নাটক অনুবাদ করলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। বর্তমানে এলগিন স্ট্রীটে তখন ডুমতলা স্ট্রীট ২৫ নম্বরে, ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ সালে বাঙালী অভিনেতা—অভিনেত্রীদের সমবায়ে প্রথম বাংলা থিয়েটারের পত্তন হল—বাংলাভাষায় নাটক অভিনয় হল। জন-সমাগমে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হল—দেশের লোক আনন্দিত হয়ে দেখল দৃশ্যপট সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়।

এই রূপ মনীষী নাট্যানুরাগীর উদ্যোগ সেদিনের শাসক-সম্প্রদায় ভালো চোখে দেখতে পারলেন না। কুটীল-চক্রান্তের বড়যন্ত্রজাল পাতা হলো—সেদিনের ন্যায় ও নীতির তীর্থভূমি ব্রিটিশ বিচারালয়ের ব্রিটিশ-ব্যবহারজীবী দলও নেপথ্যের এই ষড়যন্ত্রের নিকট নিজেদের বিবেকবুদ্ধিও বলি দিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাট্যমঞ্চ ছিল। সেখানকার দৃশ্যপট আঁকার শিল্পী লেবেডেফের থিয়েটার ওঠাতে ওয়েচক্রান্তে বেঙ্গলী থিয়েটারের চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিশ্বাসভঙ্গ ঘটাতে কৃতকার্য হল।

লেবেডেফ স্বীয় অর্থ ও শ্রমে যে থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন নিরঙ্কুশ-সাধনায়, ব্রিটিশ-বণিকের বিচারালয়ে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে, তিনি ব্যর্থ বেদনা বুকে নিয়ে মাত্র সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হলেন তাঁর সেই 'বেঙ্গলী থিয়েটার'।

"ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে এই সকল গবেষণার পর আমি দুইখানা ইংরাজী নাটক বাংলাভাষায় অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলককথা—সে যতই বিশুদ্ধ-ভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—তদপেক্ষা অনুকরণ ও হাসিতামাশা বেশী পছন্দ করে থাকেন। সেই কারণে, আমি চৌকিদার, চোর, উকীল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্বাচন করি।

আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হবার পর আমি কয়েকজন বিচক্ষণ পণ্ডিতকে আহ্বান করে আনি এবং তাঁরা মন দিয়ে আমার নাটক দুইখানি পড়লেন। পড়বার সময়ে কোন্ কোন্ জায়গা তাঁদের কাছে খুব ভাল লাগল এবং কোন্ কোন্ জায়গায় তাঁহারা খুব মুগ্ধ ও বিচলিত হলেন, সেটিও আমি লক্ষ্য করলাম। এই উপায়ে আমার অনূদিত নাটক দুইটি হাস্য-রসাত্মক ও গম্ভীর উভয় প্রকার দৃশ্যগুলিই যে অনেক উৎকর্ষ লাভ করল, এ-কথা বললে নিজের সম্বন্ধে অথথা প্রশংসাবাদ হবে মনে হয় না। নিজের জন্য সৌভাগ্যক্রমে যে শিক্ষক যোগাড় করতে পেরেছিলাম, তা যদি সম্ভব না হত তাহলে আমি যা করতে পেরেছিলাম, অন্য কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে তা অনুকরণ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হত।

পণ্ডিতরা অনুমোদন করে যাওয়ার পর আমার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্বসমক্ষে অভিনয় করতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এ-দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী এনে দিতে পারেন। তাঁর এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এবং ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য আমরা নাট্যশালার সঙ্কল্প অবিলম্বে সফল করবার উদ্দেশ্যে, গবর্নর-জেনারেল সার জন্ শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের দরখাস্ত করলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় লাইসেন্স মঞ্জুর করলেন।

এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আশ্বস্ত হয়ে নাটক প্রদর্শন করবার জন্য সমুৎসুক হয়ে আমি নিজে নক্সা করে কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমটোলায় (ডোম লেন) একটি বিস্তৃত নাট্যশালা নির্মাণ আরম্ভ করলাম। ইত্যবসরে আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করবার কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। তিন মাসে The Disguise নাটকটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত

হয়ে গেল। ১৭৯৫ সনের ২৭এ নভেম্বর আমি বাংলা ভাষায় এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করালাম। পর বৎসর (১৭৯৬) ২১এ মার্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়।"—লেবেডেফের এই জবানীতে বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রাথমিক ইতিহাসের কথা মুখ্যতঃভাবে আমরা জানতে পারি। নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে তাঁর মধ্যে ছিল দুর্জ্ঞাত প্রজ্ঞা এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বহন করছে নাটকের মঞ্চ সাফল্যের পরিচয়। আটা-শালায় দর্শকের ভীড় যেমন হয়েছিল, তেমনি আনন্দের বান ডেকেছিল। লেবেডেফ দর্শক সমাজের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য।

তৎকালে ছিল গণ-জীবনে পুরাতনের প্রভাব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাট্যমঞ্চ ছিল। কিন্তু সেখানে দেশীয়দের প্রবেশাধিকার ছিলনা। তদুপরি বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে, নিজে নকশা এঁকে থিয়েটারের বাড়ী তৈরী ও নাট্যমঞ্চ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করে লেবেডেফ যে আদর্শ স্থাপন করেন—পরবর্তী চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেকালের সংবাদপত্রে লেবেডেফের থিয়েটারের যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় যে, বক্স ফর্শনীমূল্য আট টাকা ও গ্যালারী চার টাকা ধার্য ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই হারে ফর্শনী দিয়ে সেদিন লেবেডেফের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বঙ্গভাষায় অভিনয়ের জন্য নির্মিত থিয়েটারে দর্শকদের অভাব ঘটেনি।

'দি ডিস্‌গাইস' এবং 'দি লাভ ইজ দি বেষ্ট ডক্টর' দুইখানি ইংরাজি নাটক লেবেডেফ-এর থিয়েটারে বঙ্গভাষায় অনুদিত হয়ে অভিনীত হয়। এই দুইখানি নাটকের মধ্যে অনুবাদকের দৃষ্টি ছিল জনরঞ্জনের দিকে—তাঁর প্রবণতা ছিল জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন। জন্মদেশের নাটকীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আবাল্য তাঁর সংযোগ এই বিষয়ে তাঁকে খুব সম্ভব অনুপ্রাণিত করে। লেবেডেফের অনুবাদের মধ্যে তৎকালীন কলিকাতা জীবনের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখে বিস্মিত হই যে, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর পরিচয়। এই জন্য নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে দেখতে পাই জনতার জীবন ও সমাজের প্রতিনিধি রূপে এসেছে চৌকিদার, মুহুরি, বুনিয়া, গাউয়া, বাজিয়া, নাচিয়া ইত্যাদি।

এদেশের পণ্ডিতদের সামনে যখন লেবেডেফ তাঁর অনুবাদ উপস্থাপিত করেন তখনকার দিনে তখন বাংলা গদ্যের কোন স্থায়ী আদর্শ রূপ ছিল না, এজন্য সেই অনুবাদের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ মন্তব্যের অভাব দেখা যায়। 'দি ডিস্‌গাস' কথাটির সাধারণ অর্থ 'ছদ্মবেশ' কিন্তু লেবেডেফের অনুবাদে হয়েছে 'কাল্পনিক সংবদল।' এখানে উক্ত নাটকের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে ভাষা ও বক্তব্যের পরিচয় উপস্থাপিত করা হল—

["নানান বাজিয়্যারা ভিন্ন ভিন্ন পোশাকেতে আর আর সকলের কাছ করে ও জানালার সম্মুখে।]

ভাগ্যবন্তিঃ (বাজিয়্যাদিগকে কয়।) মহান এরা, এই ভাল। ঠাকুরাণি তুই হইয়াছেন মুনিয়া আর উনি বলেন আমার (তাহার) দিগকে যাইতে। সুত হউক। বাজিয়্যারা গেল। ভাল, আমি প্রার্থনা করি যে এ আয়জন ফুরিয়াছে। আমি নিতান্ত উতলাতপ্রস্ত ছিলেম। সে কি নিমিত্তে। কেবল একটি মহত্তর কারণ। পশ্চাতে তারে পাইলে কিছু মন্দ ভবে ঠাহরিবেন না। একটি স্বামির নিমিত্তে। ও কি দুর্দশা এ, তা আমি জানি বিলক্ষণ রূপে। রাম বল! রক্ষা পাই, কি আকার এ আসিতেছে এখানে এবং কথা কহিতেছে আপনা আপনি। এ যুবা—যা হোক, আমি সাহস করিয়া খানিক দেখি উহাকে, সতর্ক হই উহাকে। ভাগ্যবন্তি (ঘোমটা দিয়া লুকায়) ঘোমটা টেনে বীলো প্রবেশ হইল রামসন্তোষ গোঁসের সহিত, জামাগায়, ভোপ, চুপি পাগনা দেয়া। মৌখে খেড়ায়।"

উপরিউক্ত রচনার মধ্যে নাটকীয়-রীতির গঠন—পারিপাট্য বর্তমানের চক্ষে প্রশংসনীয় না হতে পারে—কিন্তু একজন রুশ দেশবাসীর বাংলা শিক্ষার চমৎকার পরিচয় আমরা পাই। এই বিষয়ে বঙ্গভাষায় সাম্প্রতিক কালে কিছু গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। আরও জানা গেছে যে, লেবেডেফ স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য লেবেডেফ থিয়েটার সোসাইটী নামে একটি সংস্থা সমিতি-আইনে স্থায়ীভাবে কাজকরার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বঙ্গরাষ্ট্র মঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে লেবেডেফের অবদান অতুলনীয়। সম্প্রতি জানা গেছে যে, নাটকের পাণ্ডুলিপি এবং লেবেডেফের সম্পর্কীয় অন্যান্য কাগজপত্র মস্কোতে সংরক্ষিত আছে। সেকালে এগুলি মুদ্রিত হয়নি—মনে হয় শত্রু চক্রের চক্রান্তে তাঁর বহুসাধে গড়া থিয়েটারের অকাল-বিলুপ্তি ঘটল বলে—ভগ্নোদ্যম মনীষী লেবেডেফ এদেশ থেকে চলে গেলেন আকস্মিক ভাবে।

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সূচনাকালে এই রুশ মনীষী বঙ্গভাষা, বঙ্গরঙ্গমঞ্চ এবং এদেশের জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনে নাট্যমঞ্চের যে পাদপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, সেই প্রদীপ্তি, বহু বাধা ও চক্রান্ত সত্ত্বেও—শতাব্দীর পাঁচ অন্ধকার ভেদ করে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে রুশদেশীয় বঙ্গভাষা প্রেমিক এই মনীষীর বঙ্গভাষা প্রীতি ও সাধারণ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার গৌরবময় কথা ও কাহিনী।

———

নিখুঁত ব্লক ও মুদ্রণ—
কাজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

★ ★
★

ষ্টিরিও ক্র্যাফট্

৪১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪-৪৩৮৯

আপনাকে পূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

॥ সংযোজন ॥

পরিচালনা—বেলা দে

অংশ গ্রহণ করেছেন :

অরুণা মুখোপাধ্যায়	অঞ্জলি চ্যাটার্জী
কল্যাণী মুখোপাধ্যায়	অঞ্জনা ভট্টাচার্য
শান্তা বসু	বেলা দে
হাসি ভট্টাচার্য	জ্যোতির্ময়ী দেবী
সুনীতি গুপ্ত	বেলা দেবী
রমা নন্দী	ইন্দিরা দেবী
মীণা সেন	পুতুল রায়
শঙ্করদা	

লক্ষাধিক প্রচারিত
নির্ভীক, নিরপেক্ষ,
স্বাধীন, সংবাদপত্র

যুগান্তর

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের
স্বচ্ছ দর্পণ।

মহামায়ার সর্বশক্তি বিকশিতা সর্বত্রা মাতৃমূর্তি বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও মেলে না—কি অপূর্ব কল্পকথা, কত তপস্যা, কত ধ্যানের মহিমা এই মাতৃরূপিণী দুর্গার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সিংহবাহিনী, দশভূজা রূপ মানব সমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্ত প্রকাশ। পশুরাজ সিংহ এঁর বাহন, মহোন্মত্ত অসুর এঁর পদানত। দেবীর যোধনে শুধু নরলোক কেন, পশু ও অসুরলোকও তাদের নিজ নিজ পূর্ণ সামর্থ্যে জেগে উঠেছে—এই সামঞ্জস্য ও শৃংখলিত ঐক্য এই মূর্তিতে সূচিত হচ্ছে। বামে বীণাপাণি ও দক্ষিণে নিখিল বিদ্যা ও সামরিক বল, দক্ষিণে সকল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী কমলা ও সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। পটভূমিকায় ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর এই আসনের সহায়তা করছেন। এই ধ্যানমূর্তির পূজক আমরা—এই মহাশক্তির পূজাধিকার কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাই আমাদের সত্যে ও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—তবেই এ পূজা সার্থক হবে।

সেকাল ও একালের দুর্গাপূজা

অরুণা মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপূজো হলো মায়ের পূজো—মাতৃভাবে অনন্তের উপাসনা। প্রধানতঃ বাঙালী হিন্দুর পূজো এই দুর্গাপূজো।

সেকাল ও একালের পূজো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে প্রাচীনযুগের পূজোর কথা। দ্রাবিড়যুগে পূজো কথাটির অর্থ ছিল পুষ্পকর্ম। এই অর্থ ব্যাপক রূপ নেয় আর্যযুগে: "ফুল বেলপাতা প্রভৃতি উপকরণ ও উপচার দ্বারা ভগবানের আরাধনা" হলো পূজো।

পূজো অর্থে সাধারণতঃ মূর্তি পূজোই বোঝায়; সাকার উপাসনার মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। পুরাণে এর রূপায়ণ ঘটেছে।

দুর্গাপূজোর লক্ষ্য হলো জাতির ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ। "দুর্গা প্রতিমার লক্ষ্মী ধনের, সরস্বতী জ্ঞানের, কার্তিক বীরত্বের, গণেশ সাফল্যের প্রতীক। আর দুর্গার দশটি হাত ও দশটি প্রহরণ অপরিমেয় বলবীর্যের দ্যোতক। এই সকল গুণের অধিকারী হলেই জাতি সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করে। সিংহ বশ্যতার প্রতীক। মহিষাসুর সমস্ত অশুভের প্রতীক…" অনন্ত শক্তির প্রতীকই হলো দুর্গাপূজো।

দুর্গাপূজোর অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে সার্বজনীনতার ভাব চির-বিদ্যমান। কুম্ভকার, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বাজকর ও-ভূঁইমালী এদের সকলের মিলিত ঐক্যই পূজোকে সার্থকরূপ দেয়। পুষ্পাঞ্জলিতেও সার্বজনীনতার ভাব। এরপর অবাধ মিলনে পূজো শেষ হয় বিজয়া উৎসবে।

সেকালের দুর্গাপূজোর প্রস্তুতিপর্ব এখনকার মত ছিল না। তখন পাড়ায় পাড়ায় এত বারোয়ারী পূজো হতো না। ঘরের পূজোই ছিল বেশি। কাজেই চাঁদা আদায়ের জন্য জনসাধারণের উপর এত চাপও দেওয়া হতো না। তখনকার দিনে পূজোর আনন্দ থাকতো অনেক বেশি। পূজোর সাজ-সজ্জা ও রোশনাইয়ের এত আধিক্য ছিল না। অনাড়ম্বর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষের মনকে পূজোর আনন্দ আরো বেশি করে জাগিয়ে তুলতো। এখন যেন পূজোমণ্ডপে সাজ-সজ্জা দেখে মনে হয় মা দুর্গার দর্শন অপেক্ষা তাঁদের নিজেদের সাজ-সজ্জা দেখানো ও অপরের সাজ-সজ্জা দেখার দিকে প্রাবল্যই অধিক। সকলের মধ্যে ভক্তির ভাব অপেক্ষা প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাবই বেশি। সেকালে পূজোর আগে থেকেই বাঙালী মায়ের আগমনী গান তা বয় জনের কাছে এমনকি ভিক্ষুকের মুখেও শোনা যেত। শারদ-প্রভাতে এসব গান আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলতো। আজকের রকেটের যুগে সে কথা ভাবা কিন্তু স্বপ্ন।

দুর্গাপ্রতিমার গড়নও এখন আগেকার দিনের মত হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিকাদের অনুকরণে দুর্গাপ্রতিমা গঠিত হয়। মা দুর্গার বেশভূষাও আধুনিক ছাঁদে করা হয়। যিনি জীবজগৎকে দুর্গতির হাত থেকে মুক্তি দেন তিনিই হলেন মা দুর্গা।

দুর্গাপ্রতিমার দর্শনে সেকালের পূজোয় শ্রদ্ধার ভাব জাগতো, এখনকার পূজোয় কিন্তু ঠিক সেই মনোভাব জাগরিত হয় না। অনেক সময় দেখেছি মা দুর্গার মুখের অংশ, অসুরের নাক ইত্যাদি ইত্যাদি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা দর্শনে; বলা বাহুল্য মা দুর্গার সামনে এ ধরণের সমালোচনা শ্রদ্ধার ভাব জাগায় না।

সেকালের পুজোমণ্ডপ প্রাঙ্গনে আলপনা চিহ্নিত স্থানে যখন প্রাচীনারা লালপাড় শাড়ী পরিহিতা অবস্থায় ভক্তি নম্র চিত্তে মা দুর্গার পুজোয় এসে মিলিত হতেন তখন এক পবিত্র শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতো। এখনকার পুজোয় কিন্তু ঠিক সে ভাবের সৃষ্টি হয় না। মণ্ডপের গায়ের উগ্রতা ও মাইকে ছায়াছবির অনেক বিকট গানের কোলাহলে সেকালের পুজোর বিনম্র পরিবেশের কথা যেন ভাবাই যায় না। পুজোর সময় ভক্তিমূলক গান ও স্তোত্রাদৃত পুজো প্রাঙ্গনে বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাব সঞ্চার করে। এখনকার পুজোয় এ সবের বেশ একটা অভাব দেখা যায়।

এখনকার পুজোর আর একটি বিশেষ কথা হলো অনেক সময় বহু টাকা নানা অপ্রিয় অযোধ উৎসবে ব্যয়িত হয়। এতে বহু সময় অমিষ্ট হয়। একবার মনে পড়ে কোন একটি পুজোমণ্ডপে ছেলেরা বেশি নেশা করে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে। এই সময়ে অগ্নিসংযোগে মণ্ডপ ভস্মীভূত হয়; কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল থাকে না। এ ধরণের অনেক দৃষ্টান্তই আজকাল দেখা যায়।

এরপর আসে বিজয়ার অবাধ মিলনের দিনটি। সেকালের পুজোয় এই দিনটি সার্থকভাবে রূপায়িত হতো। পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীর ভাব বিনিময় হয়ে মিষ্টি মুখের পালা সাঙ্গ করে চিরমিলনের একটানা সুরটিকে তখনকার মানুষ ধরে রাখতো। একালের পুজোয় প্রতিমা বিসর্জন এক সাংঘাতিক ব্যাপার বলে আখ্যা দিলে ভুল কিছু হয় না। প্রতিযোগীতামূলক মনোভাব সম্পন্ন মানুষেরা একালের পুজোয় অসংখ্য মূর্তি প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনের ঘাটে এসে এক অরাজকতার সৃষ্টি করেন। সেকালের পুজোয় একালের মত ঠাকুর রেখে দেবার পদ্ধতি ছিল না যেমন এখন বহুক্ষেত্রে ২।৩ দিন পরে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ বিজয়া সম্মিলনী পুজোর পরেই হয়। এখন কিন্তু পুজোর দিনগুলোর মধ্যেই অনেক সময় এই সম্মিলনী অনুষ্ঠান করা হয়। এতে আজকাল দুর্গাপুজোর মাধুর্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

সুতরাং এই হলো সেকাল ও একালের সহরের পুজোর মোটামুটি কথা। তবে সহরের বাইরে এখনও এমন অনেক স্থান আছে যেখানে স্বাভাবিক পরিবেশে অত্যন্ত মানুষ অধিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও দুর্গাপুজোর স্বাভাবিক ভাব কিছুটা রাখতে পেরেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেকাল ও একালের পুজোর দৃষ্টিভঙ্গীর এত পরিবর্তন কেন!

বর্তমান সভ্যতার চাপে মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পরস্পরের মধ্যে অশ্রুসবণাক্ত সমুদ্র।' অধিক সঙ্কট ও যৌথপরিবারের বিলোপ সাধনের জন্য ঘরের পুজোও অনেক কমে গেছে। সে কারণে পুজোতে আনন্দের মধ্যে আতঙ্কের ভাবও এসেছে। বস্তুতান্ত্রিক মানুষ আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই আলোর ঝলমলানি তার মনকে বেশি করে আসিয়ে তোলে। আলপনায় আঁকা পুজোমণ্ডপে লালপাড় শাড়ী পরিহিতা আলতায় আঁকা পা দুটি দেখার মানুষ আজ অত্যন্ত নয়।

তবে ভবিষ্যতে দুর্গাপুজোর যেদিন আমরা মায়ের প্রতিমা দর্শন করে পুজোর সার্বজনীনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে পারব সেদিনই আমাদের হবে সার্থক দুর্গাপুজো। সার্থক হবে স্তোত্রের ভাষা:—

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

পূজার আয়োজন

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

শরৎকাল এলেই যাঁরা বয়স্ক তাঁদের মন স্মৃতিচারণা করে। শরৎ প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে অতীতের প্রতিবিম্ব, সুখস্মৃতি, শৈশব স্মৃতি, জীবনের অধ্যায়গুলো একের পর এক ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে। এবারের আকাশ বিলম্বিত বর্ষাকে অনেকদিন বহন করলো যার ফলে এবারের উৎসব নানা দুর্যোগের ছায়ায় বিষণ্ণ মূর্তি। দেশের নানাস্থান প্লাবিত। মনে পড়ে ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা কাঙালিনী মেয়ের কথা।

পূজোর উৎসবের প্রধান অঙ্গ গৃহস্থ ঘরে অতিথিদের আগমন, নতুন পোশাক কেনাকাটা। ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া যাত্রা-থিয়েটার দেখা। আনন্দময়ীর আগমনকে এইভাবেই উদ্‌যাপন করা হয় বাঙালীর ঘরে ঘরে।

আমাদের বাড়ীতে এক সময় খুব ঘটা করে পুজো হোত। মনে পড়ে জন্মাষ্টমীর দিন দুর্গা প্রতিমার 'মাটি' উঠত। সেদিন কাঠামোর গায়ে মাটী লেপার কাজ সুরু—পুজোর দালানে রাখা পুরনো মেঝ নামিয়ে মেরামত করা হতো-আমরা সারাক্ষণই পুজোর দালানে ঘোরাঘুরি করতাম। প্রথমে একমেটের কাজ—তার দিন দশেক পরে হোমেটে। তার পাঁচদিন পরে হতো রং-তুলির টান। একমনে সবই দেখতাম আর মনে মনে পুজোর দিনগুলো কবে আরো কাছে আসবে তার স্বপ্ন দেখতাম। প্রতিমার অঙ্গ সাজাতে সোলার সাজের প্রচলন আজকাল নেই বললেই হয়। এখনকার প্রতিমার সাজসজ্জা আধুনিক ফ্যাশনে নির্মিত এবং মাটীর ছাচে গড়া। আমাদের বাড়ীতে প্রতিমাকে সাজানো হতো তাকের সাজে কি তার ঝলমলে চাকচিক্য—চাঁদমালা ঝুলতো আর চকচক্ করতো, দেখে মনে হোত যেন এক একখানা রূপোর চাকা ঝুলছে। এ ছাড়া পুজোর কদিন আত্মীয় পরিজন ও কাঙালী ভোজের জন্য প্রায় তিন চারমাস আগে থেকে মা ঠাকুমা ও প্রতিবেশী সবাই কাজে লেগে যেতেন। নারকেল সন্দেশ, নারকেল নাড়ু, খইচুর, মোয়া সব শুকনো খাবার তৈরী হোত। এছাড়া পুজোর নৈবেদ্য সাজাবার জন্য তারে তারে জিনিস আসত। যাঁরা নৈবেদ্য সাজাতেন তাঁরাও ছিলেন এক একজন শিল্পী। কত সুন্দর করে কত নিষ্ঠার সঙ্গেই না তাঁরা এইসব কাজ করতেন।

বাড়ীর বড়রা নিজেরাই ভোগের রান্না করতেন। কদিনই খাওয়া হোত। অবশ্য এখন নানা কারণে এত আয়োজন করা সম্ভব নয়।

হাতের কাজও ছিল সুন্দর এবং সূক্ষ্ম। সারাদিন ধরে তাঁরা সলতে পাকাতেন। কত চিত্র বিচিত্র রংয়ের প্রদীপ বানাতেন। আলপনা দেওয়া হোত সারা দালানে। মানুষ ও দেবতার আরাধনা ও সেবা হোত একই সঙ্গে। ঢাকের বাজনায় মুখর হয়ে থাকত কয়টী দিন।—আজকাল অবশ্য ঢাকের বাজনার বদলে মাইকে শুনি ছবির গান। কিন্তু তবুও মনে হয় পুজোর দালান বা মণ্ডপ কখনই সম্পূর্ণ হয় না ঢাকের বাজনা না বাজলে।

পূজা-মণ্ডপ

শান্তা বসু

বাঙালীর একান্ত নিজস্ব উৎসব দুর্গোৎসব। বাঙলার বাইরে যেখানেই বাঙালী সেখানেই দুর্গোৎসব। এই উৎসবকে বলা হয় শারদীয়া উৎসব। বর্ষার সজল ঘন ধারা বর্ষণের শেষে শরতের সোনার আলোয় প্রকৃতি যখন নবপত্রিকা, নবপুষ্পে, নবশস্যে শ্যামল শোভায় বিকশিতা তখনই হয় দেবীর আবাহন। দেবীপূজার আনন্দের মূল সুরটি বাজে আবাহনে, আগমনে সম্মেলনে। প্রকৃতির পূর্ণতার রূপ ফোটে ষড়ৈশ্বর্যময়ী প্রতিমার মাঝে—প্রাণের সাড়া জাগে সবার মনে—সবার সম্মিলিত আনন্দের মাঝে, মিলনের মাঝে বাজে উৎসবের সুর—যে উৎসব একক নয়, বহুর সম্মেলনে যার সার্থকতা। সবার সম্মিলিত প্রাণের প্রণামটি অমৃতময়ী জননীকে নিবেদন করতে বাজে আগমনী-সুর। পূজার পুষ্পবেদী পূর্ণ হয় জগন্মাতার চরণস্পর্শে—পূজামণ্ডপ পূর্ণ হয় সার্বিক আনন্দের রূপ নিয়ে—সবার আগমনে দেবীর পূজার অন্তরের উপাচারটির নিবেদনে বাঙালীর জীবনে এই উৎসব যে কত একান্ত তার পরিচয় পাই আগমনী আর বিজয়ার গানে।

কিন্তু আমাদের জীবন থেকে আজ দেবীমাহাত্ম্য চলে গেছে, ধর্মবোধ শিথিল হয়েছে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে হারিয়ে গেছে শারদীয়া উৎসবের মূলসুরটি। আজকের দিনে দেবীপূজার উৎসবের তাৎপর্য্য নেই, অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ব্যাকুলতা নেই। মানুষের বহির্মুখিনতা, অন্তঃসারশূন্যতা, আবেগহীনতা, অশান্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা সবকিছুই আজ উৎসব উপলক্ষ করে উত্তেজনার প্রকাশ চাইছে। দেবী আজ গৌণ, উৎসব আজ উপলক্ষ্য যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য আর উত্তেজিত উল্লাসের সমারোহ। আজকের তারস্বরে সিনেমার গানসর্বস্ব মাইকের তাড়নায়, উৎকট সজ্জার অশোভন প্রদর্শনী আর হুলাহুলি কলহ-মুখরিত পূজামণ্ডপ থেকে মন চলে যায় ফেলে আসা দিন-গুলিতে। অন্তরের অন্তঃপুরের পথ বেয়ে ধীরে ধীরে পার হোয়ে যাই টলটলে জলে ভরা ঘাট-শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে লম্বুবৎখানা পেরিয়ে রাসমঞ্চের ধার দিয়ে এসে দাঁড়াই দেউড়ীর সামনে। সেই দূর থেকেই চোখে পড়ে মহিষা-উদ্ভাসিত জননীর অমৃতময়ী মূরতি।

দেউড়ীর দুইধারে সতেজ সবুজ দুটি কলাগাছের নীচে আম্রপল্লব, গঙ্গাজল সিঁদুরের আলিম্পনে সাজানো পূর্ণঘট। দেউড়ীর মাথার দিকে আমপাতা আর দেবদারুপাতার ঝালরের মাঝে মাঝে শোলার ঝুমকো দুলছে। দেউড়ী পেরিয়ে প্রশস্ত আঙিনা। আঙিনা ঘিরে দুধারে উঁচু চওড়া দালানের কোলে সারি সারি ঘর। দালানের থিলান গুলিতেও সারি সারি দেবদারু-পাতার মালা, শোলার ফুল আর ফুলের মালা ঝোলানো। ভিতর থেকে চিকের ব্যবস্থা। আঙিনার বিরাট সামিয়ানা টাঙানো। মাঝখানে সুন্দর কারুকার্য্যকরা ঢাকোয়া। ঘুরে ঘুরে ঝুলছে ঝোলোয়াড়ী কাঁচের বাতির ঝাড়। চারপাশে খুঁটির গায়ে জড়ানো পাতার আর ফুলের মালা আঙিনার শেষপ্রান্ত থেকে উঠে গেছে বিরাট চওড়া সিঁড়ি দুর্গা-দালানে।

সিঁড়ির দুপাশে নানারকমের গাছের সারি—তারই পাশে পাশে সারা আলপনার অপরূপ কাজ নেমে এসেছে ধাপে ধাপে। আঙিনার একপাশে ঢাকী আর চুনীরা-বাইয়ের নবৎখানার বাঁশীর দিন থেকে বেজেই চলেছে সানাইএর মন ভরানো বিচিত্র রাগ রাগিনী। সারা গ্রামের শিশুদের আনন্দ উচ্ছল কাকলীতে আঙিনা মুখরিত। একটি বিশেষ প্রথা ছিলো আমাদের বাড়ীতে সেটি হোলো চাঁদোয়ার চারপাশ ঘিরে সারি সারি ফল টাঙানো; যত ফল সে সময় পাওয়া যেতো মালার মত ঝোলানো হোতো চারপাশে।

এবার দুর্গা-দালান। দেবীপ্রতিমার মাথার উপর পদ্ম-আঁকা চন্দ্রাতপ। চারকোণ থেকে দুলছে বড় বড় চাঁদমালা। আলপনা আঁকা বিরাট চৌকিতে বিরাজিত দশভুজা। একেবারে কোণের দিকে একটি মস্তবড় পিলসুজে খুব বড় একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপটি নিরঞ্জনের দিন অবধি সমানে জ্বলবে তাই বারবার তেল ঢেলে সবসময় লক্ষ্য রাখা হোতো তার শিখাটির উপর—এর নাম বাণ-প্রদীপ। দেবী প্রতিমার দুইপাশে মানুষের সমান উঁচু দুটি পিতলের দণ্ড-উপর থেকে নীচ অবধি সারি সারি পিতলের বেড়-দেওয়া ছোটো থেকে ক্রমেই বড়। তার উপর মালার মত জ্বলতো প্রদীপের সারি-একেকটি দণ্ডে পাঁচশো করে। সেই হাজার প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে উঠতো দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা প্রতিমা। এইগুলিকে বলা হতো গাছ-প্রদীপ। প্রতিমার বাঁদিকে লাল মেঘের উপর শুভ্র আলপনায় ফুটে উঠতো বড় বড় পদ্মলতা, পদ্মলতা কমনীয়তার বেড়, তারই মাঝে মাঝে বসানো হোতো বিরাট পিতলের পরাণ-ভরা নৈবেদ্য। দুজনে মিলে বয়ে আনতো সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-করা ত্রিধাকৃতি বিরাট তামার থালা—তার উপর থলপদ্ম, শিউলি আর অপরাজিতার স্তূপ। বড় বড় ধূপচি থেকে চন্দনের গুঁড়ো ছড়ানো ধোঁয়ার গন্ধ ফুলের গন্ধে মিশে সুরভিত করে তুলতো পূজামণ্ডপ।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নববস্ত্রে সজ্জিত হোয়ে এসে মিলিত হোতেন পূজামণ্ডপে—পূজার উৎসবের বিশেষ সুরটি বাজতো সবার মনে—আলাপ আলাপনে হাসিতে সম্ভাষণে হতো তারই বিনিময়। সন্ধ্যারতি থেকে সুরু হতো ঢাকীর নৃত্য। রাত্রে ফরাশ পড়তো, সামিয়ানার তলায় পুরুষেরা আর শিশুরা বসতেন আর মেয়েরা দালানে চিকের আড়ালে—যাত্রা বা চণ্ডীমঙ্গল পালাগানের আসর বসতো তিনটি রাত্রিতেই। কিন্তু এই তিনটি দিনের আনন্দ কলোচ্ছ্বাস মুখরিত আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপে নামে নিবিড় স্তব্ধতা যখন প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষে ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ মনে সকলে এসে মিলিত হন পূজামণ্ডপে শূণ্য দুর্গা দালানে শূন্য চৌকির সামনে প্রণাম জানাতে। উৎসব ক্লান্ত পূজামণ্ডপের এই নিরানন্দ বিষণ্ণতা দূর করার জন্যেই বোধহয় তখন আবার আবির্ভাব হতো শিশুদের। সামিয়ানার তলায় ঝোলানো চাঁদোয়া থেকে যে ফলের সারি দোলে তার উপর আক্রমণ হোতো শিশুবাহিনীর। তাদের দুরন্ত আনন্দ কোলাহলের মধ্যে প্রণাম আলিঙ্গনে একটু প্রাণের সাড়া জাগতো উৎসব-ক্লান্ত পূজামণ্ডপে—বিসর্জনের শূন্যতা দূর করার জন্যেই বোধহয় ঐ ফলের মালার আয়োজন হোতো—শিশুদের আনন্দের মাঝে অন্তরের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখার প্রয়োজনে।

আল্পনা

সুনীতি গুপ্ত

ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই আল্পনা দেওয়ার রীতি আছে। অনুমান হয় এই লোকশিল্পটী ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে অন্য কোনও জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় কিনা জানা নেই।

আলিম্পন প্রাচীন ভারতীয় লোকশিল্পের একটী অন্যতম মহান্ ঐতিহ্য বহন করে আসছে। খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকেও যে আল্পনা দেওয়ার প্রথা ছিল, সেই সময়ের কোনও কোনও লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেকালে পূজা-পার্ব্বনে, ব্রতানুষ্ঠানে, বিবাহোৎসবে এইরূপ নানা শুভ অনুষ্ঠানে আল্পনা দেওয়ার রীতি ছিল তো বটেই, পল্লীগ্রামে ঘরের মাটির দেওয়ালে, দরজার চৌকাঠে ও শুভ অনুষ্ঠানে আল্পনা দিয়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হোত। শুধু তাই নয় আসবাবপত্রে, কলসী জাতীয় পাত্রের উপরেও লতাপাতা এঁকে ঘরের শোভাবর্দ্ধন করা হোত। বর্ত্তমানেও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তো আছেই, পল্লীগ্রামে কাঁচা বাড়ীর মাটির দেওয়ালেও আল্পনার চিত্র বিচিত্র রেখা দেখা যায়। আজও তার ধারা লুপ্ত হয়ে যায়নি।

সেকালে পুরনারীগণ গৃহকে কেন্দ্র করে যে ইচ্ছা বা বাসনা তাঁরা উপলব্ধি করতেন চিত্রাবলীর মাধ্যমে তাঁদের সেই কামনার বিষয় বস্তুর চিত্রাবলী প্রস্ফুটিত করতেন, যেমন ঘর, ময়না, ঝাঁপি, ধানের গোলা, লতাগুল্ম প্রভৃতি। এমন কি ইচ্ছা চরিতার্থ করতে আল্পনায় কোনও প্রতীক ব্যবহার করতেন। কল্পতরু, কল্পবৃক্ষ ছবি প্রভৃতি। এই সকল অবশ্য আজও আল্পনার মধ্যে প্রচলিত আছে।

আল্পনা শিল্পের সঙ্গে রমণীরা বিশেষ পরিচিত এবং এই শিল্প তাঁদের একটী বিশেষ অবদান। এই লোকশিল্পের জন্ম পারিবারিক সহজ প্রতিভায়। বংশানুক্রমিক পারিবারিক ধারার মধ্যে এই শিল্প বিদ্যমান। সাধারণতঃ ঠাকুমা, দিদিমা ও মাতৃস্থানীয়া গুরুজনদের কাছে মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে। সেকালে শিশু বয়স থেকেই মেয়েদের মধ্যে এই শিল্প দক্ষতা প্রকাশ পেতো।

আল্পনাকে একটী মতন শিল্প বলা হয়। বিভিন্ন পূজা-পার্ব্বণে, লোকাচারে মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠানে আল্পনার মধ্যে অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তুটী লিপিবদ্ধ করা হয়। সেইজন্য আল্পনার মধ্যে পান, লতাগুল্ম, ফুল, পাতা, নর-নারী, পশুপক্ষী, মাছ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র পল্লী জীবনের দৃশ্য প্রভৃতি ছবি দেখা যায়। গৃহস্থ বধূরা স্বাভাবিক শিল্প রুচির পরিচয় আল্পনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। এই শিল্পেও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য রুচির বোধ আবশ্যক।

বাংলাদেশে সাধারণতঃ চাল বেটে জলে সমানভাবে মিশিয়ে পিটুলি তৈরী করে আল্পনা দেওয়া হয়। অল্প তুলো বা কাপড়ের ছোট টুকরো আঙুলের ডগায় ধরে তার সাহায্যে আঁকা হয়।

দাদা পবিত্রতার প্রতীক সেইজন্য বোধহয় পূর্বে সাদা রঙেরই চল ছিল। আজকাল বর্ণ বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য অবশ্য আল্পনায় উপযোগী অনেক ধরণের উপকরণ প্রচলন হয়েছে।

চালবাটা দিয়ে অর্থাৎ পিটুলির সাহায্যে আঙুলের দ্রুত পরিচালনায় রাজবিকতাকে রূপায়িত করার থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতির সৌন্দর্য রূপায়ণের প্রচেষ্টাই বেশী হয়, সেই কারণে এই সকল চিত্রাঙ্কণে অভিনবত্বের প্রকাশ বেশী। আল্পনায় বারেবারে একই ধরণের রেখা দেখা গেলেও চিত্রাঙ্কণের সৌষ্ঠব অনুযায়ী ছন্দগতির বৈশিষ্ট্যে তার সৌন্দর্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশে চতুর্ভুজ, ত্রিকোণ বা সরলরেখার থেকে বৃত্তাকার ধরণের আল্পনার চলন বেশী, বৃত্তাকার নকশায় ক্রমশঃ চিত্র সন্নিবেশিত করতে করতেই সমগ্র আল্পনাচিত্রটী পরিস্ফুটিত হয়।

বিন্দু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সুরু হয়। ক্রমশঃ এই মূল বিন্দুর চারিপাশে অঙ্কণের দ্বারা চিত্রটী প্রসারিত হতে থাকে এবং বৃত্তাকার রূপের মধ্যে রুচি অনুযায়ী নানান প্রকার লতাপাতা, পদ্ম, পান, প্রভৃতি এঁকে আল্পনার সৌন্দর্য বাড়ানো হয়। মাপ জোক ব্যতিরেকেই যদিও আলপনা দেওয়া রীতি, তা সত্ত্বেও এর ছন্দ বা গতি সমান থাকা উচিত। তাহলেই এর রূপের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হবে ও চিত্রটীর সৌন্দর্য সমৃদ্ধিশালী হবে।

পূজা-পার্বণে ও যে কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকার পূর্বে পূজার জায়গা পরিষ্কার করে আলপনা দিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ঘটস্থাপনার জায়গায় আলপনা এঁকে তার উপরে ঘটস্থাপন করাই বিধি।

শুভ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রূপে যে আলপনা-চিত্র অঙ্কণ করা হয় তার কতকগুলি কোনও কোনও পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি।

গৃহদ্বারে মঙ্গলকলসী—লক্ষ্মী দেবী ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী—বাংলার গৃহস্থ বধূগণ এই দেবীর আরাধনা করে থাকেন। এই মহাদেবীর অর্চনা করলে গৃহস্থের ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হয়। সেইজন্য পারিবারিক কল্যাণ কামনায় বধূগণ গৃহদ্বারে শঙ্খ ও ধান্যপূর্ণ মঙ্গলকলসী আলপনায় এঁকে দেবীকে আহ্বান করেন। পদ্মফুল দেবীর বড় প্রিয় সেইজন্য পদ্মলতা ও তার দুপাশে চরণ এঁকে পদ্মলতার মধ্যে দিয়ে মা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন। এইরূপ আল্পনা দিয়ে লক্ষ্মীর আগমন বোঝানো হয় এবং পাখী এঁকে বোঝানো হয় লক্ষ্মীনারায়ণ পাখীতে আগমন করছেন।

শতদল পদ্ম—জগজ্জননী মা দুর্গতিহারিণী ভগবতী দশভুজা দুর্গারূপে আসুরিক শক্তি বিনাশ করছেন, তিনিই আবার জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎ প্রতিপালন করছেন ও সন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রদান করছেন। দেবী কমলাসনা। সেই জন্য দেবীর আসনের সম্মুখে শুভ্র শতদল পদ্ম অঙ্কিত করে দেবীর পূজার্চনা করা হয়।

শ্রীপদ্ম—অপূর্ব শোভামণ্ডিত বেদমাতা সরস্বতী সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদায়িনী বাক্যস্বরূপা-তাই শ্রী বলা হয়। বাসন্তী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীপদ্ম অঙ্কিত করে দেবীর পূজা করা হয়।

অষ্টদল পদ্ম—দেবগণের শক্তির প্রতীক কার্তিক। দেবতার মধ্যে মহাদেব যেমন দান করেন জ্ঞান, বিষ্ণু কৈবল্য, সূর্য আরোগ্য। তেমনই দেবগণের শক্তির প্রতীক কার্তিক দান করেন শক্তিশালী সৎপুত্র। তাঁর পূজায় অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করে তার উপর ঘটস্থাপনা করে বীর কার্তিকের পূজা করা হয়।

চরণ পদ্ম—লক্ষ্মীদেবীর পূজার বেদীতে মাঙ্গলিক, শঙ্খলতা ও মায়ের চরণ চিহ্ন আল্পনা দিয়ে দেখানো হয়, মা গৃহ-প্রবেশ করে পূজাবেদীতে উপবেশন করছেন।

ঝাঁপি, ধানের ছড়া, পদ্মফুল—ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর শোভা পায় ঝাঁপি, ধানের ছড়া ও পদ্মফুল; তাঁর পূজায় আল্পনাতে এই সকল চিত্রিত করে মায়ের অর্চনা করা হয়।

বিবাহে মীন পদ্ম—বিবাহে মাছ এবং পদ্ম ও পূর্ণ ঘট শুভ সূচনার ইঙ্গিত, এই শুভ অনুষ্ঠানে অন্যান্য আল্পনার সহিত এই সকল আল্পনা দেওয়া হয়। বিবাহ অঙ্গনকে মঙ্গলময় করে তুলতে মীন পদ্ম আঁকা হয়। পদ্ম পদ্ম আল্পনা দিয়ে অভ্যর্থনার স্থান সুলক্ষিত করা হয়। যাকে বলা হয় "মৌচক্র"।

মঙ্গলপদ্ম – যে কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলপদ্ম আঁকা হয়।

ভারতের সকল অঞ্চলেই আল্পনা শিল্পের বহুল প্রচলন আছে। আল্পনা দেওয়ার রীতি অবশ্য এক এক অঞ্চলে এক এক ধরণ ভিন্ন রীতি দেখা যায়।

দক্ষিণ ভারতে আল্পনাকে রঙ্গোলী বলা হয়। এই সকল দেশে নানা রকম রং করা গুঁড়ো চালে অথবা বিভিন্ন রকম ডাল বা মশলা বেষন—কালিজিরে, মেথি, সরষে প্রভৃতির সাহায্যে আল্পনা দিতে দেখা যায়। এঁদের আল্পনায় জ্যামিতিক রেখার মতো টান থাকে।

আজকাল শুভ অনুষ্ঠান ছাড়াও যেখানে সেখানে আল্পনা দেওয়ার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। আগে তেমনটি ছিল না, আল্পনা দেওয়ার রীতি পূজা-পার্বণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই নিবদ্ধ ছিল।

বিশ্বভারতীর প্রচেষ্টায় এই শিল্পটীর প্রচার অনেকাংশে সফল হয়েছে। গৃহ সজ্জার উপকরণ হিসাবেও আল্পনা দিয়ে গৃহের শোভাবর্দ্ধন করে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য পূর্ণ এই শিল্প ক্রমশঃ ব্যাপক প্রচার লাভ করে প্রসারিত হচ্ছে।

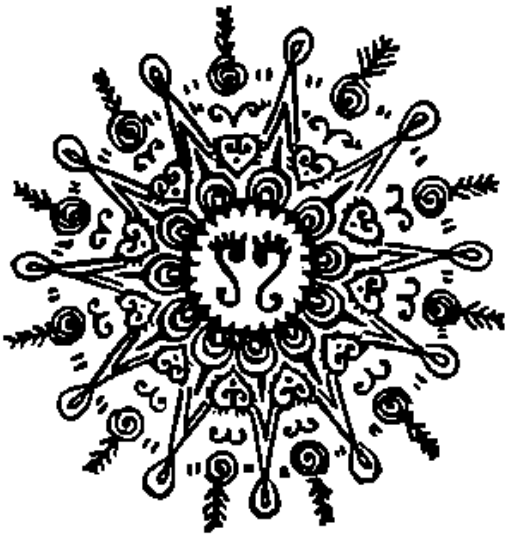

উমা কি ভবনে এল

হাসি ভট্টাচার্য

আগমনীর সুরে প্রত্যাশার সুর—শরতের শুভ সপ্তমীতে শুভযোগে উমা আসেন। 'উমা কি ভবনে এলো?' উমা শিবজায়া, সর্বমঙ্গলা, আদ্যশক্তি, ভগবতী, অশুভ-নাশিনী, জগৎ-প্রসবিনী।

'বৈদিক মন্ত্রে স্তব স্তুতি করি উচ্চারণ,
পূজক ঠাকুর করেন দেবীর পূজন।'

লৌকিক সমাজে কিন্তু তিনি কন্যা—বাংলাদেশের মেয়ে। হিমালয় রাজদুহিতা গৌরী যা যেনকার মেয়ে।

বৎসরান্তে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসেন বাপের বাড়ি—মায়ের কাছে। এই নিয়েই বাংলাদেশের সকল মায়ের মন কন্যাভাবে আপ্লুত হয়ে ওঠে। শাস্ত্রীয় বিধিমতে তিনদিন যে দুর্গোৎসব তার আনুষ্ঠানিক পর্বে বাংলাদেশের মেয়েদের ভূমিকাই বেশি।

আমন্ত্রণ থেকে শুভ বোধন—মহাষষ্ঠী, পূজার নানাবিধ আনুষ্ঠানিক কাজ এবং বিসর্জন পর্যন্ত মেয়েদের কত রকমের কাজ-কর্ম। সব ছাপিয়ে কিন্তু মাতৃভাব এবং কন্যাভাবের ব্যঞ্জনাই হৃদয়স্পর্শী। ভক্তির সঙ্গে স্নেহ—দুটি অন্তরঙ্গতার অপূর্ব সমন্বয় পৃথিবীর আর কোন উৎসবে আছে বলে মনে হয় না। শরতের মন আকুল করা বাতাসে—'পুণ্যধাম বাপের বাড়ী যাইতে চাহে সকল নারী।'

মেয়ের জন্যে মায়ের তখন মন কেমন করে—নিশিযোগে মা স্বপ্ন দেখেন—'কৈ মা উমা কৈ?'

জেগে উঠে তিনি স্বামীকে বলেন, 'কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী। মা অনুযোগ করেন,

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না।'

শরতের আকাশে বাতাসে আগমনীর এই সুর কন্যা-আহ্বানের অন্তর ব্যঞ্জনা। মেয়েকে ঘিরে মায়ের মন—সে মন বাংলাদেশের মেয়েদেরই মন। সে মনে কত কত আর্তি, বিচ্ছেদের বিষাদ, কাতরতা, কত গভীরতা।

কন্যা বিরহে মায়ের মনের ভাব আগমনীতে ব্যক্ত।

শরতের সোনালী সকালে বৈরাগী-বৈরাগিনী কণ্ঠে যখন মায়ের মনের এই আর্তি সুরে সুরে ব্যক্ত হয়—তখন সকল মা এ-গানের মর্মাধায় গায়ক গায়িকাকে তৃপ্তি ভিক্ষা দান করেন—

'আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিতে দুহিতে
গিরিপুরে করবো শিব স্থাপনা।
ঘর-জামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাস
গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস,
বৎসান্তে আনতে যেতে হবে না।'

কন্যা উপাসনাকে কেন্দ্র করে আগমনী। বর্ষার শেষ বর্ষণে মাটি সিক্ত, মাঠ ভরা সবুজ ধান ক্ষেত বাংলার সারা বছরের সকলের আনন্দ।

এমন দিনেই মেয়ে আসে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি। বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ। শরতের বাতাসে কাশের চামর দোলায়, পদ্মের শোভায় নতুন ধানের গন্ধে প্রভাত সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলকানিতে সারা বাংলায় প্রত্যাশার সুর।

শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রারম্ভকাল। এই কালের সূচনা থেকে পূজা অবধি বাংলার সামাজিক জীবনে যে আনন্দের ধারা তা অভাবনীয়।

দুঃখীর ঘর থেকে ধনীর ঘর পর্যন্ত এর জন্যে যে আকুলতা তাই হচ্ছে পূজার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের মূল ভাব হচ্ছে কন্যা আহ্বান।

মা মেয়ের সম্পর্ক প্রতিটি হৃদয়েই এক। প্রতি মায়ের অন্তরেই মেয়ের জন্য মন কেমন করা ভাব, চোখে বিরহ এবং আগমনীর বিষাদ মিশ্রিত আনন্দাশ্রু। বিবাহিতা মেয়ের কথায় মা শোনেন—

শিবের সেদিন আর এখন নাই,
ঘরে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে বিভার,
এখন সেই পাগলের ঘর, অতুল বৈভব
কুবের ভাণ্ডারী তার।

কুবের ভাণ্ডারী ঘরে মেয়ে পড়েছে। কার্তিক গণেশ ছেলে এবং লক্ষ্মী সরস্বতী মেয়ে নিয়ে উমা মা এখন ঘোরতর সংসারী। তবু মায়ের কাছে মেয়ে মেয়েই। তাইত আগমনীতে সেই মেয়ের জন্যে বিরহ-কাতরতা।

'একবার আয় মা করি কোলে দুখ-পাসরা নন্দিনী।
চায় চন্দ্রাস্যে প্রাণ উমা, ডাক মা বলে মা
শুনে মা, জুড়াই তাপিত প্রাণ।'

দুর্গাপূজার সকল আয়োজনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি মেয়ের এই মাতৃমন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

দেবীসজ্জার একাল ও সেকাল

শ্রীরূপা মল্লী

গৌড় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে বলা যায় যে শক্তি পূজার সার্বজনীন প্রথম প্রচলন করেন সেন বংশের রাজারা। কর্ণাটকী সভ্যতায় প্রভাবিত হয়েই তাঁরা এই পূজার প্রচলন করেন। বঙ্গ, রাঢ় ও পুণ্ড্র এই তিন রাজ্যের সম্মিলনে গৌড়। দীর্ঘকাল গৌড় বৌদ্ধ হিন্দু এমনকি মুসলমান ধর্মের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। সেন রাজারা সুদূর মহীশূর রাজ্য থেকে এসে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। তাই তাঁরা সার্বজনীন দুর্গাপূজাকে বাৎসরিক পূজা হিসাবে পূজিত করেছেন এবং তা প্রধান উৎসব রূপে গণ্য হয়েছে।

মহীশূর রাজ্যে বহু প্রাচীন এক দুর্গামূর্তি আছে তাঁকে সমগ্র কর্ণাটকীরা মান্য করে থাকে এবং সেই ধারা বহন করেই সেনরাজারা তাঁদের রাজ্যকালীন উৎসবরূপে দেবী পূজাকে প্রধান স্থান দেন। মহীশূরের ধারওয়ার জেলায় আইহোল বলে এক স্থানে চালুক্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যমণ্ডিত দুর্গা মন্দিরটি সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র দুর্গামন্দির বলেই গণ্য। আমাদের বর্তমান বাংলায় যে মৃন্ময়ী মূর্তিটা পূজিতা হয়ে আসছে সেটা সম্পূর্ণ আইহোলের মূর্তিরই অনুকরণে। আইহোলের মূর্তি অষ্টভুজা গৌড়ের দেবী প্রতিমা কল্পিত হয় দশভুজা রূপে। ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত। প্রস্তর মূর্তি সম্পূর্ণ কর্ণাটকী, গৌড়ীয় মূর্তি মৃন্ময়ী। কিন্তু বর্তমানকালে যে দেবী প্রতিমা সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায় সেই মূর্তি গৌড়ীয় ধারার কোন অংশেই অনুরূপ নয়, মানস কল্পনার বিভিন্ন রুচির বৈচিত্র্যে 'মৃন্ময়ী মা' বহুরূপা বৈচিত্র্যময়ী। মূর্তি, সাজ ও গঠন প্রভৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। পূর্বতন ধারার সহিত কোথাও মিল নেই।

মূর্তির মধ্য দিয়ে আমরা বিশাল শক্তিময় পুরুষের আরাধনা করি। মানব গঠনের হুবহু নকল করি না। বরং বাস্তবসত্তার স্তর থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ে রূপ কল্পনা করি। আর মধ্যে থাকে ঈশ্বরের অতিস্ত্রীয় বিশাল অনন্ত রূপের সমাহার। বাস্তব স্পর্শের কলুষকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে আসি আমাদের মনঃসংযম ও কল্পনাকে। তাই মায়ের অতিস্ত্রীয় রূপটি দেবীর আঙ্গিক গঠনের উপজীব্য, তাহা সাধারণ স্তরভূত হতে পারে না।

দেবীর অবিচল মূর্তিটি প্রকাশ করবে অনন্ত রূপরাজি যা বিশাল ভুবন জুড়ে জাগাবে হরষ। নিরাকার সত্তাকে আকারে পর্যবসিত করতে গিয়ে বর্তমানে আমরা বিপথগামী হয়ে পড়েছি।

গৌড় শিল্পের বিশেষত্ব ছিল তার সজ্জায়। প্রাচীন শিল্পকার্যের মধ্যে ছিল শোলা, সলমা চুমকি জরি ও মখমলের পালক এবং মৃত্তিকার গঠন কৌশল। তৎকালীন হস্তশিল্পের বৈভবে ও মূর্তির আঙ্গিক সজ্জায় দেবী হতো অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল ও দীপ্ত। ভক্তিস্নিগ্ধ মায়ের মূর্তিখানি সমগ্র বিশালত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। অন্তর বাহির একহয়ে নিবেদিত হত শিল্পীর সৃষ্টিতে।

তাই আজকের দেবী প্রতিমা অন্তরকে আকৃষ্ট করে না। তাদের সাজ বলে এক সাজে মাকে আভরিত করা হত। শিল্পীর নিপুণ শিল্পচাতুর্যে 'মা হয়ে উঠতেন ভুবনমোহিনী। প্রতিমার গাত্রবর্ণ হত কাঁচা হলুদের রঙ। আপাদমস্তক আভরিত হত বিভিন্ন অলঙ্কারে। মাথার মুকুটখানি হত বৃহৎ ও সবচেয়ে মূল্যবান। লম্বায় দুই ফুট প্রায়, আর চওড়ায় দেড় ফুট। তিন থাকে মুকুট হত বিচিত্র, জরি ও শোলার শিল্পনিপুণতায় পূর্ণ। মায়ের অলঙ্কারের মধ্যে থাকত কানে তিন রকম—ঝাড়বেলী, চৌদানী ও মকার বেলী ও দুল। গলায় চিক্, হাঁসুলী ও হার। সমস্ত বুক জুড়ে থাকত মূল্যবান বুক পাটা ও কোমরবন্ধ। অঙ্গে থাকত সাড়ী। কাঁধ থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত থাকত বিরাট ত্রিকোণাকৃতি দু'টি আঁচলা। হাতে বাজু, তাবিজ বাজুবালা, মরজান বা পঞ্চম ও হাতের উপর দিকে থাকত গুণ চিহ্নের ন্যায় আকারবিশিষ্ট অলঙ্কার। এছাড়া কঙ্কন, চুড়ি, চুর প্রভৃতি মণিবন্ধে শোভা পেত। বিরাট চালচিত্রে ডানদিকে লক্ষ্মী ও গণেশ বামদিকে সরস্বতী ও কার্তিক বাহন একত্রে শোভিত হত। চালচিত্রে অঙ্কিত থাকত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। মধ্যস্থলে থাকতেন মহাদেব। মায়ের হস্তগুলিতে শোভা পেত খাঁড়া, শর পাশ, চক্র, শঙ্খ, ধনু, ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্রগুলি এবং সিংহবাহিনী হয়ে মা মহিষাসুর নিধনে উদ্যতা।

বিশালত্বের অভিব্যক্তির মহিমা থেকে বর্তমানের মূর্তি ও তার আঙ্গিক সজ্জা অনেক ভিন্ন ও সুরুচি চমক ও চটুলতায় পূর্ণ। যে পবিত্রতা একদিন পূজামণ্ডপের গাম্ভীর্যকে অনুপম করে তুলত সেক্ষেত্রে শুধু বহুল চমকের প্রাবল্যে মায়ের আরাধনা নিষ্প্রভ ও করুণ হয়ে উঠেছে। কোটি মানুষের সামনে আজকের দেবীমূর্তি কোন শ্রদ্ধা আনয়ন করতে অপারগ। তিনি বিশ্বভুবনমোহিনী এক অনন্ত শক্তিরূপিণী আর মানবীয় কল্পনার মূর্তি, তার ছায়া। দেবী চরাচরজয়ী সর্বমঙ্গলা আনন্দময়ী মা।

"পুজোর উপহার"

কেনাকাটা

মীনা সেন

পুজো এসে গেল। আকাশে বাতাসে মায়ের আগমনী সুর শোনা যাচ্ছে। অনেক অসুবিধের মধ্যে দিন কাটাতে কাটাতে সবারই মনে একটু আলোর শিখা দেখা দেয়—এই টুকুই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। মায়ের মর্তে আগমনকে সমস্ত মন প্রাণ অনুভূতি আবেগ দিয়ে উপভোগ করতে চায় প্রতিটি মানুষ। নানাভাবে তাদের উপলব্ধিতে ছড়িয়ে দেয়। তার মধ্যে একটা প্রধান দিক হ'চ্ছে উপহার। মাসাধিককাল ধরে পরিবারবর্গ নিয়ে পুজোর কাপড়-জামা প্রভৃতি কেনাকাটি—সত্যিই একটা আনন্দের ব্যাপার। এবং এইটিই পূজার আনন্দ, পুজোতে উপহার দেবার প্রথা বাংলা দেশে চলে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। সেকালে—সাধারণতঃ ছেলেরা থাকত বিদেশে, দেশের বাড়ীতে থাকতেন বুড়ো বাবা ও মা। সারা বছর তাঁরা অপেক্ষা করে থাকতেন, কবে ছেলে, মেয়ে, বৌ নাতি নাতনীরা আসবে, ভরিয়ে তুলবে বাড়ীখানা তাদের আনন্দ কলরবে। বাড়ীতে মা, ঠাকুমারা বসে কর্দ করতে থাকতেন। কার জন্য শাড়ী, কার জন্য ফ্রক, সার্ট, প্যান্ট সব কিছুই এক মাস আগে থেকেই পরিকল্পনা চলতে থাকত। আবার ছোটরাও মনে মনে হিসাব করতে থাকত কার কটা জামা হতে পারে। পূজা মণ্ডপে নতুন বেশভূষায় সজ্জিত হওয়ার আনন্দ শুধু ছেলেমেয়েদের নয়—সকল বয়েসের সকল মানুষেরই।

একালেও সেই রীতিই চলে আসছে, বিশেষতঃ পুজো উপহারের বেলায়। এই উপহারের দিকটা অবশ্য মেয়েরাই দেখেন। মা, বোন, বউদি এমন কি মেয়েও চিন্তা করে, কার জন্য কি উপহার কেনা হবে। আজকের দিনে আর্থিক প্রাচুর্য মানুষের নেই কিন্তু মনে রয়ে গেছে আকাঙ্খা, সুন্দর নতুন ডিজাইনের জামা কাপড় দিয়ে প্রিয়জনকে সাজাবার। ছোট বড় ছেলেমেয়ে সকলেরই আনন্দের সীমা থাকে না নতুন জামা ও কাপড় পেলে। যাদের অতিরিক্ত কিছু আয়ের ব্যবস্থা আছে, তাঁরা তবু কোনও রকম করে এই উপহার কেনা এবং দেওয়া পর্ব সমাধা করতে পারেন, কিন্তু যাদের তা নেই, মুস্কিলটা তাদেরই বেশী। ভাবতে হয় টাকা কয়ের ভেতরে কি করে সবাইকে উপহার দেওয়া যায়। তাই আজকাল বড় বড় দোকানে যেমন আয়রানী হয়, ফুটপাতেও বেশ ভাল ভাল জামা কাপড় বিক্রি হয়। এর তাৎপর্য শুধু যে নতুন বেশ-ভূষায় মনকে নতুন করে তোলা তাই নয়—মনকে পবিত্র করা এবং বাণিজ্যিক লেন-দেনে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সাধন করাও বটে।

পুজোতে উপহার যে শুধু জামা কাপড়েই সীমিত রাখা হয় তা কিন্তু নয়। আজকাল বয়স এবং রুচি অনুসারে নানা রকম উপহারেরই প্রচলন হয়েছে।

নানা উপহার দিয়েই পুজোতে সবাইকে খুশী করার চেষ্টা সবারই মনে স্বাভাবিক। এর তালিকা তৈরী করা এবং কোন বছরে কোন জিনিস কাকে কি ভাবে দেওয়া হবে, এ ভার সাধারণতঃ মেয়েদের উপরেই থাকে। ছেলেরা টাকা এনে মেয়েদের হাতেই দেন এবং টাকার অঙ্কের সঙ্গে সমতা রেখেই মেয়েরা খুশী মনেই উপহার কিনি ব্যবস্থায় মেতে ওঠেন এবং পুজোর অন্তত এক মাস আগে থেকেই কেনা সুরু হয়ে যায়। এতে তাদের আত্মসন্তুষ্টি দু' রকম ভাবেই হয়—এক হচ্ছে স্বামীর, বা বাবার টাকার উপর তাঁদের যে দাবী এবং অধিকার হয়েছে, তার স্বীকৃতি লাভ এবং মনোমত উপহার কিনে নিজের প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়ার যে অভূতপূর্ব আনন্দ তাও উপভোগ করা। অনেক মেয়েরা নিজেরা চাকরী করেন, তাঁরা যদি স্বামীর আয়ের সঙ্গে নিজেদের আয়কে মিলিয়ে নিয়ে জিনিস পত্র কেনেন তাহলে টাকার ও কিছু সাশ্রয় হয় এবং দু'জনে মিলেমিশে কিনলে জিনিসগুলিও পছন্দ মত সুন্দর হয়। অবশ্য অনেক সময় স্বামী স্ত্রী পরামর্শ না করেই নিজের নিজের মতানুসারে জিনিসপত্র কিনে নিজের নিজের পছন্দের লোকদের উপহার দেন, এতে এক অসুন্দর এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-হীন হ'য়ে পড়েন এবং তার ফের কিন্তু অনেক সময় যারা উপহার পান তাদেরও টানতে হয়।

আজকের দিনে এইটুকুই শুধু বলতে চাই পুজোতে এই উপহার দেওয়ার রীতিটি খুবই সুন্দর সন্দেহ নাই, তাব উপহারের তালিকা করবার সময় অবশ্যই কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। যেমন উপহার যেন বাড়ীর প্রত্যেকেই পায় কম, বেশী যা-ই হোকনা কেন উপহারের তালিকা করতে আয়ের পরিমাণটা-র দিকে নজর দেওয়া চাইই। সাধ্যাতীত ব্যয় করে উপহার দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হ'য়ে যাবেই, যে পাবে, এবং যে দেবে—সার্থকতা কোনও পক্ষেই থাকবে না। উপহারের তালিকা করবার সময় সর্বদাই মনে রাখতে হবে, কাকে দেওয়া হচ্ছে। যাকে দেওয়া হবে তার মনের মত যাতে হয় সে বিষয়েও একটু খেয়াল রাখতে হবে। উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, এটাও মনে রাখতে হবে। তাই বলা চলে, উপহার দেওয়ার এবং কেনার ভারটা মেয়েদের উপর থাকলেই, সামঞ্জস্য সরলতা এবং সৌন্দর্য সবগুই বজায় থাকবে।

পুজোর সময় ভদ্রতাবাস এও আমাদের সামাজিক প্রথা। আগেকার দিনের তালিকার সঙ্গে আজকের ভদ্রতাবাসের পার্থক্য অনেক,—অনেকক্ষেত্রে এটি পীড়নের ব্যাপারও হয়ে দাঁড়ায়; তবুও এর সঙ্গে প্রতিটি পরিবারের মধ্যে যে দেনা-পাওনার সম্পর্ক তাতে মনের সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়া যায় আর সে-মন আনন্দময়ীর আগমনকে স্পর্শ করে থাকে।

পূজোর তত্ত্ব

বেলা দে

দুর্গা গৃহস্থালীর কাজে আমাদের খ্যাতি চিরদিনের। একদিনে আমরা ছিলাম এক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তখন আমাদের খ্যাতি মুখে মুখে ফিরত। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে নানা কারণে আমাদের পক্ষে ঘরকন্নার কাজে ততটা মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।—তবুও কয়েকটী বিষয়ে আমাদের সেই পূর্বখ্যাতি আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আজো পর্যন্ত বাংলার মেয়েরা তার গৃহকে করছে সুন্দর; ঘর কে করেছে নিকট পরকে করেছে আপন। গৃহই ছিল তার হৃদয় তাই সেই গৃহকে সে সাজিয়ে রাখতো নানারকম শিল্পের মাধ্যমে। ভাবলে আশ্চর্য্য মনে হয় সেই অন্তঃপুরের মধ্যে থেকে কেমন করে তাঁরা শিল্পীর নাম সার্থক করে তুলতে পেরেছিলেন।

বাংলা দেশে দুর্গাপূজার তত্ত্ব পাঠানো একটী শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে। যার যা সাধ্য তিনি তাই দিয়েই আত্মীয় স্বজনের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাবার চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি এই ব্যবস্থাটি প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এর মধ্যে যে একটি নিবিড় আত্মীয়তা আছে সেটি প্রমাণ হয় এই তত্ত্ব-আদানপ্রদানের মাধ্যমে। পূজোর প্রায় দু'মাস আগে থেকে এই তত্ত্ব কেমন করে কিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হবে মেয়ের বাড়ী, মায়েরা তারই জল্পনা কল্পনা করতে থাকেন।

কিছুদিন আগে একটি প্রদর্শনী দেখতে গেছলাম-এই প্রদর্শনীতে কেমন করে তত্ত্ব সাজানো হয় নানাভাবে তাই দেখানো হয়েছে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল তত্ত্ব পাঠানো রীতিটি তাহলে এখনো লুপ্ত হয়নি। মনে পড়ে আমার এক দাদার শ্বশুরবাড়ী ছিল মেদিনীপুরে। শীতের সময় দাদার শ্বশুরবাড়ী থেকে তত্ত্ব আসতো কত রকমের বড়ির অলঙ্কার, তিলের সন্দেশ, পাটালীর সন্দেশ, নতুনগুড়ের মোয়া, এ ছাড়া কলসী ভরা খেজুর গুড়, ফল সবজি তো আছেই। কিন্তু কি সুন্দর করে যে সাজিয়ে পাঠাতেন সে কথা আজও ভুলিনি। তারপর আমাদের পূজোর তত্ত্ব পাঠানোর মধ্যে একটি আন্তরিকতার ছাপ রয়েছে। থালায় সাজানো সন্দেশের কি বাহার তার উপর পাতা দিয়ে মুড়ে রং-বেরংয়ের ঝুলিপোষ বা তত্ত্বঢাকা দেওয়া থাকত। বাড়ীর লোকজনেরা নতুন ধুতি ও শাড়ী পরে এক সারি হয়ে সেইসব তত্ত্বের আগান প্রদান চালতো। যারা নিয়ে যেতো তাদেরও বেশ ভালই বিদায় দেওয়া হোত টাকা জলখাবার ইত্যাদি। জামাইষষ্ঠীতে কল মিষ্টান্ন ছাড়া ঝেঁতে করে বিচিত্র শিল্পকাজের মাধ্যমে নবদ এলাচ দারচিনি দিয়ে কত নকশা করা হোত। পূজো ও বিয়ের তত্ত্বে আগেকার দিনে রংবেরং ছাপানো শাড়ীকে খুব সুন্দর করে খুঁটিয়ে ঝেঁতে সাজিয়ে দেওয়া হোত তারই বা কি বাহার! এখনো এই সব তত্ত্বে রুমাল আর রিবনকে কত রকম

ফুল ইত্যাদি বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। তাই মনের এই তত্ত্ব সাজানোর রীতিটি সত্যিই অনবদ্য-মেয়ে বৌয়েরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই তত্ত্ব সাজিয়ে যাবেন। আজকাল অবশ্য তত্ত্ব পাঠানোর রীতিটি অনেক ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ হয় তো অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। তবুও এর প্রচলন থাকলে দেশের একটি শিল্পকলা প্রাধান্য পাবে এরই মাধ্যমে।

সেদিনের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে নতুন করে যেন এই তত্ত্ব সাজানোর নিয়মকানুনটি আমার মতো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একখানি মশলার ট্রে সাজানো হয়েছিল যার মধ্যে একটি সুখের পরিবারের রূপকল্পের আভাস ছিল। এছাড়া অপূর্ব ছাঁদে আলপনা দেওয়া হয়েছিল যা কোনদিন ভুলতে পারব না। কুলো আর পিঁড়ির আলপনায় হারিয়ে যাওয়া দিনে বাড়ীর রূপটি ফুটে উঠেছিল।

আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরা জাতশিল্পী-তাই তাদের হাতের ছোয়ায় সামান্য কিছু জিনিসই অন্তের চোখে আজ অপরূপ হয়ে ওঠে। যে সময় দেশে ইলেকট্রিক ছিল না বাড়ীর মেয়েরা পুজোর দালানের জন্য প্রদীপের সল্‌তে রাখবার জন্য এবং বেয়ারাদের সল্‌তেদানী তৈরী করতেন। তাতেও শিল্পীর ছোঁয়া থাকত।

আজো তাই মনে হয় আমাদের অন্তঃপুরিকারা কি একালে নানারকম শিল্পের মাধ্যমে তাঁদের সরল প্রাণ ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় রেখে চলেছেন।

গৃহসজ্জা

শকুন্তলা

আমাদের দেশে বর্ষার পর যখন শরৎ আসে তখন তার ক্ষণিক উপস্থিতিকেও আমরা সাদরে আহ্বান জানাই। কারণ শরৎ আনে সান্ত্বনা, আনে আশ্বাস, তাই তার আগমনে চারদিকের পরিবেশটা এত মধুর এত পরিপূর্ণতায় ভরা। শরৎকাল এলেই আমাদের দেশের মা বোনেদের মধ্যেও কেমন যেন একটা ব্যস্ততার ভাব দেখা যায়। বাড়ীঘর পরিষ্কার করা, ভাদ্রের রৌদ্রে আলমারীর জামা কাপড়গুলো রোদে দিয়ে ঝেড়ে মুছে তাকে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। তারপর মহালয়ার তর্পণের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচারণা করা সবই তো এই শরৎকালে।

যার যা সাধ্য তাই দিয়েই ঘর সাজানোর ধুম পড়ে যায় এই সময়। রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের জিনিসপত্র রোদে দিয়ে তাকে গুছিয়ে রাখার মধ্যেও কেমন যেন একটা তৃপ্তির আভাস মেলে। এক কথা মা আনন্দময়ীর আগমনে সবাই চান স্বাস্থ্যে সম্পদে বুদ্ধির দীপ্তিতে জীবনটাকে বিকশিত করে তুলতে।

পূজোর দিনগুলোকে আরো মাধুর্যমণ্ডিত করার জন্যই এত আয়োজন। সুন্দর পরিচ্ছন্ন গৃহ ও গৃহ পরিবেশ মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য এনে দেয়, জীবনকে আরো মনোরম ও লোভনীয় করে তোলে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সারা বছরে যে জিনিসটায় হয় তো আমাদের লক্ষ্য ছিল না ঠিক এই সময় সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়ে। ঘরের মেঝেগুলো ঝকঝকে করার জন্য কি আগ্রহ।

অনেকে আবার গৃহসজ্জনের জন্য এই সময় নানা রকম আল্পনাও দিয়ে থাকেন। কারণ গৃহসজ্জায় আলপনার একটা বিশেষ স্থান আছে। পূজামণ্ডপ, গৃহাঙ্গন, গৃহের প্রবেশ পথ প্রভৃতি জায়গাগুলোয় যদি নানা ধরণের আলপনা দেওয়া হয় বেশ মানায়। কারণ আমাদের দেশে বিভিন্ন পূজা পার্বণে, উৎসব অনুষ্ঠানে মেয়েরা মাঙ্গলিক হিসেবেই আলপনা দিতেন। শুকনো চালের গুঁড়ো হলুদে বিভিন্ন লতাপাতা, নকশা আঁকা হোত। আজকাল আবার দেয়ালে, খামের গায়ে, ঘরের মেঝেতেও আলপনা দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশের মেয়েদের অধিকাংশই শিল্পীমন, গৃহ রচনায় তার তাদের হাতে সুতরাং পূজা-পার্বণে তাদের শিল্পীমন জেগে ওঠে! তাই তারা গৃহসজ্জার কাজে আলপনাও ব্যবহার করে থাকেন।

দেহ ও মনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যে দুটী মঙ্গল হস্ত অহরহ নিয়োজিত রয়েছে তিনি হলেন সংসারের কর্ণধার গৃহলক্ষ্মী। তাঁরই সুষ্ঠু পরিচালনায় গড়ে ওঠে একটী সুন্দর সংসার। এই সংসারের যাবতীয় কাজ যেমন—রান্না অতিথিসেবা, শিল্পকাজ, গৃহসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে সুগৃহিনী তাঁর সূক্ষ্ম রুচি ও সৌন্দর্যবোধের একটী স্বাক্ষর রাখবেন।

• • •

"দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য কি বিসর্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত।"

স্বর্ণকুমারী দেবী

পূজার দিনের খাবার

অঞ্জলি চ্যাটার্জী

মানব সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই পূজা-পার্বণে আমাদের দেশে নানা ধরণের খাদ্য ব্যবস্থার রীতি আছে। দুর্গাপূজায় বিশেষভাবে এই পর্বটীর প্রতি আমাদের মেয়েদের লক্ষ্য—যেমন দুর্গা নবমীর দিন সাত রকম রান্না তার মধ্যে পাকের ঘন্ট, শুক্তো, ভাজা মাছের কালিয়া, ডাল, মাছের ঝাল, পায়েস ইত্যাদি। মহাষ্টমীর দিন বেশীর ভাগ বাড়ীতেই নিরামিষ খাওয়ার রীতি আছে। লুচি, ভাজা, আলুর দম, কচুরী, হালুয়া প্রভৃতি। নবমীর দিন আগেকার কালে যে সব বাড়ীতে পূজা হোত সেখানে বলি হোত ছোট বা বড় পাঁঠা এবং সেই পাঁঠার মাংস সকলকে রান্না করে খাওয়ানো হোত। এটা রান্না হোত পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়ে। দই, আদা-লঙ্কা ও হলুদবাটা মাখিয়ে ঘি গরমমসলা দিয়ে এই মাংস রান্না হোত তাতে দেওয়া হোত একটু হিং।

দশমীর দিন বেশ পরিপাটী খাওয়ার ব্যবস্থা আজো প্রায় সাধ্য অনুযায়ী সবাই অনুষ্ঠিত করে থাকেন। তাছাড়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের বিজয়ার প্রণাম, আলিঙ্গন প্রীতি ও ভালবাসার আদান প্রদানের জন্য আজকাল বাড়ীতে ঘুগনি, নানারকম গজা, আলুর দম, কচুরী, সিঙ্গাড়া করা হয়ে থাকে।—তবে দুর্গাপূজার খাবার হিসেবে নারকেলের রকমারী খাবার আজো অনেকে বাড়ীতেই তৈরী করেন। সেকালে ঠাকুমা দিদিমারা নারকেল ছাঁচ, নারকেল সন্দেশ, নারকেল চিড়ে, নারকেলের নাড়ু সবই ঘরে প্রস্তুত করতেন। নানা কারণে এখন সকলের পক্ষে এত আয়োজন করা সম্ভব হয় না তাই সেখানে অল্প খরচে ঘুগনি ও গজা দিয়েই সে কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিজয়ার দিন সিদ্ধি খাওয়ার প্রচলন আছে। কেউ কেউ সিদ্ধির বরফি ও সিদ্ধির সরবৎ তৈরী করেন।

আসলে ঠিক সেকালের মত একালে সবকিছু করা সম্ভব নয় তার কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা। সেকালে যে কোন পুজো-পার্বণই হোক না কেন কামারী-জোগন গৃহস্বামীর একটী অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। এখন সবকিছুই হায়সারা গোছের হয়ে আসছে। মানুষ আজ কৃত্রিমতাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরছে তাই তার কোনো কাজে আনন্দ নেই উৎসাহ নেই! কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় দেবী পূজায়ও ভক্তি অপেক্ষা আড়ম্বরই বেশী হয়েছে। তবুও দুর্গাপূজা আমাদের জাতীয় উৎসব—এ উৎসবে যেন আমরা নতুন করে মায়ের পায়ে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।

কনকাঞ্জলি

অঞ্জনা ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষে দুর্গোৎসবের নানা শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিক পর্ব এবং পূজা-ক্রিয়া পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক যে-সব আচার-অনুষ্ঠান পূজার আঙ্গিক তার মধ্যে মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানই বেশি। পুরোহিত শাস্ত্রীয় মন্ত্রের দ্বারা দেবী পূজা করেন সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—তারপর বিজয়া। মহাষষ্ঠীর দিন থেকে বিজয়া পর্যন্ত পূজোয় যে মেয়েলী অনুষ্ঠান দেখা যায়। আর এইসব মেয়েলী অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ধর্মীয় সংস্কার অপেক্ষা সামাজিক, সাংসারিক এবং ঘরোয়া ভাবধারায় সংগঠিত।

দেবী দুর্গা দশভুজা, অসুরনাশিনী, সন্তানধারিণী, সর্বমঙ্গলধারিণী দেবীমাতৃকা। তিনি চণ্ডী—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।' তাই তিনি মা—তিনি নমস্যা।

কিন্তু বাঙালী মেয়েদের কাছে তিনি যেনকার মেয়ে—উমা। এই মাটিতে তাঁর জন্ম। এই বাঙালী পরিবারে তাঁর বাপের বাড়ি। গিরিরাজের মেয়ে গৌরী বিয়ের পর কৈলাসে স্বামী শিবের ঘর করেন। ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর নিজস্ব সুখের সংসার। কিন্তু তা বলে কি বাপের-বাড়ির সম্পর্ক ভোলা যায়? যায় না। পরিণতা-বয়সেও বাঙালি-মেয়ের বাপের বাড়ির প্রতি আকর্ষণ সকল সংসারেই দেখা যায়। বছরে অন্ততঃ একবার করে বাপের বাড়ি আসতে হয় তাই। গৌরীও আসেন—দশভুজা জগজ্জননীরূপে। কিন্তু মায়ের কাছে ঠিক মেয়ে হয়েই।

মায়েরা তাই তাঁকে মেয়ের আদরেই ঘরে তোলেন—সাধ্য মত আদর-যত্ন করেন। নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ান। নৈবেদ্য থেকে ভোগের রান্না পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব ঘরোয়ানা।

মহাষষ্ঠীর দিন নতুন বস্ত্রবাসে বরণ করে যে-মেয়েকে ঘরে তোলা হয়—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা পর্যন্ত সেই মেয়েকে মেয়েলী-আচার অনুষ্ঠানে পরিচর্যা সমাজ এবং সংসার-জীবনের করণীয় কাজ। দুর্গাপূজা বালক-বালিকা থেকে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আপামর জনসাধারণের পূজা। তবু এর মধ্যে মেয়েদের আনন্দই বেশি, মেয়েদের উৎসাহই বেশি, মেয়েদের কাজই বেশি।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—এই তিনদিন শাস্ত্রীয়-অনুষ্ঠান মতে পূজা, হোম, যাগ-যজ্ঞ। তারপর বিজয়া। সেদিন নিরঞ্জন দিবস। মহাষষ্ঠীর দিন যেমন মায়েরা আদর করে মেয়েকে বরণ করে ঘরে তোলেন, আবার বিজয়ার দিন তেমনি চোখের জলে বরণ করে বিদায় দেন। সে-বিদায়ের মধ্যেও কিন্তু প্রত্যাশার সুর থাকে— মাঙ্গলিকী ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে 'আবার এসো'—এই আন্তরিক আর্তি থাকে। মেয়েদের মনের কথাই প্রকাশ পায়—'দর্শনস্য ব্যতীতেষু পুনরাগমনায় চ।'

নবমী-রাত্রি থেকে মায়েদের চোখের জলের প্রতিবিম্ব—

'কেন নিশি পোহাইল ?
সুখ নবমী কেন রে এখনি শেষ হইল ?
কেন এ নিশি চিরনিশি হয়ে না রহিল ?'

বিজয়ার দেবী-প্রতিমা নিরঞ্জনের পূর্বে কন্যা-বিদায়ের যে-আয়োজন—তা শুধু মেয়েদের অন্তর-স্নিগ্ধ কন্যা-ভাবের প্রকাশ। এয়োস্ত্রী মেয়েরা সিঁদুর, বরণ-ডালা, দই চিঁড়ে মিষ্টান্ন নিয়ে আসেন মেয়েকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। 'জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা।' প্রতি মায়ের এই কামনা প্রতি মেয়ের প্রতি। প্রতি মেয়েরও কামনা প্রতি মায়ের প্রতি। সিঁথিমূলে সিঁদুর দিয়ে সকল এয়োস্ত্রী সকল এয়োস্ত্রীর সিঁদুরের স্থায়িত্ব কামনা করেন। তেল, হলুদ, সিঁদুর দেবী প্রতিমার কপালে এবং সিঁথি মূলে ছুঁইয়ে সেই মাঙ্গলিকী সকল এয়োস্ত্রীই স্পর্শ করেন।

মেয়ে দেবী প্রতিমাকে বরণ করে, মুখে দই-চিঁড়ে মিষ্টি ছুঁইয়ে চোখের জলে বিদায়-সম্ভাষণ জানানো হয়।

তারপর চলে সিঁদুর খেলা। এই সিঁদুর খেলা কালক্রমে এয়োস্ত্রী মেয়েদের মধ্যে থেকে এখন সর্বজনে বিস্তার লাভ করেছে। মেয়েদের এই সিঁদুর খেলা রঙের খেলা। আনন্দ এবং মঙ্গল-কামনার প্রতীক।

যে রূপ এবং রঙ নিয়ে দেবী দুর্গার আগমন সেই রূপ এবং রঙ নিয়ে দেবীর প্রত্যাগমন।

বাঙলা দেশের মেয়েদের এই সংস্কার কবে থেকে আরম্ভ তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কিন্তু সামাজিক ভাবে মা-মেয়ের সম্পর্কের সন-তারিখের কোন ঘটনা ইতিহাসের সন-তারিখের তোয়াক্কা রাখে না।

কন্যা-বিদায়ের প্রাক্কালে দেবী প্রতিমাকে কনকাঞ্জলি দিয়ে বাংলা দেশের মেয়েরা বলেন—

'যদি একান্ত মনোবাসনা, যাইতে পতিভবনে।
দেখো, মোরে দুঃখিনী জননী বলে যেন থাকে মনে॥
আমি, তোর আশার আশা পেয়ে, রহি বৎসরেক চেয়ে,
পুন আসি দেখা দিও, অভাগীর এ ভবনে।
আর যা দি কনকাঞ্জলি, বিজয়া জয়া সকলি,
চুমি চন্দ্রবদনখানি, মুছে অশ্রু দুনয়নে॥"

———

বিজয়া

বেলা দেবী

বাঙালীর জীবনই ধর্ম, ধর্মই জীবন।

তাই বাংলার ঘরে ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ, পূজো, ব্রত, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দুর্গাপূজা বছরের সেরা উৎসব-অনুষ্ঠান।

ছোটবেলায় আমরা এই দুর্গোৎসবের যে রূপটি দেখেছি হাল আমলের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। আমরা গ্রামে থাকতাম। পূজোর একমাস আগে থেকে বাড়ীতেই প্রতিমা গড়ার কাজ সুরু হত। আমাদের মুগ্ধ কৌতূহলী চোখের সামনে আস্তে আস্তে দেবী প্রতিমা মূর্তি পরিগ্রহ করতো, বাড়ীর ভেতর মেয়ে মহলে নানা কাজের সাড়া পড়ে যেতো, মুড়ি, চিঁড়ে, মুড়কি, নারকেল নাড়ু, নারকেলের ছাঁচ, ক্ষীরের ছাঁচ এসব তৈরী করার ধুম লেগে যেতো। অতিথি-কুটুম এলোজন-বলোজন সবাইকে তো পূজো বাড়ীতে প্রসাদ দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে। এত খাটুনির মধ্যেও সবার হাসিমুখ। উৎসাহ উদ্দীপনায়, একটি ভক্তি নম্র আবেগে সবাই চান দাওয়ার ছোঁয়া লাগা নদীর মত ছলছল করছে। এমনি করে পায়ে পায়ে এসে যেতো পূজার দিনটি, বোধন, সপ্তমী অষ্টমী নবমী, এদিকে পূজামণ্ডপে শোনা যেত পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ—ওঁ সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে—প্রার্থনামন্ত্র—রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি—

অপর দিকে অন্দরে একটু অবসর পেলেই মা কাকিমা ঠাকুমারা বসে যেতেন গানের খাতা নিয়ে, একযোগে গলা মিলিয়ে গাইতেন—

তারা দুর্গে গো মা, তুমি নির্ভয় হয়ো না···
অতসী অপরাজিতা তাতে দুর্গা লম্বিতা
আহলকি পত্র পারিজাত·····

গাইতেন—নবমী নিশি গো পোহায়ো না।

কিন্তু তবু নবমী নিশি পোহাতো। পূজোর দিনগুলো একে একে কেটে যেতো। আসতো বিজয়া দশমী। মায়ের বিসর্জনের দিন। আমাদের বাড়ীতে মায়ের পূজোয় পশুবলির প্রথা ছিল না, তাই পূজোর এ কয়দিন নিরামিষ খাওয়া হতো। কিন্তু নবমী পূজো হয়ে গেলে অর্থাৎ দশমীর দিন আমিষ খাওয়া চলতো। সেদিন সকালবেলাই পুকুরে জাল পড়তো, অনেক বড় বড় মাছ উঠতো। সব প্রজারা সেদিন নিমন্ত্রিত হতো, কাজেই সারাদিন রান্নার ধুম। মা কাকিমা জেঠিমারাই রন্ধনপর্ব সমাধা করতেন, বেলা যত গড়িয়ে যেত ততই সবার মন ভারী হয়ে উঠতো, চোখ ছলছল করতো। যেন সত্যিই বাড়ীর সবার আদরের মেয়েটী আজ বাড়ী ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। সেকালে পূজাপার্বণের মধ্যে দেবতা ও ধর্মের সঙ্গে মানুষের এমনি স্নেহ-ভক্তি আনন্দবেদনায় জড়ানো আত্মার সম্পর্ক ছিল।

সন্ধ্যে হতেই দলে দলে প্রজারা আসতো, উঠোন ভরে সারি সারি সব খেতে বসতো। খুব যত্ন করে তাদের পরিবেশন করা হতো। এই দিনটির প্রত্যাশা করে থাকতো তারা সম্বৎসর।

এদিকের পর্ব চুকে গেলে মণ্ডপ থেকে প্রতিমা এনে বাড়ীর ভেতর উঠোনে রাখা হতো। মহিলারা সবাই তখন অশ্রু ছলছল চোখে ধান, দুর্বা, সিঁদুর, সোনা, রূপো, ঘিয়ের প্রদীপ ইত্যাদি দিয়ে মাকে বরণ করতেন, মুখে দিতেন মিষ্টি, মনে মনে বলতেন—যাগো, আবার এসো মা।

পুরুষেরা আগে তখন গলায় বিসর্জনের গান ধরতেন—

যাকে তাসাইয়া জলে কি লইয়া রহিব ঘরে
ছাইড়্যা দিতে বিদরে পরাণী গো অভয়া—

সেই মর্মস্পর্শী গানের সুরে প্রত্যেকের মন অভিভূত হতো, চোখে আসত অশ্রুধারা, নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বুঝি গানের ভাষায় আকুতি করে গাইতো—

যাগো, সিন্দুরেতে দিয়া পাও
পদচিহ্ন রেখে যাও
আইও হইল বিজয়া দশমী গো অভয়া—

মাগো, আমরা তোমার এই পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে তোমার পুনরাগমনের আশায় একটা বছর কাটিয়ে দেব।

এই গান করতে করতে মিছিল করে মায়ের প্রতিমা বাড়ীর সামনেকার দীঘির দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। হাজাকের আলোয় আলোকিত হত পথ, ঢাক আর কাঁসি বাজত। মেয়েরা ঘনঘন উলু দিতেন। ধূপ-ধৈ ছড়ানো হত প্রতিমার উদ্দেশে। ছোট ছেলেমেয়েরা বাজি পোড়াত, পটকা, ফুলঝুরি, রংমশাল। তারপর দীঘির জলে প্রতিমা বিসর্জন হতো। শূন্য মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সবাই ঘরে ফিরত, তারপর শুরু হতো বিজয়ার প্রণাম আশীর্বাদ আলিঙ্গন মিষ্টি-বিতরণ। আশীর্বাদ করা হতো মাথায় ধান-দুর্বা দিয়ে। আজও প্রতি বৎসর দুর্গাপুজো হয়। সেদিনের সেই সুরটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেই সুরটি এখন শুধু তোলা আছে বুকের গভীরে স্মৃতির কৌটায়। এখন পুজোয় যে রূপ দেখতে পাই তাতে শুধু জৌলুস আর ঝাঁকজমক আলোর রোশনাই আর মাইকের দাপাদাপি। তাও যদি ভক্তি সঙ্গীত হতো তবু না হয় কথা ছিল। এখন পুজামণ্ডপে বাজে আধুনিক প্রেমের গান নয়তো বোম্বাই ছবির হিন্দী গান।

এখন বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের মিছিলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে বিজয়া মানে যে বিসর্জনের বেদনা তা কিছুতেই মনে করা চলে না। যেন একটা হাল্কা আনন্দ উৎসব। সিটি দেওয়া, কোমর ঘুরিয়ে রুমাল উড়িয়ে, রুচিপূর্ণ নাচ হৈ-হুল্লোড়—যেন প্রাণের উৎকট উল্লাসকে ঘাসছাড়া ঘোড়ার মত আলগা করে দেওয়া। এমনি এক মিছিলে একবার দেখেছিলাম এক ব্যক্তি তাঁতের ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এলো মেলো চুলে, হাতে বোতল নিয়ে মাতাল সেজে বিজয়ায় বসে আছেন মিছিলের শোভাবর্ধন করে। দর্শকরা দেখে খুব হাসছেন। আমাদের রুচির মান কোথায় নেমে যাচ্ছে! এই ধরণের পরিবেশে বিসর্জনের বেদনার সুরটি অনুভব করবার অবকাশ কোথায়? অবশ্য সহরের পুজোয় এবং গ্রামের পুজোয় এখনও কিছু তফাৎ হয়তো আছে। তাই এখন বিজয়ার সমাধার পর বিছানায় শুয়ে বুকের গভীরে হাতড়ে হাতড়ে সেই স্মৃতির কৌটাটা নামিয়ে আনি। আস্তে আস্তে তার মুখ খুলতেই তুলে রাখা সেই ভক্তি ছলছল সুরটি হঠাৎ পেরিয়ে এসে শ্রবণ ছুঁয়ে যায়, মনকে ছুঁয়ে যায়—

যাকে তাসাইয়া জলে কি লইয়া রহিব ঘরে
ছাইড়্যা দিতে বিদরে পরাণী গো অভয়া—

অনুভব করি—চোখের কোণে উষ্ণ স্পর্শ।

সেকালের তথা অ-বারোয়ারী পূজার দালান

জ্যোতির্ময়ী দেবী

শহরের বারোয়ারী পূজা মণ্ডপে পূজা দেখতে অত্যন্ত একালের মানুষ জন্মে হয়ত ভুলেই যাচ্ছেন সত্যিকার দুর্গোৎসব কি ভাবে কেমন করে দেশে গ্রামে কুলক্রমাগত প্রথায় ধনী সম্ভ্রান্ত এবং গৃহস্থ বাড়ীতে হত। যেখানে আজো দুতিনশো বছরের আগের একটা কিম্বীট এসে পূজার দালানে ধমকে দাঁড়িয়ে সেই কুলক্রমাগত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়। বাড়ীর ও গ্রামের পাড়ার গৃহিণী বৌ ঝি ছোটছেলেমেয়েদের দল পঞ্চমীর দিন থেকেই আসা-যাওয়া করেন। কত কাজ, চাল বাছা পূজার দালান পূজার বাসন ধোঁয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, পঞ্চামৃত ধূপদীপের যোগাড় ঠিক করে রাখা।

সবচেয়ে বড় উৎসব পূজার দালানে সমবেত শিশুর দল পঞ্চমীর দিন মায়ের চক্ষুদান দেখবে। সে কত রাত্রে কুমোর কর্তা একটী একটী করে চক্ষু আঁকেন। দেশের বা গ্রামের প্রতিমা তো কিনে আনা হয় না। রথের দিন থেকে প্রতিমার কাঠামো খানিতে 'মাটী' দেওয়া হয়। 'একষেটে' 'দোষেটে' করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত গড়ন হতে থাকে। কুম্ভকারের কুমোরের নিয়ম প্রথা অনুসারে দোষেটের অর্থাৎ দুবার 'মাটী' কাঠামোতে বসে গিলে পর্জন তোলে রং গুলে রং দেবার পালা। তখন থেকেই দেশশুদ্ধ বালক বালিকা শিশুদের উৎসব কৌতূহল জমাট বাঁধতে থাকে। পড়াশোনা খেলাধূলার কাজকর্মের ফাঁকে ছোট বড় সব জড় হতে থাকে। পরস্পরকে—কে আগে কতখানি দেখেছে, প্রতিযোগীতা ও তার বিবরণ দেওয়ার ঘটা পড়ে। আগে দেখাতো কম কথা নয়!

এখন পঞ্চমীতে পূজার মণ্ডপে তো ঠাকুরের সাজসজ্জা ও চক্ষুদান-সেখানে বালক বালিকা শিশুদের ভিড়।

ভিড় নৈবেদ্য মণ্ডপে মেয়েদের পরের দিনের বোধনের কাজের ভিড়। যাঁদের বাড়ীতে বোধন তাঁদের সেইসব যোগাড়—তারপর নিজেদেরও ব্রত বটী থেকে হয়।

তারপর ভোরের বেলা থেকে মা দুর্গার মণ্ডপে তাঁর ঘরের বেড়া আলপনার বেড় দেওয়া। মঙ্গল ঘটের নিচে পদ্ম-আঁকা আলপনা।

একটু বয়স্কাদের স্নানান্তের মাথায় চুড়ো করে চুল প্রন্থি দিয়ে বাঁধা। ছোট ছোট বৌ মেয়ের পিঠেই প্রন্থি দিয়ে চুল সামলে কাজে আসা। পাছে মাঙ্গলিক জিনিষে চুল পড়ে অশুচি হয়ে যায়। এদিকে ভিজা চুল। স্নান তো করতেই হবে পূজার কাজে। খোঁপা বেঁধে কাজ করা অন্যাত্তদের নিয়ে চলবে না। যতই সভ্য আধুনিক হোক তারা এই একদিন সব প্রাচীন নির্দেশে চলবে। বিকেল হল, এলো ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। এবারে বোধনতলা বিল্ববৃক্ষ মূলে। অথবা বেল গাছের ডাল পুঁতে বোধনতলায় মায়ের বোধন আহ্বান হবে।

মঙ্গলঘট, নৈবেদ্য, শাড়ী, সিন্দুর, কড়ি, আলতা, শাঁখা, লোহা, চন্দন, ফুল, দুর্বা, বেলপাতা, তুলসী অপরাজিতা, কলপদ্ম, খেকালিকা চাই-ই।

সকালে কলাবৌ স্নান। অর্থাৎ নবপত্রিকা স্নান। কলা কচু হলুদ মানকচু ইত্যাদি ন' রকমের ওষধি গাছ জড়ো করে লাল পাড় শাড়ীর অবগুণ্ঠনে সাজিয়ে গঙ্গায় বা কোনো নদী জলাশয়ের জলে স্নান করানো হয়। আসলে ইনি হলেন ঘটনাহ বা দুর্গার আরেক প্রতীক।

তখন থেকে ইনি তো পূজার দালানে মায়ের পাশে লক্ষ্মীর হাড়িটার পাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বোধনতলায় সন্ধ্যেবেলা গৃহিনী কর্তা বন্ধুদের সকাশে এবং পুরোহিত তন্ত্রধারকদের পুণ্যসামগ্রী যোগাড়ের কাজ। পুরোহিত চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করেন। আর বারে বারে বরণ সামগ্রী নিয়ে 'কলাবৌ' নাম্নী দুর্গা দেবীকে বরণ করে আসেন। চণ্ডীর একটী করে অধ্যায় পাঠ হয়, পুরোহিতের হাতে ঘন্টা বাজে, আর ওদিকে প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে উৎকর্ণ ঢাকী দুলীদের ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে। এক লহমা দেরী হয় না। বোধন, চণ্ডী পাঠ, একটী মঙ্গল ঘট একটী হাড়ির মধ্যে (পাঁচদিন জলবে) জেলে দুর্গামণ্ডপে রাখা হয়। ঘট পুষ্পপাত্র ঠিক করে রাখা হয়। ভোরে মঙ্গল আরতির সময় ভোর পাঁচটার আগেই মঙ্গল আরতির বাজনা বেজে উঠলেই সব জিনিষ ঘোমটা দিতে হবে। গৃহিনীরা আসবেন, ছোট বৌ মেয়েরাও স্নান করে নিয়ে কেউ কেউ আসবে পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে।

কৌতুক এই, যারা চিরকাল পূজার কাজ করে কুমোর-গিন্নি বৌদেরই গৃহিনীরা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে নেন ও কুমোর বৌ কেষ্ট তো কিছু ভুলচুক হল কিনা! ঠিক করে সব কাজ করা হয়েছে তো! কারণ তাদের পূজার পালা চার বছর পরে। কারুর দু'বছর, কারো বা ন'দশ বছর পরেও হয়। ততদিনে কত গৃহিনী বৃদ্ধা স্থবির হয়েছেন, কর্মক্ষমতা নেই, কেউবা পঙ্গু হয়েছেন। সব ছোট ছোট বৌ ঝিয়ের দল ভুলে গেছে অথবা জানে না। তবুও পাড়ার বর্ষীয়সী আর পুরানো কালের লোকজন যারা কাজ করেছে। করে।

ষষ্ঠীতে পুষ্পাঞ্জলি নেই। সপ্তমী থেকে পুষ্পাঞ্জলি পূজা আরম্ভ। বৌ ঝেয়ে অনেকে তিনদিনই দেবে। অনেকে শুধু মহাষ্টমীর দিন থেকে। উপবাস করবে কেউ কেউ সারাদিন। কেউ অঞ্জলি দিয়ে জল খাবে। নানা মত, মতভেদ, বাহনাকা, নানা নারীর। বিধবাদের তো নিয়েমের শেষ নেই। 'হাড়িকাঠ' 'বলির' (তা কুমড়া আখই হোক বা ছাগই হোক) সব খাদ্য অশুচি। অন্ন হবে নিষিদ্ধ। তাছাড়া চারদিনই বার ব্রত তো আছে।

কৌতুক এই, যে যত সভ্য আধুনিক অতি আধুনিকা কলেজে পড়া, ক্লাবে যাওয়া, হোটেলে যাওয়া, বিলাতফেরৎ ও নিষিদ্ধ খাদ্যাখাদ্য ভোজিনীরাও এই কদিন সব গ্রাম্য গেঁয়ো অশিক্ষিত শাশুড়ী প্রশাশুড়ী-প্র-প্রশাশুড়ী—নানা লম্পকীয় গ্রামীণ অথবা নগরবাসী সেকালে গুরুজনদেরও বিশেষ সম্মান সম্ভ্রম করে থাকেন। বিলাতী সুট-পরা ছেলেমেয়ে নিয়ে, খালিপায়ে আলতা পরা খালি পায়ে পাখা সিঁদুর পরে অতি অনুগতভাবে শাশুড়ী স্থানীয়ের পাশে এসে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সহলমনা শাশুড়ীরা কি ভাবেন জানিনা। তবে আধুনিক শাশুড়ীওতো আছেন যিনেকালেও নানা অনাচার করেছেন, সহ্য হয়ত 'শুরু' করেছেন, অথবা অবস্থান্তর ঘটেছে। তিনি নির্লিপ্তভাবে বন্ধুর ঐ সবিনয় সম্মানটুকু মনেমনে সকৌতুকে উপভোগ করেন। এবং তাঁদের গুরুগুরুতো আধুনিকতর মানুষ এখন।

যাই হোক পূজার যতগুলি দিন বা বিশেষ দিবস হল মহাষ্টমী। আর শেষ দিন বিজয়া দশমী এই দুটী দিনই দুর্গোৎসবের মহোৎসব। অবশ্য ষষ্ঠীর দিনটীও কম নয়—নতুন কাপড় পরা, নতুন ঠাকুর দেখতে যাওয়া ছোট ছেলেমেয়ে ও মেয়ে-বৌদের উৎসব। তবে আসে বাড়ীর অথবা শ্বশুরবাড়ীর, সেও—একটা উৎসব বটে।

• • • •

এবারে এলো বিজয়া দশমী। হবি কবরা চিড়া-মুড়কী ভোগ আজ।

বিজয়া থাকে বলে সেটা সকাল বেলাই বারোয়ারী কালবেলা বেছে পুরুতঠাকুরদা দর্পণবিসর্জন সমাধা করে দেন। অর্থাৎ একটী পিতলের গামলায় হলুদ-গোলা জলে একখানি ছোট আরসি রাখা হয়। মায়ের চরণের ছায়া পড়ে জলের মধ্যে সেই আরসিতে, সেটী সকলে দেখে প্রণাম করে আসেন। তার পর পড়ে নির্মাল্য ও আশীর্বাদ দেওয়ার পালা। সবাই জলে জলে কেউ দুর্বা কেউ বিল্ব পত্র কেউ ফুল পদ্ম কেউ সবই নেবেন। পুরুত মশাইও জন বুঝে 'প্রতিষ্ঠা' বুঝে সবাইকে সব দেন।

তারপর আসে মায়ের মাথায় এই চারদিনের অর্ঘ্য নেবার পালা। অতি মাঙ্গলিক ও শুভ কল্যাণদায়ক বস্তু। একশো আট চন্দন সিক্ত দুর্বা একটী ছোট্ট গোছা এই হল অর্ঘ্য। বিপদে সম্পদে মানসিকে মহা সহায় ইনি। সকলে পায়না। কেউ কেউ পায়। খুসী হয়।

এবারে পুরোহিত মায়ের ঘটটা নেড়ে দিয়ে মুকুট খুলে নিয়ে নৈবেদ্যর ঘরে রাখেন। আর ঘরের ঘরণীর মাথায় দিয়ে দেন গাঢ় ঘন সিঁদুর দিয়ে

"সম্বৎসর ব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ"।

"আবার বৎসরান্তে এসো। এসো মা এসো।" সকলের মনে ব্যাকুল প্রার্থনা।

এ জিনিষটা বারোয়ারী মণ্ডপে দেখার আশা কই? দেখাহয় কি? কেউ দেখেন না বোধহয়।

দুপুরের কাজ বিকালের কাজ শেষ হতে হতেই পূজামণ্ডপে সালঙ্কারা সুসজ্জিতা বধূ কন্যারা বর্ষীয়সী গৃহিণীরা জমেন।

কে বরণ করবে? কোন্ শরিকের পূজা। কার ধন অর্থ প্রতিষ্ঠা বেশী? কিংবা কে সবচেয়ে বড়। কিন্তু সধবা নারী হওয়া চাই যিনি বরণ করবেন।

টুল পড়ে, চৌকী পড়ে বরণকারিণী উঠে দাড়ান, হাতে থাকে সিঁদুর সিন্ধি মিষ্টান্ন পান। সিন্ধি সন্দেশ মুখে দিয়ে পান দিয়ে সিঁদুর পরিয়ে আঁচল দিয়ে গা মুছিয়ে নিতে হবে আর কানে বলতে হবে আবার এসো মা। এসো। প্রধান বরণকারিণীর পর সধবা বিধবা গিন্নি বুড়ী যুবতী সবাই ঐ মিষ্টি পান সিঁদুর সিন্ধি নিয়ে মুখে দেবে, চরণ ছোঁয়াবে।

এদিকে তাড়া পড়ে যায় বিসর্জন নিয়ে যাওয়ার। গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে যাবে।

গ্রামের দেবী তো এক চালে চিত্তে একসঙ্গে। সেইভাবেই সকলে মিলে নামানো হয়। পাছে অঙ্গে আঘাত লাগে খুব সাবধান সবাই।

দুর্গামণ্ডপ খালি। খালি একটি ঘট বেদীর ওপর। সহসা দেখা যায় বাড়ীর কর্তা আরো অনেকে রয়েছেন, খড়িকা কাঠি ঘুরিকরে আলতা এবং কলা পাতায় চিনতে নিয়ে।

দেখা হচ্ছে দুর্গা নাম। যত ইচ্ছা ১০৮।১০০।২৮।৪টি যার যা' সাধ্য ও সামর্থ্য।

বিসর্জন হয়ে ঢাকীঢুলীর বাজনা সহ কাঠামো ঘট ফিরে আসে।

গৃহিণীরা বসে থাকেন বরণডালায় থালাখানি আর ছাড়ীকরে সিন্ধির লবণ এবং সন্দেশ নিয়ে।

মাথায় বরণডালা স্পর্শ করিয়ে সিন্ধি মিষ্টি দেওয়া হবে—সকলকে ছোটবড় সবাইয়ের প্রণাম নমস্কার আশীর্বাদ অন্তে।

এই দেবেলে পূজার কল্লোলের কাহিনী।

———

আমার চোখে

ইন্দিরা দেবী

শেষ বর্ষণ দিয়ে ভাদ্র মাস বলে: পরং এসেছে অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে—বর্ষার পালা শেষ হলো।

শরৎ হাতছানি দিলেই পুজোর কথা মনে হয়—আকাশে বাতাসে কেমন পুজো পুজো ভাব। সুনীল নির্বেষ আকাশ—চারিদিক পরিচ্ছন্ন, সতেজ সবুজ, শুভ্র শান্ত। বাতাসে কিসের আমেজ, যেন কানে কানে বলছে পুজো আসছে।

ভাদ্র মাস গেলেই পুজোর কথা মনে হয়। আমাদের ছোট বেলার দেখা পুজোর কথা মনে হয়। মাঝে মাঝে সেকালের আর এখনকার পুজো তুলনা করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেকালের পুজো যা দেখে এসেছি তার অন্যথা দেখলেই মনটা যেন কেমন হয়ে পড়ে।

ছোট বেলায় ক'টা কাপড় জামা হবে, কত ঠাকুর দেখবো ঘুরে ঘুরে, দেশের বাড়ীতে বসে প্রতিমা গড়া থেকে বিসর্জন অবধি দেখবো সেই কথা মনে হতো। আর মনে হয় ছোট কাকিমাদের দল, যারা নতুন নতুন বিয়ে হয়ে এসেছে, লজ্জা লজ্জা আধ ঘোমটা দেওয়া মুখ, যাদের কাজ কেবল ছাদ ভর্তি কাপড় তুলে গুছিয়ে জায়গায় জায়গায় রাখা আর পান সাজা—তাদের কাছে গিয়ে ঝুড়ি ভর্তি পান থেকে অনেক নিয়ে সারাদিন চিবুবো। নলিন জ্যাঠা, প্রথম দাদু যেমন এসে পান ছিবোন। দাঁত নেই তবু মুঠো মুঠো পান খান—প্রথম দাদুর দু কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে—দেখতে ভাল লাগতো না, তবু প্রথম দাদু সেজে ভাইবোনরা মিলে মজা করবো। হতোও তাই—তখন তো আর সার্বজনীন পুজো ছিল না, এক বাড়ীতে পুজো হলে সারা গাঁয়ের লোক মনে করতো নিজের বাড়ী পুজো হচ্ছে। তাই যার গাছে ফুল যার গাছে ফল হতো সব পুজোর নামে উৎসর্গ করে রাখতো। ভাদ্র মাসে নারকোল গাছে লোক উঠতো, বাড়ী বাড়ী গাছ থেকে নারকেল পাড়া হতো, নারকোলের পাতার কাঠি কেটে ঝাঁটি বেঁধে রাখা হতো—নতুন ঝাঁটার জন্যে, অবশ্যই সবই পুজো বাড়ীতে যাবে। তারপর আশ্বিন পড়লে তো কথাই নেই—সব বাড়ীর নতুন জিনিস ৺মায়ের নামেই থাকবে। একটি পুজো—কিন্তু সহযোগিতা পল্লীর সব বাড়ীর। এত বেলাবেশা, ক'দিন সবাই আপন-কেউ পর নয়।

সেই ছোট বেলায় দেখা পুজো—আজকের পুজোর জাঁকজমকের সঙ্গে যেন মন ভরাতে পারে না। এখনকার জাঁকজমক জৌলুসের মধ্যে সেই প্রাণ ভরানো, মন ভোলান জিনিস নেই। যান্ত্রিকতার চাপে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

মহালয়ার আগেই দেশের বাড়ী যাওয়া হতো। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে, শিউলি ফুল কুড়িয়ে কি আনন্দই যে হতো—তার তুলনা মেলে না। আমরা পৌঁছতাম তখন ঠাকুর দালানের প্রতিমার মাটি শুকিয়ে গেছে রং লাগানো সুরু হয়েছে। বংশানুক্রমে যে কারিগর প্রতিমা গড়তো, তাদের আমরা কাকা

বলতাম। সকাল থেকে চুপ করে বসে বসে দেখতাম কেমন করে রং তুলির টান চলেছে, আর কেবলি বলতাম—'কাকা, এরপর কি হবে?' কাদিনের কাকার খালি গা, হাত রং মাখা ময়লা কাপড় প্রায় হাঁটুর উপর আছে—একটু হেসে বলতো। দেখ না বসে কেমন হয়? দুপুরে চান করে খেতে যাবার সময় কাকা বলতো, 'তোমরা যেন রং তুলিতে হাত দিও না, আমি না আসা পর্যন্ত বসে থাক।' একটু একটু করে চোখের টান, ভ্রূ যুগল, মুখের মৃদু হাসিটি পর্যন্ত যখন ফুটে উঠতো-কি ভাল লাগতো। সেই টানা চোখ সেই ভ্রূ সেই মুখের হাসি সেই চলচলে মূর্তি আজ চোখে পড়ে না আর। তারপর সাজ—ডাকের সাজে মা যেই সব পরতেন তারপর মনে হতো মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গলার সাতনরী, হাতের উজ্জ্বল বাউটি মাথায় ঝলমলে মুকুট। চালচিত্রের হরেক রকম মূর্তি ছবি, বড় বড় সোনালী কড়া সব মিলিয়ে এক অত্যুজ্জ্বল মূর্তি। ডাকের সাজের রঙীন বড় আঁচল দু'দিক দিয়ে সাজানো—যেন চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করতো না।

মহালয়া থেকেই বোধন বসতো। তার আগেই ধোয়া মোছা বাড়ীর রং ফেরানো, আসবাবপত্র পালিশ করা শেষ করতে হতো। কত আত্মীয়রা আসতেন—কত রকমারী খাবার করতেন সব রাত দুপুর অবধি গ্যাসের আলো জেলে। ঠেলাগাড়ি করে নারকেল এসে পড়তো—তার খাবার, নাড়ু, তিলের নাড়ু চাল ভেজে গুঁড়িয়ে আনন্দ-নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু। হাঁচের খাবারই বা কত রকম। সেকালের চন্দ্রপুলির জোড়া একালে দেখি না। এখন হয়তো আরো সুন্দর করে শিল্প রুচির পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু সেদিনের সেই রুচি কলাপাতায় ছাঁইটুকু দিয়ে হাতের চাপ দিয়ে বড় বড় চন্দ্রপুলি তার উপরে পেস্তা বাদামের কুচি দিয়ে আঁকা নক্সা, তার বুঝি তুলনা মেলে না। আর একটা খাবার তার নাম 'রসকরা'—নারকেল আর চিনির সংমিশ্রণে এক রকম নাড়ু। এছাড়া নদীয়া জেলা অঞ্চলের এক রকম মিষ্টি খাবার—কদমা, কাটা জেলী। তখন তো আর দেশে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। লণ্ঠন, পিদীম জ্বলতো, হ্যাজাক, গ্যাসের আলো কাজের বাড়ীতে লাগতো। সন্ধ্যে হলেই বড়মা বলতেন: ওরে গোকুল আলো জেলে দে যাবা, দেখতে পাচ্ছি না।

তরঙ্গিনী পিসি আমাদের বাড়ীতে কাজ করতো, কিন্তু শুধু নাম বলে ডাকার স্পর্ধা আমাদের কোনো দিন ছিল না। সারাদিন এইসব দেখতে দেখতে টুকটাক খেতে খেতে ঠাকুর দালানে টানা পাখার নীচে সতরঞ্চি চাদরের উপর ঘুমিয়ে পড়তাম—অনেক রাতে ঘুম হালকা হলে ভোগের ঘর থেকে রাঙাঠাকমা, মেজ জ্যেঠিমা, বড় পিসীমাদের হাতা বেড়ীর আওয়াজ কানে আসতো।

ভোর হতে না হতে বোনেরা মিলে কাপড় ছেড়ে নিজেদের ও অন্যদের বাগানে ফুল তুলতে যাওয়া হতো। বাগানে ঢুকে কী যে ভাল লাগতো। বড় বড় বনপদ্ম, নানা রকম ফুল, শিউলির ডাল যেন সাজানো রয়েছে। ঝরে-পড়া শিউলি আলাদা ভাবে সংগ্রহ করতাম আমরা, তাতে পুজো হতো না, বোঁটা কেটে শুকিয়ে কাপড় ছোপানো হতো। আমরা ফুল তুলতে যেন পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে শুনতাম আশপাশের বাড়ী থেকে জ্যেঠিমা, কাকিমারা ডাকতেন, ওরে তোরা আয়, বাগানে কাউকে ঢুকতে দিইনি, পুজোর জন্য ফুল রেখেছি। প্রতিবেশীর সঙ্গে এত আত্মীয়তা ভালবাসার যেন তুলনা হয় না। এক বাড়ীর কাজ হলেও—সব বাড়ীতেই মনে করতেন একাজ তাঁদেরই।

পুজোর দিনে প্রসাদ বিতরণ, আপামর সাধারণের প্রসাদ খাওয়ার দৃশ্য যেমন মনে হয়—তার সঙ্গে খাসাজী ভোজন হতে হতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যেতো। বড় বড় চুল্লী কেটে এক সঙ্গে দশ বারো হাঁড়ি ভাত ভাল সিদ্ধ হতো।

ভোর থেকেই একতারা বাজিয়ে বৈরাগীর গান শোনা যেত, খই-মুড়কী চিঁড়ে-নাড়ু পয়সা দিয়ে সরা সাজানো আছে। কেউ অমনি যাবে না, দুপুরেও প্রসাদ পাবে। তাছাড়া পুজোর বাসনে যাঁরা আসতেন বসতেন তাঁদের জন্যও রক রকে কাঁসার রেকাবীতে কদ মিষ্টি সাজানো থাকতো।

পূজার তিনটি দিন যেমন বাড়ীতে আনন্দ, তেমনি ঠাকুর দেখতেও একদিন বেরোনো চলতো। যেটো পথ, একটু একটু আলো তবে পথ তো ফুলঝুরি আর বাজিতে, লোকে ভর্তি। পথে যেতে যেসব দোকানে পসার চোখে পড়তো সেখানেও দেখতাম মানুষ পেতে নতুন কাপড় পরে আলোটা উজ্জ্বল করে ব্যবসায়ী বসে আছেন।

এমনি আনন্দ করে বিজয়ার দিন এসে পড়তো। বরাবর যে ঢুলী আসতো—সেদিন তার বাজনা দেখবার পালা। পুজোবাড়ীর দেওয়া নতুন কাপড় পরে সেজেগুজে ঢাক বাজাতে, বাজাতে বাজাতে আত্মহারা হয়ে নাচতে সুরু করতো। বাড়ীর মহিলারা জলে জলে তাকে বখশিষ দিতেন

পুজো শেষে ফিরে আসার সময় কান্নায় মন ভরে উঠতো যখন দেখতাম এই কয়দিনের সঙ্গীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের ঘোড়ার গাড়ীর দিকে ম্লানমুখে চেয়ে আছে।—তারা মহরাকাকাত মেয়ে বৈষ্ণবতী কাপড়কাচা মানুষ নাতনী সরলী। ঘুমোর জাকার ছেলেমেয়ে ফুলু আর গোপালি।

কোলকাতা পৌঁছেও কয়েকদিন ওদের জন্য মন কেমন করতো।

কিন্তু সেদিনের পুজো আর তো নেই। পুজো আছে এবং আগের দিনের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী, তাক জমকের কথাই নেই। শহরে বেশীরভাগই সার্বজনীন। প্যাণ্ডেল করে বৃহৎখান নিয়ে দুইএর পল্লী মতের পল্লী ইত্যাদি নাম দিয়ে মহাসমারোহে পূজা সম্পন্ন হয়। উৎসাহ ও অনুষ্ঠানের শেষ থাকে না। যাত্রা থিয়েটার জলসার আয়োজন প্রচুর। পূজা প্রাঙ্গনে মা আছেন কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরুতরা। জগৎজননীর মূর্তি দেখে ভ্রম হয়। মায়ের মূর্তির স্নিগ্ধতা কোথায় ব্যর্থ হয়েছে। যেমন মায়ের চোখে বেশবাসে সবই তো আমাদের আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভরপুর হয়ে গেছে। বহুজনের ভীড়ে, অত্যাধুনিকের বেড়াজালে, মাইকের সদর্পে ঘোষণায়, মা হারিয়ে গেছেন নাকি? না বহুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন! মনে মনেই প্রশ্ন করি। না, মন ভরে না। কোথায় যেন অতৃপ্তি কাঁটার মত লাগে। পূজামণ্ডপে পূজা হচ্ছে—তার খবর কে রাখে? সর্বজনীন মণ্ডপের জাঁকজমক আছে ঠিকই, ভোগ নেই। বৎসরান্তে মায়ের বিচুড়ী প্রসাদ পাবার জন্য লাইন দিয়ে মায়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। দেখেছি সেইটুকু গ্রহণ করে পরম ভক্তি ভরে নিয়ে যেতে। জননী পর্যায়ে উঠলেই বীরাষ্টমী ব্রত মহাষ্টমীর দিন করার নিয়ম আছে—বাংলাদেশে সেই কারনেই প্রসাদের জন্য প্রতীক্ষা।

একবার পুজোর আগে কোলকাতার ঘুমারটুলিতে গেলাম—যাঁদের বাড়ীর পুজো হবে সেই পৃথ্বিশী তৈরীর কথা বলতে এসেছেন—সখিনী আমি।

খুঁজে খুঁজে নিজেদের পছন্দের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। সব প্রতিমার চোখই মানবীর মত, পুরোনো দিনের আয়ত চক্ষু এবং একত্রিত পরিবারের মূর্তি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ঘুরে ঘুরে হতাশ এসে দাঁড়ালাম একটি দোকানের সামনে,—সেখানে মূর্তি গড়ার প্রস্তুতি পর্ব চলছে।

—মা। কোথায় দেখলাম মা।

দোকান থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কি চাইছেন মা, অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছেন দেখছি ?

—গৃহিণী বললেন : মনের মত প্রতিমা—কিন্তু কই ?

—সেকি মা ? আমরা কারিগর, যেমন বলবেন সেইরকম তৈরী করে দেবো। বোলেই আঙুল দেখিয়ে আধুনিক প্রতিমাগুলি দেখাতে চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম : না ওরকম নয়, মা ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে থাকবেন আর মার সেই দীর্ঘ আয়ত চক্ষু চাই—যাতে জগৎজননীকে প্রশ্ন না হয়। উদ্দীপ্ত মুখটা নিরাশ করে কারিগর উত্তর দিলেন : ও, আপনারা বাংলা ঠাকুর—চাইছেন ? ওসব তো আর চলন নেই মা, আমরা তাই করি না।' বললাম : আমরা অর্ডার দিলে পারবেন না ? কারিগর আঙুল দেখিয়ে বললেন ঐ নিধুবার কাছে যান।

অবশেষে নিধুবাবুর কাছে বলেকয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। তিনি বললেন আমার বাবা করতেন দেখেছি। এখন তো এরকম কেউ বলেন না। তবে আমি বুঝেছি কি চাইছেন আপনারা। আমি করে দেবো।

এই পূজার উৎসবে বাগচি গৃহিণীর বাড়ী দিবারাত্রের বেশী সময়ই বাস হলো। বাড়ীর পূজো, সেই ডাকের সাজের পুরোনো মূর্তি, ভোগের সুগন্ধ, সবই বাল্যকালকে চোখের সামনে প্রস্ফুটিত করালো। পুরোহিত তখন বলছেন—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভীতস্য বদ্ধো জন্তো
ত্বমেকা গতি দেবি নিস্তার কর্ত্রী
নমস্তে জগৎতারিনী ত্রাহি দুর্গে।

মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে প্রসাদ ও নির্মাল্য হাতে বাড়ির দিকে রওনার জন্য পথে এসে দাঁড়ালাম। রঙীন কাপড় জামায় সেজে বালগোপালের দল হাসিমুখে চলেছে পূজা প্যাণ্ডেলের দিকে—চোখে মুখে আনন্দ উৎসাহের সতেজ চিহ্ন। তাদের গন্তব্য পথের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ছিল অন্ধকারে, রাত্রির চাঁদিনী মাখার উপরে নিয়ে শীতল বাতাসে ফুলোফুলের গন্ধে ভরা মেঠো পথ দিয়ে যাওয়ার কথা। পূজাতো আমাদের জাতীয় উৎসব—সেই উৎসবের প্রস্তুতি চলে আমাদের সারাবছর ধরে—কি সুন্দর উৎসব, কি আনন্দ যেন মায়ের মমতামাখা। ধলে গোপালের দল চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল সার্বজনীন মণ্ডপে—তীক্ষ্ণ সুরে মাইক ঘোষণা করলো :—

'আজ কাল তেরে মেরে পেয়ার'…

আবার একটু পরে— 'বাগ মে বাহার হায়'—

সুর ধরে দু আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে চলে গেল একটি তরুণ।

ঢাকের শব্দ মিলিয়ে গেছে।

পুজোয় ভ্রমণ

পুকুল রায়

সারা বছর ধরে দিন গুনি।

শুধু আমি নই, আমার মতন বাংলা দেশের অনেক পরিবারেই এই দিন গোনা চলে।

ভাদ্র শেষে আশ্বিন আসে। বর্ষার একটানা বৃষ্টি'র স্যাৎ স্যাঁতে জল হাওয়ায় মন থাকে আর্দ্র। মনের মধ্যে তখন থেকেই যেন শরতের লঘু পক্ষ মেঘের ভেসে চলার আবেশ। শরৎ আসবে তার সোনালী বর্ণালী রঙের রোদের আভা নিয়ে।

কতদিন? আরো কতদিন?

শরৎ আসে—প্রকৃতি সহাস হয়। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। গ্রাম-বাংলায় আগমনীর সুর—'মা ভোলো, মা ভোলো, বাঁধ মা মুকুল।'

মেনকা রাণীর মেয়ে গৌরী আসছেন। সারা বাংলাদেশ জুড়ে আনন্দের বন্যা।

খড়ের প্রতিমায় মাটি লেপা শেষ—এইবার রং-করা এবং সাজ-পোষাক পরানোর পালা। শহর, গঞ্জ, গ্রাম—সর্বত্রই একই ভাব, একই প্রত্যাশা, একই ছবি।

মহালয়ার পর প্রতিপদ, দ্বিতীয়া—পুজো-পুজো ভাব। ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ ছুটি হ'য়ে গেল। কতার অফিস লম্বা ছুটি। এই সময় সারা বছরের ক্লান্তি এবং অবসাদ ঘুচে ফেলার জন্যে বাইরে যাওয়া দরকার।

প্রতিদিনই চেষ্টা চলছে রেলওয়ে টিকিট কেনার অফিসে—সিট রিজার্ভেশনের জন্যে।

প্রতিবেশিনী বাচ্চুর মা জিগ্যেস করেন, 'এবার ছুটিতে কদ্দূর?' মিষ্টি হাসি হেসে বলি, ইচ্ছে তো বহুদূর পাড়ি দেওয়ার।'

'তবে বাধাটা কিসের?'

প্রতিবেশিনীর কর্তা বড় অফিসের বড় চাকুরে। মোটা টাকা মাস মাইনে। তারপর ট্রেনের ভাড়া লাগে না। লীভ্ কেয়ার কনসেশন সমস্ত ফ্যামিলির জন্যে অফিস থেকেই পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর পক্ষে নৈনিতাল, সিমলা, আর সুদূর কাশ্মীর যাওয়া এমন আর কি বড় কথা?

প্রতিবেশিনীকে বললাম—'বাধা টাকের। আমার কর্তা তো আর অফিসার নন!'

প্রতিবেশিনী একটু ব্যঙ্গ করলেন, 'কিন্তু তাই বলে আর কি করে? পিলেতেই তো সব।'

প্রশ্ন করলাম, 'অর্থাৎ?'

প্রতিবেশিনী হেসে বললেন, 'আদলের চেয়ে সুদই বেশি।'

'কলেজের মাস্টারিতে আবার পিলে বা সুধ কোথায়!' আমার কথায় প্রতিবেশিনী তেমনি হাসি মেশেই বললেন, 'কেন, কলেজ ডি. এ.-র সঙ্গে সঙ্গেই ডি.-এ., ইউ. ডি. সি., টু'পোনি, পার্ট-টাইম ওয়ার্ক, য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা-দেখা, পাঠ্যপুস্তকের নোট লেখা—আরো কত কি!'

'হ্যাঁ আরো কত কি।' সত্যিই প্রতিবেশিনী কলেজের প্রফেসরদের অনেক খোঁজ-খবরই রাখেন দেখছি।

প্রতিবেশিনী বান্ধবী এই সেদিন ঘুরে এসেছেন গ্রীষ্মের স্বল্প-মেয়াদী আনিতে হাজিলিঙে। তারতবরের দূর পাহাড়ে দেশভ্রমণ তাঁর প্রায় শেষ। এবারে আর বেশিদূর যাবেন না। এবারের পরিকল্পনা শিলঙ্। রতোক্তেনডন গুচ্ছের দেশে মেঘ আর পাহাড়ে, বন আর বর্ণালীতে 'মেঘের কবিতা'র কাব্য অনুসরণ করার প্রয়াস হয়ত তাঁর। বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে—মাথায় দু'চার গাছি পক্ক কেশ দেখা দিয়েছে;—কিন্তু মনে এখনো তারুণ্য। বলমলে শাড়িতে, সূক্ষ্ম অলঙ্কারের অলঙ্করণে, টয়লেটের সুগন্ধে এখনো তিনি যৌবনকে ধরে রেখেছেন।

কিন্তু আমাদের আর কি সে বয়েস আছে? তবুও উৎসবের ছোঁওয়ায় মনে রঙ ধরে। সাঁওতালি দেশের রাঙা-মাটির পথ, মহুয়ার গন্ধ কিংবা ধারে কাছের সমুদ্রের ডাক মনকে নাড়া দেয়।'

গ্রীষ্মের অবকাশে যেতনো চলে না। প্রতিবেশিনীর কথাই ঠিক—তখন কর্তার ঘাড় গুঁজে য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ—পূজোর ছুটিতে রসদ জোগাড়ের পালা।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল দূর পাহাড়ে পাড়ি দেওয়ার।

কিন্তু অর্থই অনর্থের মূল। পূজোর চড়া-বাজারে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের কাপড় জামা কেনাকাটিতে অনেক খরচ। তারপর কর্তা এক মুর্শীদাবাদী শাড়ি আর একছড়া গলার হার কিনে বন্ধুকে পড়লেন।

বললেন, 'চলো কাছাকাছি কোথাও যাওয়া যাক্।'

বললাম, 'কোথায়?'

'চলো না ঘাটশীলায়। পাল-মহুয়ার দেশ। উঁচু নিচু টিলা আর লাল কাঁকরে মাটি—হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের মর্মরধ্বনি আর সুবর্ণরেখার মিষ্টি মাছ। মুরগীও খুব সস্তা। ঘাটশীলা থেকে যাওয়া যাবে পাতুডি,—বন আর জঙ্গল, নির্জনতা আর ছোটখাটো পাহাড়, সেখান থেকে তামার খনি রাখা মাইন্স, সেখানে ক'দিন কাটিয়ে চলো রাঁচী। পথের দৃশ্য অবর্ণনীয়। সরীসৃপ পাহাড়ে পথ, উঁচু আর নিচু, পাল পিয়ালের জঙ্গল, নিচে খাদ। রাঁচী হিল্স্, মোরাবাদী হিল্স্ নিয়ে সুন্দর সহর রাঁচী। হুড্রু জোনা-ফলস্-এর ঝরণা-ধারা—দেহ আর মনকে তোমার ভরিয়ে তুলবে।'

স্বামীর কথায় পকেটের দৈর্ঘ্যকে ঢেকে রাখার প্রয়াস।

বললাম, 'তুমি যে কথা দিয়েছিলে এবার অনেক দূর পাড়ি দেবে। দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী,—যেখানে তিন মহাসমুদ্রের সঙ্গম, পূর্বঘাট আর পশ্চিম ঘাটের পাহাড়, বাঙ্গালোর নীলসমুদ্র, মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্, পক্ষী-তীর্থম্, মহাবলীপুরমের অপরূপ সমুদ্র আর প্যাগোডা—শিলালিপির অপূর্ব কারুকার্য। আর শুধু পাহাড় আর সমুদ্র। সেখানেই চলো না কেন।'

আমার কথায় স্বামী হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, চোখ ভরে দেখার জায়গা বটে! কিন্তু পুজোর সময় ওসব জায়গা কি ভালো লাগে?'

'কেন?'

'ওখানে তুমি তো আর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে চাকের কাঠির আওয়াজ শুনতে পাবে না। ধূপ ফুলের ঘোলায়, শিউলির গন্ধে যে পুজোর আমেজ—পাঁচটা বাঙালি-পরিবারের মুখ, পুজোর দিনের প্রসাদ—এ সবের কোন আয়োজনই ওখানে নেই। দক্ষিণ-ভারত, সৌরাষ্ট্র, কাশ্মীর—এসব জায়গায় বাংলাদেশের পুজোর স্পর্শ পাবে না! তার চেয়ে দিল্লী, বেনারস, এমন কী শিমলা পাহাড়ও ভালো—সে সব জায়গায় দুর্গা-বাড়ি আছে—বাঙালীর পুজো আছে।'

বুদ্ধিজীবী স্বামীর চোখের দিকে তাকালাম—এ কী শুধু আর্থিক বৈষম্যকে বুদ্ধি দিয়ে ঢেকে রাখার না, সত্যিই বাঙলা দেশের খাঁটি উৎসব প্রিয় মনের উৎসব ছোঁওয়ার আন্তরিকতা?

বাংলাদেশের ছোট বড় অনেক পরিবারকেই পুজোর ছুটিতে দেশ ভ্রমণে বেরুতে হয়। কেননা, সারা বছরে এরকম লম্বা ছুটি আর পাওয়া যায় না। সারা বছর ধরে চাকরির বন্ধনের ঝোলাল ঘাড়ে নিয়ে সংসারের সংগ্রাম ক্লান্ত হয়ে মনের রসদ সংগ্রহের এই সময়টাই হচ্ছে প্রশস্তকাল। গ্রীষ্মের হাঁসফাঁস নেই, শীতের তুহিনতা নেই, নির্মল প্রসন্ন-প্রকৃতি মনে একান্ত হওয়ার এমন চমৎকার সুযোগ অন্য সময় পাওয়া যায় না। আর ভ্রমণ-প্রিয়, প্রকৃতি-রসিক বাঙালী যেমন এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে ফিরে বেড়ায়, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোকের তেমন মানসিক গঠন নয়। পুজোর অবকাশে তাই ট্রেনে ট্রেনে ভিড়,—জায়গায় জায়গায় বসতি—ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে বাঙালীর সংসার। হল বেঁধে দর্শনীর স্থানের লিট নিয়ে মালপত্তর বোঝাই বাঙালী সমাজ কাছে থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের কামরায় কামরায়।

'এবারে কোথায়?'

'দিল্লী, বেরাদুন, মুসৌরী, হরিদ্বার।'

কিংবা 'লক্ষ্ণৌ, নৈমিতাল, রাণীক্ষেত, আলমোড়া হয়ে কৌশানি—শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বেশ আর রঙ।'

না হয়ত দক্ষিণে শুধু 'সমুদ্র আর সমুদ্র, সমুদ্র আর পাহাড়।'

না হয়ত পুবে আসামের 'অরণ্য আর নদী।'

মহাপ্রস্থানের পথযাত্রীও কম নয়।

কিন্তু মহাপূজার উৎসব-ছোঁওয়া ঘরে কাছের পাহাড়ী আর সাঁওতালী জায়গাগুলি মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্তের তীর্থস্থান—যেখানে গোটা সংসার নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য আর স্বামীর কথায় সেই জায়গা যেখানে পুজোর স্পর্শ আছে।

স্বামীর কথায় সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'তাহলে চলো ঘাটশীলা, পাকুড়ি, জামসেদপুর ঘুরে বাঁচী হয়ে ফেরা যাবে। মহাপূজোর সময় শুধু মায়ের মুখ দেখা যাবে। মহাষ্টমীর মহাপ্রসাদ পাওয়া যাবে। পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুর, টিপ, মাথায় এয়োতির চিহ্ন, লাল টকটকে শাড়ি পরা খাঁটি বাঙালী গৃহীপনার সংসারের স্বাদ পাওয়া যাবে। সত্যিই পুজোর সময় দূরপাল্লার গেলে যেন বিদেশ বিদেশ ঠেকে। আগেকার দিনে গ্রামেই ছিল ফিরে আসার টান। এখন যে গ্রাম নেই,—তাই অন্য গ্রামেই আমাদের যেতে হয়। তবু পুজো-ছাড়া জায়গা কি ভালো লাগে?'

আমার কথায় স্বামীও পুলকিত হলেন। বললেন, 'তাহলে চলো প্রফেসর সোম ক্যামিলীকেও বলি। এক যাত্রায় যত দল ভারি করা যায় ততই ভালো।'

সুবর্ণরেখার কলকল্লোলের সঙ্গে ঢেউ-এর মর্মর শব্দ—টিলায় টিলায় শরতের সোনালী রোদ্দুর আর পূজা-মণ্ডপে ঢাকের শব্দ—সেখানে সমবেত এক এক বাঙালি পরিবার—পূজার অবকাশে মিলিত একাত্মবর্তী আত্মীয়তায় আবদ্ধ।

আর আশ্চর্য সুবর্ণরেখার তীরে বন-জঙ্গলে যে বুনো ফুলের গন্ধ তাতে বাংলাদেশের গন্ধ। চারধারের ক্ষেতপ্রান্তরে কাশের দোলা, আর কাঁকরে মাটিতেও কী করে যেন বাংলার শিউলি-গাছের তলে তলে শিউলির মেলা বসেছে।

—: বিজয়া :—

শ্রীরামচন্দ্রের আকুল আহ্বানে শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রহরণধারিণী অসুরনাশিনী দুর্গামূর্তিতে জেগেছিলেন। বিজয়া এসেছিল, রাবণ নিহত হয়েছিল, সীতার উদ্ধার হয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্র করেছিলেন বিজয়লাভ। অযোধ্যায় বিজয়ার গীতি ধ্বনিত হয়েছিল। সমগ্র হিন্দুজাতির অন্তর আহ্বান সে বিজয়ার স্মৃতিকে প্রতি বছর বহন করে চলেছে।—এই দিনটিতে শত্রু ও মিত্র, বন্ধু ও বিরোধী, উচ্চ ও নীচ, দূর ও নিকটকে এক করে দেখবার এমন সুযোগ, এমন অবকাশ আর নেই। বিজয়ার শান্তি ও আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে জাতির জীবন নবজন্ম পরিগ্রহ করে। আপনাকে ও অপরকে আমরা যেন নতুন করে ফিরে পাই—বিজয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনের প্রারম্ভ ও নতুন জীবনের প্রকাশ। বিজয়া নবজীবনের জয়যাত্রা হোক এই প্রার্থনা করি।